এই লেখক প্রণীত

প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—১ম

সমালোচনার কথা

রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস (সম্পাদিত)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ চৈতন্যযুগ

খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩—১৬০৫ অব্দ

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., ডি.ফিল.,

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের নিবেদন

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিশাল পটভূমিকায় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল।

প্রথম খণ্ড মুদ্রণের সময় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনার পরিকল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু নানাবিধ উপাদান সংগ্রহের পর পূর্বপরিকল্পনার ঈষৎ পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। অতঃপর এই গ্রন্থ নিম্নোক্ত পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত হইয়া পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত হইবে :—

প্রথম খণ্ড—খ্রীঃ ১০ম-১৪৯৩ অব্দ (আদি ও প্রাক্‌চৈতন্য পর্ব)
দ্বিতীয় খণ্ড—খ্রীঃ ১৪৯৩-১৬০৫ অব্দ (চৈতন্য পর্ব)
তৃতীয় খণ্ড—খ্রীঃ ১৬০৬-১৮শ শতাব্দী (উত্তরচৈতন্য পর্ব)
চতুর্থ খণ্ড—খ্রীঃ ১৯শ শতাব্দী (আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়)
পঞ্চম খণ্ড—খ্রীঃ ২০শ শতাব্দী (আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায়)

প্রায় তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল ; সম্প্রতি প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। যাঁহারা প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার অবলম্বিত রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত আছেন। আমি সমগ্র জাতির মনোজীবনের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যকেই সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তনের প্রধান নিয়ামক শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, এবং সেইজন্য এই আলোচনায় মধ্যযুগের বাঙলাদেশের সমাজ, সভ্যতা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি।

বক্ষ্যমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে চৈতন্যযুগের (ষোড়শ শতাব্দী) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকালে তৎকালীন ধর্ম, সমাজ, আধিমানসিক জীবন ও সাধনার কিছু কিছু পরিচয় লইয়া আমার ধারণা হইয়াছে—চৈতন্যদেবের আবির্ভাব না হইলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশ ঘটিতে পারিত না। চৈতন্যদেব মধ্যযুগের বাঙালী-জীবনের স্পর্শমণি তাহাতে কোন

সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই স্বর্ণপ্রভা প্রকৃষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে তদানীন্তন সাহিত্যে। এইজন্য তৎকালীন ইতিহাসের পটভূমিকা, চৈতন্যজীবনাদর্শ, বৈষ্ণবসমাজ, সম্প্রদায়, দল-উপদল, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে নানা তথ্য সন্ধান করিয়াছি। পরিশিষ্টে ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান প্রধান পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে যাহাতে অন্যান্য দেশের সাহিত্যের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠক-পাঠিকার কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এইজন্য প্রসঙ্গক্রমে দুই একটি কথার ইঙ্গিত দিয়াছি।

এই গ্রন্থ রচনার জন্য উপাদান সংগ্রহ, বিভিন্ন পুঁথির পাঠবিচার, প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে আমি নানা জনের নিকট সহায়তা লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ অনুজকল্প অধ্যাপক শ্রীমান শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আমার ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান পাঁচুগোপাল দত্ত এবং সুখ্যাত তরুণ সাহিত্যিক পরম স্নেহভাজন শ্রীমান শংকর নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। আশুতোষ মিউজিয়মের কিউরেটর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় মিউজিয়মে রক্ষিত দুইটি প্রস্তর মূর্তির আলোকচিত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমার ছাত্র শ্রীমান্ সত্যকিঙ্কর সাঁইয়ের চেষ্টায় আমি 'পদকল্পতরু'র প্রাচীন পুঁথির পাটায় অঙ্কিত কৃষ্ণলীলার একখানি আলোকচিত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিবিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালা ও সংগ্রহশালা এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরী হইতে প্রয়োজনমতো অনেক পুঁথি-প্রাচীনগ্রন্থ-পট-মূর্তি-লিপিলেখন দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ইতিহাস ও সমাজ-ঘটিত নানা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

অ. কু. ব.

বাংলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ

খ্রীঃ ১৪৯৩-১৬০৫ অব্দ

BANGLA SAHITYER ITIVRITTA (Vol. 2)

(History of Bengali Literature, Vol. 2)

BY

Dr. Asit Kummar Banerjee

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা : ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি

সূচনা ॥

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত এই কাল-সীমা বিস্তৃত। ১৪৮৬ খ্রীঃ অব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম এবং ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের রাজ্যপ্রাপ্তি; এই ১৪৯৩ খ্রীঃ অব্দের পূর্ববর্তী কালের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। বক্ষ্যমাণ পর্বে প্রধানতঃ চৈতন্য-প্রভাবান্বিত বাংলা সাহিত্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রয়াস করা যাইতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও চৈতন্য-প্রভাবান্বিত বাঙলার সংস্কৃতির যে বিচিত্র বিকাশ দেখা যায়, তাহাকে কেহ কেহ য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সহিত তুলনা দিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে এই জাগরণের অর্থ—চিন্তাশক্তি, হৃদয়বৃত্তি ও অধ্যাত্মচেতনার অভিনব বিকাশ। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস যদি য়ুরোপের সংস্কৃতি, জীবন, চিত্তপ্রবাহ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য-প্রভাবান্বিত যুগও বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-মানসকে একটা বিশাল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর জীবনাবেগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।[১] অবশ্য চৈতন্যদেব মূলতঃ ধর্মীয় চেতনাকে প্রেমভক্তির গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করিয়া প্রাকৃত জীবনকে দিব্য ভাবানুষঙ্গ দান করিয়াছিলেন। কাজেই য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে চৈতন্যযুগের একটা মৌলিক পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। রেনেসাঁসের জীবনবাদী রসাবেশ ও দার্শনিক প্রত্যয় এবং চৈতন্যযুগের দিব্য রসাবেশ এক-জাতীয় নহে, বরং একে অপরের বিরোধী। প্রাকৃত মানুষ, বস্তুজগৎ এবং সুখ-দুঃখের নিবিড় জীবনরস রেনেসাঁসের একটা বড় লক্ষণ। কিন্তু চৈতন্যযুগে দিব্যজীবন, 'উজ্জ্বল' রসোল্লাস ও অমর্ত্য আকাঙ্ক্ষার পাবনী ধারা বাঙলার

১ J. N. Dasgupta—*Bengal in the Sixteenth Century*

চৈতন্যলোকে ভাববৃন্দাবনের মহিমা সঞ্চারিত করিয়াছিল। কাজেই য়ুরোপীয় রেনেসাঁস ও 'চৈতন্য রেনেসাঁসের' মধ্যে 'বহুত অন্তর'। কিন্তু বাহিরের দিক হইতে পার্থক্য থাকিলেও এই দুইটি ভাববৈশিষ্ট্যের মধ্যে গূঢ়তর সাদৃশ্য আছে। রেনেসাঁসে যেমন মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বস্তুপ্রত্যয়গত চেতনার প্রসারের ফলে জীবনের একটা মহৎ মূল্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, চৈতন্যযুগেও প্রেম ও ভক্তি মানুষের চেতনাকে সেইরূপ একটা বিশাল উপলব্ধির অসীমলোকে উন্নীত করিয়াছে। চিত্তবিস্ফোরণ রেনেসাঁসের মূল বৈশিষ্ট্য; চৈতন্যযুগেও বাঙালীর সেই চেতনার সম্প্রসারণ হইয়াছে; তবে তাহার মূলে ছিল নিঃশ্রেয়স্ প্রেম ও ভক্তিকৈবল্য। চৈতন্যদেবের প্রভাবেই বাঙালীর সাহিত্য, ধর্ম ও দৈনন্দিন আচার-আচরণ তুচ্ছতার অগৌরব হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এই যুগাদর্শে মানুষের নৈতিক জীবন, সামাজিক বিধি-কর্তব্য প্রভৃতি জীবনের আধিভৌতিক দিকটাও উপেক্ষিত হয় নাই। এইজন্য আমরা বাংলা সাহিত্যের এই পর্বকে চৈতন্যযুগ নামে অভিহিত করিতে চাই।

পরবর্তী কালে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে ইংরাজ-প্রভাবে যে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে—বিশেষতঃ শেষার্ধে প্রায় অনুরূপ ধরণের একটি আত্মপ্রসারণশীল মানবচেতনা লক্ষ্য করা যাইবে। এই জন্য বলা হয় যে, বাঙলাদেশ দুইবার সর্বাঙ্গীণ মানস-জাগরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে—একবার চৈতন্য প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে, আর একবার পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে। ঐতিহাসিকের মন্তব্যটি এই দিক দিয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। "The renaissance which we owe to English rule early in the nineteenth century had a precursor—a faint glimmer of dawn no doubt two hundred and fifty years earlier."[২]

চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সেই নবজীবন-অভ্যুদয় কতদূর আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে তাহাই আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। অবশ্য তাহার পূর্বে আমরা সমসাময়িক কালের বাঙলাদেশের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস কেন আলোচনা করিতে চাই, তাহা বোধহয় বিস্তারিত আকারে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে

---

২ *History of Bengal* (Vol. 2)—Edited by J. N. Sarkar

প্রত্যক্ষভাবে দেশ ও কালের প্রভাব সুপরিস্ফুট না হইলেও, সাহিত্যের অন্তরালে যেমন একটা জাতির আধিমানসিক সত্তা লুকাইয়া থাকে, তেমনি অনেকগুলি বাস্তব ও ভৌম কারণও অন্তর্নিহিত থাকে। তাহাই ইতিহাস—জনজীবন ও সভ্যতার নানা উপকরণ। তাই আমরা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের রূপ, রীতি ও ভাবাদর্শকে তৎকালীন দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

১

ইতিহাসের সঙ্কেত

১৪৮৬ খ্রীঃ অব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয় এবং ১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মর্ত্যলীলা সাঙ্গ হয়। কেহ কেহ বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যযুগ বলিতে খ্রীঃ ১৪৮৬—১৫৩৩ অব্দ, মোট সাতচল্লিশ বৎসর বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের যথার্থ প্রভাব সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করে তাঁহার তিরোধানের পর। জীবৎকালে তাঁহার অলোকসামান্য প্রভাব নবদ্বীপ, নীলাচল এবং বৃন্দাবনের ভক্ত-গোস্বামী-সমাজেই কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্য, বাঙালী-মানস ও সমাজে চৈতন্যসংস্কৃতির যথার্থ প্রভাব আরম্ভ হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং তাহা পরিপূর্ণ চিত্তবৈশিষ্ট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এই শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাবের ভরা জোয়ার শুরু হইয়াছে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক হইতে, এবং তাহার চূড়ান্ত ভাবরস-স্ফীতি লক্ষ্য করা যাইবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে। এইজন্য পঞ্চদশ শতাব্দীর সমাপ্তি হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত কিঞ্চিদধিক শতবর্ষের কালপর্যায়কে চৈতন্যপর্ব নাম দিতে পারি। ১৪৯৩ খ্রীঃ অব্দে হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতানরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন,[৩]

[৩] ঠিক কোন্ বৎসর হুসেন সিংহাসন লাভ করেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাঁহার নামে প্রচারিত প্রাচীনতম মুদ্রায় যে মুসলমানী সন উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। মান্দারণ হইতে যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বোধ হয় ১৪৯৪ অব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রশংসাবাচক উক্তি আছে। ১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দে মালদহে প্রাপ্ত একখানি লেখে তাঁহাকে 'খলিফা তুল্লাহ্' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই অনুমান হয়, ১৪৯৩ খ্রীঃ অব্দেই তিনি সিংহাসন লাভ করেন।

১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দে মানসিংহ কাচোয়া বাঙলাদেশে মুঘল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হন, এবং ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে আকবরের দেহান্ত হয়। সুতরাং চৈতন্য-যুগের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস রাজনৈতিক ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে মোটামুটি মিলিয়া যাইতেছে। যদিও রাজনৈতিক ইতিহাসের উত্থান-পতনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রেখায় রেখায় মিল সর্বদা লক্ষ্য করা যায় না, প্রয়োজনও নাই—তবু চৈতন্যযুগ (ষোড়শ শতাব্দী) এবং হুসেন্ শাহের রাজ্যপ্রাপ্তি (১৪৯৩ খ্রীঃ অঃ) হইতে আকবরের দেহান্ত (১৬০৫ খ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক কালপরিক্রমার মধ্যে একপ্রকার সঙ্গতি আবিষ্কার দুরূহ নহে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই একশত বৎসরের ইতিহাসকে এইভাবে বিভক্ত করা যায় ঃ—

(ক) হুসেনশাহী বংশ (খ্রীঃ ১৪৯৩-১৫৩৮ অব্দ)

(খ) শের শাহ্ ও সুর বংশ (খ্রীঃ ১৫৩৮-১৫৬৪ অব্দ)

(গ) কররানি বংশ (খ্রীঃ ১৫৬৪-১৫৭৬ অব্দ)

(ঘ) বাঙলায় মুঘল অভিযান ও মানসিংহ (খ্রীঃ ১৫৭৬-১৬০৫ অব্দ)

উল্লিখিত সনপঞ্জী অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, হুসেন শাহী বংশ, সুরবংশ, কররানি বংশ—এই তিনটি বংশধারাই আফগান বংশোদ্ভূত—চলিত কথায় 'পাঠান' নামে পরিচিত। ১৪৯৩ সালে হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা এবং ১৫৭৬ সালে মুঘল বাহিনীর অধিনায়ক মুনিম খাঁ কর্তৃক কররানি বংশের শেষ সুলতান দাউদ খাঁর শিরশ্ছেদ। তারপর পাঠান-আফগান দলপতিগণ কখনও এককভাবে, কখনও-বা দলবদ্ধভাবে মুঘল অভিযানকে নানাভাবে বাধা দিলেও শেষ পযন্ত বাঙলা ও বিহারের পাঠানশক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে লোপ পায় এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে মুঘল শাসন-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বাঙলাদেশে সুদৃঢ় হইতে আরম্ভ করে। নিম্নে সংক্ষেপে সেই ঐতিহাসিক কালবিবর্তনের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(ক) হুসেনশাহী বংশ (১৪৯৩-১৫৩৮) ॥

হুসেনশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আলাউদ্দিন সেরিফ মেক্কা' হুসেন খাঁ মধ্যযুগীয় বাঙলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক পরিচিত, খ্যাতিমান ও গৌরবান্বিত সুলতান বলিয়া সম্মান পাইয়াছেন। ব্লখ্ম্যান তাঁহার সম্বন্ধে

যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, মহামতি হুসেন শাহের নাম উড়িষ্যার সীমান্ত হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হইয়া আছে।[৪] অনেক বাঙালী কবি, ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক—হুসেনের নাম উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।[৫] চৈতন্যপ্রভাবের সূচনা, ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, নব্যন্যায়-নব্যস্মৃতির প্রারম্ভ—সমস্তই হুসেন শাহের আমলেই হইয়াছিল। উপরন্তু দেশে দীর্ঘদিন এমন শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করিয়াছিল যে, হুসেন শাহী আমল বাঙলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

হুসেন শাহ সম্বন্ধে অনেক গল্প ও লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। 'চৈতন্য-ভাগবত' অনুসারে তিনি বাল্যে নাকি সুবুদ্ধি রায় নামক এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য বা রাখাল ছিলেন। আর এক মতে, তিনি নাকি হিন্দুরমণীর সন্তান। কেহ-বা অনুমান করেন, রঙপুর তাঁহার জন্মভূমি। হুসেন শাহ ইতিহাসে এমন বিস্ময়কর প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিলেন যে, কালক্রমে তাঁহার সম্বন্ধে নানা গালগল্প চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ তাঁহার জন্মভূমি নহে। আরবের তিরমিজ অঞ্চলে অভিজাত সৈয়দবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার ভাগ্যান্বেষী পিতা ভারতবর্ষে হাজির হন। ইঁহার পুত্র সায়িদ হুসেন; ইনি নিজ প্রতিভা ও প্রভাবের বলে হাবসী সুলতান সামসুদ্দিন মুজফ্‌ফরের উজির হইয়াছিলেন। হুসেন হাবসী দুঃশাসন হইতে বাঙলাকে রক্ষা করেন এবং সুলতান মুজাফ্‌ফরের মতো নিষ্ঠুর নির্বোধ অত্যাচারী নরপশুকে হত্যা করাইয়া বাঙলাকে আবার সুখসৌভাগ্যের মধ্যে বিকশিত হইবার সুযোগ দেন। অনুমান হয়, তিনি আফগান ওমরাহদের সহায়তায় হাবসী সুলতানের অবসান ঘটাইয়া গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।[৬] হুসেন সম্ভবতঃ আরবী ভাষায় পরম অভিজ্ঞ ছিলেন; ইসলামী 'তমদ্দুন' ও সংস্কৃতিতে তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকিবারই কথা, কারণ তিনি নিজে সৈয়দবংশে জন্মগ্রহণ

---

[৪] "The name of Hussain Shah, the good, is still remembered from the frontier of Orissa to the Brahmaputra." (J A S B—1873)

[৫] চট্টগ্রামের কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, পদকার যশোরাজ খান, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই প্রভৃতি কবিগণ হুসেনের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন।

[৬] বাঙ্গালার ইতিহাস (২য়)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

করেন। বিদ্যাবুদ্ধি, চাতুরী এবং মহানুভবতার সমন্বয়ে তিনি বাঙলাদেশে একটি স্থায়ী শাসনব্যবস্থা ও শান্তিপূর্ণ জীবনধারা প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চারিদিকে ঘনায়মান বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের জন্য হুসেন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। সর্বপ্রথম তিনি হাবসী সেনা ও দেহরক্ষীদিগকে দূর করিয়া দিলেন[৭]; প্রাসাদরক্ষী হিন্দু পাইকদিগকেও বরখাস্ত করিলেন[৮] এবং সেনা-বাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা আনিলেন। হাবসী শাসনে হিন্দু জমিদার ও আফগান আমীর-ওমরাহদের অভিজাততন্ত্র ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। হুসেন বুঝিলেন যে, রাজ্যব্যবস্থা দৃঢ়তর করিতে হইলে একদল রাজপাদানুধ্যাত অভিজাত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা এবং প্রধান ব্যক্তিদের সহায়তা প্রয়োজন। বোধহয় এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি পূর্বতন আমীর-ওমরাহ ও অভিজাতশ্রেণীকে পুনরায় পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সিংহাসনের চারিদিকে একটি বিশ্বাসী অনুচরসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন।

হুসেন শাহ বাহিরের দিকেও অনেকগুলি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোনটির-বা নিজেই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সুকৌশলে সিকান্দার লোদির সঙ্গে সন্ধি এবং উত্তর-বিহার অধিকার (১৪৯৫), কামরূপ জয় ও আসাম অভিযান (১৪৯৮-১৫০২), উড়িষ্যা অভিযান (পুরী মন্দিরে রক্ষিত 'মাদলা পঞ্জিকা' অনুসারে ১৫০৯ খ্রীঃ অঃ[৯]), ত্রিপুরার সঙ্গে যুদ্ধ (১৫১৩) এবং ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামকে নিজ অধিকারে আনিয়া তিনি বিচক্ষণ বুদ্ধি ও প্রশংসনীয় সমরকুশলতার পরিচয় দেন। একমাত্র আসাম অভিযান ছাড়িয়া দিলে তাঁহার কোন অভিযানই ব্যর্থ হয় নাই। শেষ পর্যন্ত তাঁহার অধীনে বাঙলার সীমা উত্তর-পশ্চিমে সরণ এবং বিহার, দক্ষিণ-পূর্বে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম, উত্তর-পূর্বে হাজো এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে চব্বিশ পরগণা ও মান্দারণ (হুগলী জেলায় অবস্থিত) পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। দেশে শান্তি

৭ হাবসীগণ ইহার পরে গুজরাটের সুলতানের অধীনে কর্ম লইয়াছিল। দ্রষ্টব্য—রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস (২য়)

৮ এই হিন্দু পাইকগণ মেদিনীপুরের অধিবাসী। ইহাদিগকে বরখাস্ত করিয়া তিনি বিশ্বাস-ভাজন নূতন দেহরক্ষী নিয়োগ করেন। দ্রষ্টব্য, চার্লস্ স্টুয়ার্ট প্রণীত *History of Bengal.*

৯ কিন্তু হুসেনের একটি মুদ্রায় (১৫০৪-৫) জাজপুর-উড়িষ্যা জয়ের কথা আছে।

বিরাজ করার ফলে এই সময়ে বাঙলার সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রগতি ও জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

কতকগুলি বিষয়ে হুসেনের আশ্চর্য উদারতা ছিল। অনেক অভিজাত হিন্দুকে তিনি অন্তঃপুর ও রাজকার্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কর্ণাট ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় সনাতন ও রূপ তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি সনাতনকে 'সাকর মল্লিক' এবং রূপকে 'দবীর খাস' উপাধি দিয়া গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণীর কায়স্থ-প্রধান পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু) হুসেনের উজীর হইয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে পুরন্দর অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার দুই ভাইকেও উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা হয়। মুকুন্দদাস, অনুপম (রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)—ইঁহারাও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হুসেনের প্রধান দেহরক্ষী ছিলেন একজন হিন্দু—কেশব ছত্রী। প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য মুকুন্দ সেন হুসেনের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ত্রিপুরা অভিযানের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন গৌর মল্লিক। হুসেন রাজকার্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হন নাই তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এমন কি, চৈতন্যদেবের প্রতিও তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না, বা কোনরূপ ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাও প্রকাশ পায় নাই। কেশব ছত্রীর নিকট চৈতন্যের কথা শুনিয়া হুসেন বলেন :

যেখানে তাহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥
সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।
বিরলে থাকুন কিবা যেন লয় মন॥
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন॥[১০] (চৈতন্য ভাগবত)

[১০] কিন্তু ভক্তগণ বোধ হয় হুসেনকে পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কারণ এই সুলতানই

ওড়্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কতমত করিল প্রমাদ॥

বাস্তবিক উড়িষ্যা অভিযানে হুসেনের সেনাপতি এবং স্বয়ং হুসেন হিন্দুর দেবমন্দির ভাঙিয়াচুরিয়া বিধ্বস্ত করেন, জগন্নাথ বিগ্রহকেও অপবিত্র করেন, বহু হিন্দু নরনারী নির্বিচারে বিনাকারণে নিহত হয়। সেইজন্য ভক্তগণ হুসেনের অনুকূলতা সত্ত্বেও চৈতন্যকে অবিলম্বে গৌড়ের সামীপ্য হইতে সরাইতে চাহিয়াছিলেন।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' অনুসারে মনে হয়, হুসেন রাজনৈতিক কারণে কোন কোন সময়ে হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন চালাইয়াছিলেন। হয়তো নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ বর্ণদের সংহত হইতে দেখিয়া হুসেন শাহ কিয়ৎ-পরিমাণে শঙ্কিত হইয়া থাকিবেন। সে যুগের রাজনৈতিক তরল অবস্থার যুগে যে-কোন রাজা এইরূপ শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। তাই নবদ্বীপে হিন্দু-সমাজের উপর কিছু কিছু উৎপীড়ন চলিয়াছিল :

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে জার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥

পরে অবশ্য হুসেনের অনুগ্রহে নবদ্বীপের রাজভয় দূর হইয়াছিল। জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল' খুব প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, সুতরাং এ সাক্ষ্য কত দূর গ্রহণযোগ্য তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। ভাগবতে কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্বে যেমন কংসের অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে, চৈতন্যাবির্ভাবকে সমপর্যায়ে তুলিয়া ধরিবার জন্য বৃন্দাবনের রাজভয়ের সঙ্গে নবদ্বীপের রাজভয়ের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কিনা তাহাও বিবেচ্য।

আসাম অভিযানে হিন্দু জমিদারদের (মল্লকুমার, রূপনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি) সমস্ত শক্তি চূর্ণ করিয়া হুসেন কামতেশ্বরীর মন্দির ধ্বংস করেন। যুদ্ধবিগ্রহে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তবে উড়িষ্যা অভিযানে তাঁহার সেনাপতি ইসমাইল গাজী অত্যন্ত নির্মমভাবে পুরী ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস অথবা অপবিত্র করিয়াছিলেন—প্রবলভাবে ধর্মান্তরীকরণ যে হয় নাই তাহা নহে।[১১] যুদ্ধকালীন অত্যাচারের কথা ছাড়িয়া দিলে

[১১] 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এর মতে হুসেন শাহ নাকি তাঁহার বেগমের অনুরোধে পূর্বতন প্রভু ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধি রায়কে 'কারোয়ার পানি' খাওয়াইয়া জাতি নাশ করিয়াছিলেন। হয়তো এই সমস্ত গালগল্পের পশ্চাতে কিছু সত্য থাকিতে পারে। স্বার্থবুদ্ধি অথবা অত্যাচারের ভয়ে এই সময়ে যে কিছু কিছু হিন্দু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বারবোসা নামক এক পর্তুগীজ পর্যটক ১৫১৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙলা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রমণলিপিতে আছে যে, গৌড়ের মুসলমান সুলতানের দয়া ও সুযোগ-সুবিধা পাইবার জন্য বহু হিন্দু ('Gentiles') মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, রূপসনাতনও সুলতান-সাহচার্যে ও দরবারী আদর্শে খানিকটা মুসলমানী আচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে চৈতন্যসংস্পর্শে বৈষ্ণব হইয়াও তাঁহারা স্বসম্প্রদায়ে একটু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেন।

হুসেনকে উগ্র সাম্প্রদায়িক শাসক বলা যায় না। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে (শাসনকাল—১৩৪২-১৩৫৭ খ্রীঃ অঃ) বাদ দিলে হুসেন শাহকেই মধ্যযুগের বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান বলিতে হইবে। তাঁহার রাজত্বকালে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হয়; তিনি নিজে একজন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, মকদুম-মাদ্রাসা স্থাপনে বিশেষ অর্থসাহায্য করিতেন। অবশ্য হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া মনে হয় না। তখন টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা হিন্দু ভূস্বামীদের দানেই চলিত। হুসেন শুধু মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ তৎপর ছিলেন। ৯০৭ হিজিরায় একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়া তাহার গাত্রে তিনি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন—"এমন কি চীন পর্যন্ত যাইয়াও জ্ঞানান্বেষণ কর!"[১২] তিনি কিরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তাহার প্রমাণ, বহুচেষ্টার পর কামতাপুর জয়ে উল্লসিত হইয়া হুসেন মালদহে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[১৩] ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দ—মোট ছাব্বিশ বৎসর বাঙলা শাসন করিয়া এবং রাজ্যশাসন ও সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া হুসেন সেকালের পক্ষে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নুসরৎ শাহ সর্ববিষয়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেও কালগতিকে এই বংশের মহিমা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল এবং হুসেনের মৃত্যুর উনিশ বৎসরের মধ্যে বাঙলা হইতে হুসেনশাহী বংশধারা লুপ্ত হইল।

'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'-এর মতে হুসেন শাহ আঠারটি সন্তানের জনক; তন্মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কুমার নুসরৎ শাহ বা ছুটি খাঁ (ছোট খাঁ) পিতার গৌরব অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন। ১৫১৯ সালে তিনি নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর নুসরৎ শাহ নাম লইয়া গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। হুসেনের চারিত্রিক ঔদার্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যেও প্রশংসনীয়রূপে বর্তমান ছিল। তাঁহার যুবরাজ অবস্থায় শ্রীকর নন্দী মহাভারত রচনা করেন। ইহা 'ছুটিখানের মহাভারত' নামে পরিচিত। কিন্তু রাজকার্যে তিনি যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেযুগের পক্ষে তাহা বিস্ময়কর বলিতে হইবে। বোধ হয় হুসেন শাহ জীবিত থাকিলে তাঁহার পুত্রের মতো এতটা

[১২] রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস (২য়)

[১৩] ঐ

সফল হইতেন কিনা সন্দেহ। নুসরতের সময় চারিদিকে নানা সঙ্কট ঘনাইয়া আসিয়াছিল। মুঘল-পাঠানের দ্বন্দ্বে তিনি সুকৌশলে বিহার ও বাঙলার পাঠান দলপতিদিগকে বাবরের বিরুদ্ধে একত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আফগান দলপতি শের খাঁ (পরে শের শাহ্) দক্ষিণ-বিহারের জায়গীর লাভ করিয়া বাবরের অধীনতা স্বীকার করিলে এই ঐক্য বিনষ্ট হয়। নুসরৎ অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে বাবরের সহিত বাহ্য বশ্যতা রক্ষা করিয়া তলেতলে আফগান দলপতিদিগকে দলে লইয়া প্রবল মুঘল-বিরোধিতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু শের খাঁর চাতুরীর জন্য এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এই সঙ্কটের সময় নুসরৎ যেরূপ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। পিতার জীবিতকালে নুসরৎ নানা যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইলেও আহোমদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পূর্ব গৌরব বজায় রাখিতে পারেন নাই; তাঁহার বাঙালী সৈন্য জলযুদ্ধে তত পটু ছিল না বলিয়াই তিনি উত্তর-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আহোমদের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৫৩২ খ্রীঃ অব্দে নুসরৎ এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন। পিতা হুসেন শাহের রাজকীয় গুণের অধিকারী হইয়াও নুসরৎ প্রতিকূল ঘটনা ও পাঠান দলপতিদের পারস্পরিক কলহের জন্য বাঙলাকে আশানুরূপ সুদৃঢ় করিতে পারেন নাই; অবশ্য পিতার নিকট তিনি যে রাজ্যভার পাইয়াছিলেন, তাহার সীমা ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। তাহার পর হইতেই হুসেনশাহী বংশের অবনতি আরম্ভ হইল, এবং তাহার মৃত্যুর পাঁচ বৎসরের মধ্যে গৌড়দেশ সুর বংশোদ্ভূত শের খাঁ সুরের কর্তৃত্বে চলিয়া যায়।

নুসরতের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল বদর কিছুকাল সুলতান হইয়াছিলেন। পরে নুসরতের অল্পবয়স্ক পুত্র আলাউদ্দিন ফিরুজ মাত্র কয়েকমাস (১৫৩২-৩৩) সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের প্রথম কবি শ্রীধর তাঁহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ফিরুজের পিতৃব্য আবদুল বদর তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ নাম লইয়া পাঁচ বৎসর (১৫৩৩-৩৮) গৌড় শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহাসন অধিকার করার বৎসরেই চৈতন্যদেবের তিরোধান হয়। হুসেনশাহী বংশের গৌরবময় সূচনায় চৈতন্যদেবের বাল্যকাল, ধ্বংসের

পট-ভূমিকায় তাঁহার তিরোধান—এই ঐতিহাসিক আকস্মিক ঘটনা লক্ষণীয়।

মাহ্‌মুদ ইচ্ছা করিলে এবং দূরদ্রষ্টা হইলে এই সময়ে রাজনৈতিক সঙ্কটের পুরাপুরি সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই সময়ে হুমায়ুন গুজরাটের অধীশ্বর বাহাদুর শাহের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং মাহ্‌মুদ শের খাঁয়ের সহযোগিতায় পূর্বাঞ্চলে আফগান কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির দোষে শের খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। শেরের সহিত যুদ্ধে মাহ্‌মুদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইল, পূর্বাঞ্চলে শের খাঁয়ের বিপুল আধিপত্য সূচিত হইল, মাহ্‌মুদ দিন দিন হতমান হইতে লাগিলেন। শের খাঁয়ের অতর্কিত গৌড় আক্রমণে মাহ্‌মুদ বাধ্য হইয়া তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার খেসারত দিয়া সন্ধি করিলেন (১৫৩৬)। কিন্তু তখন চারিদিকে সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছিল; হুমায়ুনের সঙ্গে শের খাঁয়ের বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিবার মতো কূটবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতা তাঁহার আদৌ ছিল না। শের খাঁয়ের সেনাপতি খাওয়াস খাঁ এবং জলাল গৌড় অবরোধ করিলে আহত মাহ্‌মুদ কিছু অনুচর সঙ্গে লইয়া উত্তর-বিহারে পলায়ন করিলেন। ১৫৩৮ খ্রীঃ অব্দে ৬ই এপ্রিল শেরের আফগান বাহিনী বাঙলার রাজধানী গৌড়ের উপর সর্বপ্রথম পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিল। মাহ্‌মুদ ইহার পরেও হুমায়ুনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শের খাঁ তাঁহার দুই পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করেন। ১৪৯৩ সালে হুসেন শাহ যে বংশের পত্তন করিয়াছিলেন ১৫৩৮ সালের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িল। ইহার পর ভাগ্যান্বেষী, সুচতুর, দূরদর্শী আফগান দলপতি বিহারের জায়গীরদার শের খাঁ সুর কিছুকাল বাঙলায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া দিল্লীর তখ্‌তে আসীন হন এবং শের শাহ্ নাম লইয়া ভারতে সুর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

(খ) শের শাহ ও সুর বংশের অধীনে বাংলা (১৫৩৮-৬৪)॥

গৌড় অধিকার করার পর যখন শের খাঁ শুনিলেন যে, হুমায়ুন বাঙলা আক্রমণের জন্য আসিতেছেন, তখনই তিনি আধুনিক রাজনীতির 'পোড়মাটি'র নীতি অনুসরণে গৌড় নগর ধ্বংস করিয়া ছয়কোটি স্বর্ণমুদ্রা, সেনাবাহিনী

ও অনুচরসহ রোটাসগড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। হুমায়ুন গৌড়ে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল আলস্যে অতিবাহিত করিলেন এবং শ্রাবণমাসের দারুণ বর্ষায় গঙ্গার দক্ষিণ ধার ধরিয়া শেরের উদ্দেশে অভিযান চালাইলেন। কিন্তু কর্মনাশার পূর্ব তীরে অবস্থিত বক্‌সারের দুই ক্রোশ পশ্চিমে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন (১৫৩৯)। শের অতিক্রত বাঙলা পুনরধিকার করিয়া চারিদিকে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত হইলেন। শেরের সেনাপতি চট্টগ্রাম অধিকার করিলে চট্টগ্রামের পর্তুগীজ বণিক ও বোম্বেটেগণের অত্যাচার খানিকটা হ্রাস পাইল। অতঃপর গৌড় হইতে সরিফাবাদ এবং সপ্তগ্রাম হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত শেরের অধিকার বিস্তার লাভ করিল। ১৫৪০ সালে কনৌজের নিকট বিল্বগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুন পুনরায় শেরের নিকট শোচনীয়রূপে পরাজিত হইলেন। অতঃপর শের খাঁ শুধু গৌড় নহে, দিল্লীর তখ্‌তে উপবেশন করিলেন। দিল্লীশ্বর শের খাঁয়ের নাম হইল শের শাহ্‌, তাঁহার বংশের নাম হইল সুর বংশ। ইহার পর তিনি বৃহত্তর পটভূমিকায় আবির্ভূত হইলেন, বাঙলার সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শিথিল হইয়া গেল। অবশ্য সুর বংশের দলপতিরাই তাঁহার নির্দেশে ও অনুমোদনে বাঙলা শাসন করিত। কিন্তু মাঝে মাঝে বাঙলার শাসকগণ দিল্লীর ক্ষমতা অমান্য করিয়া স্বাধীন সুলতান হইবার 'খোয়াব' দেখিতেন। তখন বাধ্য হইয়াই শেরশাহ কে আবার 'বল্‌ঘাপুরে' [১৪] অভিযান করিতে হইত। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার শক্তি যতই অপ্রতিহত হোক না কেন, দিল্লী হইতে বাঙলার প্রতি দৃষ্টি রাখা সহজ নহে। তাই কেন্দ্রীভূত শক্তিকে বিভক্ত করিয়া 'বিদ্রোহ-নগরী'কে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। দেশকে অনেকগুলি জায়গীরে ভাগ করিয়া তিনি প্রত্যেক ভাগের কর্তৃত্ব অর্পণ করিলেন আফগান দলপতিদের উপর। এইভাবে বাঙলাদেশে জায়গীর প্রথা বা ভুঁইয়াদের উৎপত্তি হয়। জায়গীরদারেরা সকলেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিলেন, সেনাবাহিনীও রক্ষা করিতেন; কেবল প্রয়োজন পড়িলে গৌড়ের শাসককে সেনাসাহায্য করিতে বাধ্য থাকিতেন। শের মাত্র পাঁচ বৎসর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহারই মধ্যে তিনি দেশের শাসনব্যবস্থার

১৪ বাঙলা প্রায়ই দিল্লীর কর্তৃত্ব অমান্য করিয়া বিদ্রোহী হইত বলিয়া সে যুগে এই দেশ 'বল্‌ঘাপুর' বা বিদ্রোহ-নগরী নামে পরিচিত হইয়াছিল।

অনেক স্থায়ী উন্নতি করিয়াছিলেন, বাঙলাদেশেও তাহার সুফল ফলিয়াছিল।

শের শাহ্ দিল্লী হইতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরও আট বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মোট তের বৎসর বাঙলায় বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলা বা গণ্ডগোল দেখা দেয় নাই। তাঁহার পুত্র ইসলাম শাহ সুরের মৃত্যুতে (১৫৫৩) আবার আফগান সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল, বাঙলাও সেই সুযোগে দিল্লীর ছত্রছায়া হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন দিল্লীর সভায় শাঠ্য-ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইসলাম শাহের শিশুপুত্র মাত্র কয়েক দিন দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। শেরের ভ্রাতুষ্পুত্র (মতান্তরে শ্যালক) মুবারিজ খাঁ এই শিশুকে হত্যা করেন এবং মুহম্মদ শাহ্ আদিল নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তখন আফগান দলপতিদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অতি দ্রুতবেগে দিল্লীর পট পাল্টাইতেছিল। হুমায়ুন পুনরায় সুর বংশের হাত হইতে পঞ্জাব ও দিল্লী কাড়িয়া লইলেন। ১৫৫৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্র আকবর ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় পানি-পথের যুদ্ধে আদিলের সেনাপতি হিমুকে নিহত করিলেন। সেই সময়ে বাঙলার পাঠান শাসনও ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে, সেই সুযোগে আফগান সর্দারগণ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্কটের সময়ে বাঙলার আফগান সর্দারদের প্রধান আফগানিস্থানের 'করনানী' বংশোদ্ভূত তাজ খাঁ কররানি বাঙলার অপদার্থ শাসক তৃতীয় গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করিয়া (১৫৬০) বাঙলার মসনদ অধিকার করিলেন—তিনিই কররানি বংশের শাসন সূচনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সুর বংশের অধীনে বাঙলার শাসনকার্যঘটিত কিছু সুবিধা ভিন্ন বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। বরং আফগান দলপতিদের পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার জন্য সাধারণ বাঙালীর মনে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না।

(গ) কররানি বংশের অধীনে বাঙলা (১৫৬৪-৭৬) ॥

শের শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীতে আফগান সর্দারদের সভায় নানা বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। আফগান শ্রেণীভুক্ত তাজ খাঁ কররানি শের শাহের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তিনি এই সঙ্কটমুহূর্তে নিরাপদ স্থানে চলিয়া আসিবার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার দুই অনুজ বাঙলার তেলিয়াগরহি ও তাঁড়ায় জায়গীর অধিকার করিয়া বেশ প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাজ খাঁ বাঙলায় আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। বিহারের আরও অনেক আফগান দলপতি কররানি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৫৫৪ খ্রীঃ অব্দে তাজ খাঁ বাঙলায় পলাইয়া আসেন এবং তাহার দশ বৎসরের (১৫৬৪) মধ্যেই ছলে-বলে-কৌশলে গৌড়ের অনেকটা অধিকার করিয়া লন। তৃতীয় গিয়াসুদ্দিন নামক এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি যখন বাঙলার মসনদ অধিকার করিয়া চারিদিকে বিশৃঙ্খলার দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, তখন তাজ খাঁ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙলার সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং কররানি বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সিংহাসন অধিকারের বৎসর খানেকের মধ্যে তাজ খাঁর দেহান্ত হয়। তার পর তাঁহার অনুজ সুলেমান খাঁ কররানি বাঙলায় সুলতান হন (১৫৬৫)। সুলেমান প্রায় সাতবৎসর (১৫৬৫-৭২) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বাঙলা শাসন করিয়াছিলেন। কোন কোন দিক দিয়া তিনি হুসেন শাহ ও নুসরৎ শাহের সঙ্গে তুলনীয়। যুদ্ধবিদ্যা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, কূটনীতি এবং বিদ্যানুরাগে তিনিও হুসেনের মতো স্মরণীয়। উড়িষ্যা হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূভাগ সুলেমানের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। দেশে মোটামুটি শান্তি ফিরিয়া আসিল, রাজস্ব বৃদ্ধি পাইল; সুলেমান কিছু নিশ্চিন্ত হইয়া অন্যান্য কাজে মন দিলেন। মুসলমান পণ্ডিত উলেমাদিগকে তিনি সভায় আহ্বান করিতেন, মুসলমানী শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; কোরানসরিফের পবিত্র নীতি তিনি নিজেও যেমন মানিয়া চলিতেন, তেমনি অপরকেও সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতেন। অবশ্য হিন্দু প্রজাগণ তাঁহার নিকট কিরূপ ব্যবহার পাইত তাহা জানা যায় না।

'কালাপাহাড়' নামক এক ধর্মত্যাগী হিন্দুর নেতৃত্বে সুলেমান উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন। বিগ্রহ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া মণিমাণিক্য অপহরণ মুসলমান শাসনেরই অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল। সুলেমান তাহাতে ত্রুটি করেন নাই—হিন্দুর মন্দির ভাঙিয়া, বিগ্রহ অপবিত্র করিয়া, পুরী মন্দিরে আশ্রয়প্রার্থিনী ব্রাহ্মণ রমণীদের লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া বোধ করি তিনি 'গাজী' বনিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে সুলেমানের মৃত্যু

হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়েজিদ সুলতান হন বটে, কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র রাজোচিত গুণ ছিল না। ফলে অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি আফগান ওমরাহদের দ্বারা নিহত হন। ইহার পর সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খাঁ কররানিকে সুলতান করা হয়—বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে আফগান আমীর-ওমরাহগণের সক্রিয় সহায়তা ছিল।

দাউদ খাঁ কররানি খুব সম্ভব ১৫৭৩ অব্দে বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি ঠিক পিতার বিপরীত ছিলেন ; দাউদের নির্বুদ্ধিতা ও দাম্ভিকতার ফলে বৎসর খানেকের মধ্যে বাঙলার রাজধানী টাঁড়ায় সর্বপ্রথম মুঘল অধিকার স্থাপিত হয়। মদ্যপ ও লম্পট দাউদ পিতার রাজ্য ও ঐশ্বর্যে স্ফীত হইয়া আফগান আমীর-ওমরাহদিগকে প্রতিকূল করিয়া তুলিলেন এবং আকবরের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করিয়া নিজ নামে খোত্‌বা পাঠের ব্যবস্থা করিলেন। উপরন্তু টাঁকশালে নিজ নামে মুদ্রা ছাপিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আকবর গুজরাট যুদ্ধে জয়ী হইয়া দাউদের সুলতানী সাধ মিটাইবার ব্যবস্থা করিলেন। দাউদ বিপদ দেখিয়া পাটনা দুর্গে আশ্রয় লইলেন (১৫৭৪)। আকবর স্বয়ং এই অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। দাউদ বাঙলার দিকে পলায়ন করিলে আকবর শত্রুর পরিত্যক্ত ঐশ্বর্য হস্তগত করিয়া দ্রুতবেগে দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং মুনিম খাঁয়ের উপর বাকি কাজটুকু অর্পণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৫৭৪ খ্রীঃ অব্দে ২৫ শে সেপ্টেম্বর মুনিম খাঁ বাঙলার রাজধানী টাঁড়ায় প্রবেশ করিলেন—বাঙলায় প্রথম মুঘল আধিপত্যের সূচনা হইল।

দাউদ উপায়ান্তর না দেখিয়া সপ্তগ্রামের পথ ধরিয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন ; মুনিম খাঁ টাঁড়াকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তগ্রাম, ঘোড়াঘাট (দিনাজ-পুর-বগুড়া), বাকলা (বাখরগঞ্জ), সোনার গাঁ (ঢাকা), মামুদাবাদ (যশোহর-ফরিদপুর) প্রভৃতি অঞ্চলে সৈন্য পাঠাইয়া আফগান দলপতিদিগকে দমনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলে মুঘলের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে বিশেষ বিলম্ব হইয়াছিল। তাই বর্ধমান হইল মুঘলের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্রস্থল। এদিকে দাউদ পুনরায় বাঙলা অধিকারের আশায় মেদিনীপুরের দাঁতনের কাছে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। তখন তিনি মরীয়া হইয়া উঠিয়াছেন, চারিদিকে আফগানী রীতিতে গড়খাই করিয়া মেদিনীপুরের অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে শত্রুর

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। টোডরমল্ল গড়মান্দারণের পথে আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তখন মুঘল শিবিরেও নানা অবিশ্বাস ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। যাহা হোক টোডরমল্লের বুদ্ধিকৌশলে মুঘলবাহিনী শেষ পর্যন্ত দাঁতনের নয় মাইল দক্ষিণে টুকারোই প্রান্তরে সমবেত হইল। এই প্রান্তরে দাউদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে (১৫৭৫, ৩রা মার্চ) মুঘল বাহিনী বিপদের সম্মুখীন হইল, স্বয়ং মুনিম খাঁ আহত হইলেন। দাউদ খাঁ লোভের বশে মুঘল-শিবির লুঠিতে গিয়া মারাত্মক ভুল করিয়া বসিলেন, হাতের সিদ্ধি বাহিরে চলিয়া গেল। পুনরায় মুঘলের আক্রমণে আফগান সৈন্য ছত্রাকার হইয়া পড়িল, বহু পাঠান নিহত হইল, বন্দী হইল। পরদিন আহত বৃদ্ধ মুনিম খাঁ ক্রোধের বশে সমস্ত বন্দী ও আহত আফগান সৈন্যকে কোতল করিবার হুকুম দিলেন এবং "নির্বুদ্ধি আফগানদের ছিন্নমুণ্ডের দ্বারা আটটি আকাশস্পর্শী মিনার তৈয়ারি" করাইলেন।[১৫] কটকে মুঘল দরবারে দাউদ বশ্যতা স্বীকার করিয়া তরবারি সমর্পণ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ মুনিম খাঁ শান্তি পাইলেন না। রোগ-জীর্ণ শরীরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার অবর্তমানে মুঘল বাহিনীতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, এই সুযোগে আফগান দলপতিরা মুঘলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মুঘল সেনা গৌড় আশ্রয় করিল এবং পরিশেষে ভাগলপুর হইয়া দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইল। এই দুর্ঘটনার পর আকবর বাঙলায় আবার শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য হুসেন কুলিবেগকে 'খান-ই-জাহান' উপাধি দিয়া বাঙলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। খান-ই-জাহান মোট তিন বৎসর (১৫৭৫-৭৮) বাঙলার সুবাদারি করিয়াছিলেন। ১৫৭৬ সালে জুলাই মাসে বিহারের মুঘল সেনা খান-ই-জাহানের সঙ্গে যোগ দিয়া আফগান বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিল। পাঠান দলপতিরা প্রায় সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন, দাউদ বন্দী অবস্থায় নীত হইলেন এবং সন্ধিভঙ্গকারীর প্রাপ্য শাস্তি গ্রহণ করিয়া নিহত হইলেন, 'কালাপাহাড়' আহত হইয়া পলাইয়া গেল। বস্তুতঃ ১৫৭৬ সালেই বাঙলা হইতে কেন্দ্রীয় পাঠানশক্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গেল এবং ক্রমে ক্রমে মুঘলশক্তি বাঙলায় অধিকার স্থাপন করিতে লাগিল।

[১৫] ইহা আবুল ফজলের বিবৃতি। তৈমুর কিন্তু আরও উচ্চাভিলাষী ছিলেন; তিনি আশী হাজার নরমুণ্ডের দ্বারা মিনার তৈয়ারি করাইয়াছিলেন।

(খ) বাঙলায় মুঘল অভিযান (১৫৭৬-১৫৯৪)॥

দাউদ খাঁ নিহত হইবার পর মুঘল বাহিনী সর্বপ্রথম কিছু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল। মুঘল-অধিকৃত বাঙলাদেশের প্রথম সুবাদার হইলেন খান-ই-জাহান (১৫৭৫-'৮)। তাঁড়াকে রাজধানী করিয়া তিনি দেশে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য মনোযোগ দিলেন। কিন্তু ১৫৭৬ হইতে ১৫৯৪ খ্রীঃ অঃ—প্রায় আঠার বৎসর ধরিয়া বাঙালাদেশে যে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং মুঘল রাজকর্মচারীদের পারস্পরিক কলহ-বিবাদ চলিয়াছিল, তাহার তুলনা পাওয়া ভার। খান-ই-জাহানের পর সুবাদার হইয়া আসিলেন মুজাফ্ফর খাঁ তুরবতি। ইনি অত্যন্ত অপদার্থ শাসক ছিলেন; ফলে মুঘল কর্মচারীদের মধ্যে নানা অসন্তোষ দেখা দিল। ইতিপূর্বে মুনিম খাঁ বা টোডরমল্লের সময়েও মুঘল কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐক্য ছিল না। মুঘলেরা পাঠানদের মতো বাঙলাকে কোন দিন নিজের দেশ বলিয়া মনে করিত না। তাহারা সোনার বাঙলা হইতে যতটা সম্ভব ঐশ্বর্য হস্তগত করিয়া দিল্লী-আগ্রা যাত্রা করিত, কেহই এদেশে বেশিদিন থাকিতে চাহিত না। শুষ্ক অঞ্চলের অধিবাসী মুঘলগণ আর্দ্রভূমি বাঙলাকে বিশেষ পছন্দ করিত না; তাই শুধু অর্থের সঙ্গেই তাহাদের যা-কিছু সম্পর্ক ছিল। মুজাফ্ফরের (১৫৭৯) সময় হইতে আকবর বাঙলার অধিকৃত অঞ্চলকে সুবায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া একজন সিপাহ্সালারের (পরে সুবাদার) অধীনে এই নূতন সুবার ভার ন্যস্ত করিলেন; দেওয়ান, বখ্শি, মির-আদিল, সদর, কোতোয়াল, মিরবহর, ওয়াকানবিশ প্রভৃতি বিবিধ কর্মচারী প্রেরিত হইল। কিন্তু শাসনকার্যে বিশেষ শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া গেল না। অনেক কর্মচারী মুজাফ্ফরের দুর্বলতার সুযোগে বাঙলা ও বিহারে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, মুজাফ্ফর খাঁকে নিহত করিয়া তাঁড়ার কেল্লা অধিকার করিয়া ফেলিল এবং আকবরের অনুপস্থিত ভ্রাতা মুহম্মদ হাকিম মিরজার নামে খোত্বা পাঠ করিয়া আকবরের বাহিনীকে খেদাইয়া দিল (১৫৮০)। আকবর রক্ষণশীল মত ও আদর্শ মানিয়া চলিতেন না বলিয়া একদল সুন্নী কর্মচারী গোপনে গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিত, এইবার সুযোগ জুটিয়া গেল। এই যুগের বিশৃঙ্খলা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। মুঘল রাজকর্মচারীদের বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের সুযোগে অবশিষ্ট পাঠান দলপতিগণও লুঠতরাজ শুরু করিয়া দিল। ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ সাল—তিন বৎসর ধরিয়া রাজকীয় বাহিনী বিদ্রোহ দমনে

ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হোক আকবরের বাহিনীর আক্রমণে যেমন পাঠান দলপতিদের শক্তি খর্ব হইল, তেমনি বিদ্রোহী মুঘলগণও জব্দ হইল। কিন্তু মাঝে মাঝে পাঠান ভুঁইয়াগণ একত্রিত হইয়া মুঘল রাজকীয় বাহিনীকে এমন অসুবিধায় ফেলিত যে, শাসনকর্তার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িত। ১৫৮৪ সালে সুবাদার শাহাবাজ খাঁ পাঠান ভুঁইয়া ইশা খাঁর প্রধান কেন্দ্র বিক্রমপুর আক্রমণ করিতে গিয়া ব্যর্থ হন। ১৫৮৬-৮৭ সালের মধ্যে শাহাবাজ বিদ্রোহী পাঠানদের সঙ্গে মিত্রতার পথে অগ্রসর হইলেন। এই রূপে সুকৌশলে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত অঞ্চল মুঘলের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইল।

১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে ওয়াজির খাঁ এবং ১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে সৈয়দ খাঁ বাঙলার সুবাদার হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বাঙলার ভাঁটি অঞ্চলে (পূর্ববঙ্গ) পাঠান ভুঁইয়াদের প্রচণ্ড আধিপত্য ছিল। আকবর ভারতের পূর্বাঞ্চলকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্য ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দে মুঘল শাসন ও শক্তির স্তম্ভস্বরূপ রাজা মানসিংহ কাচোয়াকে বহু বিচক্ষণ কর্মচারীর সঙ্গে বাঙলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। ১৫৮৬-১৫৯৪ সাল পর্যন্ত বাঙলায় মুঘল শাসন কখনও কিছু প্রাণবান, কখনও কিছু দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যেও সম্প্রীতি ও মতের ঐক্য ছিল না, তদুপরি পাঠান ভুঁইয়ারাও নানাভাবে উপদ্রব করিতেছিল। আকবর বাঙলাকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার জন্যই মানসিংহকে সুবাদার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

মানসিংহের মতো সাহসী যোদ্ধা, বিচক্ষণ সেনাপতি এবং বুদ্ধিমান সুশাসক মুঘলযুগে দুর্লভ। বাঙলাদেশকে সুশাসনে আনিবার জন্য আকবর তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। বস্তুতঃ সেই সঙ্কটমুহূর্তে মানসিংহ প্রেরিত না হইলে পাঠান ভূস্বামীদের প্রতাপে, শুধু ভাঁটি অঞ্চল নহে, গোটা বাঙলাদেশটাই পুনরায় তাহাদের অধিকারে চলিয়া যাইত। ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দে মানসিংহ বাঙলায় উপনীত হইলেন; তিনি তাঁড়া ত্যাগ করিয়া রাজমহলে মুঘল রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁড়া তখন মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল, মরুবাসী মানসিংহ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক রাজমহলকে রাজধানী নির্বাচিত করিয়া ভালই করিয়াছিলেন। রাজধানীতে শাসনশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া ১৫৯৫ সালে মান সিংহ পূর্ববঙ্গের দুর্দান্ত পাঠান ভূস্বামীদিগকে বশীভূত বা উৎখাত করিবার জন্য সদলবলে বাহির হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সামন্ততান্ত্রিক জায়গীর-

ধারী পাঠান ভুঁইয়াদিগের শক্তি চূর্ণ করিতে না পরিলে বাঙলায় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিতে পারিবে না। ইশা খাঁ ও কেদার রায় তখন ভুঁইয়াদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতাপশালী ; কিন্তু মানসিংহের বলবীর্যের কাছে তাঁহাদের চাতুরী ও রণকৌশল স্তিমিত হইয়া পড়িল। ১৫৯৯ সালে ইশা খাঁয়ের মৃত্যু হইলে মুঘল শাসনের একটা বড শত্রু নিপাত হইল।

১৬০১ সালের দিকে মানসিংহ বাঙলার প্রান্তে অবস্থিত পাঠান শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন এবং এক বৎসরের মধ্যে ঢাকার বিদ্রোহী পাঠান-দিগের শক্তি চূর্ণ করিয়া শ্রীপুরের ভূস্বামী বারভুঁইয়াদের অন্যতম প্রধান নেতা কেদার রায়কে আকবরের পক্ষে আনিলেন। ১৬০২ সালের মধ্যে কেদার রায় মুসা খাঁ প্রভৃতি প্রবল প্রতাপান্বিত ভুঁইয়াদের শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইল। ১৬০৩ সালের দিকে মুঘল নৌবাহিনী আরাকানের মগ বোম্বেটেদের বাসা ভাঙিয়া দিল। কেদার রায় মানসিংহের বিরুদ্ধে লডিতে গিয়া যুদ্ধে নিহত হইলেন। ফলে ভুঁইয়াদের প্রতাপ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগেই বহুলাংশে হ্রাস পাইল। ১৬০৫ সালের গোড়ার দিকে আকবর বুঝিলেন যে, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন তিনি রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থার জন্য বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে নিজ শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মানসিংহও এই সঙ্কটের সময় বাঙলা ছাডিয়া আগ্রায় আকবরের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে ১৫ই অক্টোবর মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ সম্রাট আকবরের দেহান্ত হইল।

জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করিয়া মানসিংহকে আবার বাঙলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে (১৬০৬) মানসিংহ বিহারের সুবাদার পদে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার স্থানে বাঙলার সুবাদার হইয়া আসিলেন জাহাঙ্গীরের আত্মীয় কুতুবুদ্দিন খান কোক। জাহাঙ্গীর বর্ধমানের শাসনকর্তা শের আফগান ইস্তাল্‌জুর সুন্দরী পত্নী মেহেরুন্নেসাকে (নুরজাহান) হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে নিজ আত্মীয়কে এদেশের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন ; কারণ এ সমস্ত 'হার্দিক' ব্যাপার বৃদ্ধ মানসিংহ বোধহয় ততটা বুঝিতেন না, জাহাঙ্গীরও বোধকরি অভিভাবক স্থানীয় মানসিংহকে এসব কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকিবেন। যাহা হোক, ১৫৯৪—১৬০৬, প্রায় বার বৎসর একাধিকবার সুবাদারী করিয়া মানসিংহ বাঙলাদেশে মুঘল রাজ-

শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; তাঁহার শৌর্য ও বুদ্ধিবলে ভুঁইয়ারা হতবল হইলেন, কেহ বা নিহত হইলেন এবং এইরূপে মানসিংহের বিচক্ষণতায় বাঙলার মুঘল-শক্তির বিপদ কাটিয়া গেল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে মানসিংহকে ধন্যধ্বনির দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন :

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।

মানসিংহ বাঙলাদেশকে মুঘল সাম্রাজ্যের ছায়াতলে আনিতে সাহায্য করিয়া এদেশে একটা দীর্ঘস্থায়ী শাসনব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

মুঘল-পাঠান প্রসঙ্গ ॥

ইতিহাসের দিক্‌নির্দেশের প্রসঙ্গে ইতিহাসের পটে পাঠান ও মুঘল শাসনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাঙালীর মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা সহজেই মনে পড়িবে। যে-কোন কারণেই হোক, দেশে মুসলমানযুগে যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও জনজীবন যে তাহার দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। মূলতঃ বাঙলার জীবনধারা গ্রামকেন্দ্রিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া যখন মুঘল-পাঠানে মিলিয়া বাঙলার বুকে ছকপাতিয়া দশপঁচিশ খেলিতেছিল, তখনও বাঙালী হিন্দু তাহাকে একটা দৈবদুর্বিপাক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল, এবং যেমন করিয়া বন্যা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মহামারীর কাছে তাহারা আত্ম-সমর্পণ করিত, তেমনি করিয়াই নিরুৎসুক জড়তার দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লবকেও গ্রহণ করিয়াছিল। তথাপি মনে হয়, আফগান শাসনে বাঙলার শ্রীসমৃদ্ধি অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কারণ পাঠান আমলে বাঙলা দিল্লীর কর্তৃত্ব মানিয়া চলে নাই; ১৩৩৯ খ্রীঃ অব্দের পর বাঙলা দিল্লী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল এবং দেশের কেন্দ্রে সুলতানী শাসনব্যবস্থা থাকিলেও হিন্দু ভূস্বামী এবং পাঠান জায়গীরদারে মিলিয়া দেশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া শিথিল ধরণের সামন্তপ্রথা সৃষ্টি করিয়াছিলেন; ইহার ফলে শাসন ও শোষণ বিকেন্দ্রীকৃত হইয়া পড়িত, জনসাধারণকে মুঘল সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ আমলের একচ্ছত্র সুপরি-কল্পিত কেন্দ্রীয় শক্তির প্রচণ্ডতা বহিতে হইত না। উপরন্তু পাঠান সুলতানগণের অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সংস্কৃত না বুঝিলেও বাংলাভাষা বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং বাঙালী হিন্দু কবির পৃষ্ঠপোষকতা করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল-পাঠানদ্বন্দ্বে দেশে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও বাংলা সাহিত্য ও বৈষ্ণবধর্মের শ্রীবৃদ্ধি বিবেচনা করিলে পাঠানশাসনকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। হুসেন শাহের মতো ঔদার্য ও বিচক্ষণতা কোন মুঘল সুবাদার দেখাইতে পারিয়াছেন কি?

সংস্কৃতির দিক দিয়া পাঠান যুগে যেমন একটা নবজীবনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অর্থনীতির দিক দিয়াও দেশের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। কারণ দেশের প্রভূত বিত্ত রাজস্ব বাবদ দিল্লী চলিয়া যাইত না, দেশের টাকা দেশেই থাকিত। তবে একথা কতকটা ঠিক যে, পাঠানযুগে বাঙলার সঙ্গে দিল্লীর যোগাযোগ ছিন্ন হয় বলিয়া এই অঞ্চল যেন সর্বভারতীয় জীবন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল এবং সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা জাতিমানসকে কিয়দংশে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মুঘলশাসনের ফলে বাঙলাদেশে প্রশংসনীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম বৈশিষ্ট্য, দিল্লীর সঙ্গে বাঙলার যোগাযোগ স্থাপন; বাঙলা যে সর্বভারতীয় ঐক্যের অন্যতম অংশ, তাহা মুঘল আমলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লী বাঙলা হইতে একটা মোটা রকমের রাজস্ব শোষণ করিয়াছে বটে, কিন্তু মুঘল-শাসনের ছত্রছায়াতলে আসিয়া বাঙলাদেশ ভারতের রাজনীতি, ধর্মনীতি ও জীবনধারার ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসিয়াছিল। মুঘলযুগে দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে এবং যাতায়তের বাধা কিঞ্চিৎ অপসারিত হইলে দিল্লী, বিশেষতঃ উত্তর-ভারত হইতে বণিক, সৈনিক, সাধুসন্তসম্প্রদায় বাঙলাদেশে নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। বাঙলার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তীর্থদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে নীলাচল মথুরা বৃন্দাবনে যাইতেন। বাঙলার বাহিরের বৈষ্ণব তীর্থের সহিত বাঙালী বৈষ্ণবদের যোগাযোগ স্থাপিত হইল। কাজেই পাঠান যুগে বাঙালীর মনে যে প্রকার আত্মসঙ্কোচন দেখা দিয়াছিল, বাঙলাদেশ মুঘল-ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর তাহা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে লাগিল।

বাঙলাদেশে য়ুরোপীয় বণিকের সঙ্গে যথার্থ বাণিজ্য আরম্ভ হইল ষোড়শ শতাব্দীতে; ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তবে ইহাও স্বীকার্য যে, মুঘলশাসন বাঙলাদেশকে অর্থনীতির দিক হইতে বিশেষভাবে শোষণ করিয়াছিল। উপরন্তু বাঙলার মুঘল সুবাদারগণ কেহই 'দোজখ-ই-পুরে নিয়ামৎ' বাঙলাদেশকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন না, অনেকটা ইংরাজ কর্ম-

চারীদের মতো এদেশে কিছুদিন চাকুরী করিয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি ও খেলাত-খেতাব সহ দিল্লী-আগ্রায় ফিরিয়া গিয়া ওমরাহ বনিয়া যাইতেন। বাঙলার সঙ্গে তাঁহাদের শাসন ছাড়া অন্য কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না। পাঠানদের মতো তাঁহারা বাংলাভাষা শিখেন নাই, বাঙালী কবিকে উৎসাহিত করেন নাই—এক কথায় বাঙালীর সঙ্গে তাঁহাদের মানসিক বা সাংস্কৃতিক কোন যোগাযোগ ছিল না। ঐতিহাসিক যখন মুঘলশাসনের গুণকীর্তন করিয়া বলেন, "Mughal conquest opened for Bengal a new era of peace and progress"—[১৬] তখন এই উক্তিকে সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, পাঠান আমলেই চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য বিচিত্র দিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং এই যুগেই বাঙলার বৈষ্ণবগণ নীলাচল, মথুরা, বৃন্দাবনে গিয়া কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি,[১৭] চণ্ডীদাস (বড়ু ও পদাবলীর চণ্ডীদাস), কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, মুকুন্দরাম[১৮]—ইঁহারা প্রায় সকলেই পাঠান আমলের প্রভাবে বর্ধিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, মুঘলশাসনে পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক কূপমণ্ডূকতা ঘুচিয়া গিয়াছিল। ইহাও বোধহয় পুরাপুরি সত্য নহে। 'বঙ্গ' বহু পূর্বেই বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তারপর সেনবংশের এক শাখা সোনারগাঁয়ে অনেকদিন শাসন করিয়াছিলেন। কাজেই পাঠান আমলে পূর্ববঙ্গ খুব একটা পিছাইয়া ছিল না। একদা তন্ত্রসাধনার কেন্দ্রই ছিল পূর্ববঙ্গ। বাঙলায় শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক আচার্যগণ (সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি) পাঠানযুগে পূর্ববঙ্গেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সে যাহা হোক, শাসনকার্য, বহির্বাণিজ্য এবং রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মুঘল যুগের প্রারম্ভে বাঙলার সংকীর্ণতা খানিকটা ঘুচিলেও বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও বাস্তব জীবন যে তাহার দ্বারা বিশেষ লাভবান হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না।

[১৬] *History of Bengal* (Vol. 2) Edited by J. N. Sarkar

[১৭] বাংলা সাহিত্যের কোন কোন ঐতিহাসিক বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন না। কিন্তু মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে বাঙলার যেরূপ নিবিড় যোগাযোগ তাহাতে তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে সরাইয়া দেওয়া যায় না।

[১৮] মুকুন্দরাম মানসিংহের বাঙলায় আগমনের সময়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিলেও পাঠান যুগেই তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছিল।

২
সমাজ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত দীর্ঘবিস্তারী শতাধিক বৎসরের সামাজিক ইতিহাস, জনজীবনধারা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আলোচনা করিলে আমরা একটি জটিল ও রহস্যময় রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইব। দেশের সিংহাসন কখনও পাঠান-মুঘলের অধিকারে গিয়াছে, কখনও বিদ্রোহীরা সুলতানকে হত্যা করিয়া চারিদিকে অরাজকতার ভয়াবহ বন্যা বহাইয়া দিয়াছে, দেশের ব্যবসাবাণিজ্য, অর্থনৈতিক নিয়মতন্ত্র, সাধারণের জীবনযাত্রা—সমস্তই সর্বনাশা ধ্বংসের স্রোতে দিগন্তে ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে। কখনও-বা মুঘল সিপাহ্‌সালার, সুবাদার, বখ্‌শি, কোতোয়ালে মিলিয়া বাঙালীর বুকের উপর তাণ্ডব শুরু করিয়া দিয়াছে। আবার পরক্ষণেই, পট পাল্টাইয়া গেলে সূর্যাস্তের আকাশের রঙের মতো মানুষের মন বদলাইয়াছে, প্রাত্যহিক কাজকর্মে ফাটল ধরিয়াছে, কখনও-বা ঝঞ্ঝামুখর পরিবেশে বজ্রস্তনিত আকাশতলে তলোয়ারের ঝন্‌ঝনা, কামানবন্দুকের গর্জন, হয়-হস্তীর উচ্চ কলরব স্তিমিত হইয়া গিয়াছে—পাঠান সুলতান বার দিয়া বসিয়াছেন, রামায়ণ-মহাভারত শুনিতেছেন।

চৈতন্যদেব ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের মতো আবির্ভূত হইয়া বাঙলার অভিজাত-অনভিজাত, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, স্ত্রী-পুরুষ—সকলেরই মনে বিচিত্র উল্লাস, অভূতপূর্ব আনন্দ এবং ব্যাখ্যাতীত রসাবেশের দিব্যোন্মত্ততা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেশে যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছে, পাঠানে-মুঘলে রক্তপিপাসু শ্বাপদের মতো ক্ষোভে রোষে গর্জিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পাঠানযুগের বাঙলার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন গ্রামে-গ্রামান্তরে সে উত্তাপ ততটা পৌঁছায় নাই। মুঘল-যুগে বুঝি সে শান্তি ও জীবনের প্রসন্ন তৃপ্তি ফুরাইয়া গেল। দিল্লীর সঙ্গে বাঙলার মিতালি, বৃহদ্‌ ভারতবর্ষের সঙ্গে গৌড়বঙ্গের যোগাযোগ এবং শিল্পী-ব্যবসায়ী-সৈনিক-সাধক-উলেমা-ফকির-দরবেশের নিত্য যাতায়াত আরম্ভ হইল। আবার পুরী, মথুরা, বৃন্দাবনে চৈতন্যভক্তদের তীর্থযাত্রার ফলে বাঙলার ভৌগোলিক ও মানসিক সীমাও বাড়িয়া চলিল। কিন্তু মুঘল-যুগেই প্রচণ্ড শোষণ আরম্ভ হইয়াছিল। পাঠান আমলের বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে মুঘল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কবলে পড়িল, দিল্লীর

তখ্‌ত-তাউসের নজ্‌রানা পাঠাইয়া এবং রাজস্ব সমর্পণ করিয়া মুঘল সম্রাটের প্রসাদ যাচিবার জন্য এদেশের হিন্দু জমিদার ও মুসলমান অভিজাত সমাজ এবং সুবাদারগণ ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

কিঞ্চিদধিক এই একশত বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে বাঙালীর সমাজ ও দেশ; সর্বাগ্রে তাহার পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা যাক।

সমাজের কথা॥

হুসেন শাহী আমল হইতে মুঘল সুবাদার মানসিংহ কাচোয়ার সময় পর্যন্ত বাঙলাদেশের সমাজজীবনের কথা আলোচনা করিলে অনেকগুলি প্রশ্নসঙ্কুল তথ্যের সম্মুখে আসিতে হয়। পাঠানযুগে হুসেন শাহ যখন হাবসী কুশাসন হইতে বাঙলাকে রক্ষা করিলেন, তখন তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সমাধা করিয়াছিলেন। ক্ষমতালোভী অর্ধ-বর্বর হাবসীগণ হিন্দু জমিদার ও মুসলমান ওমরাহদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া অপদার্থ ব্যক্তিদিগকে অভিজাত শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। হুসেন শাহ সর্বপ্রথম পূর্বতন ক্ষমতাবিচ্যুত ও ভূমিহীন ওমরাহ ও হিন্দু অভিজাত সমাজকে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন—পরবর্তী কালে ইঁহাদের বংশধরগণ বারভুঁইয়া হইয়াছিলেন। কারণ সে যুগে সাধারণ হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মণসম্প্রদায়, যাঁহারা শাস্ত্রসংহিতার ন্যাসরক্ষক ছিলেন, তাঁহারা এই ভূস্বামীদের দ্বারা পরিপালিত হইয়াছিলেন। তেমনি মুসলমান ওমরাহগণও মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষ ও উচ্চশ্রেণী—উভয়েরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। মধ্যযুগীয় বাঙলার সংস্কৃতিতে এই ওমরাহ ও ভূস্বামীসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব ছিল। অবশ্য মুঘল আক্রমণের পর এই আভিজাত্য ভাঙিতে আরম্ভ করে। মুঘলশক্তির কাছে বাঙলার ভুঁইয়াগণ যখন একে একে হটিতে লাগিল, তখন সেই সমস্ত জমিদারি ও বিপুল ঐশ্বর্য মুঘল সেনানীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। তাই মুঘলযুগে বাঙলার অভিজাত হিন্দু ও পাঠান শ্রেণী হতবল হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙলার সমাজব্যবস্থায় ইহাকে একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

সাধারণ মানুষ লইয়া সমাজ; তাহারাই ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রধান উপাদান। তাহারা কি যুদ্ধবিগ্রহে শুধু কামানের খাদ্য হইয়াছে—দেশ,

জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে কোন দিক দিয়াই পরিপুষ্ট করে নাই? তাহা সম্ভব নহে। এই যুগে যে সমস্ত পর্যটক এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণী হইতে মনে হয়, দেশে প্রায়শঃই যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত; তাহার ফলে দুঃখকষ্টের বড অংশটা এই সাধারণ মানুষকেই বহিতে হইত, মাঝে মাঝে অনেক দিনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিব্যবস্থা প্রায় নষ্ট হইবার উপক্রম হইত।' কিন্তু তথাপি দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা খুব একটা শোচনীয় হইয়া পড়ে নাই। পাঠানযুগে এদেশ হইতে বহু দ্রব্যসম্ভার বিদেশে রপ্তানী হইত। সিজার ফ্রেডারিক, র‍্যালফ্ ফিচ্, বারবোসা, বার্থেমা—প্রভৃতি বিদেশী বণিক ও পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখা যাইতেছে যে, প্রধান ব্যবসা মুসলমান বণিকের করায়ত্ত হইলেও (র‍্যাল্ফ্ ফিচের বর্ণনা), তূলা-রেশম, শর্করা-ইক্ষু, রেশম-পশমজাত বস্ত্র প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য সমুদ্রপথে করমণ্ডল, মালাবার, পেগু, তেনাসারিন, সুমাত্রা, সিংহল, মালাক্কা অঞ্চলে নিত্যই প্রেরিত হইত; বাণিজ্যসূত্রে তাম্রলিপ্তি, বেতড, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরের সঙ্গে বাহিরের নানা সম্পর্ক গডিয়া ওঠে। বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামের খ্যাতি এতদূর ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল যে, ভেনিসের অধিবাসী গাসতালাদি (Gastaladi) ১৫৬১ খ্রীঃ অব্দে এশিয়ার যে মানচিত্র অঙ্কন করেন, তাহাতে সপ্তগ্রামের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। এমন কি সমুদ্রপথ হইতে দূরে অবস্থিত তাঁডাতেও (তাণ্ডা) বেশ ভালভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। সাধারণতঃ দেশে যখন শান্তি বিরাজ করিত, তখন জনসাধারণ ও কৃষিসমাজ এই ব্যবসা হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের স্বাদ পাইত। কিন্তু মুঘলযুগে এই ব্যবস্থায় ভাঙন ধরিল। বহির্বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রচুর অর্থ রাজস্ব ও যুদ্ধ সাহায্যবাবদ বাঙলার বাহিরে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, উপরন্তু আরবসাগর ও ভারতমহাসাগরে আরব ও পর্তুগীজ বণিকদের প্রাধান্যে ও অত্যাচারের ভয়ে বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্যও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়া গেল। সর্বোপরি সপ্তদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম বন্দর নষ্ট হইয়া গেলে বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত অবনতি ঘনাইয়া আসিল। অবশ্য ইহার পরে পর্তুগীজদের চেষ্টায় বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে হুগলী প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

পাঠানযুগের ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে, গৌড়ের হিন্দু জমিদারগণ নিমন্ত্রণের আসরে যিনি যত স্বর্ণপাত্র বাহির করিতে পারিতেন তিনি ততই

ঐশ্বর্যবান বলিয়া সমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিতেন। কাজেই পাঠানযুগে অর্থাৎ দাউদ খাঁ কররানির পূর্বে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সমাজ যুদ্ধবিগ্রহে মাঝে মাঝে বিব্রত হইয়া পড়িলেও দৈনন্দিন জীবনে মোটামুটি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল। মুঘলযুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে দেশের পাঠান-শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হইলেও মুঘলপ্রতাপ বেশীদূর সম্প্রসারিত হইতে পারে নাই, উপরন্তু মুঘল শাসক ও সেনাধিনায়কদের মধ্যেও সম্প্রীতি ছিল না। এই সময়ের উৎপীড়িত সমাজের রূপটি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে চমৎকার ফুটিয়াছে। 'বিষ্ণু-পদাম্বুজ ভৃঙ্গ' মানসিংহ বাঙলাকে এই অরাজকতা হইতে উদ্ধার করেন। টোডরমল্ল 'ওয়াশিল তুমার জমা' অনুসারে জমিজমার নিয়মানুগ বিলিব্যবস্থা করিয়া অর্থনীতি ও রাজস্বের দিক হইতে দেশের উন্নতি করিলেন; ইহার ফলে ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা অনেকটা দূর হইল। তাঁহার হিসাব মতে ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দের দিকে 'খালিশা' (exchequer) জমির কর্মকর্তা ও জায়গীরদারগণ মালখাজনা ও জিহাট কর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন, এবং ইহার জন্য সর্বত্র একই প্রকার 'দস্তুর-অল-আমল' অর্থাৎ বিধি প্রচারিত হয়। প্রথম দিকে এই বিধানের দ্বারা মুঘল-অধিকৃত বাঙলাদেশের রাজস্ব সংগৃহীত হইত প্রায় এক কোটি সাত লক্ষ টাকা। এইভাবে ক্রমে ক্রমে মুঘলযুগের প্রথম হইতেই নানা খাতে ও 'আবওয়াবে' বাঙলার মুদ্রা বাহিরে চলিয়া যাইত—ক্রমে ইহার পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। যাহা হোক পাঠানযুগের তুলনায় মুঘল আমলে রাজস্ব ও জমিজমার সুচারু বিধি প্রচারিত হইলেও সাধারণের আর্থিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে অবনতির দিকে যাইতে আরম্ভ করে। অভিজাত সমাজ তবু রাজমহল-ঢাকায় গিয়া সুবাদারের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা যে উত্তরোত্তর মন্দের দিকে যাইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু-মুসলমান ॥

হিন্দুসমাজের কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, চৈতন্যদেবের প্রভাবে সমস্ত সমাজমানসেই একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল। মুসলমান অভিযানে শূলপাণি-জীমূতবাহন শাসিত নিস্তরঙ্গ হিন্দুসমাজে যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। মুসলমান সুলতান ও সুবাদারগণ

শুধু রাজ্যপরিচালনা করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না, হিন্দুসমাজকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে যেন একটা মহৎ কর্তব্য সমাধা হইল মনে করিতেন। ধর্মান্তরীকরণের জন্য মুসলমান পীর-ফকির, সুফীসাধক ও উলেমারা যেমন মনে করিতেন যে, ইসলামি 'তমদ্দুন' প্রচারের দ্বারা তাহারা 'দার-উল-হার্ব্'-কে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করিবেন, তেমনি মুসলমান শাসক-সম্প্রদায়ও এই ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্য করিতেন। হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা, মঠ-মন্দির ভাঙিয়া তাহার মালমসলার দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা সে যুগের অধিকাংশ মুসলমান শাসকের নিত্যকর্মে পরিণত হইয়াছিল। হুসেন শাহের অনেক হিন্দু কর্মচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতি উড়িষ্যা অভিযানে গিয়া বহু দেবমন্দির অপবিত্র করেন, হিন্দুর উপর অকথ্য উৎপীড়ন করেন।[১৯] হুসেনের প্রধান রাজকর্মচারী (সাকর মল্লিক) সনাতন সুলতানের উড়িষ্যা অভিযানের সঙ্গী হইতে চাহেন নাই বলিয়া তাহাকে কিছুকাল কয়েদ থাকিতে হইয়াছিল। উপকথার 'কালাপাহাড়' হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণের পরে হিন্দুসমাজ ও ধর্মের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করিয়াছিল। অনেক সময় মুসলমান বণিকেরা দেশের অভ্যন্তর হইতে হিন্দুবালক ধরিয়া লইয়া গিয়া খোজা করিয়া পারস্যে বিক্রয় করিত।[২০] পর্যটক বারবোসার মতে অনেক হিন্দু রাজপ্রসাদ লাভের আশায় নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইত।[২১] এমন কি রাজধানী গৌড় নগরের মুসলমানগণ হিন্দুদের ধর্মাচরণে বাধা দিত[২২]।

[১৯] যে হুসেন শাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥

ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কতমত করিল প্রমাদ॥ (চৈতন্য ভাগবত)

[২০] বারবোসার ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনা হইতে।

[২১] হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥ (চৈতন্য ভাগবত)

[২২] রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস' (২য়) দ্রষ্টব্য। বিজয়গুপ্তের পদ্মা পুরাণের উদ্ধৃত কাজী হিন্দুর ধর্মকর্মে বাধা দিয়া সক্রোধে বলিয়াছিল :

হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান॥
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যথেক ছেমরা।
এড়াকুটি খাওয়াইয়া করিব জাতিমারা॥

এইজন্য সনাতন এবং অন্যান্য হিন্দুরা গৌড় নগর ত্যাগ করিয়া রামকেলি গ্রামে বাস্তু নির্মাণ করেন। সনাতনের আহ্বানে রামকেলি ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভট্টবাটীতে অনেক ব্রাহ্মণ বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও রাজদরবারে কর্ম করিবার জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু আচার-আচরণে কিছু কিছু মুসলমানী ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য সনাতন ও রূপ সমাজে একটু অবনত হইয়া ছিলেন।

হুসেনের সৈন্যেরা কামরূপ অভিযানে গিয়া সর্বাগ্রে কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির ধ্বংস করে। কালিদাস গজদানী নামক এক হিন্দু মুসলমান-কন্যা বিবাহ করিয়া সোলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করেন; ইঁহারই পুত্র খিজিরপুরের সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ মসনদ আলি। হুসেনের পুত্র নুসরৎ শাহ নাকি বৈষ্ণবের প্রতি অনুকূল ছিলেন না। চৈতন্যদেবের কাজিদলন প্রসঙ্গে দেখা যাইবে মাঝে মাঝে হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ক তীব্র আকার ধারণ করিত। মুসলমান সেনাবাহিনী সপ্তগ্রামের একটি মন্দির ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মণগণ নাকি প্রাণপণে সশস্ত্রভাবে বাধা দিয়াছিলেন। বর্ধমানের আগুরি-সম্প্রদায় কারারুদ্ধ হইয়াও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই, ফলে অনেকেই নিহত হইয়াছিল। এক ব্রাহ্মণ যুবক ঘৃণাভরে মুসলমান হইতে অসম্মত হন, ফলে তিনি নির্যাতিত ও অসম্মানিত হইয়া গৌড় হইতে বিতাড়িত হন। দিনাজপুরের দেবতলা ও দেবকোটের মন্দির ভাঙিয়া মসজিদ নির্মিত হয়। দেবকোটের নিকট দমদমায় একটি স্থায়ী সেনাছাউনি ছিল। ইসলাম-প্রচারকারী ফকিরদের অস্ত্রসাহায্য ও অন্যভাবে সাহায্য করাই ছিল ইহাদের একমাত্র কাজ। এই অঞ্চলের হিন্দুগণ দ্রুতবেগে মুসলমান হইয়া যায়। ইহার নিকটে গঙ্গাপুর গ্রামে একদা হিন্দুর সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক, এখানে এখন প্রায় সবই মুসলমান। ধর্মত্যাগের ভয়ে সম্পন্ন গৃহস্থগণ হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে পলাইয়া গিয়া ধর্ম ও প্রাণ রক্ষা করিত, কিন্তু সাধারণ লোকে বাধ্য হইয়া ধর্মত্যাগ করিত। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' আছে যে, গৌরীদাস পণ্ডিত মুসলমানভয়ে সাতদিন জলাশয়ে লুকাইয়া ছিলেন, গদাধর দাস প্রাণত্যাগ করিয়া ধর্মত্যাগের বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পান। এই ব্যাপারে একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে। কালাপাহাড়ের হিন্দু-বিরোধী ধ্বংসোন্মত্ততার ফলে বাঙলার হিন্দু ভূস্বামিগণ নাকি আকবরকে আমন্ত্রণ

করিয়া পাঠান। ইঁহাদের মধ্যে সিন্দুরিয়ার জমিদার, ঠাকুর কালিদাস রায়, সাতোড়ের রাজকুমার গদাধর রায়, দিনাজপুরের গোপীকান্ত রায় এবং তাহেরপুরের রাজারা এই ব্যাপারে গোপনে গোপনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।[২৩] সুতরাং একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাসকশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ এবং মুসলমান ধর্মগুরুদের প্রভাবে পাঠান আমলে মুসলমান ধর্মান্তরীকরণ প্রবলভাবে চলিয়াছিল।

চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে হিন্দুর উপর মুসলমানের নির্যাতনের অনেক কাহিনী আছে। মুসলমানসম্প্রদায় ছিলেন শাসক, সুতরাং শাসিতের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা থাকা স্বাভাবিক, তাহারা তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। আর তা' ছাড়া নিত্য মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়া অথবা মুসলমান দরবারে কর্ম করিয়া কেহ কেহ মুসলমানী আদব কায়দা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ-বা ঐহিক ঋদ্ধির দিকে চাহিয়া স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন :

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাএ নড়ি হাতে কামান ধরিবে॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

সমাজে এরূপ চিত্র না থাকিলে জয়ানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন না। বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' আছে—হুসেন কাজীর শ্যালক হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে সঙ্কুচিত হইত না :

যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাৎ॥
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তার স্কন্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে॥

সুতরাং আর বিস্তৃত উল্লেখ উদ্ধৃত না করিয়াও বলা যায়, সমস্ত ষোড়শ শতাব্দী ধরিয়া বাঙলার নানাস্থানে প্রবলভাবে ধর্মান্তরীকরণ চলিয়াছিল এবং দীর্ঘদিনের মুসলমান সাহচর্যের ফলে সমাজের বন্ধনও বিশেষভাবে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। চৈতন্য-আবির্ভাবের ফলে এবং চৈতন্যসম্প্রদায়ের দ্বারা এই শিথিলতার স্রোত বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক তীব্রতর হইয়া উঠিত, কখনও-বা

---

২৩ রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস (২য়)

আবার শান্ত পরিবেশে একে অপরের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিত। শাসক মুসলমান স্বভাবতঃই নিজ আভিজাত্য সম্বন্ধে কিছু দাম্ভিকতা প্রকাশ করিত। যবন হরিদাস হিন্দুর আচার গ্রহণ করিলে নবদ্বীপের কাজীর অভিযোগে 'মুল্লুকের অধিপতি' হরিদাসকে বলিয়াছিলেন :

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছাড়া হই মহাবংশ-জাত॥ (চৈতন্যভাগবত)

তবে বৈষ্ণবমতবাদের প্রভাবে বোধ হয় এই তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। মুসলমানেও হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত শুনিত। কাজেই অনুমান হয় মুঘল শাসনের পুরাপুরি আরম্ভের পূর্বে পাঠানযুগে প্রবলভাবে ধর্মান্তরীকরণ চলিলেও অধিকাংশ ধর্মান্তরিত মুসলমান হিন্দুকুলোদ্ভব বলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে সম্প্রীতি দেখা দিত।[২৪]

কথা প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে দুই চারিকথা আলোচনা করা যাইতে পারে। পাঠানযুগে এদেশে বহু সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান বাস করিত। শুনা যায়, পাঠান আমলে দক্ষিণবঙ্গে বারজন আউলিয়া মুসলমান ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, উত্তর বাঙলার পুণ্ড্র (পুঁড়ো) ও চাঁড়ালদের একটা বড সংখ্যা হিন্দুসমাজের অত্যাচারে পাঠান আমলেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। চট্টগ্রাম একদা আরবীয় বণিকদের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল; ইহারা ইসলামধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে সাহায্য করিত। কিন্তু এই সমস্ত ধর্মান্তরিত মুসলমান রাতারাতি ধর্ম ত্যাগ করিলেও হিন্দুর আচার-বিচার ও ধর্মবিশ্বাস সহজে ছাড়িতে পারিত না।

হিন্দুসমাজের নানা পর্যায় বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, চৈতন্যাবির্ভাব হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব

[২৪] হিন্দুবিদ্বেষী কাজী ভীত হইয়া চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁহার প্রীতির সম্পর্ক তুলিয়া চৈতন্যের ক্রোধ শান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন :

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

হইতেই নবদ্বীপের বিদ্যাসমাজের খ্যাতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল,—ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি চর্চার কেন্দ্র নবদ্বীপ একদা হিন্দুর প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে বাস করিয়া এবং শুষ্ক ন্যায়-স্মৃতি-ব্যাকরণ-অলঙ্কার অনুশীলন করিয়া একদিকে হিন্দু-সমাজে ভক্তিভাব হ্রাস পাইয়াছিল, আর একদিকে বৃথা-পাণ্ডিত্যের দম্ভ প্রধান হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষতঃ, তন্ত্রমতাবলম্বী কুলাচারী হিন্দু ও সহজিয়া বৌদ্ধগণ তখন দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শুনা যায়, একদল বাঙালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (সংখ্যায় প্রায় যোল শত) 'নেড়া' নাম গ্রহণ করিয়া দলবদ্ধ হইযা সারা বাঙলাদেশেই ঘুরিয়া বেড়াইত। তখন প্রকাশ্যে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি ঘটিলেও গোপনে গোপনে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, কৌলধর্ম, তন্ত্রাচার প্রভৃতি রীতিমত অনুষ্ঠিত হইত। জনসাধারণে মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীর পূজা করিত, যক্ষের উপাসনা করিত, চণ্ডীবিষহরীর দোহাই দিয়া, মদ্য মাংস সেবন করিয়া লৌকিক দেবতার উপাসনায় বিস্তর ধন ব্যয় করিত।[২৫] চৈতন্যধর্ম হিন্দুসমাজকে ভগ্নদশা হইতে উদ্ধার করিয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' কেন 'অষ্টসহস্রাধিক তত্ত্ব' লিখিয়াও হিন্দু সমাজকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন না। সমাজের উচ্চবর্ণেরা ন্যায় ও স্মৃতি লইয়া মত্ত হইয়া থাকিত, আর সেই অবকাশে সমাজের ঈষৎ অন্ত্যজগণ সকলেই মুসলমান হইয়া যাইত। বৈষ্ণবধর্ম, হিন্দুর স্মার্তসংস্কার ততটা না মানিলেও, কোন কোন দিকে দিয়া ভগ্নপ্রাণ হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠিত করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। চৈতন্যের

[২৫] চৈতন্যভাগবতে নবদ্বীপের সমাজের বর্ণনা :

> ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
> দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোনো জন।
> পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন ॥
> বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
> মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥

ইহা শুধু নবদ্বীপের চিত্র নহে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমস্ত বাঙলাদেশের সমাজের চিত্রই এখানে অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রেমধর্মও ভক্তিমান হিন্দু সমাজের উত্তম-অধমকে এক সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিল, এবং এই জন্যই ইসলাম ধর্মের প্রচণ্ড আঘাত গলিতপ্রায় হিন্দুধর্মের প্রাণ-সত্তাটিকে নিঃশেষ করিতে পারে নাই। এমন কি অনেক মুসলমান চৈতন্যদেবকে ভক্তি করিতেন, তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন।) অবশ্য রঘুনন্দন আটাশখানি স্মৃতি রচনা করিয়া হিন্দুসমাজকে নানা বাঁধন দিয়া রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন; অদ্যাপি হিন্দুসমাজের প্রায় সমস্ত শ্রেণী রঘুনন্দনের স্মৃতির মতেই কাজকর্ম নির্বাহ করিয়া থাকেন। তবে (একদিকে যেমন বৈষ্ণবধর্ম ও মহাপ্রভুর প্রভাবে সমাজের আপামর জনসাধারণ নূতন আলোক লাভ করিল, তেমনি আবার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজের সমাজপতিগণ নানা সময়ে শ্রেণীগত সমীকরণের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রেণী-উপশ্রেণীর বৈষম্য দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।) দেবীবর ঘটক (১৪০২ শক) রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের বিজাতীয় আচার-আচরণ দূর করিয়া তাঁহাদের সমাজকে ছত্রিশটি 'মেলে' বিভক্ত করেন। তাঁহার কিছু পূর্বে উদয়নারায়ণ ভাদুড়ী বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের শ্রেণীকে কয়েকটি 'পটীতে' বিভক্ত করেন; পরে বরেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আটটি পটীতে বিভক্ত হইয়া যান। কায়স্থ সমাজেও 'সমীকরণ' হইয়াছিল। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ পুরন্দর বসু (হোসেন শাহের উজীর) কায়স্থসমাজে অনেক নূতন নিয়মের প্রবর্তন করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থসমাজেও কতকগুলি নিয়মকানুন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সে যুগে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে বিবাহ চলিত।[২৬] ইহার কিছু পূর্ব হইতে হিন্দু পরিবারে যবন স্পর্শদোষ প্রবেশ করিয়াছিল। হিন্দুসমাজের নানাপ্রকার সামাজিক ও সম্প্রদায়গত গোলমাল মিটাইবার জন্য মুসলমান সুলতানও 'জাতিমালা কাছারী' স্থাপন করিতেন। সেখানে হিন্দুসমাজের নানা প্রশ্ন ও তর্কবিতর্কের মীমাংসা হইত। সুতরাং লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, চৈতন্যের প্রভাবে যেমন ব্রাহ্মণেতর সমাজ নবজাগ্রত বৈষ্ণব মতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তেমনি উচ্চ বর্ণেরাও স্ব স্ব সমাজকল্যাণের জন্য নিজেদের শ্রেণী ও উপশ্রেণীকে নানা সমীকরণের দ্বারা পরিচ্ছন্ন, পরিমার্জিত ও বিন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

[২৬] নিত্যানন্দের 'প্রেমবিলাসে' ইহার উল্লেখ আছে :

রাঢ়ী বারেন্দ্রর বিয়া হয়্যাছে অনেক :
দেশভেদে নামভেদে এই পরতেক ॥

দেশ শাসন ॥

সে যুগে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে শাসক সম্প্রদায়ের নিবিড়তর যোগাযোগ থাকা সম্ভব ছিল না। পাঠানযুগে নাগরিকতা সৃষ্টি হয় নাই; গৌড়, একডালা, তাঁড়া প্রভৃতি নগরীকে কেন্দ্র করিয়া পাঠান সুলতানের রাজধানী গড়িয়া উঠিয়াছিল। দেশবিদেশ হইতে বণিক, শিল্পী, যুদ্ধব্যবসায়ী, সুফী ও সন্ন্যাসীর দল যাতায়াত করিবার ফলে এই সমস্ত নগরী কিছুকালের জন্য প্রাধান্য লাভ করিত। এ বিষয়ে প্রাচীন গৌড়ের গৌরব সর্বাধিক। গৌড়ের উপর দিয়া বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের স্রোত বহিয়া গিয়াছে; তাতার-তুর্কী-খোরাসানী, আরমানী-মুঘল প্রভৃতি ইসলামধর্মাবলম্বী বহু দল-উপদল বাঙলা অধিকার করিতে আসিয়া বাঙলার রাজধানী গৌড়নগরী আক্রমণ করিয়াছে, কখনও লুণ্ঠ করিয়াছে, কখনও-বা বিধ্বস্ত নগরীকে মেরামত করিয়া সুলতান বা সুবাদার বার দিয়া বসিয়াছেন।[২৭] কিন্তু তাহা হইলেও পাঠান আমলে দেশে নাগরিকতার ভাবধারা বড় একটা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় শাসন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও বণিগ্‌ধর্মী সমাজের প্রভাবে না আসিলে সুপরিকল্পিত নাগরিক জীবন ও নাগরিক মনোভাব গড়িয়া ওঠে না।[২৮] মুঘল যুগেই বাঙলায় যথার্থ নাগরিক জীবনের সূচনা হয়: পাঠান আমলে দেশ কয়েকটি জায়গীরদার ও জমিদারের মধ্যে বিভক্ত ছিল। শের শাহই সর্বপ্রথম বাঙলাকে অনেকগুলি জায়গীরে ভাগ করিয়া সেগুলি নিজ অনুচরদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন এবং কাফি ফজিলেত নামক এক বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তদারকের ভার দেন। ফলে দেশে সুদৃঢ় এবং সর্বগ্রাসী কেন্দ্রীয় শক্তির পরিবর্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ সামন্তশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইঁহাদের উত্তরপুরুষগণই ভুঁইয়া নামে পরিচিত হন। ইঁহারা সরকারকে কোন রাজস্ব দিতেন না, সুলতানের প্রয়োজন হইলে শুধু সেনাসাহায্য করিতে ইঁহারা বাধ্য থাকিতেন। জমিভোগী কৃষাণ ও কারুশিল্পী-

২৭ পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত গৌড় নগরকে মেরামত ও বাসযোগ্য করিয়া হুমায়ুন ইহার নূতন নাম দেন জিন্নতাবাদ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহার জলবায়ু এত দূষিত হইয়া পড়িল যে, বাধ্য হইয়া তাঁড়াতে (তাণ্ডা) রাজধানী সরাইয়া লওয়া হয়।

২৮ নাগরিক জীবনের প্রভাব, যাতায়াত, পথঘাটের সুবিধা ও আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের ফলে য়ুরোপেও রেনেসাঁস এইরূপ ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

সম্প্রদায় এই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষ জড়িত ছিল না, রুজিরোজগারের জন্য কাহাকেও বড় একটা গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইত না। কিন্তু মুঘল আমলের প্রারম্ভে ৯৮২ হিজিরায় টোডরমল্লের বিচক্ষণতায় সমস্ত খালিসা, আবাদী ও অনাবাদী জমি জরিপ হয় এবং উৎপন্ন শস্যের হার নির্ণীত হয়। যে জমিতে এক কোটি টাকার শস্য উৎপন্ন হইত, তাহার নাম ছিল ক্রোড, যাঁহারা তাহার ভার পাইতেন তাঁহাদিগকে 'ক্রোড়ী' বলা হইত। এই ক্রোড়ীরাই আকবরের জমি ও রাজস্ব-ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দিত, সাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। ইহারা এবং ওমরাহেরা 'খালিসা' (খাস) জমি ভিন্ন অন্য সমস্ত জমির মালিক বনিয়া গিয়াছিল; ফলে এই উদ্ধত সম্প্রদায় অনেক সময় দেশের শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ দুর্বল করিয়া ফেলিত। ইহাদের লোভলোলুপতা ও বঞ্চনার ফলে মুঘল যুগে খালিসা জমির পরিমাণ প্রভূতভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। সে যাহা হোক, শাসনব্যাপারের কেন্দ্রে পাঠান ও মুঘল শক্তির কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা হইলেও রাজস্ব ও অন্যান্য ব্যাপারে হিন্দুর প্রাধান্য লক্ষিত হয়; জমিজমার মাপজোখ বিলিব্যবস্থা অনেক সময়ে বুদ্ধিমান হিন্দু জমিদারের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হইত। মুঘলযুগে জায়গীরদারগণ বিদ্রোহী হইয়া সুবাদার মুজাফ্‌ফর খাঁকে হত্যা করিলে টোডরমল্ল এই বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য পুনরায় বাঙলায় প্রেরিত হন; তিনি এদেশে আসিয়া বিদ্রোহী জায়গীরদারদের হতবল করিবার অভিপ্রায়ে সর্বাগ্রে হিন্দু ভূস্বামীদের সাহায্য লইয়াছিলেন। শের শাহ বাঙলার রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থার যে পরিবর্তন করিয়াছিলেন, টোডরমল্ল তাহাকে একেবারে বাতিল না করিয়া নূতন ও পুরাতনকে মিশাইয়া রাজস্ব ও শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। 'ওয়াশিল তুমার জমা'র হিসাবে বাঙলাকে উনিশটি 'সরকারে' এবং ছয়শত বিরাশিটি 'মহলে' বিভক্ত করা হয়। কলিকাতা ('মহল কলকাতা') তখন সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্গত; কলিকাতা ও আর দুইটি মৌজার বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৩,৯০৫ টাকা। উনিশ সরকারের মোট রাজস্বের পরিমাণ ৬,৩৩৭,০৫২, টাকা; জায়গীর জমির রাজস্ব —৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা। ইহার মধ্যে লবণকর, হাটকর, জলকর প্রভৃতি নানাবিধ 'আবওয়াব' ধরা হইত। যাহারা রাজস্ব আদায় করিত, তাহারা প্রজা-সাধারণের উপর কিরূপ উৎপীড়ন চালাইত তাহার নানা বর্ণনা মধ্যযুগের

বাংলা সাহিত্যে একটু অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে। মুকুন্দরামের সাক্ষ্য ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।[২৯]

পাঠানযুগের শেষভাগে বাঙলাদেশে বিদেশী বণিক, বিশেষতঃ পর্তুগীজদের যাতায়াত শুরু হয়। ১৫৩৭-৩৮ খ্রীঃ অব্দের দিকেই ইহারা বণিক হিসাবে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। প্রাচীন পর্যটক বারবোসা ১৫১৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙলাদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ; তিনি 'বাঙলাবন্দরে' (?) শ্বেত বণিকদিগকে বিকিকিনি করিতে দেখিয়াছিলেন।[৩০] পর্তুগীজদের পোর্টো গ্র্যাণ্ডো (চট্টগ্রাম) ও পোর্টো পিকানো (সপ্তগ্রাম) পাঠান আমলেই প্রাধান্য লাভ করে। শের শাহ সোনারগাঁ হইতে যে দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন, দেশে দস্যুতস্করের উৎপাত সত্বেও, এই সমস্ত রাস্তা বাণিজ্যপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। পাঠানযুগে দেশশাসনে যে বাঙালী হিন্দুর অধিকতর অধিকার ছিল, তাহার প্রমাণ হুসেনশাহী বংশ ও কররানি বংশের অধীনে বহু বাঙালী হিন্দু-কর্মচারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং পাঠান আমলে রাজ্যশাসন, বিশেষতঃ রাজস্বব্যাপারে একটা হিন্দু আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মুঘল আমলে এই ব্যাপার বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই যুগে শাসনকার্য ও সামরিক বিভাগের অধিকাংশ উচ্চপদ মুঘল ও উত্তরপ্রদেশের হিন্দুরা ভাগ

---

[২৯] ভবানীদাসও এই কথা বলিয়াছেন :

নির্দয় নিষ্ঠুর রাজা কলিযুগে হব।
নানান প্রমাদ দিয়া প্রজারে জ্বালাব ।।
প্রচণ্ড যবনরাজা হবে ক্ষিতিপতি।
ধর্মকর্ম লোকের হিংসিবে নিতি নিতি ।।
প্রয়াগ বারাণসী আদি যত পুণ্য স্থান।
সকল স্থানের তারা করিবে অপমান ।।
বিড়ম্বনে হরিকার্য করিতে না দিব।
বলে ধরি আনি তার জাতকুল নিব ।।

[৩০] ১৫১৭ সালে সর্বপ্রথম পর্তুগীজ নেতা জোয়ায়ো দে সিলভিরা চট্টগ্রামে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন, ১৫৩৫ সালে রেবেল্লো অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত জাহাজ লইয়া সপ্তগ্রাম বন্দরে ব্যবসা করিতে আসেন. ১৫৩৬ সালে মাহমুদ শাহ মারটিন আফোন্সো দে মেল্লোকে সপ্তগ্রামে কুঠি নির্মাণ, গুদামঘর রক্ষা ও অফিস স্থাপনের অনুমতি দিবার পর এদেশে পর্তুগীজ বণিকদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

করিয়া লইত। ইহাদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের 'লালা' এবং পঞ্জাবের 'ক্ষেত্রীরাই' (যাহারা মুঘল কর্মচারী বা সুবাদারদের সঙ্গে আসিত) অধিকাংশ উচ্চপদগুলি অধিকার করিয়া ফেলিত, বাঙালী হিন্দুর জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। পাঠানযুগে যেমন বাঙালী হিন্দু ও পাঠানে মিলিয়া দেশ শাসন করিত, মুঘল শাসনের প্রারম্ভেই সে নিয়ম বাতিল হইয়া গেল। মুঘল কর্মচারীরা বাঙালীকে বড একটা বিশ্বাস করিত না, বারভুঁইয়াদের ব্যাপারে বাঙালীর প্রতি তাহাদের বিরূপতা জাগাই স্বাভাবিক। ফলে মুঘলযুগে একমাত্র মুরশিদকুলি এবং আলিবর্দি খাঁকে ছাড়িয়া দিলে, আর কেহই হিন্দু বাঙালীকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন না। শাসনবিভাগে বাঙালী হিন্দুর বিশেষ কোন অধিকার ছিল না, ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিদেশী শ্বেতাঙ্গ ও মুসলমান বণিকেরা প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। সুতরাং মুঘলযুগে শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাঙালী হিন্দুর যে বিশেষ অবনতি হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

৩

সংস্কৃতি

চৈতন্যযুগের বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাস নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাহিরের দিকে শাসক শক্তির রোষ-তোষের ফলে, বা সিংহাসনের অধিকারী বদল হইলে, অথবা প্রায়শঃই যুদ্ধবিগ্রহের জন্য সাধারণ মানুষ, ভূস্বামিসম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণসজ্জনের মনে শান্তি ছিল না। পাঠানযুগে কিছু কিছু ধর্মান্তরীকরণের দুঃসংবাদ পাওয়া গেলেও পাঠান সুলতান ও সামন্তবর্গ এ দেশেই বাস করিতেন, বোধহয় অনেকেই বাংলাভাষা শিখিয়াছিলেন—তাহা না হইলে তাঁহারা বাঙালী কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন কি করিয়া, বাঙালী কবিরাই বা তাঁহাদের এত প্রশংসা করিয়াছেন কেন? মুঘলযুগের বাঙালী কবিরা তো মুঘল সুবাদারের বিশেষ জয়ধ্বনি করেন নাই। তাই, পাঠানযুগে নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও বাঙলার সংস্কৃতি একটা ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিয়াছিল। মুঘলযুগের প্রারম্ভে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর ংস্কৃতিক জীবনে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল। (বৈষ্ণবধর্ম এবং গোস্বামি-

সম্প্রদায়ের গ্রন্থরাজি ও অবিস্মরণীয় কীর্তিসমূহের অধিকাংশই ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যেই সমাধা হইয়া গিয়াছিল; নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতির যাহা কিছু বুদ্ধির খেলা—তাহারও মূল ষোড়শ শতাব্দীতেই নিহিত।) যাহা হোক, নিম্নে চৈতন্যযুগের বাঙলার সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

পুরাণ-স্মৃতি-তন্ত্র-বৈষ্ণব আদর্শ॥

চৈতন্যযুগে বাঙলাদেশে পৌরাণিক আদর্শ ও জীবনধারা উচ্চতর শিক্ষিত মহলে বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। সেন-বর্মণ বংশের অধীনে বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের স্থলে পুরাণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যমত এবং বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজের আদর্শ বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। সে যুগের সমাজে পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের পাঠক ও কথকের একটা স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদা ছিল। এই পুরাণীকরণের ফলে হিন্দুসমাজে স্মৃতি-সংহিতার প্রভাব প্রবলরূপে স্বীকৃত হয়, পুরাতন স্মৃতির অনুশাসন ছাড়িয়া নব্যস্মৃতির পরিকল্পনা হয়। পুরাণ এবং স্মৃতিচর্চা, বাঙালী হিন্দুকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে—একথা স্বীকার করিতে বাধা নাই। পৌরাণিক আদর্শ, ধর্মতত্ত্ব ও নীতিবাদ এবং রামায়ণ-মহাভারতের মধ্য দিয়া প্রবহমান উচ্চতর মানবধর্ম বাঙালীর সমাজ-জীবনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

(এই যুগে মুসলমান সংস্পর্শে হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে শিথিলতা দেখা দিয়াছিল, ধর্মকর্ম ও আচার-ব্যবহারে কিছু কিছু অহিন্দু রীতিনীতি প্রবেশ করিতেছিল।) কাজেই রঘুনন্দন[৩১] 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' লিখিয়া, স্মৃতির সুকঠোর বাঁধন দিয়া, শুদ্ধিতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের প্রাচীর তুলিয়া হিন্দু সমাজের বিশ্লিষ্টতাকে কোনও প্রকারে বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন। আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত—স্মৃতির এই তিনটি বিভাগকে রঘুনন্দন নানা নজীর ও গ্রন্থ মিলাইয়া পুনর্গঠিত করেন। ইদানীং বাঙলাদেশের যাবতীয় সামাজিক অনাচারের জন্য রঘুনন্দনকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের কোন কোন বিধান কিছু অযৌক্তিক এবং সমাজগঠনের

---

[৩১] বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০০ খ্রীঃ অব্দের পর প্রাধান্য লাভ করেন। কোন কোন মতে তিনি চৈতন্যের সহপাঠী ছিলেন। পি, ভি, কানে রচিত *History of Dharma Shastra* (Vol. I) দ্রষ্টব্য।

পক্ষে হানিকর বটে,[৩২] কিন্তু সেযুগের বিধ্বস্তপ্রায় হিন্দুসমাজকে বাঁচাইবার জন্য রঘুনন্দনকৃত কৃত্রিম সমাজবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। (চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম যেমন সমাজের মধ্যম শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীকে মুসলমান ধর্মান্তরীকরণ হইতে রক্ষা করিয়াছে, তেমনি রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' সমাজের উচ্চশ্রেণীকেও আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মবিশ্বাসে অটল থাকিতে সাহায্য করিয়াছে।) অবশ্য বৈষ্ণবগণ রঘুনন্দনের স্মৃতি মানিয়া চলিতেন না, তাঁহারা স্বসম্প্রদায়ের স্মৃতির মতেই প্রাত্যহিক আচার-অনুষ্ঠান নির্বাহ করিতেন।

ষোড়শ শতকে বাঙলাদেশে বৌদ্ধপ্রভাব হ্রাস পাইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধমতাবলম্বী রামচন্দ্র কবিভারতী[৩৩] ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই দেশ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্য জীবনীতে দেখা যায় যে, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ বৌদ্ধদের তর্কযুদ্ধে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে মনে হয়, সমাজে প্রকাশ্যে দু'এক স্থলে বৌদ্ধের উল্লেখ পাওয়া গেলেও উচ্চশ্রেণীতে তাহাদের প্রভাব একেবারে হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর সমাজে গোপনে গোপনে সহজিয়া বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এই 'নেড়া'র দলই নিত্যানন্দ ও তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্রের (বীরভদ্র) দ্বারা বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হইয়াছিল—ইহারাই বৈষ্ণব সহজিয়াদের দল পুষ্ট করিয়াছিল।

(হিন্দু স্মার্তসমাজে চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'চৈতন্যভাগবতে' সমসাময়িক নবদ্বীপের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার

---

৩২ রঘুনন্দন হিন্দুসমাজের মুল বিন্যাসকে মুসলমানী ভাবধারার প্রচণ্ড আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কিছু কঠিন সামাজিক বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কোন সিদ্ধান্ত আধুনিক কালে অশ্রদ্ধেয় মনে হইবে। তিনি সতীদাহের বিধান দিয়াছেন—যদিও ইহা প্রাচীন হিন্দুর অবশ্য প্রতিপালনীয় প্রথা ছিল না। তিনি ক্ষত্রিয়দের পর্যন্ত শূদ্র বলিয়াছেন, বৈদ্য সম্বন্ধে তাঁহার মন উদার নহে ('শুদ্ধিতত্ত্বম্')। শূদ্রদের জন্য একমাসের ।চ ব্যবস্থাও তাঁহার অনুদার চিত্তেরই পরিচায়ক।

৩৩ বৌদ্ধাগম চক্রবর্তী রামচন্দ্র কবিভারতী বাঙলা ত্যাগ করিয়া সিংহল যাত্রা করিয়া বং সেখানকার বৌদ্ধসমাজে অতিশয় মান্য হইয়াছিলেন।

দিকে নবদ্বীপ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকলেই বৃথাপাণ্ডিত্য, আন্বীক্ষিকী-বিদ্যার অভিমান এবং তর্কবিদ্যারসে মজিয়া ছিল। "সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ", "বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে", "রমাদৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে"—বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঐ অঞ্চলে বিদ্যা ; ঐশ্বর্যের দীপ্তি কিছু কম ছিল না। তবে দাস বৃন্দাবন দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে" কৃষ্ণনামভক্তি তখনও প্রচার লাভ করে নাই। (চৈতন্যদেবের প্রভাব স্বীকৃত হইতে আরম্ভ করে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তাঁহার তিরোধানের (১৫৩৩) পর সমগ্র হিন্দুসমাজেই তাঁহার অবতারকল্প পুণ্যচরিতকথা অতিদ্রুত বিস্তারলাভ করে। প্রথমে অনেক ভূস্বামী ও অভিজাত সম্প্রদায় (প্রতাপরুদ্র, রায় রামানন্দ, রূপ-সনাতন প্রভৃতি), তাঁহাদের পরেও বীরহাম্বীর, পঞ্চকোটের হরিনারায়ণ রাজ, নরোত্তম, রঘুনাথ দাস, উদ্ধারণ দত্ত (সপ্তগ্রামের ধনী সুবর্ণ বণিক) প্রভৃতি বড় বড় জমিদার ও ধনী ব্যক্তি চৈতন্যতত্ত্বে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।) প্রথম দিকে কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজ, বিশেষতঃ স্মৃতিশাসিত ও তন্ত্রাচারী ব্রাহ্মণগণ চৈতন্যদেবের ঘোর বিরোধিতা করিয়াছিলেন। স্মৃতিকার রঘুনন্দন মুসলমান সংস্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণ্য আদর্শকে রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর, সংশূদ্র ও সঙ্কীর্ণশূদ্র প্রভৃতির মধ্যে নানা সূক্ষ্ম ব্যবধানের রেখা টানিয়াছিলেন,—চৈতন্যের আবেগমূলক প্রেমধর্ম কিন্তু তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বুদ্ধিজীবী নব্যন্যায়পন্থী পণ্ডিতসমাজ, আচারপন্থী স্মার্তসমাজের কেহ কেহ এবং তান্ত্রিক শাক্তসমাজ প্রথম হইতেই চৈতন্যসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন।) এই সময়ে নবদ্বীপে একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অলীক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল—"কেহ বলে বিপ্ররাজ হইবেক গৌড়ে।" এই সংবাদে স্থানীয় মুসলমানগণ চিন্তিত হইয়াছিলেন বোধ হয়। তাই নবদ্বীপে প্রচারিত হইল :

> এই মত কথা হইল নগরে নগরে।
> রাজনৌকা আসে বৈষ্ণব ধরিবারে॥

এ সমস্ত গুজব অচিরে লোপ পাইয়াছিল। (চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার শিষ্য ও অনুচর-পরিকরগণ প্রেমধর্ম ও ভক্তিদর্শন প্রচার করিলেও চৈতন্যদেব নিজে সক্রিয় হইয়া বিশেষ কোন তত্ত্বদর্শন প্রচার করিয়া যান নাই ;

কারণ শেষ জীবনে তিনি প্রায়ই অধ্যাত্ম লীলারসে ডুবিয়া থাকিতেন।) নিজে তিনি কিছু কিছু স্মৃতির বিধান মানিয়া চলিতেন, বরং তাঁহার অনুচর নিত্যানন্দ আচার-বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। অবধূত হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যানন্দ সমাজে 'বান্তাসী' দোষে পড়িয়াছিলেন। সে যাহা হোক, (চৈতন্যদেবের ভক্ত শিষ্যগণ, বিশেষতঃ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বৈষ্ণব আদর্শ প্রচারের দ্বারা এবং বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ বৈষ্ণবদর্শন, স্মৃতি ও কাব্য রচনা করিয়া ভক্তিভাবব্যাকুল বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে একটা সুদৃঢ় দার্শনিক প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই সনাতন, রূপ ও জীব-গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, রসতত্ত্ব, দার্শনিকতা ও স্মৃতির উপরে যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন,[৩৪] পরবর্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সমাজ তাহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবসমাজে মুসলমান ও হিন্দুসম্প্রদায়ের অন্তেবাসিগণ স্থান পাইলেও সকলেই অল্লাধিক বৈষ্ণব স্মৃতির অনুশাসন মানিয়া চলিতেন। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজ ও আদর্শ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।)

ভক্তগণ চৈতন্যদেবের পুণ্যক্ষেম জীবন হইতেই বৈষ্ণবধর্মের রাগানুগাভক্তি-তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিদর্শনও ইহাদিগকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য প্রথমদিকে গৌড়ীয় সমাজের প্রচারকার্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন; পরবর্তী কালে শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রঘুনাথদাস, বীরচন্দ্র (বীরভদ্র)—আরও পরে রাধামোহন ঠাকুরের উপর বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বের ভার পড়ে।) বৈষ্ণব সমাজের এই যে স্মৃতির শাসন, দার্শনিক প্রত্যয়, শুদ্ধ যতিজীবনের আদর্শ, ভাগবতাশ্রয়ী ভক্তিধর্ম —ইহাদের মূলে ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব। কারণ (বৃন্দাবনের গোস্বামীদের বৈষ্ণব স্মৃতি ও দর্শনগ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল।) ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ে পরিপুষ্ট দর্শন, স্মৃতি ও ভক্তিশাস্ত্র বৈষ্ণবধর্মে ও আচরণে স্বীকৃত হইয়াছে। তবু ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব আদর্শ প্রচারিত হইবার ফলে সুকঠোর স্মার্তমতাবলম্বী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কিছু শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কোন কোন মুসলমান ভক্তরূপে গৃহীত হইলেও তাঁহারা পংক্তি ও সামাজিক আচার-ব্যবহার হইতে সাধ্যমত দূরে থাকিতেন। কিন্তু (চৈতন্যদেব সমস্ত সংসারকে ভক্তির রসে ভাসাইয়া

[৩৪] পরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া জাতিসংস্কারের বাহ্যবন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র আসিয়া বৈষ্ণব-সমাজে যে প্রবল পরিবর্তন আনিলেন, তাহার ফলে বৈষ্ণব ধর্মমত কোথাও রূপান্তরিত হইল, ভাঙিয়া পড়িল, কোথাও-বা যৌনাচারী রহস্যবাদী উপধর্মের সৃষ্টি করিল।

চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্মের প্রধান প্রভাব সাহিত্যেই বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। ধর্ম হিসাবে ইহা চৈতন্যের তিরোধানের পূর্বে ব্রাহ্মণ্য সমাজে অবজ্ঞাত হইয়াই ছিল। কিন্তু প্রেম ও আবেগমূলক ভক্তিধর্ম সমাজের নানা-স্তরে ক্রমে ক্রমে এমন একটা গতিবেগ সংগ্রহ করিল যে, স্মার্ত, তান্ত্রিক ও নব্যন্যায়ের সংস্কার বহুলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বাঙালীর অধিমানসে, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে এবং সর্বোপরি অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে চৈতন্যধর্ম ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই মহৎ জীবনাদর্শ সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল। এই বৈষ্ণবধর্মের প্রসাদেই বাঙলার সঙ্গে বহির্বঙ্গের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল; চৈতন্যদেব ভারতের দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্বে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব গোস্বামীসম্প্রদায়ও দূরে দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মথুরা-বৃন্দাবন তো বাঙালী বৈষ্ণবেরাই পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। য়ুরোপের রেনেসাঁসে যেমন ভৌগোলিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ হইয়াছিল, বাঙলাদেশের চৈতন্যযুগে সেরূপ ব্যাপার না ঘটিলেও বাঙালীরা যে ঘর ছাড়িয়া বৃহৎ ভারতবর্ষে তীর্থদর্শনের জন্যও ছড়াইয়া পড়িতেছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্যদেব শুধু ধর্মজগতের নহেন, বাঙালীর মনোজগতের দ্বারও খুলিয়া দিয়াছিলেন, বৃহৎ ভারতের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মনে করেন যে, দিল্লীর মুঘল শাসনের ফলেই বাঙলার সামাজিকতা ও চেতনার সীমা সম্প্রসারিত হইয়াছিল[৩৫]। একথা অযথার্থ নহে, কিন্তু চৈতন্যাবির্ভাব না হইলে মুঘলশাসন শুধু শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকিত, বাঙালীর মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইতে পারিত না। চাকুরী-জীবী এবং দিল্লীশ্বরের প্রসাদভিক্ষু কিছু কিছু বাঙালী অভিজাত ব্যক্তি হয়তো বাঙলা হইতে দিল্লী দরবারে হাজিরা দিত, পথঘাটের সুগমতা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার ফলে আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে চলিত, কিন্তু

---

৩৫ *History of Bengal* (Vol. 2)—Edited by J. N. Sarkar

চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রভাব ব্যতিরেকে বাঙালীর মনের আকাশের সীমা কখনই এতটা প্রসারিত হইতে পারিত না। তাই চৈতন্যধর্ম শুধু প্রেম-ভক্তি প্রচার করে নাই, আদ্বিজচণ্ডালকে কোল দেয় নাই, বাঙালীর মনের সম্প্রসারণে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে—ইহা একটা ঐতিহাসিক সত্য।

বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে শাক্তমতের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। চৈতন্যযুগেও শাক্ত মত ও তন্ত্রাশ্রিত ধর্ম প্রায় সমগ্র বাঙলাদেশেই ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। এই শাক্তগণ চৈতন্যমতের ঘোরতর বিরোধিতা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বৈষ্ণবভক্তিবাদের প্রবলতায় শাক্তমত কিছু কোণঠাসা হইলেও বাঙলাদেশ হইতে কখনই দূরীভূত হয় নাই।[৩৬] এখনও অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, বাঙলাদেশই নাকি তন্ত্রের উৎসভূমি এবং এদেশ হইতেই তন্ত্রমত আসামে, নেপালে—এমন কি সুদূর তিব্বত-চীনে প্রসারিত হইয়াছিল।[৩৭] একটি প্রাচীন শ্লোকে আছে যে, তন্ত্রবিদ্যার উৎপত্তি বাঙলায়, বিহারে, মিথিলায়—প্রচার মহারাষ্ট্রে এবং বিনাশ গুর্জরে।[৩৮] এই সমস্ত মত ও মন্তব্য কতদূর যথার্থ তাহা বলা যায় না। তবে সাধারণতঃ পূর্বভারতে, বিশেষতঃ বাঙলা-দেশে যে বহুকাল হইতে তন্ত্রের বিকাশ, বিবর্ধন ও জনপ্রিয়তা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যের পূর্বে গোটা দেশটাই প্রায় পুরাপুরি শাক্ত বনিয়া গিয়াছিল, তাঁহার পরেও শাক্ত মত বিলুপ্ত হয় নাই। চৈতন্যের পূর্বে এবং সমকালে ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্র—ইহাই ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রধান পরিচয়। এ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, খ্রীঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই তন্ত্রাচার (যাহা কুলাচার বা কৌলশাস্ত্র নামে পরিচিত) বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল। মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য নামক যে প্রাচীন তন্ত্রকারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তিনি খুব সম্ভব চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। বাংলা অক্ষরে লেখা তাঁহার 'কাম্য যন্ত্রোদ্ধার' পুঁথিটি ১২৯৭ শকে (১৩৭৫ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখিত হইয়াছিল। এদেশে বাঙালী তান্ত্রিকেরা মৌলিক তন্ত্রশাস্ত্র অপেক্ষা নিবন্ধ জাতীয় (অর্থাৎ বিভিন্ন

৩৬ চৈতন্য জীবনীগ্রন্থে তান্ত্রিক সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাসূচক উক্তি আছে। শাক্তগণও বৈষ্ণবদের তীব্র ব্যঙ্গ করিতেন। ব্রহ্মানন্দের 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী'তে বৈষ্ণববিদ্বেষ লক্ষণীয়।

৩৭ Winternitz—*History of Indian Literature*—Vol. I

৩৮ R. P. Chanda—*Indo-Ayan Races*.

মতের সঙ্কলন) তন্ত্রগ্রন্থই অধিক সংখ্যায় সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তন্ত্রসঙ্কলক হিসাবে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের নাম এবং তাঁহার 'তন্ত্রসার' সুপরিচিত। লোকমতে তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং নবদ্বীপের অধিবাসী। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য ব্রহ্মানন্দ গিরি এবং তাঁহার বিখ্যাত শিষ্য পূর্ণানন্দ গিরি বোধহয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন। বাঙলার শাক্ত-সমাজে তাঁহারা বৈষ্ণব আচার্যদের মতোই মান্য ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ যে কিঞ্চিৎ বৈষ্ণববিরোধী ছিলেন, তাঁহার 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী'তেই তাহার পরিচয় মিলিবে। পূর্ণানন্দের 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি', 'শাক্তক্রম', 'শ্যামারহস্য', 'ষট্‌কর্মোল্লাস' প্রভৃতি গ্রন্থের জনপ্রিয়তা শাক্তপরিবারে এখনও হ্রাস পায় নাই। গৌড়শঙ্কর, মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি তান্ত্রিক আচার্যগণ—কেহ ষোড়শ, কেহ-বা সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ী তন্ত্র সাধারণ সমাজেও বিশেষ প্রচারলাভ করিয়াছিল। ইহার প্রতি জনগণের প্রলোভন থাকাই স্বাভাবিক। 'পঞ্চ মকার'[৩৯] সাধনা, শ্রীবিদ্যা-অনুশীলন, ষট্‌কর্ম ইত্যাদি লোভনীয় ব্যাপারের প্রতি সাধারণ লোকে আকৃষ্ট তো হইবেই। 'কুলার্ণব তন্ত্রের' এই শ্লোকটি সাধারণ লোকের মনে কোন্ ভাব জাগাইত তাহা সহজেই অনুমেয় :

> আমিষাসব-সৌরভহীনং যস্য মুখং ভবেৎ।
> প্রায়শ্চিত্তী স বর্জ্জ্যশ্চ পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥

যাহার মুখে মদিরা-মাংসের গন্ধ নাই, সে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য এবং বর্জনের যোগ্য ; সে যে সাক্ষাৎ পশু, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

তন্ত্রের কোন কোন শ্লোকে স্পষ্টই যৌনশিথিলতার বিধান আছে। সুতরাং তন্ত্রাচারের প্রতি প্রাকৃত মানুষের আকর্ষণ তো থাকিবেই। সে যুগে সাধারণ সমাজে তন্ত্রমন্ত্র-অভিচারের এত বাড়াবাড়ি ছিল যে, চৈতন্যদেব দ্বার রুদ্ধ করিয়া যখন ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন করিতেন তখন অবৈষ্ণব জনসাধারণ মনে করিত :

---

[৩৯] পঞ্চমকার—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। অবশ্য এগুলির স্থূল অর্থের সঙ্গে গুরুতর তাৎপর্যও আছে। যেমন মৈথুনের তাৎপর্য—

> কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনাং দেহধারিণী।
> তয়া শিবস্য সংযোগে মৈথুনং পরিকীর্তিতম্ ॥

অর্থাৎ—সহস্রারে অবস্থিত পরমাত্মার সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনীর সংযোগে উদ্ভূত পরমানন্দ অনুভব করাকেই তন্ত্রে মৈথুন বলে।

এগুলা সকলে মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।।

কেহো বলে আরে ভাই, মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।।

... ...

কেহো বলে, আরে ভাই, সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ জানিল।।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে।।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ।। (চৈতন্য ভাগবত)

চৈতন্যযুগেও ষট্‌কর্মের (জারণ. উচাটন, মারণ ইত্যাদি) প্রচুর অনুশীলন হইত। তন্ত্রের দোহাই দিয়া সমাজেও নীতিবিরোধী কার্যকলাপ চলিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে যে সংস্কৃত পুঁথির তালিকা[৪০] সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাতে অসংখ্য তন্ত্রের পুঁথির উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কোন কোনটিতে রুচির লেশমাত্রও রক্ষিত হয় নাই—এমন কি তাহাতে এমন সমস্ত বীভৎস ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে যে, আধুনিক কালের পাঠক তাহা পড়িলে শিহরিয়া উঠিবেন। জ্ঞানানন্দ পরমহংস নামক কোন এক তান্ত্রিক সাধক 'কৌলাবলী নির্ণয়' নামক একখানি তান্ত্রিক পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে অত্যন্ত আপত্তিকর কদর্য যৌনাচার ঘটা করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পঞ্চমকার, মদ্যপান, সুরাদেবীর ধ্যান, তান্ত্রিক চক্রে যোনিবিচার বর্জন, সাধিকা রমণীর লক্ষণাদি বর্ণনা এবং পরিশেষে "অথ কামকলা ধ্যানাদি কথনম্‌" প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়া বামাচারী ব্যাপারসমূহ খোলাখুলিভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভট্টনাগ নামক এক তান্ত্রিক 'ত্রিপুরাসার সমুচ্চয়ঃ' তান্ত্রিকগ্রন্থে কি করিয়া সুন্দরী যুবতী আনয়ন করিতে হয়, তাহার মুষ্টিযোগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ণবসমাজেও তন্ত্রের প্রভাব ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল—'রাধাতন্ত্র'ই তাহার প্রমাণ। সমীরাচার্য প্রণীত 'গোবিন্দ কল্পলতা'য় রাধাকৃষ্ণের রূপকে তন্ত্রাচার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহা হোক, ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য-

৪০ *Notices of Sanskrit Manuscripts* (Vol. I)—H. P. Sastri

প্রভাবান্বিত যুগেও তন্ত্রের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং চৈতন্যের অনুচর-পরিকরদের সংখ্যা বিপুল না হইলে তান্ত্রিকাচার ও শাক্ত-বিরোধিতার ফলে চৈতন্যের প্রেমধর্ম গৌড়দেশে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। পরে অবশ্য চৈতন্যের প্রেমধর্মও শাক্তমতের উপর একটা মহৎ প্রতিশোধ লইয়াছিল।

বৈষ্ণবগণ যতই শাক্ত বিরোধিতা করুন না কেন, তন্ত্রের দ্বারা তাঁহারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অবশ্য দুইটি মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তন্ত্র মূলতঃ অদ্বৈতবাদী, বৈষ্ণবমত মুখ্যতঃ দ্বৈতবাদী। এই জন্য অদ্বৈতবাদী রামমোহন তন্ত্রের পক্ষপাতী হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও চৈতন্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অবশ্য অন্য কারণও থাকিতে পারে। তন্ত্র বুদ্ধিকেন্দ্রিক, বৈষ্ণবসাধনা আবেগমূলক। প্রখর মননশীল রামমোহন যে তন্ত্রের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

কৌলাচার ও সহজিয়া মতের প্রভাবে বৈষ্ণবমতের কোথাও কোথাও তন্ত্রের প্রভাব পড়িয়াছে ('রাধাতন্ত্র' ও 'গোবিন্দকল্পলতিকা' স্মরণীয়)। তেমনি আবার সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে শাক্ত পদাবলী রচিত হইয়াছিল, তাহার মূল প্রেরণা তন্ত্র হইলেও, বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও আবেগ এই পদসমূহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। এখনও বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ও শাক্ত গুরুসম্প্রদায় প্রবল। পঞ্চোপাসক ও স্মার্ত হিন্দুগণ বিধিবিহিত কার্যে রঘুনন্দন মানিয়া চলিলেও, তাঁহারা এখন হয়তো আর চক্রে বসেন না, বা বৈষ্ণবের সমস্ত কৃত্য পালন করিতে পারেন না—কিন্তু আপনার অজ্ঞাতসারে তাঁহারা বৈষ্ণব ও তন্ত্রমতের দ্বারাই চালিত হন। তাই সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, সমাজের অধিকাংশ উচ্চবর্ণেরা অদ্যাপি তন্ত্র-শাক্ত মতের দ্বারাই পরিচালিত হন। একদা বাঙলাদেশে তান্ত্রিকতা প্রবল হইয়াছিল, সাধারণ সমাজে আনুষ্ঠানিক ইত্যাদি অপ্রচলিত হইয়া পড়িলেও মূল আদর্শ ও বিধিবিধান এখনও অনুসৃত হইয়া থাকে।[৪১]

৪১

(i) *The Cultural Heritage of India*—Vol. II

(ii) *Report of the Search of Sanskrit Mss.* (1895-1900)—Mm. H. P. Sastri.

দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্য ॥

আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দেখিয়াছি যে, বিশুদ্ধ দর্শনচর্চায় বাঙালীর বড একটা অনুরাগ দেখা যায় নাই। চিন্তার নির্বস্তুকতা বা অবিকল্প চৈতন্যের আস্বাদ গ্রহণও এ জাতির মনোধর্মের বিশেষ অনুকূল নহে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও আবেগের উদ্বেলতা—এই দুইটি পরস্পরবিরোধী চরিত্র ও মনোভঙ্গী বাঙালী-সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেখা গিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতেও বাঙালী-মনীষার শ্রেষ্ঠ দান নব্যন্যায় এবং চৈতন্য রেনেসাঁস —একটি অপরটির যেন সম্পূর্ণ বিপরীত। নব্যন্যায় বুদ্ধির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করিয়াছে, অপরদিকে চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব মতাদর্শ যুগপৎ ঐশ্বর্য ও জ্ঞান-বিরোধী। বাস্তবাতিচারী আবেগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান সহায়ক।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বাঙলাদেশে কিরূপ দর্শনচর্চা হইত, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ দুষ্কর হইলেও এমন সমস্ত উপাদান ও ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে যে, যাহাতে মনে হয়, চৈতন্যযুগের পূর্বেও এদেশে স্মৃতি-মীমাংসার চর্চা তো ছিলই, এমন কি ষড়দর্শনও অনুশীলিত হইত। কারণ বঙ্গাক্ষরে লেখা ষডদর্শনের পুঁথি ও টীকা এদেশে প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীনযুগে পূর্বমীমাংসা, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দর্শন বাঙলাদেশে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মীমাংসা চর্চা ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিল। মুসলমান অভিযানে শিথিলীকৃত হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের জন্য চৈতন্যযুগের পূর্বে স্মৃতির চর্চা অধিক পরিমাণে হইত, এবং স্মৃতি অনুশীলনের জন্য যতটুকু মীমাংসার প্রয়োজন, বিদ্যার্থীরা শুধু সেইটুকুই অধ্যয়ন করিত। অথচ বাঙলার বাহিরেও একদা গৌড়-মীমাংসকদের[৪২] খ্যাতি স্বীকৃত হইয়াছিল। তন্ত্র-স্মৃতি প্রভৃতি চর্চার জন্য মীমাংসার প্রয়োজন; তাই পঞ্চদশ শতাব্দীতেও অল্পাধিক মীমাংসা অনুশীলিত হইত। এই শতকে আবির্ভূত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'অধিকরণ কৌমুদী' রচনায় মীমাংসার প্রচুর সাহায্য লইয়াছিলেন। উত্তর-বঙ্গের চন্দ্রশেখর মীমাংসার টীকা লিখিয়াছিলেন।[৪৩]

---

[৪২] গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি'-তে গৌড়-মীমাংসকের উল্লেখ আছে।

[৪৩] মীমাংসা এবং অন্যান্য দর্শনের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য:

(i) *Contribution to the History of Smriti in Bengal and Mithila* by Manomohan Chakraborty (J. A. S. B, 1915)

(ii) *Bengal's Contribution to Philosophical Literature in Sanskrit* by Chinta Haran Chakraborty ('The Indian Antiquary', 1929-30)

মীমাংসার কথা ছাড়িয়া দিলে ষড়দর্শনের মধ্যে বেদান্তানুশীলন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী, এমন কি তাহার পরেও অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। আদি-পর্বেও দেখা যাইতেছে হরিবর্মাদেবের মন্ত্রী ভবদেবভট্ট অদ্বৈতদর্শনে প্রাজ্ঞ ছিলেন। তাহার পরেও বেদান্ত চর্চার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৩৬১ শকে (১৪৩৯ খ্রীঃ অঃ) বঙ্গাক্ষরে লেখা 'বেদান্তসূত্রে'র কিয়দংশ এখনও বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে আছে। এই পরিষদ এবং মাদ্রাজের আদায়ার গ্রন্থাগারে বাঙলা অক্ষরে লেখা উপনিষদের অনেকগুলি পুরাতন পুঁথি রহিয়াছে। বেশ পুরাতন যুগেই (৯৯১ খ্রীঃ অঃ) শ্রীধরের 'অদ্বয়সিদ্ধি' রচিত হয়। গৌড় পূর্ণানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীতে 'তত্ত্বমুক্তাবলী-মায়াবাদ-শতদূষণী'-তে ১২০টি শ্লোকে শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করেন।[৪৪] চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে রীতিমতো বেদান্ত অনুশীলন হইত, কিন্তু পণ্ডিতগণ প্রায়ই শঙ্করের মায়াবাদকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেন। ন্যায়-বৈশেষিকের প্রাধান্যের ফলে তাঁহারা বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্যকে পদে পদে আক্রমণ করিতেন; ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মতবাদের প্রভাবে বেদান্তের অদ্বৈতবাদী ভাষ্যও পুনঃপুনঃ আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছে। বাসুদেব সার্বভৌম 'অদ্বৈত মকরন্দে'র[৪৫] এবং রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহর্ষের 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যম্'এর টীকা লিখিয়াছিলেন। বাঙলার প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী (ষোড়শ শতাব্দী) শঙ্করের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার 'অদ্বৈত সিদ্ধি', 'অদ্বৈতরত্ন রক্ষণ', 'বেদান্তকল্পলতিকা', 'গূঢ়ার্থদীপিকা', 'সিদ্ধান্ত বিন্দু', 'প্রস্থানভেদ' প্রভৃতি গ্রন্থ বৈদান্তিক সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাঙলাদেশে পরবর্তী কালে অদ্বৈতবেদান্তের অপেক্ষা বেদান্তের দ্বৈতবাদী বা ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা ও টীকাটিপ্পনী অধিকতর প্রাধান্য পাইলেও মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতবাদেরই শ্রেষ্ঠ এবং শেষ প্রচারক। অবশ্য তাঁহার মনেও দ্বৈতবাদী ভক্তি ঈষৎ ছায়াপাত করিয়াছিল। তিনি 'প্রস্থানভেদে' নানা দর্শন ও তত্ত্ব আলোচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তকে শ্রেষ্ঠ

---

[৪৪] মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহে' ইঁহার উল্লেখ আছে, সুতরাং ইনি চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন।

[৪৫] তখনও বাসুদেব ভক্তিপথের পথিক হন নাই। এই অদ্বৈতবাদী টীকা ১৪৬০-৮০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' (প্রথম খণ্ড)-এর ৪১-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্থান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ—তাঁহার 'ভক্তিরসায়ন'। ইহাতে ভক্তির সাহায্যে মোক্ষলাভের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মধুসূদন বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী হইলেও তদানীন্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিবাদের দ্বারা যে আংশিক প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে।

মধুসূদন সরস্বতীর অল্প পরে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী বা গৌড়ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হন। ইনি মধুসূদনের 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র টীকা রচনা করিয়া এবং 'অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বিদ্যোতন' নামক অদ্বৈততত্ত্ববিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়া পাণ্ডিত্যের প্রমাণ দিয়াছেন। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দী হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে এদেশে অদ্বৈততত্ত্বের ভক্তিবাদী ব্যাখ্যাই বিপুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। মধ্ব, নিম্বার্ক ও বল্লভের বেদান্তসূত্রের দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ও আদর্শকে কোন কোন দিক দিয়া প্রভাবিত করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর বলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দভাষ্য' নামক বেদান্তসূত্রের টীকায় উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতির সাহায্যে দ্বৈতবাদী ভক্তিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তাঁহার পূর্বে জীবগোস্বামী[৪৬] অতি সুচারুরূপে সেই চিন্তাপ্রণালীকে বিপুলায়তন দর্শনের রূপ দিয়াছেন।[৪৭]

বেদান্তানুশীল ছাড়িয়া দিলে মধ্যযুগের বাঙলায় একমাত্র নব্যন্যায় ব্যতীত সাঙ্খ্য বা বৈশেষিক দর্শনের বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ সাঙ্খ্যকার কপিলকে গৌড়ীয় প্রমাণ করিতে চাহিলেও ইহা কখনও সত্য নহে। বাঙলাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাঙ্খ্যদর্শন বিশেষ অনুশীলিত হয় নাই। অথচ তন্ত্রের মূলতত্ত্বের সঙ্গে সাঙ্খ্যদর্শনের (হরপার্বতী এবং পুরুষপ্রকৃতি) সাদৃশ্য আবিষ্কার দুরূহ নহে। রঘুনাথ তর্কবাগীশের 'সাঙ্খ্যবৃত্তিপ্রকাশ' মৌলিক গ্রন্থ নহে—ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাঙ্খ্যকারিকা'র টীকা মাত্র। এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার একখানি পুঁথি আছে; পুঁথিটি ১৪৪৮ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত হইয়াছিল। সুতরাং টীকাকার ইহার পূর্বে বর্তমান ছিলেন। পরবর্তী কালে 'সাঙ্খ্য-

---

[৪৬] জীবগোস্বামীর সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

[৪৭] চৈতন্যভক্ত বাসুদেব সার্বভৌম, মুরারি গুপ্ত, অদ্বৈত আচার্য, স্বরূপ দামোদর—ইঁহারা প্রথম জীবনে অদ্বৈতপন্থী ছিলেন। পরে চৈতন্যপ্রভাবে দ্বৈতবাদী ভক্ত হইয়াছিলেন।

কারিকা'র আরও দুই-একখানি টীকা পাওয়া গেলেও যোগদর্শনের কোন মৌলিক আলোচনা বা টীকা এদেশে পাওয়া যায় নাই।

পরিশেষে বাঙলাদেশে ন্যায়চর্চার উল্লেখ করিতে হয়। গৌড়ীয় নৈয়ায়িক-দের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, তার্কিকতা ও বিচক্ষণতা সারা ভারতবর্ষেই শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এই স্থানে ভারতের নানা অঞ্চল হইতে দলেদলে নব্যন্যায়-পাঠার্থী ছাত্র আসিত, এখনও সে রীতি অল্প পরিমাণে বজায় আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ন্যায় ও মীমাংসার উপর অসংখ্য টীকা রচিত হইলেও ইহার পূর্বে ন্যায়শাস্ত্র আলোচনায় বাঙালীর বিশেষ প্রবণতা দেখা যাইত না। মুসলমান অভিযানের পূর্বে এদেশে বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মমতের বিশেষ প্রভাব ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ তার্কিক রত্নাকর শান্তির (দশম শতাব্দী) গ্রন্থ, গৌতমের 'ন্যায়সূত্র' এবং উদয়নাচার্যের 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' এদেশে যৎসামান্য আলোচিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যখন নব্যন্যায় এদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইল, তখনই তাহার দেখাদেখি প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রও অল্পাধিক আলোচিত হইতে লাগিল।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, বাঙালী নব্যন্যায় সৃষ্টি করে নাই। প্রসিদ্ধ মৈথিলী পণ্ডিত গঙ্গেশ উপাধ্যায় (চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) 'তত্ত্বচিন্তামণি' নামক নব্যন্যায়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙালী পণ্ডিতগণ গঙ্গেশের গ্রন্থের অসংখ্য টীকা রচনা করিয়াছেন; সেই টীকা রচনাতেই তাঁহাদের যা' কিছু প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মূলগ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি' অপেক্ষা ইহার টীকাগুলি এদেশে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছে। বাঙালী নৈয়ায়িকগণ অনেক সময় গঙ্গেশের গ্রন্থের ভুলভ্রান্তি দেখাইয়া নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ন্যায়শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত—প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বাঙালী নব্যন্যায়ের চর্চা করিয়াছে এবং সে ধারা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল। হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ), জানকীনাথ ভট্টাচার্য (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) রঘুনাথ শিরোমণি (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম), কণাদ তর্কবাগীশ (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম), রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী (ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ), মথুরানাথ তর্কবাগীশ (ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ), কৃষ্ণদাস সার্বভৌম ভট্টাচার্য (ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ), গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য

(ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ পাদ), রামভদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্য (ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শুনা যায় বাসুদেব সার্বভৌম (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) মিথিলায় ন্যায় পড়িতে গিয়া বাঙলাদেশে 'তত্ত্বচিন্তামণির' পুঁথি আনিতে চাহিলে বাধা প্রাপ্ত হন। তখন তিনি সমগ্র গ্রন্থটিকে কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে লইয়া আসেন।[৪৮] পরে এদেশে গঙ্গেশের গ্রন্থের নিপুণ ও তীক্ষ্ণ টীকাটিপ্পনী রচিত হইল। 'তত্ত্বচিন্তামণি'র বিখ্যাত বিশখানি টীকার মধ্যে বার খানাই বাঙালীর রচিত। এই টীকাকারদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি এবং মথুরানাথ তর্কবাগীশের খ্যাতি সারা ভারতের নৈয়ায়িক সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হইয়াছে। রঘুনাথ বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকা 'তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি' বাঙালী-মনীষার গৌরব প্রমাণিত করিয়াছে। ইহাতে তিনি গঙ্গেশের মতের তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে গঙ্গেশের ভ্রমপ্রমাদ নির্দেশ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। বহু বিখ্যাত বাঙালী টীকাকার রঘুনাথের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।[৪৯] এমন কি অনেক বাঙালী টীকাকারও 'কাণভট্ট' শিরোমণির[৫০] টীকার টীকা রচনা করিতে শ্লাঘা বোধ করিতেন। একদা এদেশের পণ্ডিতসমাজে নব্যন্যায়ের আলোচনা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল ; মধ্যযুগে যিনি ন্যায় জানিতেন না, তাঁহাকে কেহ পণ্ডিত বলিত না। অবশ্য কথা উঠিবে, এই বিখ্যাত নৈয়ায়িকগণ বড একটা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। টীকা, তস্য টীকা—এইভাবে শুধু টীকা-টিপ্পনির স্তূপ বাড়িয়াছে, কিন্তু গঙ্গেশের মতো কেহ কোন নূতন গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন নাই। কেহ কেহ ইহাকে বাঙালীবুদ্ধির গতানুগতিক পুচ্ছগ্রাহিতা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। সে যুগের পাণ্ডিত্য কতকটা এই প্রকারই ছিল। সেকালের পণ্ডিতসমাজ মৌলিক গ্রন্থ অপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-

---

৪৮ তিনি ইহার 'সারাবলী' টীকা রচনা করেন। ইহাই বোধ হয় বাঙালী রচিত 'তত্ত্বচিন্তামণির' প্রথম টীকা।

৪৯ মথুরানাথ তর্কবাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রামভদ্র সার্বভৌম, জগদীশ তর্কালঙ্কার--ইঁহারা সকলেই রঘুনাথের টীকার টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

৫০ তাঁহার একটি চক্ষু কানা ছিল বলিয়া তিনি এই নামে উল্লিখিত হইতেন।

ভাবে বিশ্লেষণ করিতেন, প্রতিপক্ষের মতামত খণ্ডন করিয়া বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন, কিন্তু নূতনভাবে কোন একটি মৌলিক চিন্তাধারা প্রকাশ করিতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করিতেন না। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্তী যথার্থই বলিয়াছেন যে, রঘুনাথ শিরোমণি হইতে গদাধর ভট্টাচার্য পর্যন্ত নবদ্বীপে এমন সমস্ত পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহাদের সূক্ষ্ম চিন্তাধারা ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি মধ্যযুগের য়ুরোপীয় দার্শনিকদেরও পরাজিত করিতে পারিত।[৫১] কিন্তু তাঁহাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি শুধু টীকা রচনায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, ইহাই পরিতাপের বিষয়।

এই যুগে নৈয়ায়িকগণ বোধ হয় যাগযজ্ঞ ও স্মার্ত ক্রিয়াকলাপে হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। উপরন্তু চৈতন্যের অনুচরগণও নামসঙ্কীর্তনাদির জন্য স্মার্ত-সমাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এই জন্য সে যুগের একজন স্মার্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিতেরা হোম-যাগযজ্ঞ না করিয়া রঘুনাথ শিরোমণির সূক্ষ্মতত্ত্ব লইয়া মত্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং অবধূত নিত্যানন্দের প্রভাবে কৃষ্ণ নামেও সকলে পাগল। সুতরাং দেখা যাইতেছে কলির পরাক্রম বাড়িয়া চলিয়াছে।"[৫২] অবশ্য অনেক নৈয়ায়িক বৈষ্ণব ভক্তিবাদের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবানন্দ গ্রন্থারম্ভে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করিয়া তবে আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন ('নবকিশোরং নমস্যামঃ', 'প্রণম্য শিরসা কৃষ্ণং' ইত্যাদি)। গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশও বৈষ্ণব মতের প্রতি অনুকূল ছিলেন। ইনি "বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ চতুর্ব্যূহ বিষ্ণু"কে প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। নবদ্বীপের নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য-সমাজ চৈতন্যদেবের বিরোধী ছিলেন, কেহ কেহ একথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক নৈয়ায়িক যে বৈষ্ণব মতকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাও মিথ্যা নহে। তান্ত্রিক ও শাক্ত মতাবলম্বীরা চৈতন্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন বটে, কিন্তু নৈয়ায়িক সমাজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদী হইলেও ধর্মমতের দিক দিয়া আবেগময় বৈষ্ণবমতেরই পক্ষপাতী

[৫১] "Nabadwip was adorned by galaxy of philosophical stars, Raghunath Siromani to Gadadhar Bhattacharyya, the products of whose brain rivalled in acuteness of reasoning and subtlety of thought of the best schoolmen of Medieval Europe", (*History of Navya Nyaya in Bengal and Mithila* by Manomohan Chakraborty, J. A. S. B 1915)

[৫২] দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—বাঙালীর সারস্বত অবদান

ছিলেন।[৫৩] সে যাহা হোক, ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালী-মনীষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিবাদ, রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি, রঘুনাথের নব্যন্যায়, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি বিচিত্র গ্রন্থ, আদর্শ ও দার্শনিকতার সুমুদ্রিত প্রভাব দৃষ্টিগোচর হইবে। ইঁহাদের মধ্যে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি এবং নৈয়ায়িকদের নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও চিন্তার তীক্ষ্ণতা বাঙলার বাহিরেও শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

অবশ্য নব্যন্যায় বাঙালীর বিচারবুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করিয়াছে, বিশ্লেষণ শক্তিকে নিপুণতর করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাস্ত্র হইতে যথার্থতঃ কী লাভ হইয়াছে, কেহ কেহ এ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। ফাদার পন্‌স্ নামক এক জেসুইট্ পাদ্রী ১৭৪০ সালের দিকে বাঙলাদেশে আসিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই নব্যন্যায়, "stuffed with an endless number of questions, great deal more subtle than useful." নব্যন্যায়-শিক্ষার্থী সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট কথা স্মরণীয়, "The students spend several years in studying a thousand varieties of subtleties on the members of the syllogism, the causes, the negations, the genera, the species etc. They dispute stubbornly on such like trifles and go away without having required any other knowledge."[৫৪] সে যাহা হোক, নব্যন্যায়ের অনুশীলনে উপযোগবাদীদের প্রয়োজন থাক আর নাই থাক, ইহাতে যে বাঙালীর কুশাগ্রতীক্ষ্ণ ধীশক্তির অপূর্ব বিকাশ হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

এবার আমরা এই এক শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের কথা আলোচনা করিয়া ভূমিকা-অংশ সমাপ্ত করিব। অতি প্রাচীন কাল হইতে বাঙলাদেশে সংস্কৃত-ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, অভিধান, আয়ুর্বেদ, স্মৃতি প্রভৃতির রীতিমতো অনুশীলন হইয়াছিল।[৫৫] চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাধারণ শিক্ষিত সমাজেও

---

৫৩ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—বাঙালীর সারস্বত অবদান (১ম)

৫৪ তপনমোহন রায়চৌধুরী—*Bengal under Akbar and Jehangir*

৫৫ লেখকের এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত গ্রন্থাদির পঠন-পাঠনের রীতি প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্তের বাল্যশিক্ষা এবং বিপ্রদাস মনসামঙ্গলে লক্ষীন্দরের বিদ্যার্জন প্রসঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য, স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্যযুগের য়ুরোপে খ্রীষ্টানী শিক্ষাতে দুই প্রকার শিক্ষাবিধি অনুসৃত হইত—'শিক্ষাত্রয়ক' (*Trivium*) এবং 'শিক্ষাচতুষ্টক' (*Quadririum*)। অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও তর্কবিদ্যা 'Trivium' এবং পাটীগণিত, সঙ্গীত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা 'Quadrivium' নামে পরিচিত। এই দুই পর্যায়ের শিক্ষা লাভ না করিলে মধ্যযুগের খ্রীষ্টানসমাজে সম্মান পাওয়া যাইত না। আকবরের যুগে এদেশেও 'তাবি' (পদার্থ বিজ্ঞান), 'রিয়াজি' (গণিত ও অলঙ্কার) ও 'ইলাহি' (ধর্মতত্ত্ব) না শিখিলে মুসলমান-সমাজে বিদ্বান বলিয়া সম্মান পাওয়া যাইত না। চৈতন্যের পূর্বে সাধারণ শিক্ষার্থীসমাজে কি কি গ্রন্থ পড়িতে হইত, বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' হইতে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :

> অষ্টধাতু অষ্ট শব্দ পড়িল সত্বরে।
> সোমাই পণ্ডিত দ্বিজ শুভদিন করে ॥
> পড়িশালে[৩৬] লইলেক বালা লখিন্দর।
> প্রথমে পড়ায় সূত্র সুখে দ্বিজবর ॥
> তারপর ব্যাকরণ পড়ে রাজসুতে।
> ভট্টি রঘু সাহিত্য পড়িল হরষিতে ॥
> অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান।
> জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান ॥
> অষ্টাদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার।
> হইল পণ্ডিত বড় রাজার কুমার ॥

ইহা হইতে চৈতন্যের অব্যবহিত পূর্বে শিক্ষাধারা সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যাইবে।

খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর গোড়াতেই বাঙলাদেশে প্রবলভাবে আর্যাভিযান আরম্ভ হইয়াছিল। আর্যগোষ্ঠীর বহির্ভূত গৌড়বঙ্গ একদা আর্য হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; তাহার জন্য উত্তরাপথের স্মার্ত কৃত্য, ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের নীতি-আদর্শ একদা এ জাতিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু যাহাকে রসসাহিত্য বা Literature of Power বলে,

[৩৬] অর্থাৎ পাঠশালা

বাঙলাদেশে লক্ষ্মণ সেনের যুগেই তাহার কিছু উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল। অবশ্য ইতিপূর্বে বা পরে রসসাহিত্যের অনুশীলন ও অধ্যয়নের প্রতি বাঙালীর কোন আকর্ষণ ছিল না, একথা ঠিক নহে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙলা, মিথিলা ও নেপাল হইতে যে সমস্ত সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বহু পুঁথি বাংলা অক্ষরে অনুলিখিত। মধ্যযুগে নব্যন্যায়ের সর্বগ্রাসী প্রভাব সত্ত্বেও সংস্কৃত কাব্যাদির চর্চা যে কিয়ৎপরিমাণে চলিয়াছিল, তাহা এই সমস্ত প্রাপ্ত পুঁথির তালিকা হইতেই প্রমাণিত হইবে। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' (পুঁথির তারিখ—১৪৭৯ শক), 'মেঘদূত' (সংবৎ ১৭৮৬), মেঘদূতের টীকা (১৬৩৯ শক), শকুন্তলা নাটক (১৪৯৪ শক), শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' (১৬০৭ শক), ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম্' (১৪৯৩ শক), কবিরাজের 'রাঘবপাণ্ডবীয়ম্' (১৬১১ শক), নীতিবর্মার 'কীচকবধ' (১৫৯৬ শক), কৃষ্ণ-মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' (১৬৬৫ শক), 'অমরু শতক' (১৬৬৩ শক) প্রভৃতি সুপরিচিত কাব্য নাটকের অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র পুঁথি যত্রতত্র মিলিয়াছে, এবং ইহার অনেক টীকাও রচিত হইয়াছিল। বাঙলাদেশে প্রাপ্ত অধিকাংশ সংস্কৃত পুঁথি কিন্তু বঙ্গাক্ষরে অনুলিখিত। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে একথা অনুমান করিতে পারা যায় যে চৈতন্যযুগে সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদি বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাহ না হইলে এত পুঁথি মিলিবে কেন?

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, পাঠান সুলতানগণ সংস্কৃত জানিতেন না, তাই দেবভাষার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। বরং তাঁহারা কিছু কিছু বাংলা জানিতেন এবং বাংলা রচনার জন্য বাঙালী কবিকে উৎসাহিত করিতেন। সুতরাং বাঙলাদেশে এই যে সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদির অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহার মূলে পণ্ডিতসমাজের অনুরাগ ব্যতীত কোন অভিজাত ওমরাহ বা সুলতানের অনুপ্রেরণা ছিল না। অবশ্য হিন্দু ভূস্বামী সম্প্রদায় কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্ডিতমণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

বাঙলার সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলন প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে একটু সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান করিতে হইবে। মধ্যযুগের বাঙালীরা উত্তরাপথের সিদ্ধ কবিদের কাব্যনাট্যাদির পুঁথি ও টীকা নকল করিয়াছেন, নিজেরাও কিছু কিছু টীকা রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যযুগে নবদ্বীপ ও গৌড়ের অদূরে রামকেলিকে

কেন্দ্র করিয়া রূপ-সনাতনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সুদৃঢ় বিদ্বৎসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ন্যায় ও স্মৃতির সঙ্গে যে কিছু কিছু কাব্যনাট্যাদির অনুশীলন চলিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? তবে এই যুগে বাঙালীর রচিত দুই একখানি মৌলিক কাব্যনাট্যাদির সন্ধান মিলিতেছে। যেমন ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের এক পুরোহিত মুঘল অভিযানের প্রথম দিকে 'কৌতুকরত্নাকর' নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে ১৪৯৩ খ্রীঃ অব্দে রচিত ত্রয়োদর্শ সর্গে সমাপ্ত চতুর্ভুজের 'হরিচরিত-কাব্য'-এর নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। রামকেলি গ্রামের অধিবাসী এই কবি ভাগবতের আদর্শে বিষ্ণু-অবতার কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে একটি বিরাট কাব্য রচনা করেন। রূপ-সনাতনের পূর্বে বোধ হয় রামকেলি গ্রামে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের রীতি প্রচলিত ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিতে পারা যায়। গোকুলনাথ নামক এক নাট্যকার কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের আদর্শে রূপক ধরণের 'অমৃতোদয়' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য 'কুবলয়াশ্বচরিত' নাটকে মদালসার চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অমরমাণিক্য পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'বৈকুণ্ঠবিজয়' নাটক রচনা করেন। ইহাতে ঊষা-অনিরুদ্ধের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এইযুগে কিছু কিছু মৌলিক নাটক-নাটিকা-কাব্য যে রচিত হয় নাই তাহা নহে।

ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের গোস্বামীপ্রভুরা যে সমস্ত কাব্য-নাটক রচনা করিয়াছিলেন, এখানে তাহার বিশেষ উল্লেখ না করিলে বাঙালীর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে না। চৈতন্যদেবের আদর্শ, চরিত্র ও আবেগের গঙ্গোদকে অভিষিক্ত হইয়া চৈতন্য-পরিকরগণ অনেকগুলি কাব্য-নাটক লিখিয়াছিলেন, যাহার খ্যাতি সারা ভারতেই ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। ইঁহারা সকলেই চৈতন্য-পরিকর, ভক্ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সেবক এবং ভাগবতের ভক্তি অবলম্বনে মধুর রসের উদ্‌গাতা। বৈষ্ণবকাহিনী, রাধাকৃষ্ণ পদাবলী, চৈতন্যজীবনী প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ইঁহারা নাটক, কাব্য, চম্পূকাব্য ও রসশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্ত, সনাতন গোস্বামী, রূপ-গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন, জীবগোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ—ইঁহারা সকলেই সংস্কৃত সাহিত্য, কাব্যতত্ত্ব, ভক্তিসন্দর্ভ,

রসশাস্ত্র—সর্বোপরি চৈতন্যতত্ত্বে বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ চৈতন্যের জীবন অবলম্বনে কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্তের কড়চা ('শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত'), কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' (কাব্য), 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' (নাটক) প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যনাট্যে মুখ্যতঃ চৈতন্যের জীবনকথা এবং প্রসঙ্গক্রমে চৈতন্যের পরিকর সম্বন্ধেও অনেক তথ্য বিবৃত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী প্রধানতঃ বৈষ্ণব স্মৃতি ও ভাগবতের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার 'বৃহদ্ ভাগবতামৃত', 'হরিভক্তিবিলাস', 'বৈষ্ণবতোষণী' প্রভৃতি গ্রন্থে ও টীকায় যেমন ভাগবতের ভক্তিরসতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ বৈষ্ণব আচার ও কৃত্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইঁহাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষার অনুরূপ প্রতিভা এইযুগের উত্তরাপথের কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মধ্যেই পাওয়া যায় না।[৫৭]

সনাতনের অনুজ রূপ গোস্বামী কবিপ্রতিভায় অগ্রজকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি নাটক, ভাণিকা, কাব্য, চম্পূকাব্য, রসশাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র—সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় প্রতি বিভাগেই অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। নাটকের মধ্যে তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব', 'দানকেলিকৌমুদী' (ভাণিকা), কাব্যের মধ্যে 'হংসদূত', 'উদ্ধব সন্দেশ' 'পদ্যাবলী' (সঙ্কলন), 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও উজ্জ্বলনীলমণি' নামক ভক্তি ও রসশাস্ত্র, 'নাটকচন্দ্রিকা' (নাট্যশাস্ত্র) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার বহুমুখী কবিপ্রতিভা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। এই দুই ভ্রাতা চৈতন্যের প্রভাবে কাব্যসাহিত্যে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার পূর্ব হইতেই সাহিত্যরসে সদাব্রতী ছিলেন। রূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব, অলঙ্কারশাস্ত্র ও ভক্তিবাদে তাঁহার কিরূপ অধিকার ছিল তাহা এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্টরূপে জানা যাইবে।

সনাতন-রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র (অনুপমের পুত্র) জীব গোস্বামী জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্র ও রসতত্ত্বে স্নাতক হইয়াছিলেন। জীবের মতো তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী মনীষীর দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে বড একটা পাওয়া যায় না। সনাতন ভাগবত ব্যাখ্যার দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের পীঠিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন,

[৫৭] এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৈষ্ণব গোস্বামীদের গ্রন্থের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

রূপ গোস্বামী কাব্য ও রসের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী সেদিকে ততটা আত্মনিয়োগ না করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কায়ব্যূহ নির্মাণে অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি যে কাব্য-কবিতা রচনা করেন নাই তাহা নহে। 'গোপালচম্পূ', 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম', 'মাধবমহোৎসব', 'গোপাল বিরুদাবলী' প্রভৃতি কাব্যকবিতা, 'রসামৃতশেষ', 'দুর্গমসঙ্গমণি', 'লোচন-রোচনী'[৫৮] প্রভৃতি রসশাস্ত্র, 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ',[৫৯] 'সূত্রমালিকা' প্রভৃতি ব্যাকরণ গ্রন্থে তাঁহার আশ্চর্য নিপুণতা প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব আচার-আচরণ তত্ত্বের উপর লিখিত গ্রন্থাদিতেও ('গোপালতাপনী', 'ব্রহ্মসংহিতা', অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণের টীকা) তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু জীব গোস্বামী স্মরণীয় হইয়াছেন বৈষ্ণব দর্শনবিষয়ক 'ষট্সন্দর্ভের' জন্য। এই ছয়খানি গ্রন্থ ('তত্ত্বসন্দর্ভ', 'ভগবৎসন্দর্ভ', 'পরমাত্ম সন্দর্ভ', 'কৃষ্ণসন্দর্ভ' ও প্রীতিসন্দর্ভ') তাহার বিপুল পরিশ্রম, অসাধারণ মনীষা, তত্ত্বভূয়িষ্ঠ জ্ঞানানুশীলন এবং দার্শনিকোচিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার স্মারকস্তম্ভ রূপে বিরাজ করিতেছে। যাহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বলে, ইতিপূর্বে রূপ-সনাতনও স্বরূপদামোদরে মিলিয়া তাহার কায়ব্যূহ নির্মাণ করিলেও তখনও এই ধর্ম একটা সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। যে-কোন বৃহৎ ধর্মমত দার্শনিক সত্যের মধ্যে বিধৃত না হইলে তাহা কালক্রমে লোকধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং পরিশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামি-গণ[৬০] (রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, সনাতন, রূপ ও জীব) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চেষ্টায় চৈতন্যধর্ম পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে পরিণত হইয়াছিল। জীব গোস্বামীর বিপুল মনস্বিতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে বিশ্বের ভক্তিদর্শনের একটি বিচিত্র শাখায় পরিণত করিয়াছে এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও কৃত্যকে একটি সুচিরস্থায়ী বিকাশের অভিমুখে পরিচালিত করিয়াছে। পরবর্তী কালে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' জীব গোস্বামীর দার্শনিক মতের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত

[৫৮] 'দুর্গমসঙ্গমণি' ও 'লোচনরোচনী' যথাক্রমে রূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও উজ্জ্বল-নীলমণির' টীকা।

[৫৯] এই ব্যাকরণের প্রত্যেক দৃষ্টান্তে কৃষ্ণের নাম আছে।

[৬০] এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষড়গোস্বামীদের সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

হইয়াছে। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর পরে সংস্কৃতানুসারী বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা আর ততটা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। ষড়গোস্বামীদের গ্রন্থই উচ্চতর বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত ছিল, নূতন মৌলিক গ্রন্থের বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী-মানস কী ভাবে বিবর্তিত ও বিকশিত হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহার কথা বিবৃত করিলাম। এই মানসধর্ম বাঙলা সাহিত্যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ

ভূমিকা ॥

মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য, চৈতন্যজীবনী, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আধুনিক কালের শিক্ষিত বাঙালীর কিছু কিছু কৌতূহল, আকর্ষণ ও প্রীতি থাকিলেও একমাত্র মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রকে বাদ দিলে বর্তমানকালে বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও ছাত্রসম্প্রদায় ব্যতীত আর বড কেহ মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসু নহেন। ১৮৭১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র *The Calcutta Review* পত্রে 'Bengali Literature' প্রবন্ধে এবং বেঙ্গল সোসাল সায়ান্স এসোসিয়েশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় ('A Popular Literature for Bengal'—1870) মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। অবশ্য 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি কবিকঙ্কণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৭৩) মুকুন্দরাম, কেতকাদাস ক্ষমানন্দ, রামেশ্বর ও ঘনরামের উল্লেখ থাকিলেও 'মঙ্গল কাব্য' নামক কোন বিশেষ সাহিত্যশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় অবহিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৭৭ সালে ইংরেজী ভাষায় 'Literature of Bengal' নামক বাংলা সাহিত্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অতি নিপুণতার সঙ্গে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের বিস্ময়কর কবিপ্রতিভা ব্যাখ্যাত হইলেও মঙ্গলকাব্য নামক কোন স্বতন্ত্র পন্থার কাব্য সম্বন্ধে রমেশ-চন্দ্র কোন মন্তব্য করেন নাই। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে রাজনারায়ণ বসু 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮) নামক পুস্তিকাতেও মঙ্গলকাব্যের পৃথক শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তবে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার ইতিহাসে কবিকঙ্কণের কাব্যকে 'চণ্ডীকাব্য' এবং কেতকাদাসের গ্রন্থকে 'মনসার ভাসান' বলিয়াছেন। অনুমান হয় রামগতি 'ভাসান' অর্থে মঙ্গলকাব্যই বুঝিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র

প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬) মঙ্গলকাব্যের বিশেষ শ্রেণী ও কাব্যশাখার স্বরূপ নির্ণয় করেন।

বাঙলাদেশে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক এবং পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য, পূজা-প্রচার ও ভক্তকাহিনী অবলম্বনে যে-ধরণের সম্প্রদায়গত প্রচারধর্মী ও আখ্যানমূলক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য বলা হয়। যাঁহারা মঙ্গলকাব্য রচনা করিতেন বা গান করিতেন অথবা ভক্তিভরে শ্রবণ করিতেন, তাঁহারাই চণ্ডীর গান বা মনসার ভাসানকে মঙ্গল নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত মঙ্গল-কাব্যের অনেকগুলি এক মঙ্গলবারে পাঠ আরম্ভ হইত এবং পরের মঙ্গলবারে সমাপ্ত হইত। এই জন্য কোন কোন মঙ্গলকাব্য 'অষ্টমঙ্গলা' নামেও পরিচিত। পূর্ববঙ্গে রাত্রি জাগিয়া মঙ্গল গান হয় বলিয়া সেই অঞ্চলে ইহা 'রয়ানী' ('রজনী' শব্দের অপভ্রংশ) নামে অধিকতর পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে উক্ত 'মঙ্গল' শব্দের কিছু যোগাযোগ থাকিতে পারে। চৈতন্য ভাগবতের "প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল" অথবা কৃত্তিবাসী রামায়ণের "নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে" প্রভৃতি উদ্ধৃতিতে 'মঙ্গল' শব্দ লীলাকাহিনীকে নির্দেশ করিতেছে। তামিল ভাষায় 'মঙ্গল' শব্দ বিবাহ অর্থে প্রযুক্ত হইলেও বাংলা মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তামিল 'মঙ্গলের' কোন সম্পর্ক নাই। 'মঙ্গল রাগ' নামক গানের সুরবিশেষ হইতেই যে মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসহ নহে।[১] যে কোন অর্থেই হোক না কেন, মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' শব্দটির সঙ্গে শুভ ও কল্যাণের অর্থসাদৃশ্য আছে। দেবমাহাত্ম্যবাচক বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য যে আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল, সাধারণ কথায় তাহাকে মঙ্গলকাব্য বলা যায়।

মঙ্গলকাব্য, ব্রতকথা ও পাঁচালী ॥

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মঙ্গলকাব্যের প্রথম লিখিতরূপ পাওয়া গেলেও তাহারও দুই-তিন শত বৎসর পূর্বেও ইহার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে

[১] ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সংস্করণ)-এর ৮৩-৮৬ পৃষ্ঠায় ঐ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে।

হয়। পুরাপুরি মহাকাব্য বা পুরাণের আকার লাভ করিবার পূর্বে মঙ্গল-কাব্যগুলি গ্রাম্য মেয়েলি ব্রতছড়া ও লোকধর্মানুকূল কৃত্যের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। পূর্ববঙ্গে শনি ও সূর্যের পাঁচালী এবং গোটা বাঙলাদেশেই সত্যপীরের পাঁচালীর পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই পাঁচালী ব্রতকথারই লিখিত রূপ।

মঙ্গলকাব্যকে অন্ততঃ দুইটি স্তরের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করিতে হইয়াছে। প্রথম স্তরটিকে ব্রত-কৃত্য নাম দেওয়া যাইতে পারে। ধর্মানুভূতি, গার্হস্থ্যজীবনের সুখশান্তি এবং শিল্পচেতনাকে সংমিশ্রিত করিয়া আর্যেতর সমাজে ও আর্যসমাজের স্ত্রীমণ্ডলে একপ্রকার কৃত্যকেন্দ্রিক ছড়ার সৃষ্টি হয়। বলাই বাহুল্য যে, লৌকিক দেবদেবীর প্রসাদ প্রার্থনার জন্যই অন্তঃপুরিকারা ব্রত-ছড়ার সাহায্য লইতেন, আল্পনা ও অন্যান্য পবিত্র প্রতীক চিহ্নের দ্বারা দেবদেবীর বন্দনা করিতেন। পয়ারের ছড়া বা হাল্‌কা চালের চটুল ছন্দে দেবমহিমা বিষয়ক কোন একটা কাহিনী বিবৃত হইত। বস্তুতঃ, ব্রত-ছড়ার কোন রচনাকার নাই—সমাজই ব্রতকথার স্রষ্টা, রচনাকার ও সংরক্ষক। বহুজনের মিলিত চেষ্টার ফলে সমাজ-মানস হইতেই ব্রতকথার আবির্ভাব।

অনুমান হয়, মুসলমান অভিযানের পূর্বে সর্পের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মনসা ও ব্যাধের দেবী চণ্ডীর লীলামাহাত্ম্য বিষয়ক অনেক ছোটখাট ব্রতকাহিনী প্রচলিত ছিল। তারপরে বোধহয় দেবীদের কথঞ্চিৎ সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠা ঘটিলে দ্বিতীয় পর্যায়ে পুরুষসমাজেও মেয়েলি ব্রতকথা পাঁচালীর আকারে পঠিত বা গীত হইত। পাঁচালীতে কাহিনী থাকিত, কাহিনীর পৌর্বাপর্যও থাকিত (যাহা ব্রতকথায় সম্ভব নহে), এবং মোটামুটিভাবে বক্তব্যের মধ্যে একটা সঙ্গতিও থাকিত। এই দ্বিতীয় স্তরের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া না গেলেও ইহার কিছু কিছু আনুমানিক দৃষ্টান্ত দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। কানা হরি দত্তকে মনসামঙ্গলের কবিগণ আদি কবি বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, কেহ-বা তাঁহার ভুলভ্রান্তি ধরিয়া নিন্দা করিয়াছেন।[২] তিনি সম্ভবতঃ মনসামঙ্গলের ছড়ার রূপকে পাঁচালীর আকার দিয়াছিলেন।[৩] পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের কবি বিজয়

২ তৃতীয় অধ্যায়ে কানাহরি দত্ত প্রসঙ্গে এ কথার আলোচনা করা হইয়াছে।

৩ বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলেও ব্রতকথার ছাপ সুস্পষ্ট। ডক্টর সুকুমার সেন সম্পাদিত *Vipradas's Manasa-Vijaya*-এর ভূমিকা (pp. IX-X) দ্রষ্টব্য।

গুপ্তের সময়ে হরি দত্তের রচনা লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে মনসামঙ্গল কাব্য মহাকাব্য ও পুরাণের ছাঁচে রচিত হইতে আরম্ভ করিলে এ সমস্ত ব্রতকথা ও পাঁচালী ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেতকাদাস ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গল কাহিনী পশ্চিমবঙ্গে সুপরিচিত। কিন্তু ক্ষমানন্দের ভণিতাযুক্ত মনসামঙ্গলের একখানি অতি ক্ষুদ্র কাহিনী পুরুলিয়া হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্যের পুঁথিটি অর্বাচীন হইলেও ইহার কাহিনীবিন্যাস অনেকটা ব্রতকথা বা পাঁচালীর মতো। তাই মনে হয়, মনসামঙ্গল কাব্য ব্রতকথা ও পাঁচালীর মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ইঙ্গিত করিয়াছেন: "পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও একটা পর্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার ছোটো ছোটো পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া একটা বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্য, ফুলধরা হইলেই ফুলের পাপড়িগুলির মতো, ঝরিয়া পড়িয়া যায়।" ('সাহিত্য') রবীন্দ্রনাথ এখানে পল্লীসাহিত্য' বলিতে ব্রতছড়াকেই নির্দেশ করিয়াছেন এবং 'বৃহৎসাহিত্য' বলিতে পূর্ণাকারের মঙ্গলকাব্য, অনুবাদসাহিত্য প্রভৃতিকে বুঝাইয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যের পটভূমি ও বিষয়বস্তু ॥

বাঙলাদেশে মৌর্যযুগের পূর্ব হইতেই আর্যাভিগমন আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু মৌর্যযুগ হইতে উত্তরাপথের আর্যগণ বেদনিন্দিত পূর্বভারতে অধিক সংখ্যায় আসিতে শুরু করিয়াছিল এবং গুপ্তযুগে বাঙালীর আর্যেতর মানস আর্যমতে যথোচিত দীক্ষা লইয়াছিল। তাহার পূর্বে এই আর্দ্রভূমির দেশে কাহারা বাস করিত? নৃতাত্ত্বিকগণ নানা উপাদান বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনযুগে যখন আর্যগণ ব্রহ্মাবর্ত বা আর্যাবর্তের সীমা ছাড়াইয়া পূর্বাঞ্চলে প্রসৃত হয় নাই, তখন এই অঞ্চলে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কৃষিজীবী

আদিম জাতি বাস করিত। তাহাদের আচার-আচরণ, কৃত্য, আধিমানসিক চর্যা, জনন-মরণ-বৈবাহিক বৈশিষ্ট্য আর্যাভিগমনের স্রোতে অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। পরে আর্য-অনার্য-দাস-দস্যু-ব্যাধ-রাঢ়-চুয়াড-নিষাদ-পুক্কস-কোল্লভীল্ল প্রভৃতি জাতি-উপজাতিতে মিশিয়া গৌড়মণ্ডলে যখন একটি মিশ্র নৃতাত্ত্বিক জাতির উদ্ভব হইল, তখন হইতে আর্যের স্মৃতি-মীমাংসা-দর্শন অনুশীলন করিয়া 'সত্ত প্রমোশন'-পাওয়া গৌড়বঙ্গের অধিবাসীরা প্রাণপণে আর্য হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজের যে সমস্ত পুরুষ বাহিরে কাজকর্ম করিত, চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধব্যবসায় লিপ্ত থাকিত, তাহারা আর্যপ্রভাবে নিজ নিজ কৌলিক আচার-আচরণ ত্যাগ করিয়া মনেপ্রাণে আর্য বনিবার জন্য সচেষ্ট হইল। স্মৃতি-মীমাংসা পুরাণের প্রভাবে, সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন এবং পুরোহিত-যাজকসম্প্রদায়ের চেষ্টার ফলে আর্যেতর বাঙালী অচিরে আর্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিল, নিজ নিজ পূর্বতন কৃত্য ও আচার-আচরণ, কোথাও ইচ্ছা করিয়াই ভুলিল, কোথাও-বা ঔদাসীন্যবশতঃ এবং উচ্চতর মর্যাদার লোভে নিজেদের সংস্কার পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কিন্তু ঈষৎ অনগ্রসর পুরুষসম্প্রদায় এবং অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীসমাজ অত সহজে আপনাদের কুলাচার ও গার্হস্থ্য বৈশিষ্ট্য, ব্রত-দেবোপাসনা প্রভৃতি ছাড়িতে পারিল না। উপরন্তু সমাজের যে অংশ আর্যভাবাপন্ন উচ্চতর বর্ণ হইতে দূরে অবস্থান করিত এবং হীনবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহারা পূর্বতন আর্যেতর আচার ও দেববিশ্বাসের খানিকটা আঁকড়াইয়া রহিল। চণ্ডী ও মনসা এই পর্বের দেবী। পরে এই দেবীরা সংস্কৃত ও মার্জিত হইয়া আর্যদেবমণ্ডপে স্থান করিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র ও ব্যবহারের মধ্যে যে রুক্ষতা, নির্মমতা, স্বার্থপরতা ও দম্ভ লক্ষ্য করা যায়, তাহাতে স্পষ্টতঃ আর্যেতর প্রাণশক্তির অমার্জিত ও অমসৃণ প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে মানুষ জগৎকে ইন্দ্রিয় দিয়া উপলব্ধি করে, যাহারা জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য আত্মশক্তি ও বুদ্ধিতে অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য এক-একটি উৎপাতের দেবতা সৃষ্টি করিতে হয়। আর্দ্রভূমির দেশ বাঙলা—এখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর এবং সর্বত্র সাপ। সুতরাং মনসার বন্দনা করিলে সর্পাঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে চণ্ডীর উপাসনা করিলে সমস্ত আপদ কাটিয়া যাইবে, দক্ষিণরায়-কালুরায়ের পূজা-

শীর্ণি দিলে ভক্তকে আর বাঘ-কুমীরের আক্রমণে প্রাণ হারাইতে হইবে না। এমনি করিয়া উপদ্রুত অসহায় কৃষিসমাজ, নিম্নবর্ণ এবং স্ত্রীমণ্ডল ভয়ে-ভক্তিতে মনসার ভাসান গাহিয়াছে, চণ্ডীর মঙ্গলগান বাঁধিয়াছে, রঞ্জাবতী-লাউসেন-কানাড়া-কলিঙ্গার অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় রহিয়াছে একটি বিশাল গ্রামকেন্দ্রিক জল-জঙ্গল-পরিবেষ্টিত নদীমাতৃক বাঙলা-দেশ—যেখানে অষ্টিক নরগোষ্ঠীর লোকই প্রধান, যাহারা শিক্ষা-সভ্যতায় পুরা-পুরি আর্যত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

পরবর্তী কালে মঙ্গলকাব্য একটি মার্জিত শিল্পরূপের আকারে রচিত হইলেও ইহার মূলে আর্যেতর গ্রামীণ এবং লৌকিক দেবসংস্কার ও জীবনবাদ লুকাইয়া আছে। দায়ে পড়িয়া অথবা ভয়েভক্তিতে যখন সাধারণ বাঙালী চণ্ডী-মনসার আরাধনা করিত, গান রচনা করিত, দল বাঁধিয়া পাঁচালী গাহিত তখন মঙ্গল-কাব্যের একটা গ্রামীণ আদর্শ ফুটিয়া উঠিত—অবশ্য সে আদর্শ উচ্চতর ভাব-কল্পনা বর্জিত। পরে মুসলমানযুগে ব্রতকথা-ছড়া-পাঁচালী ধরণের মঙ্গলকাব্যে উত্তরাপথের আর্যের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম-দর্শন প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল এবং সেই সময় হইতে গ্রামীণ দেব-দেবীকে 'জাতে' তুলিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। মনসা মহাদেবের কন্যা, জরৎকারু ঋষির পত্নী এবং বাসুকির ভগিনী বনিয়া গেলেন; অনার্য ব্যাধের দেবী চণ্ডী শিবের অর্ধাঙ্গিনী উমাপার্বতীর সঙ্গে এক হইয়া গেলেন; ধর্মঠাকুর কোথাও বিষ্ণুর অবতার, কোথাও বুদ্ধ, কোথাও-বা শিবের অনুরূপ মাহাত্ম্য লাভ করিলেন।

বৌদ্ধযুগের বিনাশের দিনে হিন্দুর সমাজ ও শিক্ষার আদর্শ বহুল প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইলে চাতুর্বর্ণ্যকে বাঁচাইবার জন্য স্মৃতি ও পুরাণের অনুশাসন প্রয়োজন হইয়াছিল। বাঙলাদেশে মধ্যযুগে যেমন রঘুনন্দন নব্যস্মৃতির প্রাচীর তুলিয়া মুসলমান-প্রভাবিত হিন্দুসমাজকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তেমনি বাঙলাদেশের মঙ্গলকাব্যগুলি অনেকটা সংস্কৃত পুরাণের ছাঁচে রচিত হইয়াছিল এবং পুরাণের মতো বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও উপধর্মের সহায়ক হিন্দু-সমাজকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল।[৪] এই জন্য মূলতঃ মঙ্গলকাব্য আদিম

---

[৪] পুরাণের লক্ষণ : সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

পুরাণের লক্ষণ পাঁচটি—সর্গ (ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রজাসৃষ্টি), বংশ (রাজকুল বা ঋষিবংশ), মন্বন্তর, বংশানুচরিত (রাজবংশ ও ঋষিবংশের কার্যক্রম)।

সংস্কার ও গ্রাম্য ব্রত-ছড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে চৈতন্যপ্রভাবে যখন হিন্দুর ধর্ম ও আচার-বিচারের আমূল সংস্কার হইতে লাগিল, তখন আদিম ধরণের মঙ্গলকাব্যেও সংস্কৃত পুরাণাদির পালিশ পড়িল, কিন্তু পুরাণের প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের ঘটনা ও দেব-দেবীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য খুব যে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা মনে হয় না। ধর্মমঙ্গলের উপাসনাপদ্ধতি ও আচার-আচরণ অবশ্য বহুকাল ধরিয়া নিম্নবর্ণের মধ্যেই প্রচারিত হইয়াছিল। একদা ব্রাহ্মণকবি মঙ্গলগান রচনা করিলে সমাজে পতিত হইতেন। কিন্তু মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের মূলে অনার্য সংস্কার থাকিলেও পরবর্তী কালে সমাজের উচ্চবর্ণের কবিগণ এই কাব্য রচনা করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

মঙ্গলকাব্যে দেবলীলা ও নরলীলাই মূল বক্তব্য। স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের কাহিনীগত মিল রক্ষা মঙ্গলকাব্যের, বিশেষতঃ শাক্ত মঙ্গলকাব্যের প্রধান লক্ষণ। কোন দেবতা বা দেবী মর্ত্যে নিজ পূজা ও প্রতিপত্তি প্রচারে উৎসুক হইয়া স্বর্গের কোন দেবকুমার বা নর্তকীকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্যে প্রেরণ করিলেন; তাহারা মর্ত্যমাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল, বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তারপর দেব-দেবীর নির্দেশে, প্রত্যাদেশে বা স্বপ্নাদেশে পূজা প্রচারে সচেষ্ট হইল। কেহ ব্যাধের ঘরে জন্মগ্রহণ করিল, কেহ বা বণিকের ঘরে আবির্ভূত হইল, কিন্তু মর্ত্যকায়া গ্রহণ করিয়া তাহারা স্বর্গের কথা ভুলিয়া গেল। দেব-দেবীরা মর্ত্যে নিজ নিজ পূজা প্রচারের জন্য যে-কোন পন্থা গ্রহণ করিতেন। মঙ্গলকাব্যে মানুষের চরিত্রে তবু কোমলতা, করুণা, চারিত্র-মহত্ত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু দেবচরিত্রগুলির অধিকাংশেই কোন বৃহৎ মহৎ ভাব দূরের কথা, সাধারণ মানবিক গুণেরই অভাব রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকনাট্য 'স্বর্গীয় প্রহসনে' এবং বলেন্দ্রনাথ 'বাংলা সাহিত্যের দেব-দেবী' প্রবন্ধে মঙ্গল-কাব্যের দেব-দেবীদের লইয়া যে কিছু পরিহাস করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক নহে।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে দেবতার পূজা মসৃণভাবে প্রচারিত হইতে পারে নাই। মনসামঙ্গলের গোড়ার দিকে ঈষৎ নিম্নবর্ণের সমাজে দেবী মনসা কিছু প্রভাব প্রকাশ করিয়াই অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বণিকসমাজের নেতা চাঁদ বেণের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে ও প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। সেই বিরোধে তাঁহার দেবমহিমা অত্যন্ত মলিন হইয়া

গিয়াছে, কিন্তু চাঁদসদাগরের মানবচরিত্র ঠিক আদর্শলোকের তুঙ্গশীর্ষে স্থান না পাইলেও আধুনিক যুগের পাঠকেরও বিস্ময় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডেও চণ্ডীপূজার বিরুদ্ধে ধনপতির বিরোধিতা ততটা প্রবল নহে, এবং ধনপতির চরিত্রও চাঁদের মতো স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ও পৌরুষে উজ্জ্বল নহে। মনসার কাহিনীর মধ্যে একটা আদিম ধরণের অনাবৃত বলিষ্ঠতা আছে, যাহা চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে অনুপস্থিত। ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর প্রথম হইতেই দেবমহিমায় ভাস্বর, ভক্ত লাউসেনকে পদে পদে রক্ষা করা, জয়ী করাইয়া গৌরবান্বিত করাতেই তাঁহার আনন্দ; ভক্তের প্রতি দেবতার বাৎসল্যভাব প্রায় সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যেই লক্ষ্য করা যাইবে।

মনসা ও চণ্ডীর উপাসক সম্প্রদায় একদা নিশ্চয় প্রবল হইয়াছিল, এবং সমাজে এই দেবীদের পূজাবিষয়ক অনেক নিয়মরীতি প্রচলিত ছিল; কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যে পূজাকৃত্যের বিস্তারিত বর্ণনা নাই। ধর্মমঙ্গলের কাব্যগত আখ্যান এবং পূজা-উপাসনা বিষয়ক বিচিত্র বিস্তারিত খুঁটিনাটি তথ্যগুলি 'সাংজাত পদ্ধতি' ও 'ধর্মপুরাণে'র আকারে ধর্মপূজকদের মধ্যে কিছুকাল পূর্বেও বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, এখনও তাহা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আমাদের মনে হয়, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যগুলি যখন সাহিত্য হিসাবে রচিত হইতে আরম্ভ করে, তখন চণ্ডী ও মনসা পূজা প্রাচীন 'কাল্ট্' (cult) রূপে আর ততটা প্রবল ছিল না। চৈতন্যের ঈষৎ পূর্বে সাধারণ শিক্ষিত সমাজে চণ্ডী-মনসা-বাশুলী পূজা জনপ্রিয় ছিল বটে, কিন্তু চৈতন্যের প্রভাবের পরে মঙ্গলকাব্যাদি প্রচুর রচিত হইলেও হিন্দুসমাজের উচ্চস্তর হইতে চণ্ডী ও মনসা 'কাল্ট্' হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল; উপরন্তু এই জাতীয় সাহিত্য ও দেবী-পরিকল্পনায় প্রচুর পরিমাণে পুরাণের প্রভাব পড়িয়াছিল। এই জন্য চণ্ডী ও মনসামঙ্গলে ধর্মমঙ্গলের পূজাপ্রকরণের মতো দীর্ঘ বর্ণনা নাই। পরদিকে ধর্মোপাসক সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থলে এখনও আছে এবং অদ্যাপি তাহারা ধর্মঠাকুরের অর্চনার দ্বারা পুরাতন 'কাল্ট্'-এর ধারা কতকটা রক্ষা করিতেছে।

মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে বিরোধের কাহিনী আছে, এবং ভক্তের সাহায্যে দেবীর পূজা প্রচারিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে আর একটি বর্ণনা আছে যাহা ধর্মমঙ্গলে নাই। চণ্ডী ও মনসামঙ্গলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের দীর্ঘ বর্ণনা আছে— যাহার

প্রায় সবটাই কাল্পনিক এবং স্মৃতিরঞ্জিত। এককালে বাঙালী বণিক সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে যাইত, ভারতের উপকূলভাগে তাহাদের বাণিজ্যতরী ছুটিত। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে বাণিজ্য ও বদল-বাণিজ্যের অতিরঞ্জিত বর্ণনার মধ্যে তাহারই ক্ষীণ স্মৃতি রহিয়াছে। অপরদিকে ধর্মমঙ্গলে যুদ্ধবিগ্রহ অলৌকিক ঘটনার বাহুল্যই অধিক। উপরন্তু ধর্মমঙ্গলের আখ্যানভাগে রাঢ়ভূমির স্থানীয় পরিবেশ এবং অতীত ইতিহাসের ক্ষীণ ভগ্নাংশের সন্ধান মিলিবে। আদিম ধরণের মহাকাব্যে (Epic of Growth) এই দুই ধরণের কাহিনী অনুসৃত হইত। কোনটিতে সমুদ্রযাত্রা, দেশদেশান্তরে ভ্রমণ, যুদ্ধ (যেমন—রামায়ণে রাম কর্তৃক লঙ্কা অভিযান এবং অডেসিতে বর্ণিত ইউলিসিসের দশ বর্ষ ধরিয়া সমুদ্র-পরিক্রমা) এবং কোনটিতে বীররসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহ (যেমন ইলিয়াদের ট্রয়যুদ্ধ, মহাভারতের ভ্রাতৃবিরোধ) স্থান পাইত। মঙ্গলকাব্যের কোন কোনটিতে সমুদ্রযাত্রার বিস্তৃত বর্ণনা এবং কোনটিতে নায়কের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী প্রাধান্য পাইয়াছে—যেমন ধর্মমঙ্গল কাব্য।

মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে যেমন পুরাণ ও মহাকাব্যের সাদৃশ্য আছে, তেমনি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার প্রাচীন লোকগাথা 'এড্ডা' (*Edda*) ও স্কল্ডের (*Scald*) সঙ্গেও ইহার সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। প্রাচীনকালে আইসল্যাণ্ডে এড্ডা নামক লোকগাথা গদ্যে এবং পদ্যে রচিত হইয়াছিল। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উপকথা এবং বীরত্ব ও প্রেমের গালগল্প এড্ডায় স্থান পাইয়াছে। দৈত্যদানব, দেবতা ও দেবোপম মানুষ এবং তাহাদের লোমহর্ষক কাহিনী এই লোকসাহিত্যের মূল বক্তব্য। ইহাতে যেমন নারীপ্রেমের বর্ণনা আছে, তেমনি আছে সমুদ্রযাত্রা ও যুদ্ধবিগ্রহের আখ্যান। ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের অদ্ভুত ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে এড্ডা-বর্ণিত সিগুর্ড্-এর বীরত্বকাহিনীর বেশ সাদৃশ্য আছে। অবশ্য এড্ডার আখ্যানগুলিতে নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু আমাদের মঙ্গলকাব্যে দেবমহিমা ও ভক্তকথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে সব সময়ে ধর্মের জয় (poetic justice) দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে —উভয়দেশের জলবায়ু ও চরিত্রাদর্শের মধ্যে এই পার্থক্য নিহিত আছে। উভয় কাব্যের মধ্যে আরও একটা পার্থক্য—এড্ডা মূলতঃ লোকসাহিত্য, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে লোকধর্মের প্রচুর প্রভাব সত্ত্বেও ইহাকে বিশুদ্ধ লোকসাহিত্য বলা যায় না। ইহাতে একটা দীর্ঘকালাশ্রিত ঐতিহ্য, রচনা-

প্রকরণ, কাহিনী-পরিকল্পনায় বিচক্ষণ বিন্যাসপদ্ধতি এবং মানবজীবন সম্বন্ধে একটা আশাবাদী আদর্শের ইঙ্গিত আছে, যাহা ঠিক লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক স্বরূপ ॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ভূরিপরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বস্তুতঃ, রামায়ণ-মহাভারতকে বাদ দিলে এত অধিক সংখ্যায় আর কোন কাব্য রচিত হয় নাই। শিল্পপ্রকরণ ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, মঙ্গলকাব্য কোন শ্রেণীর কাব্য। মধ্যযুগের যাবতীয় কাব্যকবিতা দেবতা, দেবতার অবতার বা অবতারকল্প কোন মহাপুরুষের পুণ্যশীল চরিত্র অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বাঙলাদেশ যেমন নদীমাতৃক, বাংলা সাহিত্যও তেমনি দেবমাতৃক। মঙ্গলসাহিত্যও দেবতার মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য ; তবে সে দেবতা যে উচ্চতর দেবলোকবাসী নহেন তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন দেখা যাক, এই মঙ্গলকাব্যকে আমরা সাহিত্য বিচারে কোন্ শ্রেণী-ভুক্ত করিতে পারি। মঙ্গলকাব্য যে প্রধানতঃ কাহিনীকেন্দ্রিক তাহাতে দ্বিমত নাই ; কাহিনীর সঙ্গে দেবলীলা, ধর্মতত্ত্ব এবং তাবৎ নানাবিধ বর্ণনা মিশ্রিত হইয়া কাব্যগুলি বিপুলায়তন লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ মঙ্গল-কাব্যকে সংস্কৃত পুরাণের শেষ বংশধর বলিতে চাহেন, কেহ-বা ইহাকে মহাকাব্য বলিয়াছেন, কেহ মঙ্গলসাহিত্যকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া ভক্তি করেন, কেহ এই ধরনের সাহিত্য হইতে বাঙলার সমাজমানসের যথার্থ ঐতিহাসিক স্বরূপ সন্ধান করিতে চাহেন। মঙ্গলকাব্য যে একটি মিশ্র শিল্প তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, সংস্কৃত পুরাণের সঙ্গে ইহার বৈশিষ্ট্যগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগাবসানের পর যখন ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত হিন্দুধর্মের পুনর্গঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন স্মৃতি ও পুরাণের অনুশীলনে সমাজ লাভবান হইয়াছিল। বাঙলাদেশে মধ্যযুগে মুসলমান প্রভাবে হিন্দুসমাজের ভিত্তিভূমি দুর্বল হইয়া পড়িলে, একদিকে রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতির প্রভাবে, আর একদিকে চৈতন্যদেবের প্রেম ও ভক্তিধর্মের প্রবাহে হিন্দুসমাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক বাসনা আবার ফিরিয়া

আসিল। কিন্তু তাহারই সঙ্গে সমাজের একটু দূরে এবং পরিবারের অন্তঃপুরে যে সমস্ত লোকধর্মাশ্রয়ী দেবদেবীর পূজা-অর্চনা চলিতেছিল, ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কৃত-প্রভাবিত পৌরাণিক সংস্কৃতির সাহায্যে এই অন্তেবাসীদিগকে জাতে তুলিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবে ও আদর্শে এই সমস্ত ছড়া-ব্রতকথা ও কৃত্যগুলি পুরাণের মতোই হিন্দুর সমাজ-আদর্শকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। পুরাণের সর্গ-প্রতিসর্গ-মন্বন্তর-বংশ-বংশানুচরিতের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের রেখায় রেখায় মিল নির্ণয় সম্ভব নহে।[৫] কিন্তু পুরাণে যেমন দেবমাহাত্ম্য বা রাজবংশের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, মঙ্গলকাব্যের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ ব্যাপার আংশিকভাবে সমাধা হইয়াছে। অবশ্য রাজবংশের স্থলে সাধারণ মানুষের রাজত্ব লাভ (কালকেতু), বণিকসমাজের প্রাধান্য (চাঁদ সদাগর ও ধনপতি) এবং বড় বড় বীরপুরুষের (লাউসেন) কাহিনী মঙ্গলকাব্যে অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। সর্বোপরি সমস্ত পুরাণে একটা বিশেষ দেবতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিকতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য পুরাণের বিচিত্র জটিল কলেবরের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের তুলনা চলিতে পারে না। পুরাণের রীতি ও রচনায় নানা হস্তক্ষেপের ফলে ইহার রচনাগত বিশৃঙ্খলা কেবলই বাড়িয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত পুরাণসাহিত্য বিশ্বকোষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে কিছু অপ্রাসঙ্গিকতা ও বর্ণনার শিথিলতা থাকিলেও ইহা হইতে কাব্যধর্ম ও কাব্যপ্রকরণ কখনও বিনষ্ট হয় নাই। তাই মঙ্গলকাব্যে সংস্কৃত পুরাণের আদর্শ কিঞ্চিৎ ছায়াপাত করিলেও ইহাকে পুরাপুরি পুরাণ বলা যায় না। কবিগণ অবশ্য প্রাচীন পুরাণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া কখনও কখনও মনসামঙ্গলকে পদ্মাপুরাণ এবং ধর্মমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গলের অংশবিশেষকে 'হাকন্দপুরাণ', 'শ্রীধর্মপুরাণ 'শূন্যপুরাণ' বলিয়াছেন। কিন্তু পুরাণের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুব গভীর নহে।

মঙ্গলকাব্যে যথার্থতঃ মহাকাব্যের বীজ নিহিত আছে। প্রত্যেক দেশে উপকথা, ব্রতকথা বা লৌকিক গালগল্পই ক্রমে ক্রমে বহুজনের মিলিত চেষ্টায় মহাকাব্যে পরিণত হয়। মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন ছড়া-পাঁচালী ও ব্রতকথার মধ্য-দিয়া বিশাল কাহিনীকাব্যে পরিণত হইয়াছে, ঠিক তেমনি প্রাচ্য ও

[৫] ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-এর 'পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য' শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্ত্য দেশেও ব্যালাড বা লোকগাথার মধ্য দিয়া আর্ষ মহাকাব্য বা Epic of Growth-এর (যেমন রামায়ণ, মহাভারত, অডিসি, ইলিয়াড) উৎপত্তি হইয়াছে।[৬] কাহিনী, চরিত্র, রচনারীতির গাম্ভীর্য ও মহৎ বিশালতা না থাকিলে মহাকাব্য যথার্থ গৌরব লাভ করিতে পারে না। সর্বোপরি মহাকাব্য জাতি বা সমাজ-মন হইতে জন্মলাভ করে ; ইহা কোন কবির একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি নহে। মঙ্গলকাব্যের দেবপ্রাধান্য বাদ দিলে ইহাতে বিশাল কাহিনী, বিচিত্র চরিত্র, বড বড সংঘর্ষ, দেবদানবের সংঘাত ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। মনসামঙ্গলে কলার মান্দাসে করিয়া বেহুলার লখীন্দরের শবদেহ সহ যাত্রা, চণ্ডীমঙ্গলে কালীদহে কমলে-কামিনী বর্ণনা এবং ধর্মমঙ্গলে মাহুদ্যার সঙ্গে কলিঙ্গা-কানাডার যুদ্ধ নিশ্চয় বিস্ময় উদ্রেক করে। চাঁদসদাগরের বিদ্রোহ এবং পরিশেষে দেবীর পূজা স্বীকার শুধু মহাকাব্য নহে, ট্যাজেডিরও উপাদান হিসাবে নিতান্ত তুচ্ছ হইত না। ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ভূমির চিত্র, যুদ্ধবিগ্রহ, ইতিহাসের সঙ্কেত (পালযুগ ?) এত স্পষ্ট যে, কেহ কেহ ইহাকে রাঢ়ের 'জাতীয় মহাকাব্য' বলিয়া থাকেন। কাজেই মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের বাহ্যিক সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হইবে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে মঙ্গলকাব্যে পুরাপুরি মহাকাব্যের স্বাদ পাওয়া যাইবে না। মহাকাব্যের কাহিনীগত বিশালতা ও জটিলতা, সমাজ-মানসের সঙ্গে নিবিড যোগ, চরিত্র-পরিকল্পনার সুবৃহৎ আদর্শ—সর্বোপরি মহাকাব্যের রস (Epic spirit) ও রচনারীতি মঙ্গলকাব্যের প্রায় কোথাও পাওয়া যাইবে না। পয়ার-লাচাড়ী ছন্দে পাঁচালীর ঢঙে রচিত এই সমস্ত ধর্মীয় আখ্যানগুলিকে মহাকাব্য বলিলে আত্মপ্রসাদ পরিতৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু মহাকাব্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় না।[৭]

লৌকিক এবং পৌরাণিক আদর্শমিশ্রিত লৌকিক দেব-দেবীর মহিমা প্রচারক

[৬] লেখক সম্পাদিত নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'-এর ভূমিকায় মহাকাব্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

[৭] মঙ্গলকাব্যে যে মহৎ শিল্পাদর্শ ও বিরাট কল্পনা কিছুমাত্র সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহা রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে বুঝাইয়াছেন, "কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহার শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়িয়া উঠিতে পারে নাই।"

এবং ভক্তের গৌরববাচক এই মঙ্গলকাব্যগুলি আখ্যানকেন্দ্রিক ধর্মীয় সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার Edda, Saga বা Scald-এর সঙ্গে ইহার খানিকটা সাদৃশ্য আছে। অবশ্য 'সাগা' প্রধানতঃ গদ্যে রচিত হইত এবং স্ক্যান্দিনেভিয়ার এই লোকসাহিত্যে দেবদানবের বর্ণনা থাকিলেও ইহাতে বলিষ্ঠ মানবজীবনের যে কর্মমুখর ও রণসঙ্কুল বিরাট চিত্র আছে, একমাত্র ধর্মমঙ্গলের কিয়দংশ বাদ দিলে অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে সেই বৈশিষ্ট্য বড একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

মঙ্গলকাব্যের শ্রেণী ॥

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে লৌকিক গ্রামীণ সংস্কার, আর্যেতর দেববিশ্বাস এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে সমন্বয় লাভ করিতেছিল। বস্তুতঃ, মঙ্গলকাব্যের মূল অষ্ট্রিক সংস্কার বা আদিম জীবনাদর্শ হইতে জন্ম লাভ করিলেও মধ্যযুগে বাঙলাদেশে পুরাণের প্রভাবের ফলে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পারস্পরিক বিরোধিতা হ্রাস পাইতে লাগিল। তাহা হইলেও মঙ্গলকাব্যে স্পষ্টতঃ দুইটি ধারা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। একটি যথার্থ মঙ্গলকাব্যের ধারা, আর একটি সংস্কৃতায়িত ও পুরাণানুসারী মঙ্গলকাব্যের ধারা। যথার্থ মঙ্গলকাব্য বলিতে আমরা মূল আর্যেতর ভাবধারার সঙ্গে পৌরাণিক সংস্কারের সমন্বয়ী আদর্শে রচিত মঙ্গলসাহিত্যকে নির্দেশ করিতেছি। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ('বিদ্যাসুন্দর')—এগুলি যথার্থ মঙ্গল কাব্যের ধারা। শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, বাশুলীমঙ্গল প্রভৃতি অপ্রধান মঙ্গলকাব্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত। শিবায়ন, ধর্মমঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতিতে পুরুষ দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও মঙ্গলকাব্য স্ত্রীদেবতা-প্রধান। চণ্ডী, মনসা, কালিকা, শীতলা, বাশুলী—সমস্তই শক্তিদেবতা।

অধিকাংশ শাক্ত মঙ্গলকাব্যের প্রথমেই দেখা যায় যে, শিবের পূজা ও প্রভাব দর্শনে ঈর্ষাতুর হইয়া মনসা ও চণ্ডী শিবের সমকক্ষতা করিবার জন্য নিজ নিজ পূজা প্রচারে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারা স্বামী বা পিতার বিরুদ্ধে যাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। এই স্ত্রীদেবতারা শৈব ভক্তকে উৎপীড়িত

করিয়া, ভয় দেখাইয়া শিবের প্রভাব খর্ব করিয়া নিজেরাই আপন আপন মাহাত্ম্য প্রচারের পথ খুঁজিয়াছেন। সাধারণ লোকে ভোলামহেশ্বরের নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত, বৈদান্তিক, নির্বেদ বড একটা পছন্দ করে না—তাহারা শক্তিদেবীর অতি প্রচণ্ড রোষ ও অপরিমিত কৃপার মধ্যে পরমনির্ভরতা খুঁজিয়া বেড়ায়।[৮] তাহারা দেবীর কাছে ঐহিক ঋদ্ধি, অসীম প্রতাপ, অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি প্রার্থনা করিত। মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষের সময়ে বা পাঠানযুগে নানা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক দুর্দৈব চলিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হাবসী কুশাসনে এবং ষোডশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুঘল-পাঠানের প্রায় পঁচিশ বৎসর ব্যাপী ভয়াবহ সংঘর্ষের ফলে বাঙালীর ঘর-গৃহস্থালী ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সমাজের বন্ধন ও বিন্যাসেও ভাঙন ধরিয়াছিল। আজ যে প্রকাণ্ড ভূস্বামী ও প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি, কাল সে সুলতানের রোষে পডিয়া সর্বস্বান্ত হইতেছে। কত ডিহিদার মামুদ সরিফ যে নিরীহ বাঙালীর উপর অত্যাচার করিয়াছে কে তাহার হিসাব রাখে? এই যে সমাজের উপর-নীচ ঠিক থাকিতেছে না, চারিদিকে একটা তরল চঞ্চল অবস্থা মানুষের মনকে নিশ্চেষ্ট করিয়া তুলিতেছে—এইরূপ মানসিক ও সামাজিক অবস্থায় সাধারণে এমন দেবতা বা দেবীর পূজা করিতে চাহে যাঁহার প্রসাদ যেমন আকস্মিক অপরিমিত, রোষও তেমনি হঠাৎ আসিয়া হানা দেয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলার দিনে লৌকিক মঙ্গলকাব্য পরিকল্পনায় মার্জিত রুচি ও উচ্চতর ভাবকল্পনা বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। অবশ্য কেহ কেহ মঙ্গলকাব্যের দুর্বল ও বিবর্ণ পরিকল্পনাকে এই বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন যে, মঙ্গলকাব্যে মর্ত্যের আলো আঁধার-ভালমন্দ দিয়া গঠিত সাধারণ মানুষগুলি অঙ্কিত হইয়াছে এবং সার্থকভাবে অঙ্কিত হইয়াছে—দেবতাদের চরিত্র মলিন হইলই বা! আমাদের মনে হয় এই সমস্ত মঙ্গলকাব্য যে সমাজের জন্য রচিত হইয়াছিল, সে সমাজের লোকে মহত্তর উচ্চ আদর্শের বড একটা ধার ধারিত না। বহুদিন ধরিয়া সামাজিক জাড্যের বশে তাহাদের মন এমন বিকল হইয়া পডিয়াছিল যে, চণ্ডী-মনসার খামখেয়ালিপনা ও নীচতা এবং শিবের কামলোলুপতাকে তাহারা দেবতাদের লীলাখেলা বলিয়া প্রসন্ন উদাসীনতার সঙ্গে গ্রহণ করিত। তাই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর চরিত্রের অধিকাংশ স্থলে সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। মানবচরিত্রেও

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' ("বঙ্গভাষা ও সাহিত্য") দ্রষ্টব্য।

যে সর্বদা সঙ্গতি বজায় থাকিয়াছে তাহা নহে। চাঁদের তীব্র মনসাবিরোধিতা এবং পরে মহানন্দে দেবীর দেউলদেহারা নির্মাণ করিয়া দেবীর পূজা-অর্চনার কাহিনীর মধ্যে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিবায়নে শিবের তরুণী-ভার্যা-বিড়ম্বিত জীবন এবং কোচনারীর প্রতি আসক্তি কবিদের কল্পনাকে ধূলিধূসর করিয়া দিয়াছে। আসল কথা মঙ্গলকাব্যের কবিগণ উচ্চতর পৌরাণিক আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হইয়াও গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই জন্য যদি কোন আধুনিক সমালোচক মাইকেল মধুসূদনের প্রশংসা করিতে গিয়া মনসামঙ্গল ও শিবায়নকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন, তাহা হইলে আপত্তি করা যাইবে না।[৯]

সে যুগে আর একপ্রকার মঙ্গলকাব্য রচিত হইত যাহা প্রধানতঃ সংস্কৃত পুরাণকেই আশ্রয় করিয়াছিল। সংস্কৃত পুরাণ কোষগ্রন্থ ধরণের গ্রন্থ হইলেও ইহাতে নানা দেব-দেবীর লীলা ও ঋষিবংশ-রাজবংশের বিস্তারিত পরিচয় আছে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, বৌদ্ধযুগ শিথিল হইয়া পড়িলে বিধ্বস্ত হিন্দুর সমাজ-জীবন, নৈতিক আদর্শ, দেববাদ ও স্মার্ত সংস্কৃতিকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য রাজাদের সক্রিয় অনুপ্রেরণা ও নির্দেশে ব্রাহ্মণপুরোহিত সম্প্রদায় নানা কাহিনী ফাঁদিয়া পুরাণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ বেদব্যাসের নামে চলিলেও অনেক পুরাণ বিশেষ প্রাচীন নহে, কোন কোন পুরাণে প্রচুর প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে—তখন ভারতীয় হিন্দুসমাজ ও জীবনে অবক্ষয়ের যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সেই ভাঙনের চিহ্ন সংস্কৃত পুরাণের নানা স্থানে লক্ষ্য করা যাইবে। কোন কোন পুরাণে নির্জলা কামায়ন ধর্মের গেরুয়া ভেক ধারণ করিয়াছে, কোথাও কোথাও পুরাণের দেবতাকে 'amorous glutton' রূপেই অঙ্কিত করা হইয়াছে। নর, নরোত্তম ও নারায়ণকে নমস্কার করিয়া এবং দেবী সরস্বতীর জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া[১০]

[৯] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক যুগের মধুসূদনের সঙ্গে পূর্বতন মনসামঙ্গল কাব্যধারা তুলনা করিয়া মাইকেলের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কবির গ্রাম্য মনোভাবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন "His imagination refused to stagnate in the aboriginal backwaters where the mightiest of gods acts like an amorous glutton while mere men for ever appease the presiding deity of snakes..' *Quest*, May 1961 ('Tagore as a Lyric Poet' by Sudhindranath Datta.)

[১০] নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

পুরাণকার গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হইলেও বহু স্থলে অতি কুরুচিপূর্ণ রিরংসার কথা বলিতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই। সে যাহা হোক, হিন্দুর চাতুর্বর্ণ্য ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও পরিপোষণের জন্য এই পুরাণগুলি যে বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল এবং পরবর্তী পৌরাণিক ও স্মার্ত হিন্দুসমাজকে বহু স্থলে বর্মের মতো রক্ষা করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যখন উচ্চ বর্ণ ও মধ্য বর্ণের সমাজে চৈতন্য-প্রভাব সঞ্চারিত হইতে লাগিল, তাহায় কিছু পূর্ব হইতে এই সমাজে স্মার্ত ও পৌরাণিক আদর্শ প্রবলভাবে অনুশীলিত হইতেছিল। মুসলমানের ধর্মান্তরীকরণের নীতি এবং উচ্চাভিলাষী হিন্দুদের আচারে-আচরণে ইসলামী আদর্শ গ্রহণে সমাজ-পতিগণ নিশ্চয় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাই চৈতন্যের পূর্ব হইতে পৌরাণিক ভাবাদর্শ আবার উচ্চতর সমাজে প্রচার লাভ করিতেছিল। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কলেবর নির্মাণ করিয়াছে। তাই সমাজে যখন অপৌরাণিক মঙ্গলকাব্য ভক্তিভরে রচিত ও পঠিত হইতেছিল, তখন পুরাণ-সংস্কৃতিতে আস্থাবান লেখক ও পাঠকসমাজ হয়তো বিশুদ্ধ পুরাণকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন। তাই সংস্কৃত পুরাণ অবলম্বনে (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত ইত্যাদি) দেবী-মাহাত্ম্য, দেবী মঙ্গল, চণ্ডিকা বিজয়, গৌরী মঙ্গল, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী, গঙ্গা মঙ্গল রচিত হইয়াছিল।[১১] অবশ্য ইহাতে কিছু কিছু গল্পাংশ থাকিলেও আদর্শ, নীতি ও তত্ত্বের দিক দিয়া এই কাব্যগুলি পুরাপুরি পুরাণকেই অনুসরণ করিয়াছে, কোন কোন স্থলে ইহাকে পুরাণের অনুবাদ বলিয়া মনে হয়। তবে লৌকিক মঙ্গলকাব্যের তুলনায় পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য বিশেষ জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। জনসাধারণ এবং মধ্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় মনসা-চণ্ডীর কথাই শুনিতে চাহিত। যাহাতে বিরোধ আছে, দেবীর প্রচণ্ড ক্রোধ ও অহেতুক কৃপাকরুণা বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে নিষ্কিঞ্চন ব্যাধও সাতঘড়া ধন পাইতে পারে, নিমজ্জিত সপ্তডিঙা ভাসিয়া ওঠে, মৃত সন্তানগণ পুনর্জীবন লাভ করে, যাহার আগাগোড়া ঐহিক ঋদ্ধির স্বর্ণাবরণ এবং প্রবল শক্তির রক্তাম্বরে আবৃত —সাধারণে তো তাহাকে সসম্মানে শিরোধার্য করিবেই। মনসা ও চণ্ডী-মঙ্গলের এই জন্যই জনচিত্তে এত আদর হইয়াছিল।

[১১] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৮১, ৪৬৯

মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' নামটি এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, শাক্তবিরোধী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও নিজ নিজ সম্প্রদায়গত কাব্য ও মহাজন জীবনীতে মঙ্গল-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।[১২] চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এগুলিকে আদৌ মঙ্গলকাব্যের ধারার মধ্যে গণনা করা যায় না। রাধাকৃষ্ণের লীলা এবং বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনের আদর্শ প্রেম, ভক্তি ও শুদ্ধ যতি-জীবন ইহার মূল বক্তব্য। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনার ছায়াপাত হইয়াছে,—বল-প্রতাপ-প্রচণ্ডতা ও শক্তির দম্ভ এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা বৈষ্ণব মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ নহে। অবশ্য লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গলে' মঙ্গলকাব্যের ধারা কথঞ্চিৎ অনুসৃত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতেও মঙ্গল শব্দটি আধুনিক কবিগণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিহারী-লালের 'সারদামঙ্গল' এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মাদকমঙ্গল' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—অবশ্য আধুনিক জীবন, কবি-প্রতীতি ও কাব্যকলার সঙ্গে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের কোন দিক দিয়া কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্যও নাই।

———

ভট্টাচার্য, ঐ, পৃঃ ৮১

তৃতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্য

সর্পপূজা ও মনসা ॥

মনসামঙ্গল কাব্য বা পদ্মাপুরাণ[১] বাঙলা, আসাম ও বিহারের কোন কোন অঞ্চলে সুপ্রচলিত। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার কথা ও কাহিনী এই অঞ্চলে তো বটেই, সারা ভারতবর্ষেই প্রাচীনকালে যেমন প্রচলিত ছিল, তেমনি একালের লোকসমাজেও অজ্ঞাত নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিলে প্রাচীন যুগে ও আদিম মানবসমাজে সর্প-উপাসনার সন্ধান পাওয়া যাইবে। প্রাচীন যুগে সর্প-ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকে মানুষে ভয় করিত এবং আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার পূজা-অর্চনা করিত, কোথাও-বা সেই জীবজন্তুকে 'জীবক' (Totem) রূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের সেই বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিত। প্রাচীন ভারতের আর্যেতর নাগজাতি নাগপূজক ও সর্প-'জীবকে' বিশ্বাসী কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেহ কেহ বলেন, ব্যাবিলোনিয়া হইতে ভারতবর্ষে সর্প পূজার রীতি প্রচার লাভ করে। এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত নহে। ভারতবর্ষের জলবায়ুর গুণে এদেশে সর্পের সংখ্যাও যেমন গণনাতীত, তেমনি বিষধর সর্পের সংখ্যাও কিছু অল্প নহে। এরূপ অবস্থায় প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ঈষৎ অনগ্রসর সমাজে যে সর্পপূজা প্রচলিত থাকিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ? ভারতের অষ্ট্রিক গোষ্ঠী অপেক্ষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে সর্পপূজার অধিকতর প্রচলন দেখা যায়। আসামের কোন কোন আদিবাসীর মধ্যে সর্পপূজা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত আর্যেতর সংস্কার আর্যজাতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল; তাঁহারা অনার্যদের উপর শুধু উৎপাত করেন নাই, তাহাদের অনেক সংস্কার ও আচার-বিচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই সর্পপূজাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রত্নদিনর্শন হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নাগপূজা উত্তর-ভারতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যে সমস্ত

[১] পূর্ববঙ্গে মনসা পদ্মারূপে এবং মনসামঙ্গল কাব্য 'পদ্মাপুরাণ' নামে অধিকতর পরিচিত।

সেনানী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ দেশে ফিরিয়া গিয়া যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ ভারতে সর্পপূজার বর্ণনা আছে।[২] ঋগ্বেদে যে 'অহির্বুধ্ন্য'-এর উল্লেখ আছে, তাহা সর্প ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যজুর্বেদে সর্পের শ্রদ্ধাপূর্ণ উল্লেখ আছে। উত্তর বৈদিকযুগে সর্পবিদ্যা অনুশীলন অবশ্য জ্ঞাতব্য বিদ্যায় পরিণত হইয়াছিল। 'অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে' যে সর্পদেবতার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই পরবর্তী কালে নাগপঞ্চমী বলিয়া হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতে নাগজাতি, কদ্রুর গর্ভে বাসুকি প্রভৃতির জন্মগ্রহণ-কাহিনী, জরৎকারু ঋষির সঙ্গে বাসুকি-ভগিনীর বিবাহ, তাঁহাদের সন্তান আস্তিক কর্তৃক জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে সর্পকুলকে রক্ষা প্রভৃতির বর্ণনা আছে। সর্পপূজা বা সর্পজীবকে (Totem) বিশ্বাসী নাগজাতির উল্লেখ প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব ও গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং এই সর্পপূজা অদ্যাপি সমাজের নিম্নস্তরে ও উচ্চস্তরে সমভাবে বিদ্যমান।

এবার সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা জানিয়া লওয়া যাক। প্রাচীন গ্রীসে সর্পভূষণা 'মেডুসা' দানবীর বর্ণনা আছে।[৩] মনসা নামটি ঋগ্বেদে আছে (ঋগ্বেদ, ৫।৪৪), বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী 'মনসাদেবী'র উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'বিনয়বস্তু'-তে 'মহামায়ূরী বিদ্যা' সূত্রে "অমলে বিমলে নির্মলে মনসে" বলিয়া মনসাদেবীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। 'সাধন-মালা'য় সর্পের দেবী সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলজনক উপাদান রহিয়াছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে মনসা ও তদনুকল্প সর্পাধিষ্ঠাত্রীদেবীর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে 'কুরুকুল্লা' ও 'জাঙ্গুলী' দেবীর বর্ণনায়। দেখা যাইতেছে, কুরুকুল্লা দেবী সর্পের ও সর্পবিষের নিয়ন্ত্রী। 'সাধনমালা'য় জাঙ্গুলীতারা দেবীর বিস্তৃত পরিচয় আছে।[৪] ভারতীয় বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে সর্পের দেবী জাঙ্গুলী উপাসনার উল্লেখ দেখা যাইতেছে। সে যুগে সর্পের চিকিৎসককে 'জাঙ্গুলিক' বলিত।[৫] অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত

---

[২] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

[৩] গ্রীক উপাখ্যানে মেডুসা নাম্নী যে দানবীর উল্লেখ আছে, তাহার কেশগুচ্ছে সর্প থাকিত, মেখলায়ও সর্প থাকিত।

[৪] বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (ভট্টাচার্য)

[৫] ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত *Vipradas's Manasa-Vijaya*, Introduction, p xxxiv,

নানাসূত্রে সর্পের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বা বিষনাশিনী দেবীর কোথাও স্পষ্ট, কোথাও-বা অস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বাঙলাদেশের মনসামঙ্গলে মনসাকে নানা নামে (পদ্মাবতী, কেতকা, বিষহরী, জরৎকারু) অভিহিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে 'জাগুলি' নামটাও পাওয়া যায়। 'সাধন-মালা'র 'জাঙ্গুলী' যে বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যে জাগুলিতে পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন সংস্কৃতে কদাচিৎ মনসাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের পুরাণে অভিধানে মনসার উল্লেখ ও ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের কৃত্রিম চেষ্টা লক্ষণীয়। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে রচিত অথবা প্রাচীন পুরাণে প্রক্ষিপ্ত অর্বাচীন অংশে মনসা সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। কশ্যপ ঋষির মন হইতে সৃষ্ট—এই জন্য 'মনসা' নাম হইয়াছে। মধ্যযুগে বাঙলার বাহিরে মনসাদেবীর মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব-পঞ্জাবে মনসাদেবীর দুইটি মন্দির আছে, হরিদ্বারের কাছেও মনসাদেবীর ক্ষুদ্র মন্দির এখনও আছে। আদিবাসীদের মধ্যেও সর্পের দেবী মনসার নাম অপরিচিত নহে। রাঁচির ওরাও জাতিরা এখনও মনসামন্দিরে মুরগী বলি দিয়া থাকে। কুর্মী, হো প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যেও মনসা পূজার রীতি প্রচলিত আছে। দক্ষিণ-ভারতে নাগম্মা, মুদামা, মঞ্চাম্মা প্রভৃতি সর্পদেবীর পূজা এখনও চলে।[৬] পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসা নামের উল্লেখ এবং কোন কোনটিতে বিস্তারিত পরিচয় আছে। এই পুরাণগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে বলিয়াই মনে হয়।

বাঙলাদেশ হইতে এ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রাচীন মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কিছু কিছু মনসার মূর্তিও আছে। এই মূর্তিগুলি দশম-একাদশ শতাব্দীর হইতে পারে।* তাই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী হইতে বাঙলাদেশে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা শিল্পে ও অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণে স্বীকৃতি লাভ করে এবং চৈতন্যদেবের সময়ে বাঙলার শিক্ষিত

[৬] কেহ কেহ মনে করেন যে, 'মঞ্চাম্মা' হইতে মনসা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু শব্দ দুইটির বর্ণসাদৃশ্য ছাড়িয়া দিলে উহাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই মনে হয়। এ বিষয়ে ডঃ ভট্টাচার্যের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সং, পৃঃ ১৮৭ দ্রষ্টব্য।

* চিত্র দ্রষ্টব্য।

সমাজেও বিষহরীর পূজা অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল।[৭] ইহার কিছু পূর্ব হইতে মনসাদেবীর পূজক বা সেবকগণ সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তখন হয়তো সমাজে শৈব মতাবলম্বীর সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মনসাপূজকগণ সমাজে প্রাধান্য লাভ করিল। সেই কথাই মনসামঙ্গল কাব্য হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

মনসামঙ্গলের কাহিনী ॥

সামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে এমন একটা মানবীয় রসের প্রাধান্য আছে যে, বাঙলাদেশে রামায়ণ কাহিনীর মতো ইহার ঘটনা ও চরিত্র প্রায় কাহারও অজানা নহে। ইহার কাহিনীতে ব্রতকথা, ব্যালাড ও মহাকাব্যের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ব্রতকথার সরল-ঋজু কাহিনী, ব্যালাডের শিথিল ঘটনাবিন্যাস ও মহাকাব্যের বিশালতা এই কাব্যের কাহিনীকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়াছে এবং সেই জন্যই শুধু বাঙলাদেশে নহে, বিহার হইতে আসাম পর্যন্ত—সমস্ত অঞ্চলেই মনসা-চাঁদো-লখীন্দর-বেহুলার কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ এই কাহিনীর পশ্চাদপটে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করিয়াছেন। এই জাতীয় ব্যালাড বা বিশাল কাহিনীর অন্তরালে কোন একটা বাস্তবঘটনার কিছু প্রভাব থাকিতে পারে বটে, কিন্তু চাঁদসদাগরের কাহিনীর স্থান, নদনদী, গ্রাম-জনপদের নাম, ভাগলপুর হইতে আরম্ভ করিয়া গোটা বাঙলাদেশে ও আসামে এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে, একদা ইহার কোন একটা বাস্তব লৌকিক ও ঐতিহাসিক অস্তিত্ব থাকিলেও এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এদেশে বহুগ্রামেই নেতা ধোপানীর পাট, চাঁদের ঘাট, চাঁদের বাণিজ্যপথের নানা নিদর্শন ছড়াইয়া আছে; কাজেই কাহিনীর ঐতিহাসিক অংশ বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। তবে কাহিনীটির উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার অঞ্চলে হওয়াই স্বাভাবিক।[৮] চাঁদের বাণিজ্যপথের মধ্যে নানা বৈষম্য থাকিলেও ভৌগোলিক বর্ণনায় মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষের প্রভাব রহিয়াছে। মনসামঙ্গলের প্রধান কবিগণের মধ্যে অনেকেই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী; বিস্ময়ের বিষয়,

[৭] চৈতন্য ভাগবতের "দম্ভ করি বিষহরি পুজে কোন জন" স্মরণীয়।

[৮] বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (ডঃ ভট্টাচার্য)

ইঁহারা যখন চাঁদের বাণিজ্যের বর্ণনা দিয়াছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-জনপদেরই অধিক উল্লেখ করিয়াছেন (যদিও তাহাতে নানা ভুলভ্রান্তি আছে)। বিহারেও[৯] বেহুলার ব্রতকথা, গল্পকাহিনী ও মনসাপূজার বিশেষ প্রচলন আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মনসামঙ্গলের চম্পকনগর বোধহয় ভাগলপুরের নিকটবর্তী অঞ্চল। অবশ্য সেযুগের কবিদের ভৌগোলিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল; কেহ নিজের গ্রামের বাহিরে যাইবার বড় একটা প্রয়োজন বোধ করিতেন না। সুতরাং লোকমুখে তাঁহারা যে সমস্ত গ্রাম-জনপদ-নগর-নগরীর গল্প শুনিয়াছিলেন, তাহাকেই কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাই মনসামঙ্গলের কাহিনীর পশ্চাতে এখন আর কোন বাস্তব ইতিহাস বা ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাঙলাদেশের নানা অঞ্চলে বহু মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কাব্যগুলি 'মনসামঙ্গল' এবং পূর্ববঙ্গে প্রায়শঃই 'পদ্মাপুরাণ' নামে পরিচিত। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় মঙ্গলকাব্যের জাতিকুল বিচার করিয়া অঞ্চল ভেদে ইহার চারিটি রূপ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

(ক) রাঢ়ের মনসামঙ্গল—বিষ্ণুপাল, কেতকাদাস ক্ষমানন্দ, সীতারামদাস, রসিক মিশ্র ও বাণেশ্বর রায়।

(খ) পূর্ববঙ্গের পদ্মাপুরাণ—নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, বংশীদাস, ষষ্ঠীবর।

(গ) উত্তরবঙ্গ ও কামতা-কামরূপের মনসামঙ্গল কাব্য—তন্ত্রবিভূতি, জগৎজীবন ঘোষাল, মনকর, দুর্গাবর[১০] ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। ইঁহাদের মধ্যে জগৎজীবন, মনকর ও দুর্গাবর কামরূপের অধিবাসী, তাঁহাদের কাব্যে আসামী ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়।

---

[৯] কবি বিদ্যাপতির নামে মনসাপূজা ও বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী-সংক্রান্ত সংস্কৃতে লিখিত 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী' নামক একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, একদা উত্তরবিহারেও মনসামঙ্গলের প্রচুর জনপ্রিয়তা ছিল। তা না হইলে স্মার্ত বিদ্যাপতি এই পুস্তিকা লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। এবিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বসু লিখিত *New India Antiquary* (Vol. VII)-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[১০] ডঃ সুকুমার সেন মনকর ও দুর্গাবর কবিদ্বয়কে তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ) আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা আসামী ভাষার কবি, আসাম হইতেই ইঁহাদের কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং উত্তরবঙ্গের কবিসমাজের মধ্যে ইঁহাদের স্থান হওয়া কঠিন এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতেও ইঁহাদিগকে বাদ দেওয়াই কর্তব্য।

(ঘ) বিহারী মনসামঙ্গল—বিহারের কোন কোন অঞ্চলে ব্রত-ছড়ার আকারে এ কাহিনী প্রচলিত আছে, কিন্তু কোন কবির নাম পাওয়া যায় নাই। উত্তর-বঙ্গের মনসামঙ্গলের সঙ্গে ইহার অধিকতর সাদৃশ্য আছে।[১১]

এই চারি অঞ্চলের মনসামঙ্গলের কাহিনীতে নানা বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও ঘটনা, আদর্শ ও চরিত্রের দিক দিয়া মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। বলিতে কি একই কবির বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে অনেক পাঠ-বৈষম্য, নূতন পালা এবং একাধিক ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেরই একটা মজ্জাগত ব্যাধি। যে যুগে সাহিত্য ধর্মীয় ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল, সে যুগে পাণ্ডুলিপির বিশুদ্ধির দিকে বড় কাহারও দৃষ্টি পড়িবার কথা নহে। অর্ধ-শিক্ষিত গায়েনগণ অনেক সময় ভাষা, ঘটনা ও পালা অদল-বদল করিয়া দিত। তবু মনসামঙ্গলের নানা পুঁথির মধ্যে কাহিনীগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

মনসামঙ্গলের চাঁদের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব-কাহিনী বাঙলাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং কাব্যটির মধ্যে এই দুইটি অংশই অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। কাহিনীটির প্রথমাংশ দেব খণ্ড। এই খণ্ডে মনসার জন্ম হইতে মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারের জন্য অবতরণ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশের আখ্যান কিয়দংশে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, কিছুটা-বা পুরাণ ও মহাকাব্যের গল্পের দ্বারা প্রভাবিত। কাহিনীর সূচী :

মহাদেবের মানস-কন্যা মনসার জন্ম, মহাদেব কর্তৃক তাঁহাকে লুকাইয়া রাখা, চণ্ডীর ক্রোধ, মনসা ও চণ্ডীর কলহ, চণ্ডীকর্তৃক মনসার একচক্ষু কানা (এইজন্য তাঁহাকে চাঁদ সদাগর 'চ্যাংমুড়ী কানী' বলিয়া গালি দিয়াছেন[১২]) মনসার কোপদৃষ্টিতে চণ্ডীর,

---

[১১] বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত *Vipradas's Manasa-Vijaya* (Introduction, pp. IX to XXIV) দ্রষ্টব্য।

[১২] 'চ্যাংমুড়ী কানী' শব্দটি লইয়া কেহ কেহ গোলে পড়িয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে যাঁহারা মনসার ভাসান উপলক্ষে বেহুলার গান গাহিয়া থাকেন, তাঁহারা চ্যাংমুড়ী অর্থে চ্যাং মাছের মতো মুড়া (মুণ্ড) যাহার, অর্থাৎ 'বৃহন্মুণ্ড'—এই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। চাঁদ ক্রুদ্ধ হইয়া মনসাকে 'চ্যাংমুড়ী' ও 'কানী' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। কেহ কেহ কর্ণিকা নাম্নী অপ্সরার নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। 'চ্যাংমুড়ী' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া

মূর্চ্ছা, পরে মনসার দ্বারা চেতনা লাভ, মনসার বিবাহ, স্বামীর সঙ্গে বিবাদ, সমুদ্রমন্থনে বিষপানে মহাদেব অচৈতন্য,পরে কন্যা মনসার দ্বারা চৈতন্যলাভ, গৌরীর প্রতিকূলতায় কৈলাস ত্যাগ করিয়া পদ্মাবতীর (মনসা) জয়ন্তী নগরীতে পুরী নির্মাণ। এই পর্যন্ত হর-দুর্গা-মনসার কৈলাসের কাহিনী। দেবলীলা এইখানেই সমাপ্ত। তাহার পরে মনসার পূজা গ্রহণের চেষ্টা। প্রথমে রাখাল, তারপর হাসান-হুসেনের বিরোধিতা ও বিরোধিতা হ্রাস, চাঁদ সদাগরের উদ্যান নষ্ট, ধন্বন্তরী বধ, চাঁদের বিরোধিতার ফলে তাহার ছয় পুত্রের প্রাণবিনাশ, চাঁদের বাণিজ্যে যাত্রা, চৌদ্দ ডিঙা নিমজ্জন, লখীন্দরের জন্ম, চাঁদের দেশে প্রত্যাবর্তন, লখীন্দর-বেহুলার বিবাহ, লোহার বাসরে কালনাগের দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু, কলার ভেলায় লখীন্দরের মৃতদেহের সঙ্গে বেহুলার স্বামীকে জিয়াইবার জন্য যাত্রা। এই পর্যন্ত কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ।

তৃতীয় অংশে বেহুলার নানা প্রলোভন দুঃখকষ্ট তুচ্ছ করিয়া স্বর্গে উপস্থিতি, নৃত্যগীতে মহাদেবের প্রীতি এবং মহাদেব ও দেবতাদের অনুরোধে মনসার লখীন্দরকে বাঁচাইয়া দেওয়া, বেহুলার ছয় ভাসুরের জীবনলাভ, চাঁদের নিমজ্জিত নৌকালাভের আশা। চাঁদ মনসার পূজা করিবেন—এই প্রতিজ্ঞার পর তবে মনসা অনুকূল হইলেন।

চতুর্থ অংশ উপসংহার। বেহুলা-লখীন্দরের ডোমের ছদ্মবেশে পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্তন, পরে মিলন। চাঁদ প্রথমে কিছুতেই

তাঁহারা চ্যাঙাড়ি, চ্যাংদোলা প্রভৃতি হইতে 'চ্যাংমুড়ী'র 'চ্যাং', 'মুড়ী' শব্দকে মোড়া অর্থাৎ ঢাকা দেওয়া অর্থে এবং 'কানি' অর্থে 'পুরাতন বস্ত্রখণ্ড' বুঝিয়াছেন। অর্থাৎ এই মতে 'চ্যাংমুড়ী কানী'র অর্থ—মড়া লইবার সময় বাঁশের দণ্ড ঢাকিবার পুরাতন হ্যাকড়া বা পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড। আবার 'চ্যাং' চ্যাংড়া ([illegible] প্রাচীন বাংলা[illegible]) এবং 'মুড়'কে (মুণ্ড) ধ্বংস করা, নষ্ট করা অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহা হইলে উহার [illegible] অর্থ হইবে অল্পবয়স্কদের নষ্টকারী। তবে এ সমস্ত জল্পনা ভাষাতাত্ত্বিক ভোজবাজি মাত্র। 'চ্যাংমুড়ী'কে বৃহন্মুণ্ড অর্থে গ্রহণ করাই উচিত। মনসার ভাসানে সচরাচর এই অর্থই বলবৎ আছে।

মনসা পূজা করিতে চাহেন নাই। কিন্তু সোমাই পণ্ডিত, সনকা, বেহুলা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে বামহস্তে মনসাকে পুষ্প দিয়া (সমস্ত মনসামঙ্গলে বামহস্তের কথা নাই) পূজা করিলেন। মনসার পূজা প্রচারিত হইল, মঠ-মন্দির দেউল-দেহারা নির্মিত হইল। বেহুলা-লখীন্দর স্বর্গের উষা-অনিরুদ্ধ; মর্ত্যলোকে দেবীর পূজা প্রচারের জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবীর অভীষ্ট সিদ্ধির পর তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে গেলেন। সমস্ত মনসামঙ্গলে কাহিনীটি প্রায় এইভাবে বিবৃত হইয়াছে—যদিও বহুস্থানে নূতন পালা, বর্ণনা, ঘটনা ও চরিত্র সংযোজিত হইয়াছে।)

বাঙলায় প্রাপ্ত মনসামঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে বিহারে হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত লৌকিক বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীর অনেকস্থলে বিশেষ সাদৃশ্য আছে।[১৩] খুঁটিনাটি ঘটনা ও নামধামে কিছু নূতনত্ব থাকিলেও পশ্চিম-বঙ্গের কাহিনী যে বিহারের কাহিনীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য কে কাহাকে অনুসরণ করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে নির্ধারণ করা দুরূহ। (দক্ষিণ-ভারতের লোকসাহিত্যে মনসামঙ্গলের অনুরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত আছে—অম্মবরু নাম্নী এক গ্রাম্যদেবীর গল্প।[১৪]) অম্মবরু অনেকটা মনসার মতো; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাঁহার সন্তান। সন্তানগণ মাতার পূজা প্রচার না করিয়া নিজেদের পূজা প্রচারে অধিকতর মনোযোগী হইলে দেবী তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলিলেন, পরে আবার বাঁচাইয়া দিলেন। শিবের সঙ্গে অম্মবরুর বিরোধ-বর্ণনাই এই কাহিনীটির মূল বৈশিষ্ট্য। যাহা

১৩ মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিনী' নামক একখানি মনসাপূজা-সংক্রান্ত সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় আছে। পুঁথির পুষ্পিকা ও ভণিতা হইতে মনে হয় কবি ও স্মার্ত বিদ্যাপতিই ইহার রচনাকার। পুঁথিটির প্রাপ্তিস্থান উত্তর-বঙ্গ। মিথিলায় বিদ্যাপতির নানা স্মৃতিগ্রন্থ পাওয়া গেলেও এই পুঁথিটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। [illegible] বিদ্যাপতি রচনা হইলে, একদা মিথিলার স্মার্ত সমাজেও যে মনসাপূজা প্রচলিত ছিল [illegible] প্রমাণ পাওয়া যাইবে। নিউ ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টি-কোয়ারির ৭ম খণ্ডে প্রকাশিত শ্রীগণেশচন্দ্র বসুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৪ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

হোক এই কাহিনীতেও প্রচ্ছন্নভাবে মনসামঙ্গলের ঘটনার ছায়াপাত হইয়াছে। এইরূপ সাদৃশ্যের পশ্চাতে সব সময়ে যে প্রভাব থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসাহিত্যের মধ্যে নানারূপ সাদৃশ্য আছে। দেশভেদ হইলেও আদিম মানবজীবন ও সভ্যতার গড়নটি প্রায় সর্বত্র একই প্রকার। মানুষ যত সভ্য হইয়াছে, চারিদিকে কৃত্রিমতার বেড়া উঠিয়াছে, ততই একে অপরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তেমনি আধুনিক সাহিত্যের যুগে এক দেশের সাহিত্যের সঙ্গে অপর দেশের সাহিত্যের রীতিমতো ভেদ ঘটিয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন যুগে বিভিন্ন দেশের আদিম ধরণের লোকসাহিত্যের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং দক্ষিণ-ভারতের অম্মবরুর কাহিনী ও বাঙলার মনসার কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও প্রত্যক্ষ প্রভাব কল্পনা করিবার কারণ নাই। অথবা এমনও হইতে পারে যে, সর্পের দেবীর কাহিনী ও পূজা-প্রচারের বর্ণনা একদা সারা ভারতে লোকসাহিত্যেও বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

মনসামঙ্গলের কবি

চৈতন্যযুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তিকালের মধ্যে মনসামঙ্গলের যে কয়জন কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কানা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই ও নারায়ণদেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গাদাস সেন বোধহয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১৫] দ্বিজ বংশীদাসের গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে যে সন-তারিখ বাচক পয়ার আছে, তাহা হইতে ১৪৯৭ শক (১৫৭৫ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যায়। অবশ্য এ তারিখ নির্ভরযোগ্য কিনা তাহাতে ঘোরতর সংশয় আছে। উপরন্তু বংশীদাসের ভাষায় এমন একটা মার্জিত ভাব আছে যে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন—কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন। আমরা সেই আদর্শ অনুসারে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বংশীদাসের কথা আলোচনা করিব। বর্তমান প্রসঙ্গে কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস ও নারায়ণদেবের কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

---

১৫ এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এই কবি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

কানা হরিদত্ত ॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুঁথিপত্র লইয়া যাঁহারা কারবার করেন, তাঁহাদিগকে পুঁথির প্রামাণিকতা, সন-তারিখ, লেখকের কাল, পুঁথির অনুলিপির সময় ইত্যাদি লইয়া যে কিরূপ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িতে হয় তাহা ভুক্তভোগীরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারেন। আর্দ্র-ভূমির দেশ এই বাঙলা, অল্পেই তুলট কাগজ নষ্ট হইয়া যায়, সেহাই কালি বিবর্ণ হইয়া পড়ে; সে যুগের লোকে খুব-একটা যত্নপূর্বক পুঁথি রক্ষাও করিত না। তাহার উপরে আছে কীট-পতঙ্গের উৎপাত। বুদ্ধিমান চতুর কীট পরবর্তী কালের গবেষকদের শিরঃপীড়া ঘটাইবার জন্য ঠিক সন-তারিখের জায়গাটা বেমালুম কাটিয়া উড়াইয়া দেয়। ফলে প্রাচীনযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনা অধিকাংশ স্থলে সন-তারিখের ব্যূহরচনায় পর্যবসিত হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যামোদীরা সাহিত্যরস অপেক্ষা ইহার সন-তারিখ লইয়া কাজিয়া করিতে অধিকতর ব্যগ্র। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমরা সেইরূপ একটি 'দিল্লীকা লাড্ডু' লইয়া আলোচনা করিব যাহার কথা শোনা যায়, কিন্তু 'আঁখিপাখি' ধরিতে পারে না। আমরা মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যের আদিতম কবি বলিয়া পরিচিত কানা হরিদত্তের কথা বলিতেছি।

মনসামঙ্গলের খ্যাতিমান কবি বিজয়গুপ্তের কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে কানা হরিদত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি পয়ার-শ্লোক আছে। অবশ্য সমস্ত সংস্করণে এই শ্লোকগুলি পাওয়া যায় না। এই জন্য কোন কোন সমালোচক কানা হরিদত্ত নামে মনসামঙ্গলের কোন প্রাচীন কবির অস্তিত্বে বিশেষ সন্দিহান। প্যারীমোহন দাশগুপ্ত বরিশাল হইতে বাংলা ১৩০৮ সালে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (প্রথম সংস্করণ ১৩০৩ সনে প্রকাশিত), তাহার 'স্বপ্নাধ্যায়' নামক পালায় আছে যে, দেবী মনসা রাত্রিকালে বিজয়গুপ্তকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন:

> মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
> প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥
> হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে।
> যোড়াগাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥

কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥
গীতে মতি না দেহ কেহ মিছে লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ॥

এইজন্য দেবী মনসা বিজয়গুপ্তকে বিশুদ্ধতর কাব্য রচনা করিতে আদেশ করিলেন,

মোর বরে পুত্র তুমি হও সাবহিত।
নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত ॥

এই পয়ার কয়টি বিজয়গুপ্তের রচিত হোক আর নাই হোক, ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, কানা হরিদত্তের তথাকথিত কাব্য দেবী মনসার পছন্দ হয় নাই।[১৬] সুতরাং এই প্রমাণ দৃষ্টে তাঁহাকে কেহ কেহ মনসামঙ্গলের আদিতম কবি বলিতে চাহেন। বিজয়গুপ্তের সময়েই হরিদত্তের গীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে 'যোড়াগাঁথা' নাই (অর্থাৎ ছন্দের ত্রুটি), শব্দযোজনা সুশ্রাব্য নহে, মিত্রাক্ষরও অত্যন্ত ত্রুটিজনক।[১৭] ইহাতে বোধহয় পূর্ব-বঙ্গের দুই-একটি আঞ্চলিক গ্রাম্য শব্দ ছিল ; হরিদত্ত 'লাফ'কে 'ফাল' লিখিয়াছিলেন। কাজেই কালক্রমে লোকে হরিদত্তের গান করিত না। এই মন্তব্য হইতে মনে হয়, পুরাতন যুগে হরিদত্ত নামে মনসামঙ্গলের কোন কবি আবির্ভূত হইলেও তাঁহার গান ব্রতকথার আদর্শে রচিত হইয়া থাকিবে। 'লাফ' শব্দ

[১৬] বিজয় গুপ্তের একখানি অর্বাচীন পুঁথিতেও (১৮৩৭ সালের অনুলিপি) এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইতেছে :

সর্বলোকে গিত গাহে না বোজে সাহিত্য।
প্রথমে রচিল গিদ কানা হরিদত্ত ।।
হরিদত্তের গিদ লোপ্ত পাইল এই কালে।
জোড়াগাঁথা নাহি কিছু ভাণ্ডে বোলে চালে ।।

(কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুঁথিশালায় রক্ষিত মূল পুঁথির ফটোস্টাট কপি হইতে উদ্ধৃত।)

[১৭] দেবীর মিত্রাক্ষরের বিশুদ্ধির প্রতি বোধ হয় একটু অতিরিক্ত ঝোঁক ছিল। বিজয় গুপ্তকেও তিনি বর দিয়া বলিয়াছিলেন :

মনে কিছু না ভাবিও মুই দিলাম বর।
না বুঝিয়া বল যদি হবে মিত্রাক্ষর ।।

পূর্ব-বঙ্গের উপভাষায় কোথাও কোথাও 'ফাল' হইয়া যায়। হরিদত্ত উপভাষার শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া দেবী এই কাব্যে সুখী হইতে পারেন নাই বোধ হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত কানা হরিদত্ত রচিত কোন মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া যায় নাই—বিজয়গুপ্তের সময়ে লুপ্ত হইয়া গেলে এখন আর তাহা কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ?

(দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ও 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে' হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' নামক একটু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি প্রমাণ হিসাবে যে নিদর্শনটুকু দিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট প্রাচীন নহে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিঘাপইৎ গ্রামে মনসামঙ্গলের একটি প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছিলেন ; তাহাতেই নাকি হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা ছিল। সেইটিই বোধ হয় দীনেশচন্দ্র-উল্লিখিত 'পদ্মার সর্পসজ্জা'। উক্ত পুঁথি-প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "সম্প্রতি মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিঘাপইৎ গ্রামে একখানি প্রাচীন মনসামঙ্গলকাব্য হইতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই হরিদত্ত পূর্ব-বঙ্গের কবি ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা। সুলেখক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার কর্তৃক হরিদত্তের এই পুঁথিখানির উদ্ধার হইয়াছে।) ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ৮ম সং, প ১১০-১১১)

(এই উক্তিটিতে কিছু সংশয় রহিয়া গিয়াছে। দক্ষিণারঞ্জন-আবিষ্কৃত পুঁথিটি যদি পুরাপুরি কানা হরিদত্তের হইত, তাহা হইলে দীনেশচন্দ্র প্রথমে "একখানি প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্য হইতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে"—একথা বলিতেন না। কিন্তু উক্ত মন্তব্যের পরক্ষণেই তিনি "হরিদত্তের এই পুঁথিখানি" বলিয়াছেন। এই দুই উক্তির অসামঞ্জস্য সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না। আমাদের অনুমান, দীনেশচন্দ্র হরিদত্ত ভণিতাযুক্ত কোন পুঁথি দেখেন নাই, দক্ষিণারঞ্জন-প্রেরিত পদগুলিকে বিনা অনুসন্ধানে কানা হরিদত্তের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাসে দীনেশচন্দ্র এরূপ অনেক করিয়াছেন।)

হরিদত্তের ভণিতায় 'পদ্মার সর্পসজ্জা' নামক যে কয়ছত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী ॥
সুতলিয়া নাগ কৈল গলার সুতলি।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হ্রিদয়ে কাঁচুলী ॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিতোর সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥[১৮]

এখানে ভাষাকে ইচ্ছা করিয়া পুরাতন রূপ দিবার চেষ্টা অতিশয় প্রকট। প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' (২য় সং; পৃঃ ২০১) পুত্র হারাইয়া চাঁদের যে বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ভণিতায় হরিদত্তের জবানী রহিয়াছে[১৯]। প্যারীমোহন সম্পাদিত গ্রন্থে পুরুষোত্তম নামক কবি বা গায়েনের (গায়েনের হওয়াই সম্ভব) পদ অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে ইহা অতি সাধারণ ব্যাপার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারায়ণদেবের যে পুঁথিটি আছে (পুঁথি সংখ্যা-৬৬৩৭) তাহাতে বহু পদে বংশীদাসের ভণিতা আছে। সে যাহা হোক, কানা হরিদত্ত কোন কবিই হউন, আর গায়েনই হউন,

---

১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯১ পুঁথিতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে:

ওলা শুনি আস্তের কাহিনী।
মুই হেন সেবক শরণ লইলাম গো
ঘটে লামি লও ফুলপাণি ॥

১৯ ক্ষীরোদ জলে চান্দ লখাইরে ভাসাইয়া
বিস্তর করেছে বিষাদ।
পুত্র পুত্রবধূ জলেতে ভাসাইয়া
কি আর জীবনে সাধ ॥
বাণিজ্য করিয়া পাইলাম হীরামন মাণিক্য
সম্পূর্ণ চৌদ্দখানি ভরা।
মনসা পরিবাদে সকলি হারাইলাম
আপনি আসিলাম একা ॥
কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তার অনুবন্ধ লাচরির ছন্দ
শ্রীপুরুষোত্তমে গায় ॥

অথবা দীনেশচন্দ্রের মতে কোন ব্যালাড-লেখকই হউন—এই নামে মনসামঙ্গলের কোন এক কবি কথনও বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। বিজয়গুপ্ত তাঁহার কাব্যের ত্রুটি দেখাইতে গিয়া 'লাফ' 'ফাল' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন; এই শব্দবিপর্যয়টি পূর্ব-বঙ্গে অঞ্চলবিশেষে এখনও দেখা যায়। কাজেই হরিদত্ত নামীয় কোন কবি নিশ্চয় পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বিজয়গুপ্তের অন্যান্য পুঁথিতেও কানা হরিদত্তের উল্লেখ আছে। পূর্বে যে 'পদ্মার সর্পসজ্জা' উল্লেখ করা হইয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বিজয়গুপ্তের কয়েকখানি পুঁথিতে তাহা হরিদত্তের ভণিতায় আছে।[২০] আবার দাস হরিদত্ত নামক একজন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, যিনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর 'সপ্তশতী' অংশের বাংলা অনুবাদ করিয়া 'কালিকাপুরাণ' রচনা করিয়াছিলেন।[২১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এসিয়াটিক সোসাইটিতে 'কালিকা-পুরাণে'র পুঁথি আছে। ইহার ভাষা অত্যন্ত আধুনিক; দাস হরিদত্ত শাক্ত পৌরাণিক কাব্যের অনুবাদ করিলেও মনোভাবের দিক হইতে বৈষ্ণব ছিলেন। অবশ্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এ ব্যাপার এমন কিছু নূতন নহে। শাক্ত মঙ্গল-কাব্যের কবি দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরাম বৈষ্ণব মতের প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিলেন—উত্তর-চৈতন্যযুগের ইহা একটা সাধারণ লক্ষণ। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন

---

২০ পুঁথি সংখ্যা—১০৯১A. B.C. D. E.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারায়ণ দেবের একখানি প্রাচীন পুঁথিতে (পুঁথি—৬২৩৭) হরিদত্তের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে:

পদ্মার চরণে গতি হরিদত্তে কয়।
মনসা পূজিলে সভে ধনপুত্র পায়।।

২১ ইহা হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:

যে শুনে তারকবধ কার্তিক নিধন।
তারে পূর্ণ কৃপা করি করে অনুক্ষণ।।
মৎস্য কূর্ম বরাহ নরহরি বামন।
পঞ্চ অবতার মর্ত্যে করিলা নারায়ণ।।
ত্রেতাযুগে ভৃগুরাম রাম রঘুবর।
দ্বাপরে হৈলা প্রভু রাম হলধর।।
বৌদ্ধরূপ ধরি হরি জগত বিহারে।
কাল সহযোগে বৌদ্ধ আপন সংহরে।।

১৮শ শতকের শেষভাগে লিখিত বৈদ্য হরিদাসের ভণিতাযুক্ত মনসামঙ্গলের একখানি পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণের দাস হরিদত্ত, মনসামঙ্গলের বৈদ্য হরিদাস এবং বিজয়গুপ্ত-উল্লিখিত কানা হরিদত্ত এক ব্যক্তি কিনা, নির্ণয় করিবার মতো কোন প্রমাণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। ডক্টর সেন বলিয়াছেন, "এই হরিদাস-হরিদত্ত পুরুষোত্তম উল্লিখিত 'কানা হরিদত্ত' হইতে বাধা নাই। তবে তাঁহার কাল যে অষ্টাদশ শতাব্দের আগে হইবে এমন মনে করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ২৪৩) এই হরিদত্ত যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী না হন, তাহা হইলে বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা হইলে মনসামঙ্গলের আদিকবি রূপে তাহাকে গণনা করা যাইবে না। কিন্তু বিজয়গুপ্তের নানা পুঁথিতে এবং নারায়ণদেবের একটি পুঁথিতে হরিদত্তের ভণিতা আছে। সুতরাং কানা হরিদত্তের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অবশ্য হরিদত্ত প্রাচীন যুগের কোন গায়েনও হইতে পারেন। নানাস্থানে যখন তাঁহার উল্লেখ দেখা যাইতেছে, তখন তাঁহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্যই সন্ধান করা যায় নাই, তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ না হইলেও আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয় রহিয়াছে।

বিজয়গুপ্ত ॥

বাঙলাদেশে মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের কেতকাদাস ক্ষমানন্দের ও পূর্ব-বঙ্গের বিজয়গুপ্তের কাব্যের প্রচার হইয়াছিল সর্বাধিক। ছাপার অক্ষরেও এই দুই কাব্য অনেক পূর্ব হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে কেতাকাদাসের কাব্য সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে প্রথম মুদ্রিত হয়, তারপর বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের কথা উল্লেখ করিতে হয়। অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য কবিকে নানা দুর্মূল্য দিয়া খ্যাতিলাভ করিতে হয়। বিজয়গুপ্তের কাব্য পূর্ব-বঙ্গে এত অধিক চলিয়াছিল (এখনও 'রয়ানী'—রজনী নামে এই অঞ্চলে গীত হয়) যে, গায়েন ও লিপিকারদের হস্তক্ষেপের ফলে বিজয়গুপ্তের মূল রচনার অতি অল্পই রক্ষা পাইয়াছে। পুঁথির সংখ্যা অধিক নহে; যাহাও-বা আছে, তাহার অনুলিপির কাল বিশেষ প্রাচীন নহে,—বিশেষতঃ

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের পুঁথি

(পৃঃ ৯০)

পুরাপুরি বিজয়গুপ্তের ভণিতাযুক্ত একখানি পুঁথিও পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে বহু স্থলে কর্ণপুর, বর্ধমান দাস, চন্দ্রপতি, হরিদত্ত, পুরুষোত্তম, জানকীনাথ, দ্বিজ কমলনয়ন প্রভৃতি ভণিতা দৃষ্টে মনে হয়, কাব্যটি প্রায়শঃই 'Composite text'-এ পরিণত হইয়াছে। অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য গায়েন ও লিপিকারগণ ভাষাকে যথেচ্ছা বদলাইয়া লইয়াছেন। এরূপ 'পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন' সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কৃত্তিবাসে যেমন প্রচুর প্রক্ষেপ প্রবেশ করিয়াছে, বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে ঠিক অনুরূপ হস্তক্ষেপ ও রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়।

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্যারীমোহন দাশগুপ্ত উদ্যোগী হইয়া ১৩০৩ সনে সর্বপ্রথম বরিশাল হইতে বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ প্রকাশ করেন।[২২] প্রকাশের চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়া গেলে পুনরায় বাংলা ১৩০৮ সনে (১৯০২) উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উক্ত জেলাবাসী রামচরণ শিরোরত্নও অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া প্যারীমোহনকে গ্রন্থ সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থ-প্রকাশক 'আদর্শযন্ত্রের'র স্বত্বাধিকারী অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "কয়েকখানা আসল প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্টে এবার কিছু কিছু পরিবর্ধিত ও প্রাচীনকালের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের সহজবোধ্য অর্থ সন্নিবিষ্ট হইল।" উক্ত গ্রন্থ সম্পাদনা করিবার জন্য গৈলা গ্রামে (প্রাচীন ফুল্লশ্রী) ১৩০৮ সনে ২রা

২২ প্রথম সংস্করণের এক কপি ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে আছে। ডঃ শ্রীসুকুমার সেন প্রথম সংস্করণের ভূমিকা হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত প্রথম সংস্করণের সম্পাদক বলিতেছেন, "এই পুস্তক প্রাচীনকালের হস্তলিখিত জীর্ণশীর্ণ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বরিশাল জজ আদালতের ভূতপূর্ব হেডক্লার্ক ফুল্লশ্রী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সেন-মজুমদারের বৃদ্ধ পিতামহ ৺দেবীপ্রসাদ সেন মজুমদার কর্তৃক ১১৮১ সনের লিখিত গ্রন্থ, সরমহল গ্রামস্থ বরিশালের খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীকুমার গুপ্তের জনৈক পূর্বপুরুষ সনারাম গুপ্ত কর্তৃক ১৭২০ শকের লিখিত গ্রন্থ, গৈলা গ্রামস্থ কৃষ্ণকিশোর মুন্সী লিখিত গ্রন্থ হইতে আমাদের সংগ্রহকারক যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন।" 'লিখিত গ্রন্থ' বলিতে সম্পাদক বোধ হয় উক্ত ব্যক্তিদের হেফাজতে রক্ষিত পুঁথি বা তাঁহাদের অনুলিখিত পুঁথি বুঝাইয়াছেন—উক্ত ব্যক্তিদের লিখিত বা প্রণীত কোন অর্বাচীন মনসামঙ্গল গ্রন্থের কথা এই উক্তির উদ্দেশ্য নহে। দ্রষ্টব্য : ডঃ সুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ২৩৭

ফাল্গুন এক জনসভায় প্যারীমোহনকে সংবর্ধনা করিয়া এক প্রশংসাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল:

> "শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্ত অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ ও দেশভক্তি-প্রণোদিত হইয়া অশেষ যত্ন-চেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত নানা স্থান হইতে অনেক তুলট কাগজের গ্রন্থ আনয়ন করিয়া ১৩০৩ সনে সর্বপ্রথমে বিশুদ্ধ পাঠ-সম্বলিত একখানি "মনসামঙ্গল" সংগৃহীত ও মুদ্রাঙ্কিত করেন।"[২৩]

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে 'কাশীপুর নিবাসী' পত্রিকা (২০ আষাঢ়, ১৩০৩) এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলিয়াছিলেন, "বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৈলানিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাশগুপ্ত মহাত্মা বিজয়-গুপ্তের কীর্তি যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, ও ঘরে ঘরে সহজে এই মনসামঙ্গল গ্রন্থ পাঠ হইতে পারে, তজ্জন্য দীর্ঘকাল হইতে বহু চেষ্টা ও পর্যটন করিয়া কয়েকখানি হস্তলিখিত পুরাতন গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।" স্বয়ং সম্পাদক দাশগুপ্ত মহাশয় ভূমিকায় কবির কাল-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তিনি "১০-১২ খানি তুলট কাগজের পুস্তক" পাঠ করিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, "আমাদের দেশে যতখানি পুস্তক পাইয়াছি তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রায় এক রকম। অনুলিপিকারগণের ভ্রমবশতঃ স্থানে স্থানে অতি সামান্য পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন গ্রামস্থ পুস্তকের মধ্যে অনেক অনৈক্য দেখা যায়। কেহ কেহ নিজ নিজ মতলব সিদ্ধির জন্য ইহার অনেক স্থলে অন্য কবির রচিত কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ-বা নিজ শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্য স্বরচিত কবিতা অথবা গ্রন্থস্থ কোন অংশের পরিবর্তে স্বরচিত পদ সকল ভরিয়া দিয়াছেন।" ভিন্ন গ্রামের পুঁথিতে প্রক্ষেপ থাকিতে পারে, এই ভয়ে প্যারীমোহন তাঁহার নিজ গ্রামের পুঁথির পাঠকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছিলেন—কারণ, তাঁহার গ্রাম গৈলায় (প্রাচীন ফুল্লশ্রী) বিজয়গুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন। যুক্তির দিক দিয়া তাঁহার এই মত ও গ্রন্থ-সম্পাদনের রীতি আমরা মানি, আর নাই মানি,—প্যারীমোহন যে ইচ্ছা করিয়া পাঠ বদলাইয়া আধুনিক শব্দ ছাপিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। দীনেশচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বিজয়গুপ্তের কাব্যে প্রক্ষেপ সম্বন্ধে

[২৩] এখানে সম্পাদকের মন্তব্য ও অন্যান্য উদ্ধৃতি দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩০৮) হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বলিয়াছেন, "বিজয়গুপ্তের ছদ্মবেশে 'জয়গোপালগণ' ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন।") আর এক লেখক আরও একটি সংবাদ দিয়াছেন, "সংগ্রাহক প্যারীমোহনবাবু কবিতা লিখিতেন।"[২৪] দীনেশচন্দ্র এবং ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য হইতে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিজয়গুপ্তের কাব্যের পুঁথিতে গায়েনগণ যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এমনকি কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ অধিকারী প্যারীমোহনও হয়তো ইহাতে আধুনিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সম্পাদক জয়-গোপাল ইচ্ছামতো পাঠ বদলাইয়াছিলেন।[২৫] এ দৃষ্টান্ত তো আমাদের সামনেই রহিয়াছে। সুতরাং প্রয়োজন স্থলে, পুরাতন গ্রাম্য ভাষাকে মার্জিত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা নিজ কবিত্ব-কণ্ডুয়ন নিবারণের জন্য প্যারীমোহন মূল পুঁথির ভাষা বদলাইয়া ফেলিতেও পারেন। কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয় যে ইচ্ছা করিয়া মূল পুঁথির পাঠ বদলাইয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তিনি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া নানা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইচ্ছামতো পাঠ বদলাইবার দুরভিসন্ধি থাকিলে তিনি কখনও লিখিতে পারিতেন না, "মনসামঙ্গলের ভাষা অনেক স্থানেই গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট। বর্তমান সময়ের অনেক নব্য পাঠক এই জন্য মনসামঙ্গলকে অতীব বিরক্তির চক্ষে দেখিতে পারেন। আমরা স্বীকার করি, মনসামঙ্গলের ভাষা সত্য সত্যই গ্রাম্যতা দুষ্ট, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা বিরক্তির সহিত ফেলিয়া দেওয়ার জিনিষ নহে। ৪—শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, 'মনসামঙ্গল' পাঠ করার সময় পাঠকগণ অনুগ্রহ-পূর্বক একবার তাহা স্মরণ করিয়া লইবেন।" এই কাব্যের ভণিতায় কিছু কিছু অশ্লীলতা আছে বলিয়া "কেহ কেহ এই সকল ভণিতাগুলি মুদ্রিত না করিতে আমাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমরা নানা কারণে ঐ সকল হিতৈষী মহাত্মাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া বড়ই দুঃখিত আছি।" (ভূমিকা) এখানেও দেখা যাইতেছে যে, সম্পাদক পুঁথির ভাষায় যথাবস্থিত বিশুদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। এ কথাও তিনি ভূমিকায়

[২৪] ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ

[২৫] জয়গোপাল প্রসঙ্গের জন্য এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' -এর (১ম) ৫২৩-৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কিভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠ বদলাইয়া-ছিলেন, তাহা ঐ খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

লিখিয়াছেন[২৬]। সুতরাং মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত আধুনিক শব্দ রহিয়াছে তাহা পুঁথির লিপিকার অথবা গায়েনগণ কৃত—প্যারীমোহন এজন্য দায়ী নহেন।

অবশ্য ছাপা গ্রন্থ ও পুঁথির পাঠে যে বিভিন্নতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী—কোথায় এই ত্রুটি নাই? যাহার অত্যধিক প্রচার হইয়াছে তাহার পুঁথিতেই পুরাতন শব্দের স্থলে নূতন যুগের শব্দ স্থান করিয়া লইয়াছে, অনেক নূতন বর্ণনা ও পালা স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিয়াছে। কাব্যশক্তিতে ঊনতা অথবা জনরুচির বিরোধিতার জন্য যে সমস্ত কাব্য সমাজে বিশেষ চলিত না, বহুবার বহুজনের দ্বারা 'কপি' হয় নাই, তাহার ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ অনেকটা বজায় আছে। যেমন—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। কিন্তু বিজয়গুপ্তের কাব্যের মতো অতিশয় জনপ্রিয় কাব্যে অসংখ্য, অযথা এবং অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এখানে প্যারীমোহন-সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠের সঙ্গে ১২৪২-৪৪ সনের (১৮৩৫-৩৭) মধ্যে অনুলিপিকৃত একখানি পুঁথির[২৭] পাঠের তুলনা দেওয়া যাইতেছে:

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১২৪২-৪৪ সনের পুঁথি ॥

(১) শ্রাবণমাসে রবিবার মনসাপঞ্চমী।
ত্রিতিয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা জায়ে স্বামী॥
নিদ্রার আবেষে না জাগে কোন জন।
হেনকালে বিজয়ে গোপ্তে দেখীল সপন॥
গৌরবর্ণ স্বরির ব্রাহ্মণের নারি।
রত্নময়ে অলঙ্কার দিব্ব বস্ত্র পড়ী॥
তপ্ত কাঞ্চন হেন স্বরিলের দ্যুতী।
চৌ সুশ্রীকাসিত পরম যুবতী॥

(২) এতেক শুনিয়া পদ্মা বিরস বদন।
চান্দোরে ডাকিয়া চণ্ডি বলিলা বচন॥

২৬ "অনুলিপিকারগণের ভ্রমবশতঃ স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন হইয়াছে।" (দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা)

২৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের 'ফটোস্ট্যাট' কপি হইতে উদ্ধৃত।

তোমার ঠাই কহি শুন চান্দ সদাগর।
একথা আমি সেই নাহি অন্য পর ॥
সেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ আদি চন্দ্র দিবাকর ॥

॥ প্যারীমোহন-সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

(১) শ্রাবণমাসের রবিবারে মনসাপঞ্চমী।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় স্বামী ॥
নিদ্রায় আকুল লোক না জাগে একজন।
হেনকালে বিজয়গুপ্ত দেখিল স্বপন ॥
গৌরবর্ণ শরীর এক ব্রাহ্মণের নারী।
রত্নময় অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র ধারী ॥
তপ্ত কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতি।
ইন্দ্রের শচী কিম্বা মদনের রতি ॥

(২) এতেক শুনিয়া চান্দর বিরস বদন।
চান্দরে ডাকিয়া চণ্ডী বলিল তখন ॥
পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর।
একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও আর ॥
যেই জন দেখ বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ দেখ চন্দ্র দিবাকর ॥

উল্লিখিত উদ্ধৃতি বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, ছাপা গ্রন্থ ও পুঁথির পাঠে বেশ পার্থক্য আছে, কিন্তু একেবারে 'খোল-নলিচা' বদলাইয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না।[২৮]

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের রচনাকাল লইয়া রীতিমতো সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। এ পর্যন্ত যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার সবগুলিতে সন-তারিখ

[২৮] ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বিজয়গুপ্তের ছাপা গ্রন্থে (প্যারীমোহন সম্পাদিত) আধুনিক শব্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল আমাদের কাছে যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা যে নিতান্ত আধুনিক কালের যোজনা তাহা দেখাইবার জন্য কয়েকটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ) কিন্তু আমরা ১২৪২ সনের পুঁথির সঙ্গে প্যারীমোহন-সম্পাদিত ছাপা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩০৮) পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছি যে, মুদ্রিত পাঠে অনেক অর্বাচীন শব্দ ও বর্ণনা থাকিলেও ইহাকে 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র মতো 'জাল' গ্রন্থ বলা যায় না।

নাই। যেগুলিতে আছে, তাহাতেও একের সঙ্গে অপর পুঁথির তারিখের ঐক্য নাই। সম্পাদক প্যারীমোহন বলিয়াছেন যে, তাঁহারা লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন যে, ১৪০৬ শকাব্দে (১৪৮৪ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। যে সমস্ত 'রয়াণীর' দল বা গায়েনসম্প্রদায় এই গান গাহিয়া বেড়াইত, সম্পাদক তাহাদের কাছেও এই ১৪০৬ শকাব্দের কথাই শুনিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি পুঁথিতে যে সন-তারিখের উল্লেখ পাইয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে :—

১। ঋতুশশী বেদশশী শক পরিমিত। (১৪১৬ শক—১৪৯৪ খ্রীঃ অঃ)

২। ছায়াশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।। (১৪০০ শক—১৪৭৮ খ্রীঃ অঃ)

৩। ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।। (১৪০৬ শক—১৪৮৪ খ্রীঃ অঃ)

আমরা ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের পুঁথিতে সন-তারিখ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত পয়ারটি পাইয়াছি—

হৃতু সিখে বেদ সসি পরিণিত সক।
সুলতার হুসন রাজা প্রিথাবি পালক।।

নিশিকান্ত সেন কোন কোন পুঁথিতে 'ছায়াশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক' অথবা 'ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক'—এই সনও পাইয়াছেন।[২৯] দেখা যাইতেছে যে, বিজয়গুপ্তের অনেকগুলি পুঁথিতে সন-তারিখের উল্লেখ আছে, কিন্তু তারিখগুলির মধ্যে ঐক্য নাই। উল্লিখিত পয়ারের প্রথমটিতে ১৪১৬ শক (১৪৯৪ খ্রীঃ অঃ), দ্বিতীয়টিতে ১৪০০ শক (১৪৭৮ খ্রীঃ অঃ), এবং তৃতীয়টিতে ১৪০৬ শক (১৪৮৪ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইতেছে। নিশিকান্ত সেন কোন কোন পুঁথিতে যে তারিখ দেখিয়াছেন তাহাতেও নানা অনৈক্য ও সংশয় আছে। এই সনগুলির মধ্যে প্রথমটি হইতেছে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান হইয়াছিলেন। তাহার বৎসর খানেকের মধ্যেই বিজয়গুপ্ত এই কাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন। কারণ ঐ পয়ারে হুসেনের নাম আছে। অন্য সনগুলিতে নিশ্চয় ভুল আছে। কারণ ১৪৭৮ বা ১৪৮৪ খ্রীঃ অব্দে হুসেনকে বাঙলার সিংহাসনে পাওয়া যায় না। বিজয়গুপ্ত হুসেন

[২৯] প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৮

শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম পয়ারের সনটি (১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রীঃ অঃ) কাব্যরচনার সন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

অবশ্য এ সমস্ত সন-তারিখের জল্পনা যে খুব নির্ভরযোগ্য নহে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ নানা পুঁথিতে যে পয়ার তিনটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ঐক্য নাই। তিনটি তারিখের মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য কোন্ সনটি যথার্থ তাহা লইয়া সংশয় সৃষ্টি হইতে পারে। তবে হুসেন শাহের নজিরকে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে স্বীকার করিলে ১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রীঃ অব্দকে কাব্যরচনার কাল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য ১৩১৪ সনে কলিকাতা হইতে নগেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বিজয়গুপ্তের যে কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কালজ্ঞাপক পয়ারটি নাই। সুতরাং কোন কোন ঐতিহাসিক সন-তারিখের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিতেছেন।

কেহ কেহ আর একটা গৌণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই কাব্যের রচনাকাল স্থির করিতে চাহেন। কবির উক্তি অনুসারে মনসাপঞ্চমীর দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে রবিবারে দেবী মনসা স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া কবিকে কাব্য লিখিতে আদেশ দান করেন। জ্যোতিষ গণনানুসারে ১৪১৬ শকে ২২ শ্রাবণ রবিবার কয়েক দণ্ড পরে পঞ্চমী আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার পরদিন ২৩ শ্রাবণ সোমবার কয়েক দণ্ড পর্যন্ত ছিল। তাই 'জ্যোতিষ দিনচন্দ্রিকা' মতে ১৪১৬ শক কাব্যরচনাকাল হিসাবে গৃহীত হইতে পারে।[৩০] অর্থাৎ ১৪১৬ শকের দিকেই পাল্লা ঝুঁকিতেছে। হুসেন শাহের গৌড়ের সিংহাসন অধিকারের বৎসরখানেকের মধ্যে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

বিজয়গুপ্তের কোন কোন পুঁথিতে কবির যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। বরিশালের গৈলা গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই গ্রামটির প্রাচীন নাম মানসী, তারপর ইহা ফুল্লশ্রী নামে পরিচিত হয়। বিজয়গুপ্ত ফুল্লশ্রীর কথাই বলিয়াছেন। গুপ্ত কবির বর্ণনা অনুসারে এই গ্রামের পশ্চিমে ঘাঘরা নদী এবং পূর্বে ঘণ্টেশ্বর নদ। ঘাঘরা নদী এখনও বিলের আকারে বর্তমান আছে, ঘণ্টেশ্বরের চিহ্নও দেখা যায়। এই গ্রামে 'বিজয়গুপ্তের মনসা

৩০ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণের সংযোজিত ভূমিকা, পৃ. ৮/০

বাড়ী' (মনসার মন্দির) এবং এই মন্দিরে পিতলের মনসামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শুনা যায়, এখানে বিজয়গুপ্ত মনসামূর্তি স্থাপন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কবি বিস্তারিতভাবে ফুল্লশ্রী গ্রামের বর্ণনা দিয়াছেন; নিজের সম্বন্ধে তিনি "সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত" ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় দেন নাই।

প্রথমে পুঁথির ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ইহাতে অল্প কিছু স্থানীয় উপভাষার প্রয়োগ থাকিলেও বাগ্‌ভঙ্গিমা পশ্চিম-বঙ্গের সাধুভাষার অনুগত।[৩১] তবে মুদ্রিত পুঁথির অতি অল্প স্থানেই প্রাচীনত্বের চিহ্ন আছে। কেন ইহাতে এত রূপান্তর হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। কাজেই যে রীতি অনুসারে প্রাচীন সাহিত্য, ভাষা ও বাক্‌রীতি বিচার করা হয়, বিজয়গুপ্তের এই কাব্য সেই বিচারে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। বহু গায়েন ও লিপিকারগণের হস্তক্ষেপের ফলে ইহার অনেক বদল হইয়াছে। এমন কি গায়েনদের কৃপায় ইহাতে অনেক আধুনিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। যেমন—হ'ল (হইল), যাব (যাইব), করল ('নারী করল চুরী') ব'লে (বলিয়া), করলাম, মরেছিল, করবে, আসবে, পেয়েছি, ম'ল (মরিল, মইল), 'চান্দর জন্য যেতে হইল বেহুলাসদন' 'যেওনা যেওনা বলি ডাকে তার মায়' 'পার হয়ে যেতে হয় এই যে জঞ্জাল', 'তোমার মায় আমার মায় মাসতাত বোন', 'তোমার ছয়পুত ম'ল সেও কি আমার দোষ?'—ইত্যাদি শব্দ ও বাক্যগুলি যে কোন মতেই প্রাচীন কালের নহে তাহা যে-কোন পাঠকই বুঝিবেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, প্যারীমোহন কোন প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; এই সমস্ত পুঁথি ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে বলিয়াই মনে হয়। এক স্থানে বেহুলার 'কীর্তন গানের' (দ্বিতীয় সংস্করণের ২১১ পৃষ্ঠা) উল্লেখ আছে। কীর্তন গান চৈতন্যদেবের পূর্বে ছিল বলিয়া অনুমিত

[৩১] মধ্যযুগে পূর্ব-বঙ্গে রচিত গ্রন্থাদিতে মোটামুটি পশ্চিম-বঙ্গীয় সাধুভাষা ব্যবহৃত হইত। আঞ্চলিক ভাষা ঐ অঞ্চলের সাহিত্যের ভাষায় খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস মহাশয় কিছুকাল পূর্বে দ্বিজ রামদেবের যে-অভয়ামঙ্গল কাব্য আবিষ্কার ও সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহা চট্টগ্রামের গ্রন্থ হইলেও পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষাকে পুরাপুরি অনুসরণ করিয়াছে। লেখকের এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দ্বিজ রামদেব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা থাকিবে।

হয় না।[৩২] এই জন্য যাঁহারা বিজয়গুপ্তের মুদ্রিত কাব্যের প্রাচীনত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা সহজ নহে। সুতরাং কাব্যটি যে-আকারে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে অসংখ্য আধুনিক হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, ইহা কোন প্রাচীন সাহিত্যরসিক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এইরূপ অবস্থায় ইহার কাব্যগুণ বিচার করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তথাপি পৌর্বাপর্য রক্ষার জন্য এ সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা যাইতেছে।

(আঞ্চলিক প্রীতিবশতঃ অনেক ভক্তপাঠক বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের উচ্চ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সুলভ মুদ্রণের ফলে এ কাব্য অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু নারায়ণদেবের কাব্য পাঠ করিলে বিজয়গুপ্তের মুদ্রিত গ্রন্থকে অত্যন্ত দুর্বল, শিথিল এবং ব্রতকথা-ছড়া-ব্যালাডের সমন্বয়ে সৃষ্ট বিশৃঙ্খল কাহিনী বলিয়া মনে হইবে। প্রথমতঃ, কাহিনীতে কোন প্রকার সামঞ্জস্য দেখা যাইবে না। মনসা-চণ্ডী-শিবের আখ্যানটুকু অনাবশ্যক এবং অনর্থক অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। চাঁদসদাগরের বাণিজ্য, বদল-বাণিজ্য ও দুর্গতির বর্ণনা নিতান্তই গতানুগতিক—কয়েক শতাব্দী পূর্বের উপকূল-বাণিজ্যের ক্ষীণ স্মৃতি। বেহুলার স্বামীদেহ সহ গারুড়ীর সন্ধানে যাত্রা, পথের প্রলোভন জয়, স্বর্গে গিয়া মহাদেবাদি দেবতাদিগকে নৃত্য-গীতে খুশি করিয়া স্বামী ও ভাসুরদের জীবন-সংগ্রহ এবং শ্বশুরের নিমজ্জিত তরণী উদ্ধারের কাহিনীতে বৈচিত্র্য না থাকিলেও স্বচ্ছ বর্ণনাভঙ্গিমা কথকতা ও পাঁচালীর রীতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মনসার ঈর্ষাকে নেতা যে-ভাবে কুটিল পথে চালনা করিয়াছে এবং রুষ্টা দেবীর ক্রোধকে অভীষ্ট পথে লইয়া গিয়াছে, তাহাতে সমগ্র কাব্যের কাহিনীটি যেন তাহারই করধৃত সূত্রে পরিণত হইয়াছে।)

চরিত্র বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, দেব-দেবীর চরিত্রে কোন প্রকার মহিমা রক্ষিত হয় নাই। চণ্ডী-মনসা-গঙ্গার কোন্দল কলহবিদ্যাপটীয়সী জনপদ-বধূদিগকেও লজ্জা দিবে। মহাদেবের গঞ্জিকা-ধুস্তুর-সেবী কামলম্পট চরিত্র প্রায় সমস্ত শাক্ত মঙ্গলকাব্যে একভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বাঙলাদেশে কৃষিজীবী আদিম অস্ট্রিক ধারার অনুসারে শিবঠাকুরের চরিত্র মনসা-চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়নে যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রামীণ মনোভাবটি বাস্তবধর্মী স্থূলরেখায় স্পষ্ট

বৈষ্ণবপদাবলী-সংক্রান্ত অধ্যায়ে কীর্তন গান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

ফুটিয়াছে। বৃদ্ধবয়সেও শিবের কামলোলুপতা প্রচুর। পুষ্পবনে পুষ্প তুলিতে গিয়া

কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব
রতিরসে করে ঢসমস।
অতি কামে হৈয়া ভোল শ্রীফলবৃক্ষে দিল কোল
আচম্বিতে খসিল মহারস।।

নিজ মানস-কন্যা মনসাকে দেখিয়া শিবের উত্তেজনা :

কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত।
লজ্জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত।।
নাকে হাত দিয়ে পদ্মা বলে রাম রাম।
শিবের চরণে পড়ি করিল প্রণাম।।
পদ্মা বলে বাপ তুমি পরম কারণ।
না বুঝিয়া বল কেন কুৎসিত বচন।।

বৃদ্ধ স্বামীর পরস্ত্রী-আসক্তির জন্য চণ্ডীর বিলাপ :

চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর।।

ডোমনীবেশিনী চণ্ডীর প্রতি পরস্ত্রীবোধে মহাদেবের কদর্য আসক্তি, মনসাকে দেখিয়া ঋষি জরৎকারুর কামাবেশ ("কামবাণে মোহিত হইল জগৎকারু") স্বর্গে নৃত্যরতা বেহুলাকে দেখিয়া মহাদেবের কামাভিলাষ ("যৌবন দান কর মোরে ভজ মোর ঠাঁই") প্রভৃতি চিত্র মধ্যযুগীয় মঙ্গল-কাব্যের কবিদের দীন কল্পনাই সূচিত করিতেছে।

চাঁদসদাগরের চরিত্রে কিছু কিছু মহৎগুণের সমাবেশ হইলেও শৃঙ্গাররসের ব্যাপারে কবি বিজয়গুপ্ত চাঁদকেও নিতান্ত সামান্য ব্যক্তিরূপে আঁকিয়াছেন ছদ্মবেশিনী মনসার রূপে কামাবেশ বশে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যাবস্থায় চাঁদ কর্তৃক মনসাকে মহাজ্ঞান দান তাঁহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়াছে। বাণিজ্য তরণী ডুবিয়া গেলে দারুণ দুঃখে পড়িয়া চারিপণ (চারি আনা) কড়ি পাইয়া চাঁদ বলিতেছেন :

এক পণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব।
আর এক পণ কড়ি দিয়া চিরা কলা খাব।।
আর এক পণ কড়ি নিয়া নটি বাড়ী যাব।
আর এক পণ কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব।।

বহুদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া ঘরে লখীন্দরকে দেখিয়া সোনেকার চরিত্রে চাঁদের সন্দেহ ("সুরূপ পুরুষ দেখি পুরীর ভিতর"), বেহুলার বিবাহে সমাগত স্ত্রীগণের পতিনিন্দা প্রভৃতিতে কবি রুচির মুখ রক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

রসিকতার ব্যাপারে বিজয়গুপ্ত আধুনিক পাঠকের রুচিকে আঘাত করিবেন। রাখালদিগকে মনসাপূজা করিতে দেখিয়া হাসান-হুসেনের সহকারী খোনকার মনসার ঘট ভাঙিতে আসিলে, রাখাল বালকেরা সুকৌশলে তাহাকে বিছুটি বনে ("চোত্রার গাছ[৩৩] সনে হল দরশন") লইয়া গিয়া বলিল, "এই গাছে করে বাস হিন্দুর দেবতা।" খোনকার চটিয়া উঠিয়া হিন্দুর গাছকে অসম্মান করিতে গিয়া কিরূপ জব্দ হইল তাহার ধূল্যবলুণ্ঠিত হাস্যরোলের বর্ণনা, গ্রাম্য হইলেও, বাস্তবজীবনের চিত্র বলিয়া নিতান্ত মন্দ হয় নাই। দুই একটি উক্তি বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছে; যথা—"উর্ধ্ব আঙ্গুলে কভু বাহির না হয় ঘি"—যদিও বাক্‌রতিতেও আধুনিকতার গন্ধ সুস্পষ্ট।

মনসা-চরিত্রে একটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও মানবিক গুণের বিকাশ হয় নাই—দৈবী গুণের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। যেখানে জরৎকারু ঋষি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, সেখানে তাঁহার উক্তি অল্পস্বল্প করুণরস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে:

> জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
> যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
> শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
> পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে॥[৩৪]

এই সামান্য কয় ছত্র বাদ দিলে মনসা-চরিত্রে ঈর্ষাতুর নীচতা ভিন্ন অন্য কোন মহৎগুণের পরিচয় ফুটে নাই—সমস্ত মঙ্গলকাব্যেরই এই একই প্রকার বৈশিষ্ট্য। অবশ্য দেবদেবীর চরিত্র যেরূপ হোক না কেন, সোনেকার মাতৃহৃদয়ের বেদনা, বেহুলার সুদৃঢ় চরিত্র, কর্তব্যবোধ ও পাতিব্রত্য বর্ণনায় কবি-গায়েনগণ কোথাও ত্রুটি রাখেন নাই। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কোন দিক দিয়াই

---

৩৩ পূর্ব-বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে বিছুটিকে চোত্রা বলে।

৩৪ অবশ্য এ ধরণের বাঁধাগতের শোক প্রকাশ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধা বিরহে' রাধার বিলাপ স্মরণীয়।

কাব্যগুণান্বিত না হইলেও এইরূপ দুই একটি চরিত্র ও ঘটনার কিছু প্রশংসা করিতে হইবে। বেহুলার সৌন্দর্য বর্ণনা—

চাচর মাথার কেশ চন্দন ললাটে।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুর নিকটে ।।
দশন মুকুতা পাঁতি অধরে তাম্বুল।
নাসিকা নির্মাণ দেখি যেন তিলফুল ।।
নিতম্বযুগল যেন নয়নে কাজল। ৩৫
কমল উপরে যেন ভ্রমর যুগল ।।
অর্ধোত্থিত স্তনদ্বয় শোভে হৃদিপরি।
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি ।।

লোহার বাসরঘর বর্ণনা এবং ছন্দের অল্পস্বল্প বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বহুস্থলে গায়েনগণ হস্তক্ষেপ করিয়া ভাষাকে মার্জিত ও ছন্দকে শ্রুতি-সুখকর করিয়াছেন। এমন কি ভারতচন্দ্রের

হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গতরঙ্গে ।।

ছত্রগুলির অনুসরণে বিজয়গুপ্তের নামে

জগতমোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূতপিশাচ ।।

ছত্রগুলি বেমালুম চলিয়া গিয়াছে।[৩৬]

প্রসঙ্গক্রমে চাঁদের চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেবদ্রোহী এই মানবচরিত্রটির দার্ঢ্য, পৌরুষ ও বীর্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ময়কর গৌরব লাভ করিয়াছে। শিবের উপাসক চাঁদ সদাগর শিবের মতো ভোলামহেশ্বর নহেন। জীবনের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই অবহিত।

---

৩৫ এই অংশের অর্থ বোধগম্য হইল না। বলাই বাহুল্য এই কয় ছত্রের বর্ণনায় গায়েনগণের হস্তকৌশল বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইবে।

৩৬ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের সম্পাদক প্যারীমোহন দাশগুপ্ত মনে করেন, "ভারতচন্দ্র ও ঘনরাম মনসামঙ্গল হইতে আরও একটি ভাব লইয়া সাধারণের নিকট কতই প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন।" (ভূমিকা) কিন্তু তিনি এসম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করেন নাই। অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য ভারতচন্দ্রের রচনা পরবর্তী কালের মনসামঙ্গলের পুঁথিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—এইরূপ অনুমান করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

প্রয়োজন স্থলে চাঁদসদাগর প্রচণ্ড মনসা-বিরোধিতা করিয়াছেন। ধন-জন-পুত্রক্ষয় তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই, মনসাকে তাঁহার পার্শ্বে অতিশয় দুর্বল, শ্রীহীন ও স্বার্থান্ধ জরতী বলিয়া মনে হয়। হেঁতালের বাড়ি হস্তে চাঁদকে দেখিয়া ভীরু মনসার চকিত পলায়ন এবং মহাজ্ঞান হরণ করিবার জন্য কামকলার ফাঁদ পাতিয়া চাঁদসদাগরের শক্তি ও মনুষ্যত্ব হরণ—ইহাতে দেবী-চরিত্রের নীচতাই ফুটিয়াছে। অবশ্য সে যুগের অর্থবান বণিকসমাজের মতো চাঁদের কিছু কিছু নারী-ঘটিত দুর্বলতা ছিল। কিন্তু সে সমস্ত বর্ণনায় মহাদেবের কুচনী-বাড়ী যাতায়াতের মতো একটা কৌতুকরস সৃষ্টি হইয়াছে। সে যুগের সমাজ এ সমস্ত ব্যাপারকে 'তেজীয়ান না দোষায়' বলিয়া মানিয়া লইত, তখনও উনিশ শতকী 'মিড্ ভিক্টোরিয়ান' রুচিবাগীশ উন্নাসিকতা সৃষ্টি হয় নাই।

(পুত্র হারাইয়া চাঁদের গম্ভীর বিলাপ এবং সোনেকাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা মাইকেল মধুসূদনের রাবণের বিলাপ এবং মন্দোদরীকে সান্ত্বনাদানের চিত্রকে স্মরণ করাইয়া দিবে।) চাঁদসদাগর পত্নী সোনেকাকে বলিতেছেন :

> শীতল চন্দন যেন আভের ছায়া।
> কার জন্য কান্দ প্রিয়া সকল মিছা মায়া ॥
> মিছামিছি বলি কেন ডোকর আমার।
> যে দেছিল লখীন্দর সে নিল আরবার ॥

এই বিষণ্ণ নির্বেদ সান্ত্বনাতীত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা স্মরণীয়; মনসার মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য এই বণিকের চরিত্রের সঙ্গতি বহুস্থলে নষ্ট করা হইয়াছে। বাণিজ্যে গিয়া মনসার চক্রান্তে তাঁহার দুর্দশার বর্ণনা অসঙ্গত, অযথার্থ, অপ্রাসঙ্গিক ও হাস্যকর হইয়াছে। ইহাতে মনসার মহিমা বৃদ্ধি পায় নাই, চাঁদের চরিত্রও একেবারে নষ্ট হইয়াছে। সর্বশেষে সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও চাঁদ পুনরায় মনসা পূজা করিতে চাহিলেন না—

> ধনে জনে কার্য নাহি যাউক আরবার।
> পদ্মা না পূজিব আমি কহিলাম সার ॥

তখন স্বয়ং চণ্ডী তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, "একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও আর"—এবং চাঁদ যখন দেখিলেন,

এক রথে পদ্মা দুর্গা অন্তরীক্ষে স্থিতি।
দুইজনে দেখে চান্দ একই মূরতি ॥

তখন চণ্ডী ও মনসার মধ্যে কোন ভেদ নাই জানিয়া চাঁদ বুঝিতে পারিলেন :

এমন মূরতি আমি কভু দেখি নাই।
এতকাল মোরে কেন না বলিলা আই ॥
যেই মুখে বলিয়াছি লঘুজাতি কানী।
সেই মুখে ভস্ম দেও জগৎজননী ॥

এই বর্ণনায় মনসা-ভক্তগণ খুশি হইয়াছেন, কিন্তু চাঁদের পৌরুষ-বীর্য যে ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবীর মহিমা প্রচারের জন্য বিজয়গুপ্ত চাঁদের চরিত্রটির পরিণতি নষ্ট করিয়া কাব্যের ভরাডুবি করিয়াছেন।

আর একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া আমরা বিজয়গুপ্তের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতে চাহি। বিজয়গুপ্ত মনসাভক্ত ছিলেন; চাঁদ সদাগর ছিলেন শৈব। অথচ এই কাব্যে বিষ্ণু ও চণ্ডিকায় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাইতেছি। কবি আরম্ভই করিয়াছেন, "গরুড বাহনে বন্দম বিষ্ণুর চরণ" বলিয়া। 'হরিহর নারায়ণ স্মরয়ে গোবিন্দ', 'হরি ভজিবার সময় যায় বহিয়া', 'হরিধ্বনি জয়জোকাব বচাইর নগর', 'জনমে জনমে হই রাধা-কানুর দাস', 'বাঁশী হইল কাল যাইতে যমুনার জলে' প্রভৃতি অজস্র স্থানে রাধাকৃষ্ণ ও বিষ্ণু-হরির উল্লেখ আছে। এসমস্ত উল্লেখ পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত না হইলে ইহার দ্বারা চৈতন্যের প্রভাবের পূর্বেই বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। চৈতন্যের পূর্বে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে তান্ত্রিক-শাক্ত মতের সঙ্গে কিছু কিছু বৈষ্ণব মতও ছিল। কাজেই প্রায় সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যেই রাধাকৃষ্ণ বা বিষ্ণু-হরির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের মনটি কিয়দংশে বৈষ্ণব-ভক্তির অনুকূল ছিল।

কাব্যধর্ম বিচারে বিজয়গুপ্তের কবিপ্রতিভা উচ্চ স্তরের নহে। চরিত্র-চিত্রণ, কাহিনীর বয়ন-কৌশল, কাব্যসৌন্দর্য প্রভৃতি খুঁটিয়া দেখিলে নারায়ণদেবকেই উৎকৃষ্টতর মনে হইবে। তবে যে-কোন কারণেই হোক, ছাপাখানার যুগে বাঙলাদেশে বিজয়গুপ্তের অধিকতর প্রচার হইয়াছিল। এই জন্যই আমরা এতটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিলাম

বিপ্রদাস পিপলাই ॥

বিপ্রদাসের কাব্যে স্পষ্টতঃ সন-তারিখের নির্দেশ[৩৭] পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা বিজয়গুপ্তের পরে চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া গ্রামে (মতান্তরে নাদুড়্যা বটগ্রাম) আবির্ভূত বিপ্রদাস পিপলাই নামক এক ব্রাহ্মণ কবির কথা আলোচনা করিতেছি।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সন-তারিখ এবং পুঁথি নকলের সততা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন, এবং সে সন্দেহ আদৌ অযৌক্তিক নহে। যাঁহারা মধ্যযুগের সাহিত্য লইয়া গবেষণা করেন, শুধু পুঁথির সন-তারিখ নির্ণয়ে তাঁহাদের অনেক সময় অপব্যয়িত হইয়া যায়। বিপ্রদাসের কাব্য জনপ্রিয়তা লাভ করিতে না পারিলেও নির্ভেজাল সন-তারিখ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া উল্লেখযোগ্য। অবশ্য নানা কারণে এই কাব্য লইয়া প্রাচীন সাহিত্যসেবী মহলে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে মনসামঙ্গলের একমাত্র, আদি ও অকৃত্রিম কবি বলিয়া উল্লসিত হইয়াছেন।[৩৮] কেহ-বা এ কাব্যকে আদৌ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না, ইহার কাব্যবিচার করাও বাহুল্য মনে করিয়াছেন।[৩৯] নানা কারণে বিপ্রদাস সম্বন্ধে এই রূপ বিপরীত মত সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধান কারণ—পুঁথির পৃষ্ঠার গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা। নিম্নে সংক্ষেপে এই পুঁথিবিভ্রাট সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা যাইতেছে।

যাঁহাকে সাহিত্যের ঐতিহাসিক "মনসামঙ্গলের সবচেয়ে পুরানো কবি" বলিয়াছেন, ১৮৯৭ সালের পূর্বে সেই বিপ্রদাসের কোন পরিচয় শিক্ষিত ও সাহিত্যিক সমাজ জানিত না। কবি বিপ্রদাস কলিকাতা হইতে বহু দূরে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাদুড়িয়া গ্রামে (বাদুড়িয়া থানা) তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। কলিকাতার অদূরে দত্তপুকুর অঞ্চল হইতে তাঁহার কাব্যের তিনখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অথচ ঊনবিংশ

---

৩৭ সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের প্রধান।

৩৮ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, পূর্বার্ধ

৩৯ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

শতাব্দীর একেবারে শেষভাগের পূর্বে বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' পুঁথির খবর কলিকাতায় পৌঁছায় নাই। তদানীন্তন বাঙ্গালা সরকার বিপ্রদাসের দুইখানি পুঁথি ক্রয় করেন। পুঁথির সংখ্যা যথাক্রমে—জি. ৩৫২৯ এবং জি. ৩৫৩০। পুঁথি দুইখানি এখন এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পত্তি। ১৮৯৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় এবং এশিয়াটিক সোসাইটির চেষ্টায় প্রকাশিত *Descriptive Catalogue of Vernacular Manuscripts*-এ পুঁথি দুইখানি এবং কবির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রকাশিত হয়। ৩৫২৯ সংখ্যক পুঁথিতে সন-তারিখের উল্লেখ নাই; অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইহার অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।[৪০] দ্বিতীয় পুঁথিতে (জি. ৩৫৩০) পাতার গোলমাল আছে। মনে হয় দুইখানি পুঁথি একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। উপরন্তু এই পুঁথিতে পাঁচজনের হস্তাক্ষর রহিয়াছে, তন্মধ্যে একজন নরসুন্দরও আছেন। পঞ্চভূতের ব্যাপার বলিয়া এই পুঁথির পাঠ সংশয়াতীত নহে। ১৭৪০ বা ১৭৫৯ সালে ইহা লিপিকৃত হইয়া থাকিবে। তৃতীয় পুঁথিখানি বর্ধমান সাহিত্য সভার ৪০৩ সংখ্যক পুঁথি, এটিও খণ্ডিত। ছোট জাগুলিয়ার (চব্বিশ পরগণা) স্বর্গত অখিলচন্দ্র বসুর হেফাজতে এই পুঁথিখানি ছিল এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের নির্দেশক্রমে বর্ধমান সাহিত্য সভার জন্য ইহার একটি অনুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে। মূল পুঁথিটি কোথায় আছে জানা যায় না। চতুর্থ পুঁথিটি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে আছে (পুঁথি সংখ্যা—১৮৯৩)। এটি খণ্ডিত নহে, সম্পূর্ণ—বোধ হয় ছোট জাগুলিয়ার পুঁথির পূর্বতন রূপ। ইহাও উক্ত গ্রামের শশিভূষণ বসুর নিকটে ছিল, কিছুকাল হইল ইহা বিশ্বভারতীর অধিকারে আসিয়াছে। এই পুঁথিটি ১২৩১ বঙ্গাব্দে (১৮২৫) লিপিকৃত হয়। এই চারিখানি পুঁথির মধ্যে শেষোক্তটি ছাড়া আর সমস্ত পুঁথি খণ্ডিত। তিনটি পুঁথি এমনভাবে খণ্ডিত যে, বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। এই তো গেল পুঁথির কথা। মাত্র চারিখানি পুঁথি, তাও তিনখানি অত্যন্ত খণ্ডিত। পুঁথিগুলির লিপিকাল অত্যন্ত আধুনিক। কলিকাতার নিকটবর্তী গ্রামে থাকিলেও এই কাব্য আদৌ প্রচার লাভ করে নাই। সর্বোপরি ভাষার মধ্যে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু আধুনিকতা সঞ্চারিত হইয়াছে। পাঁচমিশেলি হাতের লেখাতে পুঁথির প্রামাণিকতা

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত *Viprada's Manasa Vijaya*

সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়তর হয়। অর্বাচীন কালের শব্দের সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

১। ছাড়িয়া যাবে মোরে কোথা (পৃ. ৪৫)[৪১]
২। চিন্তাকুল দুই ভাই-ভাবে সবিস্ময় (পৃ. ৮৬)
৩। যেন ধায় রাহু পসারিয়া বাহু
দিবাকর শশী দেখি। (পৃ. ১০৩
৪। সূর্যের আতপে যেন মৃণাল শুখায় (পৃ. ১১৪)
৫। তোমার পঞ্চত্ব হইল মোর দৈবদোষে (পৃ. ১১৪)

এই ভাষা কি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা হইতে পারে? আরও একটু আধুনিক রচনাভঙ্গীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

চাঁচর প্রচুর কেশ বাঁধিল কবরী
নানা অলঙ্কার অঙ্গে মণিরত্ন ঝুরি।
চন্দন তিলক শোভে ললাটে সিন্দুর
নয়নে কজ্জল তাহে অলক প্রচুর।
দশন মুকুতা পাঁতি জিনিয়া ভ্রমর[৪২]
অমিয়া বরিখে বিম্ব জিনিয়া অধর।
তপত কাঞ্চন জিনি দেহের বরণ
পট্টবস্ত্র পরিধান সূর্যের কিরণ।
চরণে নূপুরধ্বনি বাজে রুনুঝুনু
নানা রত্নে মণিময় দীপ্ত করে তনু।

এখানে ভাষা ও পয়ার এমন চাঁছা-ছোলা যে, ভারতচন্দ্র-ঘনরামের কথা মনে পড়ে। আরও একটি কারণে এই কাব্যের প্রাচীনত্বে বিশেষ সংশয় জন্মে। চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ইহাতে কলিকাতা ও কাছাকাছি গ্রাম ও তীর্থের বর্ণনা আছে :

ডাহিনে হুগলি রহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে বাহিল বোয়ো পূর্বে কাঁকীনাড়া।
মূলাজোড় গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর
পশ্চিমে পাইকপাড়া বাহে ভদ্রেশ্বর।

---

[৪১] ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত *Vipradas's Manasavijaya*-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা।

[৪২] দশন কি মিশিকালো, যে কালো ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা ?

চাঁপদানি ডাহিনে বামেতে ইছাপুর
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর।
বামে বাঁকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে
জমিন বাহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে।
পূজিল নিমাইতীর্থ (!) করিয়া উত্তম
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপম।
চানক বাহিয়া যায় বুড়নিয়ার দেশ
তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ।
খড়দহে শ্রীপাট (!) করিয়া দণ্ডবত
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকে অবিরত।
রিসিড়া ডাহিনে বাহে বামে সুকচর
পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোননগর।
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে
পূর্বেতে আঁড়িয়াদহ ঘুসুড়ি পশ্চিমে।
চিতপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা
নিশিদিসি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা।
পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা। (পৃ ১৪৩-৪৪)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের (প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড) ১২৯২ সনের সংস্করণে ধনপতির বাণিজ্যপথের তালিকায় প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায় :

গরিফা ছাড়িয়া ডিঙ্গা গেল গোন্দলপাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন ন পাড়া ।।
ব্রহ্মপুত্র সন্ধ্যাবতী দেই ঘাটে মেলা।
ইচ্ছাপুর এড়াইল বেনিয়ার বালা ।।
উপনীত হইল ডিঙ্গা নিমাই তীর্থের ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যেথা ওড়ফুল ফুটে ।।
ত্বরায় চলয়ে তরী তিলেক না রহে।
ডাহিনে মাহেশ রাখি চলে খড়দহে ।।
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
কুচিনান ধনপতি একেবারে পায় ।।

নানা উপায়ে তথা পূজে পশুপতি।
কুচিনান এড়াইল সাধু ধনপতি ॥
ত্বরায় বাহিছে তরী তিলেক না রয়।
চিত্রপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায় ॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা ॥ (পৃ ১৯৬-৯৭)[৪৩]

এই দুই বর্ণনার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বেতাই-চণ্ডীর পূজা দিয়া, কালীঘাটে কালীপূজা করিয়া ক্রমে বারুইপুরে চাঁদের নৌকা পৌঁছিল। বিপ্রদাসের বর্ণনার ভাষা আধুনিক তো বটেই, অনেকগুলি গ্রাম-জনপদের নামও আদৌ প্রাচীন নহে। 'আইন-ই-আকবরী'-তে সপ্তগ্রাম সরকারের অধীনে 'মহল কলকাত্তা'র উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রচিত কোন কাব্যে এইরূপ উল্লেখ কিছু সন্দেহজনক। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিহাস—নিমাইতীর্থ এবং শ্রীপাট খড়দহের উল্লেখ। এই দুইটি গ্রাম চৈতন্যদেবের পরে ও প্রভাবে বিখ্যাত হইয়াছিল। রাম না হইতে রামায়ণ রচনা হয়তো সম্ভব, কিন্তু নিমাইয়ের পূর্বে নিমাইতীর্থ এবং নিত্যানন্দের পূর্বে শ্রীপাট খড়দহের সশ্রদ্ধ উল্লেখ সম্ভব নহে। স্পষ্টতঃই এই বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত। বাধ্য হইয়া পুঁথি-সম্পাদককে বলিতে হইয়াছে—"There is little doubt that the earlier narrative is a singer's elaboration made at a much later date."[৪৪] কিন্তু কলিকাতার উল্লেখ আছে বলিয়াই কেবল এই অংশটুকুকে গায়েনের প্রক্ষেপ বলিতে হইবে কেন? এই অংশের ভাষা গ্রন্থের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা তো আধুনিক নহে। বিপ্রদাসের গোটা পুঁথিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, পথের বর্ণনাতেও সেই একই রীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া শুধু কলিকাতার উল্লেখযুক্ত অংশকে গায়েনের প্রক্ষেপ বলিয়া সমস্যাকে সরল করিয়া ফেলা যায় না। কেহ কেহ বলিতে

[৪৩] ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে মুকুন্দরামের বর্ণনায় এই সমস্ত গ্রাম-জনপদের উল্লেখ ততটা অবিশ্বাস্য নহে। অবশ্য কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বঙ্গবাসী সংস্করণে ধনপতির যাত্রাপথের বর্ণনায় কালীঘাট, বেতড়, বাগন (বাগনান ?) প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও কলিকাতার নাম নাই।

[৪৪] ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত *Vipradus's Manasavijaya*-এর ভূমিকা (p.V) দ্রষ্টব্য।

পারেন যে, এই বর্ণনা পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কারণ চাঁদ ইহার পরে অনুপম পাটনে পৌঁছাইয়া পথের বর্ণনা দিবার সময় শুধু উজানি, নদীয়া (নবদ্বীপ), আঁবুয়া (অম্বিকা?), ফুলিয়া, ত্রিবেণী—মাত্র এই কয়টি গ্রামের বর্ণনা দিয়াছেন; সপ্তগ্রাম বা আর কোন গ্রামের নাম করেন নাই। তাই গ্রন্থ-সম্পাদক বলিতে চাহেন যে, মূলে শুধু এইটুকু ছিল, পরে গায়েনগণ স্থানীয় গ্রাম-জনপদের নাম যোগ করিয়া দিয়াছে। যুক্তি হিসাবে ইহাতে কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পূর্বে কবি গ্রাম ও তীর্থের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার সামান্য পরে সমস্ত গ্রামের পুংখানুপুংখ উল্লেখ বা বর্ণনা দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। নবম পালার চতুর্থ স্তবকের বিস্তারিত বর্ণনা (যাহাকে ডঃ সেন প্রক্ষিপ্ত বলিতে চাহেন) রহিয়াছে; তাই কয়েক পৃষ্ঠার পরে অষ্টম স্তবকে একই বর্ণনার সময়ে কবি ইচ্ছা করিয়াই বোধ হয় সংক্ষেপে সারিয়াছেন। সুতরাং যেখানে ভাষা বা অন্য কোন বাধা নাই, সেখানে কবিকে প্রাচীন বলিবার জন্যই অংশ-বিশেষকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। অবশ্য একথা ঠিক যে, নিমাইতীর্থ ও শ্রীপাট খড়দহের উল্লেখ সত্য বলিয়া ধরিলে কবিকে চৈতন্য-নিত্যানন্দের তিরোধানের পরে আনিয়া ফেলিতে হয়। যাঁহারা তাহাতে সঙ্কুচিত, তাঁহারা ইচ্ছামতো অংশবিশেষকে গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারেন। কিন্তু পুঁথির ভাষা বিচার করিয়া ইহাকে কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে লওয়া যায় না। বরং আরও পরবর্তী হওয়াই সম্ভব।

পুঁথির প্রথম পালার চতুর্থ স্তবকে কালজ্ঞাপক পয়ারটি লক্ষণীয়:

> সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
> নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান ॥
> হেনকালে রচিলা পদ্মার ব্রতগীত।
> শুনিয়া দ্রবিদ লোক পরম-পীরিত ॥

অর্থাৎ ১৪১৭ শকে (১৪৯৫ খ্রীঃ অঃ) যখন হুসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন এই গীত রচিত হয়। এই সন-তারিখটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এশিয়াটিক সোসাইটির দুইখানি পুঁথিতে (জি. ৩৫২৯ এবং জি. ৩৫৩০) এবং বিশ্বভারতীর পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই সনে অবিশ্বাস করা যায় না। তবে যে আদর্শ পুঁথি (যাহার সন্ধান পাওয়া যায়

নাই) অবলম্বনে এই চারিখানি পুঁথি নকল করা হইয়াছিল, তাহাতে যদি কালজ্ঞাপক চারিছত্র প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কবির প্রাচীনত্বের গৌরব ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। যদি এই পয়ারটিকে তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভাব-ভাষায় বিপ্রদাসের মনসাবিজয়কে কিছুতেই প্রাচীন কাব্য বলা যাইবে না। কালজ্ঞাপক 'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক'-ই ইহার প্রাচীনত্বের একমাত্র প্রমাণ এবং ইহা বাদ দিলে 'মনসাবিজয়'-এর প্রাচীনত্বকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা সুকঠিন।

এই কাব্যের প্রারম্ভে বিপ্রদাস যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি নাদুড্যা বটগ্রামে (কোন কোন পুঁথিতে বাদুড়া) বাৎস্য গোত্রের পিপলাই শাখার (পৈপ্‌লাদ) সমবেদের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কবিরা চারি ভাই। পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কেহ কেহ বাদুড়া গ্রাম কোথায় তাহা লইয়া গোলে পড়িয়াছেন। কিন্তু জেলা চব্বিশ পরগণায় বসিরহাটের অন্তঃপাতী বাদুড়িয়া থানা এখনও আছে। কবিও খুব সম্ভব এই অঞ্চলের অধিবাসী। কারণ তাঁহার কাব্যে এই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ ভাষাভঙ্গিমা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—'দন্তবোডা' (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষায় ফোক্‌লা দাঁত), 'গোডানি' (পাদস্পৃষ্ট জল), 'ঢেকা মারা' (ধাক্কা দেওয়া) প্রভৃতি শব্দ। এগুলি এখনও বসিরহাট ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে ব্যবহৃত হয়।

বিপ্রদাসের মনসাবিজয়[৪৫] সম্বন্ধে সম্পাদক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : "In the whole of Middle Bengali Literature there is never a tale more sincerely and effectively told than Vipradas's narrative." কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রচিত হইলে ইহা বিজয়গুপ্তের অপেক্ষা যে উৎকৃষ্টতর, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কাহিনীটির ঘটনা-বিস্তৃতি স্বচ্ছ, ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ এবং বর্ণনাভঙ্গিমা উৎকট আতিশয্য বর্জিত। ডঃ সেন পুনরায় বলিয়াছেন, "His sincerity and faith

[৪৫] বিপ্রদাস এই কাব্যকে ছয়বার 'মনসাবিজয়', নয়বার 'মনসামঙ্গল' এবং একবার 'মনসাচরিত' বলিয়াছেন। পুঁথির সম্পাদক ডঃ সেন 'মনসাবিজয়' নামটি গ্রহণ করিয়াছেন। 'মনসামঙ্গল' আখ্যা দিলেও নামকরণে ত্রুটি হইত না, কারণ কবি নয়বার এই নামই ব্যবহার করিয়াছেন।

saved his poem from poetic verbosity and lurid vulgarity." অবশ্য কবির ভাষাভঙ্গিমা এতই পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত যে, ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ জাগে। যে কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়, যাহার বহু অনুলিপি হয়, তাহাতে অর্বাচীন কালের শব্দ প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু বিপ্রদাসের কাব্য কোন দিনই বহুলভাবে প্রচারিত হয় নাই, কারণ ইহার প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিদের তুলনায় অতিশয় অল্প। উপরন্তু প্রাপ্ত পুঁথিগুলি কবির জন্মস্থানের নিকটেই পাওয়া গিয়াছে। দূর-দূরান্তরে বিস্তার লাভ করিলে পুঁথির ভাষায় দেশ ও কালের অথবা অর্বাচীন যুগের ছাপ থাকিবার যুক্তি থাকিত। বিজয়গুপ্তের পুঁথির মধ্যে নানা গোলমাল থাকিলেও ১৮৩৭ সালে অনুলিখিত পুঁথিটির [৪৬] ভাষাতেও খানিকটা প্রাচীনতা আছে। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয় বিপ্রদাসের পুঁথিতে সেরূপ কোন প্রাচীনত্বের চিহ্ন নাই—যদিও চারিখানি পুঁথির মধ্যে তিনখানির অনুলিপির কাল বিজয়গুপ্তের ১৮৩৭ সালের পুঁথির অপেক্ষা প্রাচীনতর।

বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ের মধ্যে হাসেন-হুসেনের পালাটি (চতুর্থ পালা, ১৮ স্তবক) দীর্ঘতর এবং অন্যান্য মনসামঙ্গলের তুলনায় সুপরিকল্পিত ; মুসলমান সমাজ ও জীবনের এরূপ পুংখানুপুংখ ও তথ্যবহ পরিচয় একমাত্র মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ বলিলেই চলে। মনসার সঙ্গে বিরোধের ফলে বিষাতিয়া সাপের দংশনে বড মিঞার মৃত্যু হইলে বাড়ীর চাকর-নফরগণের মনোভাব চমৎকার ফুটিয়াছে :

মিঞা যবে ফৌত হইল গোলামের খোষ পাইল
বিবি লইয়া পলাইতে চায়।

বিপ্রদাসের রচনায় হাস্যরসের সাক্ষাৎকার বড একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পংক্তি কৌতুকরসে উজ্জ্বল।

চরিত্র বিচারে সর্বাগ্রে মনসার উল্লেখ করা কর্তব্য। বাংলা মনসামঙ্গলে মনসার চরিত্র অতি কঠোর ও নির্মম,--মাঝে মাঝে ঘৃণ্য নীচতার ধার ঘেঁষিয়াও গিয়াছে। কিন্তু বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা-চরিত্রে একটা অভিনব বৈশিষ্ট্য

---

[৪৬] বিজয়গুপ্তের এই পুঁথিটির একখানি 'ফটোস্টাট কপি' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগে আছে।

লক্ষ্য করা যায়। এই চরিত্রে করুণা ও স্নেহ-মমতা সঞ্চার বিপ্রদাসের অন্যতম প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। হাসন ভক্তির বশে দেবীর পূজা করিলে—

হাসন এতেক যদি করিল স্তবন
মনসা ব্যথিত অতি হইলা তখন।
অধিক বাড়িল দয়া আপন কিঙ্করে
ডাকিয়া বলেন মাতা মধুর সুস্বরে।

হাসনের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন, "অনায়াসে বর মাগ জেই মনে লয়।" তখন হাসন বলিল, "তব পদে ভক্তি অতি রহে নিরন্তর।"[৪৭] বেহুলা-মনসা-চাঁদের পারস্পরিক চরিত বর্ণনায়ও মনসাকে করুণাময়ী করিয়া আঁকিবার চেষ্টা লক্ষণীয়। ইহাও কাহিনীটির আধুনিকতার ইঙ্গিত করিতেছে। প্রথম দিকে রচিত মনসামঙ্গলের মনসা চরিত্রের কঠোরতা পরবর্তী কালের কাব্যে কিরূপ করুণ ও কোমল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রমাণ বিপ্রদাসের মনসা। তবে একথাও ঠিক, কাব্যটি নিতান্তই ব্যালাড ধরণের আখ্যানকাব্য হইয়াছে। নারায়ণদেবের কাব্যে আদিরসের উল্লাস আছে। আবার তাহার সঙ্গে বিশাল কাহিনী, দেবদ্রোহী মানব ও ক্রূর দেবীর জিঘাংসার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়ে' সেরূপ মহাকাব্যোচিত প্রসার ও গভীরতা লক্ষ্য করা যায় না। বেহুলার বেদনা, সনকার বিলাপ, চাঁদের দুর্গতি—এ সমস্তই সহজ সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যিক বক্রতা বা চারুত্ব নাই বলিলেই চলে।[৪৮] "বিপ্রদাসের কাব্যের ভূমিকাগুলি, দেব হোক বা মানুষ হোক, স্বভাবসঙ্গতভাবে চিত্রিত হইয়াছে—"[৪৯] সমালোচকের এই মন্তব্য পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না। নর-নারীর চরিত্রগুলির মধ্যে চরিত্রগত এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই যাহা অন্য মনসামঙ্গল কাব্যে লভ্য নহে। চাঁদের চরিত্র মোটামুটি সঙ্গত। পুত্রের বিবাহে আনন্দিত চাঁদের বর্ণনা—

চাঁদো রাজা নাচে কান্ধে হেতালের বাড়ি
ঝলমল করে মুখে পাকা গোঁপ দাড়ি।

গতানুগতিক চিত্রের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছে। চাঁদ-চরিত্র

[৪৭] এই নিঃশ্রেয়স ও কেবলাভক্তি চৈতন্য ও উত্তর-চৈতন্য যুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

[৪৮] বিপ্রদাস নিজের কাব্যকে 'ব্রতগীত' বলিয়াছেন, কাজেই ব্রতকথা জাতীয় কাব্যে দীর্ঘ কাহিনী ও সাহিত্যিক কৌশল না থাকাই স্বাভাবিক।

[৪৯] ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ

সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছেন, "সমগ্র পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে চাঁদের মতো পুরুষ চরিত্র আর একটি নাই। যে-দেবতার কাছে যে মাথা বিকাইয়াছে, সে ছাড়া অন্য দেবতার কাছে নতি স্বীকার করিতে সে প্রস্তুত নয়।" এ কথা কিন্তু বিপ্রদাসের চাঁদসদাগর সম্বন্ধে পুরাপুরি প্রযোজ্য নহে। কাব্যের শেষে চাঁদ মনসার নিকট মিনতি করিয়া বলিলেন, আমি পাপমুখে তোমার বহু নিন্দা করিয়াছি; আমার মাথায় পদাঘাত কর, যাহাতে দোষ-নিন্দার যথোচিত শাস্তি হয়।

দেখিয়া চাঁদোর স্তুতি তুষ্ট বিষহরি
মাগিল জতেক বর দিলা পূর্ণ করি।
হাসি পদাঘাত কৈলা চাঁদোর মস্তকে
অন্তরিক্ষ হইয়া দেবী রহিল কৌতুকে।

মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিগণ দেবীকে দিয়া চাঁদোর মস্তকে পদাঘাত করান নাই। কাজেই অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যের মতো এখানেও চাঁদের চরিত্রের শেষ রক্ষা হয় নাই। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, চারিটি কারণে এই কাব্য আলোচনার যোগ্য ঃ—(ক) রচনার সন-তারিখ, (খ) হাসান-হোসেন প্রসঙ্গ, (গ) কলিকাতা প্রভৃতির উল্লেখ,[৫০] (ঘ) মনসার অপেক্ষাকৃত কোমল ও মানবীয় চরিত্র। রচনা-ভঙ্গিমায় সংস্কৃত শব্দ ও বিশুদ্ধ বৈয়াকরণ রীতি উল্লেখযোগ্য (এবং কিঞ্চিৎ সন্দেহজনকও বটে)। চরিত্র বর্ণনায় কবি খুবই সাদাসিধা কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, "কবির পরিচিত সমাজ-সংসারের ও পারিপার্শ্বিকের অনুরাগী" চরিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। কাজেই কিছু স্বাভাবিকতা আছে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া নারায়ণদেব-ক্ষমানন্দকে ছাড়িয়া বিপ্রদাসকে পাদ্যার্ঘ্য দিবার প্রয়োজন নাই।

নারায়ণদেব ॥

'সুকবিবল্লভ' নারায়ণদেব মনসামঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কিনা তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে যেমন মুকুন্দরামের খ্যাতি বহু প্রচারিত, তেমনি মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের কাব্য শুধু

[৫০] ডঃ সুকুমার সেন কলিকাতা-সংক্রান্ত ছত্রগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে চাহেন, তাহা হইলে চারিটি আকর্ষণের একটি খারিজ হইয়া গেল।

সুপ্রচারিত নহে, বাঙলার বাহিরে আসামেও অন্যতম জনপ্রিয় কাব্য বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ, পক্ষপাত ও ব্যক্তিগত অভিরুচি বাদ দিয়া সহজ শিল্পরসের দৃষ্টি হইতে বিচার করিলে নারায়ণদেবকে মধ্যযুগের একজন প্রতিভাশালী কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হইয়াও নারায়ণদেব কাহিনীটিকে একটা বিশাল রূপ দিবার জন্য যেরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন এবং কবিপ্রতিভার যেরূপ বিস্ময়কর শক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, ক্ষমানন্দ কাহারও রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। তাঁহার অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, ১৬৯৫ খ্রীঃ অব্দে লিপিকৃত একখানি প্রাচীন পুঁথির আলোকচিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-বিভাগে আছে। মঙ্গলকাব্যের এত পুরাতন পুঁথি অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। নারায়ণদেবের অধিকাংশ পুঁথিতে অন্য কবি বা গায়েনের ভণিতা থাকিলেও মূল কাহিনীর মধ্যে মোটামুটি সঙ্গতি আছে—অন্ততঃ বিজয়গুপ্তের পুঁথি অপেক্ষা তাঁহার পুঁথি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।[৫১]

নারায়ণদেবের প্রায় অধিকাংশ পুঁথিতে সংক্ষেপ আত্মজীবনী উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য এক পুঁথির সঙ্গে অন্য পুঁথির পাঠগত নানা বৈষম্য আছে। এই দেব-উপাধিক কায়স্থ-কবির পূর্বপুরুষের নিবাস রাঢ়দেশ; তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ উদ্ধারণদেব (উদ্ধবরাম) রাঢ়দেশ ছাড়িয়া ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পিতা নরসিংহ, মাতা রুক্মিণী। কবিরা কায়স্থ, মৌদ্‌গল্য গোত্র, গুণাকর গাঞি। কবির জন্মস্থান লইয়া একদা প্রচুর বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের তীরে বোরগ্রাম এখন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু একদা শ্রীহট্টবাসীরা

[৫১] শ্রীমতী সাধনা সেনগুপ্ত এম. এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নারায়ণদেবের যে পুঁথি সম্পাদনা করিতেছেন তাহাতে চারখানি পুঁথির সাহায্য লওয়া হইয়াছে—

১। পুঁথি সংখ্যা—৬৬৩৭; ময়মনসিংহে প্রাপ্ত; ১২১১ সালে অনুলিখিত। এই পুঁথিখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের হইলেও ইহাতে নারায়ণদেবের ভণিতা অনেক বেশি।

২। পুঁথি সংখ্যা—৩; ফটোস্টাট কপি; ১১০১ সনের অনুলিপি। ইহাতে বংশীদাসের বহু ভণিতা আছে।

৩। পুঁথি সংখ্যা—৬১০৮ (১২৮ মঘী সাল)

৪। পুঁথি সংখ্যা—৬৩২৪ (ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত প্রদত্ত পুঁথি)

দাবি করিয়াছিলেন যে, নারায়ণদেব শ্রীহট্টের অধিবাসী। কারণ বোরগ্রাম পূর্বে শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। ময়মনসিংহ-বাসীরা কিন্তু দাবিদাওয়া ত্যাগ করেন নাই। ১৩১৮ সনের রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কবিকে ময়মনসিংহবাসী প্রমাণের জন্য অনেক তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীহট্টবাসী বিরজাকান্ত ঘোষ ১৩১৯ সালের রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় নারায়ণদেবকে শ্রীহট্টের অধিবাসী প্রমাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৩২০ সনের 'সৌরভ' (মাঘ) পত্রিকায় রমানাথ চক্রবর্তী সতীশচন্দ্রকে সমর্থন করেন। অচ্যুতচরণ চৌধুরী 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে' কিন্তু কবিকে আসামবাসী বলিয়াই দাবি করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে বোরগ্রাম যদিও ময়মনসিংহের মধ্যে, কিন্তু উক্ত জেলার একপ্রান্তে অবস্থিত, ইহার চারিদিকেই জলাভূমির বিস্তার। বরং শ্রীহট্টের সঙ্গে ইহার অধিকতর যোগাযোগ। তাই নারায়ণদেবের অনেক পুঁথি আসামে প্রচার লাভ করিয়াছে। 'সুকবিবল্লভ নারায়ণ'—কবির এই নামটি আসামী লিপিকার ও গায়েনের হাতে পড়িয়া 'শুকনান্নি'-তে পরিণত হইয়াছে। আসামে 'শুকনান্নি'র পদ্মাপুরাণ বিশেষ জনপ্রিয় গ্রন্থ। এখনও আসাম হইতে এই পুঁথি মুদ্রিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, আধুনিক আসামী গবেষকেরা নারায়ণদেবকে আসামী বলিয়া দাবি করিয়াছেন। কিন্তু আসামী সংস্করণ ও বাংলা সংস্করণ যে একই নারায়ণদেবের রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে বাংলা অপেক্ষা আসামী সংস্করণ অনেক সংক্ষিপ্ত এবং আসামী-ভাষা-বৈশিষ্ট্য ও উচ্চারণে পূর্ণ।

নিম্নে নারায়ণদেবের বাংলা পুঁথি ও হেমচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত 'অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি' (Vol. II, Part II) হইতে আসামী ও বাঙালী নারায়ণদেবের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি (সাধনা সেনগুপ্ত সম্পাদিত) ॥

লখাই বোলে শুন প্রিয়া আমার বচন।
ভোজন করিতে ঝাটে চড়াও রন্ধন ॥
ক্ষুদায়ে প্রাণ দহে ধরাইতে না পারি।
বিলম্ব না কর প্রিয়া উঠ শীঘ্র করি ॥
লজ্জিত হইয়া বেউলা বলিল বচন।
তণ্ডুলাদি নাহি প্রভু করিতে রন্ধন।

॥ 'অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি'তে উদ্ধৃত ॥

লখাই বোলে শুন কন্যা আমার বচন।
ভোজন করিবো জাস্তে চরাও রন্ধন॥
ক্ষুধায়ে আকুল তনু ধরিতে না পারি।
বিলম্ব না কর কন্যা চল শীঘ্র করি॥
লজ্জা পাই বেহুলাই বুলিল বচন।
চাউল সাজ নাই আমি চরাইতে রন্ধন॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে দুই নারায়ণদেব একই ব্যক্তি। নারায়ণদেব ময়মনসিংহের বোরগ্রামের অধিবাসী, ঐ অঞ্চলে এখনও তাঁহাদের উত্তর-পুরুষের শাখা বর্তমান। জেলাপ্রীতিবশতঃ নারায়ণদেবকে যাঁহারা শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী জলসুখা পরগণার 'নগর' গ্রামে টানিয়া লইতে চাহেন, তাঁহারা বোরগ্রামকে তো অস্বীকার করতে পারেন না। তাই শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ, শ্যাম ও কুল, দুই-ই রাখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা প্রথমে নারায়ণদেবকে শ্রীহট্টে লইয়া যান ; তারপর, কোন কারণবশতঃ নারায়ণদেব বোরগ্রামে বাস্তু উঠাইয়া আনেন—এইরূপ একটা মীমাংসায় আসিবার চেষ্টা করেন।[৫২] কিন্তু এখন এ সমস্ত বাদানুবাদ অর্থহীন।

নারায়ণদেবের অনেক পুঁথিতে[৫৩] বহু গায়েন, লিপিকার বা কবির ভণিতা আছে। যথা—বংশীদাস, বিপ্রজগন্নাথ, জগন্নাথদাস, জানকীনাথ, শিবানন্দ, মনোহর, চন্দ্রধর প্রভৃতি। নারায়ণদেবের নিজস্ব ভণিতা প্রায়শঃই এইরূপ—'সুকবি বল্লভ হয় নারায়ণদেবে কয়' অথবা 'সুকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালী'। এইজন্য কেহ কেহ নারায়ণদেব ও কবিবল্লভকে পৃথক কবি মনে করেন। অবশ্য অধিকাংশ সমালোচকের মতে 'সুকবি-বল্লভ' বা 'কবি-বল্লভ' নারায়ণদেবের উপাধি—মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ' বা রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' বিরুদের মতো। আবার কেহ দেখাইয়াছেন যে, বল্লভঘোষ নামক মনসা-

---

৫২ অচ্যুতচরণ চৌধুরী—শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।

৫৩ কেদারনাথ মজুমদার 'ময়মনসিংহের বিবরণে' (১ম খণ্ড) নারায়ণদেবের যে পুঁথি হইতে উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নাকি কবির স্বহস্ত লিখিত এবং উহা কবির উত্তর-পুরুষদের নিকট ছিল। এ সমস্ত জল্পনা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। দ্রষ্টবা—রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮

মঙ্গলের আর এক কবির নাম পাওয়া গিয়াছে।[৫৪] বিখ্যাত নারায়ণদেবের সঙ্গে অখ্যাত বল্লভের ভণিতা মিশিয়াও যাইতে পারে। কিন্তু নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে ভণিতার যে-ভাবে উল্লেখ দেখা যাইতেছে, তাহাতে 'সুকবি-বল্লভ' বা 'কবি-বল্লভ' নারায়ণদেবের উপাধি বলিয়াই মনে হয়।

নারায়ণদেবের কাল লইয়াও অনুমানের অন্ত নাই। তাঁহার কোন পুঁথিতেই কালনির্ণয়ের কোন নির্দেশ বা আভাস নাই। অপেক্ষাকৃত নবীন পুঁথিগুলির ভাষাতেও প্রাচীনতার ধারা কিছু কিছু বর্তমান আছে—যাহা বিপ্রদাসের কাব্যে নাই বলিলেই চলে। 'নারায়ণদেবের বংশধরদের নিকট যে বংশতালিকা আছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, যাঁহারা এখন বর্তমান আছেন, তাঁহারা নারায়ণদেব হইতে অষ্টাদশ পুরুষ। সাধারণ হিসাবে প্রতি একশত বৎসরে চারপুরুষ ধরা হয়। এই হিসাব অনুসারে নারায়ণ-দেবকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে—যদিও বংশতালিকার হিসাব খুব নির্ভরযোগ্য নহে। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, কবি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি বিপ্রদাস-বিজয়গুপ্তের পূর্বে, সমকালে বা ঈষৎ পরে বর্তমান ছিলেন। অবশ্য এ অনুমানও পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তিনি বিজয়গুপ্তের সমকালে বা পরে কাব্যরচনা করিলে হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না। বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস—দুইজনেই হুসেনের নাম করিয়াছেন। নারায়ণদেব বিশেষভাবে পৌরাণিক মতের অনুকূলতা করিলেও মুসলমান সমাজের প্রতি অনুদারতা দেখান নাই। কাজেই তিনি যে জ্ঞাতসারে হুসেন শাহের নাম বাদ দিবেন, তাহা মনে হয় না। ফুল্লশ্রীর কবি হুসেনের নাম উল্লেখ করিতে পারিলে বোরগ্রামের কবির তাহা না করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?[৫৫] তবে তিনি যদি হুসেনের পূর্ববর্তী অথবা অনেক পরবর্তী হন তাহা হইলে গৌড়ের সুলতানের নাম না থাকিবার কারণ বুঝা যায়। "ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে সপ্তদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত ধরিলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম হয়"—ইহাও জোর করিয়া বলা যায় না। বিপ্রদাসের পুঁথিতে উল্লিখিত সনের কথা বাদ দিয়া

---

[৫৪] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

[৫৫] একটা বিস্ময়ের বিষয়, নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ত, নিজ নিজ রচনায় কেহ কাহারও উল্লেখ করেন নাই।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের পুঁথি

(পৃঃ ১১৮)

ভাষা বিচার করিলে দেখা যাইবে, নারায়ণদেবের পুঁথির ভাষাতে অধিকতর প্রাচীনত্ব রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং গৌণ প্রমাণের বলে তাঁহাকে বিপ্রদাসের পরবর্তী বলা যায় না। তাঁহার কাব্যে অনেক বৈষ্ণব ধুয়া আছে বলিয়া তাঁহাকে চৈতন্যযুগেও আনা যায় না। কারণ প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব দুর্লক্ষ্য নহে। সুতরাং নারায়ণদেবকে অনুমানের বলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা সামান্য পরে আবির্ভূত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নারায়ণদেবের গ্রন্থ নানা সময়ে মুদ্রিত হইয়াছে। বাংলা ১২৮৪ সনে শ্রীহট্ট হইতে ভৈরবচন্দ্র শর্মার সম্পাদনায় নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। তাহার ছয় বৎসর পরে ১২৯০ সনের পৌষ সংখ্যায় 'নব্যভারতে' নারায়ণদেব সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে কবিকে চৈতন্যদেবের ১৫২ বৎসর পরে আবির্ভূত বলা হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক এ সন-তারিখ কোথা হইতে পাইলেন, তাহা বলেন নাই। সুতরাং এই তারিখও নির্ভরযোগ্য নহে। কলিকাতার বেণীমাধব দে এবং ময়মনসিংহের চারুপ্রেসের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ দুইবার মুদ্রিত হয়। ইহার মধ্যে চারুপ্রেসের সংস্করণটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের সম্পাদনায় নারায়ণদেবের যে পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে।[৫৬] তাহাতে বিভিন্ন পুঁথির পাঠ উল্টাপাল্টা হইয়া গিয়াছে।

এবার নারায়ণদেবের কাব্য-পরিচয় লওয়া যাক। নারায়ণদেবের কাব্য আকারে অন্যান্য মনসামঙ্গলের তুলনায় রীতিমতো দীর্ঘ এবং দেবলীলার তুলনায় নরলীলা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। বস্তুতঃ, 'সুকবি-বল্লভ' সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যে অতিশয় অভিজ্ঞ ছিলেন। মহাভারত, শৈবপুরাণ ও কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে তিনি কাহিনী সংগ্রহ করিয়া মনসামঙ্গলের দেবখণ্ডটিকে পুরাণের আকার দিতে চাহিয়াছেন। কুমারসম্ভবের প্রভাবে রচিত তাঁহার 'রতিবিলাপ' অংশটুকু কবিতা হিসাবে অতীব প্রশংসনীয় :

---

[৫৬] সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শ্রীমতী সাধনা সেনগুপ্ত অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ সম্পাদনা করিতেছেন।

পতিশোকে রতি কান্দে লোটাইয়া ধরণী।
কেন হেন কর্ম কৈলা দেব শূলপাণি ।।
দেবের দেবতা তুমি ভুবনের পতি।
স্ত্রীবধ দিব আজি গলায় দিব কাতি ।।
সংসারেতে যত পুরুষ সব হইল নাশ।
স্ত্রীপুরুষে আর না পুরিব আশ ।।
দক্ষিণ সময় আর না পুরিব মন্দ।
পঙ্কজ ছাড়িয়া যাইব মকরন্দ ।।
কোকিল মধুর ধ্বনি না পুরিব হৃদয়।
মর প্রভু বিনে নাহি বসন্ত সময় ।। (সাধনা সেনগুপ্ত অবলম্বিত পাঠ)

হাস্য ও করুণরসে নারায়ণদেবের আশ্চর্য দখল ছিল; বিশেষতঃ ব্যঙ্গের তির্যকতা তাঁহার রচনার একটি উল্লেখযোগ্য গুণ।[৫৭] ডোমনীবেশিনী চণ্ডীর প্রতি মহাদেবের কামাসক্তি দেখিয়া দেবীর ব্যঙ্গোক্তি স্মরণীয় :

ডুমুনি বোলে দাড়ি পাকাইলা কি কারণ।
......নারীর উপরে এখনেহ মন ।।
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দিব্য পাকাবেল ।।
বৃদ্ধ হইলে পাইকের ভাবকী মাত্র সার।
তোমার মুখে চাহ আমাক বল করিবার ।। (ঐ পুঁথি)

কবি শাক্ত-মঙ্গলকাব্য লিখিলেও ধর্মমতে বৈষ্ণবানুকূল ছিলেন। প্রায় সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যেই এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়। (স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণ "শিশুকালে গোপরূপে হাতে লইয়া বাঁশী" কবিকে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন।) তাই কাব্যের নানাস্থানে ও ধুয়াতে বৈষ্ণব পদাবলীর ঝঙ্কার আছে :

বাপু ধীরে যাও পথ নিরীক্ষিয়া।
পাষাণ লাগিবে পদে পাষাণ ঠেকিয়া ।।

ইহাতো বৈষ্ণব পদের বাৎসল্য রসের সুর।

কবির রচনা যে বিশেষ গাঢ়বদ্ধ এবং ভাষা ও ছন্দে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়

---

৫৭ বণিক সম্বন্ধে একটা চমৎকার ব্যঙ্গোক্তি :—

কাক হস্তে সেআন জে বানিয়া ছাওয়াল।
বানিয়া হস্তে ধুত্ত জেই তারে দেই পান ।। (ক. বি. পুঁথি—৬১০৮)

রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ক্ষমানন্দের রচনাশক্তিও বিশেষ প্রশংসনীয়, কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণে সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ আছে, সেই পরিমাণে স্বতস্ফূর্ততা নাই। নারায়ণদেবের অতিদীর্ঘ কাহিনীটি সরস ও সাবলীল রচনার জন্য (পূর্ববঙ্গীয় ও শ্রীহট্টীয় বাক্‌রীতি সত্ত্বেও) পাঠে ক্লান্তিকর মনে হয় না। সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের জন্য ভাষা যে কিঞ্চিৎ গুরুভার বটে, তবে তাহা বাস্তবিক ভার হইয়া উঠে নাই। দুই একটি উক্তি উদ্ধৃতি করিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। অসহায় বেহুলার দেবতাদের প্রতি ক্ষীণকণ্ঠের ব্যর্থ অভিশাপ :

শাপ দিয়া বিধাতারে করোঁ। ভস্মরাশি।
বিধাতাকে কি দিম দোষ মুঞী কর্মদোষী ॥
... ...
উত্তর না দেহ প্রভু নাহি কর রাও।
মুঞী অভাগিনীর দিগে চক্ষু মেলি চাও ॥

অথবা স্বামীর মৃতদেহ সহ কলার ভেলায় অকূলে ভাসিয়া বেহুলার বিলাপ :

জাগ প্রভু কালিন্দী নিশাচরে।
ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে ॥
প্রভুরে তুমি আমি দুই জন।
জানে তবে সর্বজন ॥
তুমি তো আমার প্রভু আমি যে তোমার।
মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার ॥

প্রভৃতি উক্তিগুলি আর্তি ও বেদনায় অশ্রুসিক্ত হইয়া আধুনিক কালের পাঠকেরও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। পুত্রশোকাতুরা সনকার বিলাপও করুণ-রসের আকর।

হাস্যরসে নারায়ণদেবের কৃতিত্ব কিছু অল্প নহে। (বেহুলার বিবাহে সমাগত নারীগণের পতিনিন্দা এবং লখীন্দরকে দেখিয়া বৃদ্ধাগণের নির্লজ্জ কামাসক্তি প্রকাশের হাস্যকর বর্ণনা আধুনিক কালের পাঠক-সমাজের প্রীতিকর না হইলেও সে যুগের সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় ইহাকে অতিশয় নিন্দনীয় বলা যায় না। কেহ কেহ নারায়ণদেবের রুচির প্রশ্ন তুলিয়াছেন। গ্রন্থের বহুস্থলে নির্জলা কামাবেশের বর্ণনা আছে—প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে এরূপ বর্ণনা

খুবই সুলভ। তবে লখীন্দরের অপরিপক্ক বয়সে যেরূপ আদিরসের বাড়াবাড়ি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সে যুগে স্বাভাবিক হইলেও এখন কিঞ্চিৎ জুগুপ্‌সা-জনক মনে হইবে। 'বালা লখীন্দর' বিবাহ-বাসরেই যেরূপ পাকা-প্রেমিকের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে তাহাতে তাহাকে চৌষট্টি কলায় বিশেষ প্রবীণ বলিয়া মনে হয়।[৫৮] কেহ কেহ মনে করেন যে, কবি পুরাণের প্রভাবে উতরোল আদিরসের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যে অসম্ভব, তাহা নহে; কারণ সংস্কৃতে রচিত শিবপুরাণ প্রভৃতি শৈব গ্রন্থে যেরূপ ব্রীড়াজনক আদিরসের বর্ণনা আছে, তাহার দ্বারা একযুগের বিকৃত রুচি ও অবক্ষয়ী সমাজের শোচনীয় চিত্রই মসীবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু এই অপরাধে নারায়ণদেবকে পৃথক শাস্তি দিবার প্রয়োজন নাই। মধ্যযুগের বহু মঙ্গলকাব্যেই আদিরসের উদ্দাম বর্ণনা আছে। যে-বিপ্রদাস মোটামুটি সংযতভাবে আদিরসের চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনিও বেহুলার প্রতি কামশরাহত মহাদেবের যে ঘৃণ্য রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও কি রুচির মুখ রক্ষা হইয়াছে?[৫৯]

চরিত্রবিচার প্রসঙ্গে চাঁদ ও বেহুলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চাঁদ-চরিত্রেরও শেষরক্ষা হয় নাই বটে,[৬০] তবে অন্যান্য কবিদের তুলনায় নারায়ণদেব চাঁদ-চরিত্রে বীর্য, কঠোরতা ও কোমলভাবের সমন্বয় করিতে অধিকতর সমর্থ হইয়াছেন। বেহুলার চরিত্রটি অধিকতর সুচিত্রিত হইয়াছে। কুলবধূসুলভ কোমলতা এবং ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের মনোবল—এই উভয় গুণকে কবি আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে বাস্তবিক মহাকাব্যের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু যুগধর্মের জন্য তাহা

৫৮ উত্তরবঙ্গের তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গলে আছে যে, প্রথম বয়সে বিবাহের পূর্বে লখীন্দর মাতুলানী গমন করিয়াছিল। তাই তাহার পিতা চাঁদসদাগর তাড়াতাড়ি পুত্রের বিবাহের উদ্যোগী হন। বিহারে প্রচলিত কাহিনীতেও এই কুৎসিত ব্যাপারের উল্লেখ আছে। দ্রষ্টব্য: ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত *Vipradas's Manasavijaya*, Introduction, p. xxviii.

৫৯ Ibid, পৃ. ২১৭, ২২শ পালা।

৬০ চাঁদ বারবার 'কণ্ঠে থাকিতে না পূজি লঘু কানী' বলিলেও শেষ পর্যন্ত মহা আড়ম্বরে মনসা পূজা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি দক্ষিণহাতে পূজা না করিয়া "পিচ দিআ বাম হাতে তোমারে পূজিব" বলিয়াছেন।

ততটা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। মঙ্গলকাব্যকে *vock poesie* বলা না গেলেও[৬১] ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় এবং অ্যাংলো-স্যাকসন যুগের লোকসাহিত্যের যে সাদৃশ্য আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ কবি সংস্কৃতজ্ঞ হইলেও এ কাব্যের কাহিনী ও চরিত্রকে পুরাপুরি মহাকাব্যের রূপ দিতে পারেন নাই। নারায়ণদেব তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাহা হইলেও ক্ষমানন্দকে ছাড়িয়া দিলে নারায়ণদেবকে মনসামঙ্গলের একজন উৎকৃষ্ট কবি বলিতে হইবে।

———

[৬১] ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডের (পূর্বার্ধ) ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

বাঙলায় চণ্ডীপূজা ॥

মনসাপূজা ও মনসামঙ্গল কাব্যের মতো বাঙলাদেশে চণ্ডীপূজা, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ও ঘটস্থাপনা এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের (অভয়ামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, অন্নপূর্ণা-মঙ্গল, অম্বিকামঙ্গল নামেও পরিচিত) যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যাইবে। মনসাদেবীর পরিকল্পনা বিশেষ জটিল নহে। ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণ্যেতর সংস্কৃতির সূত্রটি অল্প আয়াসেই নির্ণয় করা যায়। কিন্তু বাঙলায় চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকার পূজা, ব্রত-নিয়ম, কাহিনী প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল ; কেহ কেহ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবীকে পুরাপুরি পৌরাণিক এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত মনে করেন। কেহ মনে করেন, তন্ত্রের মৌলিক তত্ত্বের সঙ্গে এই চণ্ডীর অধিকতর সাদৃশ্য আছে, কেহ-বা বৌদ্ধ দেবীকে চণ্ডীতত্ত্বের মূল মনে করেন। চণ্ডীর সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপালারও যোগাযোগ দেখা যায়। অনার্য কিরাত-সমাজের কোন দেবীর সঙ্গে চণ্ডীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আবিষ্কার কোন কোন সমালোচকের উদ্দেশ্য। কেহ চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ্য করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এত উপাদান ও পরস্পর-বিরোধী তথ্য পাওয়া গিয়াছে যে, নিশ্চয়তাসহ জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। বস্তুতঃ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পরিকল্পনায় নানা যুগে নানা লোকশ্রুতি, জীবনাদর্শ, গ্রামীণ প্রত্যয় ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, এখন পরিষ্কার করিয়া প্রায় কিছুই নির্ধারণ করা যায় না। সর্বোপরি আমাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা, রুচি ও ধর্ম-বিশ্বাস আমাদের বিচারবুদ্ধিকে কিছু অস্বচ্ছ করিয়া ফেলিয়াছে। যাঁহারা চণ্ডিকাকে শিবগৃহিণীরূপে দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা ইঁহাকে কিরাতের দেবী বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। যাঁহারা বাঙলার সংস্কৃতি ও অধিমানসের মধ্যে কেবলই 'প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড' সমাজতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে বদ্ধপরিকর,

তাঁহারা চণ্ডিকাকে অনার্য কিরাত-সমাজের দেবী বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। এইরূপ পরস্পর মত-বিরোধের ফলে চণ্ডিকার স্বরূপ লইয়া রীতিমতো দ্বিধার সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতীয় সাধনায় স্ত্রীদেবতার যে বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা অবৈদিক দ্রাবিড় সভ্যতা হইতেই গৃহীত হউক, আর যেখান হইতেই আসুক না কেন, প্রাচীন যুগ হইতেই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে একটি শক্তিময়ী নারীশক্তির পরিকল্পনা সমাজে ও সাধনায় গৃহীত হইয়াছিল। বেদে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্, রাত্রিসূক্ত, ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্র[১], কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতীর আখ্যান, সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে ভদ্রকালী, হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে ভবানী দেবী, শুক্ল যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা (ইনি রুদ্রের ভগিনী বলিয়া কথিত) তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রুদ্রের পত্নী ("তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং"), তৈত্তিরীয়ের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা-উপনিষদে দুর্গাগায়ত্রী মন্ত্র "কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ[২] প্রচোদয়াৎ" প্রভৃতি উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, বৈদিক ও উপনিষদের কালে সর্বশক্তিময়ী নারীদেবতার পরিকল্পনা সে যুগের আর্যসমাজে অজ্ঞাত ছিল না[৩], এবং শুধু বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক সংস্কৃতিতে নহে,—বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেও এইরূপ দেবী-পরিকল্পনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ডক্টর বিনয়-তোষ ভট্টাচার্য রচিত *Introduction to Buddhist Esotericism* ও সম্পাদিত *Sadhanmala* গ্রন্থে বহু বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর উল্লেখ আছে। হিন্দুর দশমহাবিদ্যা (কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী,

১ ঋগ্বেদে বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অগ্নিদুর্গার উল্লেখ আছে।

২ সায়নাচার্যের মতে দুর্গি ও দুর্গার মধ্যে ভেদ নাই।

৩ কেহ কেহ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অরণ্যানী দেবীকে বাংলা চণ্ডীমঙ্গলের উৎস বলিতে চাহেন। ঐ মণ্ডলের ১৪৬ সূক্তে দেবীকে "মৃগাণাং মাতরম্" বলা হইয়াছে। ব্যাধের দেবী চণ্ডীর সঙ্গে পশুজননী বৈদিক অরণ্যানী দেবীর ভাব-ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, "অরণ্যানীই বহু শত শতাব্দীর পথ বাহিয়া নানা কবি-কল্পনার রঙে ডুবিয়া ও নানা লোকভাবনার পাকে জড়াইয়া পুরাণো বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবী মঙ্গলচণ্ডী রূপে দেখা দিয়াছিলেন।" (ডঃ সুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ) কিন্তু এই অনুমান প্রমাণ করিবার মতো উপাদানসমূহ এখনও হস্তগত হয় নাই।

বগলা, মাতঙ্গী, কমলা), উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী, তারা—এ সমস্তই বৌদ্ধ দেবী। বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তিও পাঁচটি দেবী—লোচনা, যামকী, পাণ্ডারা, আর্যতারা ও বজ্রধাত্রেশ্বরী। জাপানে 'সপ্তকোটি বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টী দেবী' নাম্নী যে দেবী পূজিতা হন, তিনি অনেকটা চণ্ডীর মতো, কারণ জাপানী চনষ্টী ও সংস্কৃত চণ্ডী একার্থবাচী। বৌদ্ধদের দেবী মারীচিও দশভুজা। 'মহাবস্তু'-তে আছে যে, বুদ্ধদেব অভয়াদেবীর পদবন্দনা করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনিই চণ্ডিকা। বাঙলা-দেশের চণ্ডীমঙ্গল অভয়ামঙ্গল নামে পরিচিত, একথাও স্মরণযোগ্য। চীনের ক্যাণ্টন শহরে বৌদ্ধ মন্দিরে শতভুজা দেবীমূর্তি আছে। জৈনগণ দেবী সরস্বতীকে শুধু কলাবিদ্যার দেবী বলিয়া শ্রদ্ধা করেন না, তাঁহাকে বিশ্বরূপিণী ও সর্বশক্তিময়ী বলিয়াও শ্রদ্ধা করেন।

মহাভারতের যুগে দেবীদুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষাসুর-বিনাশিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এমন কি দেবীর নামের বিকল্প হিসাবে কুমারী, কালী, কপালী, মহাকালী, চণ্ডী, কান্তারবাসিনী প্রভৃতি নামগুলিও মহাভারতে আছে। অবশ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণেই (১৩শ অধ্যায়) চণ্ডীর সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে পার্জিটারের সম্পাদনায় চণ্ডীর অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চণ্ডী রচনার কাল নির্ধারিত হইয়াছে। দশম শতাব্দীর পূর্বেই চণ্ডীদেবীর প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর নাগার্জুনী গুহার এক শিলালিপিতে 'মহিষাসুর-মস্তকে পদদ্বয় স্থাপনকারিণী' দেবীর উল্লেখ আছে। বারাহীতন্ত্র, স্কন্দপুরাণ, দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, বামনপুরাণ, বৃহৎ নন্দিকেশ্বরপুরাণ প্রভৃতিতে চণ্ডীর বিশেষ উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'শক, মৌর্য, কোলাবিধ্বংসী' প্রভৃতি শব্দের জন্য ইহাকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী বা তাহারও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়। সুরথ রাজা, মেধস্ মুনি ও সমাধি বৈশ্যের গল্প অবলম্বনে রচিত চণ্ডীকথা বাঙলা দেশেও সুপরিচিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে বাঙলায় প্রস্তরে নির্মিত অষ্টভুজা বা চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি পাওয়া যাইতেছে। মূর্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি পুরাপুরি দুর্গামূর্তি। ত্রিপুরার দেউলবাড়ীতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি, দিনাজপুরের মঙ্গলবাড়ীতে প্রাপ্ত চতুর্ভুজা প্রস্তরমূর্তি, উত্তর-বাঙলায় প্রাপ্ত দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিভুজা

চণ্ডীর প্রাচীন মূর্তি (একাদশ শতাব্দী)

(পদতলে গোধিকা) (পৃঃ ১২৭)

দেবীমূর্তি [৪] প্রভৃতি মূর্তিগুলির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এগুলির প্রায় সমস্তই দুর্গামূর্তির অংশীভূত। কারণ ইহাতে গণেশ, শিব, এবং কার্তিকেয় মূর্তি আছে। কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত দ্বাদশ শতাব্দীর মূর্তিটিতে গোধিকার মূর্তি আছে বলিয়া ইহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। হর-পার্বতীর দুর্গা ও চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর একীভূত হইয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত এই মূর্তিটিতে পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীমূর্তির বিশেষভাবে পরিকল্পনাও কয়েকটি পাষাণ মূর্তিতে লক্ষ্য করা যায়। একাদশ শতাব্দীর একটি চণ্ডীমূর্তি রাজশাহীর মান্দোয়েল হইতে পাওয়া গিয়াছে; দুঃখের বিষয় ইহাতে গোধিকাটি নাই। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে যে চণ্ডীমূর্তিটি নির্মিত হইয়াছিল, তাহাতে সিংহের সঙ্গে গজলক্ষ্মীর মতো দুইটি হস্তীও আছে। ইহা ছাড়া কোন কোন মহিষমর্দিনীর পদতলে 'শ্রীমাসিক চণ্ডী' উৎকীর্ণ আছে। এই সমস্ত মূর্তির উল্লেখ হইতে উপলব্ধি হইবে যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশে দুর্গা ও চণ্ডীর পূজা-অর্চনা সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এমন কি, কোন কোন মূর্তিতে চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-উপাখ্যানের স্বর্ণ-গোধিকাও আছে। চণ্ডী ও দুর্গা পৃথক দেবী হইলেও ক্রমে ক্রমে এই দুই দেবীই পুরাণে ও সাহিত্যে এক হইয়া গিয়াছিলেন; বাঙলাদেশে দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইবে। তাই চণ্ডীমঙ্গলে যে চণ্ডীর পরিকল্পনা দেখা যায়, তাহাতে যুগপৎ দেবী দুর্গা এবং স্বর্ণগোধিকা-লাঞ্ছিতা চণ্ডী—উভয়েরই সমন্বয় ঘটিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলে যে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা নামক মেয়েলী ব্রতের প্রভাব রহিয়াছে, তাহাতে শুধু পৌরাণিক ভাবধারা স্বীকৃত হয় নাই। বাঙলাদেশে আর্যসমাজ বহির্ভূত যে সমস্ত কৃত্য, আচার ও কালট্ বা উপসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে চণ্ডী-সম্প্রদায় বা 'চণ্ডী কালট্'-এর উল্লেখ করা কর্তব্য। মনসা-সম্প্রদায়ের মতোই সারা বাঙলাদেশে একদা এই চণ্ডী-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। এখন কথা হইতেছে, এই চণ্ডী-সম্প্রদায় কি ব্রাহ্মণ্যশাখাভুক্ত শৈব-সৌর-শাক্তের মতো কোন সম্প্রদায়, অথবা মনসা-সম্প্রদায়ের মতো একটি আর্যেতর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোন লোক-সম্প্রদায়—তাহা লইয়া নানা মতভেদ

এই মূর্তির পাদদেশে বামদিকে একটি উর্ধ্বমুখী গোধিকার মূর্তি আছে। সুতরাং দেবীর সঙ্গে গোধিকার সম্পর্ক অন্ততঃ দ্বাদশ শতাব্দী বা তাহার পূর্বেও পাওয়া যাইতেছে। (চিত্র দ্রষ্টব্য)

দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ বলেন 'চণ্ডী' শব্দটি দ্রাবিড ; পরবর্তী কালে সংস্কৃতে-প্রবেশ করিয়া আর্য হইয়া গিয়াছে।[৫] এখনও আদি-অস্ট্রালয়েড আদিবাসী এবং ছোট নাগপুরের ওঁরাও উপজাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নাম্নী এক দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। ইঁহার প্রসন্নতা লাভ করিলে শিকারে সফল হওয়া যায়। ওরাও-সমাজ প্রস্তরখণ্ডে দেবীর রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করে, নিজেদের কাছে দেবীর চিহ্নিত প্রস্তর রাখে—তাহাতে নাকি শিকারে সিদ্ধকাম হওয়া যায়। উৎসবের দিন ওরাও যুবকগণ ছাগবলি দিয়া চাণ্ডীর পূজা করে এবং সেই মাংস রাঁধিয়া সকলে ভোজন করে। ছোটনাগপুরের আর একটি উপজাতি শিকারের দেবী চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গার পূজা করিয়া থাকে এবং দেবীর নিকট মোরগ বলি দেয়। পালামৌ জেলার করোয়া উপজাতির মধ্যে চাণ্ডীদেবীর পূজা প্রচলিত আছে[৬]।

অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আদিবাসীদের 'চাণ্ডী' আসলে 'চান্দী'। ইংরাজীতে Chandi লেখা হয়, বাংলা উচ্চারণে ভুল করিয়া 'চাণ্ডী' বলা হইয়াছে। আদিবাসীদের Chandi বা চান্দীর সঙ্গে বাঙলার চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর কোন সম্পর্ক নাই।[৭] অর্থাৎ এই মতাবলম্বীরা চণ্ডীকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য-দেবী প্রমাণের জন্য অনার্যস্পর্শদোষ বর্জিত দেবীর পরিকল্পনায় Chandi-কে চান্দীরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন। কিন্তু এই Chandi-র যথার্থ উচ্চারণ চাণ্ডী ; চন্দী বা চান্দী নহে। ছোটনাগপুরের উপজাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ শরৎচন্দ্র রায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩৪৫, ৪র্থ সংখ্যা) 'ভারতের মানব ও মানব সমাজ' প্রবন্ধে "চাণ্ডী" দেবীর কথাই বলিয়াছেন, চান্দী নহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ছোটনাগপুরের উপজাতি সমাজে অদ্যাপি চাণ্ডী নাম্নী শিকারের দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর সঙ্গে ওঁরাও বা অন্যান্য উপজাতির চণ্ডীর কোন সম্পর্ক আছে কিনা বিবেচ্য। প্রাচীন পুরাণে (দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, মার্কণ্ডেয়

[৫] অবশ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতো প্রাচীন গ্রন্থেও চণ্ডীর নাম পাওয়া যাইতেছে।

[৬] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' বিস্তৃততর আলোচনা দ্রষ্টব্য (তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৩০-৩১)।

[৭] সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত', ভূমিকা, পৃ. ২।/০।

পুরাণ, হরিবংশ) এই দেবী চণ্ডী নামে উল্লিখিত হইলেও ইনি যে ব্যাধ ও অনার্যের দেবী, একথা মানিয়া লইতে কেহ কেহ সঙ্কোচ বোধ করেন। আদিবাসী উপজাতি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা এবং অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীনতাই দেবীর অনার্য-সংস্পর্শকে আমাদের বিব্রত করিয়া তোলে। প্রাচীন গ্রন্থে দেবীমূর্তি বর্ণনায় গোধার উল্লেখ দেখা যায়। মণ্ডন সূত্রধার রচিত 'রূপমণ্ডন' নামক প্রতিমা-নির্মাণ গ্রন্থে দেবীকে "গোধাসনা ভবেদ্ গৌরী লীলয়া হংসবাহনা" বলা হইয়াছে।[৮] পঞ্চম শতাব্দীতে এক গুহাগাত্রে অষ্টাদশভুজার যে মূর্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে দেবীর দুই হস্তে দুইটি গোধার (গোসাপ) মূর্তিও আছে।[৯] এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দুর্গা, চণ্ডী ও গোধিকাবাহিনী চণ্ডী—মূলে ইঁহারা পৃথক থাকিলেও এবং পরবর্তী কালে বাঙলাদেশের শিষ্ট সমাজে দেবী দশভুজার পূজা চলিলেও,[১০] গোধিকা লাঞ্ছনাধারিণী কালকেতু-ধনপতির উপাস্য দেবীর মহিমা-বিষয়ক মেয়েলি ব্রতকথা-ছড়ায় মঙ্গলচণ্ডীর কথা বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের লোকসাহিত্য ও লোকধর্মে নানা উপধর্মের এমন সমন্বয়-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, কাহার কোন্ মতটি কতটুকু গৃহীত হইয়াছে, কতটুকুই-বা বর্জিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। কেহ কেহ বাশুলী, গজলক্ষ্মী প্রভৃতিকেও মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে এক করিয়া ফেলিতে চাহেন। বাশুলীদেবী সম্ভবতঃ 'বজ্র ধাত্রেশ্বরী' দেবীর অপভ্রংশ। কেহ বা বজ্রতারা, বজ্রশারদা, নীলতারা, জাঙ্গুলিতারা প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবীর সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর দেবীর সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। অবশ্য চণ্ডীর সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মমতের যোগ থাকা কিছু অসম্ভব নহে। মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথিতে গোড়ার দিকে চণ্ডীর উৎপত্তি[১১] ও শিবের সঙ্গে বিবাহের ব্যাপার পুরাপুরি ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপত্তন পালার অনুরূপ।[১২]

---

[৮] Pandit Gopinath Rao—*Elements of Hindu Iconography* (Vol. I, Part II).

[৯] ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৪৮৬ (পাদটীকা)

[১০] বাঙলাদেশে নাকি কংসনারায়ণ দশভুজার পূজা প্রচলিত করেন। কিন্তু পূর্ববর্তী স্মৃতিকার শূলপাণির 'দুর্গোৎসব বিবেকে' দুর্গাপূজার বর্ণনা আছে।

[১১] পরে মাণিকদত্তের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[১২] কেহ কেহ মনে করেন যে, ধর্মমঙ্গল ও বৌদ্ধধর্মের আদ্যাদেবী ক্রমশঃ চণ্ডী ও শিবের গৃহিণীতে পরিণত হইয়াছেন। দ্রষ্টব্য: চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণের ভূমিকা।

'সাধনমালা'য় বজ্রধাত্রেশ্বরীর যে বর্ণনা আছে, তাহার সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর রেখায় রেখায় মিল না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে গুণগত আত্মীয়তা আবিষ্কার দুরূহ নহে। কেহ-বা বিশুদ্ধ তন্ত্র হইতে মঙ্গলচণ্ডীর উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন।[১৩] এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছি। বাঙলাদেশে তন্ত্রোক্ত দেবীর প্রভাবে অথবা মার্কণ্ডেয় পুরাণের আদর্শে কিছু কিছু কাব্য রচিত হইয়াছিল বটে (দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল প্রভৃতি), কিন্তু তাহার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর বিশেষ কোন যোগাযোগ নাই; কেবল দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে মঙ্গলাসুরের সঙ্গে চণ্ডীর যে সংঘর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পুরাপুরি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ছাঁচে রচিত।[১৪] বাঙলাদেশে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা ধরণের পুঁথি এখনও সুপ্রচলিত আছে, মনসার ব্রতকথার পুঁথির মতো লোপ পায় নাই।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা-অর্চনা বাঙলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে অল্পবিস্তর উল্লেখ আছে। কালিকা পুরাণে "পটেষু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্"—অর্থাৎ পট, প্রতিমা অথবা ঘটস্থাপন করিয়া মঙ্গলচণ্ডিকার পূজার উল্লেখ থাকিলেও পটে ও প্রতিমায় সাধারণতঃ পৌরাণিক মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর উপাসনা হয় এবং ঘট স্থাপন করিয়া পুরমহিলারা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করেন। বাঙলাদেশের একখানি অর্বাচীন পুরাণ 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে' কালকেতুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়:

ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডীকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতি বমন্তী ॥

অনু: আপনি সুবর্ণগোধিকা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কালকেতুকে বর দিয়াছেন, আপনি শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি মাতঙ্গ ভোজন ও উদ্‌গীরণ করতঃ কমলে-কামিনী রূপে শ্রীমন্ত সদাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালবাহনরাজার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। (পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত)

এখানে বৃহদ্ধর্মপুরাণে কালকেতু ও ধনপতি সদাগর—উভয়ের গল্পের ইঙ্গিত রহিয়াছে। অবশ্য তাহার জন্য কাহিনীকে অত্যন্ত পুরাতন মনে

[১৩] সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, পৃ. ১৮৶—১৮৮০

[১৪] ভবানীদাসের 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা'য় বলা হইয়াছে যে, দেবী মঙ্গলাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া 'মঙ্গলচণ্ডী' নাম লাভ করিয়াছিলেন।

করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ বৃহদ্ধর্মপুরাণের প্রাচীনতা কেহ স্বীকার করেন না। লিপিকার ও পণ্ডিত মহাশয়দের কৃপায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও হাল আমলের ব্যাপার অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। কাজেই বৃহদ্ধর্মপুরাণে বাংলা মঙ্গলকাব্যের কাহিনীটি স্থান করিয়া লইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর বিস্তারিত উল্লেখ থাকিলেও [১৫] কালকেতু বা ধনপতির কোন ইঙ্গিত নাই। তবে একথা ঠিক যে, মঙ্গলচণ্ডী মূলতঃ নারীসমাজের দেবতা ('যোষিতামিষ্ট-দেবতা'—স্ত্রীলোকের ইষ্ট দেবতা)। প্রথমে তিনি ব্যাধসমাজে পূজিত হইয়াছিলেন, তাই দেবী 'কান্তারবাসিনী', 'বিন্ধ্যবাসিনী' প্রভৃতি নামে পরিকীর্তিত। পরে সমাজমুখ্য বণিকশ্রেণীতে দেবীর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা দেখিয়া মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে বাঙলার সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাই মনে পড়ে।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ॥

প্রায় সমস্ত চণ্ডীমঙ্গলেই দুইটি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়—আক্ষেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড। প্রথমটিতে কালকেতুর আখ্যান এবং দ্বিতীয়টিতে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের গল্প বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মনসা মঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে যেমন একটা ঐক্য আছে, চণ্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন কাব্যে সেরূপ কোন ঐকমত্য নাই, এবং সেইজন্য শিল্পবিচারে মনসামঙ্গল অধিকতর সার্থক হইয়াছে। এবিষয়ে কিন্তু মতভেদের অবকাশ আছে। মনসামঙ্গলের কাহিনীগুলি সর্বত্র একই আদর্শ অনুসরণ করে নাই। বিপ্রদাস ও নারায়ণ-দেবের কাব্যের কাহিনী এক নহে। বিপ্রদাসে পৌরাণিক প্রভাব অল্প, অপরদিকে নারায়ণদেবে অর্ধেকেরও বেশি অংশ পৌরাণিক আখ্যানে পূর্ণ। কেতকাদাস, বিজয়গুপ্ত, বংশীদাস চক্রবর্তী—ইঁহাদের কাহিনীর মধ্যে মোটামুটি ঐক্য থাকিলেও পার্থক্যও বড় অল্প নাই। কারণ অঞ্চলভেদে কাহিনীর অল্পবিস্তর পরিবর্তন হইতে পারে।[১৬] তেমনি নানা কবির অবলম্বিত মণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর মধ্যেও অল্পাধিক নূতনত্ব, বৈচিত্র্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন দ্বিজমাধবের মঙ্গলাসুরের আখ্যান;

---

[১৫] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড

[১৬] ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত *Vipradas's Manasavijaya*-এর ভূমিকায় বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে।

অনেক কবি এ আখ্যান বাদ দিয়াছেন। সেইরূপ মাণিকদত্ত তাঁহার কাব্যের প্রথম দিকে ধর্মমঙ্গলের আদর্শ অনুযায়ী সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু নানা উপকাহিনী ও অপ্রধান বর্ণনায় পার্থক্য থাকিলেও কালকেতু ও ধনপতির মূল কাহিনী মোটামুটি একই ধারা অনুসরণ করিয়াছে।

প্রথম কাহিনীটির কথা ধরা যাক। ব্যাধ কালকেতুকে দেবী চণ্ডী দয়া করিলেন, 'হিংসক রাঢ়' পশুশিকারীও দেবীর কৃপালাভ করিয়া গুজরাট নগর পত্তন করিল। অবশ্য কালকেতু ও ফুল্লরা যথার্থ ব্যাধ নহে—শাপভ্রষ্ট দেব-দেবী। ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বর ও তাহার পত্নী ছায়া ব্যাধের ঘরে কালকেতু ও ফুল্লরা রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। এখানে লক্ষণীয় যে, অস্পৃশ্য ব্যাধ-জাতিকে দেবী করুণা করিয়াছেন; এইজন্য কেহ কেহ বলেন—এই চণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডী নহেন—কোন অনার্য দেবী, পরে ইনি পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। প্রাচীন পাষাণ-মূর্তিতে দেবীর বাহন গোধিকা আছে এবং অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণে কালকেতু-ধনপতির কাহিনীর সামান্য উল্লেখ আছে। এই প্রমাণের বলে আখ্যানটিকে খুব প্রাচীন বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, "দুইরূপ দুর্গারই নামান্তর চণ্ডী ছিল। প্রথম দুর্গার বেলায় চণ্ড-বিনাশিনী বলিয়া চণ্ডী নাম খুব সার্থক। দ্বিতীয় দুর্গা অভয়া ও জীবধাত্রী বলিয়া তাঁহার নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী।"[১৭] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণই এই সিদ্ধান্তের মূল উৎস। সেখানে "শুভে মঙ্গলদক্ষে চ শুভে মঙ্গলচণ্ডিকে" এবং "মঙ্গলাধিষ্ঠাত্রী দেবি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে" প্রভৃতি উক্তির দ্বারা দেবীর কল্যাণীরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। কালকেতু আখ্যানে কল্যাণী দেবী কালকেতুকে বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং কলিঙ্গরাজকে শাস্তি দিয়া কালকেতুর প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কাহিনী ধনপতির আখ্যানে দেবীর এই স্নেহপরবশ মূর্তিটি অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। খুল্লনার দুঃখে দেবীর দয়া এবং শ্রীমন্তকে রক্ষার জন্য অনুচরসহ সিংহল রাজ্যে উৎপাত-উৎপীড়ন সৃষ্টিতে দেবীর কৃপাময়ী মূর্তিই প্রকাশ পাইয়াছে। মনসামঙ্গলে মনসার মধ্যে যে বাৎসল্য-রসের একান্ত অভাব দেখা যায়, তাহাই চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর মধ্যে প্রচুর পাওয়া যায়।

[১৭] ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ডের পূর্বার্ধ (পৃঃ ৪৮৭) দ্রষ্টব্য।

এইজন্য কেহ কেহ মনসার তুলনায় চণ্ডীর পরিকল্পনাকে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলিয়াছেন। তবে ইতিপূর্বে আমরা মনসা ও চণ্ডীর যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে চণ্ডীকে মনসা অপেক্ষা নবীনতর বলিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বরং চণ্ডী আখ্যানটি মনসা অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়, পুরাতন লিপিলেখন ও সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে উল্লেখ হইতে তাহাই অনুমান হয়।

মনসামঙ্গলের মতো চণ্ডীমঙ্গলেও দেব খণ্ড, আক্ষেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড—এই তিনটি অংশ দেখা যায়। দেব খণ্ডে যথারীতি হরপার্বতীর দাম্পত্য-জীবনের চিত্র আছে। দেবী নিজ পূজা প্রচারের জন্য স্বর্গ হইতে ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বরকে মর্ত্যলোকে কালকেতুরূপে প্রেরণ করিলেন—এই স্থান হইতে মর্ত্য-কাহিনীর আরম্ভ। তাহার পরবর্তী আখ্যায়িকায় স্বর্গের নর্তকী রত্নমালাকে অভিশাপগ্রস্ত হইয়া খুল্লনারূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। এই স্থান হইতে কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভ। অবশ্য কোন কোন চণ্ডীমঙ্গলে হরপার্বতীর লীলা আদৌ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয় নাই—যেমন দ্বিজ-মাধবের কাব্য। সেখানে দেবী কর্তৃক মঙ্গলাসুর বধ এবং মঙ্গলচণ্ডী নামগ্রহণ, তার পরেই দেবীর মর্ত্যে পূজা প্রচারের উদ্যোগ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম আখ্যানের নাম আক্ষেটিক বা আখেটিক খণ্ড। কারণ এই অংশে আক্ষেটিক (ব্যাধ) কালকেতুর দেবী-কৃপালাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশেই দেবীকে অনার্যের দেবী বলিয়া মনে হয়। মনসামঙ্গলে হাসান-হুসেনের পালাটি কালকেতুর পালার মতো বিস্তারিত ও স্বতন্ত্র পালারূপে রচিত হইতে পারিত। বিপ্রদাস কতকটা সেইরূপ চেষ্টাও করিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, ক্ষমানন্দ সকলেই হাসান-হুসেনের পালা কিছুটা বর্ণনা করিলেও এই বিষয়ে পৃথক কোন দীর্ঘ কাহিনীর বিবরণ দেন নাই। কিন্তু বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়ে' হাসান-হুসেনের পালা কিয়দংশে কালকেতুর পালার মতো দৈর্ঘ্য ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। মনসামঙ্গলে যেমন মনসাকে প্রথমে নিম্নসমাজে প্রাধান্য লাভ করিতে হইয়াছিল, সেইরূপ চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীকেও প্রথমে ব্যাধের সমাজে পূজা লাভ করিতে হইয়াছে। অবশ্য ব্যাধ বলিয়া সঙ্কুচিত হইবার কারণ নাই। মহাদেবও কিরাতবেশ ধারণ করিয়া অর্জুনকে ছলনা করিতে গিয়াছিলেন। দেবীর অপর নাম 'কান্তারবাসিনী' বলিয়া তাঁহাকে কোন পার্বত্য ব্যাধ জাতির দেবতা বলিয়া মনে হইতেছে।

ধনপতির কাহিনীতে যে আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা মনসা-মঙ্গলের চাঁদসদাগরের অনুরূপ। চাঁদের শিবোপাসনা এবং স্ত্রীদেবতাপূজায় আপত্তি, গোপনে সনকার মনসাপূজা, ক্রোধের বশে চাঁদ কর্তৃক দেবীর অমর্যাদা এবং তাহার ফলে দারুণ বিপর্যয়—এ সমস্তই চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়া যায়। ধনপতিও শৈব, সে-ও চণ্ডীর ঘট পা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল; এই জন্য কালীদহে তাহাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। অবশ্য তাহার পুত্র দেবীর ভক্ত শ্রীমন্তের জন্যই সে রক্ষা পাইয়াছে এবং পরিশেষে দেবীর দেউল নির্মাণ করিয়াছে। বণিক-সমাজে মনসাপূজার প্রথম প্রবেশ ঘটিল সনকার দ্বারা। চণ্ডীও বণিক-সমাজে প্রবেশ করিলেন খুল্লনার দ্বারা। মনসামঙ্গলের সনকা এবং চণ্ডীমঙ্গলের খুল্লনাই সর্বপ্রথম দেবীদের অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের খুল্লনার মধ্যে সনকা ও বেহুলা একচরিত্রে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যের ভদ্র সমাজে প্রথম অধিষ্ঠান হইয়াছে অন্তঃপুরে—স্ত্রীমণ্ডলে। ইহাতে মনে হয় সমাজের উচ্চস্তর বণিকশ্রেণীতে যখন শৈবমত প্রচারলাভ করিয়াছিল, তখনও তলে তলে অন্তঃপুরে চণ্ডীপূজা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দেবী চণ্ডিকা যেমন স্বামীর পূজা দর্শনে ঈর্ষাতুর হইয়া নিজ পূজা প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তেমনি মনসাও পিতার পূজা দেখিয়া ছলে বলে কৌশলে নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজেই চণ্ডীমঙ্গল ও মনসা-মঙ্গলের কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে মাঝে মাঝে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কে কাহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনায় যে অপেক্ষাকৃত মার্জিত হাতের স্পর্শ আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।[১৮] মনসা চরিত্রে কোথাও কোমল ভাব নাই; কিন্তু চণ্ডী চরিত্রে অনেক স্থলে কোমল বাৎসল্যরসের প্রকাশ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-মতের প্রভাবে দেবীচরিত্রে মানবীয় কোমলতা ও স্নেহবাৎসল্যের স্পর্শ

[১৮] মনসার কাহিনী বা মনসাদেবীর পরিকল্পনা প্রাচীনতর হইতে পারে, কিন্তু দেবীর মুসলমান সমাজে পূজা লাভের ইচ্ছা এবং হাসান-হুসেনের পালা-বর্ণনায় কাহিনীতে অর্বাচীন কালের হস্তক্ষেপ সূচিত হইতেছে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ, বিশেষতঃ মুকুন্দরাম, কালকেতুর নগরপত্তন প্রসঙ্গে মুসলমান-সমাজের বিস্তারিত উল্লেখ করিলেও দেবী মুসলমানের পূজা গ্রহণে সমুৎসুক, কোথাও এরূপ বর্ণনা নাই।

লাগিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য কেহ কেহ চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীকে মনসা অপেক্ষা নবীনতর বলিতে চাহেন।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি

একদা চণ্ডীমঙ্গল ব্রত-উপাসনা ও কাব্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের কিছু পূর্ব হইতেই সাধারণ-সমাজে মঙ্গলচণ্ডীর গীতকথা, পাঁচালী ও ব্রতকথা যে কতদূর জনপ্রিয় ছিল তাহা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত হইতেই জানা যায়।

ধর্মকর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥

সকলে রাত্রি জাগিয়া চণ্ডীর গীত গাহিত। মঙ্গলচণ্ডীর উপাসকগণের আর্থিক অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না :

দেখ এই চণ্ডীবিষহরীরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে যত নাগরিয়া॥

সুতরাং বৈষ্ণবপ্রভাবের পূর্বে সাধারণ সমাজে চণ্ডী ও বিষহরীর (মনসা) পূজার্চনার বিশেষ প্রভাব ছিল। প্রভাবের অর্থ—উক্ত ধর্মানুকূল 'কাল্ট্' বা উপসম্প্রদায় ছিল, এবং 'কাল্ট' থাকিলে তাহার সাহিত্যও থাকিবে। মঙ্গল-চণ্ডীর গীত গোড়ার দিকে মেয়েলি ব্রতকথা বা ব্যালাড ধরণের গ্রাম্য সাহিত্য ছিল বলিয়া মনে হয়। মনসামঙ্গলের ব্রতকথার রূপটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের ব্রতকথা এখনও এদেশে চলে, ফলে ছাপাখানা হইতে শনি ও মঙ্গলচণ্ডীর বহু অর্বাচীন পাঁচালী নিত্যই প্রকাশিত হইতেছে। ভবানীশঙ্কর দাসের 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা'[১৯] ১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও ইহাকে পাঁচালী বলা যায় না—ইহাতে মঙ্গলকাব্যের ধারাই অনুসৃত হইয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে চৈতন্যযুগের চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মাণিকদত্ত॥

কানা হরিদত্তকে যেমন মনসামঙ্গলের আদি কবি বলা হয়, তেমনি মাণিক-দত্তও চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি বলিয়া পরিচিত। অবশ্য কানা হরিদত্ত রচিত

[১৯] রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত।

কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু মাণিকদত্ত রচিত, নামাঙ্কিত বা ভণিতাযুক্ত দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালায় (পুঁথি সংখ্যা—৬১৮৫) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (পুঁ সং ২০৮) পুঁথি-শালায় এই পুঁথি দুইখানি আছে। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলের দুই স্থানে পূর্ববর্তী কবি মাণিকদত্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছেন :

মাণিকদত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়॥ (বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ৬)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত মুকুন্দরামের একখানি অতি পুরাতন পুঁথিতে এই মাণিকদত্তের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে :

আদ্য কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস।
মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ॥
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।
বিনয় করিয়া কবিকঙ্কণে কয়॥ (সাহিত্য পরিষদ পুঁথি—৩২)

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম খণ্ডে মাণিকদত্তের সশ্রদ্ধ উল্লেখ লক্ষ্য করা যাইবে :

জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালিদাস।
কর জুড়ি বন্দিব পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥
মাণিকদত্তকে করিয়ে পরিহার॥
বড়ু সর্বানন্দকে করিল নমস্কার॥

অবশ্য সমস্ত পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থে এই শ্লোক পাওয়া যাইতেছে না। সে যাহা হোক, মাণিকদত্তের এই উল্লেখ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এই নামীয় কোন কবি মুকুন্দরামের পূর্বে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন এবং মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

মঙ্গলকাব্যের আদি কবি সম্বন্ধে নানা সংশয় আছে। কানা হরিদত্তের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট সম্বন্ধেও বিশেষ সংশয় আছে।[২০] মাণিকদত্ত সম্বন্ধে যে নিঃসংশয় হওয়া গিয়াছে তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। মালদহ অঞ্চল হইতে মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির (একখানি পুঁথি-নকলের তারিখ—১৬৯৬ শক, ১১৮১ সাল = ১৭৭৪ খ্রীঃ অঃ)

---

২০ ধর্মমঙ্গলের প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এবিষয়ে আলোচিত হইবে।

উদ্যোগে মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলের দুইখানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানির মধ্যে একটুকরা জমাখরচের কাগজে ১১৯১ সাল (১৭৮৫ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইতেছে। এই অর্বাচীন পুঁথি দুইখানি ব্যতীত মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে আর কোন উপাদান পাওয়া যায় নাই। অবশ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় মাণিকদত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে—১৩১১ সালে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী', ১৩১৭ সালে হরিদাস পালিতের 'গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডীর গীতে বৌদ্ধভাব' এবং ১৩৪৫ সালে তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের 'মাণিক-দত্ত ও মুকুন্দরাম' প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইবার পর এ সম্বন্ধে আলোচনার পথ খানিকটা সুগম হইয়াছে। ১৩২০ সনের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী রচিত 'মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী' প্রবন্ধটিতে বিস্তারিতভাবে কবির কাব্য ও কবি সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে দেখা যাইতেছে যে, লেখকগণের প্রমাণের চেষ্টা দ্বিবিধ—মাণিকদত্ত মালদহের অধিবাসী এবং তাঁহার কাব্যে ধর্মমঙ্গলের নিরঞ্জন-আদ্যা-সংক্রান্ত বৌদ্ধভাবমূলক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব পড়িয়াছে। সম্প্রতি এই পুঁথির আলোচনায় দেখা যাইতেছে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যে মজ্জাগত ব্যাধি—অর্থাৎ পুঁথির বিশৃঙ্খলা, এখানেও তাহা পুরামাত্রায় বর্তমান। পুঁথি দুইটি যে-আকারে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কবিকে কিছুতেই মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয় না। ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। যথা—

মুখের অমৃত তাহার খসিয়া পড়িল।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে জল উপজিল॥

অথবা,

আমারে বোল ডান রে বুড়িরে, আমারে বোল ডান।
কার খাইমু ভাতার পুত কার করিমু হান॥

অথবা,

নিদ্রায় আছিল শুইয়া আইল দেবী মহামায়া
আইল দেবী হেমন্তনন্দিনী।

ষোড়শ শতাব্দীতে এরূপ ভাষাপ্রয়োগ হইতে পারে না। উপরন্তু কবি এই পুঁথিতে চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুচর-পরিকরের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন,

উপরন্তু ইহাতে 'ফিরিঙ্গী' শব্দ রহিয়াছে।[২১] সুতরাং আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা এ কাব্যকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।' আর তা' ছাড়া, প্রাপ্ত পুঁথি কোন্ মাণিকদত্তের তাহা লইয়াও সন্দেহ আছে। পুঁথির গ্রন্থোৎপত্তি অংশে আছে—

রঘুয়ে রচিআ পুথি অদভুত করিল।
রাঘবে রচিআ পুথি বিদেশি করিল॥
মুকুন্দে রচিআ পুথি কবিকঙ্কন কৈল।
আপনি মাণিকদত্ত মাণিকদত্ত হৈল॥

ইহার অর্থ বোধহয় এইরূপ—কবির দুইজন দোহার রঘু এবং রাঘব প্রথমে কবির রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। মুকুন্দ (মুকুন্দরাম) সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া কবিকঙ্কণ হইলেন। নিজে মাণিকদত্ত মাণিকদত্ত হইলেন—এই উক্তি লইয়া গোল বাধিয়াছে। কোন কোন লেখক মনে করেন যে, উক্ত পংক্তিতে দুই মাণিকদত্তের নাম রহিয়াছে। তন্মধ্যে একজন মুকুন্দরামের পূর্বে বোধহয় ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই ব্রতকথা জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের অনেক পরে, সপ্তদশ শতাব্দী বা তাহারও পরে আর-এক মাণিকদত্ত পূর্বতন পালাকে সংশোধন করিয়া বর্তমান আকারে চালাইয়াছেন। পুঁথির ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে; চৈতন্যবন্দনা ও চৈতন্য পরিকরের উল্লেখ আছে বলিয়া প্রাপ্ত পুঁথিকে কোন মতেই প্রাচীন বলা যায় না।[২২] কেহ কেহ উল্লিখিত "আপনি মাণিকদত্ত মাণিকদত্ত হৈল" পংক্তির অন্যরূপ অর্থও করিয়াছেন।[২৩] মাণিকদত্ত কাব্য রচনা করিয়া নিজেই গান গাহিতেন —উক্ত পংক্তিটির সেরূপ তাৎপর্যও থাকিতে পারে। তাহা হইলে প্রাচীন ও

[২১] "আকন ফিরিঙ্গী সব বসিল একত্তর।" গুজরাট নগর পত্তনে ফিরিঙ্গীরাও বসবাস করিতে আসিয়াছিল। মুকুন্দরাম এই প্রসঙ্গে মুসলমান ও অন্যান্য জাতির কথা বলিলেও ফিরিঙ্গীর উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য তিনি 'হার্মাদের' (পর্তুগীজ জলদস্যু) কথা বলিয়াছেন।

[২২] এবিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতটি যুক্তিসঙ্গত—"প্রাপ্ত পুঁথির 'মাণিকদত্ত' অষ্টাদশ শতাব্দের আগেকার লোক না হওয়াই সম্ভব। তিনি খানিকটা পুরাণো মালমশলা ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মালমশলা পূর্বতন কোন 'মাণিকদত্ত'-এর কাছে নেওয়া কিনা এবং নেওয়া হইলে কতটা নেওয়া তাহা বলিবার উপায় নাই।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ)

[২৩] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

অর্বাচীন—তুইজন মাণিকদত্তের জল্পনা মিথ্যা হইয়া যায়। পুঁথিটির গোড়ার দিকে আছে যে, তিনি বাদক ও দোহারকে সঙ্গে লইয়া কলিঙ্গদেশে গিয়াছিলেন :

চারি জনে যুক্তি করি লড়ে কলিঙ্গ দ্বারে।
নাটগীত গায় প্রতি ঘরে ঘরে॥

কবি তিনজনকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। রঘু ও রাঘব হইলেন 'দোহার-পাইল', শ্রীকান্ত পণ্ডিত মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ং কবি হইলেন গায়েন। সুতরাং যাঁহারা "মণিকদত্ত রচিআ মাণিকদত্ত কৈল" পংক্তির অর্থ করিয়া বলেন—এখানে তুই মাণিকদত্তের কথা বলা হইতেছে না, স্বয়ং মাণিকদত্ত কাব্য রচনা করিয়া নিজেই গাহিতে আরম্ভ করিলেন—ইহাই পংক্তিটির যথার্থ অর্থ, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা যাইবে না। কবির দোহারগণও হয়তো কাব্যে প্রচুর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিবেন। এখনও মালদহ অঞ্চলে মাণিকদত্তের গান খুব চলে। পুনঃ পুনঃ গীত হওয়ার ফলে ইহাতে প্রক্ষেপ প্রবেশ করিয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ব্রতকথা জাতীয় কাব্যটি বাহিরে বিশেষ প্রচার লাভ করে নাই, বোধ হয় বৌদ্ধভাবই ইহার প্রধান কারণ। Oral tradition বা মৌখিক প্রচারই ইহাকে রক্ষা করিয়াছে। মৌখিক রচনায় প্রক্ষিপ্ত পংক্তি প্রবেশের অধিকতর সম্ভাবনা। মাণিকদত্তের ভাগ্যে তাহাই হইয়াছে। প্রাপ্ত পুঁথিকে আসল মাণিকদত্তের পুঁথি বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকের যে বিশেষ আপত্তি আছে, ইহাই তাহার কারণ। আমাদের অনুমান, কালক্রমে লোকমুখে ও গায়েনদের হস্তক্ষেপের ফলে মাণিকদত্তের মূল পুঁথির খোল-নলিচার অনেকটাই বদলাইয়া গিয়াছে। কাব্যের প্রথমে কবির যে আত্মকাহিনী আছে, তাহা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। সেই বর্ণনায় দেখা যাইতেছে, নিজ পূজা প্রচারের জন্য নারদের উপদেশে চণ্ডিকা-ই পুঁথি রচনা করিয়া নিদ্রিত কবির শিয়রে পুঁথিটি রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং পরদিন প্রভাতে মাণিকদত্ত শয্যা তাগ করিয়া শিয়রে পুঁথিখানি দেখিতে পাইলেন। দেবীর প্রভাবে তাঁহার অঙ্গ বৈকল্য দূরীভূত হইল (তিনি কালা ও খোঁড়া ছিলেন)। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে অনগ্রসর কবি পুঁথিটি বুঝিতে পারিলেন না।[২৪]

[২৪] এ্যাংলো-স্যাকসন কবি কিড্‌মন ও (Caedmon) হুইটুবি গির্জার মূর্খ পরিচারক ছিলেন। তিনিও স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া এ্যাংলো-স্যাকসন ভাষায় বাইবেল রচনা করেন।

বিস্তর পুথি দেখি দত্ত ভাবিল বিশেষে
কেমতে গাইব এত গীত অষ্ট দিবসে ॥
বিস্তর পুথি দেখি দত্ত অন্তরে ডরিল।

তিন শত বত্তিশ[২৫] লাচাড়ি রচিলেন গান।
দিশ পাঁচালি কৈল পদ মূর্তিমান ॥

তখন তিনি মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাহিবার জন্য পালিগায়ক (দোহার) রঘু-রাঘব এবং মৃদঙ্গবাদক শ্রীকান্তকে সঙ্গে লইয়া কলিঙ্গদেশে দেবীর নামগান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কলিঙ্গরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া 'ধুলিয়া কাঠা'র (ধূলিপূর্ণ প্রকোষ্ঠ) মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিল। কবি কাঁদিয়া বলিলেন, "গোরাচান্দ বিনা কার স্মরণ লইমো।"[২৬] তখন দেবী রাজাকে দুঃস্বপ্ন দেখাইলে রাজা মাণিকদত্তকে মুক্তি দিয়া তাঁহার সহায়তায় মহাসমারোহে চণ্ডীপূজা করিলেন। দেবী রাজাকে বর দিয়া বলিলেন :

মন্ত্রতন্ত্র যত দেখ অকারণে সব লেখ
গুহ্য কথা কহিব তোমারে।
যে জন ভকত হয় সাদরে সেবিয়া লয়
ভাবিলে পায় অন্তরে ॥

ইহার পর মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচারিত হইল। এই আত্মজীবনীটি যে কাল্পনিক, কবির রচিত নহে, পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। চৈতন্যভক্তি এবং মন্ত্রতন্ত্রের স্থলে ভক্তির জয় ঘোষণাই তাহার প্রমাণ—এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের প্রভাব স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করা যাইবে।

প্রাপ্ত পুঁথি সম্বন্ধে নানা সংশয় থাকিলেও কবির ব্যক্তিগত পরিচয় ও

২৫ আর একখানি পুঁথিতে আছে—

তিন্ শয় সাট লাচারি করিয়া প্রবন্ধ।
এহি মতে করিল পোথার নিবন্ধ ॥

এই পুঁথি পাঠে মনে হয়, কবি প্রথমে দেবী-প্রদত্ত গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীকান্ত পণ্ডিত বুঝাইয়া দিলে তবে তিনি পয়ার লাচাড়ি ছন্দে মঙ্গলচণ্ডীর গীত রচনা করেন।

২৬ এখানে গোরাচাঁদের উল্লেখ দেখিয়া মনে হইতেছে, এই আত্মকাহিনী পরবর্তী কালে গায়েন ও দোহারের দ্বারা পুঁথিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে।

আবির্ভাব কাল লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। পুঁথি দুইখানি মালদহ হইতে পাওয়া গিয়াছে ; এখনও মালদহে এই কাব্য উৎসব-অনুষ্ঠানে গীত বা পঠিত হইয়া থাকে। উপরন্তু ইহাতে যে সমস্ত গ্রাম, নদনদী, মঠ-মন্দিরাদির উল্লেখ আছে, তাহাতে মালদহের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। ধনপতি সদাগর বাণিজ্যে বাহির হইয়া গৌড়ে উপনীত হইলে যে সমস্ত গ্রাম-নদনদীর পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঝাড়গ্রাম, বডগাছা, আগ্‌লা, কাঞ্চননগর, সন্ন্যাসী পাটন, ছাত্যাভাত্যার বিল (যাহা লইয়া ভাতিয়া পরগণা হইয়াছে), 'কেন্দুয়ার নালা', গৌড়েশ্বরীর মন্দির, দ্বারবাসিনীর ভগ্নস্তূপ প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। এ সমস্তই মালদহের নিকটবর্তী, উপরন্তু পুঁথির ভাষায় বহুস্থলে মালদহের বাক্‌রীতির প্রভাব দেখা যায়। অতএব হরিদাস পালিত এবং রজনীকান্ত চক্রবর্তী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১১, ১৩১৭) কবিকে মালদহের অধিবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এ অনুমান অযৌক্তিক নহে। সম্ভবতঃ কবি মালদহের 'ফুলবাড়ী' গ্রামে ('ফুলুয়া নগর') জন্মগ্রহণ করেন। কবি যুগপৎ কালা ও খোঁড়া ছিলেন, দেবীর বরে তিনি স্বভাবিক দেহ লাভ করেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধিতে তিনি বোধহয় বিশেষ অগ্রবর্তী ছিলেন না, নিজেই নিজের কাব্য গান করিয়া বেড়াইতেন—এইটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পুঁথিতে প্রচুর হস্তক্ষেপ ঘটিলেও কবি যে মুকুন্দরামের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (পুঁথিতে চৈতন্যের উল্লেখ থাকিলেও), উপস্থিত ক্ষেত্রে শুধু এইটুকুই অনুমিত হইতে পারে। অবশ্য তাঁহার কাব্যের গোড়ার দিকে ধর্মমঙ্গলের অনুরূপ সৃষ্টিপত্তনের বর্ণনা রহিয়াছে বলিয়া কাব্যটিকে অতিশয় প্রাচীন মনে হইতে পারে। কিন্তু মালদহ অঞ্চলে এখনও আদ্যের গম্ভীরা গানের প্রচলন আছে, যাহাতে ঐরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। 'কবি মালদহের অধিবাসী বলিয়া নিরঞ্জন ও আদ্যাদেবীর কাহিনী সৃষ্টিপালার মধ্যে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র সৃষ্টিপালার জন্য কাব্যটিকে সুপ্রাচীন বলিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যাহা হোক, অন্য কোন নির্ভরযোগ্য বিরুদ্ধ প্রমাণ অথবা পুঁথি হস্তগত না হইলে কবি মাণিকদত্তকে মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

কবি-বর্ণিত সৃষ্টিলীলা সত্যই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বৌদ্ধমতাশ্রিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রারম্ভে নিরঞ্জন ও আদ্যাদেবীর বিস্তৃত পরিচয় আছে। ঐ ধরণের

সৃষ্টিতত্ত্ব একদা বৌদ্ধ-প্রভাবিত বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত ছিল। অন্যান্য কাব্যেও ইহার অল্পাধিক প্রভাব পড়িয়াছিল। মুকুন্দরাম মহাদেবের বর্ণনায় "নিরঞ্জন নিরাকার" (বঙ্গবাসী সংস্করণ)-এর উল্লেখ করিয়াছেন, দিগ্‌বন্দনায় "আদিদেব বন্দিব ঠাকুর নিরঞ্জন" এবং "বৌদ্ধরূপে বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ" বলিয়াছেন। দ্বিজমাধবও মঙ্গলচণ্ডীর গানে যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতেও ধর্মমঙ্গলের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। নিরঞ্জন-আদ্যাঘটিত কাহিনী সেযুগে হিন্দুসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। কালক্রমে আদ্যাকে সহজেই পার্বতীর সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হয়।

মাণিকদত্তের সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:

> আপনে ধর্মগোশাই গোলক ধিয়াইল।
> গোলক ধিয়াইতে ধর্মের মুণ্ড সৃজিল॥
> আপনে ধর্মগোশাই সুন্য ধিয়াইল।
> সুন্য ধিয়াইতে ধর্মের সরির হইল॥
> ... ...
> জলেতে আসন গোশাই জলেতে বৈসন।
> জল ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন॥
> ভাসিতে ধর্মগোশাই পাইল ঠেসন।
> চৌদ্দযুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ॥

ইহার পরে ক্রমে ক্রমে ধর্মের বাহন উলূক-গজ-কূর্মের সৃষ্টি হইল, নাগ সৃষ্টি হইল। নিরঞ্জন নাগের উপর পৃথিবীর ভার অর্পণ করিলেন। আদিধর্ম বা নিরঞ্জন হইতে আদ্যার উৎপত্তি হইল। মাণিকদত্তের কাব্যে এই আদ্যাই চণ্ডীতে পরিণত হইয়াছেন। আদ্যার সৃষ্টির পর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের জন্ম হইল। তারপর ধর্ম মহাদেবকে আদেশ দিলেন, আদ্যাকে বিবাহ কর। মহাদেব বলিলেন যে, দেবীর সাতবার জন্মগ্রহণ করার পর তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। সেই আশায় আদ্যা প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে দেবীর সাত জন্ম অতিবাহিত হইল। শিব ভিক্ষায় বাহির হইয়া এক ঋষির আশ্রমে আদ্যাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। ইহার পরে আদ্যা-চণ্ডিকা আপনার পূজা প্রচারে সচেষ্ট হইলেন। ইহার পর দেবীকর্তৃক ধূম্রলোচন অসুর বধের পর প্রথম কাহিনী আরম্ভ হইল। ইহাতেও যথারীতি কালকেতু ও ধনপতি

সদাগরের কাহিনী দুইটি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। "কাব্যটি জনসাধারণের জন্য লেখা বলিয়া ছড়াবহুল"[২৭]—তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় মূল পাঁচালীটি ব্রতকথা জাতীয় ছিল। কিন্তু যে দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে ঠিক জনসাধারণের কাব্য বলা যায় না। কারণ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে কাহিনীর ধারাবাহিকতা আছে এবং চণ্ডী, কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি ও খুল্লনার চরিত্রে মোটামুটি বিকাশ লক্ষ্য করা যাইবে। তবে ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা ইহাতে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে; তাহাকে নিছক 'ভিলেন' বলিয়াও মনে হয় না। দেবী শেষ পর্যন্ত তাহাকে জব্দ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পুঁথির বর্ণনায় কবিত্বের চিহ্ন নাই, বর্ণনাভঙ্গিমাও গতানুগতিক। বস্তুতঃ মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিপালা বাদ দিলে কাব্য হিসাবে ইহা কোন দিক দিয়াই উল্লেখ-যোগ্য নহে। মাত্র দু' একটি স্থলে কিঞ্চিৎ রচনাকৌশল লক্ষ্য করা যাইবে :

১। ক্রুদ্ধা চণ্ডীর বর্ণনা—

ডাহিনে বামে চাহিয়া দেবী কি না দেখিল।
হাথের কাঙ্কন দেবী টানিঞা খসাইল॥
চক্র ধরিয়া দেবী দিল একটান।
চক্র হৈতে আনল বাহির হৈল দশখান॥
সেহি ত আনলের তাপে শঙ্কর ঘামিল।
শিবের ললাটে ঘাম ভুমিত পাড়িল॥

২। বন্যায় ভাঁড়ুর দুরবস্থা—

কার বাড়িত ঝাটিঝুটি কার বাড়িত ভড়।
ভাড়ু দত্তের বাড়ি হেল নদীয়া সাগর॥
ক্রোধে জ্বলিল তবে ভাড়ুয়া নাবড়।
ব্যর্থ সেবা করিল মুঞি ভোলা মহেশ্বর॥
কি করিতে পারে দুর্গা সর্বমঙ্গলা।
আদাড়ের বাঁশ কাটি উথাড় বান্ধিল॥
ধীরে ধীরে বন্যা ভাড়ুদত্তের বাড়িত আইল॥
মালসাট দিয়া বাহিরায় ভাড়ুয়া নাবড়।

২৭ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ

শিব[২৮] জপিয়া খট্টা পাড়িল পিড়ার উপর ॥
ধীরে ধীরে বন্ধ্যা পিড়ার উপর গেল।
পিড়া ছাড়িয়া ভাড়ু ঘরে সামাইল।
শিবমন্ত্র জপিয়া কপাট লাগাইল ॥

৩। (জরতীবেশিনী চণ্ডীর হেঁয়ালি—)

আমারে বোল ডানরে বুড়িরে আমারে বোল ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান ॥
ডান নইরে ডান নই হইএ মুখদোষী।
দ্বারে বসি খাইনু মুঞি চৌদ্দ ঘর পড়শী ॥
ডাইন বলিঞা মোরে বোলে বার বার।
ঘরে বসি খাইনু মুঞি বুড়া পোদ্দার ॥
উত্তরদেশ গেনু খাইঞা আইনু কাঙ্গাল।
দুয়ারে বসিয়া খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্গাল ॥
ডাইন বলিঞা মোরে বোলে বার বার।
আজিকা হৈনু ডান তোমা খাইবার ॥

শেষ পংক্তি যেমন নাটকীয় আকস্মিক, তেমনি উদ্ভট পরিহাসে উতরোল।

প্রাপ্ত পুঁথির ভাষায় অর্বাচীনতা প্রবেশ করিয়াছে ; উহার ভাষা ও ছন্দের ত্রুটি অতিশয় প্রকট। কবির আত্মজীবনী-জ্ঞাপক পয়ার হইতে মনে হয়, তিনি শিক্ষায় অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাহিয়াই বোধহয় কবি জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং দোহার ও বাজনদার সঙ্গে লইয়া গ্রামে-গ্রামান্তরে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। কাজেই গীতিকাটিতে সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও শিল্পকৌশলের বিশেষ কোন পরিচয় নাই।

দ্বিজমাধব ॥

দ্বিজমাধবের[২৯] চণ্ডীমঙ্গল লইয়া আমাদিগকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। অর্ধশিক্ষিত পুঁথি-নকলকারীদের অপপাঠের ফলে সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। দ্বিজমাধবের কাব্যের পুঁথি ও ব্রতকথা ধরণের

[২৮] এই কাব্যে ভাঁড়ু দত্তকে শৈব রূপে অঙ্কন করা হইয়াছে।

[২৯] কবি চণ্ডীমঙ্গলে সর্বদা দ্বিজমাধব ও দ্বিজ মাধবানন্দ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কেহ কেহ তাঁহাকে মাধব আচার্য আখ্যা দিয়াছেন। ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধবাচার্য অপর কবি।

ছোট ছোট পালাগান চট্টগ্রাম ও উত্তর-বঙ্গে সুপরিচিত। বরং চট্টগ্রামে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল বিশেষ প্রচলিত নাই। সেইরূপ পশ্চিম-বঙ্গেও মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রচার হয় নাই। অথচ তাঁহার কোন কোন পুঁথিতে আত্ম-জীবনীজ্ঞাপক পয়ারে তাঁহাকে পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী বলিয়া মনে হইতেছে। মাধব বা মাধব আচার্য নামে একাধিক কবি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল [৩০] প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া সমস্যাকে প্রায় জটিলতম করিয়া তুলিয়াছেন। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত বাঙালাদেশের প্রায় সমস্ত মহিলাসমাজে প্রচলিত আছে। সেই জন্য চণ্ডী ও মনসার পাঁচালী অর্বাচীন কালেও রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে মাধবের সর্বাধিক প্রভাব বলিয়া এই অঞ্চলে মাধবাচার্যের মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা-সংক্রান্ত অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, কিছু কিছু মুদ্রিতও হইয়াছে। এই মাধবের নামে প্রচারিত ব্রতকথা ও তাঁহার পুরা আকারের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। নিম্নে মাধবাচার্যের মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের ছাপা পুঁথি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথির (পুঁথি সংখ্যা—২৩১৮) পাঠের তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে।

'সুকবি-মাধবাচার্য বিরচিত জাগরণ' [৩১]

তবে বারে ·বীরবর জিনি মত্ত করিবর
গজশুণ্ড জিনি করবারে।
যথেক আঁখটীসুত তারা সব পরাভূত
খেলায় জিতিতে নাহি পারে॥
বাটুল বাঁশ লয়ে করে পশুপক্ষী চাপি ধরে
কাহার ঘরেতে নাহি যায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি থাকিয়া মারয়ে পাখী
ঘুড়িয়া পড়ে যায়॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি (পুঁথি সং-২৩১৮)—

বাড়ে বীরবর করিবর জিনি কর
গজশুণ্ড বাম করে।
যথেক আক্ষটি সুত তারা সব পরাভূত
খেলায়ে ·জিনিতে নাহি পারে॥

---

[৩০] যথাস্থানে ইঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

[৩১] চট্টগ্রাম নারায়ণ যন্ত্রে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী মুদ্রিত এবং প্রকাশিত—সন ১২৯৯ সাল। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী রাত্রি জাগিয়া গীত হইত বলিয়া চট্টগ্রামে ইহা 'জাগরণ' নামেও কথিত হয়।

বাটুল বাঁশ লইয়া করে পক্ষী বধিবার তরে
তার ঘাও ব্যর্থ নাহি যায়ে।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি থাকিয়া মারয়ে পাখী
ঘুমি ঘুমি পড়ে ঠায়ে ঠায়ে॥

এখানে লক্ষণীয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে মোটামুটি ঐক্য আছে। অবশ্য লিপিকার-গায়েনগণ ইহাতে যে কতটা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহার কোন হিসাব-নিকাশ নাই। কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত সুধীভূষণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বিভিন্ন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' প্রকাশিত হইয়াছে। পুঁথি-সম্পাদক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি প্রাচীন পুঁথির (পুঁথি সংখ্যা—২৩১৮ ; ১৭৫৯ সালের অনুলিপি) উপর ভিত্তি করিয়া এবং প্রয়োজনস্থলে অন্য পুঁথির পাঠান্তর দিয়া এই কাব্য সম্পাদনা করিয়াছেন। অবশ্য সম্পাদক-প্রদত্ত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নামটি আদৌ যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। কবি স্বয়ং ইহাকে সারদা-চরিত বলিয়াছেন। সম্পাদক ভূমিকায় (পৃঃ ৩I৶০) 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নাম গ্রহণের কারণ দেখাইয়াছেন।[৩২] কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনে বিনা কারণে পুঁথি-বহির্ভূত কোন স্বকপোলকল্পিত নামকরণ করা উচিত নহে। বাংলা সাহিত্যে

---

[৩২] সম্পাদকের উক্তি : "দ্বিজমাধব ভণিতায় সারদামঙ্গল বা সারদাচরিত নামে কাব্যটিকে পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু এতগুলি প্রচলিত নাম থাকিতে আমরা 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নামটি নির্বাচন করিলাম, তাহার প্রথম কারণ, এই নামকরণের দ্বারা কাব্যটি যে প্রাচীন মঙ্গলগীতের একটি নিদর্শন, তাহা বুঝান যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্যভাগবতে। সেখানে ইহাকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' বলা হইয়াছে। সুতরাং এই নামের দ্বারা কাব্যটির সহিত প্রাচীন ধারার সংযোগ সাধিত হইবে। তৃতীয়তঃ, এই নামকরণ হইতে বুঝা যাইবে, এই কাব্যের দেবী 'মঙ্গলচণ্ডী', তিনি কেবলমাত্র 'চণ্ডী' নহেন।" সম্পাদকের এই সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা এখানে বিস্তারিত আকারে আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য সম্পাদনে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' নীতি মানিয়া চলা উচিত। দ্বিজমাধব স্বয়ং এই কাব্যকে 'সারদামঙ্গল' বা 'সারদাচরিত' বলিয়াছেন। চলিত কথায় এই শ্রেণীর কাব্য চণ্ডীমঙ্গল নামে পরিচিত। সম্পাদক এই তিনটি নামের যে কোন একটি (প্রথম দুইটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত) গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহার ইচ্ছামতো কাব্যের নামকরণ মানিয়া লওয়া যায় না। তিনি বলিয়াছেন, "অনেক সময়ে পুঁথি মিলাইয়া দেখিলেই চলে না, নিজের বিচার বুদ্ধিও খাটাইতে হয়।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনে 'নিজের বিচার-বুদ্ধি' যত অল্প খাটানো যায়, ততই ভাল।

'অভয়ামঙ্গল', 'অম্বিকামঙ্গল' প্রভৃতি নাম সত্ত্বেও 'চণ্ডীমঙ্গল' নামটি সাধারণ সমাজে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছে। অতঃপর এই কাব্য আমাদের গ্রন্থে 'চণ্ডীমঙ্গল' নামেই অভিহিত হইবে।

দ্বিজমাধবের সমস্ত পুঁথিতে কাব্যরচনাকাল পাওয়া গিয়াছে:

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজমাধব গায়ে সারদাচরিত॥

অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্দে (১৫৭৯ খ্রীঃ অঃ) এই 'সারদাচরিত' রচিত হইয়াছিল। কবি আর এক স্থলে আকবরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন:

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার॥

১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙলার যথার্থ মুঘল অভিযান আরম্ভ হয়। ইহার সামান্য পূর্বে বাঙলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদের শিরশ্ছেদ হয় (১৫৭৫)। ইহার পর বাঙলার মুঘল সুবাদার হইলেন খান-ই-জাহান খাঁ। তাঁহাকে তিন বৎসর (১৫৭৫-৭৮) ধরিয়া বাঙলার বিশৃঙ্খলা দমন করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রতিভা বিশৃঙ্খল বাঙলাদেশে উত্তরাপথের রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেও তখনও পূর্ব-বঙ্গ ও ভাটি অঞ্চলে পাঠান দলপতি ও ভুঁইয়াদের প্রচণ্ড আধিপত্য ছিল; ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ সুবাদার হইয়া আসিয়া ঐ সমস্ত দুর্দান্ত ভুঁইয়াদের দমনের চেষ্টা করেন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের শাসনকালে বাঙলার ভুঁইয়াগণ সর্বপ্রকারে হতবল হইয়া পড়েন। দ্বিজমাধব যখন চট্টগ্রামে বসিয়া (১৫৭৯) চণ্ডীমঙ্গলের গীত রচনা করিতেছিলেন, তখন তাহার ত্রিসীমানায় 'একাব্বর' রাজার কোনও প্রকার আধিপত্য ছিল না। তবে উক্ত পদে দেখা যাইতেছে যে, কবি ত্রিবেণী ও নবদ্বীপের কথা বলিতেছেন, কিন্তু চট্টগ্রামের কোন কথা নাই। তখন (অর্থাৎ ১৫৭৯ সালে) পশ্চিম-বঙ্গে আকবরের প্রবল প্রতাপ ততটা স্থাপিত হয় নাই। তাহা হইলেও কবি যদি পশ্চিমবঙ্গে বসিয়া কাব্য রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাতে আকবরের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিন্তু চট্টগ্রামে এ কাব্য রচিত হইলে আকবরের উল্লেখ বিশেষ সন্দেহজনক হইয়া পড়ে। প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে সন-তারিখের গোলযোগ ও কারচুপি কাহারও অজানা নহে। যাহা হোক সমস্ত পুঁথিতে

যখন সন-নির্দেশক পয়ার পাওয়া যাইতেছে, তখন ধরিয়া লওয়া গেল যে, কবি মুকুন্দরামের পূর্বে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন।

দ্বিজমাধব গ্রন্থারম্ভে 'আত্মকথা' বর্ণনায় বলিয়াছেন :

সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তদ্বীপ সার।
ত্রিবেণী যে গঙ্গা যথা বহিছে ত্রিধার॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে নদীয়ার যে মহাস্থান।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র অনেক প্রধান॥
পরাশর পুত্রজাত মাধব যে নাম।
কলিকালে হইত জগত অনুপাম॥

এখানে মনে হইতেছে কবি ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পরাশর। তাঁহার নানা পুঁথিতে বর্ণিত আত্মকথায় নানা গোলমাল ও বৈষম্য আছে। এখানেও দেখা যাইতেছে তিনি নদীয়া অর্থাৎ নবদ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তগ্রাম বা নবদ্বীপ, কোথায় তাঁহার পিতৃভূমি, তাহা লইয়াও সংশয় দেখা দিতে পারে। কোন কোন পুঁথিতে কবি আপনাকে পরাশর অনুজ বলিয়াছেন—'তাহার অনুজ আমি মাধব আচার্য।' তাই অনেকে মনে করেন, কবি পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, পরে চট্টগ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম. নোয়াখালি ও রংপুর ভিন্ন অন্য কোথাও দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গলের বিশেষ কোন প্রচার নাই, কেহ কবির নামও জানে না। যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও চট্টগ্রামাদি অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং কবি যদি পশ্চিম-বঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে সুলেমান-দাউদের বিশৃঙ্খলার সময় তিনি অথবা তাঁহার পিতা পশ্চিম-বঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কবি চট্টগ্রামে বাস করিবার সময়ই এই কাব্য রচিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। কবি মাধব গ্রন্থ মধ্যে কোথাও চট্টগ্রাম বা পূর্ব-বঙ্গের কোন অঞ্চল, গ্রাম, জনপদ বা নদ-নদীর উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য কবির আত্মপরিচয় কতদূর প্রামাণিক তাহাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপবাসী[৩৩] আর এক মাধবাচার্য

[৩৩] ইনি যে নবদ্বীপে বাস করিতেন 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে' তাহার উল্লেখ আছে :

সুরধুনী তীরে বিশেষ নবদ্বীপ।
যথা চৈতন্যচন্দ্র অদ্বৈত সমীপ॥

'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য (ভাগবতের অনুবাদ) রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও নিজ পরিচয়ে বলিয়াছেন :

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥

ইঁহার আত্মজীবনীজ্ঞাপক পয়ারগুলির সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজমাধবের পুঁথির গোলমাল হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। কেহ কেহ ময়মনসিংহ জেলার সদর মহকুমার গোঁসই-চান্দুয়া গ্রামে এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমার যশোদল গোঁসাই-গঞ্জ গ্রামে [৩৪] 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা মাধবাচার্যের বংশধরগণের পরিচয় পাইয়াছেন। এই বংশে 'মাধব-বংশতত্ত্ব' নামক একখানি কুলপঞ্জিকা আছে, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, গঙ্গাতীরবাসী পরাশর-পুত্র বৈষ্ণব কবি ও চৈতন্য-ভক্ত মাধবাচার্য ময়মনসিংহ জেলার মেঘনা নদীর নিকটে নবাবপুরে বসবাস করেন। এই বংশ এখনও বর্তমান আছে, এবং বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব সমাজে ইঁহারা সকলের সম্মানার্হ। এখনও সেখানে শ্রাবণী অমাবস্যা তিথিতে মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' পাঠ হয়। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি পুরাতন বাংলা সাহিত্যে পুঁথির প্রামাণিকতা, কবি-পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জঞ্জাল সৃষ্টি হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' বা 'গঙ্গামঙ্গল' রচয়িতা চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব-ভক্ত নবদ্বীপবাসী মাধবাচার্য যে চট্টগ্রামে চলিয়া গিয়া-ছিলেন, এমন কথা বৈষ্ণব সাহিত্যের কোথাও নাই। অথচ পূর্ব-বঙ্গে তাঁহার বংশধারা এখনও বর্তমান আছে—ইহাও অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। চণ্ডী-মঙ্গলের দ্বিজমাধব এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মাধবাচার্য ইঁহাদের মধ্যে কে পূর্ব-বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন তাহা লইয়া নানা সংশয় ও মতানৈক্য সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব-বঙ্গের তথ্য ও লোকশ্রুতি মানিলে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র বৈষ্ণব কবিকে ময়মনসিংহের অধিবাসী বলিতে হয়। অপর দিকে দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গলের প্রায় সমস্ত পুঁথি চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে ; পশ্চিম-বঙ্গে তাঁহার একখানি পুঁথিও পাওয়া যায় নাই বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে চট্টগ্রামের কবি বলিতে চাহেন। এ বিষয়ে নূতন কোন তথ্য পাওয়া না গেলে কোন্ কবি কোথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইবে না। অবশ্য দ্বিজমাধব শাক্ত কাব্য লিখিলেও

---

[৩৪] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

তাঁহার গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলীর নানা উল্লেখ আছে। এই পদগুলি [৩৫] তাঁহার রচিত হোক, অথবা গায়েনদের (লক্ষ্মীনাথ, কামদেব, দ্বিজ পার্বতী, রায় অনন্ত, অনন্ত দাস ইত্যাদি) প্রক্ষেপ হোক, ইহাতে চৈতন্যযুগের সুরের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এখন কাব্যটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, চট্টগ্রামে দ্বিজমাধবের চণ্ডীর আখ্যান 'জাগরণ' নামে পরিচিত। আটদিন ধরিয়া রাত জাগিয়া এই গান হইত বলিয়াই ব্রতকথা জাতীয় কাহিনীটি এই নামে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য বর্ধিতায়তন পুঁথিতে 'সারদামঙ্গল' ও 'সারদা-চরিত' নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্যটির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য —দেবীকর্তৃক মঙ্গলাসুর বধ। শিবের বরে উদ্ধত মঙ্গলাসুরের বিনাশের পর দেবীর মর্ত্যলীলার সূচনা হইল। কবি বলিয়াছেন—

জয় জয় জয় দুর্গা সর্ব বিঘ্ন খণ্ডি।
মঙ্গলদৈত্যে বধি মাতা হইলা মঙ্গলচণ্ডী॥

এই জন্য দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী; মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথাও এই নাম হইতে পরিকল্পিত হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী শব্দ চৈতন্য-পূর্ব যুগেও অপরিচিত ছিল না। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে রাত্রি জাগিয়া মঙ্গলচণ্ডীর গীত শ্রবণের কথা উল্লেখ

৩৫ পুঁথিতে এই পদগুলিকে 'বিষ্ণুপদ' বলা হইয়াছে :

১। মৈলু মৈলু মঞি বাঁশিয়ার জ্বালায়ে।
গৃহকর্ম লোকধর্ম রাখন না জায়॥
বাঁশের বাঁশী কহে কথা শুনিতে মধুর।
যে জনে দিয়েছে ফুক সে জন চতুর॥

২। বিনোদিনী, বিলম্ব করিতে না জুয়ায়ে।
তুয়া পথ নিরক্ষিতে ● রহিয়াছে প্রাণনাথে
রাধা বলি মুরলী বাজায়ে॥
নূপুর কিঙ্কিণীর ধ্বনি কেয়ূর কুণ্ডলমণি
পরিহরি করহ গমন।
প্রিয়সখীর করে ধরি নীল নিচোল পরি
দেখ গিয়া ঐ চান্দ-বদন॥

ইহার ভাষা এত আধুনিক যে ইহার প্রামাণিকতায় আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়। বোধ হয় এ সমস্ত 'বিষ্ণুপদ' পরবর্তী কালের গায়েনদের প্রক্ষেপ।

করিয়াছেন। যাহা হোক, দেবী প্রথমে কলিঙ্গরাজের পূজা পাইলেন। তারপর শিবের অভিশাপে ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বরের মর্ত্যভূমিতে ধর্মকেতু ব্যাধের ঘরে জন্ম গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া কালকেতুর দেবীর কৃপালাভ, রাজ্যস্থাপন এবং পরিশেষে অগ্নিতে স্বামী-স্ত্রীর জীবনাহুতি দিয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনীটি এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীটি মুকুন্দরামের তুলনায় অত্যন্ত অপরিসর, অনেকটা ব্রতকথার আদর্শে রচিত। কবি আক্ষেটি-খণ্ডের প্রায় কোথাও আখ্যান জমাইতে পারেন নাই। চরিত্র বলিতে একমাত্র ভাঁড়ুদত্ত ব্যতীত কোনটিরই বিশেষ বৈচিত্র্য বা বিকাশ লক্ষ্য করা যাইবে না। ভাঁড়ুর স্বার্থপরতা, চাতুরী ও বঞ্চনা বেশ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। অবশ্য তাহার অপরাধ যেমন গুরুতর, শাস্তিও তেমনি তীব্র হইয়াছে। কালকেতুর আদেশে সকলে "অশ্বমূত্রে তিতায়ে চুল"; মাথা মুড়াইতে গিয়া উল্টা দিকে ক্ষুর টানিয়া ক্ষৌরকার তাহার দুর্গতির একশেষ করিয়া ছাড়িল। আবার কেহ কেহ, "শিরে ঢালি দিল লোনা জল"। ভাঁড়ু গঙ্গাপারে পলাইয়া গিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "গঙ্গাপারে গিয়া মুড়াইয়াছি মাথা।" লহনা-খুল্লনা সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যটি যুক্তিসঙ্গত—"মাধুর লহনা ও খুল্লনা ততদূর পরিষ্কার নহে—উহারা মুকুন্দের লহনা ও খুল্লনার রেখাপাত মাত্র।"

মর্ত্যলীলার পর কালকেতু-নীলাম্বর স্বর্গে গেল, স্বর্গে স্বয়ং মহাদেব তাহাকে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান শিক্ষা দিলেন :

শুন শুন কহি তত্ত্ব অয়ে নীলাম্বর।
আপনা শরীর চিন্ত হইতে অমর ॥
সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে ॥
জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরসান।
ভাটি বন্দী করিয়া জোয়ারে দিব টান ॥
সে জোয়ারে ঠেকি হংস হইব সুস্থির।
কায়াপিণ্ডে হৈব দেখা নিশ্চল শরীর ॥
শিরে সহস্রদল পদ্ম কহি তার তত্ত্ব।
অধোমুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত ॥

সে অমৃত রহে ভাল পুরুষের স্থান।
নহি টলিবেক পথ সুস্থির পুরাণ॥
মেরুদণ্ডে ভর করি করিবেক ধ্যান।
নবদ্বার বন্দ কৈলে জিনিবা শমন॥

একদা তন্ত্র, যোগ, হটযোগ ও সহজিয়া সাধন-প্রকরণ বাঙলাদেশে কিরূপ প্রচারলাভ করিয়াছিল তাহা এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে।[৩৬] পালাশেষে শিবকর্তৃক নীলাম্বরকে কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বে দীক্ষা দেওয়ার কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহা পরবর্তী কালের গায়েনদের প্রক্ষেপও হইতে পারে।

কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগরের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কবি এই পালার গোড়ার দিকে দেব-দেবী বন্দনায় 'প্রথমে বন্দম গুরু ধর্ম নিরঞ্জন' বলিয়া নিরঞ্জন-ধর্মের বন্দনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আমরা মাণিকদত্তের কাব্যে নিরঞ্জন ও আদ্যার কাহিনী লক্ষ্য করিয়াছি।[৩৭] ধর্ম-মঙ্গলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব বাঙলাদেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে। ধনপতির জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি, পারাবত সন্ধানে লক্ষপতির গৃহে গমন ও খুল্লনার রূপের আকর্ষণ—এইভাবে কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গলের মতোই কাহিনীটি বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই—দু'একটি নূতনত্ব আছে মাত্র। খুল্লনার চরিত্রটি

---

৩৬ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যোগসাধনার কথা আছে:

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মনপবন গগনে রহাই॥
মূলকমলে করিলে মধুপান
এবেঁ পাইএ্যা আহ্মে ব্রহ্মগেয়ান।
... ...
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধি
মনপবন তাত কৈল বন্ধা।
দশমী দুআরে দিলোঁ কপাট
এবে চড়িলোঁ সো সে যোগবাট। (রাধা বিরহ)

৩৭ দ্বিজমাধব তাঁহার কাব্যের এক স্থলে ধর্ম ও ডাকিনী-যোগিনীর কথা বলিয়াছেন:

ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ ধর্মের সভায়ে।
গাইন গুণীন বন্দোঁ গুরুজনের পায়ে॥

নিন্দার নহে। কবি মাঝে মাঝে বেশ পরিহাসের ইঙ্গিতও করিয়াছেন। খুল্লনার কলহ মিটিয়া গেলে লহনা রোহিত মৎস্যের মুড়া রাঁধিয়া খুল্লনাকে খাওয়াইবার জন্য সাধাসাধি করিতে লাগিল। কিন্তু খুল্লনা জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে না দিয়া খাইবে কি প্রকারে?

খুলনায়ে বোলে দিদি মুড়া খাও তুহ্মি।
তবে এক লক্ষ ধন পাই আজু আহ্মি॥
মুড়া লইয়া পেলাপেলি কেহ নাহি খায়ে।
উভার উপরে থাকি বিড়াল আড়চোখে চাহে॥
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে।
মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ী পিছে॥

মুড়ার দুর্গতি প্রচ্ছন্ন পরিহাসে সমুজ্জ্বল। সুশীলার বারমাস্যা বর্ণনায় গতানুগতিকতা থাকিলেও অনলঙ্কৃত প্রাণের কথা পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে। ভাদ্রমাসের দুঃখ বর্ণনায় সুশীলার উক্তিটি সুন্দর ও সংযত :

কাকেও না ছাড়ে বাসা কাল ভাদ্র মাসে।
হেনকালে যাইতে চাহ দূর পরদেশে॥
কিরূপে বঞ্চিমু মুঞি অভাগিনী নারী।
রান্ধিয়া যোগাইমু অন্ন নেঅ সঙ্গে করি॥

দ্বিজমাধব উচ্চতর কলাশক্তির অধিকারী নহেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কবি কাহিনীটিকে পাঁচালী ও ব্রতকথার ঢঙে বিবৃত করিয়াছেন, ইহাকে নাটকীয়তা ও কথাসাহিত্যের রসে ভরিয়া তুলিতে পারেন নাই। চরিত্রাঙ্কনেও তাঁহার দক্ষতা এমন কিছু বিস্ময়কর নহে। ভাঁড়ুদত্ত ব্যতীত আর কোন চরিত্রই সুপরিকল্পিত এবং সুচিত্রিত হয় নাই। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন, "দ্বিজমাধবকে যদিও একজন প্রথমশ্রেণীর কবি বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না, তথাপি আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস তাঁহার পূর্বে আর খুব বেশী কবি দেখাইতে পারেন নাই।"[৩৮] কিন্তু দ্বিজমাধবের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে আবির্ভূত পদ্মাপুরাণের নারায়ণদেব অধিকতর সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। বর্ণনার স্বাভাবিকতা দ্বিজমাধবের কাব্যে যে নাই তাহা নহে, কিন্তু স্বাভাবিক বর্ণনাকে শিল্পরূপ দিবার জন্য যে ধরণের সৃষ্টিকুশলতা প্রয়োজন,

৩৮ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

তাহা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রে কাব্যেই মিলিয়াছে। দ্বিজমাধব এ বিষয়ে অতিশয় দীন। মুকুন্দরামের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর প্রতিভা—তাঁহার গ্রন্থ নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ শিল্প হইয়াছে; অপর দিকে মাধবের কাব্য শুধু পরস্পর-ভাবে সজ্জিত গোটাকতক স্বাভাবিক চিত্রে পরিণত হইয়াছে। কাজেই চরিত্র ও কাহিনীতে সংহতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, দ্বিজমাধব চট্টগ্রামের ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, মুকুন্দরামের কাব্যে রাঢ়ের ঐতিহ্যের অনুস্যূতি আছে। এই মতও তর্কসাপেক্ষ। মনে রাখিতে হইবে, দ্বিজমাধব পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, পরে চট্টগ্রামে বসবাস করেন; উপরন্তু তাঁহার কাব্যে ভাষা ও বর্ণনার কোন স্থলে চট্টগ্রামের পরিবেশের বিশেষ কোন প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। কবি ঘটনাটিকে পশ্চিম-বঙ্গেই স্থাপন করিয়াছেন। ধনপতির বাণিজ্যপথের বর্ণনায় পশ্চিম-বঙ্গের নদনদী-গ্রাম-জনপদ-তীর্থস্থানের উল্লেখ রহিয়াছে, পূর্ব-বঙ্গের স্থানের উল্লেখ প্রায়ই অনুপস্থিত। অবশ্য মুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁহার তুলনা চলিতে পারে না। মুকুন্দরাম শুধু দৃষ্টিকেই সৃষ্টিকার্যে নিয়োগ করেন নাই, তাহার সঙ্গে চিত্তবৃত্তিরও সংযোগ সাধন করিয়াছিলেন। মাধবে তাহার বিশেষ অভাব আছে, এবং আছে বলিয়াই দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল ব্রতকথার সীমা ছাড়াইয়া কাব্যলোকে উন্নীত হইতে পারে নাই।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ॥

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের দুইজন কবি দুই প্রকার বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। মুকুন্দরাম কাহিনী, চরিত্র ও বাস্তব মানব-জীবন-রস সৃষ্টিতে যেরূপ নিপুণতা দেখাইয়াছেন, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ঠিক সেইরূপ বাগ্‌ধারা, শব্দবৈদগ্ধ্য, মণ্ডনকলা, ছন্দের নবীনতা এবং সরস পরিহাস-রসিকতার একটি মার্জিত ও প্রসন্ন নাগরিক মনের পরিচয় দিয়াছেন। তাহা হইলেও সমস্ত দিক বিচার করিলে মুকুন্দরামকেই শ্রেষ্ঠতর আসন দিতে হইবে। শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নহে, যে কয়জন প্রাচীন কবি আধুনিক বাঙালী-সমাজে কথঞ্চিৎ প্রচার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দরামের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কবিদের যে দুর্দশা অপরিহার্য, মুকুন্দরামও তাহা হইতে পরিত্রাণ পান

নাই। তাঁহার কাব্যের সন-তারিখের গোলমাল প্রাচীন সাহিত্য-পাঠক এবং গবেষকের শিরঃপীড়ার কারণ হইয়াছে। আমরা নিম্নে মুকুন্দরামের আবির্ভাবকাল, গ্রন্থরচনার সন এবং সংক্ষিপ্ত কাব্যপরিচয়ে অগ্রসর হইতেছি।

কবি-পরিচয় ও গ্রন্থরচনা ॥ মুকুন্দরাম তাঁহার গ্রন্থমধ্যে আত্মপরিচয় দিবার সময় এমন কতকগুলি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে (মতভেদ সত্ত্বেও) মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। প্রথমে কবির আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক ত্রিপদীর কথা ধরা যাক। মধ্যযুগে কবিদের ব্যক্তিগত কথা তাঁহাদের নিজ নিজ কাব্যে অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে—সন-তারিখ সম্বন্ধে তাঁহারা প্রায়ই উদাসীন থাকিতেন, কেহ-বা বুদ্ধির চাতুরী দেখাইবার অভিপ্রায়ে সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে পয়ার রচনা করিয়া সুকৌশলে গ্রন্থরচনার সন-শকাব্দের উল্লেখ করিতেন। লিপিকারের হাতে পড়িয়া সাঙ্কেতিক ছত্রগুলি আরও রহস্যময় হইয়া উঠিত। ফলে প্রাচীন বাংলা কাব্য ও কবিদের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে আধুনিক গবেষক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-পাঠকদের অযথা বিড়ম্বনায় পড়িতে হয়।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সংযোজিত কবির আত্মজীবনীটি বাস্তবতা, মানবধর্ম ও সাহিত্যরসে এমন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে যে, মধ্যযুগের কোন কাব্যেই ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তাঁহার কাব্যেও এই ব্যক্তিগত মনের ভাব-ভাবনা কিছুিৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে—ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কবির ব্যক্তিগত কথা কাব্যে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য কাব্যের 'objectivity' বা বস্তুগত বর্ণনা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। একথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। কবির ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা তাঁহাকে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল করিয়াছে, জীবনের প্রতি প্রসন্নতা সঞ্চার করিয়াছে—গতানুগতিক সামান্য আখ্যানকে শিল্পরূপ দান করিয়াছে। তাঁহার ঈষৎ পূর্বে আবির্ভূত দ্বিজমাধবের সঙ্গে এই স্থানেই তাঁহার পার্থক্য। মুকুন্দরাম শিল্পী, দ্বিজমাধব বিবৃতিকার, সংবাদপত্রের রিপোর্টার মাত্র—একথা মুকুন্দরামের আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

দামুন্যা গ্রামে রক্ষিত মুকুন্দরামের প্রাচীন পুঁথির প্রথমে ও শেষে কবির যে আত্মপরিচয় আছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে—কবি মুকুন্দ-রাম কয়েক পুরুষ ধরিয়া বর্ধমানের রত্না নদীর তীরে দামুন্যা (দামিন্যা)

গ্রামে কৃষিকার্য অবলম্বন করিয়া বসবাস করিতেন। কবিরা চক্রাদিত্য শিবের উপাসক হইলেও কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী ছিলেন। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা দামুন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর জমি ভোগ করিতেন। পরে রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট দেখা দিল। 'অধর্মী রাজার' অত্যাচারে এবং প্রধান কাজকর্মচারী (ডিহিদার[৩৯]) মাহ্‌মুদ সরীফের শাসনে দেশের লোকের দুর্গতির সীমা রহিল না, আর্থিক অবস্থার সাংঘাতিক অবনতি হইল। চারিদিকে বিশৃঙ্খলার সুযোগে রাজকর্মচারী ও পোতদার—ইহাদেরই সুদিন আসিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, সাধারণ মানুষ, এমন কি ধনীরাও ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল। তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর তালুক বাজেয়াপ্ত হইল, তিনিও কয়েদ হইলেন। এরূপ অবস্থায় কবি মুকুন্দরাম আর কাহার ভরসায় দামুন্যায় বাস করিবেন? কৃষিকার্য কবির জীবিকা। অত্যাচারী রাজকর্মচারীরা জমির কোণে দড়ি দিয়া মাপিয়া পনের কাঠার জমিকে এক বিঘা ধরিয়া লইয়া সেই হারে খাজনা ধার্য করিল, অনাবাদী (খিলভূমি) জমিকেও সুফলা জমি বলিয়া তাহারও খাজনা বাড়াইয়া দিল। সর্বোপরি বিধর্মী শাসক "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল অরি।" যেখানে প্রাণ বিপন্ন, ধর্মে বাধা এবং উপজীবিকা বন্ধ, অত্যাচারী মুসলমান-প্রভাবিত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যাওয়া ছাড়া কবি আর কী করিবেন? প্রতিবেশীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মুকুন্দরাম পত্নী, কনিষ্ঠ ভাই রমানাথ (রামানন্দ), শিশুপুত্র এবং একজন অনুচর (দামোদর নন্দী) সঙ্গে করিয়া দক্ষিণে হিন্দু-প্রধান নিরাপদ অঞ্চল মেদিনীপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। পথের দুঃখ-কষ্ট অবর্ণনীয়। সামান্য যে অর্থবল ছিল, রূপরায় নামক এক ডাকাত তাহা কাড়িয়া লইল। ক্রমে মুড়াই নদী পার হইয়া, ভেঙ্গুটিয়া গ্রাম ছাড়িয়া দারুকেশ্বর-নারায়ণ-পরাশর আমোদর প্রভৃতি নদ-নদী অতিক্রম করিয়া অতি দুঃস্থ অবস্থায় কবি সপরিবারে গুচুড়ে গ্রামে উপনীত হইয়া এক পুকুরের পাড়ে আশ্রয় লইলেন। তৈলহীন রুক্ষ স্নানের পর শালুক ডাঁটা হইল তাঁহাদের খাদ্য। কবি শুধু জলপান করিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। শিশুটি কিন্তু ভাত খাইবার জন্য বায়না জুড়িল—"শিশু কান্দে ওদনের

---

[৩৯] ঐতিহাসিকের মতে মুকুন্দরাম যে সময়ের কথা বলিতেছেন, তখন 'ডিহিদার' পদের উদ্ভব হয় নাই। (দ্রষ্টব্য: বিশ্বভারতী পত্রিকায় (৩য় সংখ্যা, ১৩৬৩) ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের প্রবন্ধ।)

তরে।" ক্লান্ত, চিন্তিত, ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ-কবি সেই পুকুর পাড়ে ক্ষণেকের জন্য ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখিলেন দেবী চণ্ডী কবির মায়ের বেশে শিয়রে আবির্ভূত হইয়া কবিকে মন্ত্র দান করিলেন এবং নিজ মহিমা-বিষয়ক কাব্য লিখিবার নির্দেশ দিলেন। তারপর কবি শিলাবতী নদী পার হইয়া মেদিনীপুরের (তখন উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত) ব্রাহ্মণ-ভূমির ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপনীত হইলেন এবং শ্লোক রচনা করিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন। বাঁকুড়া রায় কবির বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া আশ্রয় দিলেন এবং কবিকে নিজ শিশুপুত্র রঘুনাথের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। মুকুন্দরামের দুঃখের রাত্রি পোহাইল। ক্রমে বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর মুকুন্দরামের ছাত্র রঘুনাথ রায় রাজা হইলেন—কবির মোটামুটি অবস্থা ফিরিল। কবি দেবীর স্বপ্নাদেশ যেন ভুলিয়াই গেলেন। তাঁহার অনুচর দামোদর নন্দী এই স্বপ্নের কথা জানিত এবং কবিকে চণ্ডীর কাব্য রচনা করিতে প্রায়ই অনুরোধ করিত। কবি আলস্যবশতঃ বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার একটি পুত্র মারা গেল। কবি আর বিলম্ব না করিয়া রঘুনাথের রাজ্যলাভের বেশ কিছুদিন পরে অনেক দিনের চেষ্টায় এই দীর্ঘ 'অভয়ামঙ্গল' (চণ্ডীমঙ্গল) কাব্য রচনা করিলেন। বলা বাহুল্য প্রাণরসে-উজ্জ্বল এরূপ বাস্তব জীবন-বর্ণনা মধ্যযুগের অন্য কোন কাব্যে আদৌ সুলভ নহে। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ তাঁহাদের কাব্যের প্রারম্ভে আত্মকথা বর্ণনা করিয়াছেন বটে, একটু বিস্তৃতভাবেই বলিয়াছেন—কিন্তু তাহা অত্যন্ত গতানুগতিক প্রথাপালনে পর্যবসিত হইয়াছে। এখন দেখা যাক, মুকুন্দরামের আত্মবিবরণ হইতে কবির আবির্ভাব-কাল ও গ্রন্থ-রচনা সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় কি না।

প্রথমে সন-তারিখযুক্ত পয়ারের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ১৭৪৫ শকাব্দে (১৮২৩—২৪ খ্রীঃ অঃ) রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।[৪০] উক্ত গ্রন্থের শেষে কালজ্ঞাপক এই কয়ছত্র মুদ্রিত হইয়াছিল :

[৪০] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত মুকুন্দরামের কীটদষ্ট একখানি মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গল আছে। ইহার ছাপার ছাঁদ অত্যন্ত পুরাতন। অক্ষর দৃষ্টে এবং গ্রন্থটির জীর্ণ অবস্থা হইতে অনুমান হয়, ইহা ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় পাদের পরবর্তী নহে। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও শেষপত্র নাই। ইহাই কি রামজয় বিদ্যাসাগরের সংস্করণ ?

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥
অভয়ামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসোর সহিত মাতা হইবে আনন্দ॥

'রস' শব্দকে 'ছয়' অর্থে ধরিলে (কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও মধুর এই সঙ্কেতের সাহায্যে ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাইবে। রসকে 'নয়' অর্থে ধরিলে (শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত রস)[৪১] ১৪৬৬-এর স্থলে ১৪৯৯ শকাব্দ (১৫৭৭ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইবে। এই শ্লোকটি রামজয় বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ ব্যতীত চণ্ডীমঙ্গলের আর কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। তবে সম্প্রতি বর্ধমান সাহিত্য সভায় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত একখানি চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথিতে[৪২] এই শ্লোকটি আছে :

শকে রষ রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতমত দিলা গিত হরের বণিতা॥
অভয়ামঙ্গল গিত গাইল মুকুন্দ।
আশোর সহিত মাতা হইবে আনন্দ।

অবশ্য পুঁথিটি অতিশয় অর্বাচীন কালের, ছাপা গ্রন্থেরও বিশ বৎসর পরে অনুলিপিকৃত। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয়তো পুঁথি-লেখক ছাপা গ্রন্থ হইতেই উক্ত কালজ্ঞাপক পয়ারটি বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ অনুমান পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ বর্ধমান-সাহিত্য-সভার পুঁথিটি অপর কোন প্রাচীনতর পুঁথির অনুলিপি, মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে উহার মিল নাই। সুতরাং কেহ কেহ মনে করেন যে, লিপিকার অন্য কোন পুঁথি হইতে ঐ সন-তারিখ পাইয়াছিলেন, ছাপা বহি হইতে নহে। এ অনুমান অসঙ্গত নহে। এই অনুমানের সাহায্যে বলা চলিবে, মুকুন্দরামের কোন কোন পুঁথিতে কালজ্ঞাপক পয়ার ছিল। সুতরাং অনুমানের মাত্রা আর একটু বাড়াইয়া বলা যাইতে

৪১ সাহিত্যদর্পণের মতে রস নয় প্রকার। মতান্তরে শান্ত রসকে বাদ দিয়া রসকে আট প্রকার ধরা হয়। অমরকোষে রস আট প্রকার কথিত হইয়াছে।

৪২ ডঃ সুকুমার সেন বিশ্বভারতী পত্রিকায় 'মুকুন্দরামের দেশত্যাগ কাল' প্রবন্ধে এই পুঁথিটির উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী পত্রিকা (১৩৬৩, মাঘ-চৈত্র) এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' (পৃ. ২০৪-২০৫) দ্রষ্টব্য।

পারে যে, রামজয় বিদ্যাসাগরের ছাপা গ্রন্থটি যে পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ সন-তারিখ ছিল, এবং বর্ধমান-সাহিত্য-সভার পুঁথিটিও যে পুঁথির অনুলিপি, তাহাতেও ঐ সন-তারিখ ছিল। অবশ্য যাঁহারা এই অনুমান মানিতে চাহিবেন না, তাঁহারা হয়তো বলিবেন যে, বর্ধমান-সাহিত্য-সভার পুঁথিটি কোন পুরাতন পুঁথির অনুলিপি হইলেও পুঁথির আধুনিক লেখক সন-তারিখটি ছাপা গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আরও দুই স্থলে এইরূপ সন-তারিখ পাওয়া গিয়াছে। একটি—চট্টগ্রামে প্রাপ্ত মুকুন্দরামের চৌতিশা। ইহা মূল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রাপ্ত পুঁথিটিতে বহু গণ্ডগোল আছে। ইহার রচনা-কালজ্ঞাপক শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য:

> শাকে ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত।
> পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত॥[৪৩]

এখানে কেহ কেহ 'সিন্ধু'কে 'ইন্দু' ধরিয়া ১৫১৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছেন। তৃতীয়টি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিশাল-লোচনীর গীত' নামক পুঁথিতে উল্লিখিত।[৪৪]

এখন দেখা যাক এই তারিখগুলির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত গ্রন্থের তারিখে 'রস'কে ছয় ধরিলে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ (১৪৬৬ শক) এবং নয় ধরিলে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ (১৪৯৯ শক) পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত চৌতিশার পুঁথিতে ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ (১৫১৫ শক) পাওয়া যাইতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে সন-তারিখ নির্ণয়ে 'রস' শব্দটি সাধারণতঃ ছয় অর্থে ব্যবহৃত হইত, নয় অর্থে নহে।[৪৫] অর্থাৎ এই মতে

[৪৩] নগেন্দ্রনাথ বসু নাকি একটি পুঁথিতে এই শ্লোক পাইয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Date of Kavikankan Mukunda Ram Chakravarty*, 'Journal of the Department of Letters', Vol. XVI (1927).

[৪৪] বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৬৩) ডঃ সুকুমার সেনের প্রবন্ধে উল্লিখিত।

[৪৫] অবশ্য নয় অর্থে ('নবরস') যে এই 'রস' প্রযুক্ত হয় নাই, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ মুকুন্দরামের অন্যত্র আছে:

> প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বৈসে
> নবরস হয় এক স্থানে॥

অর্থাৎ বালিকার এগার বৎসর বয়স হইলে মনে কামের উদ্রেক হয় এবং নয়টি রস একত্রে অবস্থান করে। দ্রষ্টব্য: ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।

উক্ত পয়ার ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ (১৪৬৬ শক) নির্দেশ করিতেছে। কবি যখন স্ত্রীপুত্রাদির হাত ধরিয়া নিজ বাস্তুভূমি ত্যাগ করিয়া নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দক্ষিণে মেদিনীপুরের পথে উঠিলেন, তখন গোচড়িয়া (আধুনিক গুচুড়ে গ্রাম, ঘাঁটাল মহকুমার অন্তর্গত) গ্রামের এক পুকুর পাড়ে পঁহুছিলেন তখন—

ক্ষুধাভরে পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
হাতে লইয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥

এই তারিখটি (১৫৪৪ খ্রীঃ অঃ) বোধহয় এই সময়কে নির্দেশ করিতেছে। রসকে ছয় অর্থে ধরিলে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, নয় অর্থে ধরিলে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়েই কবি কাব্য রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ পান।

১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দটি নানা কারণেই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ কবির আত্ম-পরিচয়ে প্রকাশ যে, তিনি প্রথমে বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার শিশুপুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রায় রাজা হন। তাঁহার রাজ্যকাল ১৫৭৩-১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। কবির স্বপ্নদর্শন ইহার অনেক পূর্ববর্তী ঘটনা ; সুতরাং ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ বাতিল হইয়া যায়। অবশ্য যাঁহারা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দকেই ধরিয়া থাকিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে, কবি আত্মপরিচয়ে যে সামাজিক ও শাসন-বিশৃঙ্খলার কথা বলিয়াছেন, তাহা এই সময়ে অর্থাৎ দাউদ খাঁ কররানি ও মুঘল সংঘর্ষের সময়ে ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমরা যে সনটি (১৫৪৪ খ্রীঃ অঃ) গ্রহণ করিতে চাই, সেই সময়েও বাঙলার ইতিহাসে অনুরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট ঘনাইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পাঠান অধিকারের শেষ দিকে সুরবংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার কালে ১৫৩৭ হইতে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ঘনাইয়াছিল।[৪৬] হুসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহ ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ শাহ্‌কে হত্যা করিয়া গৌড়ের সুলতান হন (১৫৩৩)। ইহার নির্বুদ্ধিতার ফলে হুসেনশাহী

[৪৬] বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৩, মাঘ-চৈত্র

বংশের সর্বনাশ হয়। শেরশাহের সহিত সংঘর্ষে ইনি সর্বস্বান্ত হন, এই সময়ে বাঙলায় নানা বিপর্যয় দেখা দেয়। মুকুন্দরামের কোন কোন পুঁথিতে 'হৈল রাজা মামুদ শরিফ' পাঠ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, এ মামুদ শরিফ আর কেহ নহেন—গিয়াসুদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহ্‌। সুতরাং উক্ত সামাজিক বিশৃঙ্খলা, যাহার জন্য মুকুন্দরাম বাস্তভিটা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা মুঘল-পাঠান সংঘর্ষের কাল নহে, উহা হুসেনশাহী বংশের সঙ্গে সুরবংশের সংঘর্ষের সূচনা করিতেছে।[৪৭] তাই মনে হয়, কবি যে সময়ে ঘর ছাড়িয়াছিলেন এবং পথে দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হওয়াই সম্ভব। অবশ্য রঘুনাথ রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তি-কালের যে বিবরণ রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' দেওয়া হইয়াছে,[৪৮] তাহার প্রামাণিকতা অস্বীকার করিলে রঘুনাথ রায়ের রাজ্যকাল-সংক্রান্ত সন-তারিখের তথ্য দাঁড়াইতে পারে না। যাহা হোক পুঁথিতে প্রাপ্ত সন-তারিখ এবং ব্রাহ্মণভূমির জমিদার রঘুনাথ রায়ের রাজ্যকাল ধরিয়া যদি কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আনুমানিক ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি গৃহত্যাগ করেন এবং ঐ সময়ে স্বপ্নে কাব্যরচনার প্রত্যাদেশ পান, তাহা হইলে বিশেষ আপত্তি থাকিবে না।

কিন্তু আর একটি দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি আছে। মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক ত্রিপদীতে (মুদ্রিত গ্রন্থ) আছে :

[৪৭] এই মামুদ শরিফ যে মুকুন্দরামের আত্মজীবনীর 'ডিহিদার মামুদ শরিফ' তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ উক্ত আত্মজীবনীতেই আছে :

সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ॥

সুতরাং এ মামুদ শরিফ মানসিংহেরই সমকালীন কোন শাসনকর্তা হইবেন—কেহ কেহ এরূপ অনুমানও করিতে পারেন।

[৪৮] ১৮৭৩ সনের প্রথম সংস্করণে ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন : "আমাদের পরম সুহৃৎ মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কবিকঙ্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল ও বংশাবলী প্রভৃতি পূর্বোল্লিখিত রাজধানী হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তদ্দারা জানা যাইতেছে যে, রাজা রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ শক (১৫৭৩ খ্রীঃ অঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৪ শক (১৬০৩ খ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত ৩০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন।"

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ॥

মানসিংহ বিহারের সিপাহ্‌সালার নিযুক্ত হন ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৫৯০ সালে তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহী আফগানদিগকে দমন করেন। তিনি বাঙলার শাসক (সিপাহ্‌সালার বা সুবাদার) ছিলেন ১৫৯৪ হইতে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কবি যদি এই সময়ে ঘর ছাড়েন, তাহা হইলে কাব্যরচনাকাল ১৫৯৪ সালে নামিয়া আসে। 'গ্রন্থ উৎপত্তির বিবরণ' নামে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, রাজা মানসিংহের 'গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' থাকিবার কালে কোন-এক ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে কবি ঘর ছাড়েন এবং এই সময়ে স্বপ্নাদেশ লাভ করেন। মানসিংহকে ধরিলে পুঁথি বা ছাপানো গ্রন্থের সনতারিখের আক্ষরিক অর্থ গোলমাল হইয়া যায়। এই জন্য কেহ কেহ ইহার মধ্যে একটা রফা করিয়াছেন। কবি ঘর ছাড়িয়াছিলেন মানসিংহের অনেক পূর্বে, ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, তখন তাঁহার বয়স বেশি নহে; সঙ্গে একটা ছোট শিশু-সন্তানও ছিল ('শিশু কান্দে ওদনের তরে')। কিছু তরুণ বয়স না হইলে অরাজকতার সময়ে তিনি এতটা ঝুঁকি লইয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ পথে বাহির হইতে সাহস করিতেন না। ধরিয়া লওয়া যাক, ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি ঘর ছাড়িলেন তখন তাঁহার বয়স অন্যূন পঁচিশ। এই সময়েই তিনি স্বপ্নাদেশ লাভ করিলেন তারপর আরড়া ব্রাহ্মণভূমির ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পাইলেন, তাঁহার শিশুপুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক হইলেন—এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল। কবি স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়াও কাব্যরচনার বিশেষ উদ্যোগী হন নাই। এদিকে তাঁহার অনুচর দামোদর নন্দী কবিকে কাব্য রচনার জন্য তাগাদা দিত।[৪৯] তারপর কবির ছাত্র ও শিষ্য রঘুনাথ পিতার মৃত্যুর পর রাজপদ পাইয়া নিত্যই গুরুকে কাব্যরচনা করিতে অনুরোধ করিতেন।[৫০] ইতিমধ্যে "গীত না করিয়া

---

[৪৯] সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বরূপসন্ধি
অনুদিন করিত যতন॥

[৫০] নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ।

মৈল ছাল্যা"—তখন কবি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি রঘুনাথের রাজ্যাঙ্কে (১৫৭৩-১৬০৩ খ্রীঃ অঃ), মানসিংহের 'গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' হইবার সময়ে (১৫৯৪-১৬০৫ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচনা করিলেন। যখন তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একটি শিশুপুত্র ছিল। কিন্তু কাব্য রচনার কালে তিনি পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও পৌত্রের ("রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ন") উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যদি তাঁহার বয়স পঁচিশ হয়, তাহা হইলে গ্রন্থ রচনার সময় তাঁহার বয়স অন্যূন পঁচাত্তর হইবে। কবি যে তখন বেশ বৃদ্ধ, তাহার নানা প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে ছড়াইয়া আছে।[৫১] কিন্তু ইহার গুরুতর বিরুদ্ধ-প্রমাণ—মানসিংহের উল্লেখ। মুকুন্দরামের কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী তথ্য ও সন-তারিখ হইতে যথার্থ কালনিরূপণ অতিশয় দুরূহ তাহা অস্বীকার করিয়া সমস্যাটিকে অযথা লঘু করিবার প্রয়োজন নাই।

কবির কাব্য মানসিংহের সময়ে সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে দ্বিমতের অবকাশ অল্প। কিন্তু কবি কবে গৃহত্যাগ করিলেন, এবং স্বপ্নাদেশ লাভ করিলেন, ইহা লইয়াই যা কিছু মতভেদ। রঘুনাথের রাজ্যকাল ধরিয়া ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দকে গৃহত্যাগের কাল নির্দেশ করিতে হয়। রঘুনাথের কাল জানা না থাকিলে ('শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা') ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, এই মতে আর কোন আপত্তি থাকিবে না। ১৩১২ বঙ্গাব্দের 'প্রদীপে' অম্বিকাচরণ গুপ্ত এই বিষয়ে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তদনুসারে রঘুনাথের রাজ্যকাল অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।[৫২]

---

[৫১] কোন কোন সংস্করণে লহনার ঔষধ সন্ধানের বর্ণনায় কবি পরিহাস করিয়া নিজের কথা উল্লেখ করিযাছেন, "বুড়ারে না করে গুণ মোহন ঔষধ।"

[৫২] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সন-তারিখ নির্ণয়ের মতো বিড়ম্বনা আর নাই। ডঃ সুকুমার সেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৩, মাঘ-চৈত্র) এইরূপ একটি বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে ১৫৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল রচনা সমাপ্ত হয়। তখন রঘুনাথ ব্রাহ্মণভূমির রাজা। কাব্যে রঘুনাথের কোন পুত্রের উল্লেখ নাই বলিয়া ডঃ সেন অনুমান করেন, "চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময়ে রঘুনাথের পুত্র জন্মায় নি।" ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথের কত বয়স হইতে পারে? ১৫৪৪ সালে যখন কবি আরড়ায় পৌছিলেন, তখন রঘুনাথের পিতা বাঁকুড়া রায় কবিকে শিশুপুত্র রঘুনাথের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ধরিয়া লওয়া যাক তখন রঘুনাথের বয়স চার-পাঁচ বৎসর, অর্থাৎ ১৫৪০ সালের দিকে রঘুনাথের জন্ম হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে কাব্য সমাপ্তিকালে (১৫৯১-৯২) রঘুনাথের অন্যূন বয়স হইবে পঞ্চাশ বৎসর। তখনও রঘুনাথের পুত্র চক্রধরের জন্ম হয় নাই? চক্রধর ১৬০৪ সালে রাজা হন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৫৪৪ সালে মুকুন্দরামের গৃহত্যাগ, ১৫৯১ সালে গ্রন্থসমাপ্তি এবং তখনও রঘুনাথ অপুত্রক—ইহার মধ্যে হিসাবের বিশেষ গোলমাল আছে। (দ্রষ্টব্য : প্রদীপ, ১৩১২)

সুতরাং নূতন কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলে এই রূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, কবি ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে গৃহত্যাগ করেন, ঐ সময়ে পথিমধ্যে কাব্যরচনার জন্য দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদেশ লাভ করেন এবং তাহার প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে রঘুনাথ রায়ের রাজ্যকালে ১৫৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সমাপ্ত করেন। অবশ্য যাঁহারা প্রশ্ন তুলিবেন যে, স্বপ্নাদেশ লাভের অর্ধ শতাব্দী পরে মুকুন্দরাম কাব্যরচনায় অগ্রসর হইবেন, ইহাও তো অল্প সংশয়ের বিষয় নহে। তাঁহারা বরং বলিবেন, ১৫৭৭ সালে মুকুন্দরাম ঘর ছাড়িলে এবং স্বপ্নাদেশ লাভ করিবার চৌদ্দ-পনের বৎসর পরে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলে স্বাভাবিকতার খুব বেশি হানি হইবে না। কিন্তু ইহার মধ্যে যাঁহারা রঘুনাথ রায়ের রাজ্যকালকে (১৫৭৩-১৬০৩) তুরুপ হিসাবে ব্যবহার করিবেন, তাঁহারাই উপস্থিত ক্ষেত্রে জিতিয়া যাইবেন। যাহা হোক নূতন কোন তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইবে না, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাইতেছি।

কাব্য-পরিচয়॥ মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী দুইজন কবি মাণিকদত্ত ও দ্বিজ-মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মুকুন্দরাম মাণিক-দত্তের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সুতরাং কাব্যরচনায় তিনি মাণিকদত্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু তিনি চট্টগ্রামের দ্বিজমাধবের কোন সংবাদ রাখিতেন না। তিনি যেখান হইতেই উপাদান সংগ্রহ করুন না কেন, কাব্যটির শিল্পরূপ দিয়াছিলেন নিজ প্রতিভার প্রেরণায়। প্রথম খণ্ড বা আক্ষেটিক খণ্ডের ঘটনা: বন্দনা, সৃষ্টিপ্রকাশ, দক্ষ-শিব-সতী, সতীর তনুত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ নাশ, গৌরীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ ও কৈলাসে আগমন—ইহা হইল দেব-কাহিনী তথা ভূমিকা। তার পর মর্ত্য-কাহিনীর সূচনা। মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচারের জন্য ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ও তৎপত্নী ছায়াকে যথাক্রমে ব্যাধ ধর্মকেতুর গৃহে কালকেতু এবং সঞ্জয়ের ঘরে ফুল্লরা রূপে জন্মলাভ করিতে হইল। তার পরের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সূত্র—কালকেতুর বয়ঃপ্রাপ্তি, ফুল্লরার সঙ্গে বিবাহ, পশু শিকারে কালকেতুর বীরত্ব, দেবীর নিকটে পশুদের অভিযোগ[৫৩], দেবীর স্বর্ণগোধিকা রূপধারণ, কালকেতুর

[৫৩] চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবীকে কেহ কেহ কিরাতের দেবী বলিতে চাহেন শুধু এই কাহিনীটির জন্য। ধনপতির কাহিনীতে দেবী বণিকের উপাস্যা।

গোধিকা বন্ধন ও আনয়ন, দেবীর স্বরূপ প্রকাশ এবং কালকেতুকে কৃপা। এ পর্যন্ত কাহিনীতে উপকাহিনী, বৈচিত্র্য বা বিপরীত কাহিনীর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাইবে না। (কাহিনীর দ্বিতীয়াংশেই ঘটনা নাটকীয় দ্রুততায় অগ্রসর হইয়াছে এবং দৈব প্রভাবের স্থলে বাস্তব মানুষের পুরুষকারের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে।) ইহার পরের কাহিনী—দেবীর কৃপায় ব্যাধ কালকেতুর ঐশ্বর্য লাভ, বন কাটিয়া গুজরাট নগর পত্তন, বুলান মণ্ডল, ভাঁড়ু দত্ত প্রভৃতির আগমন, মুসলমান-ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-গোপ-ধীবর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের গুজরাটে বাসস্থাপন, ভাঁড়ু দত্তের অন্যায় আচরণে কালকেতু কর্তৃক তাহার অপমান, অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভাঁড়ু দত্তের কলিঙ্গরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র, কলিঙ্গরাজের গুজরাট আক্রমণ, ভাঁড়ু দত্তের বিশ্বাসঘাতকতায় কালকেতুর কারাবাস, কালকেতু কর্তৃক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীর স্তব, কলিঙ্গরাজের প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ, কালকেতুর মুক্তি-লাভ ও সম্মান প্রাপ্তি, ভাঁড়ু দত্তের যথাযোগ্য শাস্তি, কালকেতু-ফুল্লরার শাপের অবসান, পুত্র পুষ্পকেতুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বর্গের নীলাম্বর ও ছায়ার স্বর্গধামে সশরীরে যাত্রা[৫৪]—এই স্থানে আক্ষেটিক পর্ব সমাপ্ত হইয়াছে। এই কাহিনীর দেবতাদের চরিত্র ও ঘটনার কিয়দংশ

---

৫৪ দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গানে কালকেতু ও ফুল্লরা চিতানলে দেহ সমর্পণ করিয়া স্বর্গে গিয়াছিল.

স্নান করিল দুহে স্রোত গঙ্গার জলে।
প্রজার তরে করে আজ্ঞা জ্বালিতে আনলে।।
বেদ হস্তে বান্ধি কুণ্ড কৈল নিয়োজিত।
মলয়জ কাষ্ঠে অগ্নি হইল প্রজ্বলিত।।
অগ্নি দেখিয়া বীর সাহসে প্রবীণ।
সপ্তবার হুতাশন কৈল প্রদক্ষিণ।।
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া সপ্তবার।
হরিহরি স্মরি পড়ে ইন্দ্রের কুমার।।
তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল রমণী।
গুজরাটের লোক সবে দিল জয়ধ্বনি।।
পাবকেতে ভর করি দুহার জিউ যায়ে।
রথ ভরে ঠেকাইল মঙ্গলচণ্ডিকায়ে।।

পুরাণ হইতে, কিছুটা-বা লোকজীবনের আদর্শ অনুসারে পরিকল্পিত। দেবকাহিনীর মধ্যে এমন কোন বৈচিত্র্য নাই যাহা আধুনিক কালের পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারে। কেবল ঘরজামাই শিবের দুর্দশা এবং সেই প্রসঙ্গে মাতা মেনকার সঙ্গে গৌরীর কোন্দল বিশেষ উপভোগ্য। নিষ্কর্মা ঘরজামাই পুষিয়া মেনকা কন্যার নিকট অভিযোগ করিলেন, "ঘরজামাই পুষিব কতকাল ?"

রান্ধি-থাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত॥

ইহাতে গৌরী ফুঁসিয়া উঠিলেন, কলহবিদ্যায় তিনিও নিতান্ত অপটু নহেন :

এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন।
ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন॥
জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান।
তাহে ফলে মাষ মুগ তিল সধা ধান॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।
আজি হইতে তোমার দুয়ারে দিনু কাঁটা॥
মৈনাক তনয় লয়্যা সুখে কর ঘর।
কত না সহিব খোঁটা যাব দেশান্তর॥

এই বর্ণনা দেবলীলাকে বাঙালীর ঘরের দ্বারে আনিয়া ফেলিয়াছে।

মুকুন্দরাম কালকেতুর কাহিনীটির উদ্ভাবয়িতা না হইলেও ইহার বৈচিত্র্য-সাধনে তাঁহার দান অপরিসীম। ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরার জীবনকথাকে তিনি ব্রাহ্মণ্য আদর্শের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে চাহেন নাই। ব্যাধকে ব্যাধ রাখিয়াই তিনি কাহিনীটির আদ্যন্ত সঙ্গতি বজায় রাখিয়াছেন। এই কাহিনীটিতে দেবীমাহাত্ম্য অবশ্য আছে, কিন্তু কালকেতুর স্বকৃতচেষ্টার দ্বারা গুজরাট নগর স্থাপনের বর্ণনা বাস্তবিক কৌতূহলপ্রদ। বিশেষতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের গুজরাটে আগমনের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় কবির দেশ-সমাজ-শ্রেণী সম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শিতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। মুসলমান সমাজের বর্ণনা বিস্ময়কর তথ্যে অতিশয় মূল্যবান :

ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিতপাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।

ছোলেমানী মালা করে জপে পীরপেগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরাণ।
কেহ-বা বসিয়া হাটে পীরের শিরিনি বাঁটে
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান ॥

মুসলমান সমাজ-বর্ণনায় তিনি শুধু খুঁটিনাটি তথ্য দেন নাই, তাহার সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। বরং কোন কোন ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার মন্তব্য কিছু তিক্ত

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে
চাউলের কোচ্ড়া বান্ধে টান ॥

ভাঁড়ু দত্তের দ্বারা কাহিনীটি তির্যকতা লাভ করিয়াছে। কালকেতু এই ধূর্ত অসাধু ব্যক্তিটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলে সে-ই কলিঙ্গরাজকে গুজরাট আক্রমণে উত্তেজিত করিয়াছে এবং তাহারই কৌশলে কালকেতুকে বিশেষ অপমান ভোগ করিতে হইয়াছে।

কাহিনীটির দ্বিতীয় অংশ, যাহা বণিকখণ্ড নামে পরিচিত, তাহা প্রথমটির মত সংহত-গঠন নহে। যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকিলেও, মনে হয়, কবি অযথা অপ্রয়োজনে প্রচুর উপাদানের দ্বারা কাহিনীটিকে দীর্ঘ করিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, বণিকখণ্ডের কাহিনী আরও সংক্ষিপ্ত ও সংহত হইলে মুকুন্দরামের প্রতিভার সম্মান বাড়িত।

ব্যাধের দ্বারা গুজরাটে দেবীপূজা প্রচারিত হইল। এইবার অভয়া সখীদের সঙ্গে যুক্তি করিলেন, স্বর্গের কোন অপ্সরী-নর্তকীকে মর্ত্যে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পূজা প্রচারে পাঠাইতে হইবে। ইন্দ্রের নর্তকী রত্নমালা নৃত্যের সময় তালে ভুল করিলে দেবী সেই সুযোগে তাহাকে অভিশাপ দিলেন, "মানব হৈয়া জন্ম চল বসুমতি।" ইছানী নগরে বণিক লক্ষপতির ঔরসে রম্ভাবতীর গর্ভে তাহার জন্ম হইল। নাম রাখা হইল খুল্লনা। ইহার পর কাহিনীটি অতি দীর্ঘ, নানা পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের কাহিনী : বয়ঃপ্রাপ্তা খুল্লনাকে দেখিয়া ধনপতি বণিকের বিবাহের ইচ্ছা, প্রথমা পত্নী রুষ্টা লহনাকে

ধনপতির সন্তোষসাধন, ধনপতি ও খুল্লনার মহাসমারোহে বিবাহ, বিবাহের পর শুকপক্ষীর খাঁচা আনিবার জন্য ধনপতির গৌড়ে যাত্রা, লহনা-খুল্লনার সম্প্রীতি, তাহা দেখিয়া তুর্বলা দাসীর তুশ্চিন্তা, লহনাকে কুমন্ত্রণা দান, স্বামী-বশের জন্য লহনার লীলাবতী ব্রাহ্মণীকে আনয়ন, উভয়ের কুপরামর্শ, অনুপস্থিত ধনপতির হস্তাক্ষর জাল করিয়া পত্ররচনা, খুল্লনাকে ছাগ সংরক্ষণে নিয়োগ, খুল্লনার বাধ্য হইয়া ছাগ চরাইতে গমন, দারুন তুঃখ ভোগ, চণ্ডিকা পূজা, চণ্ডিকার বরলাভ, ধনপতির স্বদেশে প্রত্যাগমন, ধনপতির লহনাকে ভর্ৎসনা, এবং খুল্লনার প্রতি সপ্রেম ব্যবহার, খুল্লনার গর্ভ, খুল্লনার ছাগরক্ষণের ব্যাপারে নিমন্ত্রিত কুটুম্বগণের নিমন্ত্রণ গ্রহণে মতভেদ, নানা পরীক্ষায় সতী খুল্লনার সসম্মানে উত্তরণ, ধনপতির ব্যবসা-বাণিজ্যে যাইবার উদ্যোগ, যাইবার সময় খুল্লনাকে ঘট পাতিয়া চণ্ডীপূজা করিতে দেখিয়া সক্রোধে ধনপতির ঘটে পদাঘাত, সিংহল যাত্রাপথের বর্ণনা, কালীদহে 'কমলে-কামিনী' দর্শন, সিংহলে শালবাহন রাজার সমীপে এই বৃত্তান্ত কথন, রাজাকে ঐ দৃশ্য দেখাইতে ব্যর্থ হওয়ায় ধনপতির বন্ধন ও কারাবাস। দ্বিতীয় পর্বের কাহিনী: খুল্লনার গর্ভে শাপভ্রষ্ট মালাধরের শ্রীমন্তরূপে জন্ম, বালক শ্রীমন্তের বিদ্যাভ্যাস, শিক্ষক জনার্দন ওঝার সঙ্গে দ্বন্দ্ব, জনার্দন কর্তৃক শ্রীমন্তের পিতার বিষয়ে কুকথা, পিতার সন্ধানে শ্রীমন্তের বাণিজ্যে যাত্রা, পথের বর্ণনা, 'কমলে-কামিনী' দর্শন, সিংহল-রাজের নিকট ধনপতির মতোই কারারুদ্ধ, শ্রীমন্তের মশানে আগমন, শ্রীমন্তের দেবী-স্তুতি, দেবীর মশানে হানা, সিংহলরাজ্যে ভীষণ উৎপাত, সিংহলরাজের চৈতন্য। চণ্ডিকাস্তব, শ্রীমন্ত ও ধনপতির মিলন, রাজকন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ, কিছুকাল নববধূসহ সিংহলে অবস্থান, পরে সিংহলরাজ কর্তৃক কন্যা-জামাতাকে বিদায়দান, স্বদেশে সকলের প্রত্যাবর্তন, দেশে ফিরিয়া রাজা বিক্রমকেশরীকে 'কমলে-কামিনী' প্রদর্শন, রাজকন্যা জয়াবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের আবার বিবাহ, সুশীলার অভিমান, শ্রীমন্তবেশী মালাধর ও খুল্লনাবেশিনী রত্নমালার স্বর্গে যাত্রা, মর্ত্যলীলা সাঙ্গ। বণিকখণ্ডে এই দীর্ঘকাহিনী নানা খুঁটিনাটি বর্ণনার দ্বারা আরও দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই অংশের কাহিনী-গ্রন্থন ও বর্ণনায় মুকুন্দরাম পরিমিত শিল্পবোধের পরিচয় দিতে পারেন নাই, মূল ঘটনার ধারাবাহিকতা ও ঋজুতা মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রার তুইবার বর্ণনায় শিল্পচাতুর্যের অভাব

ঘটিয়াছে। যাহা হোক, বণিকসমাজে দেবীর পূজা প্রচার লাভ করিলে তিনি ভব্য সমাজে পাংক্তেয় হইলেন। চণ্ডী প্রধানতঃ স্ত্রীসমাজের দেবতা তাহা এই অংশ হইতে বোধগম্য হইবে। বর্ণনার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য থাকিলেও তদানীন্তন দেশ, কাল, সমাজ, বহির্দেশীয় ভৌগোলিক বর্ণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে দামুন্যা-আরড়ার কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কাহিনীর মধ্যে অনেক অলৌকিকতা আছে, তাহাকে অবশ্য অ্যারিস্টট্‌লের মতে *deus ex machina* বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। কিন্তু মানুষের কাহিনীর প্রতি কবির অধিকতর কৌতূহল ছিল। কালকেতুর কাহিনীর তুলনায় ধনপতির কাহিনীতে বৈচিত্র্য অধিক, সীমাও দূরসম্প্রসারী; কিন্তু পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাবে দ্বিতীয় কাহিনীটি প্রথম কাহিনীটির মতো চিত্তাকর্ষী হইতে পারে নাই।

চরিত্র-পরিচয় ॥ মুকুন্দরামের প্রধান বৈশিষ্ট্য—চরিত্র-পরিকল্পনা। বস্তুতঃ মধ্যযুগে বাস্তব জীবনচিত্রাঙ্কনে মুকুন্দরামের সমান প্রতিভাশালী কবি আর একজনও পাওয়া যাইবে না। প্রসঙ্গক্রমে ভারতচন্দ্রের কথা মনে হইবে। ভারতচন্দ্র চরিত্রচিত্রণে ততটা সার্থক নহেন, যতটা মণ্ডনকলায় কুশলী। মুকুন্দরামের রচনারীতিতে চারুত্ব ও বক্রতার অভাব আছে, কিন্তু বিচিত্র চরিত্রচিত্রে সে ত্রুটি ঢাকিয়া গিয়াছে। কাহিনীকেন্দ্রিক রচনায় চরিত্র-প্রাধান্য আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত এই কবির চরিত্র-পরিকল্পনায় আধুনিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। তিনি দেবদেবীর চরিত্রগুলিকে যথাসম্ভব মনুষ্যধর্মের দ্বারা জীবন্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহার প্রশংসা নহে। তিনি মর্ত্যের মানবচরিত্র অঙ্কনে যে সহানুভূতি, বাস্তব জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দর্শনশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যেই দুর্লভ।

ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বর ও তাহার পত্নী ছায়া মর্ত্যলোকে ব্যাধের ঘরে জন্মাইয়াছিল। রত্নমালা ও মালাধর যথাক্রমে খুল্লনা ও শ্রীমন্তরূপে মর্ত্যভূমি স্পর্শ করিয়াছিল এবং মর্ত্যলীলাবসানে ও দেবীর পূজা প্রচারের পর স্বর্গের দেব-দেবী স্বর্গে ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যতদিন তাহারা মর্ত্যে ছিল, ততদিন এক মুহূর্তের জন্যও তাহারা জাতিস্মর হইয়া ওঠে নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হইলে এই ব্যাপার লইয়া কিছু না কিছু লিখিয়া ফেলিতেন।

(কালকেতু ফুল্লরাকে আমরা যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। ব্যাধ-নন্দন কালকেতু ভোজনে বসিয়াছে,—খুল্লনা বোঁচা নারিকেলে জল ভরিয়া দিয়া হরিণের ছাল পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল, বীর হাত পা ধুইয়া খাইতে বসিল :

মোচড়িয়া গোঁফ দুইটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ।
ছয় হাঁড়ি মুসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞ্জ আমড়া॥
... ...
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
ছোট গ্রাস গেলে যেন তেয়াটিয়া তাল॥

এখানে ব্যাধ-বীরের ভোজনের বর্ণনায় ডাইনিং-হলে আসীন বিলাসী ভব্য-সম্প্রদায় যে আঁতকাইয়া উঠিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কালকেতু দেবকৃপাপুষ্ট হইলেও বুদ্ধিবিবেচনায় সভ্য-ভব্যতার ধার দিয়াও যায় না। দেবীর আশীর্বাদে মাটি খুঁড়িয়া সে সাতঘড়া ধন পাইল। বাঁকে করিয়া দুই দিকে দুই ঘড়া লইয়া তিনবার ছয় ঘড়া ধন ঘরে তুলিল, বাকি রহিল এক ঘড়া। ফুল্লরা ঘরে বসিয়া ঘড়া পাহারা দিতেছে। শেষে কালকেতু দেখিল বাঁকে করিয়া প্রতিবারে দুই ঘড়া লইলে এক ঘড়া অবশিষ্ট থাকে। তখন সে দেবীকে অনুরোধ করিল, "এক ঘড়া ধন মাতা নিজ কাঁখে কর।" দেবী কি আর করিবেন, ভক্তের জন্য ধনঘড়া কাঁখে করিয়া বীরের পিছনে পিছনে চলিলেন! তার পরের কাহিনী :

পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু যায়॥
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছুপানে চায়॥
মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধন ঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী॥

কবি কালকেতুর চরিত্রটাকে আমাদের সামনে যেন খুলিয়া ধরিয়াছেন; তাহার অশিক্ষিত, অমার্জিত ব্যাধচরিত্রের বন্য সরলতা ও গ্রাম্য সংশয় এখানে চমৎকার ফুটিয়াছে। আদিকবি বাল্মীকি বেদ-বেদান্তে পারঙ্গম মারুতির

চরিত্রবর্ণনায় এই একই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে-হনুমান রামসেবক মহাপণ্ডিত, তিনিও মাঝে মাঝে বানর-স্বভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন।[৫৫])

কবিকঙ্কণ নায়কচরিত্র বা নেতৃস্থানীয় প্রধান পুরুষ-চরিত্রাঙ্কনে খুব একটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই—যেমন ধনপতির চরিত্র। ধনপতির চরিত্র নিতান্তই বিলাসী নায়ক চরিত্র হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চণ্ডী-বিরোধিতা মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের মনসা-বিরোধিতার পার্শ্বে অত্যন্ত ম্লান মনে হয়। দুইপত্নী লইয়া তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনটি স্নিগ্ধ মধুর, কখনও কখনও কৌতুক রসে বেশ উজ্জ্বল হইয়াছে, কিন্তু কোথাও একটা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ফুটিতে পারে নাই। তবে কাব্যের সমাপ্তিটি তাঁহার বিলাপে মিলনের মধ্যেও বিষণ্ণতার সুর ধ্বনিত করিয়াছে। পুত্র ও পত্নী স্বর্গের দেবদেবী; তাহারা শাপের অবসানের পর স্বর্গে চলিয়া গেল, আর ধনপতি শূন্য স্মৃতি বুকে আঁকড়াইয়া মর্ত্যভূমিতে পড়িয়া রহিলেন :

খুল্লনা প্রণাম করে পতির চরণে।
চরণে ধরিয়া রামা করে নিবেদনে॥
অনুমতি দেহ নাথ যাই সুরপুরী।
ইন্দ্রের নর্তকী আমি রহিতে না পারি॥
এত শুনি ধনপতি কান্দে উভরায়।
যাইবে ছাড়িয়া আমি না দিব বিদায়॥

এই বিলাপ প্রেম-প্রীতি-ব্যাকুল একটি সাধারণ মানুষের অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরাও ধনপতির দুঃখে সহানুভূতি বোধ করি।

(মুকুন্দরাম পুরুষ চরিত্রে, বিশেষতঃ প্রধান চরিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও স্ত্রীচরিত্র এবং পুরুষের তির্যক চরিত্রে অসাধারণ কুশলতা দেখাইয়াছেন।) ফুল্লরা, লহনা ও খুল্লনার চরিত্র যেন প্রতিদিনের দেখা-চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। ফুল্লরার সরলতা, খুল্লনার শান্তভাব, সাময়িক দুর্ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ এবং বিপদ কাটিয়া গেলে সতীনকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া

[৫৫] রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে (১০ম সর্গ) হনুমান সীতার সন্ধানে রাত্রিকালে রাবণের পুরী-মধ্যে নিদ্রিতা মন্দোদরীকে দেখিয়া ভ্রমক্রমে, "তাঁহাকেই সীতা মনে করিয়া আনন্দিত হইলেন; এবং বানরস্বভাব প্রদর্শনপূর্বক এক প্রান্তে গিয়া বাহু আস্ফোটন, পুচ্ছ চুম্বন, আনন্দে নৃত্য, বিবিধ ভাবভঙ্গী, গান ও লম্ফ প্রদানপূর্বক স্তম্ভে আরোহণ করিয়া পুনর্বার ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন।" (বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত বাল্মীকি-রামায়ণ, পৃ ৫৪৮)

দেওয়া—ইত্যাদি বর্ণনাসমূহ পরিপক্ক শিল্পীর লেখনী হইতেই বাহির হইয়াছে। কিন্তু লহনার প্রতি আমাদের অধিকতর সহানুভূতি রহিয়াছে। স্বামী তরুণী সপত্নী আনিয়াছে—তাহার লজ্জা, দুঃখ ও শঙ্কার সীমা নাই। তাহার উপর খুল্লনা আবার তাহার খুড়তুতো ভগিনী—যাহাকে 'বোনসতিনী' বলে তাহাই। সে পূর্বে জানিত রূপের ছলাকলায় স্বামীকে ধরিয়া রাখিবে :

পূর্বে জানিতাম আমী অধিন আমার স্বামী
স্মরজোরে পোহাব রজনী।
না জানি দৈবের মাইয়া আসি কোন্ পথ দিয়া
নারিকেলে সান্ধাইল পানী॥

সে স্বামী-বশের জন্য ঔষধ করিল, নবযুবতী সতীনকে অশেষ কষ্ট দিল, প্রথম স্বামী-সম্ভাষণে যাইতে তাহাকে নানাপ্রকার কাল্পনিক ভয় দেখাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তরুণী খুল্লনা স্বামীর আদরিণী হইল। ঈর্ষার জ্বালায় লহনা স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলে তরুণী-পত্নীরসে মুগ্ধ ধনপতি তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া গালি দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল :

চল্ ঘর ছাড়ি বাঁজি চল ঘর ছাড়ি।
যদি নাই খাবি বাঁজি পাউড়ির[৫৬] বাড়ি॥

অবশ্য পরে ধনপতি বিগতযৌবনা জ্যেষ্ঠা পত্নীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে চাহিলেও সে বুঝিল তাহার যৌবন গিয়াছে, দিনও গিয়াছে। এই যৌবন-দীনা স্বামীপ্রেম-বঞ্চিতা বন্ধ্যা নারীর ক্ষুব্ধ উক্তিতে কবির বিশেষ সহানুভূতি সঞ্চারিত হইয়াছে :

ফুরাল্য যৌবন কাল এবে সে সতিনী কাল
তৃণসম আপনাকে বাসি।
ঔষধ সাধিত যত সব হৈল বিপরীত
ঠাকুরানী হয়্যা হৈলুঁ দাসী॥
... ...
যৌবন মোহন ফান্দ ঔষধ বালির বান্ধ
মৃত্যু ভাল যৌবনবিহীন।
শত পরি অলঙ্কার সকল দেহের ভার
যৌবন তনুর আভরণ॥

ছোট লাঠি বা ছড়ি।

সে দুর্বলা দাসীর কথায় মুগ্ধ হইয়া খুল্লনাকে অশেষ কষ্ট দিয়াছে বটে, কিন্তু শুধু স্বামীপ্রেম হারাইবার ভয়েই সে নীচ ও নির্মম কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। তাহার চরম দুর্বলতা—সে বন্ধ্যা। এইখানেই তাহার প্রচণ্ড অক্ষমতা। খুল্লনার বধূ হইয়া আসিবার পর সেই অক্ষমতা তাহাকে কাঁটার মতো বিঁধিয়াছে। কবি এই মন্দভাগিনীকে আমাদের সহানুভূতির পাত্রী করিয়া তুলিয়াছেন, এই স্থানেই তাঁহার শিল্প-প্রতিভার জয় হইয়াছে। মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যের চরিত্রগুলি প্রায়শঃই 'একপেশে'—যাহাকে আধুনিক কালের সমালোচক flat character বলেন। কিন্তু মুকুন্দরাম লহনাচরিত্রে নানা ত্রুটির সমাবেশ করিয়াও তাহার দুর্ভাগ্যের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন; বর্তমান কালের পাঠক এইজন্য ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মুকুন্দরামকেও নিজ পাঠকক্ষে স্থান দিয়া থাকেন।

খল, দুষ্ট, চতুর ও স্বার্থপর তির্যক চরিত্রগুলির প্রতি মুকুন্দরামের অধিকতর সহানুভূতি লক্ষ্য করা যাইবে। আক্ষেটিক খণ্ডের দুঃশীল বণিক মুরারি শীল ও তস্য পত্নী বাণ্যানী, ভাঁড়ু দত্ত এবং বণিকখণ্ডের দুর্বলা দাসী প্রভৃতি চরিত্রগুলি এক একটি 'টাইপ' চরিত্রের আকারে ফুটিলেও তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আধুনিক কালেও পরম উপভোগ্য মনে হইবে। বণিক মুরারি শীল অতিশয় ধূর্ত, তাহার পত্নীও "যেন হাঁড়ির মত সরা!"[৫৭] কালকেতু দেবীর কৃপা লাভের পর 'সাতকোটি তঙ্কার' মূল্য মাণিক্য-অঙ্গুরী বিক্রয় করিবার জন্য বেণে মুরারি শীলের আস্তানায় হাজির হইয়াছে: কালকেতুর সাড়া পাইয়া সে ভিতরের কুঠুরীতে গা ঢাকা দিল, কারণ "মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি"—বোধহয় কালকেতু সেই দেড় বুড়ি চাহিতে আসিয়াছে। 'খুড়া খুড়া' বলিয়া কালকেতু ডাকাডাকি করিতে লাগিল। বেণের বাণ্যানী অধিক সেয়ানা, সে কালকেতুকে সাফ জবাব দিল, "ঘরেতে নাহিক পোতদার।" সেও ভাবিল, কালকেতু নিশ্চয় মাংসের বাকি দাম দেড় বুড়ি চাহিতে আসিয়াছে। কিন্তু কালকেতু যখন দাম চাহিল না, বরং বলিল:

---

[৫৭] ফুল্লরা-কালকেতুর বিবাহ প্রস্তাবে সোমাই পণ্ডিত, বরকন্যা যে রাজযোটক, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিল:

সেই বরযোগ্যা কন্যা তোমার ফুল্লরা।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা॥

শুন গো শুন গো খুড়ি কার্য কিছু আছে ডেড়ি
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা নিব কড়ি।

তখন প্রাপ্তির গন্ধ পাইয়া বাণ্যানী বলিয়া উঠিল :

কালু, দণ্ড দুই করহ বিলম্বন।
সরস করিয়া বাণী হাসি কয় বাণ্যানী
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥

এদিকে কিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া মুরারি খিড়কীর দরজা দিয়া ঢুকিয়া কালুর সঙ্গে আত্মীয়তা জুড়িয়া দিল,

বাণ্যা বলে, ভাইপো ইবে নাহি দেখি তো
এ তোর কেমন ব্যবহার।

যাহা হোক, অঙ্গুরীয়টির ওজন হইল ষোল রতি দুই ধান। বণিক হিসাব করিয়া বলিল :

সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কর‍্যাছ উজ্জ্বল॥

সুতরাং এ বেঙ্গা পিতলের আঙটির আর কতই বা দাম হইবে? হিসাব দাঁড়াইল সওয়া আট আনা,—পিতলের আঙটির আট আনা দাম, যথেষ্ট বৈকি! কালকেতু বুঝিল বণিক ঠকাইতে চায়। সে অন্যত্র যাইতে চাহিলে মুরারি কালকেতুর বাপের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিল :

ধর্মকেতু ভায়া সনে কৈলুঁ লেনা দেনা।
তাহা হইতে ভাইপো হয়্যাছ সেয়ানা॥

এই সমস্ত চরিত্রে যে প্রচ্ছন্ন পরিহাস-কৌতুকের আমদানি করা হইয়াছে, তাহা উচ্চ প্রতিভার পরিচায়ক। এই দিক দিয়া ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটি বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। এই খলপ্রকৃতির দুষ্ট ব্যক্তির নীচতা ও স্বার্থপরতার জন্য কালকেতুকে অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু কবির যেন তাহার প্রতিও বিরূপতা নাই, তাহার সমস্ত অন্যায় আচরণকে তিনিও কৌতুক-প্রসন্নতার সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন। কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করিতেছে, কত লোক আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে ভাঁড়ু দত্ত আসিয়া হাজির হইল। তাহার প্রথম আগমনটি যেন 'আবির্ভাব'—

ভেট লয়্যা কাঁচকলা　　　পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ুদত্তের পয়ান।
ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ　　　ছেঁড়াধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান।।
প্রণাম করিয়া বীরে　　　ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলেতে বসি　　　মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া।।

কালকেতুকে বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ করিয়া ভাঁড়ু দত্ত যখন সাধারণের উপর অত্যাচার করিয়া অন্যায়ভাবে টাকাকড়ি আদায় করিতে লাগিল, তখন কালকেতু আর সহিতে পারিল না, ভর্ৎসনা করিয়া বলিল :

ভাঁড়ু, কি তোর ব্যবহার।
কি কারণে লোট হাট রাজার বাজার।।

কথা কাটাকাটির পর ভাঁড়ু দত্ত সক্রোধে গুজরাট ছাড়িয়া গেল, যাইবার সময়ে কালকেতুকে শাসাইয়া গেল :

হরিদত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি।
হাটে লয়্যা বেচাইব বীরের ঘোড়া হাতী।।
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনর্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।।

ভাঁড়ু দত্ত নিজ প্রতিজ্ঞামতো ষড়যন্ত্র করিয়া কালকেতুর অশেষ দুর্গতি করিয়া ছাড়িল। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতু বন্দী হইবার মূলেও তাহার চক্রান্ত। যাহা হোক, দেবীর কৃপায় কালকেতু পুনরায় সগৌরবে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন বাতাস অন্য দিকে ঘুরিয়াছে দেখিয়া এই শঠ আসিয়া কপট উৎকণ্ঠায় বলিল :

তুমি খুড়া হৈলে বন্দী　　　অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।

কিন্তু এবার আর কালকেতু তাহার বাক্যপ্রবন্ধে ভুলিল না, ভাঁড়ুর উচিত শাস্তি বিধান করিল। তাহার মুখে অভক্ষ্য পুরিয়া বোঁচা ক্ষুরে চুলদাড়ি মুড়াইয়া তাহার অপমান ও শারীরিক নির্যাতন করিল, কেহ তাহার নেড়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিল, গলায় জবাফুলের মালা পরাইয়া বলির পাঁঠার

মতো সাজাইয়া দিল, নগরের অর্বাচীন বালকেরা তাহাকে টিটকারি দিতে দিতে চলিল। কুলবধূরাও তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইল, "কালো হাঁড়ি ফেলি মারে কুলের বহুড়ী।" অবশ্য তাহার দুর্গতি দেখিয়া কালকেতুর দুঃখ হইল, পরে দয়ালু রাজা তাহাকে, "কৃপা করি পুনর্বার দিল ঘরবাড়ী।" মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত অপূর্ব হইলেও দ্বিজমাধবের ভাঁড়ু দত্তে অধিকতর সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে। এখানে পাপের শাস্তি ও ক্ষমার দ্বারা poetic justice-এর প্রতি মুকুন্দরাম অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন। কাজেই ভাঁড়ুর সকরুণ পরিণাম কালকেতুর যেমন করুণা উদ্রেক করে, তেমনি পাঠকও তাহার অন্যায় সত্ত্বেও তাহার গুরুতর দণ্ডে দুঃখবোধ না করিয়া পারে না। এ পরিণাম নিতান্তই গতানুগতিক হইয়াছে। কিন্তু দ্বিজমাধবের ভাঁড়ু একেবারে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের 'ভিলেন' শ্রেণীর চরিত্র। দারুণ নির্যাতন অপমানেও তাহার শিক্ষা হয় না, স্বরূপ বদলায় না। কালকেতুর নিকট অশেষ দুঃখ পাইয়াও সে খল-প্রবৃত্তি ও ধূর্ততা ত্যাগ করিল না। কালকেতুর অনুচরেরা তাহার মাথা মুড়াইয়া গঙ্গাপার করিয়া তাড়াইয়া দিলে সে নূতন স্থানে গিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "গঙ্গাসাগরে গিয়া মুড়াইয়াছি মাথা।" যাহা হোক বাংলা সাহিত্যে যতগুলি খলচরিত্র আছে, তন্মধ্যে মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটি সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

পরিশেষে দুর্বলা দাসীর কথা উল্লেখ করিয়া আমরা চরিত্র-আলোচনা প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। দুর্বলা লহনার দাসী। ধনপতির খুল্লনা-বিবাহে লহনার আপত্তি ও অভিমান হইলেও ধনপতির প্রবাসবাসের কালে দুই সতীনে বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল। কিন্তু দুর্বলা দাসী সহিতে পারিল না :

কর্পূর তাম্বুল লয়্যা দু সতীনে থাকে শুয়্যা
য়েকত্র শয়ন দিবা রাতি॥

দুই সতীনের এত সম্প্রীতি দাসদাসীর শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। দুর্বলা ভাবে, দুই জনে একসঙ্গে থাকিলে দুই জনেরই কাজ করিয়া মরিতে হইবে, ত্রুটি ঘটিলে "দুজনে দিবে গালি।" সে মনে মনে ভৃত্যতন্ত্রের সারকথা বুঝিয়া ফেলিল :

যেই ঘরে দু-সতিনে না করে কন্দল।
সে ঘরে যে বসে চেড়ি সে বড় পাগল॥

অনুক্ষণ দু-সতীনে করয়ে কন্দল।
তবে দাসদাসী পায় পরম মঙ্গল॥

তাহারই কুমন্ত্রণায় দুই সতীনের গোলমাল পাকাইয়া উঠিল। তাহারই মন্ত্রণায় অল্পবুদ্ধি লহনা ক্ষেপিয়া ওঠে, ধনপতি ঘরে ফিরিলে দুর্বলার কথা শুনিয়া লহনা 'লাসবেশ' করিয়া সাধুর মনোহরণ করিতে গিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করে। দুর্বলার চরিত্র নিতান্ত স্বার্থ দিয়া রচিত হইলেও লহনার প্রতি তাহার একটু টান আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এগার বৎসর বয়সে লহনা ধনপতির ঘরে বধূ হইয়া প্রবেশ করিয়াছে। বোধহয় তখন হইতেই দুর্বলা ধনপতির বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতেছিল। সুতরাং পুরাতন জনের প্রতি তাহার কিছু মমতা থাকাই স্বাভাবিক। তবে মূলতঃ পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য সে দুই সতীনে কলহ বাধাইয়া দিয়াছে এবং নানা ব্যাপারে লহনার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। চরিত্রটিতে তির্যকতার অভাব থাকিলেও কবির বাস্তবতাবোধ সহজেই আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। মুকুন্দরাম খুব বৃহৎ মহৎ বিস্ময়কর বিশাল চরিত্র সৃষ্টি করিতে না পারিলেও সাধারণ, প্রত্যক্ষ, পরিচিত ও পাঁচাপাঁচি বাস্তব চরিত্রাঙ্কনে অসাধারণ কুশলতা দেখাইয়াছেন।

মুকুন্দরামের বাস্তবতা॥ বাস্তবতা, সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি, অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি—মুকুন্দরামের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিরাজ করিত বলিয়াই কেহ কেহ তাঁহাকে ঔপন্যাসিক প্রতিভাধর বলিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত কবির বাস্তব দর্শনশক্তি সম্বন্ধে যথার্থ বলিয়াছেন, "The thought and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali Literature."[৫৮] কেহ কেহ তাঁহার রচনায় 'উৎকৃষ্ট নাট্যলক্ষণ' পাইয়াছেন।[৫৯]

কেহ-বা তাঁহাকে "আধুনিক বাংলার বস্তুতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকদেরও অগ্রদূত" বলিতে চাহেন।[৬০] বাস্তবতা, চরিত্রবিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব (বিশেষতঃ নারী মনস্তত্ত্ব), পরিহাস-রসিকতা এবং ঔপন্যাসিক নিঃস্পৃহতা বিচার করিলে তাঁহার

৫৮ R. C. Datta—*The Literature of Bengal*

৫৯ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

৬০ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

চণ্ডীমঙ্গলে উপন্যাস ও নাটকীয় গুণ পাওয়া যাইবে।[৬১] এ যুগে জন্মাইলে তিনি কাব্য না লিখিয়া উপন্যাস লিখিতেন, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু প্রায় তাবৎ মঙ্গলকাব্যেই অল্পাধিক উপন্যাস ও নাটকীয় গুণ আছে, ইহা একা মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য নহে—যে-কোন আখ্যানধর্মী কাব্যেই (দেব-দেবী লীলাবিষয়ক হইলেও) উপন্যাসের ঘটনাবিবৃতি ও চরিত্রসৃষ্টি এবং নাটকীয় ঘটনা-সংবেগ থাকে। তবে মুকুন্দরামের প্রতিভা এই বৈশিষ্ট্যকে অপেক্ষাকৃত কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারিয়াছে। ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারসুলভ নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক চিত্তধর্ম তাঁহাকে অধিকতর সাহায্য করিয়াছে। নিজ জীবনে তিনি প্রচুর দুঃখ-দুর্ভাগ্য ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনের প্রতি তাঁহার মনে কোনরূপ তিক্ততা বা অপ্রসন্নতা সৃষ্টি হয় নাই। সর্বক্ষেত্রেই তিনি উপভোগক্ষম জীবনরসবোধ বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। এই জন্য এই মধ্যযুগীয় কাব্যখানি আধুনিক যুগেও সকলের প্রীতি লাভ করিয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত প্রভাব বেশি পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহার এই কাব্য বৃহত্তর 'জাতীয় কাব্য' না হইয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এ মতও বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে কোন কাব্যই কবির ব্যক্তিগত কাব্য হয় নাই, হওয়া সম্ভব ছিল না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এ দেশে উনিশ শতকের ব্যাপার এবং তাহা মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেই আসিয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য একান্ত-ভাবে দেবকৃপা-নির্ভর ; সুতরাং সে যুগে কবির ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা বড় কেহ শুনিতে চাহিত না। তবু আখ্যানকাব্যের কবিগণ গ্রন্থরচনার উপক্রমে

[৬১] এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত—"উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে বাঙ্গালা ভাষায় যদি এমন কোন গ্রন্থের নাম করিতে হয় যাহাতে আধুনিক কালের সাহিত্যবস্তুর—উপন্যাসের রস কিছু পরিমাণেও পাওয়া যাইতে পারে, তবে তাহা সে বই কী তাহা যিনি মানে বুঝিয়া মুকুন্দরামের কাব্য পড়িয়াছেন তিনি—সহৃদয় হইলে বুঝিবেন। নিপুণ পর্যবেক্ষণ, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে সব গুণ ভালো উপন্যাস-লেখকের রচনায় আমরা প্রত্যাশা করি, সে সব গুণ, সে কালের পক্ষে যথোচিত পরিমাণে মুকুন্দরামের কাব্যে পাই" ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ)। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এবিষয়ে সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, "দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।" ('বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা')

নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিয়া লইতেন, তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে এখন তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু মধ্যযুগীয় কোন কবি নিজ ব্যক্তিগত কাহিনীকে গ্রন্থমধ্যে টানিয়া আনেন নাই। মুকুন্দরাম দুই-এক প্রসঙ্গে নিজের কথা বলিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য কবির সদাপ্রসন্ন কৌতুকমুখর সজীব মনটিকে কোথাও ম্রিয়মাণ বা বিষণ্ণ করে নাই। সুতরাং (চণ্ডীমঙ্গলের এই কবিকে subjective poet বলা উচিত হইবে না, তাঁহার এই কাব্য ব্যক্তিগত কাব্য নহে।)

কোন কোন সমালোচক মুকুন্দরামের বাস্তবতাকে চসার ও ক্র্যাবের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। প্রাচ্য সাহিত্যরসিক ই. বি. কাউয়েল সাহেব মুকুন্দরামকে চসারের ও ক্র্যাবের সঙ্গে তুলনা দিয়া লিখিয়াছিলেন, "It is this vivid realism which gives such a permanent value to the description. Our author is the Crabbe among Indian poets and his work thus occupies a place which is entirely its own." চসারের বাস্তবানুগত্য ও রসরসিকতা মুকুন্দরামের রচনায় নিশ্চয়ই পুরামাত্রায় বর্তমান আছে, কিন্তু চসারের কল্পনার বৈদগ্ধ্য ও প্রকাশরীতির বৈচিত্র্য অধিকতর উপভোগ্য। তাহার কারণ একজন অভিজাত সমাজে বিচরণশীল ও রাজসভার কবি, আরেকজন গ্রাম্য ভূস্বামীর সভাতলে আসীন। বরং ভারতচন্দ্রের কল্পনার তির্যকতা অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ।

(কাউয়েল সাহেব মুকুন্দরামের বাস্তবানুগত্যের সঙ্গে ইংরেজ কবি ক্র্যাবের (১৭৫৪-১৮৩২) তুলনা দিয়াছেন। ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর কবির *The Village*, *The Parish Register* প্রভৃতি তীক্ষ্ণ বাস্তবধর্মী কবিতার সঙ্গে ১৬শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের কবির তুলনা যথোপযুক্ত নহে। ক্র্যাব তদানীন্তন কাব্যের রোমান্টিক কল্পনাবিলাসকে বাস্তব দৃশ্যের সুকঠিন আঘাতে চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের সেরূপ কোন অভিসন্ধি ছিল না। মুকুন্দরামের যুগটাও ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের সঙ্গে কোন দিক দিয়াই সমতুলিত হইতে পারে না।[৬২] ক্র্যাবের মধ্যে আঘাত, তীব্রতা, তিক্ততা—মুকুন্দরামের

---

[৬২] মুকুন্দরাম ও ক্র্যাবের তুলনা করিয়া ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ক্র্যাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য, "সমসাময়িক যুগের কাব্যে যে অবাস্তব সৌন্দর্যবোধ ও শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ পল্লীজীবনের আসল রূপটিকে আড়াল করিয়া দেখাইয়াছে, ক্র্যাবের কবিতা তাহারই

মধ্যে পরিহাস, কৌতুক, চিত্তের সরস প্রসন্নতা। কাজেই মুকুন্দরামকে যেমন পুরাপুরি চসার ও ক্র্যাবের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, তেমনি তাঁহাকে বিশুদ্ধ বাস্তব রস বা 'বস্তুতন্ত্রতা'র কবি বলিলেও 'কালানৌচিত্যদোষ' ঘটিবার সম্ভাবনা। তাঁহার কাব্যে বাস্তব চিত্র থাকিলেও তিনি পুরাপুরি বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ হইতে কাব্য রচনা করেন নাই, সে যুগে বিশুদ্ধ বাস্তবতা কোন কবির মধ্যেই ছিল না। সেরূপ মনোভাব সৃষ্টি হইবার মতো সাহিত্য ও সমাজেরই অভাব ছিল। মুকুন্দরাম প্রসন্ন মধুর দৃষ্টির সাহায্যে বাস্তবতাকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছেন এবং তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী বিবর্ণ ব্যাপারকেও রচনার গুণে সুখপাঠ্য করিয়াছেন। মূলতঃ তিনি আদর্শবাদী এবং রোমান্টিক দৃষ্টির অধিকারী; কিন্তু উপাদানগুলি তদানীন্তন সমাজ হইতে গৃহীত বলিয়া তাঁহার কাব্যে বর্ণিত ঘটনা, দৃশ্য বা চরিত্রকে অত্যন্ত বাস্তব বলিয়া বোধ হয়। সে যাহা হোক, মধ্যযুগে ভারতচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে আখ্যান-কাব্যের কবি হিসাবে তাঁহার সশ্রদ্ধ মর্যাদা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

মুকুন্দরামের ধর্মমত ॥ মুকুন্দরামের ধর্মমত লইয়াও কিছু কিছু মতভেদ দেখা দিয়াছে। মধ্যযুগের কবিদের রচনা বিচার-বিশ্লেষণ করিতে গেলে কবির ব্যক্তিগত ধর্মানুভূতির কথা অবশ্যই আসিয়া পড়ে। বাঙলার মধ্যযুগ প্রধানতঃ ধর্মচেতনার যুগ, অন্ততঃ বাঙলাদেশে এই সময়ে যে-সব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার কোনখানিকেই ধর্মীয় আবহাওয়া হইতে সরাইয়া রাখিয়া বিচার করা যায় না, এবং গ্রন্থবিচার প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের ধর্মবিশ্বাসের কথাও অনালোচিত থাকিতে পারে না। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ নিজ নিজ ইষ্টদেবতার বন্দনা করিলেও কেহ কেহ বৈষ্ণবমতের প্রতি কিছু অনুরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যযুগ বা সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তর-চৈতন্যযুগে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। বৈষ্ণবধর্ম প্রাধান্য লাভ করিবার পূর্বে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালীর ধর্মমত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সমাজে স্মার্ত আচার, পুরাণকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাস এবং শৈব ও শাক্তমতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

প্রতিবাদ; কিন্তু এই নিম্নতম মানের জীবনের প্রাণকেন্দ্র কোথায় তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি বস্তুর কবি, কিন্তু বাস্তব রসের কবি নহেন।" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম খণ্ডে সংযোজিত ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত।)

তবু সকলের অগোচরে বৈষ্ণবমত ও আদর্শ চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই লোকচিত্তাকর্ষী হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে নামতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব আদর্শের সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব শাক্ত মঙ্গলকাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা উক্ত কাব্যের নানা স্থানে (ধুয়া ও লাচাড়ীতে) ভাগবতোক্ত বৈষ্ণবমতের প্রতি অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল গান পুরাপুরি শাক্ত মঙ্গলকাব্য হইলেও তাহাতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট 'বিষ্ণুপদ' অর্থাৎ বৈষ্ণব পদ রহিয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মাঝে মাঝে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও তাহা মূলতঃ নেতৃবৃন্দের বা গুরু-আচার্যগণের তর্কবিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, হিন্দু জনসাধারণের মনে ধর্মসংক্রান্ত কোন অনুদার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে নানা স্থানে বৈষ্ণব-প্রভাব আছে বলিয়া তাঁহাকে কেহ কেহ বৈষ্ণব বলিতে চাহেন।

মুকুন্দরাম যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে তাঁহারা পুরুষানুক্রমে চক্রাদিত্য শিবের সেবক ছিলেন। কবিও শিবের কৃপায় কবি হইয়াছিলেন তাহা আত্মকথায় বলিয়াছেন।[৬৩] তাঁহার পিতামহ জগন্নাথ গোপাল পূজা করিতেন এবং মীন-মাংস ত্যাগ করিয়া দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্র জপিতেন।[৬৪] তিনি বোধ হয় বালগোপাল মূর্তির পূজা করিতেন। তাঁহাকেও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বলিতে হইবে। অবশ্য পূর্ব-চৈতন্যযুগে আবির্ভূত বলিয়া তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ অবলম্বন করেন নাই। তাঁহাদের বংশ প্রধানতঃ শৈব বংশ—যদিও তাঁহার পিতামহ বৈষ্ণব আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৌলিক ধর্মে কবিও শৈব, শিবের কৃপাতেই তিনি কবি হইয়াছেন এবং শিবের ভক্ত হইলে শক্তির ভক্ত হইতে বিশেষ বাধা নাই। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের বহু স্থলে স্পষ্টতঃ বৈষ্ণব প্রভাবের উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথমে

---

৬৩ সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীত।

৬৪ কয়ড়ি অমুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
বিনয়ে মাগিয়া বর জপি মন্ত্র দশাক্ষর
মীন মাংস ত্যজি বহুকাল ॥

কবি গণেশ-সরস্বতী-মহাদেব-লক্ষ্মী-শ্রীরাম-চণ্ডী-শুকদেবের বন্দনা করিয়া পরে চৈতন্যবন্দনা করিয়াছেন। শাক্ত কাব্যে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যবন্দনা বিস্ময়কর :

সুতপ্ত কাঞ্চন গৌর ভুবনলোচন-চোর
করঙ্গ-কৌপীন-দণ্ডধারী।
নয়নে গলয়ে লোর গলে দলে প্রেমডোর
সতত বোলেন হরি হরি।।

ইহা তো নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব-ভক্তের উক্তি। ইহা ছাড়িয়া দিলেও তিনি গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থলে হরি, বিষ্ণু ও কৃষ্ণের উল্লেখ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। মানসিংহের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ' শব্দ ব্যবহারেও সেইরূপ বৈষ্ণব আনুকূল্য সূচিত হইয়াছে—হওয়াই স্বাভাবিক। চৈতন্যের মৃত্যুর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয়। তখন শুধু বাঙলাদেশেই নহে, নীলাচলে, দক্ষিণ-ভারতে এবং মথুরা-বৃন্দাবনে চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তি ও বৈষ্ণব আদর্শের কথা বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই আবহাওয়ায় বাস করিয়া মুকুন্দরাম যে গ্রন্থমধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুকূলতা প্রকাশ করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? এইজন্য চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমালোচকগণ কবিকে বৈষ্ণব বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক এই মত মানিয়া লইতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, মুকুন্দরাম শাক্ত মঙ্গলকাব্য লিখিয়াছেন, কুলদেবতার দিক হইতে শৈব; আবার কাব্যমধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন, বন্দনা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত করা যায় কি? সেকালে বাঙালী হিন্দুসমাজে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সৌর-গণপত্য, এই পঞ্চোপাসক শ্রেণী বর্তমান ছিল। এখনও আচারে অধিকাংশ হিন্দুই এই পঞ্চদেবতার প্রতি আস্থাশীল; কেবল মন্ত্রগ্রহণ, কুলাচার বা সংস্কারের সময় তাঁহারা বিশেষ দেবতাকে গ্রহণ করেন: অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের সমান ভক্তি লক্ষ্য করা যাইবে। কাব্যের আরম্ভেই মুকুন্দরাম

বেদ অন্ত দরশনে ব্রহ্মা করি যারে ভণে
অন্তে বলে পুরুষপ্রধান।

বলিয়া ব্রহ্ম-বন্দনা করিয়াছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব হইলে সর্বাগ্রে কৃষ্ণের বন্দনা করিতেন। কালকেতুর নগর পত্তনের বর্ণনায় ব্রাহ্মণ, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বর্ণনায় কবি নিশ্চয় সবিস্তারে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বর্ণনা করিতেন। তাহা না করিয়া তিনি স্মার্ত মতাবলম্বী পুরাণাশ্রয়ী পঞ্চোপাসক হিন্দুর মতো সমস্ত দেবতাকেই ভক্তি করিয়াছেন। এই জন্য কোন এক লেখক বলিয়াছেন, "From what has been said, it appears clear and transparent that Kabikankan Mukunda Ram Chakravarty was neither a Vaishnaba, nor a Sakta, nor a Saiva, nor a Ganapatya: but he was everything. In other words, he was a believer in all the dieties of the Smarta cult of medieval Bengal."[৬৫] লেখকের এই মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। বাস্তবিক মধ্যযুগে হিন্দুসমাজে সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতা বা মতবিদ্বেষের উগ্রতা বড একটা প্রবল হইয়া উঠে নাই। একমাত্র বৈষ্ণবদের কিঞ্চিৎ দলগত উগ্রতা ও স্বাতন্ত্র্যভাব ছিল। তাঁহারা শাক্তদিগকে সভয়ে এড়াইয়া চলিতেন, বোধ হয় মনে মনে ঘৃণাও করিতেন। কিন্তু শাক্ত ও শৈবধর্ম অন্য উপসম্প্রদায়কে স্বচ্ছন্দে কোল দিতে পারে—সে ঔদার্য বৈষ্ণবমতে ততটা লক্ষ্য করা যায় না। বৈষ্ণবগণ নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়কে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে ততটা উৎসুক নহেন।

মুকুন্দরাম ধর্মমতে শৈব ও শাক্ত দুই-ই হইতে পারেন; বৈষ্ণবযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণকথা ও চৈতন্যলীলার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তাই বলিয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র বৈষ্ণব বলা যায় না। সৌর-গাণপত্য মত মুকুন্দরামের সময়ে বাঙলার শিষ্ট-সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। বাকি রহিল শৈব ও শাক্ত। কবিকঙ্কণ কাব্য রচনা করিলেন চণ্ডীমঙ্গল, শিব সেই চণ্ডীর স্বামী। উপরন্তু কবির বংশধরগণ অদ্যাপি শিবোপাসক বলিয়া পরিচিত। তাই তাঁহাকে শুধু স্মার্ত পঞ্চোপাসক বলিলেই সব বলা হইল না। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় ধর্মের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ ছিল। কবি যে শাক্ত দেবীর বন্দনা করিয়াছেন, পুরাণমতে তিনি পরম বৈষ্ণবী—যাঁহাকে

---

[৬৫] *Indian Historical Quarterly*, 1928 ('Religion of Kavikankan Mukundaram Chakravarty' by Basanta K. Chattarjee)

কবি বলিয়াছেন, "হরি-হর-হিরণ্যগর্ভের মূল তুমি"। তাই কবিকে আনুষ্ঠানিকভাবে শাক্ত বলিতে হইবে, সম্প্রদায় হিসাবে তিনি বৈষ্ণব নহেন। কিন্তু যুগধর্ম প্রভাবে তাঁহার মনে ও রচনায় বৈষ্ণব প্রভাবের অম্লান স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়।

পরিশেষে আধুনিক কালের এক রসগ্রাহী সমালোচকের মুকুন্দরাম-সম্পর্কিত মন্তব্য উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাইতেছে: "অতিপল্লবিত, অহেতুক বিস্তারের স্থলে অর্থঘন সংক্ষিপ্ত, অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ ও ভক্তিবিহ্বলতার অস্বচ্ছলতার স্থলে মিতভাষিতা ও তীব্র ভাস্বরতা, নির্বিচার প্রথানুবর্তনের স্থলে বাস্তব স্বীকৃতির প্রখর মৌলিকতা, অর্ধযান্ত্রিক পূর্বরোমন্থনের স্থলে নূতন অনুভূতির দীপ্ত ঝলক—এই সমস্তই তাঁহারা রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচনার উপর এক সচেতন, সমগ্র প্রসারিত মননশক্তির পরিচয় দীপ্যমান। তাঁহার শিল্পবোধ মার্জিত, জীবনবাদসম্ভূত রসিকতা তাঁহার পূর্ববর্তীদের গ্রাম্য ভাঁড়ামো হইতে স্বতন্ত্র জাতীয়। তাঁহার কৌতুকরস কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার বঙ্কিম কটাক্ষ, অর্থগূঢ় মন্তব্য ও সমগ্র মনোভাব ও জীবনদর্শনের নানামুখী বিস্তার হইতে ইহা তির্যক রেখায় ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে।"[৬৬]

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ॥

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত এমন আর কোন উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য নাই যাহার আলোচনা এখানে প্রয়োজন হইতে পারে। এই সময়ে লোক-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া লোকধর্মাবলম্বী নানা ধরণের মঙ্গলকাব্য রচিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং কীটপতঙ্গের খরশাণ দন্তের কবল হইতে তাহার অতি অল্পই রক্ষা পাইয়াছে। যাহাও-বা দুই চারিখানি কোন প্রকারে কিছুকাল জীবিত ছিল, তাহাও সাহিত্যাংশে এমন কিছু অভূতপূর্ব নহে যে, দীর্ঘ আয়ুর আশীর্বাদ লাভ করিবে। লোকবিস্মৃতি ও মহাকালের ঔদাসীন্য এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যকে অজ্ঞাতলোকে নিক্ষেপ করিয়াছে—ভালই করিয়াছে। তাহা না হইলে রাশি রাশি অপদার্থ পুঁথির চাপে মধ্যযুগীয় বাংলা

---

৬৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে (১ম) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'ভূমিকা' হইতে উদ্ধৃত।

সাহিত্যের প্রাণান্ত হইত। এই যুগে রচিত বলিয়া যে দুই চারিখানি মঙ্গল-কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এখানে সংক্ষেপে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমে দ্বিজ জনার্দনের চণ্ডীমঙ্গলের কথা উল্লেখ করিতে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই কাব্যের যে পুঁথিখানি রহিয়াছে[৬৭], তাহা বাংলা ১২৬৭ সনে অনুলিখিত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্রের নিকট যে পুঁথিখানি ছিল তাহার লিপি নাকি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। অবশ্য দীনেশচন্দ্রের সনতারিখ ও লিপির বয়স-অনুমান সব সময়ে নিরাপদে নির্ভর করা যায় না। যাহা হোক দ্বিজ জনার্দনের নামাঙ্কিত কালকেতু ও ধনপতির যে পালাগান পাওয়া গিয়াছে তাহা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর ছড়া ও ব্রতকথার ধরণে রচিত। ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গিমা—কোনটাই সাহিত্যের দরবারে ঠাঁই পাইবে না। ইহাতে মূল পালাটি কিন্তু ধনপতি সদাগরের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া রচিত; কালকেতুর আখ্যান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। কবির সন-তারিখ, আবির্ভাব কাল, পুঁথির রচনাকাল—কোন বিষয়েই কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে উত্তর-বঙ্গ হইতে পুঁথিগুলি আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে উত্তর-বঙ্গের কবি বলিতে চাহেন। কেহ কেহ অনুমান করেন "এইরূপ কোন চণ্ডীর গীতকে অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য তাঁহার কাব্য গঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।"[৬৮] তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। এই ধরণের ব্রতকথাই মঙ্গলকাব্যের উৎস। কিন্তু দ্বিজমাধবের পুঁথিটির ভাষা প্রাচীন নহে, বক্তব্য বিষয়েও পুরাতন কালের বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। সুতরাং ইহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক স্থলে স্থাপন করা যায়—অবশ্য ইহাও অনুমান মাত্র।

বলরাম কবিকঙ্কণ নামে মেদিনীপুরবাসী এক কবি নাকি মুকুন্দরামের পূর্বে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তদানীন্তন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট সংবাদ পান যে, ঈশানচন্দ্র বসুর নিকট নাকি এই পুঁথির নকল আছে।[৬৯] বিদ্যানিধি

---

৬৭ সাহিত্য পরিষদ পুঁথি সংখ্যা—২০৭

৬৮ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

৬৯ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা।

যথাস্থানে খোঁজ করিয়া মূল পুঁথির মাত্র কয়েকখানি নকল করা পৃষ্ঠা পাইলেন, মূল পুঁথি অসূর্যম্পশ্যা হইয়াই রইল। যখন মূল পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তখন এ বিষয়ে গবেষণা চালাইলে ন্যায়শাস্ত্রের 'অনুমান-খণ্ডের' উপর অধিক অত্যাচার করা হইবে। বলরামের যে দুই-চারিটি ভণিতা উদ্ধার করা গিয়াছে তাহা অবিকল মুকুন্দরামের মতো। যেমন—

অভয়ার অভয় চরণ করি ধ্যান।
বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

শুনা যায় মেদিনীপুরের অধিবাসীরা অনেকেই ইঁহাকে মুকুন্দরামের গুরু বলিয়া থাকেন। মূল পুঁথি দর্শন না দিলে এ সব গুরু-শিষ্য-সংবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজমাধবের গঙ্গামঙ্গলের[৭০] কথা সারিয়া লওয়া যাক। বাংলা সাহিত্যে একই নামের একাধিক কবির জন্ম হইয়াছিল। ফলে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক স্থলে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। একেই তো লিপিকার-গায়েনগণ কাব্যকণ্ডুয়নের তাড়নায় কবিদের রচনায় নিজ নিজ রচনা জুড়িয়া দিতেন, তাহার উপর এক নামের তিন কবি হইলে তো কথাই নাই। মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজমাধব, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের কবি মাধবাচার্য, গঙ্গা-মঙ্গলের কবিও দ্বিজমাধব। ফলে ত্র্যহস্পর্শ ঘটা কিছু বিচিত্র নহে। ইতিপূর্বে দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, দুইজন মাধব (একজন শাক্ত কবি, অপরজন বৈষ্ণব কবি) দুই সময়ে দুই প্রকার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মাধবের নামে 'গঙ্গামঙ্গল' নামক একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, ইহার শেষের পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সন-তারিখ ও কবি-পরিচয় জানিবার উপায় নাই। চট্টগ্রামের মুন্শী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ এই পুঁথির আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক। করিম সাহেবের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার বন্ধুর জন্য চট্টগ্রামের রোসাঙ্গিরী গ্রাম হইতে ইহার পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। করিম সাহেব বহু পুঁথি ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন, কিন্তু আর কোথাও ইহার দ্বিতীয় লিপি দেখেন নাই। ফলে প্রাপ্ত পুঁথি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। পুঁথি-সম্পাদক করিম সাহেব বলিয়াছেন যে,

---

[৭০] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে মুন্শী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সম্পাদনায় প্রকাশিত।

এই পুঁথির সঙ্গে গোবিন্দদাসের কলিকামঙ্গলের পুঁথির পৃষ্ঠার গোলমাল হইয়া গিয়াছে, এক পুঁথির পৃষ্ঠা অন্য পুঁথিতে চলিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় করিম সাহেব সম্পাদিত দ্বিজমাধবের 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণ কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

এই কাব্যে পৌরাণিক গঙ্গাবতরণ এবং সগরবংশের উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল, ক্লান্তিকর; পুনরাবৃত্তির ফলে বিরক্তি উদ্রেক করিয়া থাকে। লোকজীবনের আদর্শ ইহাতে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। পুরাণের অক্ষম অনুকরণ চণ্ডীমঙ্গল গানের কবি দ্বিজমাধবের রচনা হইতে পারে না। গঙ্গামঙ্গলের দ্বিজমাধব অন্য কোন কবি হইবেন; এ কাব্যে উৎকট সংস্কৃত-আতিশয্য এবং দুরূহ আভিধানিক শব্দের বাড়াবাড়ি থাকিলেও কাব্যটি কোন দিক দিয়াই সার্থক হইতে পারে নাই। কবির গান, সুর ও তালের দিকে অধিকতর ঝোঁক ছিল, তাই ইহাতে তিনি রাগরাগিণীর নানা বৈচিত্র্য উল্লেখ করিয়াছেন। শিথিল কাহিনী নীরসভাবে বিবৃত হওয়াতে পাঠকের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটা কৌতুককর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যমরাজের নিকট কোন্ পাপী কিরূপ শাস্তি পায় সেই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে:

স্বামীরে লুকাইয়া স্ত্রী মিষ্ট দ্রব্য খাএ।
সেহো পাপী ভুঞ্জে পাপ আসিয়া এথাএ॥

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে এই কবি স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। স্বামীকে লুকাইয়া মহিলারা তিন্তিড়ী ফেলিয়া মিষ্টদ্রব্য খাইতে যাইবেন কেন? মোটকথা এ কাব্যকে দ্বিজমাধবের রচিত বলিয়া মনে হয় না, ভাষাও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী হইতে পারে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন নানা ধরণের পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য রচিত হইতেছিল, তখনই ইহার রচনা সম্ভব। অতএব করিম সাহেব এ কাব্যকে যেরূপ পুরাতন বলিতেছেন, ইহা আমাদের কাছে সেরূপ প্রাচীন বলিয়া মনে হইতেছে না। ইহার ভাষাই ইহার বিরুদ্ধে যাইবে।

মঙ্গলকাব্যের গোড়ার দিকের রচনা হিসাবে দীনেশচন্দ্র কবিকঙ্কের বিদ্যা-সুন্দর এবং গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন। ময়মনসিংহের কবিকঙ্ক ও লীলার কাহিনী লইয়া রচিত ব্যালাড সুপরিচিত; এখনও ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের মুখে ঐ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রকুমার দে পূর্ব-বঙ্গ হইতে

অনেক পালাগান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি নাকি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর পালাও পাইয়াছিলেন, দীনেশচন্দ্রের নিকটেও বোধহয় একখানি পুঁথি ছিল।[৭১] কিন্তু সে পুঁথির আলোকদর্শন ঘটে নাই বলিয়া আমরা আলোচনা করিতে অপারগ।[৭২] তবে চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায় ১৩২৪ হইতে ১৩২৭ সালের মধ্যে কবি কঙ্কেব জীবনী ও 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা হইতে কঙ্ককে অত্যন্ত অর্বাচীন কালের কবি বলিয়া মনে হয়। দীনেশচন্দ্র কঙ্ককে "চৈতন্য-সমসাময়িক এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন"—বলিয়াছেন। কোন্ প্রমাণের বলে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইলেন তাহার কোন নির্দেশ দেন নাই। তবে কবি কঙ্ক চৈতন্যদেবের দেড়শ-দুইশ বৎসর পরে বর্তমান ছিলেন, তাহাতে বিশেষ সংশয় নাই। কারণ তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দরে' সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে—দেবী কালিকার নহে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সত্যপীরের পূজা ও কাহিনী উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অপরদিকে কবি কঙ্কের ভাষা এত আধুনিক (চন্দ্রকুমারের কিঞ্চিৎ হস্তাবলেপ থাকা বিচিত্র নহে!) যে, ইহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিক পূর্ববর্তী বলিতে দ্বিধা হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একখানি কালিকামঙ্গলের উল্লেখ করা প্রয়োজন। গোবিন্দদাস নামক এক কবি 'কালিকামঙ্গল' নামক একখানি বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই বৃহৎ পুঁথিটি (এসিয়াটিক গ্রন্থ সংখ্যা—২১) আছে। ইহাতে যে সন-তারিখের নির্দেশ আছে, তাহাতে ইহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়াই মনে হয়। দীনেশচন্দ্র এ কাব্যকেও অতিশয় প্রাচীন বলিয়াছেন। সন-তারিখের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহার ভাষার আধুনিকতা ও ছন্দের পরিমার্জিত রূপ বিশেষ সংশয়জনক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও, এ কাব্য রচিত হইতে পারে—বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে উনবিংশ শতাব্দীতেও বহু গালগল্প ও কাব্য রচিত হইয়াছিল। কাব্যটির বৈশিষ্ট্য পরে আলোচিত হইবে। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, একখানি অর্বাচীন কাব্যকে দীনেশচন্দ্র ১৫৯৫

---

[৭১] দীনেশচন্দ্র—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ ৩২৭ (৮ম সং)

[৭২] পরবর্তী খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকিবে।

খ্রীঃ অব্দে রচিত মনে করিয়া পুলকিত হইলেও তথ্যের দ্বারা উহার প্রাচীনতা প্রমাণ করা যায় না।

এ যুগের মঙ্গলকাব্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যে-কোন সামান্য সতর্ক পাঠকেরও দৃষ্টি এড়াইবে না। প্রথমতঃ, এই মঙ্গলকাব্যগুলি সাম্প্রদায়িক দেবদেবী-মাহাত্ম্য প্রচারক গ্রন্থ হইলেও ইহাতে নানা স্থানে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির বিচিত্র ইতিহাস, কোথাও পরোক্ষভাবে, কোথাও-বা প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য কাব্যে বর্ণিত সমস্ত ব্যাপারকেই প্রামাণিক ও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সমুদ্রযাত্রা ও বদল-বাণিজ্য স্মৃতিবহ থাকিয়া অতিরঞ্জনের আতিশয্যে অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শাক্ত মঙ্গলকাব্যেও প্রচুর পরিমাণে বৈষ্ণব প্রভাব পড়িয়াছে ইহাও লক্ষণীয়। শুধু উত্তর-চৈতন্যযুগে নহে—বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব—যাঁহারা চৈতন্য-প্রভাবের পূর্বে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বৈষ্ণব মনোভাবের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বটি চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব সমাজে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল ; এবিষয়ে শাক্তদের ঔদার্য প্রশংসনীয়। তৃতীয়তঃ, এই মঙ্গলকাব্যে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বেশ সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মনসা ও চণ্ডী আদিতে আর্যেতর কৌমের দেবতা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। মাণিকদত্তের চণ্ডী তো পুরাপুরি বৌদ্ধ ধর্মমঙ্গলের আদ্যা দেবী। চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টি পত্তনের নানা স্থানে দেব-নিরঞ্জনের কথা বলা হইয়াছে—ইহাও বৌদ্ধ মনোভাবসূচক। পুরাণের আখ্যায়িকা, ধর্মতত্ত্বের গল্প এবং আর্যেতর লোকসংস্কারের মিলনের ফলে মনসা ও চণ্ডীর পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। এই দিক দিয়া বিশেষতঃ, মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজের গঠন-প্রকৃতি জানিতে হইলে এই মঙ্গলকাব্যেই তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইবে। অবশ্য কাব্য হিসাবে মঙ্গলকাব্য খুব একটা প্রশংসনীয় ঐতিহ্য বহন করিতেছে না। একদা মধ্যযুগীয় কুলধর্ম ও সমাজধর্মের ছায়াতলে বসিয়া কবিগণ দেবদেবী-মহিমার গান বাঁধিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাহা শুনিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিত, কাব্যসৃষ্টির দিকে কাহারও বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। তবু মুকুন্দরাম-নারায়ণদেবের মতো সহজাত কবিত্বশক্তির অধিকারী রচনাকারগণ গতানুগতিক বর্ণনার মধ্যেও এমন কিছু কিছু বৈচিত্র্য, চারুত্ব ও কারুকলা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আধুনিক কালের পাঠকও তাহাতে উপভোগ্য অংশ আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

চৈতন্যদেব ও বাঙালীর জীবন-সাধনা

কবি গাহিয়াছেন, "বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।" একটু ভাবিয়া দেখিলে এই পংক্তিটির যৌক্তিকতা এক মুহূর্তেই আমাদের নিকট অতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে। বাঙালীর চিত্তলোক মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিয়াছে, চৈতন্যদেব যেন তাহারই ঘনীভূত নির্যাস। ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পুরা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত—প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া চৈতন্যদেবের প্রভাব এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিকাশ বাঙালী-মানসকে বিচিত্র দিকে সম্প্রসারিত করিয়াছে। বাঙালী-সমাজ, বাঙালী-মানস ও বাংলা সাহিত্যে কোন একটিমাত্র ব্যক্তির এরূপ প্রভাব দেখা যায় না। "বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাঙলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল" (রবীন্দ্রনাথ)। চৈতন্যাবির্ভাবে একদিকে যেমন বাঙালী-মানসে 'ভাবের বাষ্প' এবং 'প্রেমের রস' জমিয়া উঠিতেছিল, তেমনি সমাজ ও জীবনের বহিরঙ্গেও বৃহৎ মানবতার আদর্শ ও বিস্তার ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। ঠিক যাহাকে সমাজ-সংস্কার বলে বা য়ুরোপীয় আদর্শে যাহা humanism নামে পরিচিত, চৈতন্যদেব সজ্ঞানে তাহার প্রবক্তা বা প্রচারক ছিলেন না; কিন্তু চৈতন্য-প্রভাবে সমাজের নিম্নবর্ণেরাও যে উত্তর-চৈতন্যযুগে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। চৈতন্যদেব মোটামুটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কার মানিয়া চলিলেও তাঁহার তিরোধানের পর ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব গুরু-গোস্বামী রূপে সর্বত্র ব্রাহ্মণের মতোই শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্য-প্রভাব ব্যতিরেকে বাঙালী সমাজে ইহা কখনই সম্ভব হইত না। অবশ্য তন্ত্রে,

বিশেষতঃ 'চক্রে' জাতিবিচারের সীমারেখা মানার রীতি ছিল না। কিন্তু সামাজিক আচার-আচরণে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র পুরাপুরি শ্রেণীবিন্যাস মানিয়া চলিত।

বাঙলাদেশে পালযুগ হইতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীসম্প্রদায়ের যে বিন্যাস-রীতি অনুসৃত হইয়াছিল, স্মৃতি-সংহিতা যাহাকে গঠন ও পোষণ করিয়াছে, চৈতন্যযুগে আসিয়া তাহাতে বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হইল। বৈষ্ণব গোস্বামিগণ নূতন করিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতি রচনায় প্রস্তুত হইলে সমাজে ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রাচীরে ফাটল ধরিল। একদিকে যেমন সমাজের অভ্যন্তরে এইরূপ একটা পরিবর্তনের ধারা ছুটিয়া আসিল, তেমনি পরিব্রাজক চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙালীর ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইল। ঐতিহাসিক বলেন যে, মুঘল আমলে সাক্ষাৎভাবে দিল্লীর প্রভাবে আসিবার পর বাঙালীর রুদ্ধতোয় জীবন প্রসার লাভ করে।[১] কিন্তু মুঘলশাসনের অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে চৈতন্য ও তাঁহার পরিকরগণ দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-ভারতে তীর্থদর্শনের অভিলাষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। আকবরের যুগে সারা ভারতের সঙ্গে বাঙালীর রাষ্ট্রশাসনগত যোগাযোগ ঘটিলেও তাহার অনেক পূর্বে বাঙলার বৈষ্ণব ধর্মগুরুগণ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, জীবন ও আদর্শের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ অচিরে নীলাচল, বৃন্দাবন ও মথুরা বাঙালী-তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। তাই শুধু প্রেমভক্তির দিক দিয়া নহে, ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির বিচারে চৈতন্য-প্রভাব বাঙলা-দেশের পক্ষে বিধাতার আশীর্বাদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, আমরা "শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে, বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি" এবং "প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই" (রবীন্দ্রনাথ)। বৈষ্ণবসাধনা আমাদের যে-পরিমাণে ভাবাবেগে ব্যাকুল করিয়াছে, সূক্ষ্ম তত্ত্বচিন্তায় সুতীক্ষ্ণ করিয়াছে, উদারতর মানববোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে ইহা বলিষ্ঠতা, শক্তি ও সামর্থ্য দিতে পারে নাই—এবং বাঁচিয়া থাকা, বিস্তার লাভ করা ও বিরুদ্ধতাকে শুধু প্রেমের দ্বারা নহে—প্রবলতার দ্বারা জয় করার এষণাকে উদগ্র করিয়া তুলিতে পারে নাই। তথাপি চৈতন্য-প্রভাব বাঙালীর সমগ্র মানসলোকে

---

১ *History fo Bengal*, vol. II (Edited by J. N. Sarkar)

একটা অননুভূতপূর্ব বৈদ্যুতিক চেতনা সঞ্চার করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে একদা ভৌম-বৃন্দাবন ও ভাব-বৃন্দাবনের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছিল।

১
চৈতন্য জীবন-কথা

সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে তথ্যাদির ব্যাপারে নানা মত-পার্থক্য থাকিলেও চৈতন্য-জীবনকথার মোটামুটি পরিচয় পাইতে বাধা ঘটে না। প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া চৈতন্যদেব সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কথা প্রচারিত হইয়াছে। যে সমস্ত বৈষ্ণব অনুচর তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচনাতেই যখন নানা অলৌকিক অতিরঞ্জন রহিয়াছে, তখন কালক্রমে তাঁহার জীবনকথা যে পরিপূর্ণ ভাগবত মহিমা লাভ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? চৈতন্যের জীবনের ঘটনা ও তত্ত্বগত পর্যায় বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টতঃ তিনটি ভাগ লক্ষ্য করা যাইবে। তিনি প্রায় চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাহার পর গৌড়ভূমি ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকের বেশে পথে বাহির হন,—ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম পর্ব বা গৌড়পর্ব। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি প্রায় পাঁচবৎসর দক্ষিণ-ভারত, পশ্চিম-ভারত ও মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়াছেন। ইহাই চৈতন্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব বা পরিব্রাজক পর্ব। পরিব্রাজক-জীবনের পর তিনি জীবনের শেষ আঠার বৎসর নীলাচলে স্থায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন। ইহা অন্ত্য পর্ব বা নীলাচল পর্ব। তাঁহার আয়ুষ্কালের মোট পরিমাণ কিঞ্চিদধিক সাতচল্লিশ বৎসর।[২]

চৈতন্য-জীবনের গৌড়পর্ব ॥

চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি গৌড়দেশ নহে—শ্রীহট্ট। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর

[২] চৈতন্যদেবের জন্ম—১৪৮৬ খ্রীঃ অঃ ২৭ ফেব্রুয়ারী, মৃত্যু—১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ ৩ আষাঢ়। জীবনকাল—সাতচল্লিশ বৎসর চার মাসের সামান্য বেশি। স্বামী বিবেকানন্দ আরও অল্পদিন বাঁচিয়াছিলেন (১৮৬৩, জানুয়ারী—১৯০২ জুলাই), সাড়ে উনচল্লিশ বৎসর। চৈতন্যদেবের জন্ম, তিরোধান ও আয়ুষ্কালের হিসাবের জন্য ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' দ্রষ্টব্য।

গোড়ার দিকে শ্রীহট্টে মুসলমান-ধর্মান্তরীকরণের প্রচেষ্টা যে প্রবলবেগে চলিয়াছিল, তাহা শাহ্‌ জালালের 'কেরামতের' গল্প হইতেই প্রমাণিত হইবে। রাজা নীলাম্বরের রাজ্যনাশ এবং শ্রীহট্টে মুসলমানের আধিপত্যের বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ব্রাহ্মণ বৈদ্য-কায়স্থ সজ্জনসমাজ স্থান ত্যাগের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। গঙ্গার তীরে অবস্থিত নবদ্বীপধাম পূর্ব হইতেই বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং সামাজিক ও ধর্মীয় উপপ্লবের সময়ে কিছু সংখ্যক শ্রীহট্টবাসীরা যে পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ অঞ্চলে নূতন করিয়া বাস্তু নির্মাণ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?[৩] চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র, জগন্নাথের শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তী, শান্তিপুরের অদ্বৈত, চৈতন্যের সহপাঠী মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস, তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর, (চৈতন্যের মেসো)—ইঁহারা সকলেই শ্রীহট্টের অধিবাসী। ইঁহাদের অধিকাংশই হয় ধর্মসঙ্কটে, না হয় বিদ্যালাভের আশায় অথবা অর্থনৈতিক কারণে নবদ্বীপ অঞ্চলে আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র (মিশ্র পুরন্দর নামেও পরিচিত) শ্রীহট্টের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। জগন্নাথ ও নীলাম্বর চক্রবর্তী একই গ্রামের অধিবাসী; ইঁহারা নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করার পর নীলাম্বরের কন্যা শচীদেবীর সঙ্গে জগন্নাথের বিবাহ হয়।

চৈতন্য-জীবনীকার জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে একটা নূতন সংবাদ দিয়াছেন:

চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ
আছিলা জাজপুরে।

---

[৩] জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, অনাবৃষ্টি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার ভয়েই অনেকে নবদ্বীপে পলাইয়া আসেন:

শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল।
ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল।।
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিঞা।
নানা দেশে সর্বলোক গেল পলাইঞা।।
নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্র জগন্নাথে।
সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল উৎপাতে।।
(জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, নদীয়া খণ্ড)

শ্রীহট্ট দেশেরে পালাঞা গেলা
রাজ ভ্রমরের ডরে ।। (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, উৎকল খণ্ড,)

জয়ানন্দের এই সংবাদটি অভিনব। চৈতন্যের অন্য কোন জীবনীতেই ইহার উল্লেখ নাই। জয়ানন্দের অনেক কথাই প্রামাণিক নহে। তিনি জনচিত্ত রঞ্জনের জন্য লোকশ্রুতি ও গাল্পগল্পের প্রতি অধিকতর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ যাজপুর হইতে শ্রীহট্টে চলিয়া গেলে মহাপ্রভুর উড়িষ্যাগমন উপলক্ষে জীবনীকারগণ এবিষয়ে কিছু উল্লেখ করিতেন। অন্য কোন প্রমাণের অভাবে মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন, এ মত আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে পরিত্যাগ করিতেছি।[৪]

জগন্নাথ ও শচীদেবীর প্রথম সন্তান বিশ্বরূপ। তাহার পর কয়েকটি সন্তান জন্মলাভ করিলেও সব কয়টিই বাল্যকালে মারা যায়। বিশ্বরূপের জন্মের বার বছর পরে শচীমাতার কনিষ্ঠ সন্তান নিমাইয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পোষাকী নাম বিশ্বম্ভর। কিন্তু বাল্যকালে তিনি নিমাই বলিয়াই অধিক পরিচিত ছিলেন। অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুর পর চৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হয় নিমাই, অর্থাৎ নিমের মতো তিক্ত—যাহাতে 'নিমাই' নামের জন্য যম বালকটিকে ছুঁইতে না পারে। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী এই নামকরণ করেন।[৫] নিমাই অতিশয় গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া নবদ্বীপে

---

[৪] ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ জয়দেবকে যেমন ওড়িয়া বলিয়া দাবি করিয়াছেন, তেমনি জয়ানন্দের একটি সংশয়পূর্ণ উক্তিকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে খাড়া করিয়া তাঁহারা মহাপ্রভুকেও ওড়িয়া বলিয়া কাড়িয়া লইতে চান। যথা—"Chaitanya himself emerged from a highly learned and respectable Oriya Brahmin family of Orissa and had migrated for a time to Bengal owing to disagreement with the King of Orissa." (*Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, Vol. VI, Pt. III, p. 448)। ডঃ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার আর একটি সংশয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য পাশ্চাত্ত্য বৈদিক বংশে বাৎস্য গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু উড়িষ্যার পাশ্চাত্ত্য বৈদিক বংশ নাই। সুতরাং কোন দিক দিয়াই চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষকে ওড়িয়া বলা যায় না।

[৫] চৈতন্যের জন্ম হইলে পুরমহিলারা বলিতে লাগিলেন :

ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যাপুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম যে নিমাই ॥ (চৈতন্য ভাগবত)

কেহ কেহ মনে করেন যে, নিমাই নামটির আর এক অর্থও হইতে পারে "নিমাই—যাহার মা

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াও পরিচিত (অপভ্রংশে ও আদরে-শ্রদ্ধায়—গোরা, গোরাচাঁদ, গোরা-রায় ইত্যাদি) হইয়াছিলেন। প্রায় চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুদত্ত নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য —সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। এই নামটি দেশে-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে। অদ্যাপি তিনি এই নামেই সর্বত্র পরিচিত।

চৈতন্যের জন্ম হয় ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খ্রীঃ অঃ ২৭ ফেব্রুয়ারী, ৮৯২ বঙ্গাব্দ) ২৩শে ফাল্গুন শুক্র বা শনিবার পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে—সন্ধ্যায়। তাঁহার বাল্যকালে জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ বিবাহের ভয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান। এইজন্য তাঁহার মাতাপিতা সর্বকনিষ্ঠ আদরের সন্তানকে অনেক দিন পাঠশালায় পাঠান নাই, পাছে বিদ্যালাভ করিয়া নিমাই-ও অগ্রজের মতো সংসার-আশ্রমে বিরক্তি বোধ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়। মহাপ্রভু বাল্যকালে কিরূপ লীলা করিতেন, দুষ্টামি করিয়া বেড়াইতেন, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে তাহার চমৎকার জীবন্ত বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনায় কিছুটা ভক্তি ও স্নেহ-মিশ্রিত অতিশয়োক্তি আছে। ভাগবতের সঙ্গে রেখায় রেখায় মিল দেখাইতে গিয়া বৃন্দাবনদাস কোন কোন স্থলে মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। তবে একথা ঠিক, শচীমাতার কনিষ্ঠ সন্তানটি বাল্যকালে যে ভাল-মানুষটি ছিলেন, তাহা নহে। বিব্রত বালিকাগণ শচীর কাছে বালক নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের কথা প্রায়ই বলিয়া দিত। সে অন্যায়গুলি নিতান্ত নিরীহ নহে, 'বসন করয়ে চুরি', 'বালুকা দেই অঙ্গে', 'ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে'। কাহারও অভিযোগ আরও সাংঘাতিক—"কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে"—যদিও নিমাই তখন বালক মাত্র। বালিকা যুবতীরা অভিযোগ পেশ করিয়া বলিল :

পুরুবে শুনিল যেন নন্দের কুমার।
সেইমত সব করে নিমাই তোমার॥ (চৈ. ভা.)

এই সমস্ত বাল্যলীলা ভাগবতের ছাঁদে রচিত হইয়াছে বলিয়া অনেক সময়ে

নাই—অর্থাৎ তাহা হইলে যমের করুণা হইবে' (ডঃ সুকুমার সেন)। আমাদের মনে হয়, নিমাই নামের ঐরূপ ভাষাতাত্ত্বিক অর্থ বাঙলাদেশে প্রচলিত নাই। দুঃখী, এককড়ি, গোবর প্রভৃতি নাম যে অর্থে রাখা হয়, অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুর পর নবজাত চৈতন্যের 'নিমাই' নামকরণের সেইরূপ অর্থই রহিয়াছে।

দৈব মহিমা মানব-লীলার বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। সে যাহা হোক, বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিলে জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে পড়াইতে সম্মত হইলেন না, "মূর্খ হৈয়া মোর ঘরে রহুক নিমাই।" কিন্তু চৈতন্য বাল্যকালে এমন সমস্ত দুর্ললিত লীলা প্রকটিত করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার উপনয়নের পর মিশ্র বাধ্য হইয়া পুত্রকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করিয়া দিলেন। চৈতন্য এখানে বোধহয় কিছুদিন পড়াশুনা করিয়া ব্যাকরণে খুব অভিজ্ঞ হইয়া ওঠেন, এমন কি গুরুকেও 'উত্তরপক্ষ' করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না ("গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন")। বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠী মুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতিকে ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া এই কিশোরটি সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

চৈতন্যদেব কিশোর বয়সে ব্যাকরণের সূত্র ও টীকা এমনভাবে আয়ত্ত করিলেন যে, অল্প বয়সেই তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ইতি-মধ্যে জগন্নাথের মৃত্যু হইল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরুর আশা হইল যে, কালে নিমাই একজন বিখ্যাত 'ভট্টাচার্য' অর্থাৎ নৈয়ায়িক হইবেন। পরে নিমাই পণ্ডিত মুকুন্দের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইতে লাগিলেন এবং যৌবন-চাঞ্চল্য বশতঃ অন্যান্য ভট্টাচার্য পণ্ডিতদিগকে বিদ্রূপ করিতে শুরু করিলেন :

> প্রভু কন সন্ধিকার্য নাহি জ্ঞান যার।
> কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার॥
> হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।
> তবে জানি ভট্টমিশ্র পদবী সবার॥ (চৈ. ভা.)

একদা বল্লভ আচার্যের অনূঢ়া কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে গঙ্গাস্নানে যাইতে দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত সেই বালিকার প্রতি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য, এ আকর্ষণ নিছক একতরফা হয় নাই—"হেনমতে দোঁহা চিনি দোঁহা ঘর গেলা।" মাত্র পঞ্চ হরিতকী দিয়া বল্লভের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে চৈতন্যের বিবাহ হইল। তখন চৈতন্যের বয়স ষোল-সতের বৎসরের অধিক হইবে না। এদিকে ছাত্র অধ্যাপনা চলিতেছে।

সে যুগে পূর্ব-বঙ্গের নানা স্থান হইতে বহু পড়ুয়া নবদ্বীপে আসিয়া জমায়েত হইত। অনেক বৈষ্ণবভাবাপন্ন ভক্তও গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে বাস

করিতে আসিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ নিভৃতে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেন। সুকণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণলীলা গান করিতেন। চৈতন্য মাঝে মাঝে বৈষ্ণবভক্ত মুকুন্দকে লইয়া পরিহাস করেন, কৃষ্ণ-ভক্তদিগকে ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া বিব্রত করিয়া তোলেন, সকলে তাঁহাকে আসিতে দেখিলেই পলাইয়া যায়। চৈতন্য হাসিয়া বলেন :

> এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
> পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি সে মাত্র॥
> আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
> অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥

নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর চৈতন্যের মন কৃষ্ণানুকূল হয়। মুকুন্দের সঙ্গে অলঙ্কার বিচারে চৈতন্যদেবকে অলঙ্কার শাস্ত্রেও পরম প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে হয়; ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ গদাধরকেও তিনি তর্কে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। একদা চৈতন্যের দেহে বায়ুরোগ প্রকাশ পাইল, তিনি প্রায় উন্মত্তের মতো আচরণ করিতে লাগিলেন, কখনও-বা আবেশের বশে বলিতে লাগিলেন, "মুই সেই, মোরে ত না চিনে কোন জন"। তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, "ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ"। ক্রমে তিনি সুস্থ হইলেন, যথারীতি টোল চলিতে লাগিল। তবে বায়ুরোগের ফলে একটা পরিবর্তন সূচিত হইল। তিনি স্নানান্তে শ্রীকৃষ্ণ পূজা আরম্ভ করিলেন। এদিকে তাঁহার ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিল। অতঃপর দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধের পূর্বে চৈতন্য ঐ পণ্ডিতকে গঙ্গার শোভা বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। চৈতন্য সেই কবিতায় নানা অলঙ্কার-দোষ দেখাইয়া দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্যের গর্ব খানিকটা চূর্ণ করিলেন। বৈয়াকরণ চৈতন্যের কাছে ন্যায়-সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসা বৈশেষিক-বেদান্তে পরম প্রাজ্ঞ দিগ্বিজয়ী বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। গৌড়-তিরহুত-দিল্লী-কাশী-গুজরাট-বিজয়নগর-কাঞ্চীপুরী-হেলঙ্গ-তৈলঙ্গ-ওড্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের যত পণ্ডিত ছিলেন, কেহ দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু নবীন যুবক নিমাইয়ের কাছে তিনি পরাভূত হইলেন। নবদ্বীপের লোকে নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যে বিস্মিত হইল। অতঃপর গৌরাঙ্গদেব পূর্ব-বঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইলেন। সেখানকার লোকেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিল। ঐ অঞ্চলের পণ্ডিত-অধ্যাপকেরা নবীন যুবককে বলিলেন :

উদ্দেশ্যে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি ॥ (চৈ. ভা.)

পূর্ব-বঙ্গে তাঁহার কিছু অর্থলাভও হইল। তপন মিশ্র নামক এক কৃষ্ণভক্তকে চৈতন্য ধর্মোপদেশ দিলেন। ইনিই চৈতন্যদেবের প্রথম শিষ্য। পূর্ব-বঙ্গ হইতে খ্যাতি ও অর্থ লইয়া গৃহে ফিরিয়া চৈতন্য শুনিলেন লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছে। কিছুকাল পরে শোক সংবরণ করিয়া তিনি যথারীতি মুকুন্দের অঙ্গনে টোলে গিয়া ছাত্র পড়াইতে লাগিলেন। প্রভুর কৌতুকরস কিন্তু হ্রাস পায় নাই। শ্রীহট্টের লোকদের দেখিলে তিনি অধিক কৌতুক করিতেন। তাহারাও চটিয়া গিয়া বলিত :

তুমি কোন্ দেশী তাহা কহত নিশ্চয় ॥
পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার ॥

শ্রীহট্টবাসী ও পূর্ব-বঙ্গীয়দের কথা ধরিয়া তিনি 'বাঙ্গালের' সঙ্গে রসিকতা করিয়া সকলকে চটাইয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেন। এদিকে ছাত্রগণ তাঁহার কাছে বৎসর খানেক পড়িয়াই পাণ্ডিত্য লাভ করিতে লাগিলেন। রাজপণ্ডিত সনাতন তাঁহার কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে চৈতন্যের দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, এবং মোটামুটি সমারোহ সহকারে বিবাহ হইয়া গেল। এদিকে নবদ্বীপ-সমাজে বৈষ্ণবগণ স্মরণ-কীর্তন লইয়া আছেন; যাহারা অবৈষ্ণব তাহারা এই সমস্ত নৃত্যগীতের ব্যাপারে বিষম ক্রুদ্ধ হইল, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জাগিয়া উঠিল।

চৈতন্যদেব আনুমানিক তেইশ বৎসর বয়সে (১৫০৮) গয়ায় গিয়া পিতৃপিণ্ড দিবার সঙ্কল্প করিলেন। গয়াধামে গিয়া পিতৃপিণ্ডদানের পর ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁহার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইল। চৈতন্যদেব এখানে ঈশ্বরপুরীর নিকট দশাক্ষর গোপালমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মধ্যে যথার্থ কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তি-আর্তির আবির্ভাব হইল। নবদ্বীপে ফিরিয়াও তাঁহার প্রেমোন্মত্ততার উপশম হইল না। তাঁহার পূর্বের সে রঙ্গ-পরিহাস, বিদ্যার দম্ভ—এ সমস্তই তিরোহিত হইল, পরিপূর্ণ সংসার-বৈরাগ্য তাঁহাকে আশ্রয় করিল। ফলে টোল বন্ধ করিয়া দিতে হইল। গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাঁহাকে বৃথাই উপদেশ দেন—"ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও"। কিন্তু চৈতন্যের তখন ভাবাবিষ্ট

অবস্থা ; কৃষ্ণপ্রেম তাঁহাকে প্রবল আবেগের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তগণ, যাঁহারা এতদিন 'পাষণ্ডী'-দের ভয়ে ততটা প্রকট হন নাই, এইবার তাঁহারা সকলে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হইয়া নামকীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন। অবৈষ্ণবগণের বাধাও প্রবলতর হইতে লাগিল। খুব সম্ভব শাক্ত ও নৈয়ায়িকগণ কাজীর নিকট নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। কাজী কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিল। যদি কেহ কীর্তন করে, তাহা হইলে "সর্বস্ব দণ্ডিয়া তারে জাতি যে লইমু।" চৈতন্য ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনদলে কীর্তনের আয়োজন করিলেন। সম্মুখের দলের অগ্রভাগে রহিলেন হরিদাস, মধ্যের দলে রহিলেন অদ্বৈত এবং শেষের দলের পুরোভাগে রহিলেন স্বয়ং চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। চৈতন্যসম্প্রদায় ঠিক অহিংস বা 'তৃণাদপি সুনীচ' বা 'তরোরিব সহিষ্ণু' হইয়া কাজীর অত্যাচার মাথা পাতিয়া লইলেন না। শেষ পর্যন্ত কাজী চৈতন্যদেবের রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া সবিনয়ে তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাইয়া ফেলিল :

> নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
> সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥*
> ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
> মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥ (চৈতন্য চরিতামৃত)

কিন্তু অবৈষ্ণবগণের বিরোধিতা ক্রমেই প্রচণ্ড হইতে লাগিল। তখন চৈতন্যদেব চিরাচরিত ভারতীয় সংস্কার স্বীকার করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি দেখিলেন শুধু কীর্তন-নৃত্যগীতে হরিনাম প্রচারিত হইবে না। জীব উদ্ধার করিতে হইলে সন্ন্যাসগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য—ইহাই ভারতের ধর্মগুরুদের চিরকালের আদর্শ ; গৃহস্থের নিকটে কেহ ধর্মোপদেশ লইবে না। তিনি মনে করিলেন :

> অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
> সন্ন্যাসিবুদ্ধিতে মোরে প্রণত হইব॥

সন্ন্যাসীর প্রথা মতো গেরুয়া ও দণ্ড ধারণ না করিলে কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। তাই তিনি পাষণ্ডী উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। সেই সময়ে নবদ্বীপে কেশব ভারতী আসিয়াছিলেন। তাঁহার

সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চৈতন্য তাঁহার নিকট নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কেশব ভারতী কাটোয়া চলিয়া গেলে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, আচার্য মুকুন্দ দত্ত—এই তিনজনকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্যদেব কাটোয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং ভারতীর নিকট দীক্ষা লইলেন। কেশব ভারতী গৌরাঙ্গদেবের নূতন নামকরণ করিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য :

পাইলা উচিত নাম কেশব ভারতী।
প্রভু বাম হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধমতি।।
কত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য কীর্তন প্রকাশিয়া।।
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মাঘমাসে তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর প্রায় পূর্ণ হইয়াছিল। পঁচিশ বৎসরে পা দিয়াই তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া যতিজীবন গ্রহণ করিলেন।[৬] ইহার বৎসর খানেক পূর্বে তিনি গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়াছিলেন (১৪৩০ শক, পৌষমাস) এবং এই একবৎসর কাল তিনি কীর্তন ও কৃষ্ণকথারসে মত্ত হইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর আর তিনি গৃহে প্রবেশ করেন নাই। দীক্ষার পর তিনি একটা দিন কাটোয়ায় অতিবাহিত করিলেন এবং তাহার পর বৃন্দাবনে যাইতেছেন মনে করিয়া তিন-চারদিন রাঢ়দেশ (বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ) পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। তারপর নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে শচীমাতাকে সংবাদ দিতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে শান্তিপুরে অদ্বৈতনিবাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; বোধহয় চৈতন্যদেব দশ-বার দিন শান্তিপুরে ছিলেন। তার পর ফাল্গুনমাসের মাঝামাঝি তিনি নীলাচলের দিকে যাত্রা করিলেন। চৈতন্যের গৌড়ের লীলা শেষ হইল; নিমাই পণ্ডিতের জীবনে ছেদ পড়িয়াছে পূর্বেই—যেদিন তিনি গয়াধামে ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র লইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের জীবনেও সমাপ্তি নামিয়া আসিল, যেদিন তিনি কেশব ভারতীর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা লইলেন। ইহার পর তিনি আর একবার মাত্র গৌড়ে আসিয়াছিলেন।

৬ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

পরিব্রাজক চৈতন্যদেব ॥

নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চব্বিশ বৎসর পার হইয়া মাতা ও স্ত্রীকে ছাড়িয়া পদব্রজে পুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুরী বাঙলাদেশের নিকটে অবস্থিত, কাজেই মথুরা-বৃন্দাবনের দিকে অধিকতর আকর্ষণ থাকিলেও শুধু মাতার সংবাদ লইবার জন্য এবং গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গলাভের জন্য চৈতন্য স্থায়িভাবে পুরীধামে বসবাসের সঙ্কল্প করিলেন। গৌড়ে তখনও কিন্তু বিধিবদ্ধ কোন বৈষ্ণবসম্প্রদায় গড়িয়া ওঠে নাই; তখনও শাক্ত, স্মার্ত ও নৈয়ায়িকগণ চৈতন্যের ঘোরতর বিরোধী, বৈষ্ণবধর্মে আস্থাহীন। চৈতন্য আরও কিছুকাল বাঙালাদেশে থাকিলে এদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায় অধিকতর সুগঠিত হইতে পারিত; চৈতন্যের তিরোধানের পর বৃন্দাবনের গোস্বামিসম্প্রদায় ও গৌড়ীয় ভক্তগণের মধ্যে তত্ত্ব লইয়া যে মতান্তর দেখা দিয়াছিল এবং যে ছিদ্রপথে বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে দুর্বলতা প্রবেশ করে, তাহা হয়তো ঘটিতে পারিত না। এই জন্য চৈতন্যের বাঙলা ত্যাগকে কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে' ''সর্বস্বনাশো হি নঃ''—আমাদের সব নষ্ট হইল, বলিয়াছেন।

বয়োজ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ ও সুবৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্যের উপর গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভার দিয়া চৈতন্যদেব ১৫১০ খ্রীঃ অব্দে ফাল্গুনমাসের মধ্যে যাত্রা করিয়া এই মাসের মধ্যেই পুরীধামে পৌঁছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নিত্যানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ ও মুকুন্দ। চৈতন্যদেব পুরীধামে আঠার দিন অতিবাহিত করিয়া দক্ষিণ-ভারত পর্যটনে বাহির হইলেন। পুরীধামে স্বল্পকাল অবস্থান করিয়া তিনি দুইটি উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদান করেন। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই সময়ে পুরীধামে বাস করিতেছিলেন। চৈতন্যের ভাবোন্মত্ত ভক্তির অতিরেক বোধহয় তাঁহার বিশেষ মনঃপূত হয় নাই। তাই তিনি এই নবীন সন্ন্যাসীকে ভক্তিধর্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম অদ্বৈতবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিতে আসিলেন। সাতদিন ধরিয়া তিনি মহাপ্রভুকে বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য শুনাইলেন এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্রোতা তো বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেছেন না। তিনি কি অদ্বৈতভাষ্য বুঝিতে পারিয়াছেন? অতঃপর নবীন সন্ন্যাসী ও প্রবীণ বৈদান্তিকে তর্কবিতর্ক শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত নিষ্কাম অদ্বৈতবাদী বাসুদেব সার্বভৌম,

বেদান্ত ভাষ্যের অদ্বৈতবাদের অসারতা বুঝিতে পারিলেন এবং চৈতন্যের পরম ভক্ত হইয়া বলিলেন :[১]

তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহদণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥

বাসুদেবের তখন কিরূপ অবস্থা ?

অশ্রু স্তম্ভ পুলক স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি ॥

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রও চৈতন্যের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। কেহ কেহ বলেন গজপতি প্রতাপরুদ্র (রাজ্য কাল—১৪৯৮-১৫৪০ খ্রীঃ অঃ) আনুষ্ঠানিকভাবে চৈতন্যধর্মে দীক্ষা লন নাই। কিন্তু তিনি যে চৈতন্যদেবকে দেবতার মতো ভক্তি করিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহার পর চৈতন্যদেব যথার্থ তীর্থ-পরিক্রমায় বাহির হইলেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণ-ভারতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ১৫১০ সালের ফাল্গুন মাসের শেষে পুরীধামে উপনীত হন, চৈত্রমাসে সার্বভৌমকে স্বমতে আনয়ন করেন এবং বৈশাখ মাসে কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া[৭] কৌপীন-দণ্ড ধারণ করিয়া দাক্ষিণাত্য পরিক্রমায় বাহির হইলেন। দাক্ষিণাত্য যেমন অদ্বৈতবাদের লীলাস্থল, তেমনি দ্বৈতবাদী ভক্তিধর্মও এই অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে। 'আলোয়ার' নামক ভক্তসম্প্রদায় এই অঞ্চলের অধিবাসী। সুতরাং চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হইয়া পড়িলেন। তিনি দক্ষিণ-ভারতের যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই ভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছেন। এমন কি পশ্চিম-ভারতেও কেহ কেহ তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিতেন। মারাঠী সাধক তুকারাম তাঁহাকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। দক্ষিণে পূর্ব হইতে 'রাগানুগা' ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি উপাসনা প্রচার করিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেঙ্কটভট্ট ছিলেন নারায়ণের উপাসক। চৈতন্য-

[৭] মতান্তরে গোবিন্দদাস কর্মকার—'গোবিন্দদাসের কড়চার' লেখক। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। চৈতন্যের কোন প্রামাণিক জীবনীতেই তাঁহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী হিসাবে গোবিন্দদাস কর্মকারের উল্লেখ নাই। পরে এবিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইলেন। চৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভারত পর্যটনকালে আদিকেশব মন্দির হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' এবং কৃষ্ণবেণ্বাতীরে বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ দুইখানি সংগ্রহ করেন। এই দুইখানি গ্রন্থ চৈতন্য-মত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। অতঃপর মধ্বমতাবলম্বী আচার্যগণ বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণ লইলেন। পরিশেষে বিদ্যানগরে গোদাবরী-তীরে চৈতন্যদেব পরম ভক্ত-বৈষ্ণব রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হইলেন। চৈতন্য যে পথের পথিক, পণ্ডিত ভক্ত রামানন্দও সেই একই পথের যাত্রী। উভয়ের মধ্যে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব লইয়া অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। রায় রামানন্দ তারপর মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভের জন্য পুরীধামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণবদের প্রধান কেন্দ্র পন্ধরপুর এবং সেখান হইতে সোমনাথ, দ্বারকা, প্রভাস[৮] পরিক্রমার পর পুরী প্রত্যাবর্তনের পথে পুনরায় রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হন। এই ভাবে প্রায় বৎসরাধিক গত হইলে (১৪৩২-৩৩ শক) তিনি পুরীধামে ফিরিয়া প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্রের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে শচীমাতা ও ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিরাপদে পুরী প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইলেন। ক্রমে ক্রমে পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ দামোদর, ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড় হইতে নীলাচলে ভক্তদের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কাজেই চৈতন্যদেব বাঙলার বাহিরে থাকিয়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে মোটামুটি সংযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর বাঙলার বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও সমাজকে পুনর্গঠনের জন্য তিনি নিত্যানন্দকে বাঙলায় পঠাইয়া দেন।

এই বার তিনি বৃন্দাবন পরিক্রমার অভিপ্রায়ে গঙ্গার তীর ধরিয়া গৌড়ে যাত্রা করিলেন (১৫১৩) এবং গৌড়ের নিকটে রামকেলিতে উপস্থিত হইলেন। বোধ হয় এই সময়ে তিনি শান্তিপুরে শচীমাতার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আর কখনও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। রামকেলিতে তিনি হুসেন শাহের সুপ্রসিদ্ধ কর্মচারী সনাতন ও রূপের আনুগত্য লাভ

---

৮ গোবিন্দদাসের কড়চায় এই ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। অন্য কোন চৈতন্য-জীবনীতে এই পরিক্রমার বর্ণনা নাই।

করিলেন। 'সাকর মল্লিক' (সনাতন) এবং 'দবির খাস' (রূপ) যাবনিক নাম বা উপাধি দুইটি বদলাইয়া তিনি ভক্তদ্বয়ের নাম দিলেন সনাতন ও রূপ। ভ্রাতৃদ্বয় চৈতন্য-প্রদত্ত নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা কর্ম ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুকে অনুসরণ করিতে চাহিলেন। বাস্তবিক রূপ-সনাতন ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবের সাহায্য না পাইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যের পর একটা নগণ্য উপসম্প্রদায় হইয়া পড়িত, এতটা প্রাধান্য ও গৌরব লাভ করিতে পারিত না। সনাতন দেখিলেন, চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রা করিতেছেন, সঙ্গে রহিয়াছে অসংখ্য ভক্ত। তখন বোধহয় পাঠান শাসনের হাওয়া ফিরিতেছিল, হিন্দুবিদ্বেষ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছিল। বিচক্ষণ সনাতন মহাপ্রভুকে এত লোক লইয়া তীর্থ-পরিক্রমায় বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। চৈতন্যদেব জনসমাগম ত্যাগ করিয়া পুনরায় পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সামান্য পরে ১৫১৪ খ্রীঃ অব্দে মাত্র একজন পাচক ও একজন অনুচর সঙ্গে লইয়া ঝাড়খণ্ডের অরণ্যপথ পার হইয়া কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং এই প্রাচীন হিন্দুতীর্থে কিছুকাল ভক্তদের (চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ, তপনানন্দ) সান্নিধ্য লাভ করিয়া প্রয়াগের দিকে চলিলেন। কাশীর বৈদান্তিক পণ্ডিতগণও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা, লুপ্ততীর্থের উদ্ধার এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্তিস্থাপনে তাঁহার কিছুকাল অতিবাহিত হইল। পরে তিনি প্রয়াগে পৌঁছিলেন। এখানে রূপ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম বা বল্লভ (জীবের পিতা) মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন—তাঁহারা গৌড়েশ্বরের কর্মত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভের জন্য সেখানে সমাগত হন। চৈতন্যের উপদেশে রূপ ব্রজমণ্ডলে অবস্থান করিতে যাত্রা করিলেন। কাশীধামে মহাপ্রভু ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমাস পর্যন্ত ছিলেন। এখানে সনাতন আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তিনি হুসেন সাহের কর্ম ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। চৈতন্য সনাতনকে নানা উপদেশ দিয়া ব্রজধামে পাঠাইয়া দিলেন এবং ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে পদব্রজে আবার সেই বনপথ ধরিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রথম নীলাচলে উপস্থিত হন। দাক্ষিণাত্য, পশ্চিম-ভারত, গৌড়ভূমি, মথুরা-বৃন্দাবন-প্রয়াগ-কাশী পরিক্রমায় তাঁহার প্রায় ছয়

পুরীধামে নরেন্দ্র-সরোবর তীরে সপারিষদ শ্রীচৈতন্যদেব
(মুশিদাবাদের কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে রক্ষিত চারিশত বৎসরের পুরাতন
চিত্রের প্রতিলিপি) (পৃঃ ২০৫)

বৎসর কাটিয়া গেল; ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি নীলাচল ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। তাঁহার জীবনের শেষ আঠার বৎসর এখানেই প্রায় দিব্যোন্মত্ত অবস্থায় অতিবাহিত হয়।

নীলাচল পর্ব ॥

১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই (?) মাস হইতে ১৫৩৩ সালের জুলাই, মোট আঠার বৎসর চৈতন্যদেব নীলাচলে কাশীশ্বর মিশ্রের আশ্রমে দিব্যভাবের বশে বিভোর হইয়া কাল অতিবাহিত করেন। এই ভাবাবেশ বৃন্দাবন পরিক্রমা কালেই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, যে জন্য তাঁহার অনুচরবৃন্দ তাঁহাকে বৃন্দাবনে রাখা সমীচীন মনে করে নাই। পুরীধামের শেষ আঠার বৎসর বাহিরের দিক হইতে বিশেষ ঘটনাবহুল নহে। হরিদাস, স্বরূপ দামোদর, পরমানন্দপুরী, রায় রামানন্দ—ইঁহারা মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সঙ্গী হইয়া দিবারাত্র তাঁহার কাছে কাছে থাকিতেন। চৈতন্যদেবের আবেশের সময় স্বরূপ ভক্তি ও প্রেমের গান গাহিয়া তাঁহার বাহ্যচেতনা ফিরাইয়া আনিতেন। মহাপ্রভুর পূর্বেই হরিদাস দেহরক্ষা করেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং নিজহস্তে সমুদ্রতীরে এই ভক্তটির শেষকৃত্য সমাধা করেন। গৌড় হইতে ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্বে পুরীধামে সমবেত হইতেন, মহাপ্রভু ইঁহাদের মারফতে শচীমাতার সংবাদ পাইতেন। কিন্তু শেষ দিকে তাঁহার বাহ্যচেতনা প্রায়শঃই দিব্যানুভূতিতে লুপ্ত হইয়া যাইত, তখন তিনি মর্ত্যেই ভাববৃন্দাবনকে প্রত্যক্ষ করিতেন, চটক পাহাড়কে গিরিগোবর্ধন বলিয়া মনে করিতেন, কখনও সেই আবেশে পথিমধ্যেই চেতনা হারাইয়া লুটাইয়া পড়িতেন, কখনও-বা কৃষ্ণবিরহে স্বরূপ-রামানন্দকে মিনতি করিয়া বলিতেন :

কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গীতগোবিন্দের গান গাহিয়া স্বরূপ মহাপ্রভুকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিতেন। মহাপ্রভু উন্মাদের মতো, বিরহীর মতো, নিষ্কিঞ্চনের মতো রোদন করিতেন, শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। আঠার বৎসরের মধ্যে শেষ বার বৎসর তাঁহার জাগরণ ও চেতনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তারপর যখন তাঁহার বয়স পুরা আটচল্লিশ বৎসরও হয় নাই (সাতচল্লিশ

বৎসর সাড়ে চারিমাস), তখন তাঁহার ক্ষীণতনু দিব্যপ্রেমের উদ্বেগ-আর্তি আর সহিতে পারিল না। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন বা জুলাই, আষাঢ় মাসে (১৪৫৫ শক, ৯৪০ বঙ্গাব্দ বেলা তৃতীয় প্রহরে—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে) চৈতন্যদেব মর্ত্যদেহ রক্ষা করেন। তাঁহার তিরোধান সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোন বর্ণনা দেন নাই। এই পরম শোকাবহ ঘটনা কোন্ ভক্তই বা প্রাণ ধরিয়া বর্ণনা করিতে পারেন ? তবে জয়ানন্দ ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে অস্পষ্ট উক্তি আছে। লোচনদাস বলিয়াছেন :

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

জয়ানন্দ আরও বিস্তৃতভাবে মহাপ্রভুর লীলাবসান বর্ণনা করিয়াছেন :

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
... ...
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
... ...
মায়ার শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥
... ...
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচায গোসাঞি স্থনি।
বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গেলা শচী ঠাকুরাণী॥

ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, চৈতন্যের সংস্কৃত ও বাংলা প্রামাণিক জীবনীতে তাঁহার তিরোধানের কথা স্থান পায় নাই। একমাত্র জয়ানন্দই মহাপ্রভুর স্বাভাবিক মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধান সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া বিশেষ কিছু জানা যায় না। লোকশ্রুতি অনুসারে কখনও তিনি জগন্নাথ শরীরের লীন হইয়া গিয়াছিলেন, কখনও-বা ভাবাবেশে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন। পুরীতে এমন জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, পাণ্ডারা চৈতন্য-মহিমা ও প্রভাব দর্শনে ঈর্ষাতুর হইয়া তাঁহাকে নাকি মন্দির মধ্যে নিহত করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণেই সমাহিত করে, এবং প্রচার করিয়া দেয়, তিনি জগন্নাথ শরীরে লীন হইয়া গিয়াছেন। এই শেষোক্ত বর্ণনাটি নিশ্চয়ই গল্পবুভুক্ষু

সাধারণ মানুষের উর্বর কল্পনাপ্রসূত। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর গুণগ্রাহী ছিলেন, পুরীর বহু প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ওড়িয়া ভক্ত মহাপ্রভুকে গুরুর মতো ভক্তি করিতেন, নিত্য তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রচুর লোকসমাগম হইত। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে হত্যা করিয়া সমাহিত করার লোমহর্ষক ডিটেকটিভ গল্প কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু (দুর্ঘটনার ফলেও হইতে পারে) হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। নয়নাশ্রুপ্লাবনে যাঁহার মানবসত্তা ক্ষণেক্ষণে ভাগবত মহিমা লাভ করিয়াছে, তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহপিণ্ডটি জগন্নাথ শরীরে লীন না হইলে কি তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইত?

২

চৈতন্য-অনুচরবৃন্দ

পৃথিবীর ধর্মপ্রবর্তকগণ কোন লিখিত শাস্ত্র রাখিয়া যান নাই, তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য ও অনুকর-পরিকরের দলই সম্প্রদায়ের তত্ত্বকথা, দর্শন, আচার-আচরণের রূপ বাঁধিয়া দিয়াছেন। যিশু খ্রীষ্টের তত্ত্বকথা পিটার ও পলের দ্বারাই প্রচাবলাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের শিষ্য ও অনুচরগণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কায়ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে নীলাচলে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার কালের মধ্যবর্তী সময়ে বহুস্থানে পর্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য দিব্যকান্তি ও ঈশ্বরপ্রেম দর্শনে বহুলোকে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে, তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে—যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহারাও চৈতন্যের অলৌকিক জীবন-কথায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আদর্শ শিরোধার্য করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব জীবৎকালে কৃষ্ণভক্তি প্রচারে উৎসুক হইলেও কোন সম্প্রদায় বা দার্শনিক 'স্কুল' প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। শেষের দিকে তিনি তো কৃষ্ণরসে বাহ্যজ্ঞান-রহিত অবস্থায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার জীবনী-কাব্যগুলিতে তাঁহাকে মহাপণ্ডিত ও দার্শনিকরূপে অঙ্কন করার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাসুদেব সার্বভৌম ও রায় রামানন্দের সঙ্গে আলাপাদিতে তাঁহার দূরপ্রসারী মনন ও

অপার্থিব আবেগানুভূতির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[৯] কিন্তু ভক্ত ও অনুচরদিগকে তিনি মহৎ জীবনের আদর্শ এবং কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। সনাতন ও রঘুনাথ দাসকে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এমন কিছু দুরূহ, গূঢ় বা গুহ্যকথা নহে, যে-কোন ধর্মোপদেষ্টা সেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ তিনি অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে সংস্কৃতে 'শিক্ষাষ্টক'[১০] নামক আটটি উপদেশ দিতেন। নিম্নে এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইতেছে :

(১) চেতোর্দর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধি-বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনং ॥

অনুবাদ : যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন চিত্তদর্পণকে মার্জনা করে, যাহা ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণ করে, যাহা কল্যাণকুমুদে জ্যোৎস্না বিতরণ করে, যাহা বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ, যাহা আনন্দসমুদ্র বর্ধন করে, যাহা পদে পদে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া পূর্ণ অমৃতের স্বাদ দান করে এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দসুখ উপভোগ করাইয়া সর্বেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে, সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন সর্বতো-ভাবে ও সর্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছে।

(২) নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি-
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অনু : ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি বশতঃ তুমি নিজের অসংখ্য নামের প্রচার

---

[৯] অবশ্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পাণ্ডিত্য প্রকাশ চৈতন্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য নহে; চৈতন্যজীবনীকার ভক্তগণ ভক্তিবশতঃ তাঁহাকে অপরাজেয় তার্কিক ও দার্শনিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত এই সমস্ত ঘটনাকে "obviously exaggerated and some times puerile" বলিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য : ডঃ সুশীলকুমার দে প্রণীত *Vaishnav Faith & Movement* পৃ ৫৪—৫৫) আধুনিক গবেষকদের এই সিদ্ধান্তও একটু অতিরঞ্জন-দোষদুষ্ট। পাণ্ডিত্য চৈতন্য-দেবের একমাত্র পরিচয় না হইলেও, নিতান্ত তরুণ বয়সে তিনি যে সে যুগের বিদ্বৎসমাজে অতিশয় মান্য হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

[১০] রূপগোস্বামী সঙ্কলিত 'পদ্যাবলীতে' এই আটটি শ্লোক চৈতন্যদেব রচিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

করিয়াছে এবং সেই নামসমূহে নিজের সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছে। হে প্রভো, তোমার এত দয়া, কিন্তু আমার ঈদৃশ দুর্দৈব যে, তোমার কোন নামে আমার রুচি জন্মিল না।

(৩) তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

অনুঃ তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, তরুর মতো সহিষ্ণু হইয়া, নিজে নিরভিমান হইয়া এবং সর্বজীবে সম্মান দিয়া সর্বদা শ্রীহরিনাম কীর্তন করিবে।

(৪) ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অনুঃ হে জগদীশ্বর, আমি ধন, জন, সুন্দরী বা কবিতা কামনা করি না, যেন জন্মে জন্মে তোমার শ্রীচরণে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

(৫) অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥

অনুঃ হে নন্দনন্দন, তোমার দাস আমি বিষম সংসারসাগরে নিপতিত হইয়াছি; তুমি কৃপা করিয়া এ কিঙ্করকে তোমার শ্রীচরণের ধূলিসদৃশ জ্ঞান কর।

(৬) নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

অনুঃ তোমার নাম গ্রহণ করিতে কবে আমার নয়নে দরদর বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে. গদ্‌গদভাবে কবে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং পরম আনন্দভরে কবে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে?

(৭) যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেন মে ॥

অনুঃ কৃষ্ণবিরহে নিমেষপরিমিত সময় আমার নিকট যেন যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, আমার চক্ষে যেন অবিরল বর্ষার বারিধারা ঝরিতেছে, এবং সমস্ত জগৎ যেন আমার নিকট শূন্যময় বোধ হইতেছে।

(৮) আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

অনুঃ তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন, অথবা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্মাহত করুন, কিংবা সেই লম্পট যাহা ইচ্ছা করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ—অন্য আর কেহই নহে।

এই শ্লোকগুলিতে গভীর ভক্তি ও আদর্শের কথা ব্যক্ত হইলেও এখানে বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক বা দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মত প্রচার ও সংরক্ষণের ভার লইয়াছিলেন তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যসম্প্রদায়। এ বিষয়ে চৈতন্যদেব অতিশয় ভাগ্যবান। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ—বিশেষতঃ সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী চৈতন্যসম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ না করিলে এবং দর্শন, ভক্তিসাধনা, রসতত্ত্ব ও বৈষ্ণব স্মৃতিবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা না করিলে চৈতন্যসম্প্রদায় উপসম্প্রদায় হইয়া থাকিত, এই মত পরবর্তী কালে সারা বাঙলাদেশে এবং বাঙলার বাহিরে এরূপ বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না—চৈতন্যের আবেগধর্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই ম্লান হইয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় একদিকে যেমন দলগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার কেহ কেহ চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করিয়া আবেগের ও প্রেমের উচ্ছ্বাসকে দার্শনিক ও যৌক্তিক পারম্পর্যের দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রধান প্রধান গৌড়ীয় ও নীলাচল ভক্তদের কথা আলোচনা করিব এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব।

গৌড়ের ভক্ত ॥

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে দেখাইয়াছেন যে, চৈতন্যলীলার পূর্বে নবদ্বীপে ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ, গঙ্গাদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মুকুন্দ—ইঁহারা সকলেই প্রেমধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ইঁহারা মিলিত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্মরণ-কীর্তন করিতেন। অদ্বৈত আচার্য এই সময়ে নবদ্বীপে টোল খুলিয়াছিলেন। তিনিও এই পথের পথিক ও নেতা। তিনি তো কৃষ্ণাবতারের পথ চাহিয়া ছিলেন। হরি-হীন বিশ্বসংসার দেখিয়া অদ্বৈত মনে মনে বলিতেন :

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ॥

তবে সে অদ্বৈতসিংহ আমার বড়াই।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাঙ হেথাই ।।
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাহিব সর্ব জীব উদ্ধারিয়া ।। (চৈতন্য ভাগবত)

নবদ্বীপে তখন দারুণ অনাচার; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শুধু শুষ্ক জ্ঞানানুশীলনে মত্ত; স্নানের সময় পুণ্ডরীকাক্ষের নামটিও লয় কি না লয়! শ্রীবাসের অঙ্গনে যখন এই ক্ষুদ্রসম্প্রদায় কীর্তন গাহিতেন, তখন স্মার্ত, নৈয়ায়িক ও তান্ত্রিক 'পাষণ্ডীগণ' তাহাতে অতিশয় বিরক্তি বোধ করিত। ক্রমে চৈতন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবশ্য বিদ্যারসে মাতিয়া এই সমস্ত কৃষ্ণভক্তকে বাহ্যতঃ পরিহাস ও ব্যঙ্গ করিতেন। এদিকে নবদ্বীপের অধিকাংশ লোক শ্রীবাসাদি কৃষ্ণভক্তদিগকে বিদ্রূপে জর্জরিত করিত, কীর্তন শুনিলে বলিত, "সব পেট ভরিবার আশ।" (চৈ. ভা.) ভক্তগণ নিমাই পণ্ডিতের অঙ্গে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিলেন, মনে মনে আশান্বিত হইলেন, বুঝি বৈকুণ্ঠেশ্বর তাঁহাদের কাতর প্রার্থনা শুনিয়াছেন। কিন্তু ব্যাকরণ বিদ্যায় দড় নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণব ভক্তির ধার দিয়াও যান না, বরং বৈষ্ণবদিগকে পরিহাস করেন। ভক্তগণের ক্ষোভের সীমা নাই। কবে নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ও দম্ভের নির্মোক খসিয়া পড়িবে? সুগোপনে নিমাই পণ্ডিতের মনেও ভক্তির মেঘ জমিতে ছিল, বর্ষণের কাল ক্রমেই আসন্ন হইয়া আসিল। দিগ্বিজয়ী পরাভব স্বীকার করিলে নিমাই পণ্ডিত যে উপদেশ দিয়াছিলেন,[১১] এবং পূর্ব-বঙ্গ পরিভ্রমণে গিয়া তিনি তাঁহার প্রথম ভক্ত-শিষ্য তপন মিশ্রকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন,[১২] তাহাতে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি চৈতন্যের প্রচ্ছন্ন আসক্তি সূচিত হইয়াছে।

চৈতন্য যখন গয়াধাম হইতে নূতন মানুষ হইয়া ফিরিলেন, তখন এই সমস্ত ভক্তের দল উল্লসিত হইলেন। এতদিন পরে বুঝি বিষ্ণুমায়াচ্ছন্ন নিমাই পণ্ডিতের যথার্থ স্বরূপ প্রস্ফুটিত হইবার সময় হইয়াছে। লোকে বলিল, নিমাইয়ের বায়ুরোগ হইয়াছে। নিমাই-ও মাঝে মাঝে চিন্তিত হইতেন। একদা তিনি শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত, তোমার

---

[১১] চৈতন্য ভাগবত, আদি, ১১শ

[১২] ঐ, আদি, ১২শ

চিত্তে কি লয় আমারে ?" শ্রীবাস বুঝিতে পারিলেন, চৈতন্যের দেহে বায়ুরোগ প্রবেশ করে নাই :

মহা ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণে অনুগ্রহ হইল তোমারে ।। (চৈ. ভা.)

এইবার ভক্তগণ আশ্বস্ত হইলেন, বুঝিলেন মহাপ্রভুর প্রকট হইবার কাল উপস্থিত। অদ্বৈত ভাবোন্মত্ত তরুণ গৌরাঙ্গকে ঠিক চিনিতে পারিলেন—"এই মোর প্রাণনাথ।" গদাধর ইহাতে সংশয় প্রকাশ করিলেও অদ্বৈতের মনে কোন দ্বিধা রহিল না। পরে গদাধরও নিঃসন্দেহ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব তনুকান্তি এবং ভাবোন্মত্ত কৃষ্ণভক্তির পরিচয় পাইয়া গদাধরও মনে মনে কহিলেন, "হেন বুঝি অবতীর্ণ হইল ঈশ্বর।" নিমাই অদ্বৈতকে প্রণাম করিলে আচার্য মনে মনে হাসিয়া বলেন, তুমি আমাকে ভাঁড়াইতে পারিবে না :

মনে বলে অদ্বৈত, 'কি কর ভারিভুরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি ।।' (চৈ. ভা.)

নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞানহীন কৃষ্ণপ্রেমরতি দেখিয়া সকলে বলাবলি করিতে লাগিল :

কেহো বলে, এ পুরুষ অংশ অবতার।
কেহো বলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার ।।
কেহো বলে, শুক বা প্রহ্লাদ বা নারদ।
কেহো বলে, হেন বুঝি খণ্ডিত আপদ ।। (চৈ. ভা.)

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় মহাপ্রভুর কীর্তনে বৈষ্ণব ভক্তগণ আশ্বস্ত হইলেন—যদিও 'পাষণ্ডী'রা এ সমস্ত কীর্তন ও নৃত্যকোলাহল আদৌ ভালচোখে দেখিত না। যাহা হোক শ্রীবাস ও অদ্বৈত গৌরাঙ্গকে সর্বপ্রথম কৃষ্ণাবতার বলিয়া প্রচার করেন। এমন কি শ্রীবাস বিষ্ণুপূজার উপচারসমূহ মহাপ্রভুর চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে মুরারি গুপ্তের সঙ্গে চৈতন্যের পরিহাসের সম্পর্ক ছিল। রামোপাসক মুরারিকেও মহাপ্রভু বরাহ-অবতারের মূর্তি দেখাইলেন—মুরারি চৈতন্য-সেবক হইয়া ধন্য হইলেন। এই সময়ে দক্ষিণ-ভারত পর্যটন করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন। চৈতন্যদেব গয়া হইতে ফিরিবার পর হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত নবদ্বীপের ক্ষুদ্র এক ভক্তগোষ্ঠীর কাছে কৃষ্ণাবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। বোধহয় অবৈষ্ণব 'পাষণ্ডী'-সমাজ তখনও তাঁহার প্রতি

আকৃষ্ট হয় নাই। নবদ্বীপ তখন ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্র ; কাজেই প্রথম দিকে চৈতন্যপ্রভাব ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কাজীর বশ্যতা স্বীকার, জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনায় অবৈষ্ণব-সমাজও চৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগের পর তাঁহার প্রভাব শুধু নবদ্বীপেই নহে, পশ্চিম-বঙ্গের বহুস্থলে বহু মানুষের চিত্তে দাবানলের মতো বিস্তার লাভ করিল। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা শুধু তাঁহার প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় ভক্ত অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইতেছি।

অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যান্দ চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় ভক্তদের মধ্যে প্রধান। চৈতন্যের নীলাচলে যাত্রার পরে এবং তাঁহার তিরোধানের পরেও শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য এবং তাঁহার পত্নী সীতাদেবী বৈষ্ণবসমাজ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং খড়দহে নিত্যানন্দ, তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) এবং পত্নী জাহ্নবীদেবীও বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব বাঙলায় বৈষ্ণবধর্ম সুপ্রচারের জন্য অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকেই উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছিলেন এবং পুরী হইতে নিত্যানন্দকে বাঙলায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যের অনুপস্থিতি ও অবর্তমানে গৌড়ের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নানা পরিবর্তন হইয়াছিল। ভিতরে ভিতরে শান্তিপুর ও খড়দহের মধ্যে বিরোধ ও প্রতিকূলতা সৃষ্টি হইয়াছিল, এরূপ অনুমান নিতান্ত অযথার্থ নহে। তৃতীয় সম্প্রদায় হইতেছে শ্রীখণ্ডের (কাটোয়া) বৈষ্ণবগোষ্ঠী। ইঁহাদের নেতৃত্ব করিতেন মুকুন্দদাস ও নরহরি সরকার। সঙ্গীতে, আবেগে, সুর চর্চায় ইঁহারা আর এক প্রকার বৈষ্ণব ভাবাদর্শ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সহজিয়া নামক যে 'রাগানুগা' পন্থী সহজ-ভজনের দল বিচিত্র মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছিল, শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ই তাহার পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত আচার্য ॥ চৈতন্যের অধিকাংশ পরিকরের মতো অদ্বৈত আচার্যও শ্রীহট্টের অধিবাসী। চৈতন্যের জন্মের অর্ধ-শতাব্দীরও পূর্বে ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈত শ্রীহট্টে লাউড় পরগণায় নবগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি নাকি লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। বাল্যকালে অদ্বৈতের নাম ছিল কমলাক্ষ (কমলাকর) ভট্টাচার্য। বার বৎসর বয়সে কমলাক্ষ মাতাপিতার

সঙ্গে শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে আসেন। প্রথম যৌবনে তিনি জ্যোতিষ, ষড়দর্শন ও চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। বেদে অভিজ্ঞতার জন্য তিনি 'বেদপঞ্চানন' উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। ষড়দর্শন পড়িয়া তিনি বোধ হয় কিছুকাল অদ্বৈতপন্থী হইয়াছিলেন—অদ্বৈত আচার্য নামটি সেই স্মৃতি বহন করিতেছে। 'প্রেমবিলাস'-এর মতে তিনি প্রথম জীবনে অদ্বৈতবাদ ও মুক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। শান্তিপুর তাঁহার নিবাস হইলেও তিনি নবদ্বীপে টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইতেন। চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিতেন। বোধ হয় তাঁহার উপদেশের ফলেই বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন—শচীদেবী এইজন্য অদ্বৈতকে পরোক্ষ-ভাবে দায়ী করিতেন।

অদ্বৈত যে মূলতঃ জ্ঞানবাদী ছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই জন্য তিনি মহাপ্রভুর নিকট মাঝে মাঝে তর্জিতও হইতেন। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস এ বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ আখ্যান লিখিয়াছেন। একবার মহাপ্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতের আলয়ে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, জ্ঞান বড়, না ভক্তি বড়? অদ্বৈত বলিলেন, "সর্বকাল বড় জ্ঞান।" ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রোধে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া—

> পিঁড়া হইতে অদ্বৈতের ধরিয়া আনিয়া।
> স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পড়িয়া॥

অদ্বৈত ভ্রমক্রমে পূর্ব সংস্কার ছাড়িতে না পারিয়া জ্ঞানমার্গ ও মুক্তিতত্ত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি মহাপ্রভুর নিকট যথোচিত দণ্ড লাভ করিলেন। অবশ্য বৃন্দাবনদাস সমস্ত ব্যাপারটাকে লীলারহস্য বলিয়া লঘু করিতে চাহিয়াছিলেন। আসলে অদ্বৈত চৈতন্যভক্ত হইলেও বেদান্তের মুক্তিতত্ত্বকে যে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, অদ্বৈত শ্রীধরস্বামী ও মাধবেন্দ্র পুরীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া "believed in tempering intellectual Advaitisim with emotional Bhakti."[১৩] এ সিদ্ধান্ত যুক্তিপূর্ণ। কথিত আছে, অদ্বৈত মুক্তিপথ ত্যাগ করিয়া ভক্তিপথ গ্রহণ করিলে তাঁহার বৈদান্তিক শিষ্যদ্বয় (কামদেব নাগর ও শঙ্করদেব) তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়ে গিয়াছিলেন। অদ্বৈত কিছুকাল পরিব্রাজক হইয়া

১৩ S. K. De—*Vaisnava Faith and Movement*, pp. 24-25

দক্ষিণ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার সঙ্গে নাকি পরমভক্ত মাধবেন্দ্র-পুরীর সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণ-ভারত তখন ভক্তিবাদের কেন্দ্র। সেখানে শাণ্ডিল্য ও নারদের ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং মাধবেন্দ্রের প্রভাবে তাঁহার অদ্বৈত-পন্থী চিত্তে বোধ হয় প্রথম ভক্তিবাদের আবির্ভাব হয়। পরে তিনি শান্তিপুরে ফিরিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন এবং সীতা ও শ্রী নাম্নী দুই ভগিনীকে বিবাহ করেন। যবন হরিদাসের ত্যাগমহিমাপূত অপূর্ব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাঁহার মনে ক্রমেই ভক্তিবাদ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। নবদ্বীপে ভক্তিহীন জ্ঞানমার্গের অত্যধিক প্রভাব দেখিয়া নব ভাবরসে আপ্লুত অদ্বৈত কৃষ্ণাবতারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় যে মুষ্টিমেয় ভক্তিবাদী ভক্তের দল সমবেত হইয়া কৃষ্ণের কীর্তন, স্মরণ ও মনন করিতেন, অদ্বৈত তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, অদ্বৈতের হুংকারেই কৃষ্ণ চৈতন্য-চন্দ্ররূপে নবদ্বীপে শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বয়সে তাঁহার পিতৃতুল্য পরম ভক্ত অদ্বৈতকে চৈতন্যদেব 'নাড়া' (ন্যাড়া) বলিয়া বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি নীলাচলে সর্বসমক্ষে মহাপ্রভুকে কৃষ্ণাবতার বলিয়া ঘোষণা করিলেন :

> শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
> দীনদুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর।। (চৈ. ভা.)

এই বলিয়া তিনি ভক্তগণের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। এ সব ব্যাপারে চৈতন্যদেব অতিশয় রুষ্ট হইতেন। তিনি তো কৃষ্ণের দাসানুদাস; তাঁহাকে স্বয়ং-কৃষ্ণ বলিলে তিনি নিজেকে প্রত্যবায়গ্রস্ত বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য তাঁহার ভক্তগণ মনে মনে দৃঢ়রূপে জানিয়াও তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে কৃষ্ণাবতার বলিয়া প্রচার করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু নীলাচলে সমবেত গৌড়ীয় ও উৎকলীয় ভক্তগণের সমক্ষে অদ্বৈত চৈতন্যের ভাগবত-সত্তা সম্বন্ধে নিঃসংশয়-চিত্তে ঘোষণা করিলেন। অবশ্য ইহার বহু পূর্বে নবদ্বীপে যখন নিমাই পণ্ডিতের বায়ুরোগ হইয়াছে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত, তখন হইতেই অদ্বৈত আচার্য গৌরাঙ্গকে তুলসীমঞ্জরী দিয়া পূজা করিতেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণাবতার বলিয়া নিজে বিশ্বাস করিতেন, শ্রীবাসাদিকেও বিশ্বাস করাইয়াছিলেন।[১৪] 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে গোবিন্দ ঘোষের পদে দেখা যাইতেছে

---

[১৪] চৈতন্য ভাগবত, মধ্য, দ্বিতীয়

যে, অদ্বৈত নবদ্বীপ থাকিতেই গৌরাঙ্গের চরণে তুলসীপত্র দিয়া 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া প্রণিপাত করিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-এর মতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে নাম সঙ্কীর্তনে গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণকে অভিন্ন প্রচার করিয়াছিলেন।[১৫] চৈতন্যদেব তাঁহাকে বাঙলাদেশে কৃষ্ণনাম প্রচারে পাঠাইয়া দিলে অবধূত সর্বত্র চৈতন্য মহিমাই প্রচার করিয়াছিলেন :

> চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম।
> চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥ (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ১ম)

কৃষ্ণ ও রাধাতত্ত্ব লইয়া রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামী পরে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতের নেতৃত্বে গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁহাকে কৃষ্ণাবতার বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও অতিবৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য কিছুকাল জীবিত ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, তিনি নাকি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাহা হইলে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স অন্যূন ১১৫ বৎসর হইবে। নিত্যানন্দ তাঁহার পূর্বেই লোকান্তরিত হন। অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুত নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবক হইয়া বাস করিতেন।[১৬] অদ্বৈতের জীবিতকালে শান্তিপুর ও খড়দহের মধ্যে গুরুপদবী লইয়া কিঞ্চিৎ বিরোধ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর খড়দহ-সম্প্রদায়ের ভার পড়িল বীরচন্দ্রের বিমাতা জাহ্নবীদেবীর উপর। বীরচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা লইতে যাত্রা করিলে নিত্যানন্দ-সেবকগণ তাঁহাকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনেন; জাহ্নবীদেবীর নিকটেই তাঁহার দীক্ষা হয়। অদ্বৈত্যের মৃত্যুর পর সীতাদেবী শান্তিপুরে নেতৃত্ব লাভ করিলেন, তাঁহার পরে অদ্বৈত-পুত্রেরাই শান্তিপুর ও নবদ্বীপ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ও গুরুপদ লাভ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ দর্শন ও তত্ত্বের কঠিন ভিত্তির উপর চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অদ্বৈতের কৃপায়, বৃন্দাবন হইতে

---

[১৫] ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ

[১৬] অদ্বৈতের অপর দুই পুত্র নাকি চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিতেন না। এইজন্য অদ্বৈত তাঁহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য : ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত 'ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলী', পৃ ৩০৯)

প্রচারিত রাধাকৃষ্ণের যুগলতনুস্বরূপ চৈতন্য অপেক্ষা কৃষ্ণাবতার চৈতন্যই বাঙলাদেশে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিলেন। কোন আদিরসাত্মক ভক্তির দিকে না গিয়া বৃদ্ধ আচার্য গীতার 'সম্ভবামি যুগে যুগে' এই আদর্শে চৈতন্যদেবকে জীবতারণে, পাষণ্ডী দমনে এবং হরিনাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করাইয়াছেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে গৌড়ীয় মতের যে পার্থক্য, তাহা অদ্বৈত প্রভুর আদর্শ হইতেই মোটামুটি অবধারণ করিতে পারা যায়।

নিত্যানন্দ ॥ গৌড়ভূমিতে, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যাঁহার দান, দায়িত্ব ও কৃতিত্ব সর্বাধিক গৌরবপূর্ণ, তিনি অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু। নিমাই-নিতাই এই দুইটি নাম এখনও একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের দারুমূর্তি নিষ্ঠবান বৈষ্ণবগৃহে এখনও ভক্তির সহিত অর্চিত হয়। সাধারণে এখনও নিতাইকে নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়াই জানে। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে চৈতন্য বাঙলাদেশে নাম প্রচার করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অদ্বৈতপ্রভু অতিবৃদ্ধাবস্থাতেও নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু আপামর জনসাধারণ ও আদ্বিজ-চণ্ডালের মধ্যে কৃষ্ণনাম প্রচার ও চৈতন্যের গুণকীর্তন নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হইত না। গৌড়ীয় চৈতন্যসম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য অবধূত নিত্যানন্দের নাম এখনও সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার জীবনকথা এবং আচার-আচরণও অন্য বৈষ্ণব আচার্য হইতে বিশেষ পৃথক, কখনও কখনও অতি অদ্ভুত। অগ্রজকল্প নিত্যানন্দের অরক্ষণশীল আচার ব্যবহারের জন্য চৈতন্যদেব রীতিমতো শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। চৈতন্য-ভক্তদেরও কেহ কেহ অবধূতের উন্মত্ত ও ব্রাত্যবৎ আচরণ অনেক সময় বিশেষ পছন্দ করিতেন না। চৈতন্যদেব দিব্যভাবে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া পড়িলেও মণিরত্ন চিনিতে বিলম্ব করিতেন না। নিত্যানন্দকে যোগ্য পাত্র জানিয়াই তিনি তাঁহার হস্তে গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভার অর্পণ করেন। অদ্বৈতপ্রভু তখন অতিবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং নিত্যানন্দের উপরেই বাঙলাদেশে বৈষ্ণবমত ও নামতত্ত্ব প্রচারের ভার পড়িল। তিনি আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমা সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকথায় অলৌকিকতা অপেক্ষা লৌকিক বৈচিত্র্যই অধিকতর কৌতূহলপ্রদ।

সংসার-আশ্রমে নিত্যানন্দের নাম ছিল বোধ হয় কুবের[১৭], এবং সন্ন্যাস-আশ্রমে নাম হয় নিত্যানন্দ। ধনে কুবের নহেন—অসাধারণ মানসিক ঐশ্বর্যে ধনী ও ভূয়োদর্শনে পরম প্রাজ্ঞ নিত্যানন্দ বীরভূমের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মাঘমাসে জন্মগ্রহণ করেন (চৈ. ভা.)। তাঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা; মাতা পদ্মাবতী। সে যুগে বোধহয় তরুণ ব্রাহ্মণসন্তানগণ সুযোগ পাইলেই সন্ন্যাসী হইয়া ঘর ছাড়িতেন। তাই হাড়াই ওঝা সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন—পাছে নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যান। পুত্রের বয়স তখন অনধিক বার-চৌদ্দ বৎসর। পিতা ভাবিলেন কিশোর পুত্রের পায়ে বিবাহের সোনার শিকল পরাইয়া দেওয়া যাক। কিন্তু ব্যাপার হইল অন্যরূপ। কিশোর বয়সেই নিত্যানন্দ এক সন্ন্যাসীর সাথী হইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া গেলেন। ক্রমে কিশোর যুবক হইলেন, যৌবনও শেষ হইয়া আসিল। নিত্যানন্দ প্রায় বিশবৎসর নানা তীর্থে অবধূতের বেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, পথের মানুষ পথে নামিয়া, আচার-বিচারের জাতি-পাঁতি উড়াইয়া দিয়া মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর সংক্ষিপ্ত তালিকা আছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে, প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া নিত্যানন্দ বাঙলার ভদ্রেশ্বর হইতে বাঙলার বাহিরের বৈদ্যনাথ, কাশী, প্রয়াগ, মথুরাবৃন্দাবন, দ্বারকা, সিদ্ধপুর, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থান ঘুরিয়া ভক্তিশাস্ত্রের খনি দক্ষিণ-ভারতে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে সম্ভবতঃ মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎ হয়। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনানুসারে মাধবেন্দ্র ও নিত্যানন্দের মধ্যে যেন কতকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এই সময়ে নিত্যানন্দ ভক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাহার 'অবধূত' উপাধি হইতে মনে হয়, তিনি পূর্বে শৈবমতেই চলিয়াছিলেন। হয়তো মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি ভক্তিধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। ইতিমধ্যে তিনি শুনিলেন যে, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনি গৌরাঙ্গের নামে আকৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপে হাজির হইলেন। তিনি চৈতন্য অপেক্ষা বয়সে নয়-দশ বৎসর বড় ছিলেন, উপরন্তু

[১৭] লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন এনাম আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যথা—

মা বাপে থুইলা নাম কুবের পণ্ডিত।
সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সুচরিত ॥ (চৈ. ম.)

আকারে-প্রকারে বোধহয় তাঁহাকে দেখিতে কতকটা বিশ্বরূপের মতো ছিল। শচীমাতা অনাত্মীয় নিত্যানন্দকে সন্তানের স্নেহে কোলে টানিয়া লইলেন, ভক্তেরা তাঁহাকে বলরামের অবতার বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। তাহার স্পষ্ট কারণও ছিল। নিত্যানন্দ একেবারে চৈতন্যের বিপরীত; মাঝে মাঝে তিনি এমন শিশুসুলভ ব্যবহার করিতেন যে, বাহিরের লোকে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝিত। প্রথম যৌবনে তিনি তন্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া কিঞ্চিৎ 'কারণ' অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কাজেই ভক্তেরা বারুণীপানে ঘূর্ণিতলোচন বলরামের সঙ্গে নিত্যানন্দের সাদৃশ্য তো দেখিতে পাইবেনই।[১৮] নিত্যানন্দ মাঝে মাঝে প্রেমরসে (অথবা বারুণী পানে?) মাতাল হইয়া অসম্বদ্ধ আচরণ করিতেন, অসংলগ্ন উক্তি করিতেন। ভক্তেরা মনে করিতেন—এই তো বলরামের লীলা! চৈতন্যদেব অগ্রজতুল্য নিত্যানন্দ অবধূতকে স্বীয় 'গণ' বলিয়া এক মুহূর্তে চিনিয়া লইলেন, নিত্যানন্দও মহাপ্রভুকে 'আপন ঈশ্বর' বলিয়া বুঝিয়া ফেলিলেন। তখন গৌরাঙ্গের বয়স চব্বিশ বৎসরেরও কিছু কম, নিত্যানন্দ বড় জোর বত্রিশ বৎসরের পরিণত যুবক। নিত্যানন্দ শ্রীবাস ও মালিনীর (শ্রীবাসের পত্নী) গৃহে পুত্রস্নেহে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতেই মহাপ্রভুর আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেক হইল, তিনি যথার্থ গৌড়-মণ্ডলের ভক্তসম্প্রদায়ের নেতা হইলেন। সকলের অগ্রে নিত্যানন্দ 'জয়' 'জয়' বলিয়া চৈতন্যের শিরে এক কলসী জল ঢালিয়া দিলেন, তারপর অন্যান্য ভক্তরাও মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া অভিষেক করিলেন। চৈতন্য মধুররসের উপাসক হইলেও মাঝে মাঝে মর্ত্যসত্তা বিস্মৃত হইয়া যাইতেন এবং কৃষ্ণরূপের আবেশে উন্মত্ত হইয়া পাষণ্ডীদের বিরুদ্ধে হুংকার ধ্বনি করিতেন, সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করিয়া সক্রোধে বলিতেন, "খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা", কখনও ভক্তদের সামান্য ত্রুটির প্রতি অত্যন্ত নির্মম হইতেন। কিন্তু নিত্যানন্দের মনটি ছিল অতি কোমল; মানুষকে ভালবাসিয়া, ক্ষমা করিয়া, বুকে টানিয়া লইয়া নিত্যানন্দ বাঙলাদেশে যথার্থই প্রেমের বন্যা আনিয়াছিলেন। জগাই-মাধাইয়ের অত্যাচারে চৈতন্যদেব মর্ত্যলীলা ভুলিয়া গিয়া সক্রোধে 'চক্র চক্র' বলিয়া হাঁক দিয়াছিলেন—সুদর্শনচক্রের দ্বারা মহাপাপীদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া

[১৮] কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় তাঁহাকে স্পষ্টই বলরামের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন—"ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।" (১১শ শ্লোক)

ফেলিবেন। কিন্তু নিত্যানন্দ পাপী-তাপীকেও কোল দিয়াছেন—জগাই-মাধাই উদ্ধারের কাহিনী নিত্যানন্দের পরদুঃখকাতর উদার হৃদয়কে একমুহূর্তেই আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে তিনি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কেবল নিত্যানন্দই তাহাতে পূর্ণ সম্মতি দিয়াছিলেন। বিশ বৎসর তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া আপামর জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষকে নূতন কথা শুনাইতে হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে হইবে। চৈতন্যদেব নীলাচলে যাত্রা করিলে নিত্যানন্দও তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহার বড ইচ্ছা ছিল, পুরীধামে মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে বাস করিবেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহাকে ও অদ্বৈত আচার্যকে বাঙলাদেশে কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

নিত্যানন্দ বাঙলাদেশে ফিরিয়া পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গে কৃষ্ণনাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য-অর্চনারও ব্যবস্থা করিলেন। তখনও মহাপ্রভুর তিরোধান হয় নাই। চৈতন্যের বিগ্রহ পূজার প্রথম প্রবর্তক নিত্যানন্দ। পরে তিনি পানিহাটীতে আসিয়া প্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন। পানিহাটী, আকনামাহেশ, সপ্তগ্রাম, আগরপাড়া, কুমারহট্ট, খড়দহ, তাম্বুলি, হাথিয়াকান্দা, পাথরঘাটা, হাতিয়াগড়, ছত্রভোগ, বরাহনগর, কোতরঙ্গ, বানিদিঘা, চাতরা, পাঁচপাড়া, বেতড়, বূঢ়ল, অম্বুয়া, ফুলিয়া, দোগাছিয়া, নিমতা, উদ্ধারণপুর, নৈহাটী প্রভৃতি গ্রামে নিত্যানন্দ মহোল্লাসে ভক্তদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের মহিমা-কীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে কোল দিলেন। তখন সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় সমাজে একটু অপাংক্তেয় হইয়া থাকিতেন। সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী ও সুবর্ণবণিক সমাজের নেতা উদ্ধারণ দত্ত তাঁহার সেবক হইয়া ধন্য হইলেন। শুনা যায় নিত্যানন্দ নাকি খড়দহে 'নেড়ানেড়ী'দিগকে (সহজিয়া) বৈষ্ণবসমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের অভিষেকের মতো পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে মহাসমারোহে নিত্যানন্দের অভিষেক হইল। তাঁহার আচার-আচরণ অনেকের নিকট অদ্ভুত মনে হইত। অভিষেকের সময় তিনি নানা আভরণ-অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন। প্রচারে বাহির হইয়াও তিনি ঠিক নিষ্কিঞ্চনবৎ আচরণ করিতেন না। তাঁহার বহু বণিক ও ধনী ভক্ত ছিল। নবদ্বীপ ত্যাগ

করিয়া নিত্যানন্দ পানিহাটী খড়দহে কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। তাঁহার আচার-বিচার অত্যন্ত উদার—স্মার্ত নিয়ম-কানুন তিনি বড় একটা মানিতেন না। নবদ্বীপের শ্রীবাসাদি ভক্তগণ এতটা যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না।[১৯] এইজন্য নিত্যানন্দ একটু দূরে অবস্থান করিয়া শিষ্যসহ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমাজের অপাংক্তেয়দের কোল দিলেন, বণিকসম্প্রদায়কে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন এবং জাতিপাঁতির ভেদ একেবারে উঠাইয়া দিলেন। পানিহাটীতে নিত্যানন্দ ছত্রিশ জাতিকে চিঁড়াদধির ভোজে বসাইয়া দিলেন। চৈতন্যসম্প্রদায়ের মনের দিক হইতে জাতিবিচার না থাকিলেও বাহিরের আচরণে কিছু কিছু সম্প্রদায়-চিহ্ন ছিল। হরিদাস ও সনাতন মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ-ভক্ত এবং বৈষ্ণবসমাজে অতিশয় মান্য হইলেও ইঁহারা অন্যান্য ভক্তদের সান্নিধ্য হইতে একটু দূরে একান্তে অবস্থান করিতেন। হরিদাস হয়তো মুসলমান ছিলেন অথবা মুসলমানের দ্বারা লালিত-পালিত হইয়াছিলেন; সনাতন হুসেন শাহের প্রধান কর্মচারী হইয়া কিছু কিছু ম্লেচ্ছাচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পাছে ভক্তেরা মনে মনে কিছু ভাবিয়া বসেন, এইজন্য এই দুই আদর্শ ভক্ত সসঙ্কোচে একান্তে অবস্থান করিতেন। চৈতন্য যে এই ভেদবৈষম্য দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তিনি অন্তরের ভক্তি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, বাহিরের এই সমস্ত আচার-আচরণ লইয়া চিন্তা করিবার অবকাশ পান নাই। অবশ্য তিনি নিজে যে আচার-আচরণ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা নহে। নিত্যানন্দ চৈতন্যের শাস্ত্রমার্গীয় আচার-আচরণ ততটা ভালচোখে দেখিতেন না। উড়িষ্যা যাত্রাকালে নিত্যানন্দ চৈতন্যের সন্ন্যাসজীবনের প্রতীক দণ্ডটিও ভাঙ্গিয়া দিয়া মহাপ্রভুর সন্ন্যাসী-অভিমান দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে চৈতন্য একটু অভিমান

[১৯] অদ্বৈত একবার পরিহাস করিয়া নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন :

পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল-জন্ম জাতি কেহো না জানি কোথাত॥
পিতামাতা গুরু আদি নাহি জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল, বোলায় অবধূত॥ (চৈতন্যভাগবত)

অদ্বৈত সকৌতুকে যাহা বলিয়াছিলেন, নবদ্বীপের অনেক বৈষ্ণবভক্ত নিত্যানন্দ সম্বন্ধে মনে মনে তাহাই সত্য বলিয়া মনে করিতেন। ফলে রক্ষণশীল বৈষ্ণবগণ নিত্যানন্দের বেপরোয়া আচার-আচরণের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন।

প্রকাশ করিলেও পরে নিত্যানন্দের প্রতি পূর্ববৎ স্নেহ ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ শাস্ত্রমার্গ মানিয়া চলিতেন না বলিয়া কোন কোন ভক্ত চৈতন্যের কাছে নিত্যানন্দের অনাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন। শুধু তাই নয়, নিত্যানন্দ অবধূত সন্ন্যাসী হইয়াও বিলাসী গৃহস্থের মতো জীবন যাপন করিতেন, অলঙ্কার ধারণ করিতেন, শূদ্রের বাটীতে অবস্থান করিতেন—কাজেই শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণদের আপত্তি হইবার কথা।[২০] কিন্তু চৈতন্য বুঝিয়াছিলেন, শুদ্ধভক্ত মহামল্ল নিত্যানন্দের ইহা ছদ্মবেশ মাত্র। তাই তিনি নিত্যানন্দের স্বরূপ বুঝাইয়াছিলেন :

পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল ॥

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে যে, নিত্যানন্দ বাদ্যযন্ত্র সহ নৃত্যগীতে আসক্ত ছিলেন এবং অলঙ্কার ধারণ করিতেন বলিয়া চৈতন্য নাকি একটু অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন :

কর্তাল মৃদঙ্গযন্ত্র মাল্যচন্দনে।
শিঙ্গা বেত্র গুঞ্জহার নূপুর আভরণে ॥
মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সঙ্কীর্তনে।
হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোন জনে ॥

ইহার উত্তরে নিত্যানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা লোকচরিত্রজ্ঞ নেতার উক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে :

শুনি নিত্যানন্দ গোঁসাই হাসি হাসি কহে।
কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে ॥

অর্থাৎ কলিযুগে বৈষ্ণবধর্মকে গণধর্মে পরিণত করিতে হইলে এ সমস্তই প্রয়োজন। নিত্যানন্দ স্থানকালপাত্র অনুসারে ঠিকই বলিয়াছিলেন। আচণ্ডাল সকলকে কোল দিয়া এবং যম-নিয়মাদির প্রতি অবহেলা দেখাইয়া নিত্যানন্দ পরোক্ষভাবে বৈষ্ণবধর্মের পরিচালনাকে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের কবল হইতে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন। একদা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "ডিমোক্র্যাসী যদি একটা রস হয়, তবে তারই নাম 'অকিঞ্চন সমরস' এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুই বাঙলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিমোক্র্যাট…ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রচার করিয়াছেন

[২০] চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

—'অকিঞ্চন সমরস' পতিত উদ্ধার।"[২১] আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের এই উক্তিটি অতিশয় গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। ডেমোক্র্যাসী শব্দটিকে রাজনীতি-সমাজনীতি হইতে সরাইয়া আনিয়া ধর্মাচারে প্রয়োগ করিলে নিত্যানন্দকে ডিমোক্র্যাট না বলিয়া পারা যায় না।

অদ্বৈত বোধহয় নিত্যানন্দের এই নূতন আচরণ বিশেষ পছন্দ করিতেন না। জনসাধারণকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়া উদ্ধার করিতে হইবে নিশ্চয়। অদ্বৈতই তো শ্রীবাসের আঙিনায় মহাপ্রভুকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "চণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গায়্যা।" কিন্তু নিত্যানন্দ দৈনিক আচার-আচরণে যে-ভাবে ইতর-ভদ্র ব্রাহ্মণ-শূদ্রকে এক করিয়া ফেলিতেছিলেন, অদ্বৈতের তাহা বোধহয় মনঃপূত হয় নাই। তাই চৈতন্যের অনুপস্থিতির ফলে গৌড়ে ভক্তিধর্মে কালিমা প্রবেশ করিতেছে এই মর্মে প্রহেলিকার ভাষায় একখানি 'তরজা'পত্র লিখিয়া তিনি জগদানন্দের মারফতে নীলাচলে প্রভু-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন :

বাউলকে কহিও—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও – হাটে না বিকায় চাউল ।।
বাউলকে কহিও—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও—ইহা কহিয়াছে বাউল ।। (চৈতন্য চরিতামৃত)

কেহ কেহ মনে করেন, এই তরজার প্রচ্ছন্ন অর্থ—নিত্যান্দের বিরোধিতা। নিত্যানন্দের জাতিপাঁতি একাকার করণে বোধহয় কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া অদ্বৈত চৈতন্যদেবকে প্রচ্ছন্নভাবে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, এদেশে ভক্তিধর্ম আর পূর্বের মতো নাই, ভক্তি প্রচারের কাজ বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না। কেহ কেহ এরূপ অর্থে না লইয়া ছত্র কয়টির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে—চৈতন্য-প্রভাবে দেশে প্রেমধর্ম এমন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছে যে, এখন আর কাহাকেও প্রেম দিবার প্রয়োজন নাই, লোকে স্বতঃই কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়াছে।[২২] নীলাচলের ভক্তগণ এই তর্জার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমে "তাঁর

[২১] গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ, পৃ ৯৬

[২২] রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে ১৩৪৫ সনের সংস্করণের ৯৭০-৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যেই আজ্ঞা” বলিয়া কিছুকাল মৌন হইয়া রহিলেন, তারপরে স্বরূপ পুনরায় প্রশ্ন করিলে মহাপ্রভু ইহার যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতেও তর্জার অর্থ সরল হইল না। পরিশেষে তিনি স্বীকার করিলেন, “আমি হো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ।” যদি তর্জাটিতে ভক্তিপ্রচারের প্রশংসা থাকিত, তাহা হইলে চৈতন্যদেব এবং চৈতন্যভক্তগণ নিশ্চয় উল্লাস প্রকাশ করিতেন। কিন্তু মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ নীরব হইলেন, “স্বরূপ গোঁসাই কিছু হইলা বিমনা।” স্বরূপ নীলাচল লীলার প্রধান সাক্ষী, ভক্তিশাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ। তিনি যখন বিমনা হইলেন, তখন এই তর্জায় প্রচ্ছন্নভাবে বেদনা ও হতাশার কথা আছে। কারণ, ইহার পরেই চৈতন্যের বিরহদশা আরও বাড়িয়া গেল, বাহ্যজ্ঞান এক-প্রকার লুপ্ত হইল। ইহার পর তাঁহার বাহ্য চেতনা কোন দিন ফিরিয়াছিল কিনা সন্দেহ। সুতরাং এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায় যে, শান্তিপুর হইতে নীলাচলে মহাপ্রভুকে অদ্বৈত যে প্রহেলিকাময় তর্জাপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সরল অর্থ—চৈতন্যের অনুপস্থিতির ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শিথিলতা প্রবেশ করিয়াছে, ভক্তিধর্ম প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়াছে। অথচ দেখা যাইতেছে এই সময়ে নিত্যানন্দ ভক্তগণসঙ্গে ভাগীরথীতটে আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছেন, মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেক হইতেছে, চিঁড়াদধি সেবার মহোৎসব চলিতেছে, আদ্বিজচণ্ডাল চৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছে।

অদ্বৈতের প্রভাব ও নেতৃত্বে বৈষ্ণবধর্ম নবদ্বীপ ও উহার চতুষ্পার্শ্ব ছাড়িয়া ব্যাপকভাবে বেশী দূর যাইতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্য আমরা অনুমান করি, নিত্যানন্দের আদ্বিজচণ্ডালকে চৈতন্যপ্রেমে একাকার ও ‘বাউল’ করিবার চেষ্টা নবদ্বীপের প্রবীণ ও ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ী ভক্তগণ বিশেষ সুদৃষ্টিতে দেখেন নাই। নীচ ও অন্ত্যজকে বুকে তুলিয়া লও, কিন্তু নিম্নে নামিয়া গিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার প্রয়োজন নাই—বোধহয় অদ্বৈত এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু নিত্যানন্দ জাতিপাঁতি বিধিনিষেধ কিছুই মানিতেন না, বাঙলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে তিনি সম্পূর্ণ নূতন ভাবভঙ্গী আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পরিণাম কোথায় গড়াইয়াছিল, তাহা আমরা এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করিব।

মহাপ্রভুর তিরোধানের কিছু পরে নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়া সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করেন। কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্যদাস

সরখেলের (সূর্যদাস আবার নিত্যানন্দের শিষ্য) দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ হয়।[২৩] তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ছাপ্পান্ন বৎসর। এই বিবাহে বোধহয় কিছু কিছু সামাজিক কথা উঠিয়াছিল। নিত্যানন্দ অবধূত হইয়া নানা দেশ ঘুরিয়াছিলেন, আচার-বিচারের কিছুই মানেন নাই, নবদ্বীপে ফিরিয়া বা খড়দহে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াও তিনি ততটা শুদ্ধাচার মানিয়া চলিতেন না, কোন কোন সময় তিনি বালকবৎ আচরণ করিতেন। তাই বৈষ্ণবসমাজের কেহ কেহ তাঁহার পোষকতা করিতেন না।[২৪] যাহা হোক, এই বিবাহে নিত্যানন্দের দুইটি সন্তান হয়। বসুধার গর্ভে বীরভদ্র (বীরচন্দ্র) এবং জাহ্নবীর গর্ভে রামভদ্রের জন্ম হয়। নিত্যানন্দের লীলাবসানে[২৫] জাহ্নবী দেবী এবং বীরভদ্র বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপ-সম্প্রদায়ের প্রভাব কিছু হ্রাস পাইল এবং বীরভদ্রের প্রভাবে বাঙলার বৈষ্ণবসম্প্রদায় নূতন পথ গ্রহণ করিল।[২৬] বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীরা চৈতন্যের দর্শন ও ভক্তিতত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন,— তাঁহাদের গ্রন্থাদি রচিত না হইলে বৈষ্ণবধর্ম এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া আর এক দিক হইতে নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের আদর্শকেই সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন

২৩ জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে আরও একটি বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন :

সূর্যদাস নন্দিনী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী।
নিত্যানন্দ প্রেমময়ী শ্রীবসু জাহ্নবী ॥

জাহ্নবী ও বসুধা তো তাঁহার ধর্মপত্নী। তাহা হইলে সরখেল-দুহিতা শ্রীমতী চন্দ্রমুখীর সঙ্গে নিত্যানন্দের কিরূপ সম্পর্ক ছিল? অথবা 'চন্দ্রমুখী' শব্দ বসুধা ও জাহ্নবীর বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? জয়ানন্দের পরিবেশিত তথ্যের উপর নির্ভর করিলে বিপজ্জনক ব্যাপারের সম্মুখীন হইতে হইবে।

২৪ এইরূপ বিরূপতার উৎকট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর খড়দহে যে মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে অনেক বৈষ্ণব যোগদান করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বাটীতে একবার বৈষ্ণবদের সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সভায় কৃষ্ণদাসের ছোট ভাই নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। তাহা লইয়া নিত্যানন্দের দুইজন অনুচরের সঙ্গে তাঁহার রীতিমতো মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পরেও কেহ কেহ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত না।

২৫ 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী' মতে ১৫৪২ খ্রীঃ অব্দে নিত্যানন্দের তিরোধান হয়।

২৬ এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে বীরভদ্র-প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে।

উৎকলে চৈতন্যভক্ত ॥

নীলাচলে চৈতন্যদেবের শেষ আঠার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এখানে শুধু গৌড়ীয় ভক্তগণই রথযাত্রার সময় মিলিত হইতেন না, নীলাচলের অনেক ভক্ত ও পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। খাস উৎকলীয় ভক্তদের মধ্যে জনার্দন, কৃষ্ণদাস, শিখি মাহিতী, মুরারি মাহিতী (শিখির ভাই), প্রদ্যুম্ন মিশ্র, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, বিষ্ণুদাস, পরমানন্দ, ভবানন্দ, কাশীপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র কাশী মিশ্র ও বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট চৈতন্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার একান্ত অনুরাগী হইয়া পডিাছিলেন। কুঞ্জঘাটার জমিদার-বাড়ীতে সর্পাষদ চৈতন্যের যে বিরাট পুরাতন চিত্র আছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, প্রতাপরুদ্র সোপানের উপর চৈতন্যের প্রায় পদতলে দণ্ডবৎ হইয়া পডিয়া আছেন (চিত্র দ্রষ্টব্য)। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ না করিলেও চৈতন্যদেবের যে একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত ভক্তদের মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা চৈতন্যতত্ত্বের গূঢ়কথা জানিতেন, চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে ইঁহাদের বিস্তারিত পরিচয় আছে। বৃন্দাবন-ধামের চৈতন্য-ভক্ত গোস্বামিগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কায়ব্যূহ নির্মাণ করিলেও এই তিনজন নীলাচলবাসী ভক্ত চৈতন্যের নিকটতম সাহচর্যে বাস করিতেন বলিয়া চৈতন্যের গূঢ় তত্ত্বকথা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ রাখিতেন। এখানে এই তিনজন ভক্তের কথা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

বাসুদেব সার্বভৌম ॥ বাসুদেব সম্বন্ধে এত বিভিন্ন প্রকার জনশ্রুতি আছে যে, কোন্‌টি বিশ্বাসযোগ্য, আর কোন্‌টি অতিরঞ্জিত বা অবিশ্বাস্য তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বাসুদেব ভট্টাচার্য পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বন্দ্যঘটী কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশারদ। ইনিও বৈদান্তিক ছিলেন। নবদ্বীপের চারিটি বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে বাসুদেবের নাম জড়াইয়া গিয়াছে—নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এবং চৈতন্যদেব। ইঁহারা সকলেই নাকি নবদ্বীপে বাসুদেবের টোলে

পড়িয়াছিলেন। বোধহয় এ সমস্ত লোকশ্রুতির মূলে সত্য নাই। সে যাহা হোক, বাসুদেব মিথিলায় ন্যায় পড়িতে গিয়া পক্ষধরের নব্যন্যায়ের গ্রন্থ 'চিন্তামণি' এবং উদয়নাচার্যের 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'র শ্লোকাংশ সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ করিয়া বাঙলাদেশে লইয়া আসেন এবং টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে নব্যন্যায় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির গুণে নবদ্বীপে ন্যায়-অধ্যাপনা খুব জমিয়া উঠিল। তাঁহার ছাত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার গ্রন্থের টীকা লিখিয়া খ্যাতি ও বিদ্যাবুদ্ধিতে গুরুকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে যে, মুসলমান সুলতানের অত্যাচারের ভয়ে বাসুদেব পুরীতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য দর্শনে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বৃত্তিতে নব্যন্যায়ের পণ্ডিত হইলেও জ্ঞানবিশ্বাসে তিনি বোধ হয় বৈদান্তিক ছিলেন। কেবল শেষজীবনে চতুর্বিংশ বয়স্ক চৈতন্যের প্রভাবে তিনি ভক্তিধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। চৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকারটি বড চমৎকার। বাসুদেবের পিতা বিশারদের সঙ্গে চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর পরিচয় ছিল। কিন্তু চৈতন্যের শৈশবেই বাসুদেব সম্ভবতঃ নবদ্বীপ ছাড়িয়া পুরীধামে চলিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই তিনি চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা-সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। চৈতন্য প্রথমবার পুরীধামে উপস্থিত হইয়া জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়েন; তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া পাণ্ডাগণ তাঁহাকে এমন প্রহার করে যে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে। সেই সময় বাসুদেবও মন্দিরে আসিয়াছিলেন; তিনি গৌড় হইতে আগত এই দিব্যকান্তি তরুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের বাসায় লইয়া আসেন এবং সেবা করিয়া সুস্থ করিয়া তোলেন। চৈতন্য সুস্থ হইলে এই বৈদান্তিক পণ্ডিত নিজ ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্যের নিকট সংবাদ লইয়া দেখিলেন, এই তরুণ যুবক দ্বৈতবাদী ভক্তির পথিক। বৈদান্তিক বাসুদেব তখন চৈতন্যকে ভক্তির আবেগ ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। কারণ চৈতন্যদেব কেশবভারতীর নিকট দীক্ষা লইলেও 'ভারতী' সম্প্রদায় অধ্যাত্মমার্গে মধ্যম শ্রেণী মাত্র।[২৭] যাহা হোক সার্বভৌম নবীন সন্ন্যাসীকে

[২৭] চৈতন্যদেব এইজন্য পুনঃপুনঃ আপনাকে হীনসম্প্রদায় বলিয়াছেন :

অদ্বৈতবাদী বেদান্ত-উপনিষদ ব্যাখ্যা করিলেন। সাতদিন ধরিয়া এই ব্যাখ্যা-আলোচনা চলিল, কিন্তু সমস্তটাই একতরফা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। চৈতন্য সাতদিন ধরিয়া নীরবে সার্বভৌমের ব্যাখ্যা শুনিলেন। অষ্টম দিনে সার্বভৌম বিস্মিত হইয়া জানিতে চাহিলেন যে, চৈতন্য সমস্ত কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা। মহাপ্রভু তখন সুতার্কিকের মতোই বলিলেন যে, মূল বেদান্তসূত্র ও উপনিষদ তিনি বেশ বুঝিয়াছেন, কিন্তু "তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়তো বিকল।" তারপর প্রবীণ বৈদান্তিক ও নবীন ভক্তিবাদীর মধ্যে দারুণ তর্ক চলিল। উভয়েই নানা ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থ হইতে অসংখ্য উদ্ধৃতি উল্লেখ করিলেন। শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কে অদ্বৈতবাদী বাসুদেব নতি স্বীকার করিলেন, তাঁহার বৈদান্তিক আবরণ অপসারিত হইল, "প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার।" অতিশয় সংযত গম্ভীর সর্বজনমান্য প্রায়-বৃদ্ধ বাসুদেব চব্বিশ বৎসরের নবীন যুবকের চরণ বন্দনা করিলেন, চৈতন্যের আলিঙ্গন লাভ করিয়া

ভট্টাচার্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি ॥ (চৈ. চ.)

মহাপ্রভু তাঁহার বৃদ্ধ ভক্তকে শান্ত করিলে সার্বভৌম আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন :

তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি—প্রতাপ প্রচণ্ড ॥

প্রভু কহে আমি হই হীন সম্প্রদায়।
তোমার সভাতে মোর বসিতে না জুয়ায় ॥ (চৈ. চ.)

শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত দশনামী সম্প্রদায়িগণ দশটি শাখায় বিভক্ত—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পুরী, পর্বত, ভারতী, কানন ও সরস্বতী। শঙ্করাচার্য কোন কারণে গিরি ও পুরীর দণ্ড কাড়িয়া লইয়া বিদায় দেন, এই দুই সম্প্রদায় তাই 'গুরুত্যাগী' নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্য ভারতীর দণ্ড ভাঙিয়া অর্ধেকটি দান করেন। ভারতীসম্প্রদায় গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হন বলিয়া 'হীনসম্প্রদায়' নামে পরিচিত এবং ইঁহারা এই জন্য অন্যান্য সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে একটু হীন হইয়া থাকিতেন। কেশব ভারতী এই ভারতী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। মহাপ্রভু তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন বলিয়া নিজেকে হীন মনে করিতেন। চৈতন্যকে দেখিয়া বাসুদেব সার্বভৌমও বোধ হয় একটু অপ্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতীসম্প্রদায় এই হয়ে ত মধ্যম।" (চৈ. চ.)

নিত্যানন্দের জগাই-মাধাই জয় অপেক্ষাও বাসুদেবের পরাজয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বাসুদেবের মতো বিখ্যাত পণ্ডিত, নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকের মহাপ্রভুর চরণে শরণ লইবার সংবাদ বুদ্ধিজীবী নৈয়ায়িক মহল ও বৈদান্তিক গোষ্ঠীতে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাসুদেবকে স্বগণভুক্ত করিয়া চৈতন্যও মহানন্দে বলিয়াছিলেন :

> আজি মুই অনায়াসে জিনিমু ত্রিভুবন।
> আজি মুই করিমু বৈকুণ্ঠে আরোহণ ॥

বাসুদেব-চৈতন্যদেবের এই কাহিনী এইজন্য বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনার পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-মান্য প্রবীণ পণ্ডিতের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া চৈতন্যদেব উৎকল-সমাজে শীঘ্রই অবতার বলিয়া পূজিত হইলেন এবং বেদান্তসূত্রের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যার স্থলে দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা পণ্ডিতসমাজে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। বাসুদেব বোধহয় ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার নামে 'গৌরাঙ্গাষ্টক' নামক সংস্কৃতে রচিত গৌরাঙ্গ-স্তুতি প্রচলিত আছে। চৈতন্যদেবকে তিনি অবতার বলিয়া ভক্তি করিতেন। চৈতন্য ও বাসুদেবের তর্ক-বিতর্ক কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন, উভয়ের আলোচনাটি ঠিক ঐ ভাবে হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যাইতেছে না। কারণ চৈতন্যচরিতামৃতের এই বর্ণনায় দেখা যাইতেছে, চৈতন্য 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন। রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' চৈতন্য-তিরোধানের পরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি অনেকটা কবিরাজ-গোস্বামীর স্বকপোলকল্পিত, এ অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নহে। কৃষ্ণদাস চৈতন্যের মুখে এই সমস্ত শ্লোক অর্পণ করিয়া বর্ণনার ঐতিহাসিক ক্রম নষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য চৈতন্যপ্রভু তর্ক-বিতর্কের স্থলে ঠিক ঐ শ্লোক পাঠ না করিলেও অনুরূপ কথাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস ঠিক উদ্ধৃতিটি চৈতন্যের মুখে বসাইয়া দিয়াছিলেন—হয়তো ইহাতে ঐতিহাসিক ক্রমের খানিকটা ক্ষতি হইয়াছে। যাহা হোক বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লইয়া চৈতন্য ও বাসুদেবের বিতর্ক এবং পরিশেষে বাসুদেব কর্তৃক ভক্তিপথ গ্রহণ, একথা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, কবি কর্ণপূর এবং বৃন্দাবনদাস এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কৃষ্ণদাস সমস্ত বিতর্কটিকে যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করিবার জন্য প্রসঙ্গ ক্রমে গৌড়ীয় মতানুসারে কৃষ্ণতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন যে, চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থে মহাপ্রভুকে যেরূপ সুতার্কিক, দার্শনিক ও তাত্ত্বিকরূপে অঙ্কন করা হইয়াছে, বাস্তবিক তিনি সেরূপ ছিলেন না। তিনি প্রধানতঃ ছিলেন ঈশ্বরপ্রেমে 'বাউল' সন্ন্যাসী; পুঁথিপত্রের বিশেষ ধার ধারিতেন না। বাসুদেবের মতো অদ্বৈত শাস্ত্র এবং নব্যন্যায়ে নিষ্ণাত তাত্ত্বিক ব্যক্তি যে তত্ত্ববাদে হারিয়া গিয়া মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। ডঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"In the orthodox accounts, however, it appears that the great Vedantist was not fully convinced by the metaphysics of the young enthusiast, but that he was finally overpowered when Caitanya revealed himself to his vision as the divine Krishna."[২৮] কিন্তু বাসুদেব চৈতন্যের 'কেরামতে' মুগ্ধ হইয়াই পাগলের মতো তাঁহাকে ভজন-পূজন করিবেন এবং দীর্ঘকাল-পোষিত সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবেন—তাঁহার মতো বুদ্ধিবাদীর তীক্ষ্ণ মন-বুদ্ধি এতটা অসাড় হইয়া গিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। চৈতন্য-জীবনীতে এ সম্বন্ধে ঠিক খবরটি না থাকিলেও বৈদান্তিক সার্বভৌম যে বিদ্যার অসারতা বুঝিয়া এবং বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ত্যাগ করিয়া চৈতন্য-পরিকর হইয়াছিলেন, এ কথা কিছুতেই অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ বাসুদেবের পরাজয় যথার্থই পরাজয়—প্রেমভক্তির নিকট শুষ্ক বুদ্ধির পরাভব। বাসুদেবকে স্বমতে আনয়ন চৈতন্যদেবের ঐশী মহিমারই পরিচায়ক। রায় রামানন্দের সঙ্গেও তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু রামানন্দ পূর্ব হইতেই ভক্তিপথের পথিক হইয়াছিলেন, চৈতন্যদেবকে গোড়া হইতে রামানন্দকে তত্ত্বোপদেশ দিতে হয় নাই।

রায় রামানন্দ ॥ চৈতন্যদেবের উৎকলীয়া ভক্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন রায় রামানন্দ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রায় রামানন্দ ও চৈতন্যদেবের রসতত্ত্ব বিষয়ক আলাপাদির যে চিত্র দিয়াছেন (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ম পরিঃ) তাহাতে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় নির্যাসটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় প্রতাপরুদ্রের অধীনে কোন অঞ্চলের ভূস্বামী বা বড় রাজকর্মচারী ছিলেন। রামানন্দও বিদ্যানগরের উচ্চতর

[২৮] Dr. S. K. De.—*Vaishnava Faith & Mevement*

রাজকার্যোপলক্ষে গোদাবরীতীরে রাজমহেন্দ্রীতে বাস করিতেন। রায় বিশুদ্ধ ভক্তিপথের পথিক ছিলেন। জাতিতে শূদ্র হইলেও শাস্ত্র ও ভক্তিতে তাঁহার অগাধ অধিকার ছিল। বহু ব্রাহ্মণও তাঁহার অনুচর হইয়াছিলেন। উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন বলিয়া রামানন্দকে বাহ্যিক ঐশ্বর্যের মধ্যে কাল কাটাইতে হইত, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং 'মঞ্জরী' ভাবের রসিক।

বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্যের ভক্ত হইলেন। কিন্তু চৈতন্যের কৃষ্ণকথার পিপাসা মিটান সার্বভৌমের সাধ্যাতীত। তিনি রায় রামানন্দের কথা বলিয়া দিলেন। বলিলেন যে, রামানন্দের ভক্তিবাদকে একদা তিনি 'অপ্রাকৃত' ব্যাপার বলিয়া পরিহাস করিতেন।[২৯] কিন্তু চৈতন্যের সান্নিধ্য লাভের পর বাসুদেব সার্বভৌম রায় রামানন্দের মহিমা বুঝিতে পারিলেন এবং চৈতন্যকে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। অতঃপর রাজমহেন্দ্রীতে গোদাবরী তীরে প্রবীণ রসিক রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইল। পরস্পরের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপাদি হইল। চৈতন্যের প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ ধীরে ধীরে শাস্ত্রবিহিত ভাবে ভক্তিধর্ম ও সাধ্যবস্তু ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু "প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।" রামানন্দ সর্বশেষে বলিলেন, "কান্তভাব প্রেম-সাধ্য সার।" চৈতন্যদেব ইহাই শুনিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এইখানেই কি সমস্ত প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাপ্তি?

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥

রায় রামানন্দ বিস্মিত হইলেন। ইহার পরেও কেহ কিছু জানিতে চাহিতে পারে?

রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও আমি কহি সেই বাণী॥

তখন রামানন্দ ভক্তিতত্ত্বের গূঢ়তম তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলেন এবং রাধাঠাকুরাণী ও সখীভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেন। তাহাই রাধাপ্রেম, যখন 'না সো রমণ, না হাম রমণী'—যখন স্ত্রীপুরুষের ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যায়, যখন

অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া॥ (চৈ. চ.)

'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা' মুছিয়া গিয়া 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা' জাগ্রত হয়। অহং-চেতনার সম্পূর্ণ নির্বাপণ না হইলে গোপী-প্রেম উপলব্ধি করা যাইবে না। তাই সখীসাধনাই এই ভক্তিধর্মের মূলকথা।[৩০] চৈতন্যদেবের অন্তরের পিপাসা নিবৃত্ত হইল; রমানন্দ শূদ্র হইলেও চৈতন্যদেব তাঁহাকে প্রেমতত্ত্বের গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

এই আলোচনায় বৃন্দাবন-গোস্বামীদের তত্ত্বাদর্শই অনুসৃত হইয়াছে। বোধহয় স্বরূপ-দামোদরের কড়চায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছিল; কৃষ্ণদাস তাহা হইতেই এই আলাপাদির ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন। স্বরূপের 'কড়চা' পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই তত্ত্বের কতটুকু কৃষ্ণদাসের নিজের পরিকল্পনা, কতটুকু চৈতন্য-রামানন্দের আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কতটুকুই-বা কৃষ্ণদাস স্বরূপ-দামোদরের তথাকথিত কড়চা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে না। কৃষ্ণদাস মাঝে মাঝে চৈতন্যের মুখে এমন সমস্ত গ্রন্থের শ্লোক বসাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে জীবনীর ঐতিহাসিক ক্রমভঙ্গ হইয়াছে। এমন কি স্বয়ং কৃষ্ণদাসের রচিত গ্রন্থের শ্লোকও মহাপ্রভুর উক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইজন্য কেহ কেহ এই আলাপের সবটুকু যথার্থ বা ঐতিহাসিক বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহেন। ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, সূক্ষ্মভাবে ঐতিহাসিক ক্রমানুসরণ চৈতন্য-জীবনগ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে; ঠিক ভাবটি ব্যক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর মুখে এমন শ্লোক দিয়াছেন, যাহা হয়তো মহাপ্রভুর তিরোধানের পর রচিত হইয়াছিল। কিন্তু রামানন্দ ও চৈতন্যের মধ্যে আলাপনের ব্যাপারকে অনৈতিহাসিক বলিয়া এড়াইবার উপায় নাই। তবে তাঁহাদের আলাপ কি কি রীতিতে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ব্যাপারকে যে ভাবে যে দৃষ্টিতে বর্ণনা করিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস কিন্তু সে ভাবে বর্ণনা করেন নাই। চৈতন্য রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ—ইহাই কৃষ্ণদাসের মূল বক্তব্য; তাই রায় রামানন্দের মুখে সেইরূপ শ্লোক দেওয়া হইয়াছে।

আলাপাদির মধ্যেই রায় মহাপ্রভুর চাতুরী ধরিয়া ফেলিলেন। চৈতন্য

৩০ কাহারও কাহারও মতে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে সখী-সাধনা বা 'মঞ্জরী' ভাবের সাধনার প্রতি চৈতন্যদেবের বিশেষ কোন প্রবর্তনা ছিল না। পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রসতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ; অথচ তিনি-ই তো রাধাকৃষ্ণের যুগল তনু :

রায় কহে—প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি ॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ (চৈ. চ.)

মহাপ্রভু ভক্তের কাছে ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন :

গুপ্তে রাখিহ কথা, না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥ (ঐ)

ঠিক এইরূপ ব্যাপার হইয়াছিল কিনা জানা যাইতেছে না। কিন্তু এই ভাবের আলোচনা হওয়া সম্ভব। কবিকর্ণপূর ও মুরারি গুপ্তের কড়চাতে এই ঘটনার উল্লেখ থাকিলেও এইরূপ ধর্মতত্ত্বালোচনার বর্ণনা নাই। মনে হয় কৃষ্ণদাস স্বরূপ-দামোদরের কড়চা হইতে এই তথ্য অবগত হইয়াছিলেন, এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই আদর্শে এই তত্ত্বকথাকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। কবিকর্ণপূর রামানন্দকে 'সহজ বৈষ্ণব' বলিয়াছেন। তাই কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়াদের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই 'সহজ' শব্দটির সঙ্গে মহাযান-হীনযান-মন্ত্রযান-সহজযান—কাহারও কোন সম্পর্ক নাই। এখানে 'সহজ' বলিতে রাগানুগা ভক্তিকে নির্দেশ করা হইয়াছে, বৈধী ভক্তি নহে। রায় রামানন্দ সহজিয়া ভক্ত অর্থাৎ রাগানুগা পন্থী ছিলেন। প্রচলিত কাহিনীতেও তাঁহাকে এইরূপ মনে হয়।[৩১]

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও সখীসাধনার বৈশিষ্ট্য চৈতন্য রায় রামানন্দের নিকট শিক্ষা করেন—ইহা চৈতন্যের নিজস্ব পরিকল্পনা বা আদর্শ নহে। বাস্তুতঃ চৈতন্যদেব রায়কে গুরু বলিলেও রামানন্দ মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে স্থান পাইয়া বলিয়াছিলেন :

মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥

চৈতন্যদেব যেন রামানন্দের মুখে নিজের কথাই শুনিতেছেন, এবং প্রশ্ন করিয়া করিয়া রায়ের মুখ হইতে ঠিক কথাটি বাহির করিয়া লইতেছেন।

৩১ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ, পৃ ১২৮-৩২

সে কথা রামানন্দ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। কাজেই এই সখীসাধনা চৈতন্য রামানন্দের নিকট লাভ করিয়াছিলেন একথা বলা যুক্তি সঙ্গত নহে। রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই তাঁহার চিত্তে প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব জাগ্রত হইয়াছিল। সাক্ষাতে পরস্পরে পরস্পরকে নিবিড ভাবে চিনিতে পারিলেন। পরে রামানন্দ পুরীধামে গিয়া মহাপ্রভুর নিকটেই অবস্থান করিয়াছিলেন। বরং এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সখীসাধনার ক্রমটি কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই এই আলোচনায় স্থান পাইয়াছে।[৩২] নীলাচলের স্বরূপ-দামোদর ও চৈতন্যতত্ত্বে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কড়চাটি পাওযা গেলে তাঁহার মনোভাব ও আদর্শ ব্যাখ্যায় সুবিধা হইত।[৩৩] নীলাচলে বিভিন্ন ভক্তের সংযোগে চৈতন্য-দেব রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে দিবারাত্র ডুবিয়া থাকিতেন, পুরীধামে গোটা ভারতবর্ষের পুণ্যপিপাসু নরনারীর আগমন হইত; সমাগত পণ্ডিত ও ভক্তগণ এই 'ন্যাসী'-কে সাক্ষাৎ করিয়া জীবন ধন্য মনে করিতেন। বৃন্দাবন ও নীলাচল চৈতন্য-তত্ত্বকে সংরক্ষণ করিয়াছে, পরিপোষণ করিয়াছে, নূতন করিযা ব্যাখ্যা করিয়া গৌড়ীয় রাগানুগা বৈষ্ণব ধর্মকে দার্শনিক ভিত্তি ও ভক্তিরসের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

---

৩২ সখীসাধনার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামানন্দের মুখে বলাইয়াছেন :

সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা—সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেবা হৈতে পল্লবাদ্যের কোটিসুখ হয়॥

৩৩ চৈতন্য জীবনীকাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে স্বরূপ দামোদরের কড়চা আলোচিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামী

চৈতন্যদেবের কৃপাতেই বৃন্দাবন পুনরায় তীর্থক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং পৌরাণিক মহিমার স্মৃতি রূপে ভক্তহৃদয়ে চির-শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। চৈতন্যদেব গৌড়-রামকেলি হইয়া যখন ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া কাশী-প্রয়াগ পার হইয়া বৃন্দাবন পরিক্রমায় গিয়াছিলেন, তখন ইহা ঝোপজঙ্গলে পরিপূর্ণ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। চৈতন্যদেবই অলৌকিক অন্তঃপ্রেরণার দ্বারা চালিত হইয়া বৃন্দাবনের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষ্ণলীলাস্থলী নির্দেশ করেন। সেই সমস্ত স্থানে পরবর্তী কালে মঠ-মন্দির নির্মিত হয়। পরে তিনি অনেক ভক্তকে এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে পাঠাইয়া দিতেন। এইভাবে গৌড়ীয় ভক্ত ও তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের ফলে ভাব-বৃন্দাবন মর্ত্য-বৃন্দাবনে পরিণত হয়। চৈতন্যদেবের অন্তরের একান্ত অভিলাষ ছিল, তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণের পর ব্রজমণ্ডলেই বাস করিবেন। কিন্তু বাঙলা হইতে এত দূরে অবস্থান করিলে শচীমাতা তাঁহার কোন সংবাদ পাইতেন না; এই জন্যই তিনি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হিন্দু-মাত্রেরই পবিত্র তীর্থ; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও তত্ত্বাদর্শ প্রসঙ্গে আমরা এই তীর্থের প্রতি অধিকতর কৌতূহলী হইয়া থাকি। বৃন্দাবনের গোস্বামী-সম্প্রদায়ের রচিত গ্রন্থাদি ও আদর্শের প্রভাবের ফলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন একটা বিশিষ্ট দর্শন-শাখা রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম যদি শুধু গৌড় ও উৎকলে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে ইহা একটি দার্শনিক মতবাদরূপে কখনই বিস্তার লাভ করিতে পারিত না।

চৈতন্যের তিরোধানের পরে নিত্যানন্দ, এবং নিত্যানন্দের পরে তাঁহার পুত্র বীরভদ্রের (বীরচন্দ্র) হস্তে বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্বের ভার অর্পিত হইয়াছিল। পিতাপুত্র দুইজনে বৈষ্ণবসমাজে ও ধর্মে গণমানসের প্রভাব সূচিত করিয়াছিলেন। ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলেই প্রেমধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ঠিক বটে। কিন্তু অবধূত নিত্যানন্দ এবং বীরভদ্র—কাহারও দার্শনিক

প্রবণতা ছিল না ; সহজ আবেগে তাঁহারা সাধারণ মানুষকে আবিষ্ট করিয়াছেন বটে ; কিন্তু 'কালট্' কে 'রিলিজিয়ন' করিতে গেলে শুধু ভাবাবেগের উন্মত্ততা থাকিলেই চলিবে না। তাহার সঙ্গে বিশেষভাবে প্রয়োজন দার্শনিক মননের সুকঠিন ভিত্তি—যাহার উপর ধর্ম ও সম্প্রদায় স্থাপিত হইবে। (বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সহায়তা না পাইলে বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম সহজিয়া সাধনার উপরে উঠিতে পারিত না ; হয় খড়দহ, আর না হয় শ্রীখণ্ডসম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে পরিচালিত করিত। কিন্তু অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীদের (বিশেষতঃ সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী) সংস্কৃত গ্রন্থগুলি আবেগমূলক বৈষ্ণব মতকে একটা সর্বভারতীয় দার্শনিক প্রত্যয় দান করিয়াছে, ভাবাতিরেকের উচ্ছ্বাসকে মননের বেষ্টনী টানিয়া সংযত করিয়া রাখিয়াছে।)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সর্বপ্রথম ষড়-গোস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন :

> শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
> শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
> এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
> যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

এই ছয় গোঁসাইকে তিনি "এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার"[১] বলিয়া গ্রন্থের প্রারম্ভেই প্রণাম করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজনই (সনাতন, রূপ ও জীব) বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যে সুপরিচিত। অন্য তিন জন (রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট) সাধন-ভজন লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন, বিশেষ কোন গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সনাতনাদির মতো খ্যাতি লাভ করেন নাই।[২] অবশ্য ইঁহাদের পূর্বেও মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া পবিত্র ব্রজমণ্ডলকে সর্বপ্রথম ভক্তচক্ষে আনয়ন করেন। চৈতন্যের পূর্বে মাধবেন্দ্রপুরীই এদেশে

[১] কৃষ্ণদাস ব্যতীত আর কেহ 'ছয় গোসাঞি' শব্দ প্রয়োগ করেন নাই—যদিও মুরারির কাব্যে গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস এবং সনাতন-রূপের উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনদাস শুধু রূপ-সনাতনের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকর্ণপুর তাঁহার মহাকাব্য ও নাটকে রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

[২] গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাসের নামে যে গ্রন্থ ও স্তব-স্তুতি পাওয়া যায়, তাহা পরে আলোচিত হইয়াছে।

অনুরাগমূলক কৃষ্ণভক্তির প্রথম প্রচারক।[৩] তিনিই ব্রজধামে গোপালমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঙলাদেশ হইতে দুইজন পুরোহিতকে আনয়ন করিয়া গোপাল সেবার ব্যবস্থা করেন। পরে চৈতন্যদেব লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ মিশ্রকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সনাতন-রূপের বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বেই (আনুমানিক ১৫১০-১১ খ্রীঃ অঃ) ইঁহারা বৃন্দাবনে গিয়া তীর্থ মহিমা পুনরুদ্ধারের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নিম্নে সংক্ষেপে বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

রঘুনাথ ভট্ট ॥

নির্লোভ নিরহঙ্কার বৈষ্ণব যতি-জীবনের আদর্শ স্বরূপ রঘুনাথ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যখণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ) ভিন্ন অন্য কোথাও বিশেষ কোন আলোচনা নাই। ষড়-গোস্বামীদের মধ্যে তিনিই যেন কাব্যের উপেক্ষিত। রঘুনাথ গ্রন্থ রচনা করেন নাই, বোধ হয় সেই জন্য তাঁহার নাম ও খ্যাতি ততটা প্রচার লাভ করে নাই। শুনা যায়, মানসিংহ নাকি তাঁহাকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন এবং গুরুর নির্দেশে অম্বরাধিপতি গোবিন্দ-বিগ্রহের মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।[৪] বাহিরে রঘুনাথের বিশেষ প্রচার না থাকিলেও অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ ভক্ত এবং এইজন্য চৈতন্যদেব তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

রঘুনাথের পিতা তপন মিশ্র চৈতন্যের প্রথম শিষ্য। গৌরাঙ্গ পূর্ব-বঙ্গ পরিভ্রমণে গিয়া এই ভক্তটিকে লাভ করেন এবং তাঁহাকে সাধ্যসাধন বিষয়ে তত্ত্বোপদেশ দান করেন। তপন মিশ্র পরবর্তী জীবনে স্ত্রীপুত্রাদিসহ কাশীবাস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন যাইবার পথে এবং ফিরিবার সময়ে চৈতন্য তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। বাল্যকালে রঘুনাথ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্তের কড়চায় (৪র্থ, ১ম, শ্লোক ১৫-১৭) আছে যে, তপন মিশ্রের বাড়ীতে অবস্থান করিবার সময় চৈতন্যদেব বালক

[৩] কৃষ্ণদাসও বলিয়াছেন :

সাবধানে বন্দিব আজ শ্রীমাধবপুরী।
বিষ্ণুভক্তি পথের প্রথম অবতরি ॥

[৪] F. S. Growse--*History of Mathura*

রঘুনাথকে কৃপা করেন। কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ মহাপ্রভুর সাহচর্য লাভের জন্য পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদেবও তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আটমাস সেবারসে কাটিয়া গেল। রঘুনাথ সুনিপুণ সুপকার ছিলেন ("রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ"), মহাপ্রভুকে প্রায়ই রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। আটমাস পরে মহাপ্রভু রঘুনাথকে আবার কাশী পাঠাইয়া দিলেন। উপদেশ প্রসঙ্গে বলিলেন, "বিবাহ না করিহ।" মহাপ্রভু রঘুনাথকে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করিতে আদেশ দিলেন। প্রভুর উপদেশে রঘুনাথ পুনরায় কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং জনক-জননীর সেবাবকাশে বৈষ্ণব ভক্তের নিকট ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন। চারিবৎসর পরে মাতাপিতার মৃত্যু হইলে রঘুনাথের শেষ বন্ধনও কাটিয়া গেল। তখন তিনি ভাগবতে পরম প্রাজ্ঞ হইয়াছেন। পুনরায় নীলাচলে আসিয়া তিনি চৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করিলেন এবং এবারেও আটমাস কাটাইয়া দিলেন। পরে মহাপ্রভু রঘুনাথকে বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলেন :

আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবন।
তাঁহা যাই রহ যাঁহা রূপসনাতন॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণভগবান॥ (চৈতন্য চরিতামৃত)

এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জগন্নাথের তুলসীর মালা গলায় পরাইয়া দিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথ ভট্ট রূপ-সনাতনের সান্নিধ্য লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় সুকণ্ঠ ছিলেন, তদুপরি সঙ্গীতেও তাঁহার বেশ অধিকার ছিল ("এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিনচারি রাগ")। তাঁহার ভাগবত পাঠে রূপ-সনাতন অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার নির্লোভ প্রচার-খ্যাতিহীন বিনয়ী জীবনটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ চমৎকার ফুটাইয়াছেন :

গ্রাম্যবার্তা নাহি শুনে না করে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজা দিতে অষ্টপ্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম নাহি শুনে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে—এই মাত্র জানে॥

মৃত্যুর সময়েও তিনি মহাপ্রভু প্রদত্ত তুলসীমালাটি ত্যাগ করিতে পারেন নাই,

তাহা গলে ধারণ করিয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও রঘুনাথ কিছু রচনা করিয়া যান নাই, তবু আদর্শ জীবনের জন্য তিনি বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীর অন্যতম হইয়া বৈষ্ণবসমাজের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ দাস ॥

সপ্তগ্রামের সম্পন্ন কায়স্থ ভূস্বামীর একমাত্র সন্তান রঘুনাথ দাস গোস্বামী অব্রাহ্মণ হইয়াও বৃন্দাবনের ষড-গোস্বামীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ গুরুর মতোই মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্যের শিকল কাটিয়া তিনি সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, অপ্‌সরার মতো লাবণ্যময়ী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া রাজপুত্র প্রথম যৌবনেই ছিন্ন কন্থাধারী ভিখারী হইয়াছিলেন। চৈতন্যের স্নেহ, স্বরূপ-দামোদরের শিক্ষা এবং রূপ-সনাতনের বন্ধুজনোচিত সাহচর্য পাইয়া বিনয়ী, আত্মগোপন-প্রয়াসী পরম 'বিরক্ত' সন্ন্যাসী রঘুনাথ দাস মধ্যযুগীয় বাঙলাদেশে আদর্শ বৈষ্ণব রূপে পূজা পাইয়াছেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ভূস্বামী কায়স্থ গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ বাল্যে রাজোচিত ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প বয়স হইতেই তাঁহার মনে ধর্মের প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মাতাপিতা চিন্তিত হইলেন এবং পুত্রের বিবাহ দিয়া রঘুনাথকে ঘরসংসারী করিবার অভিলাষ করিলেন। চৈতন্য রামকেলি যাইবার সময় যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন রঘুনাথ বয়সে কিশোর; তিনি সেই বয়সেই মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছুটিলেন। মহাপ্রভু দেখিলেন, তখনও রঘুনাথের সংসার-আশ্রম ত্যাগের সময় হয় নাই, তখনও তাঁহাকে কিছু দিন 'বিষয় ভুঞ্জিতে' হইবে। তাই লোকচরিত্রজ্ঞ মহাপ্রভু উপদেশ দিলেন :

> স্থির হৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
> ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধু কূল ॥
> মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
> যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া ॥
> অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
> অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ (চৈ. চ.)

মহাপ্রভু বুঝিয়াছিলেন, নবীন যুবক রঘুনাথের হৃদয়ে প্রবল প্লাবনের বেগে ঈশ্বরপ্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও পলিমাটি জমিতে বিলম্ব আছে—অর্থাৎ তখনও পরিপক্ক ভক্তি জাগ্রত হয় নাই—তাই এই উপদেশ। ইতিপূর্বে তাঁহার পিতা তাঁহাকে রক্ষকের প্রহরাধীনে চোখে চোখে রাখিতেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর উপদেশে যথারীতি কাজকর্ম করিতে লাগিলেন; কিন্তু তরুণী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া বহির্বাটীতে মন্দিরে অবস্থান করিলেন—অন্তঃপুরে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি শুনিলেন নিত্যানন্দ ভক্তগণসঙ্গে পানিহাটীতে অবস্থান করিতেছেন। রঘুনাথ সেখানে উপস্থিত হইয়া অবধূতকে প্রণাম করিলেন। হেঁয়ালির ভাষায় নিত্যানন্দ বলিলেন:

চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজ তোর করিব দণ্ডন ॥

রঘুনাথ বাহিরে বিষয়ীর মতো আচরণ করিতেন, কিন্তু অন্তরে বৈরাগ্যের ভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া থাকিতেন—তাই তিনি নিত্যানন্দের ভাষায় 'চোরা'। নিত্যানন্দ বলিলেন, তোমাকে দণ্ড দিব। তুমি এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির ভক্তকে চিঁড়াদধির ভোজন করাও। তাহাই হইল, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রঘুনাথ গঙ্গার তীরে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভক্তদের চিঁড়াদধির 'ভাণ্ডারা' লাগাইয়া দিলেন, নিত্যানন্দের কাছে তিনি আনন্দে এই দণ্ড গ্রহণ করিলেন। ইহাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 'দণ্ডমহোৎসব' নামে পরিচিত।[৫]

এদিকে মাতপিতা তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছেন, পাছে রঘুনাথ প্রভুর কাছে পলাইয়া যান। রথযাত্রার পূর্বে গৌড়ীয় ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের (কবি কর্ণপূরের পিতা) নেতৃত্বে পুরীধামে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইতেন। রঘুনাথ ইঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিতে পারিতেন; কিন্তু ইঁহাদের সঙ্গে গেলে লোকজানাজানি হইবে, পিতা সংবাদ পাইলেই পুনরায় ধরিয়া আনিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন। তখন রঘুনাথ সুকৌশলে রক্ষীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া, নীলাচলগামী ভক্তদের সঙ্গ ছাড়িয়া অজ্ঞাত, অনভ্যস্ত ও বিপজ্জনক পথে প্রায় অভুক্ত থাকিয়া শীর্ণদেহে চারিদিন পথ অতিবাহন করিয়া নীলাচলে চৈতন্যের পদতলে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য তরুণ ভক্তকে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন এবং স্বরূপ-দামোদরের হস্তে রঘুনাথের অধ্যাত্ম ও শাস্ত্র শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন; কারণ

---

[৫] এখনও পানিহাটীতে জ্যৈষ্ঠমাসের ১৩ তারিখে এই উৎসব হইয়া থাকে।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও বৈষ্ণবদর্শনে স্বরূপ-দামোদর অপেক্ষা আর কাহারও অধিকতর অধিকার ছিল না। চৈতন্যদেব স্পষ্টই বলিলেন, "আমি তত নাহি জানি ইঁহ যত জানে।" স্বরূপের কাছে রঘুনাথ দাস বৈষ্ণব দর্শন ও চৈতন্য-তত্ত্ব শিক্ষা করিলেও মহাপ্রভুর নিজ মুখ হইতে উপদেশ প্রার্থনা করিলে চৈতন্যদেব স্বরচিত 'শিক্ষাষ্টক'টি* সংক্ষেপে বলিলেন এবং স্বরূপের কাছে বাকি অংশটুকু জানিয়া লইতে নির্দেশ দিলেন। এইভাবে রঘুনাথ একদিকে বিষয়-বাসনা ছাড়িয়া স্বরূপের নির্দেশে বৈষ্ণব দর্শনাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে প্রাণধারণের জন্য সামান্য অশন-বসনেও উদাসীন হইয়া পড়িলেন, শেষে ভিক্ষা করাও ছাড়িয়া দিলেন; পরিত্যক্ত অন্নব্যঞ্জন কুড়াইয়া লইয়া তাই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া তিনি অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন—অবশিষ্ট সময়ে শুধু ঈশ্বর চিন্তা ও নামগানে মত্ত হইয়া রহিলেন। একদা মহাপ্রভু রঘুনাথকে গুঞ্জামালা এবং কৃষ্ণের বিগ্রহকল্প কৃষ্ণশীলা দান করিলেন। নিষ্কিঞ্চন রঘুনাথ সেই শীলামূর্তির পূজা-সেবা করিতে লাগিলেন। আবাল্য ঐশ্বর্যে লালিত ধনী-সন্তান রঘুনাথ দাস বৈরাগ্য অবলম্বনের পর "আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন"—এমন কি তিনি খাদ্যদ্রব্যের কোন রসই গ্রহণ করিতেন না। যাহা হোক চৈতন্যদেব ও স্বরূপ-দামোদরের তিরোধানের পর রঘুনাথ মনে করিলেন, পার্থিব দেহের আর কীই-বা প্রয়োজন? তখন তিনি বৃন্দাবনে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু সনাতন ও রূপের সাহচর্যে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ কয়টা দিন তিনি আদর্শ ত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার সেবা করিতেন; এই সময়ে কবিরাজ গোস্বামী বোধহয় রঘুনাথের নিকট মহাপ্রভু-সংক্রান্ত কাহিনী ও তত্ত্বকথা শুনিয়া থাকিবেন। সনাতন ও রূপের মৃত্যুর পর রঘুনাথের লোকান্তর হয়। ভারতবর্ষে যে প্রকার যতি-জীবনের আদর্শ চিরদিন শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে, রঘুনাথ দাস যেন তাহার পূর্ণ প্রতীক ছিলেন।

রঘুনাথ শুধু যে বৈষ্ণবশাস্ত্রে নিষ্ণাত ছিলেন, তাহা নহে; সংস্কৃতে রচিত তাঁহার অনেকগুলি স্তোত্র ও কবিতা বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার নামে প্রায় ২৯টি স্তব-স্তোত্র ও কবিতা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি', 'প্রেমপরাবিধ স্তোত্র' ইত্যাদি অনেকগুলি স্তবস্তুতি 'স্তবমালা'য় সঙ্কলিত

* এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে 'শিক্ষাষ্টক' উল্লিখিত হইয়াছে।

হইয়াছে। 'মুক্তাচরিত্র' ও 'দানকেলিচিন্তামণি' তাঁহার বিখ্যাত ক্ষুদ্রকাব্য, 'মুক্তাচরিত্র' চম্পূকাব্য—অনেকটা দানলীলার মতো। ক্ষেত্রে মুক্তা বপন করিয়া কৃষ্ণ মুক্তালতা হইতে মুক্তাফল লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু গোপীরা তাঁহার দেখাদেখি সেইরূপ ভাবে মুক্তালতা উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন—কারণ চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণ ও গোপবালকেরা গোপীদের উপ্ত মুক্তাগুলি গোপনে সরাইয়া ফেলেন, ফলে গোপীদের ক্ষেত্রে মুক্তালতার পরিবর্তে কাঁটা গাছের জন্ম হইল। তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া কৃষ্ণের নিকট মুক্তা কিনিতে চাহিলেন। কৃষ্ণও সময় বুঝিয়া মুক্তার পরিবর্তে প্রত্যেক গোপীর নিকট বিশেষ বিশেষ দান চাহিয়া বসিলেন। দানলীলার মতো আদিরসাত্মক রঙ্গরহস্য ও আবেগ ইহার মূল বিষয়। রঘুনাথের 'দানকেলিচিন্তামণি' রূপ গোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী'র আদর্শে রচিত হয়। বসুদেব যজ্ঞ করিতেছেন। সেই যজ্ঞে রাধা ও অন্যান্য গোপীরা ঘৃত লইয়া চলিয়াছেন। কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতে দানী হইয়া বসিয়াছেন। তিনি গোপীদের নিকট কর দাবি করিলেন—বলা বাহুল্য রাধা ও সখীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই হইল কর। গোপীরাও কর দিবেন না, গোবর্ধনের তলে বসিয়া রহিলেন। শেষে নান্দীমুখীর মধ্যস্থতায় ঠিক হইল যে, পরদিন মানস-গঙ্গার কুঞ্জাভ্যন্তরে রাধা ও গোপীগণ কৃষ্ণকে দান দিবেন। এই কাব্যও আদিরস ও ভক্তিরসের উল্লাসে উতরোল। রঘুনাথের সংস্কৃত শ্লোক রচনার হাতটি বড় মিষ্ট। আদিরসাত্মক কবিতা রচনা করিতে গিয়া তিনি ভক্তিরসের সাহায্য লইলেও বর্ণিত বিষয়কে পুরাপুরি দেহতন্মাত্রহীন অধ্যাত্ম-ব্যাপারে পরিণত করেন নাই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ নির্লোভ মুনিবৃত্তি পালন করিলেও কবিতায় ছন্দ-অলঙ্কার-রসের ঐশ্বর্য সৃষ্টিতে কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নাই।

॥

গোস্বামী-সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপাল ভট্টকে লইয়া কিছু কিছু মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এমন কি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহাকে ষড়্-গোস্বামীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং নিজেও তাঁহাকে গুরু বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়াছেন, কিন্তু নিজের গ্রন্থে তিনি পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য সম্বন্ধে মিতবাক।

রূপ-সনাতন বৃন্দাবনের অতিশয় শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি হইলেও মুসলমান-সহবাসের জন্য তাঁহারা প্রায় কাহারও গুরু হইতে চাহিতেন না, নিজেরাই ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেন। কাজেই গোপাল ভট্টের উপর মন্ত্রদান ও গুরূপদেশের ভার পড়িয়াছিল। অথচ প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লিখিত হয় নাই। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব ইতিহাস ও সমাজ-সংক্রান্ত গ্রন্থে (নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর', নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস', মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী' ইত্যাদি) গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু ঘটনাবিবৃতি আছে বটে, কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। সনাতন গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস' গোপাল ভট্টের নামে চলে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা সনাতনেরই রচনা, কিন্তু তিনি গোপালভট্টের নামে চালাইয়াছিলেন। অপর মতে এই গ্রন্থের প্রমাণ-উদ্ধৃতি গুলি গোপাল ভট্ট কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল, মূল গ্রন্থটি সনাতনেরই রচিত। এই সমস্ত কারণে ষড-গোস্বামীদের মধ্যে গোপাল ভট্টকে লইয়া কিছু কিছু সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে।

মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত গ্রন্থে আছে, দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে চৈতন্যদেব বর্ষার চারিমাস ত্রিমল্ল নামক শ্রীবৈষ্ণবপন্থী এক ভক্তের বাড়ীতে অতিবাহিত করেন। গোপাল ভট্ট ত্রিমল্লের পুত্র। বালক গোপাল চৈতন্যের স্পর্শে ভক্ত হইয়াছিলেন। মুরারি গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে আর কিছু বলেন নাই। কবিকর্ণপূর চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে বলিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভারতের শ্রীরঙ্গমে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে বহু স্থলে গোপাল ভট্টকে শ্রদ্ধা নিবেদিত হইলেও দক্ষিণ-ভারতে মহাপ্রভুর পরিক্রমা প্রসঙ্গে গোপাল ভট্টের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বর্ণনায় দেখা যাইতেছে, চৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভারতে গিয়া শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চারিমাস অবস্থান করেন। অথচ করিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আর এক স্থলে বলিতেছেন, মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারতে কাবেরী নদীতে স্নানাদি করিলেন এবং রঙ্গনাথের মন্দির দর্শন করিলেন, তখন 'শ্রীবৈষ্ণব' বেঙ্কট ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার গৃহে চৈতন্যদেব চারিমাস বর্ষাযাপন করেন। বেঙ্কট ভট্ট মহাপ্রভুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও মহাপ্রভুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া

ধন্য হইলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, কবিরাজ-গোস্বামী ত্রিমল্ল ভট্ট ও বেঙ্কট ভট্টের মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। অনেক বৈষ্ণব লেখক মনে করেন যে, ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতী—ইঁহারা তিনজনে সহোদর ভাই এবং গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র ('ভক্তিরত্নাকর')। ইঁহারা শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা করিতেন। চৈতন্যের প্রভাবে তিন ভাই-ই রাধাকৃষ্ণের সেবক হন, বালক গোপাল ভট্টও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন। পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি চৈতন্যের নির্দেশে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সাহচর্যে বাস করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে' (নিত্যানন্দ দাস) এই কাহিনী আরও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী'তে বর্ণিত ঘটনা 'প্রেমবিলাস'-এর প্রায় অনুরূপ। 'প্রেমবিলাস'-এর মতে চৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গমে চারিমাস ত্রিমল্লের গৃহে অতিবাহিত করেন, এবং ত্রিমল্লের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রবোধানন্দকে বালক গোপালের শিক্ষা বিধান করিতে নির্দেশ দেন। এই বর্ণনায় মনে হইতেছে গোপাল ত্রিমল্লের পুত্র; কারণ এখানে বেঙ্কট ভট্টের নাম নাই। 'অনুরাগবল্লী'তেও গোপালকে ত্রিমল্লের পুত্র মনে হইতেছে। মনোহর দাসের মতে বেঙ্কট ভট্ট সর্বজ্যেষ্ঠ, ত্রিমল্ল ও প্রবোধানন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যাহা হোক এই সমস্ত বর্ণনায় নানা গোলমাল ও মতানৈক্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য কুতর্ককারী ও অবিশ্বাসীকে ধমকাইয়া নরহরি বলিয়াছেন :

> শ্রীগোপাল ভট্টের এ সব বিবরণ।
> কেহ কিছু বর্ণে কেহ না করে বর্ণন ॥
> না বুঝিয়া মজে ইহে কুতর্ক যে করে।
> অপরাধ বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চরে ॥

কিন্তু তাহাতেও সংশয়ের নিরাকরণ হয় নাই। প্রবোধানন্দ যে গোপাল ভট্টের পিতৃব্য, তাহা নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর', নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' ও মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী' ব্যতীত অন্য কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই। নানা মতবৈষম্যের মধ্যে শুধু এইটুকু জানা যাইতেছে যে, গোপাল ভট্টের নিবাস ছিল দক্ষিণ-ভারতে। চৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। কারণ দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণের পর পুরী হইয়া তিনি গৌড়ে

রামকেলিতে আসিয়া রূপ-সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সুতরাং দক্ষিণ-ভারতে তিনি গোপাল ভট্টকে বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইতে নির্দেশ দিবেন—ইহা অতি অবিশ্বাস্য। প্রবোধানন্দের নাম পাওয়া যাইতেছে গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত 'হরিভক্তিবিলাসে'। সেখানে গোপাল ভট্ট নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়াছেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে, পিতৃব্য-ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পর্ক, তাহা কোথাও বলা হয় নাই। প্রবোধানন্দের নামে যে সমস্ত স্তোত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চৈতন্যের প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি লক্ষিত হয়। তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' কাব্যে দেখা যায়, তিনি পুরীধামে চৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। সে যাহা হোক গোপাল ভট্টের পরিচয় সম্বন্ধে প্রামাণিক চৈতন্যজীবনীতে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই, এবং কেন বলা হয় নাই, তাহাও রহস্যময়। নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকরে' এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিল।
গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল॥
কেন নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে।
নিরন্তর অতিদীন মানে আপনারে॥
কবিরাজ তার আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার।
নামমাত্র লিখে না করে প্রচার॥

কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কেন গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন নাই, নরহরি সে বিষয়ে যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা অসম্ভব নহে। নরহরি 'ভক্তিরত্নাকরে' বলিয়াছেন যে গোপাল ভট্ট নাকি লীলাশুকের 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত'-এর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই গোপাল ভট্ট এবং 'হরিভক্তি-বিলাসে'র গোপাল ভট্ট এক ব্যক্তি, না পৃথক ব্যক্তি, তাহা বুঝা যাইতেছে না।

'হরিভক্তিবিলাস' নামক প্রসিদ্ধি বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রারম্ভের শ্লোকে গোপাল ভট্ট নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়াছেন, এবং চৈতন্যকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কুড়িটি বিলাসে (অধ্যায়) আছে। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আচার-আচরণ, সামাজিকতা, কৃত্য প্রভৃতি পুরাণ-তন্ত্র হইতে উল্লেখ সহ ব্যাখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ইহাতে বৈধীভক্তি বা শাস্ত্রমার্গীয় ভক্তি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং অনেক স্থলে

(বিশেষতঃ দীক্ষাদানে) তান্ত্রিক আচার-আচরণের উল্লেখ আছে। কিন্তু বৈষ্ণবদের নিকট অতিশয় প্রিয় 'রাসযাত্রা' সম্বন্ধে ইহাতে কোন উল্লেখ নাই। লেখক ইহাতে চৈতন্য পূজা বা চৈতন্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নির্বাক; ঠিক তেমনি ইহাতে লক্ষ্মী, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিগ্রহের উল্লেখ থাকিলেও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কোন নির্দেশ নাই। কৃষ্ণকে ইহাতে চক্রধারী চতুর্ভুজ রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে, বৃন্দাবনের মুরলীধারী রূপে নহে। কৃষ্ণের ধ্যানেও রাধার উল্লেখ নাই। গোপালভট্ট কি তাহা হইলে রাধাতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না? গৌড়ের ভক্তদের মতো তিনি চৈতন্য-বিগ্রহের কথা বলেন নাই, যদিও প্রতি অধ্যায়ের পূর্বেই চৈতন্যদেবকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন, কিন্তু রূপ-সনাতনের মতো রাধাকৃষ্ণতত্ত্বকে পুরাপুরি স্বীকার করেন নাই। অনুমান ১৫৪১ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে 'হরিভক্তিবিলাস' রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে ইহার উল্লেখ আছে।

'হরিভক্তিবিলাসে'র 'দিগ্‌দর্শনী' নামক টীকাটি নাকি সনাতনের রচিত। কেহ কেহ মনে করেন গোটা 'হরিভক্তিবিলাস'ই সনাতনের রচিত।[৭] হরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকরে' বলিয়াছেন যে, সনাতনই গোপাল ভট্টের নামে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মনোহরদাস 'অনুরাগবল্লী'তে বলিয়াছেন যে, সনাতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোপাল ভট্ট বিভিন্ন পুরাণ তন্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া ইহার পূর্ণতা সাধন করেন। বোধহয় সনাতনের পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই ইহারা তাঁহার নামের সঙ্গে 'হরিভক্তিবিলাসকে' জড়াইয়াছেন। কিন্তু জীব গোস্বামী ও কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে উল্লিখিত অনুরূপ প্রমাণও উপেক্ষা করা যায় না। জীব গোস্বামী তাঁহার 'লঘু বৈষ্ণব-তোষণী'র শেষে সনাতনের গ্রন্থ-তালিকায় 'হরিভক্তি বিলাসে'র নাম করিয়াছেন।

---

[৭] চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন যে, মহাপ্রভু সনাতনকে বৈষ্ণবস্মৃতি রচনার নির্দেশ দেন :

> পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
> প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব স্মৃতি করিবারে ॥
> মুই নীচ জাতি—কিছু না জানো আচার।
> মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার ॥ (চৈ. চ. মধ্য)

কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব সনাতনকে উপদেশ দিয়া 'হরিভক্তিবিলাস' রচনা করিতে আদেশ করেন। সেই আদেশের ফলে সনাতন এই গ্রন্থ রচনা করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আরও দুই স্থলে (মধ্য-১ম ; অন্ত্য-৪র্থ) 'হরিভক্তিবিলাসের' রচনাকাররূপে সনাতনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ 'হরিভক্তিবিলাসে' উল্লিখিত গোপাল ভট্টের নামও তো উডাইয়া দেওয়া যায় না। যাঁহারা মনে করেন (মনোহর দাস) গ্রন্থটির মোটামুটি খসডা সনাতনের রচনা, গোপাল ভট্ট নানা শ্লোকাদি তুলিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ করেন—তাঁহাদের যুক্তি অসম্ভব না হইলেও অনুমান মাত্র। কেহ কেহ মনে করেন, সনাতন মুসলমান সংস্পর্শে রাজকর্ম করিয়াছিলেন ; এইজন্য তিনি বৃন্দাবনেও ভক্তগণের নিকট সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেন। এই স্মৃতিগ্রন্থ তাঁহার নামে প্রচারিত হইলে পাছে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবসমাজে ইহার গৌরব হ্রাস পায়, সেই জন্য বোধ হয় তিনি নিজেই ইহাকে গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত হইতে দিয়াছিলেন। এ অনুমানও খুব নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ (ভাগবতামৃত, বৈষ্ণবতোষণী) তাহা হইলে বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছিল কি করিয়া ? সেগুলি তো সনাতনের নামেই প্রচারিত হইয়াছে। অতএব এ অনুমানের পক্ষেও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কারণ এই গ্রন্থে গোপাল ভট্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সনাতন প্রভৃতির পরিতৃপ্তির জন্যই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে 'হরিভক্তিবিলাস' গোপাল ভট্টের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল।

গোপাল ভট্টকে লইয়া তর্কবিতর্কের কোন দিন অবসান হইবে কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ দুইজন গোপাল ভট্টের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন।[৮] দ্রাবিড় দেশের অধিবাসী নৃসিংহের পৌত্র এবং হরিবংশ ভট্টের পুত্র এক গোপাল ভট্ট 'কাল-কৌমুদী', 'কৃষ্ণবল্লভী' এবং 'রসিকরঞ্জনী' নামক তিনখানি আচার-আচরণমূলক পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইনি শুধু চৈতন্য-ভক্ত ছিলেন না, চৈতন্যতত্ত্বেও পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার ঐ পুস্তিকা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

[৮] ডঃ সুশীলকুমার দে প্রণীত *Vaishnava Faith & Movement*-এ এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য। জীব গোস্বামী কোন এক দক্ষিণী ভট্টের নিকট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। গোপাল ভট্টই দক্ষিণী ভট্ট কিনা জানা যায় না। বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে এই দক্ষিণী ভট্ট হইতেছেন গোপাল ভট্ট। জীব গোস্বামী 'ষটসন্দর্ভে' দক্ষিণী ভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার পুস্তিকায় কৃষ্ণকে গৌড়ীয় আদর্শানুসারে অবতার না বলিয়া 'অবতারী' (অর্থাৎ পরম দেবতা) বলা হইয়াছে, বাঙলাদেশের মতের সঙ্গে এই পুস্তিকাত্রয়ীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। অপর দিকে 'হরিভক্তিবিলাসে'র গোপাল ভট্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শ কখনও গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং 'কাল-কৌমুদী' ইত্যাদি পুস্তিকার রচনাকার গোপাল ভট্ট এবং 'হরিভক্তিবিলাসে'র গোপাল ভট্টকে একই ব্যক্তি বলা যাইবে কি প্রকারে ?

রূপসনাতনের তিরোধানের পর গোপালভট্ট বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের গুরু বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব নেতা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য গোপাল ভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট বৈষ্ণব তত্ত্ব শিক্ষা করেন।

সনাতন গোস্বামী ॥

সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী—এই গোস্বামীত্রয় রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব, আদর্শ ও দর্শনের মননশীল ভিত্তি প্রস্তুত করিয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, এই তিন গোস্বামীর সহায়তা না পাইলে 'চৈতন্য-কাল্ট্' (cult) কখনও বিশিষ্ট ধর্ম ও দর্শনের মর্যাদা লাভ করিত না। শ্রীখণ্ড, নবদ্বীপ-শান্তিপুর ও খড়দহের বিভিন্ন সম্প্রদায় কখনও চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণ বলিয়া, কখনও-বা নাগরীভাবে সাধনা করিয়া বৈষ্ণব সহজিয়াদের দল ভারী করিতেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, সনাতন ও রূপ চৈতন্যের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও দুই ভ্রাতাকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে বাস না করিয়া বাঙলাদেশে থাকিলে অথবা পুরীধামে অবস্থান করিলে তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আদর্শের বাহিরে যাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ, ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি প্রস্তুতিতে বিলম্ব হইয়া যাইত। তাঁহারা বাঙলার প্রভাবের বাহিরে ছিলেন বলিয়া দূরে বসিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ চিত্তে শাস্ত্রানুশীলন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সনাতন-রূপ-জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট—ইঁহারা সকলেই দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ। ষড়গোস্বামীর মধ্যে এই চারিজনের গ্রন্থই বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রূপ গোস্বামী সাহিত্য-রসতত্ত্ব, সনাতন গোস্বামী ভাগবত-

ব্যাখ্যা, জীব গোস্বামী দর্শনানুশীলন এবং গোপাল ভট্ট বৈষ্ণবস্মৃতি রচনা করিয়া বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়কে একটি বড ধর্মগোষ্ঠীতে সংহত করেন।

সনাতন জ্যেষ্ঠ, [১] রূপ মধ্যম এবং অনুপম বা বল্লভ কনিষ্ঠ। জীব অনুপমের পুত্র। জীব গোস্বামী 'লঘুতোষণী'র শেষে নিজ বংশধারার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যে কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। সনাতন নিজ গ্রন্থ 'বৃহৎ ভাগবতামৃতের' স্বকৃত টীকায় নিজের বংশধারা সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'পক্ষে চ ভক্তঃ স্বপ্রিয়ভৃত্যো যো রূপঃ কর্ণাটদেশ-বিখ্যাত-বিপ্রকুলাচার্য-শ্রীজগদ্‌গুরুবংশজাত-শ্রীকুমারাত্মজো গৌড়দেশী সঃ শ্রীরূপনামা বৈষ্ণববরস্তেন সহেত্যর্থঃ।" রূপও 'সনাতনাষ্টকে' সনাতনকে বলিয়াছেন— দাক্ষিণাত্যের ভূমিদেবভূপবংশভূষণ মুকুন্দদেবের পৌত্র। শ্রীজীব 'লঘুতোষণীর শেষে বলিয়াছেন :

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কস্মিদ্রোহমবাপ্য সৎকুলজ নির্ঝালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণশ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো যজ্ঞিরে
যে স্বয়ং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চিতম্ ॥

এই সমস্ত উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে, তাঁহারা কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ এবং ভূস্বামীর সন্তান ছিলেন। কয়েক পুরুষ বাঙলাদেশে বাস করিয়া তাঁহারা প্রায় বাঙালী হইয়া গিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশ তালিকা উদ্ধৃত হইতেছে।

[১] ইঁহাদের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাকলা চন্দ্রদ্বীপের ভূস্বামী ছিলেন। জীব গোস্বামী 'লঘুতোষণী'তে যে বংশধারার বর্ণনা দিয়াছেন, সেখানে সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম করেন নাই। বোধ হয় ইনি অবৈষ্ণব, অত্যাচারী ও দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন। (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ১৯শ পরিঃ)
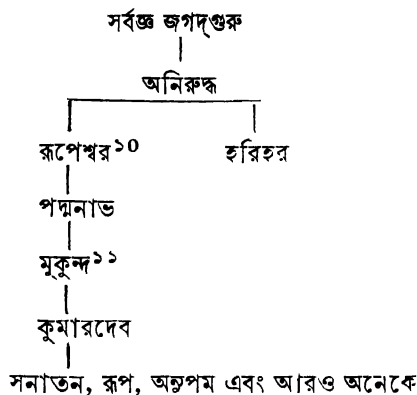
কর্ণাটদেশীয় এই ব্রাহ্মণবংশ চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পিছনে একটা রাজনৈতিক এবং পারিবারিক মনোমালিন্যের ইতিহাস আছে। সর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু ছিলেন কর্ণাটদেশের রাজা বা অনুরূপ পদাভিষিক্ত প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি; ইঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ। পিতাপুত্রে বৈদিক শাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিহর রাজ্য কাড়িয়া লইলে রূপেশ্বর পূর্বাঞ্চলে পলাইয়া আসেন। ইঁহার পুত্র পদ্মনাভ—ইনিও বেদ ও উপনিষদে অভিজ্ঞ ছিলেন। পদ্মনাভ সম্ভবতঃ গঙ্গাতীরে নবহট্টে (কাটোয়ার নিকট নৈহাটী) বসবাস করেন। ইনিও যজন-যাজন লইয়া থাকিতেন। ইঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে মুকুন্দ সর্বকনিষ্ঠ। পারিবারিক কলহের জন্য মুকুন্দ নৈহাটী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব-বঙ্গে প্রস্থান করেন এবং যশোহরের ফতেয়াবাদে বাস্তু নির্মাণ করেন। ইঁহার পুত্র কুমারদেব। কুমারের অনেকগুলি সন্তান ছিল। সনাতন, রূপ ও অনুপম ইঁহারই বিখ্যাত পুত্র। অনুপমের আর একটি নাম বল্লভ। চৈতন্যদেব জ্যেষ্ঠ দুই ভাইয়ের নূতন নাম দিয়াছিলেন—সনাতন ও রূপ। কোন কোন গ্রন্থে ইঁহাদের আরও দুইটি নাম পাওয়া গিয়াছে—অমর (রূপ) ও সন্তোষ (সনাতন)। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা যায় না। ইঁহারা সন্ন্যাস

[10] ইনি কর্ণাট ত্যাগ করিয়া বাঙলার দিকে পলাইয়া আসেন।

[11] মুকুন্দ কনিষ্ঠ। ইঁহার উপরেও চারিজন ভ্রাতা ছিলেন।

গ্রহণের পর সংসার-আশ্রমের নাম ব্যবহার করেন নাই, চৈতন্যদেব-প্রদত্ত নাম শিরোধার্য করিয়াছিলেন। অনুপম ছিলেন হুসেন শাহের টাঁকশালের অধ্যক্ষ। রূপের উপাধি ছিল 'দবির খাস', সনাতন 'সাকর মল্লিক' নামে সুলতান সমীপে উল্লিখিত হইতেন।[১২] দবির খাস বা সাকর মল্লিক তাঁহাদের নাম নহে, উপাধি মাত্র। তাঁহারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন নাই, বা মুসলমান আচরণও অবলম্বন করেন নাই। তবে সর্বদা মুসলমান সহবাস করিতে হইত বলিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসমাজে তাঁহারা কিছু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেন। এমন কি, বৈষ্ণব হইয়াও তাঁহাদের সে সঙ্কোচ যায় নাই। কেহ কেহ তাঁহাদের 'পিরালী' মুসলমান বলিয়াছেন।[১৩] ইহাও ঠিক নহে। সনাতন-রূপ

---

[১২] 'সাকর মল্লিক' ও 'দবির খাস' প্রকৃতপক্ষে কাহার উপাধি তাহা লইয়া কিছু মতানৈক্য আছে। চৈতন্যভাগবতে "সাকর মল্লিক আর রূপ দুই ভাই"—এইরূপ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সনাতন হইতেছেন 'সাকর মল্লিক'। মহাপ্রভু সনাতনের 'সাকর মল্লিক' অভিধা ঘুচাইয়া সনাতন নাম রাখেন—একথা চৈতন্য ভাগবতেই আছে। তবে রূপকে স্পষ্টতঃ 'দবির খাস' বলা হয় নাই। চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে রূপকেই যেন সাকর মল্লিক বলিয়া মনে হইতেছে—"রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে"। এই জন্য কোন এক আধুনিক লেখক সনাতনকেই সাকর মল্লিক ও দবির খাস, দুই নামেই অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি, রূপকে সর্বত্র রূপ নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে, 'দবির খাস রূপ' এরূপ উক্তি কোথাও নাই। এবিষয়ে গিরিজা-শঙ্কর রায়চৌধুরীর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদ' (পৃ১৪৭-৪৯) দ্রষ্টব্য। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে' রূপকেই 'দবির খাস' বলিয়াছেন।

[১৩] ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪১ দ্রষ্টব্য। সনাতন হুসেনের সঙ্গে উড়িষ্যা অভিযানে যাইতে স্বীকৃত হন নাই বলিয়া হুসেন তাহাকে কয়েদ করিয়া এক মুসলমান দ্বাররক্ষীর উপর তাঁহাকে পাহারা দিবার ভার দিয়া উড়িষ্যা আক্রমণে যান। সনাতন মুসলমান দ্বাররক্ষীটিকে টাকায় বশ করিয়া মুক্তি সংগ্রহ করেন। সনাতনকে ছাড়িয়া দিতে অনুরুদ্ধ হইয়া সেই রক্ষী ভীত হইয়া পড়িলে সনাতন তাহাকে বলিলেন যে, চিন্তার কোন কারণ নাই, তিনি এদেশে থাকিবেন না, মক্কায় যাইবেন—

কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব।
দরবেশে হৈয়া আমি মক্কায় যাইব ॥

এই উক্তিতে কেহ কেহ সনাতনকে মুসলমান বলিতে চাহেন। এ অনুমান যথার্থ নহে। এখানে সনাতন অশিক্ষিত মুসলমান রক্ষীকে ভুলাইবার জন্য একথা বলিয়াছিলেন। বাহ্যতঃ তাঁহাকে মুসলমানের বেশ পরিধান বা মুসলমানী আদবকায়দা গ্রহণ করিতে হইত। এই জন্য প্রহরী তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তাই বলিয়া সনাতন যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা কখনও বলা যাইবে না।

বৈষ্ণবীয় বিনয় বশতঃই সুনীচ হইয়া থাকিতেন, মুসলমান বলিয়া নহে। চৈতন্যদেব এই জন্য দুই ভ্রাতাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।)

সনাতন নবদ্বীপের নৈয়ায়িক পণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সনাতনের পূর্বপুরুষগণ সকলেই বৈদিক সংহিতা ও বৈদিক যাগযজ্ঞে সুপণ্ডিত ছিলেন, কেহ কেহ উপনিষদও পাঠ করিয়াছিলেন। কর্ণাটে সংস্কৃতচর্চা সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা সেই অঞ্চলের সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কাজেই শাস্ত্রচর্চায় তাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষগণ দ্বৈতবাদী ভক্তিদর্শনে নিষ্ঠাবান ছিলেন কিনা জানা যায় না। সনাতন 'বৈষ্ণব তোষণী'র প্রারম্ভে নিজের ছয়জন গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছেন—ভট্টাচার্য সার্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য ও রামভদ্র বাণী-বিলাস। কিন্তু বিদ্যাবাচস্পতির নিকটেই তিনি প্রধানতঃ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সনাতন গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের উচ্চ কর্মচারী হইয়াছিলেন এবং ধনজন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। গৌড়ের নিকটে রামকেলিগ্রামে তাঁহারা বসবাস করিতেন। চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে গৌড়ে আসিলে সনাতন তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হন। চৈতন্যের সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্বেই তাঁহাদের চিত্তে বৈষ্ণবাদর্শ স্থায়ী হইয়াছিল। কারণ রূপের 'দানকেলি-কৌমুদী', 'উদ্ধবদূত' ও 'হংসদূত' চৈতন্যের সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যের আবির্ভাব, সন্ন্যাসগ্রহণ, নবদ্বীপে বৈষ্ণব ভক্তদের সমাবেশ—সনাতন নিশ্চয় এ সমস্ত সংবাদ রাখিতেন। তাঁহারা সুলতানের অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও মুসলমানের সাহচর্যে মোটেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন না।)(হুসেন শাহ শেষের দিকে হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেন নাই। সনাতন হুসেনের উড়িষ্যা-অভিযানের সঙ্গী হইতে চাহেন নাই, কারণ উড়িষ্যার তীর্থমন্দির ও দেবদেবী কলুষিত করাও হুসেনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু হইয়া সনাতন নিজেকে এই অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখিবেন কি করিয়া? তিনি অভিযানে যাইতে অস্বীকৃত হইলে হুসেন শাহ তাঁহাকে কয়েদ করেন এবং একটি মুসলমান দ্বাররক্ষীর হস্তে সনাতনকে পাহারা দিবার ভার দিয়া উড়িষ্যাভিযানে প্রস্থান করেন।)

হেনকালে গেল রাজা ওড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥

তিঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা ভাঙিতে
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥
তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥

ইতিপূর্বে মহাপ্রভুর সঙ্গে রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল: তখন হইতেই তাঁহারা অন্তরে অন্তরে বিষয়বাসনার প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সনাতনের পূর্বেই রূপ হুসেন শাহের কর্ম ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশে পলাইয়া গিয়াছিলেন। পাছে সনাতন সেই পথ ধরেন, এইজন্য হুসেন তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিবার ব্যবস্থা করেন। সনাতন কারারক্ষীর যোগসাজসে পলাইলেন এবং কাশীধামে পৌছাইবার পর চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে নানা তত্ত্বোপদেশ দান করিলেন। ইতিপূর্বে চৈতন্যদেব রূপকেও প্রয়াগে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন:

তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তিস্মৃতি শাস্ত্রে করি করিহ প্রচার ॥

অতঃপর সনাতন পুনরায় প্রস্থান করিয়া মহাপ্রভুর নির্দেশমতো চলিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি আর একবার ব্রজধাম হইতে নীলাচলে আসিয়া প্রায় একবৎসর মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। মুসলমান সুলতানের কর্ম করিয়া তিনি নিজেকে হীন মনে করিতেন এবং সঙ্কোচবশতঃ জগন্নাথ মন্দিরেও যাইতেন না, পুরীতে তিনি যবন হরিদাসের কুটিরে অবস্থান করিতেন। এইজন্য কোন কোন মহলে এমন কথা উঠিয়াছে যে, সনাতন গৌড়ের সুলতানের অধীনে কর্ম করিয়া মুসলমান উপাধি ও আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত পূর্বেই জ্ঞাপন করিয়াছি। সে যাহা হোক, সনাতনের চেষ্টাতেই মথুরা বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থমাহাত্ম্য পুনরুদ্ধার হইয়াছিল, এবং তাঁহার গ্রন্থাদি বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও আচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সনাতন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঈষৎ পরে দেহ রক্ষা করেন।

জীব গোস্বামীর তালিকানুসারে সনাতনের রচিত গ্রন্থাদি :—

১। বৃহদ ভাগবতামৃত

২। হরিভক্তিবিলাস

৩। লীলাস্তব বা দশম চরিত (পাওয়া যায় নাই)।

৪। বৈষ্ণবতোষণী (জীব ইহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া 'লঘুতোষণী' রচনা করেন)।

'বৃহদ্ভাগবতামৃত' পৌরাণিক ধরণের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সংক্রান্ত কাব্য। স্বয়ং লেখক ইহাতে 'দিগ্দর্শনী' নামক টীকা সংযোজনা করিয়া নিজেই ইহার দুরূহ অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১২] মহাভারতে যেমন জৈমিনি জনমেজয়কে ঘটনা বিবৃতি করিতেছেন, এই কাব্যেও সেই ধারা অনুসৃত হইয়াছে। কবি ইহাকে ভাগবতের সারভূত, বেদের শ্রেষ্ঠ অংশ ইত্যাদি প্রশংসাবাণীতে অভিহিত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব, দর্শন ও আদর্শ ব্যাখ্যা করিবার জন্যই তিনি কাহিনীর পরিকল্পনা করিয়াছেন। কাব্যটির দ্বিতীয়াংশে প্রাগজ্যোতিষের অধিবাসী এক তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ এবং মথুরার এক গোপবালকের কথোপকথনের মধ্য দিয়া ধর্মজগতের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হোক এই বিরাট কাহিনীকাব্যে পুরাণের রীতি ও আদর্শ অনুসৃত হইলেও সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসাদর্শ ব্যাখ্যানেই এই কাহিনীর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী 'সংক্ষেপ ভাগবতামৃতে' এই 'বৃহতে'র তত্ত্বাংশকে আরও সংক্ষেপ ও সংহত আকারে পরিবেষণ করিয়াছেন।

সনাতনের 'বৈষ্ণবতোষণী' ('দশমটিপ্পনী' নামেও পরিচিত) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা। জীব গোস্বামী ইহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া নাম দেন 'লঘুতোষণী'। জীব গোস্বামীর মতে ১৫৫৪ খ্রীঃ অব্দে সনাতন ইহার টীকা সমাপ্ত করেন। সুতরাং এই গ্রন্থের রচনা-কাল অনুমান করা যাইতে পারে। এই টীকায় সনাতন মাধবেন্দ্রপুরীকে কৃষ্ণভক্তির অঙ্কুর রূপে গণ্য

[১২] চৈতন্যদেবের নিকটে তিনি যে বৈষ্ণবতত্ত্বের শিক্ষা, আদর্শ ও অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি 'বৃহদ ভাগবতামৃতের' ১১শ শ্লোকে ("অনুভূতস্য চৈতন্যদেব তৎপ্রিয়রূপতঃ") এবং তাহার 'দিগ্দর্শনী' টীকায় ("শ্রীমচ্চৈতন্যরূপোঽসৌ ভগবান্ প্রিয়তংসদ") পুন: পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। রূপ গোস্বামীও "হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহম্ বরাক রূপোঽপি" বলিয়া চৈতন্যদেবের স্তুতি করিয়াছেন।

করিয়াছেন। এই টীকার আরও দুইচারিটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষ৭ করিতে পারে। ইহার 'নমস্ক্রিয়া'য় সনাতন চৈতন্যদেবকে দেবতা বলিয় গ্রহণ করিয়াছেন :

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবং।
প্রেমভক্তিবিতানার্থং গৌড়দেশেঽবততার যঃ ॥

ইহার সঙ্গে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রন্থের অভ্যন্তরে আর ইঁহাদের উল্লেখ নাই। বৃন্দাবনের গোস্বামী-সম্প্রদায় গৌড়ীয় ভক্তদে প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিলেও গ্রন্থাদিতে খুব বেশি ইঁহাদের উল্লেখ করেন নাই গৌড়ীয় ভক্তদের শ্রীচৈতন্য-ভজনপূজন ইঁহাদের নিকট ততটা প্রীতিকর হয় নাই। ইতিপূর্বে আমরা গোপাল ভট্ট সম্পর্কে কোন কোন ক্ষেত্রে সনাতনে নামে প্রচলিত 'হরিভক্তিবিলাস' সম্বন্ধে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছি। এই গ্রন্থ পুরাপুরি সনাতনের রচিত হইলে ইহাতে শুধু লক্ষ্মী নারায়ণের উপাসনার কথা থাকিত না, রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইত।

রূপ গোস্বামী॥

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে পুরী হইতে আর একবার বাঙলাদে আসিয়াছিলেন, বাঙলাদেশে ইহাই তাঁহার শেষ আগমন। এই সময়ে তিনি গৌড়ের রামকেলিতে উপস্থিত হইলেন। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ যদিও চৈতন্য দেবের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি কৌতূহলী হইয়াছিলেন, তবু ভক্তগ স্থলতানকে পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই রাজকর্মচারী কেশ ছত্রী মহাপ্রভুকে গৌড় ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চৈতন্য দেব দবির খাস ও সাকর মল্লিকের সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই সুদূর নীলাচ হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। (ইতিপূর্বে সনাতন ও রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথ শুনিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব হইতেই ভক্তি পথের পথিক হইয়াছিলেন। বিধর্মী ও খেয়ালী স্থলতানের কর্মনির্বাহ আ তাঁহাদের ভাল লাগিতেছিল না। এমন সময় দুই ভাই শুনিলেন যে, চৈতন্য দেব গৌড়ে আসিয়াছেন। তখন তাঁহারা গোপনে ছদ্মবেশে মহাপ্রভুর নিক গভীর রাত্রিতে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য এই দুই ভ্রাতার মধ্যে বৈষ্ণব

ধর্মের মহৎ সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনের তীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণব রসশাস্ত্র, স্মৃতিগ্রন্থ প্রভৃতি রচনার কথা বলিলেন।

মহাপ্রভুর উপদেশ-নির্দেশের পর রূপ গৌড় হইতে প্রয়াগে আসিবার গোপন ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা বিষয়-সম্পত্তি, সঞ্চিত অর্থ ও আত্মীয় স্বজনের ব্যবস্থা করিলেন। কারণ সনাতন জানিতেন, তাঁহারা কর্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাঁহাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের উপর হুসেনের কোপ আসিয়া পড়িবে। রূপ বিষয়সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিলেন। গৌড়ে সনাতনকে আরও কিছুদিন অবস্থান করিতে হইবে। রূপ জ্যেষ্ঠের জন্য এক মুদির নিকটে দশহাজার টাকা রাখিয়া দিয়াছিলেন।[১৩] তারপর ছোট ভাই অনুপমের (বল্লভ) সঙ্গে রূপ প্রয়াগের অভিমুখে চলিলেন। প্রয়াগে রূপ ও অনুপম মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে চৈতন্যদেব রূপকে দশদিন ধরিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র শিক্ষা দিলেন এবং তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়া ভক্তিশাস্ত্র লিখিতে আদেশ করিলেন। চৈতন্যদেব ভক্তিশাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন, তাহা কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া রূপ নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহাপ্রভুর উপদেশে রূপ কৃষ্ণলীলাকে ব্রজের লীলা ('বিদগ্ধমাধব') এবং দ্বারকালীলা ('ললিতমাধব')—এই দুইভাগে বিভক্ত করিবার ইচ্ছা করেন। 'বিদগ্ধমাধবে'র প্রথম অঙ্কে রূপ গোস্বামী চৈতন্যদেবের স্তুতি করিয়া লিখিয়াছিলেন, "সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।" আত্মপ্রশংসায় মহাপ্রভু যেন মরমে মরিয়া যাইতেন। ইহাতে একটু লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি রূপের কাছে অনুযোগ করিলেন :

> কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্যসুধাসিন্ধু।
> তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি ক্ষার বিন্দু॥

রায় রামানন্দ রূপের চৈতন্য-প্রশংসা সমর্থন করিয়া বলিলেন :

> রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পূর।
> তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥

---

১৩ রাজকর্ম ত্যাগ করিবার সময় রূপ অন্ততঃ চল্লিশ হাজার টাকার অধিকারী ছিলেন। দ্রষ্টব্য : বিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ২৯৭।

এক বিন্দু কর্পূর দিলে মিষ্টান্নের স্বাদ যেমন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, তেমনি 'বিদগ্ধ-মাধব' নাটকে চৈতন্যের উল্লেখ। রূপ গোস্বামী নানা গ্রন্থ লিখিয়া অগ্রজ সনাতনের তিনবৎসর পূর্বেই লোকান্তরিত হন।[১৪]

সনাতন বৈষ্ণব আচার, নীতি-উপদেশ, ভাগবত ব্যাখ্যা প্রভৃতি ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন; কিন্তু রূপ কাব্য, নাটক, চম্পূকাব্য (গদ্যপদ্য মিশ্রিত), নাট্যতত্ত্ব, অলঙ্কার, নাট্যশাস্ত্র, রসতত্ত্ব—এক কথায় রসসৃষ্টি ও তত্ত্বব্যাখ্যা—দুই ব্যাপারেই আশ্চর্য কুশলতা দেখাইয়াছেন। কবিপ্রতিভা ও সমালোচকের বিচারবোধ রূপের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে মিলিত হইয়াছিল। নিম্নে তাঁহার প্রধান প্রধান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১। কাব্য—হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, স্তবমালা (ইহাতে ৬৪টি স্তব ছিল, জীব গোস্বামী এইগুলিকে সঙ্কলিত করিয়া 'স্তবমালা' নাম দিয়াছিলেন।)

২। নাটক—বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী (ভাণিকা)

৩। রসতত্ত্ব ও অলঙ্কার শাস্ত্র—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি

৪। কাব্যসঙ্কলন—পদ্যাবলী

৫। নাট্যতত্ত্ব—নাটকচন্দ্রিকা

৬। ধর্মতত্ত্ব—সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত (সনাতনের বৃহদ ভাগবতামৃতের সংক্ষিপ্তসার নহে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথক রচনা।)

ইহা ছাড়াও আরও কিছু কিছু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা (রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা), পর্যুক্তাখ্যাত-চন্দ্রিকা, কৃষ্ণজন্মতিথি, অষ্টকালিকা শ্লোকাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী ইত্যাদি। রূপের সাহিত্যিক প্রতিভা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও সুপ্রচুর।

শিখরিণী ছন্দে (মন্দাক্রান্তা নহে) ১৪২ স্তবকে রচিত 'হংসদূত' কাব্যটি দূতকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের দিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ রাধাকে ফেলিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, এদিকে কৃষ্ণবিরহে রাধা শীর্ণ হইয়া যাইতেছেন। সখী ললিতা রাধার এই অবস্থা দেখিয়া একটি শ্বেতহংসকে দূত করিয়া বৃন্দাবন হইতে মথুরায় কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন—বৃন্দাবন

---

[১৪] মতান্তরে সনাতন ও রূপ প্রায় একসময়েই লোকান্তরিত হন। এখনও বৃন্দাবনে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সনাতনের এবং তাহার সাতাশ দিন পরে শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশীতে রূপের তিরোধান উৎসব হইয়া থাকে। দ্রষ্টব্য : ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য।

হইতে মথুরা—দূরত্ব অল্পই। বৃন্দাবন হইতে মথুরা পর্যন্ত পথের বর্ণনা, কৃষ্ণলীলার চিহ্ন স্থান প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণের অশংাবতারও ইহাতে স্থান পাইয়াছেন। 'উদ্ধবসন্দেশ' কিন্তু মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত ১৩১টি স্তবক। রূপ ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত উদ্ধব-কাহিনীকে বিস্তারিতভাবে রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ উদ্ধবকে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে দূত করিয়া পাঠাইতেছেন। ইহাতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে পথের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বৃন্দাবনের লীলাস্থলগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পূর্বে মথুরায় আসিবার সময় গোপীগণ আর্তিবশতঃ কিরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা সবিস্তারে বলিয়াছেন। তারপর প্রত্যেক প্রধানা গোপীর (চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ধন্যা, শ্যামলা, পদ্মা, ললিতা, ভদ্রা, শৈব্যা) কাছেই সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু রাধার জন্য পাঠাইলেন নিজের গলার মালা। ইহার ভাষা ও অলঙ্কার বিস্ময়কর চাতুর্যে পূর্ণ। আবেগের ঐকান্তিকতা এবং করুণ বেদনার শুদ্ধ প্রবাহে 'উদ্ধবসন্দেশ' দূতকাব্যের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে।)

(স্তবস্তোত্র রচনাতেও রূপ গোস্বামী আলঙ্কারিক নিপুণতা ও কবিকল্পনার নানা বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। জীব গোস্বামী প্রায় চৌষট্টিটি স্তবস্তোত্রকে একত্রিত করিয়া নাম দেন 'স্তবমালা।' ইহার প্রথম তিনটি স্তবকে চৈতন্য-বন্দনা থাকিলেও বাকি স্তবগুলিতে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এই স্তোত্রগুলির প্রায় সমস্তই অতিশয় পরিমিত এবং রচনার দিক দিয়া অতিশয় গাঢ়বন্ধ। অবশ্য কোন কোন সমালোচক বলেন যে, ইহাতে হৃদয়ের আবেগের চেয়ে বক্তব্যের চারুত্বই অধিক। রূপ গোস্বামী যেন বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্যই এই স্তোত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন।[১৫] কথাটা অযথার্থ নহে। রূপ গোস্বামীর সমস্ত কাব্যকবিতাতেই কিঞ্চিৎ চেষ্টাকৃত রচনার লক্ষণ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বিরুদকাব্যও বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত। তন্মধ্যে 'গোবিন্দ বিরুদাবলী' তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত আলঙ্কারিক কৌশল, শ্রুতিসুখকর অনুপ্রাস—প্রভৃতি কাব্যকৌশলে পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দেয়। রূপ গোস্বামী ইহাতে কবিতার মতোই অনুপ্রাসযুক্ত একপ্রকার বিচিত্র গদ্যের ব্যবহার করিয়াছেন। বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় কাব্যে

---

১৫ ডঃ সুশীলকুমার দে প্রণীত *Vaishnava Faith & Movement* এর পৃ. ৫০০ দ্রষ্টব্য।

যে পরিমাণে ঝঙ্কার, শাব্দিক কৌশল এবং আলঙ্কারিক নিপুণতা থাকে, সেই পরিমাণে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ থাকে না। রূপ গোস্বামীর কাব্যেরও সেই একই বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী কালে কবিকর্ণপূর ও জীব গোস্বামী এই বিরুদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কবিকর্ণপূরের 'আনন্দবৃন্দাবন', জীবের 'গোপালবিরুদাবলী', বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী', রঘুনন্দন গোস্বামীর 'গৌরাঙ্গবিরুদাবলী' প্রভৃতি স্তোত্রকাব্য রূপ গোস্বামীর আদর্শেই রচিত।)

এই প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামীকৃত কবিতাসঙ্কলন 'পদ্যাবলীর'ও উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্য-সম্প্রদায় ও ভারতবর্ষের ভক্তিবাদী বৈষ্ণবসমাজে এই কাব্যসঙ্কলন সুপরিচিত। রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক ও দ্বৈতবাদী ভক্তিসংবলিত নবীন ও প্রাচীন কবিদের নানা কবিতা হইতে ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা বৈষ্ণবদের জন্যই সঙ্কলিত। ফলে ভক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থ, প্রবণতা ও পরিণতি এই সঙ্কলনেই লক্ষ্য করা যাইবে। কৃষ্ণভক্তির আদর্শ অনুসারে ইহাতে কৃষ্ণলীলার পদ গ্রথিত হইয়াছে।) বাঙলাদেশের বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের আদর্শই এই সঙ্কলনের পদ নির্বাচন ও পর্যায়ক্রমে অনুসৃত—ইহাও স্মরণীয়। ১২৫ জন কবির ৩৮৬টি শ্লোকে পূর্ণ এই বিরাট শ্লোকসংগ্রহ 'সদুক্তিকর্ণামৃতের' সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য 'সদুক্তি'তে নানা ভাবের শ্লোক ছিল. 'পদ্যাবলী'তে শুধু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবিতা স্থান পাইয়াছে—'সদুক্তি' হইতেও কিছু কিছু শ্লোক গৃহীত হইয়াছে। (অমরু, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের অন্য-প্রকার শ্লোকও রাধা-কৃষ্ণলীলার পটভূমিকায় গ্রথিত হওয়াতে কোনরূপ রসাভাস ঘটে নাই। রূপ গোস্বামী নিজে কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সুতরাং সঙ্কলক হিসাবে তিনি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপার, তাঁহার এই সঙ্কলনটি গ্রথিত না হইলে বাঙলা ও বাঙলার বাহিরের বহু স্বল্পপরিচিত বা অপরিচিত কবির নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইত।) আমরা রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'র কৃপায় এইরূপ অনেক কবির নাম জানিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের একটিমাত্র স্তবক রক্ষা পাইলেও তাহার দ্বারাই তাঁহারা স্মরণীয় হইয়া আছেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'পদ্যাবলীতে' সংস্কৃত ভাষায় বাঙালীর লিরিক প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগে রূপের যে কিরূপ অধিকার ছিল, তাহার

প্রমাণ তাঁহার দুইখানি নাটক, 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব', এবং একখানি ভাণিকা—'দানকেলিকৌমুদী'। 'দানকেলিকৌমুদী' বোধহয় অন্য দুইখানি নাটকের পূর্বে রচিত হয়।[১৬] 'ভাণিকা' উপরূপক বা নাটিকার শ্রেণীভুক্ত। মাত্র একটি অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটিকাটির দ্রুত ঘটনা, হাস্যপরিহাস, শৃঙ্গাররসের সরসতা এবং বিচিত্র বিস্ময়কর বর্ণনা, বিশেষতঃ রূপ গোস্বামীর স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দ রচনাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বসুদেবের যজ্ঞে রাধা ও সখীগণ কলসীতে ঘৃত লইয়া চলিয়াছেন, পথিমধ্যে কৃষ্ণ অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাধার সঙ্গে রঙ্গরহস্য জুড়িয়া দিলেন এবং ঘাটোয়াল হইয়া শুল্ক চাহিয়া বসিলেন। এই লইয়া কৃষ্ণ, সুবল ও মধুমঙ্গল এবং রাধা, ললিতা, বিশাখা ও অন্যান্য গোপীদের মধ্যে কৌতুক-কলহ বাধিল। তখন বয়োজ্যেষ্ঠা পৌর্ণমাসী আসিয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন। পরস্পরের প্রেমকলহ ও রঙ্গকৌতুকই এই ভাণিকার প্রধান বর্ণিত বিষয়।) সুতরাং ইহাতে নাট্যশাস্ত্রানুসারী ঘটনাসংবেগ ও চরিত্রের বিশেষ কোন বিকাশ ও পরিপূর্ণতা নাই। এই নাটিকার রচনাগত কৃত্রিমতা ও কষ্টসাধ্য আলঙ্কারিক কৌশল আধুনিক পাঠকের প্রীতিকর হইবে না, কিন্তু কয়েকটি শ্লোকে রূপ গোস্বামীর কল্পনার বৈচিত্র্য ও রচনার মাধুর্য স্বীকার করিতে হইবে।

('বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধবে'ই তাঁহার নাট্যপ্রতিভা যথার্থ মুক্তি পাইয়াছে। রূপ গোস্বামী প্রথমে একটি নাটকেই কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও দ্বারকালীলা রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে বাস করিবার সময় দুই লীলাকে মিলাইয়া দিয়া নাটক রচনার পরিকল্পনা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। বৃন্দাবনেই মঙ্গলাচরণ এবং নান্দীশ্লোক রচিত হইয়াছিল। গৌড়ে আসিয়া পুনরায় যখন তিনি মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য পুরীধামে যাত্রা করিলেন, তখন উড়িষ্যার সত্যভামাপুর নামক এক গ্রামে রাত্রিযাপনের সময় স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক দিব্যরূপা নারী আজ্ঞা দিতেছেন—"আমার নাটক পৃথক

[১৬] ডঃ সুশীলকুমার দে-র পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ৩২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 'দশরূপকে'র মধ্যে ভাণও একপ্রকার পুরাদস্তুর নাটক। ইহাতে অদ্ভুত বিচিত্র ঘটনাসমূহের বর্ণনা থাকিলেও চরিত্র ও কাহিনীর পূর্ণতাও থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্রতর 'ভাণিকা' বিষয়বস্তুর দিক হইতে ভাণের অনুরূপ হইলেও ইহাতে ঘটনা বা চরিত্রের পূর্ণতা ততটা থাকে না।

করহ রচন।' রূপ গোস্বামী বুঝিলেন, দেবী সত্যভামা পৃথক নাটক রচনার আজ্ঞা দিয়াছেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন :

ব্রজপুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা ।। (চৈ. চ.)

মহাপ্রভুর সঙ্গে রূপের সাক্ষাৎ হইল। তিনি পুরীধামে চৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করিয়া হরিদাসের কুটীরে কিছুকাল রহিলেন। নাটক রচনায় তাঁহার সমস্যার কথা চৈতন্যদেব জানিতে পারিলেন। তিনি শুধু বলিলেন :

কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে ।।

মধুর রসের উপাসক চৈতন্যদেব কৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকার ঐশ্বর্যময় লীলায় যেন শান্তি পাইতেন না। রূপ গোস্বামী অন্তর্যামী মহাপ্রভুর কথায় নূতন আলোক লাভ করিলেন। দেবী সত্যভামা স্বপ্নাদেশ দিয়াছেন পৃথক্ নাটক রচনা করিতে, কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় অভিমানিনী দেবীর নিশ্চয় আপত্তি হইবার কথা। অপর দিকে চৈতন্যদেব বলিতেছেন, কৃষ্ণকে ব্রজের বাহির করিও না। রূপ দুই দিক রক্ষা করিয়া দুইখানি নাটক রচনা করিলেন—'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব'। 'বিদগ্ধমাধবে' বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু 'ললিত-মাধবে' বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা—তিনটিই স্থান পাইয়াছে।

সাত অঙ্কে সমাপ্ত 'বিদগ্ধ মাধবে' রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ হইয়া সম্ভোগে সমাপ্ত হইয়াছে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'-তে বর্ণিত রসশাস্ত্র ও নায়ক-নায়িকা প্রকরণের আদর্শ ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। এই নাটকের প্রথমেই রূপ গোস্বামী শচীনন্দন চৈতন্যদেবের বন্দনা করিয়াছেন।[১৭] নাটকটির সংক্ষিপ্ত কাহিনী : রাধা তাঁহার দুই সখী ললিতা ও বিশাখার সঙ্গে সূর্যপূজায় চলিয়াছেন, চন্দ্রাবলীও তাঁহার দুই সখী পদ্মা ও শৈব্যার সঙ্গে চলিয়াছেন গৌরীতীর্থের দিকে চণ্ডিকার পূজা করিতে। পৌর্ণমাসী এদিকে রাধা ও কৃষ্ণের গোপন মিলনের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার নিকট কৃষ্ণ শুনিলেন যে, অভিমন্যুর (প্রচলিত বাঙলায় আয়ান) সঙ্গে রাধার বাহ্যবিবাহ হইয়াছে। রাধা

---

[১৭] অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব সংদীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ।।

কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া এবং বিশাখা-আনীত চিত্রপট দেখিয়া কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইলেন—ইহাই পূর্বরাগ। রাধাকৃষ্ণের মিলন না হওয়ার জন্য উভয়েরই বেদনার সীমা নাই। রাধা কৃষ্ণকে একটি প্রণয়পত্রিকা লিখিলেন; কৃষ্ণ এই পত্র পাইয়া বাহ্যতঃ রোষ প্রকাশ করিলেন এবং সৎ জীবনাদর্শের কথা বলিলেন। কিন্তু পরিশেষে ছদ্ম ক্রোধ ত্যাগ করিয়া প্রতিদান স্বরূপ রাধাকেও মালা পাঠাইলেন। কৃষ্ণের ঈষৎ ঔদাসীন্যে রাধা দুঃখিতচিত্তে যমুনায় প্রাণ-বিসর্জনের সঙ্কল্প করিলেন। অন্তরাল হইতে ইহা শুনিতে পাইয়া কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা জটিলা (রাধার শাশুড়ী) আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিল। অবশ্য পরে পৌর্ণমাসী, ললিতা ও বিশাখার সহায়তায় রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। ইহার পরে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রতিনায়িকার পূর্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। পরে রাধা চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণের বেণু হরণ করিলেন। রাধার বিভিন্ন মনোভাব, অভিসার, বাসকসজ্জা, কলহান্তরিতা, মান, কৃষ্ণকর্তৃক রাধার মানভঞ্জন, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি রসশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। রাধার সঙ্গে রাসলীলার পর চন্দ্রাবলীর আখ্যানও শেষাংশে আসিয়া গিয়াছে। চন্দ্রাবলী সখীদের সঙ্গে গৌরীতীর্থে চণ্ডীপূজা করিতে গিয়াছিলেন। এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার গোপন মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু পৌর্ণমাসী রাধা ও ললিতাকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া চন্দ্রাবলী-কৃষ্ণ-মিলন বানচাল করিয়া দিলেন। পিতামহী করালিকার হস্তক্ষেপের ফলে চন্দ্রাবলীকে বাধ্য হইয়া কৃষ্ণের আশা ছাড়িতে হইল। কৃষ্ণ এই 'সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে' গৌরীর মূর্তিগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধা জটিলার তর্জন হইতে বাঁচিয়া গেলেন এবং পরিশেষে রাধার সঙ্গে মিলিত হইলেন।

'ললিতমাধব' দশ অঙ্কে সমাপ্ত দীর্ঘ ঘটনাবিবৃতিমূলক নাটক, ইহাতে নাটকীয় ঘটনাসংবেগের তীব্রতা অল্প। যদিও ঘটনাটি নানা দিক দিয়া বেশ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। 'উজ্জ্বলনীলমণি' বর্ণিত সংবর্ধমান সম্ভোগের বর্ণনার জন্যই নাকি এই নাটক রচিত হইয়াছিল। ইহাতে বৃন্দাবন (১-৩ অঙ্ক), মথুরা (৪ অঙ্ক) এবং দ্বারকায় (৬-১০ অঙ্ক) কৃষ্ণের প্রেমলীলা অঙ্কিত হইয়াছে। দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনের ঘটনাকে এক সূত্রে মিলাইয়া দিবার জন্য রূপ গোস্বামী সুকৌশলে ইহাতে জন্মান্তরের সাহায্য লইয়াছেন। তিনি

দেখাইয়াছেন যে, চন্দ্রাবলী, রাধা ও অন্যান্য গোপীরা রুক্মিণী ও সত্যভামা ভিন্ন আর কেহ নহেন। অর্থাৎ রূপ গোস্বামী পরকীয়া ও স্বকীয়া নায়িকার বিরোধ মিটাইবার জন্য এই প্রকার মৌলিক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীরা সকলেই রাধা, চন্দ্রাবলী ও অন্যান্য গোপীমাত্র। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা ও চন্দ্রাবলীর রীতিমতো বিবাহেরও বর্ণনা আছে। রাধা ও অন্যান্য গোপীদের পূর্বে বিবাহ হইলেও তাহা আসল বিবাহ নহে—ছায়া মাত্র। গোপেরা ইহাদিগকে স্ত্রীভাবে দেখিত না।

কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, পরে সন্ধ্যাকালে রাধা ও চন্দ্রাবলীর সঙ্গে তাঁহার মিলন হইল, কিন্তু উভয়ের শাশুড়ীর জন্য এই মিলনে বাধা পড়িল। তার পরদিন কংস রাধাকে অপহরণ করিবার জন্য শঙ্খচূড় নামক এক দৈত্যকে পাঠাইয়া দিল। রাধা সূর্যপূজায় যাত্রা করিলে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ পূজারীর বেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রঙ্গ বেশীদূর গড়াইবার পূর্বেই শঙ্খ-চূড়ের উপস্থিতি এবং অন্তরালে কৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার বিনাশ হইল। পরে অক্রূর কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইতে আসিলেন—গোপীদের দুঃখের সীমা রহিল না, রাধা পাগলিনীর মতো কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে কৃষ্ণকে না পাইয়া যমুনায় ঝাঁপ দিলেন, বিশাখাও সেই পথ অনুসরণ করিল, ললিতা পর্বতচূড়া হইতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। দৈববাণী হইল, রাধা অন্য জগতে চলিয়া গিয়াছেন। পরে বৃন্দাবনের শোকাশ্রুপূত প্রান্তর ছাড়িয়া ঘটনাস্থল মথুরায় স্থানান্তরিত হইল। কৃষ্ণ মথুরায় থাকিয়াও গোপী ও রাধা-বিরহে দুঃখ পাইতেছেন। ইতিমধ্যে জানা গেল চন্দ্রাবলী, আসলে রুক্মিণী। তাঁহার ভাই রুক্মী ভগিনীকে বৃন্দাবন হইতে লইয়া গিয়া শিশুপালের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। নরকাসুরও এই সময়ে বৃন্দাবন হইতে ষোল হাজার একশত গোপীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে বৃন্দাবন শূন্য হইয়া পড়িল। যাহা হোক, পৌর্ণমাসীর সাহায্যে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া আসিলেন। সত্যভামার কাহিনীতে দেখা যাইতেছে, রাধাই সত্যভামা। রুক্মিণী-চন্দ্রাবলীর উপর সত্যভামা-রাধার রক্ষা ও দেখাশুনার ভার দেওয়া হইল। কৃষ্ণ রাধা-সত্যভামাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং গোপনে মিলিত হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চন্দ্রাবলী-রুক্মিণীর আকস্মিক আবির্ভাবের ফলে মিলনপ্রসঙ্গ নষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর

দ্বারকায় কৃষ্ণের প্রেমের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে রুক্মিণী-চন্দ্রাবলী এবং সত্যভামা-রাধার পারস্পরিক ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ দূরীভূত হইল, মিলনের মধ্যে নাটক সমাপ্ত হইল।

'বিদগ্ধ মাধবে' রূপ গোস্বামীর নাট্যপ্রতিভা প্রশংসনীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কাব্য, নাটক, চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতি বিচারে 'বিদগ্ধ মাধবে'র নাট্যগুণ নিন্দিত হইবে না, প্রশংসাই পাইবে। রূপ গোস্বামী সর্বোপরি কবি ও ভক্ত। তৎসত্ত্বেও তিনি এই নাটকে নাটকীয় পরিস্থিতি ও চরিত্রের নানারূপ আচরণগত পরিবর্তনের সাহায্যে বক্তব্যবিষয়কে যথাসম্ভব সুকৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু 'ললিতমাধব' আধুনিককালের পাঠকের নিকট বিশেষ প্রশংসা লাভ করিতে পারিবে না। দীর্ঘ দশ অঙ্ক, জটিল কাহিনী-উপকাহিনী, দুই জন্মের নায়িকার প্রবর্তন প্রভৃতি কৌশলের জন্য এই নাটক অত্যন্ত কৃত্রিম, দীর্ঘ ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। যিনি 'নাটকচন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন, তিনি যে কি করিয়া এই প্রকার একখানি ক্লান্তিকর, স্ফীতকায় কৃত্রিম কলাকৌশলে স্খলদ্‌গতি নাটক রচনা করিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। তিনি স্বকীয়া-পরকীয়া নায়িকা লইয়া চিন্তায় পড়িয়াছিলেন, তাই যেন-তেন-প্রকারেণ রাধাকে সত্যভামা এবং চন্দ্রাবলীকে রুক্মিণী বানাইবার জন্য অনাবশ্যক জটিল কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। সর্বোপরি বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার ঘটনাকে একটি নাটকে স্থান দিয়া তিনি সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। সেইজন্য 'ললিতমাধব' অপেক্ষা 'বিদগ্ধমাধব' পাঠকসমাজে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছে।

পরিশেষে রূপ গোস্বামীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রূপ গোস্বামীর মনীষা, ভূয়োদর্শন, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রখর জ্ঞান, রসতত্ত্ব, ভক্তিশাস্ত্র ও কাব্য-প্রকরণে যে কিরূপ অসাধারণ অধিকার ছিল, তাহা এই দুইখানি গ্রন্থ হইতেই জানা যাইবে। বস্তুতঃ, এ বিষয়ে সনাতন অপেক্ষা তাঁহারই কৃতিত্ব সমধিক। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্য ও রসতত্ত্ব অবিকল তাঁহার আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছে। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র ভক্তিরস এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'র বৈষ্ণব মতানুবর্তী অলঙ্কারতত্ত্ব ও কাব্যদর্শ শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের নহে, ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রেরও একটি সার্থক সংযোজনা। ১৭শ শতাব্দীর জগন্নাথ

তাঁহার 'রসগঙ্গাধরে' অলঙ্কার ও কাব্যবিচারে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত রূপ গোস্বামীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মৌলিকতা ও বিশ্লেষণ প্রণালী 'রসগঙ্গাধরে'র লেখকের মৌলিকতাকেও ম্লান করিয়া দিবে।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বিরাট গ্রন্থ।[১৮] ইহা চারিটি বিভাগে (পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরভাগ) বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগে আবার অনেকগুলি 'লহরী' বা উপ-পরিচ্ছেদ আছে। রূপ গোস্বামী যদিও প্রধানতঃ কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও রসতত্ত্বে যে তাঁহার নিষ্ঠা কতদূর গভীর ছিল, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ভক্তি ও শৃঙ্গার রসের এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিপুণ বিশ্লেষণ এবং মর্ত্যচেতনার অন্তরালবর্তী একটা অশরীরী রহস্যময় অস্তিত্বের এরূপ রসময় ব্যঞ্জনা সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই দুর্লভ। ভক্তিকে রসে পরিণত করা এবং রসতত্ত্বে কৃষ্ণভক্তির সহজ স্বীকৃতি দানের চেষ্টাই রূপ গোস্বামীর এই বৃহৎ গ্রন্থরচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের দর্শন ও সাহিত্য রূপ গোস্বামীর এই গ্রন্থখানির দ্বারা প্রচুর লাভবান হইয়াছে।

ইহার পূর্ববিভাগে চারিটি লহরী—এই চারিটি লহরীতে বিভিন্ন প্রকার ভক্তির কথা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। প্রথম লহরীতে 'সামান্যভক্তি' (সাধারণ ভক্তি)—আচরণীয় ধর্ম হইতে যে ভক্তির উদয় হয়। দ্বিতীয় লহরীতে 'সাধনভক্তি' বা বাহিরের বিশেষ আচরণের দ্বারা যে ভক্তি আয়ত্ত হইতে পারে। এই অধ্যায়ে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় লহরীতে 'ভাবভক্তি'—অর্থাৎ যে ভক্তি আপনা-আপনি অন্তর হইতে আবির্ভূত হয়, এবং চতুর্থ লহরীতে 'প্রেমভক্তি', অর্থাৎ ভক্তি যখন প্রেমে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে শেষ তিনটি লহরীতে বর্ণিত সাধনভক্তি, ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তিকে 'উত্তমা ভক্তি'র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় লহরীতে বর্ণিত রাগানুগা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, এই ভক্তি অনুরাগকেই অনুসরণ করিয়া থাকে। 'রাগ'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে,

---

[১৮] বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'কে সংক্ষিপ্ত করিয়া নাম দেন যথাক্রমে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ'। জীব গোস্বামী দুইটি গ্রন্থের দুইটি টীকা রচনা করেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে 'দুর্গমসঙ্গমণি' এবং লোচনরোচনী'।

"স্বারসিকা তন্ময়ী পরাষ্টিতা'—ইষ্টের প্রতি (অর্থাৎ কৃষ্ণ) সহজ, গভীর এবং অন্যোন্যভাবে সংযুক্ত ভক্তি। রাগানুগা ও বৈধী ভক্তির ভেদ বুঝাইতে গিয়া রূপ গোস্বামী দেখাইয়াছেন, বৈধী ভক্তিতে বিধি, শাস্ত্র ও আচারের প্রাধান্য। কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে শুধু স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের প্রাধান্য। ইহা কখনও কখনও 'পুষ্টিমার্গ' নামেও অভিহিত হয়। ভাবভক্তিতে (তৃতীয় লহরী) অন্তরের ভাবেরই প্রাধান্য। ইহাতে ভাব রসে পরিণত হয় না। চতুর্থ লহরীতে বর্ণিত প্রেমভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলা হইয়াছে। ইহাতে ভাবভক্তি প্রেমভক্তিতে পরিণতি লাভ করে।

ইহার পরের বিভাগগুলিতে ভক্তিকে রসের স্বরূপে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দক্ষিণ বিভাগে স্থায়িভাবের শ্রেণীবিন্যাস, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক-ভাব, ব্যভিচারী ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাইবে। পশ্চিম বিভাগে পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস এবং উত্তর বিভাগে সাতটি গৌণ ভক্তিরস ও রসাভাসের বর্ণনা লক্ষ্য করা যাইবে। অলঙ্কারশাস্ত্রে নয়টি স্থায়িভাবের যথাক্রমে নয়টি রসে পরিণত হওয়ার কথা আলোচিত হইয়াছে। যথা—

ভাব	রস
রতি	শৃঙ্গার
হাস	হাস্য
শোক	করুণ
ক্রোধ	রৌদ্র
উৎসাহ	বীর
ভয়	ভয়ানক
জুগুপ্‌সা	বীভৎস
বিস্ময়	অদ্ভুত
নির্বেদ	শান্ত

রূপ গোস্বামী ভক্তিরসকে সমস্ত স্থায়িভাবের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণরতিকেই প্রাধান্য দান করেন, অর্থাৎ রূপ গোস্বামীর নিকট শৃঙ্গাররসের সারভূত যে ভক্তিরস—তাহাই একমাত্র রস, আর সমস্তই গৌণ। তিনি ভক্তিরসকে দুইভাগে ভাগ করেন—মুখ্য ভক্তিরস (পাঁচটি) ও গৌণ ভক্তিরস (সাতটি)।

মুখ্য ভক্তিরস—(১) শান্ত (২) প্রীতি (৩) অদ্ভুত (৪) বাৎসল্য (৫) মধুর বা উজ্জ্বল।

গৌণ ভক্তিরস—(১) হাস্য (২) অদ্ভুত (৩) বীর (৪) করুণ (৫) রৌদ্র (৬) ভয়ানয় (৭) বীভৎস। এইস্থানে দক্ষিণ বিভাগের সমাপ্তি।

পশ্চিম বিভাগে মুখ্য ভক্তিরসের বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই অধ্যায়ে পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস এবং ইহাদের বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিকভাব-সঞ্চারিভাবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। উত্তর বিভাগ বা সর্বশেষ বিভাগে সাতটি গৌণ ভক্তি-রসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যাইবে। তাঁহার মতে পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরসই ভক্তিশাস্ত্রে স্বীকৃত, অন্য সাতটি গৌণ ভক্তিরস মুখ্য রসের সহায়তা ও পরিপুষ্ট করে। (রূপ গোস্বামী এই বৃহদ্ গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তির, বিশেষতঃ ভক্তিকে রস বলিয়া প্রমাণের জন্য যে পাণ্ডিত্য, যুক্তিবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, মধ্যযুগে সারা ভারতে কোনও আলঙ্কারিকের মধ্যে সেরূপ প্রতিভার দ্যুতি ও মৌলিকতা দেখিতে পাওয়া যায়-না।) অবশ্য ইহাতে নব্যন্যায়ের মতো যেরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে হয়তো কেহ কেহ এই আলোচনায় রূপ গোস্বামীর শুধু বুদ্ধির ব্যায়ামই আবিষ্কার করিবেন। কিন্তু রসশাস্ত্র বা ভক্তিদর্শন গড়িয়া তুলিতে গেলে এইরূপে ভূয়োদর্শী সূক্ষ্ম বুদ্ধিরই প্রয়োজন। হয়তো ইহাতে খুঁটিনাটি বিষয়ের বাহুল্য আছে, ইহার অনেকটাই আধুনিক মনের নিকট অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে হইতে পারে, আধুনিক মনো-বিজ্ঞান এই রসতত্ত্বের অনেক কিছুকেই স্বাভাবিক মনোবৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, রূপ গোস্বামী যদি অসাধারণ ধৈর্য পরিশ্রমের সাহায্যে এই বিপুল গ্রন্থটি রচনা না করিতেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব সাহিত্যের আশ্চর্য বিকাশ ঘটিতে পারিত কিনা সন্দেহ।)

(ইহার পর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'তে রূপ গোস্বামী যেমন অদ্ভুত বিচক্ষণতার সঙ্গে ভক্তিকে রসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তেমনি তিনি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে শৃঙ্গাররসকে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমগ্র অলঙ্কারশাস্ত্রকেই অপ্রাকৃত পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া অলঙ্কার তত্ত্বকে নূতনভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আমরা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, রূপ গোস্বামী পাঁচটি রসকে মুখ্য

ভক্তিরসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (শান্ত, প্রীতি, প্রেয়, বাৎসল্য ও মধুর)। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে এই পাঁচটি মুখ্যরসের প্রধানতম যে শৃঙ্গার, মধুর বা উজ্জ্বল-রস—তাহাকেই নূতন অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করা হইয়াছে। তাই ইহার নাম 'উজ্জ্বলনীলমণি' অর্থাৎ নীলমণি বা কৃষ্ণের উজ্জ্বল বা শৃঙ্গাররসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। লেখক সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রোক্ত শৃঙ্গাররসকেই বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণকে 'নায়কচূড়ামণি' বা শ্রেষ্ঠ নায়করূপে গ্রহণ করিয়া সেই আলোকে উজ্জ্বলরসকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে তাই আদর্শ নায়ক-নায়িকার (কৃষ্ণ ও রাধা) পটভূমি হইতে অলঙ্কার ও রসতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উজ্জ্বলরসের স্থায়িভাব হইতেছে 'প্রিয়তা' বা 'মধুরা রতি'। কৃষ্ণ-গোপীর শৃঙ্গার সম্ভোগ লীলায় এই রসের পরিপূর্ণ পুষ্টি। কৃষ্ণের এই স্বানুভব রতি বিভাবনা, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, সাত্ত্বিকভাব প্রভৃতির সাহায্যে ভক্তের হৃদয়েও মধুর রসের প্রতীতি সৃষ্টি করে। এই রতিকে তাই 'ভক্তিরসরাজ' বলা হয়। প্রথমে আলম্বন বিভাবনা বর্ণনাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণকে পতি বা উপপতি নায়করূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রে পরকীয়া নায়িকার প্রতি প্রীতি রসাভাস বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া প্রাকৃত অর্থে তুচ্ছ করা যায় না। তিনি নিজে রসাস্বাদনের জন্য ("রস-নির্যাস-স্বাদার্থম্-অবতারিণি") আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নায়িকাপ্রকরণেও এইরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নায়িকাগণ সকলেই কৃষ্ণ-বল্লভা। কৃষ্ণের বিবাহিত পত্নীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, ব্রজমণ্ডলে তাঁহার প্রিয়ারা সংখ্যায় যোড়শ সহস্র এবং দ্বারকার পত্নীরাও একশ আটজন। রূপ গোস্বামী দেখাইয়াছেন যে, এই নায়িকাগণ ঠিক পরকীয়া নায়িকা নহেন। কারণ, ইঁহাদের সকলের সঙ্গেই কৃষ্ণের গান্ধর্বমতে বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু এই বিবাহের কথা প্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়া ইঁহারা পরকীয়া নায়িকা বলিয়া পরিচিত। অবশ্য গোপগণের সঙ্গে এই স্ত্রীদের কোনওপ্রকার দাম্পত্য সংযোগ ঘটে নাই। কৃষ্ণের মায়ায় তাহারা মায়া-স্ত্রী লইয়া ভুলিয়াছিল। এইজন্য ব্রজদেবীদের পাতিব্রত্যে হানি হয় নাই ("ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ")। ইঁহাদের মধ্যে বৃন্দাবনের রাসরসেশ্বরী শ্রীরাধা সর্বশ্রেষ্ঠা। তাঁহাকে রূপ-গোস্বামী তন্ত্রের মহাশক্তির সঙ্গে একীভূত করিয়া বলিয়াছেন, ইনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী মহাশক্তি। রূপ গোস্বামী নায়ক, নায়িকা, দূতী প্রভৃতিকে অলঙ্কার

শাস্ত্রের আদর্শ অনুসারে এবং কৃষ্ণাসক্তিকে কেন্দ্র করিয়া অতি-বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

অলঙ্কারশাস্ত্রের মধুরা রতিকে যে পর্যায় অনুসারে বিভাগ করিয়া ক্রমোন্নতি বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতেই রূপ গোস্বামীর আদর্শ, রসতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-চেতনার পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। মধুরা রতির সাতটি পর্যায় কল্পিত হইয়াছে :—

১। প্রেম (ভাববন্ধনের বীজ অর্থাৎ প্রীতির মূল।)

২। স্নেহ (প্রেম হইতে উর্ধ্বতর। হৃদয়-দ্রাবণ ইহার প্রধান লক্ষণ।)

৩। মান (প্রেমে ঔদাসীন্য কল্পনা করিয়া আক্ষেপাতিরেক হইতে মানের জন্ম হয়।)

৪। প্রণয় (বন্ধুর বিশ্বস্ততা অর্থাৎ বিশ্রম্ভ)

৫। রাগ (প্রেমের বেদনার আনন্দে রূপান্তর)

৬। অনুরাগ (নিত্য নব নব প্রেম)

৭। ভাব বা মহাভাব (প্রেমের পরাকাষ্ঠা, ব্রজগোপীরা যে প্রেম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।)

এই সমস্ত বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, আদিরসকে অপ্রাকৃত বিভাবনার সাহায্যে উজ্জ্বলতম করিয়া তোলাই 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র উদ্দেশ্য। তিনি তাই কৃষ্ণকে প্রধান নায়কপদে বরণ করিয়া পুরাতন অলঙ্কারশাস্ত্রের নায়ক-নায়িকা-দূতী এবং ভাব ও রসের তত্ত্বকে বিশুদ্ধ শৃঙ্গাররসের পক্ষ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য রূপ গোস্বামীর ভক্তিতত্ত্ব আদিরসেরই নির্যাসমাত্র; তবে অধ্যাত্মচেতনায় আস্থাহীন পাঠকের নিকট এই সমস্ত উজ্জ্বলরসের বর্ণনা অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়-পারবশ্য বলিয়া মনে হইবে। পরবর্তী কালের বৈষ্ণবসমাজে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার যে বিষময় ফল ফলিয়াছিল, তাহার কারণ—অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসে স্থূল প্রাকৃত হস্তাবলেপ। সে যাহা হোক, রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনকে পরিপূর্ণতা দিয়াছে, পরিপুষ্ট করিয়াছে—একটা নূতন রস-প্রতীতি ও উপলব্ধির আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

জীব গোস্বামী ॥

সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী—এই তিনজন বৈষ্ণবসম্প্রদায়, দর্শন ও তত্ত্বাদর্শ গড়িয়া তুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে সনাতন বৈষ্ণব-মতের উপনিষদ ভাগবতের ব্যাখ্যার দ্বারা, রূপ ভক্তিশাস্ত্র ও আলঙ্কারিক রসতত্ত্বকে বৈষ্ণবধর্মের অনুকূলে স্থাপন করিয়া এবং জীব গোস্বামী বৈষ্ণব দর্শনের সুদৃঢ়ভিত্তির উপর বিরাট সৌধ নির্মাণ করিয়া চিন্তা, জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। প্রতিভা বিচারে জীব গোস্বামীর সংগ্রহবুদ্ধি, বিশ্লেষণ শক্তি এবং সংহতি সৃষ্টির বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। সনাতন মূলতঃ ভাষ্যকার, তাঁহার অনুজ রূপ কবি ও মর্মগ্রাহী রসবেত্তা ; কিন্তু তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী মূলতঃ দার্শনিক। অপরদিকে রূপ ও সনাতন অধিকাংশ সময়ে বৃন্দাবনে জনসমাগম ও জন-সংযোগ বর্জন করিয়া নিষ্কিঞ্চন যতির জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু জীব গোস্বামীর সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিশেষ যোগাযোগ ছিল, বাঙলার বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপ চলিত। বাঙলায় কিভাবে বৃন্দাবন-গোস্বামীদের গ্রন্থ, মত ও আদর্শ প্রচারলাভ করিবে, সেজন্য তিনি অতিশয় ব্যগ্র ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' উল্লিখিত তাঁহার পত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি বাঙলায় বৈষ্ণবগণের তত্ত্বঘটিত সন্দেহ ও বাদানুবাদ নিরসনে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহার আগ্রহে ও আনুকূল্যে রূপ-সনাতনের গ্রন্থসমূহ বাঙলাদেশে প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এক কথায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কল্যাণ, বিকাশ ও বর্ধনের প্রতি তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁহার জন্যই ১৭শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বিশেষ কোন মারাত্মক ফাটল ধরে নাই। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাসে' জীবের জীবনকথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে সন-তারিখ ও পৌর্বাপর্যের যেরূপ গোলমাল থাকা স্বাভাবিক, 'প্রেমবিলাসে' বর্ণিত জীব গোস্বামীর কাহিনীতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এখানে সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, সনাতন, রূপ ও অনুপম (বল্লভ)—তিন ভাই-ই গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। তন্মধ্যে অনুপম ছিলেন হুসেনের টাঁকশালের অধ্যক্ষ। ধর্মমতে তিনি বোধহয় রামোপাসক ছিলেন। তাঁহার পুত্র জীব। রূপ-সনাতন গৌড় হইতে পলায়ন করিবার

পূর্বে পরিবারের জন্য বিষয় সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করিলেন এবং পরিবারের সকলকে যশোহরের ফতেয়াবাদে রাখিয়া আসিলেন—পাছে ক্রুদ্ধ হইয়া হুসেনসাহ তাঁহাদের পরিবারবর্গের উপরেও হস্তক্ষেপ করেন এই আশঙ্কায়। সম্পত্তি ও আত্মীয়-স্বজনের ব্যবস্থা করিয়া তিন ভাই-ই চৈতন্যের শরণ লইলেন। ইতিমধ্যে অনুপমের মৃত্যু হইল। চৈতন্যের তিরোধানের সময় জীব বালক বা কিশোর মাত্র। 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে যে, রামকেলিতে যখন চৈতন্যদেবের সঙ্গে রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন নাকি বালক জীব মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা জনশ্রুতি মাত্র। বাল্যকালে জীব চৈতন্য-ভক্তির আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। পরিবারে পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের গৃহত্যাগের গল্প শুনিতে শুনিতে কৈশোর বয়সেই জীবের মনে সংসার ত্যাগের বাসনার উদয় হইয়াছিল। 'ভক্তিরত্নাকরে' এই বৈরাগ্যের চমৎকার বর্ণনা আছে। কিশোরবয়সী জীব পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের আদর্শ হৃদয়ে লইয়া একদিন মস্তক মুণ্ডন করিলেন এবং গৈরিক বেশ ধারণ করিয়া সন্ন্যাস লইলেন। প্রথমে তিনি যশোহর হইতে নবদ্বীপে নিত্যানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীবাসের আঙিনায় গিয়া চৈতন্য-পদরেণুরঞ্জিত প্রাঙ্গণে দিব্যভাবে আবিষ্ট হইলেন। তারপর তিনি নিত্যানন্দের নির্দেশে কাশীধামে গিয়া মধুসূদন বাচস্পতির[১৯] নিকট ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বেদান্ত পাঠ করিলেন। অতঃপর বিদ্যার্জনের পর নবযুবক জীব বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সনাতন ও রূপ ভ্রাতুষ্পুত্র জীবকে উত্তমরূপে ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব তত্ত্বে দীক্ষা দিলেন। জীব গোস্বামীর মনটি ছিল দার্শনিক ও তাত্ত্বিকের মতো। নানা মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া, বাঙলাদেশে প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া এবং বৃন্দাবন হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে পরিচালিত করিয়া তিনি একাধারে তাত্ত্বিক-দার্শনিক এবং সংগঠকের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার নানা ধরণের গ্রন্থকে নিম্নলিখিত শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১। কাব্য—গোপালচম্পূ, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, মাধবমহোৎসব, গোপাল-বিরুদাবলী।

---

[১৯] ইনি সম্ভবতঃ 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র প্রসিদ্ধ মধুসূদন সরস্বতী নহেন।

২। ব্যাকরণ ও রসশাস্ত্র—হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা, রসামৃত-শেষ, দুর্গমসঙ্গমণি, লোচনরোচনী।

৩। বৈষ্ণবস্মৃতি ও ধর্মতত্ত্ব—কৃষ্ণার্চাদীপিকা, গোপালতাপনী, ব্রহ্ম-সংহিতা, ক্রমসন্দর্ভ, লঘুতোষণী।

৪। বৈষ্ণবদর্শন—ভাগবতসন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ, সর্বসংবাদিনী।

এই তালিকা লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে জীব গোস্বামীর প্রতিভা কিরূপ বিচিত্র, বহুব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, স্মৃতি, দর্শন—কোন বিষয়েই তাঁহার অনধিকার ছিল না। কাব্য রচনা করিলেও জীব গোস্বামীর প্রতিভা মূলতঃ দার্শনিক ও তাত্ত্বিকের প্রতিভা।

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সূত্রমালিকা' (ব্যাকরণ) ও 'কৃষ্ণার্চাদীপিকা' (স্মৃতি) পাওয়া যায় নাই। বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁহার প্রধান প্রধান গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

জীব গোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' গদ্য-পদ্যময় বিরাট কাব্য। দুইখণ্ডে (পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ) সত্তর অধ্যায়ে সমাপ্ত এই কাব্যে কৃষ্ণলীলা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বার্ধে কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরলীলা এবং উত্তরার্ধে কৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলা স্থান পাইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হইলেও তিনি ইহাতে নিজ দর্শন ও তত্ত্বকথাও সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পাণ্ডিত্য, দার্শনিকতা, রচনাচাতুর্য, অলঙ্করণ প্রভৃতিতে এই গদ্য-পদ্যময় সুদীর্ঘ চম্পূকাব্য কবির অসাধারণ মনীষাই প্রমাণিত করিতেছে—যদিও কাব্যটি যে দার্শনিকের রচিত, তাহা পদে পদে বুঝা যায়। ভক্তির দৃষ্টিতে না দেখিলে এই কাব্য পাঠকের নিকট খুব একটা প্রীতিকর মনে হইবে না। কৃষ্ণ ও গোপীদের নবকৈশোর প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন যে, এই সময় কৃষ্ণের বয়স ছয়, এবং গোপীদের বয়স পাঁচ। ইহাতে আধুনিক পাঠক কৌতুক বোধ করিতে পারেন। কবি যেখানেই কৃষ্ণ-গোপীদের শৃঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন সেখানেই তাহাকে স্মৃতিসংহিতার দ্বারা সংশোধন করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গোপীগণ কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী—ইহা প্রমাণের জন্য তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছে (পূর্বার্ধ—২৩শ অধ্যায়)। এ কাব্যে কবিত্ব, কল্পনা, রস যে নাই তাহা নহে; কিন্তু জীব গোস্বামী প্রায়শঃই তত্ত্ব ও দর্শনের কথা ভুলিতে পারেন নাই, পাঠকও পারে না। অসাধারণ

পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও এ কাব্য রূপ গোস্বামীর রচনার মতো ততটা সরস ও স্বতঃস্ফূর্ত নহে। 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুমে' কল্পতরুস্বরূপ কৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে—যাহা ইতিপূর্বে রচিত 'গোপালচম্পূ'তে আরও বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহাতেও দর্শন ও তত্ত্বের কথাই অধিক। 'মাধবমহোৎসবে' নয়সর্গে ১১৬৪ শ্লোকে বৃন্দাবনে রাধা ও কৃষ্ণের অভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার পূর্বেই রঘুনাথ দাস 'ব্রজবিলাস স্তব' ও 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'-তে ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং 'মুক্তাচরিত্রে' বিস্তারিত আকারে ইহার বর্ণনা দিয়াছিলেন।

ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রেও জীবের বিশেষ নিপুণতা ছিল। তাঁহার 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ' নানা কারণে পাঠকসমাজে বিশেষ জনপ্রিয়। ইহাতে সাধারণ ব্যাকরণের রীতি অনুসৃত হইলেও জীব গোস্বামী উদাহরণের স্থলে সব সময়ে কৃষ্ণ, রাধা বা তাঁহাদের 'গণের' দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—যাহাতে ভক্তেরা ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে কৃষ্ণের নাম স্মরণ করিতে পারে, অর্থাৎ যাহাকে একাধারে আহার ও ঔষধ বলে! 'সূত্রমালিকা' বা 'ধাতুসূত্রমালিকা' বোধ হয় ধাতুপাঠ শ্রেণীর পুস্তিকা,—ইহা পাওয়া যায় নাই। তাঁহার 'রসামৃতশেষ' বা 'ভক্তিরসামৃতশেষ' সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে।[২০] ইহাই যে জীবের বিলুপ্ত 'রসামৃতশেষ', কেহ কেহ তাহা মানিয়া লইতে কিছু সংশয়ান্বিত।[২১] যাহা হোক ইহাতে বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের আদর্শে অলঙ্কারতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব বিষয়ে রচিত তাঁহার গোপালতাপনী উপনিষদ, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতির টীকা এবং সনাতনের 'বৈষ্ণব-তোষণীর' সারসংক্ষেপ 'লঘুতোষণী'-তে টীকাটিপ্পনীর সাহায্যে বৈষ্ণব তত্ত্বকথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার প্রচুর পাণ্ডিত্য ও রসবোধের পরিচয় রহিয়াছে বটে, কিন্তু জীব গোস্বামী যে জন্য বৈষ্ণবসমাজে ও বঙ্গসংস্কৃতিতে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা হইতেছে বৈষ্ণবদর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থ। সনাতন ও রূপ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, সম্প্রদায়, সমাজ ও ধর্মতত্ত্বে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে বিরাজ করিবেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে মননশীল,

[২০] নবদ্বীপের হরিদাস দাস সম্পাদিত, ১৯৪১

[২১] ডঃ সুশীলকুমার দে প্রণীত *Vaishnava Faith & Movement* দ্রষ্টব্য।

চিন্তাবদ্ধ ও সুদূরপ্রসারী দার্শনিক প্রত্যয়ে তুলিয়া ধরিতে হইলে জীব গোস্বামীর মতো একটি প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। রূপ গোস্বামী যেমন ভক্তি ও রসকে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, জীব গোস্বামী সেইরূপ দূরগামী প্রতিভার আলোকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের আদ্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং অপূর্ব মনীষার সাহায্যে আবেগের ধর্মকে বুদ্ধিজীবী (scholastic) দর্শনের পর্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন। শুধু আবেগের অতিরেক নহে, উচ্ছ্বাস-অনুরাগের তারল্যকে মুক্তকঠিন স্ফাটিকত্বে রূপায়িত করা দুরূহ—বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপারে। কারণ, বৈষ্ণবধর্ম মূলতঃ আবেগের ধর্ম। জ্ঞানমিশ্রা বা ঐশ্বর্যমিশ্রা ভক্তি যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'সাধ্য' নহে, তেমনি শুষ্ক দর্শনতত্ত্ব-অনুশীলনও এই মতের অনুকূল নহে। চৈতন্যদেব 'শিক্ষাষ্টক'[২২] ব্যতীত কোন দার্শনিক গ্রন্থ বা অন্য কিছু রচনা করেন নাই; কেহ তাঁহার কাছে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে তিনি স্বরূপ-দামোদরকে দেখাইয়া দিতেন। তিনি সনাতনকে বৈষ্ণব-আচারদর্শন এবং রূপকে রসশাস্ত্র রচনা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। জীবিত থাকিলে মহাপ্রভু জীব গোস্বামীকে নিশ্চয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করিতে বলিতেন। বাস্তবিক জীব গোস্বামীর দার্শনিক গ্রন্থসমূহ রচিত না হইলে বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম ক্রমে লৌকিক উপধর্মের কবলে পড়িত এবং শেষ পর্যন্ত আউল-বাউল-সাঁইগুরুর দলে পড়িয়া জাত হারাইয়া একেবারে ভিন্ন ভেক ধারণ করিত।

জীবের 'ভাগবত সন্দর্ভ' বা 'ষট্‌সন্দর্ভ' ছয়খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের সমাহার—(১) তত্ত্ব সন্দর্ভ, (২) ভগবৎ সন্দর্ভ, (৩) পরমাত্ম সন্দর্ভ, (৪) শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, (৫) ভক্তি সন্দর্ভ এবং (৬) প্রীতি সন্দর্ভ। জীবের আর একখানি গ্রন্থ 'সর্ব-সংবাদিনী'তে উল্লিখিত প্রথম চারিখানির ব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছে। 'ভাগবত সন্দর্ভে' গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শের অনুকূলে ভাগবতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অবলম্বিত হইয়াছে। তাই এই নামটি যথোপযুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনায় জীব গোস্বামী সনাতন ও রূপের নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি সন্দর্ভের গোড়াতেই তিনি 'দাক্ষিণাত্য ভট্ট' (দক্ষিণদেশবাসী) নামক কোন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণের

---

[২২] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

মতে এই দাক্ষিণাত্য ভট্ট খুব সম্ভব গোপাল ভট্ট। বোধহয় জীব গোপাল ভট্টের কাছে এই দর্শনগ্রন্থ রচনায় বিশেষ সাহায্য ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। আত্মগুপ্তি-প্রয়াসী গোপাল ভট্টের নামটি জীব গোস্বামী উল্লেখ করিতে পারেন নাই—শুধু 'দাক্ষিণাত্য ভট্ট' বলিয়া আভাসমাত্র দিয়াছেন। রামানুজ বা মধ্বের মতো জীব গোস্বামী কোন দার্শনিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া যান নাই বটে, কিন্তু ভাগবত অবলম্বনে তিনি যেভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিগত, নিয়মানুগ ও যুক্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ আলোচনার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়।

'তত্ত্বসন্দর্ভে' দর্শনের প্রাথমিক কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রমাণ বা জ্ঞানের উৎসভূমি ও উৎপত্তির আলোচনাই ইহার মুখ্য বিষয়। শুধু প্রমাণ নহে, প্রমেয় বা জ্ঞাতব্য বস্তু তাহার পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের বিবিধ প্রমাণ (প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য) আলোচনা করিয়া একমাত্র শব্দ-প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়াছেন—এবং সে শব্দ-প্রমাণ হইতেছে ভাগবতের প্রমাণ। 'ভগবৎসন্দর্ভে' ভগবানের স্বরূপ নির্ধারিত হইয়াছে। ভাগবতের শ্লোক অনুসারে[২৩] জীব গোস্বামী ব্রহ্মকে ত্রিস্বরূপে ব্যাখ্যা করিলেন—ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবান। উক্ত শ্লোকের 'জ্ঞানমদ্বয়ম্'-কে জীব গোস্বামী অদ্বৈত জ্ঞান অর্থে না লইয়া সগুণ দ্বৈত-জ্ঞান অর্থে বিচার করিয়াছেন। এই সন্দর্ভে ব্রহ্মের স্বরূপ, স্বরূপশক্তি এবং ব্রহ্ম ও শক্তির সম্পর্ক বিচার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি—(১) স্বরূপ শক্তি, (২) তটস্থা শক্তি, (৩) বহিরঙ্গা শক্তি। ইহাদের যথাক্রমে নাম—স্বরূপ-শক্তি বা পরাশক্তি, তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি। এই সন্দর্ভে শুধু স্বরূপ শক্তি বা পরা শক্তির কথা বলা হইয়াছে। আর দুই শক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে 'পরমাত্ম সন্দর্ভে'। এই স্বরূপ শক্তি ও ব্রহ্ম এক, অবিচ্ছেদ্য ও অভিন্ন। স্বরূপ শক্তিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়—সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী। সন্ধিনী হইতেছে ব্রহ্মের সদংশের অঙ্গীভূত, সংবিৎ-শক্তি ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ এবং হ্লাদিনী শক্তি ব্রহ্মের আনন্দময় শক্তি। এই তিন শক্তিই ব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছে। এই

---

[২৩] বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তিনের মধ্যে হ্লাদিনীশক্তি আবার অপর দুই শক্তিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং এইস্থানেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের বিশেষত্ব। 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' কৃষ্ণকে ব্রহ্ম এবং রাধাকে হ্লাদিনী শক্তি বলা হইয়াছে।

'পরমাত্মসন্দর্ভে' পরমাত্মার সঙ্গে জীব ও প্রকৃতির সম্বন্ধ আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সঙ্গে কিছু পার্থক্য আছে। ব্রহ্ম হইতেছেন নির্বিশেষ অবিকল্পাত্মক চৈতন্য; কিন্তু পরমাত্মা সবিশেষ সগুণ চৈতন্য। তাই পরমাত্মায় আংশিক বিকাশ, ইহার সহিত মায়াশক্তি ও জীবশক্তির সম্পর্ক। ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে, ভগবান বা ব্রহ্মের সঙ্গে স্বরূপ শক্তির অন্যোন্য সম্পর্ক এই সন্দর্ভে জীবশক্তি ও মায়াশক্তির বিস্তৃত আলোচনাই মুখ্য। শেষে জীব গোস্বামী দেখাইয়াছেন যে, যেহেতু জীব তটস্থা-জীবশক্তির অঙ্গীভূত, সেই জন্য জীব ভগবানের অংশ, তাহা সত্য বটে। কিন্তু শক্তিরও একটা স্বাতন্ত্র্য ও পৃথক সত্তা আছে। এই ভগবান ও জীবশক্তির সম্পর্কটি কতকটা সূর্য ও সূর্যকিরণের মতো। অর্থাৎ ভেদ আছেও বটে, নাইও বটে,—সেই সম্পর্ক অচিন্ত্য, চিন্তার অতীত। এই মতই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তিভূমি। অবশ্য তাই বলিয়া জীব কখনও ব্রহ্মের সমতুল্য নহে, ব্রহ্মের সঙ্গে তাহার সেব্য-সেবক সম্পর্ক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' অধিকতর মূল্যবান। অন্যান্য সন্দর্ভগুলি যেন এই সন্দর্ভের ভূমিকা বা সূচনা। ইহাতে বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্মের নানা তত্ত্বই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পূর্বতন তিনখানি সন্দর্ভে ভগবান ও জীবশক্তির বিষয়ে যে আলোচনা স্থান পাইয়াছে, এখানে ভাগবতের কৃষ্ণের উপর তাহা আরোপ করা হইয়াছে। কৃষ্ণ অবতার নহেন, তিনি 'অবতারী', ব্রহ্মসনাতন, ভগবান —এইভাবে জীব গোস্বামী আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন এবং কৃষ্ণের নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষ্ণের ব্যূহ, পরিকর, বাসস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া কৃষ্ণ ও গোপীদের সম্পর্ক লইয়া জীব গোস্বামী সেই পতি-উপপতি তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বহু সময় ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে গোপী ও কৃষ্ণের মধ্যে পত্নী ও পতির সম্পর্ক—উপপতির সম্পর্ক নহে। রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ-নায়িকা বিচারে স্বকীয়াবাদের পরিপোষক ছিলেন। জীবও সেই পথ ধরিয়াছেন। পরবর্তী কালে গৌড়ীয় সমাজে স্বকীয়াবাদের স্থলে

পরকীয়াবাদ প্রাধান্য লাভ করে। জীবের মতে, যদিও গোপীপ্রেম-প্রসঙ্গে গোপীপ্রেমকে উপপতির প্রেমের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে—আসলে প্রেমের নিবিড়তা বুঝাইবার জন্য এইরূপ উৎকট উপমার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। কারণ ভাগবতে বহুস্থানে গোপীদিগকে কৃষ্ণবধূ বলা হইয়াছে। যাহা হোক, জীব গোস্বামীর মতে গোপীগণ কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা। অপরের বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে প্রেমপ্রচেষ্টা "অধর্মময়ত্ব-প্রতীতৌ অশ্লীল তয়া ব্যাহন্যত এব রসঃ" —অধর্মময়, অশ্লীল—ফলে রস ব্যাহত হয়। সেই জন্য জীব গোস্বামীর মধ্যমতাত রূপ গোস্বামী 'ললিতমাধবে' (১০ম অঙ্ক) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদের রীতিমতো সামাজিক বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জীবও বলিতেছেন যে, গোপীরা বিবাহিত হইলেও গোপদের সঙ্গে তাঁহাদের দেহ-সম্পর্ক হয় নাই। কারণ কৃষ্ণ মায়াশক্তির বলে গোপদের নিকট মায়া-গোপবধূ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণই গোপীদের একমাত্র পতি। এই গোপবধূরা পরস্ত্রী নহেন, কৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তি; সুতরাং নিজ শক্তির সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা কিরূপে দাম্পত্য-ধর্মদূষণ হইতে পারে? এখানে বক্তব্য যে, বৃন্দাবনমণ্ডলের গোস্বামিগণ পরকীয়া তত্ত্ব ততটা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা রাধা এবং গোপীদিগকে কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি ও বিবাহিতা বধূ প্রমাণের জন্য নানা নজির খুঁজিয়াছেন। অপরদিকে তাঁহাদের আদর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হইলেও গৌড়মণ্ডলে পরকীয়াবাদই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

'ভক্তিসন্দর্ভে' ভগবান অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বর্ণিত হইয়াছে। জীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন যে, ভগবানের সঙ্গে জীবের দুই প্রকার সম্পর্ক কল্পনা করা যায়। একটি—ভগবানের কৃপাবশে এবং জীবের সংস্কার বা সুকৃতির বশে কোনরূপ শিক্ষা বা উপদেশ ব্যতিরেকেই অন্তরে আপনা-আপনি ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত হয়—যেমন ভক্ত প্রহ্লাদ। আর একটি—যাহারা মায়াশক্তির বশীভূত হয় তাহাদের এই ভক্তিপ্রবণতা বাধা প্রাপ্ত হয়। ভক্তি তখন জীবের বৈমুখ্য দূর করিয়া ভগবানের প্রতি আকর্ষণ সঞ্চার করে। এই মায়াশক্তির প্রভাবে জীব তাহার আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যায়; ভগবানের স্বরূপশক্তির বলেই জীব মায়াশক্তির কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে। ভক্তির দ্বারা দেবতার অর্চনা জীবের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ভক্তিকে শুধু উপায় বলিলেই চলে না, ইহাই জীবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম ('পরধর্ম')। ধর্মের

অর্থ—ভগবানের প্রীতি। ইহা প্রবৃত্তি বা জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্ত, তাই বলিয়া ইহাকে নিবৃত্তি বলা যায় না। কারণ, বৈমুখ্যের সঙ্গে নিবৃত্তির বিশেষ পার্থক্য নাই। তাই ভক্তিকে বলা হইয়াছে "স এবৈকান্তিকং শ্রেয়ঃ"। এইজন্য অন্যান্য 'ধর্ম'-এর তুলনায় ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।] এই ভক্তির দুইটি লক্ষণ ঃ—

১। অহৈতুকী বা অকিঞ্চনা—এই ভক্তিতে কোন হেতু নাই, কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই। ঈশ্বরপ্রেমেই ইহার একমাত্র লক্ষ্য।

২। অপ্রতিহতা—যে ভক্তি সুখ-দুঃখের দ্বারা বাধগতি নহে।

জীব গোস্বামী শেষপর্যন্ত দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞানমিশ্র ভক্তিও শ্রদ্ধাভক্তিতে পরিণত হইতে পারে এবং ভক্তি থাকিলেই আপনা-আপনি জ্ঞান আসিবে। সত্যকারের জ্ঞানের সার্থকতা ভগবদ্‌জ্ঞানে এবং ভগবদ্‌জ্ঞানের অর্থই ভক্তি। যাহারা ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞান বা মুক্তির দিকে ধাবিত হয়, তাহারা তণ্ডুল ফেলিয়া তুষ লইয়া মত্ত হয়। এই শ্রেষ্ঠ ভক্তির নাম 'অকৈতবা' বা 'অকিঞ্চনা' ভক্তি। ইহার দুইটি শাখা—বৈধী ও রাগানুগা। বৈধীভক্তির এগারটি স্বরূপ —(১) শরণাপত্তি (ভগবানকে অনন্যপতিরূপে গ্রহণ), (২) গুরুসেবা, (৩) শ্রবণ (ভগবানের গুণকীর্তন শ্রবণ), (৪) কীর্তন, (৫) স্মরণ, (৬) পদসেবা, (৭) অর্চনা, (৮) বন্দনা, (৯) দাস্য, (১০) সখ্য, (১১) আত্মনিবেদন।

প্রেমের দ্বারা বা অনুরাগের দ্বারা ঈশ্বর-আরাধনার নাম রাগানুগাভক্তি। রাগানুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির পথ অনুসরণ করে। রাগাত্মিকা ভক্তির অর্থ—যাহাতে চিত্তের অনুরাগ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ভগবানের পরিকরের বা শক্তির অনুরাগমূলক ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। জীব যখন সেই আদর্শ অনুসরণ করে তখন সেই ভক্তির নাম হয় রাগানুগা ভক্তি। অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি বল্লবী-যুবতীদের অনুরাগ রাগাত্মিকা ভক্তি, এবং মর্ত্যের বৈষ্ণব ভক্তদের কৃষ্ণানুরাগ রাগানুগা ভক্তি।

(সর্বশেষের সন্দর্ভটি 'প্রীতিসন্দর্ভ' নামে পরিচিত। ইহার মূল লক্ষ্য ভগবানের প্রতি প্রীতি বা প্রেমভক্তির সঞ্চার—যাহা মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। অন্যান্য সন্দর্ভগুলিতে পরমাত্মার স্বরূপ নির্ধারিত হইয়াছে, ভগবান কৃষ্ণই যে একমাত্র উপাস্য তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং তাঁহার উপাসনাই ভক্তির একমাত্র অবলম্বন, তাহাও সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।)

'প্রীতিসন্দর্ভে' প্রীতিকেই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দর্শনে বলে, দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য। জীব গোস্বামী দেখাইলেন যে, ভগবৎপ্রীতি চিরসুখময় ও দুঃখলেশহীন। এই ভগবৎ প্রীতির বশে জীব লোকাতীত রস ভোগ করিতে পারে। 'সৎ', 'অনন্ত', 'কেবল' ও 'পরম'—ভগবানের এই চারিটি স্বরূপ। 'পরমাত্ম সন্দর্ভে' বলা হইয়াছে, যদিও জীব ভগবানেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মায়াশক্তির প্রভাবে সে ভগবানকে ভুলিয়া থাকে এবং পুনঃপুনঃ জন্মচক্রে ঘুরিয়া মরে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য ভগবৎ চেতনার অনুপস্থিতি থাকিলেও ঈশ্বর কৃপায় জীব সেই প্রেম লাভ করিতে পারে। মায়াশক্তির অবসানে এবং স্বরূপ শক্তির প্রভাবে জীবের মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে—ভাগবতে যাহাকে স্ব স্বরূপে প্রত্যাবর্তন বলা হইয়াছে।

তারপর জীব গোস্বামী দেখাইয়াছেন যে, প্রীতি ব্যতিরেকে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার বা সান্নিধ্য লাভ হইতে পারে না। জীব ভগবানের প্রতি প্রীতিতে আকৃষ্ট হইলে মুক্তিও তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়, আর ভগবানের প্রেম লাভই তো মুক্তি। এই মুক্তি প্রসঙ্গে বৈষ্ণব মত যে তত্ত্বে উপনীত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপ এই ঃ—

১। মায়াশক্তির বিদূরণ এবং স্বরূপশক্তি বা ভক্তির দ্বারা জীবের সত্য-স্বরূপ উপলব্ধি।

২। মায়াশক্তি ও জাগতিক গুণের অতীত এমন একটা অবস্থা লাভ করিতে হইবে যাহার ফলে মৃত্যুর পর স্থুল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার ভূতশরীরের বিলুপ্তি হইবে।

৩। কর্মের বিলুপ্তি, কিন্তু ভক্তির বিলুপ্তি নহে।

৪। 'সংসার' বা পুনর্জন্মের ক্ষান্তি।

৫। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার।

৬। জীবনমুক্ত জীবের স্বাতন্ত্র্য, সেইরূপ পৃথক সত্তায় ভগবৎসেবা ও প্রীতি প্রভৃতি রসভোগ।

দর্শনে যে পাঁচপ্রকার মুক্তির কথা আছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন তাহাকেই একটু ভিন্নভাবে উল্লিখিত রীতিতে গ্রহণ করিয়াছে। এই দার্শনিকগণ তাই মুক্তি ও প্রীতির মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। বিশুদ্ধ ভক্তির অর্থ শুদ্ধা প্রীতি। মুক্তি যদি ভক্তির অঙ্গীভূত না হয় তাহা হইলে তাহাকে ইহারা

'কৈতব' বা ছলনা বলিয়াছেন। এমন কি যাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রীতি বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। জীব গোস্বামী তিনপ্রকার ভক্তের কথা বলিয়াছেন—(ক) শান্তভক্ত, যাঁহারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি বাঞ্ছা করেন, (খ) ভগবানের পরিকরগণ—যাঁহারা 'রাগাত্মিকা' ভক্তির দ্বারা বিধৃত, যথা রাধা, গোপী প্রভৃতি, (গ) মর্ত্যের ভক্ত, যাঁহারা ভগবানের পরিকরের কৃপায় 'রাগানুগা' ভক্তির সাহায্যে দাস্যসখ্যাদি বিভিন্ন রসভোগের প্রয়াসী। কিন্তু যথার্থ ভক্ত শুধু ভগবৎ প্রীতিই কামনা করেন।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে ভগবানের প্রতি উদ্দিষ্ট প্রীতি প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হয়। এই প্রেমভক্তির বশে জীব প্রেমস্বরূপ ভগবানকে যেমন উপলব্ধি করে, ভগবানও তেমনি ভক্তের প্রেমের মারফতে নিজের প্রিয়তা বা প্রীতিবোধকে নিজেই আস্বাদন করেন। অবশ্য ভগবানের এই আনন্দের কোন বিকল্পাত্মক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। আপনার হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা তিনি নিজেই আপনার আনন্দ উপলব্ধি করেন, ভক্তেরাও তাহার অণুপরিমাণ স্বাদ পায়। ইহাই ভগবৎ প্রীতি—যাহার ফলে উপাসক এবং উপাস্য একাত্ম ('পরস্পরাবেশত্ব') হইয়া যান ; অবশ্য তাই বলিয়া একাকার হইয়া যান না, অন্যোন্য একাত্মতার মধ্যও পৃথক সত্তাবোধ থাকে। যেমন লোহাকে আগুনে তপ্ত করিলে তাহা অগ্নিময় হয় বটে, কিন্তু লৌহত্ব ছাড়ে না। এই প্রীতির বিকাশ ও পর্যায় আটটি স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়—(১) রতি, (২) প্রেম, (৩) প্রণয়, (৪) মান, (৫) স্নেহ, (৬) রাগ, (৭) অনুরাগ, (৮) মহাভাব। জীব গোস্বামী 'প্রীতিসন্দর্ভে' এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।

তিনি এই সন্দর্ভে দুইটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, একটি—ভক্তি কিরূপে রসে পরিণত হইতে পারে, আর একটি—স্বকীয়া-পরকীয়াবাদ। রূপ গোস্বামী এসম্বন্ধে খুব সূক্ষ্ম তর্কের অবতারণা করেন নাই, কিন্তু জীব দেখাইয়াছেন যে, অলঙ্কারশাস্ত্রসমূহে ভক্তিকে রস বলা না হইলেও ভগবৎপ্রীতি যথার্থ স্থায়িভাব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কৃষ্ণরতিতে স্থায়িভাবের সমস্ত প্রকরণই বর্তমান, তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবও কৃষ্ণরতিতে পাওয়া যাইবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গোপীপ্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, গোপীপ্রেমই যথার্থ কৃষ্ণরতির দৃষ্টান্ত। কিন্তু স্বকীয়া-পরকীয়া প্রসঙ্গে সংস্কারের সঙ্কট কাটাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, দ্বারকার কৃষ্ণভামিনীগণ এবং বৃন্দাবনের গোপযুবতীদের মধ্যে

একদল কৃষ্ণের বিবাহিতা, অপর দল পরোঢ়া। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না—ইহারা সকলেই কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। সুতরাং বৃন্দাবনের গোপীলীলার মধ্যে প্রাকৃত কাম নাই, পরকীয়া ভাবও নাই। রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ললিতমাধবে' পুনঃপুনঃ বলিতে চাহিয়াছেন যে, গোপীরা কৃষ্ণের যথার্থ পত্নী, কিন্তু বৃন্দাবনে অল্প সময়ের জন্য বাহ্যতঃ তাঁহাদের মধ্যে পরকীয়া ভাবের উল্লেখ দেখা গিয়াছিল। সেই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান গোস্বামীরা পরকীয়াবাদের সমর্থক ছিলেন না। 'ষট্‌সন্দর্ভে'র শেষে জীব-গোস্বামী কৃষ্ণাবতাররূপে আবির্ভূত চৈতন্যবিগ্রহকে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। কারণ এই সমস্ত সন্দর্ভে জীব ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ বলিয়াছেন—চৈতন্য তাহারই মূর্ত বিগ্রহ। জীব গোস্বামীর দার্শনিক চিন্তা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মনন ও তত্ত্বের দিকটিকে কিরূপ যুক্তিপূর্ণ পূর্বাপরসঙ্গতির মধ্যে বিকশিত হইতে সাহায্য করিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্যতীত আর কোন বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ও দার্শনিক এইরূপ অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যের প্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শ কিরূপ সূক্ষ্মতা লাভ করিয়াছিল, তাহা উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। শুধু আবেগের বাহুল্য নহে, সূক্ষ্ম চিন্তা ও তত্ত্বনিষ্ঠার প্রতি বাঙালী বৈষ্ণব সমাজের কিরূপ আকর্ষণ ছিল তাহা উপরি-লিখিত সনাতন-রূপ-জীব-গোস্বামীর সংস্কৃত গ্রন্থাদির স্বল্প উল্লেখ হইতেই প্রতীয়মান হইবে। সনাতনাদি এবং গোপাল ভট্ট বাঙালী না হইয়াও বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের অশেষ উপকার করিয়াছেন, এবং সেইজন্যই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

সপ্তম অধ্যায়

বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও চৈতন্যদেব

চৈতন্যদেব শেষ কয় বৎসর প্রায় বাহ্যজ্ঞানতিরোহিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যেটুকু চেতন থাকিতেন, তাহাও রায় রামানন্দ স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি ভক্তদের প্রেমভক্তিবিষয়ক পাঠ ও গানে মত্ত হইয়া থাকিতেন। এইজন্য কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যদেবের সম্প্রদায় গড়িবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কথা বিচার করিলে তাহাই মনে হয়।

এই মত মহাপ্রভু রাত্রিদিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥
একদিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥

স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

সুতরাং শেষ জীবনে সম্প্রদায় স্থাপন ও দল সম্প্রসারণ সম্বন্ধে ভাবিবার মতো মনের অবস্থা চৈতন্যদেবের ছিল না, তাহা সত্য বটে। কিন্তু তিনি কোনদিন বৈষ্ণবসম্প্রদায় স্থাপন ও বিবর্ধনের কথা চিন্তা করেন নাই, একথা ঠিক নহে।[১]

[১] কেহ কেহ মনে করেন চৈতন্যদেব কখনও সম্প্রদায় স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন নাই। তাঁহার চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তগণ আপনা-আপনি তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়াছিল, এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়িয়া ওঠে। "Although Chaitanya possessed great qualities of leadership and extra-ordinary power over minds of men, he did not any time of his career concern himself directly with the organisation of his followers. Absorbed in his devotional ecstasies, he hardly ever sought to build up a cult or a sect." —*Vaisnava Faith & Movement* (Dr. De) p. 77.

বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিবার জন্য চৈতন্যদেব পূর্বেই লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ মিশ্রকে ব্রজমণ্ডলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ তাঁহার উপদেশেই বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবতত্ত্ব, আচার ও রসশাস্ত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কারণ, চৈতন্যদেব জানিতেন, সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শুধু স্মরণকীর্তনই যথেষ্ট নহে, তাহার জন্য শাস্ত্রসংহিতা, আচার-দর্শন, দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি সনাতন ও রূপকে এই গুরুতর কার্যের ভার দিয়াছিলেন। তেমনি আবার অদ্বৈত-নিত্যানন্দকে বাঙলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের নির্দেশ দিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্মকে গণধর্মে রূপান্তরিত করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার সঙ্গে নীলাচলে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অবধূতকে বাঙলাদেশেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—কারণ, তিনি জানিতেন চৈতন্যহীন বাঙলায় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও আদর্শকে সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করার নেতৃত্ব ও যোগ্যতা একমাত্র নিত্যানন্দেরই ছিল। আরও নানা স্থলে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যথাযোগ্য ব্যক্তিকে উচিত ভার দিয়াছিলেন। কাজেই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি কিছুই চিন্তা করেন নাই, সেরূপ মনোভাবই তাঁহার ছিল না—একথা পুরাপুরি সত্য নহে। তবে শেষ কয় বৎসর তিনি মর্ত্যজগতের কোন কিছু সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেন না, দিব্যানন্দে মাতাল হইয়া থাকিতেন। তবু নীলাচলে গৌড়ীয় ভক্তগণ বৎসরে একবার করিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতেন। বৃন্দাবন হইতেও সংবাদাদি আসিত। ফলে, তিনি নীলাচলে অবস্থান করিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অনাথ হইয়া যায় নাই, প্রেমধর্ম প্রচারেও বাধা ঘটে নাই। চৈতন্যের জীবৎকালেই নিত্যানন্দ পশ্চিম-বঙ্গে ইতর-ভদ্র সকলের মধ্যেই কৃষ্ণ-নাম, চৈতন্যলীলা এবং বৈষ্ণব মতাদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং চৈতন্য-দেব কোনদিনই সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তা করেন নাই—একথা সত্য নহে।[২]

চৈতন্য-অবতারবাদ ॥

চৈতন্যদেব প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নবদ্বীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার

---

[২] চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য—১৫শ পরিঃ) কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন যে, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ নিভৃতে বসিয়া গৌড়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার সম্বন্ধে যুক্তি করিয়াছিলেন এবং চৈতন্য নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেমধর্ম প্রচারের ভার দিয়াছিলেন।

জন্মের পূর্ব হইতেই এই অঞ্চলে মুষ্টিমেয় ভক্তসম্প্রদায় মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রধান ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। অদ্বৈতের নিবাস শান্তিপুরে হইলেও টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইয়া নবদ্বীপেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিত। তাঁহার টোলে চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ অধ্যয়ন করিতেন। অদ্বৈত মূলতঃ বৈদান্তিক পন্থী হইলেও ভক্তিরসেও তাঁহার তুল্য অধিকার ছিল। তখন নবদ্বীপে—পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত হিন্দুসমাজেই ভক্তিধর্মের অবনতি হইয়াছিল। নব্য-ন্যায়, তন্ত্র ও স্মৃতিসংহিতা চর্চায় অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তদের মনে শান্তি ছিল না। অদ্বৈত মনে মনে কামনা করিতেন :

কৃষ্ণশূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায় বড় দুখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥

অদ্বৈতপ্রভু এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইতেছিলেন—ভক্তদের মতে তাঁহার আকুল প্রার্থনায় কৃষ্ণ কলিযুগে চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন। বৃন্দাবনদাস তাই বলিয়াছেন, "অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার"। চৈতন্যাবতার সম্বন্ধে বৃন্দাবনের অভিমতটি উল্লেখযোগ্য :

সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায় করেন বিজ্ঞাপনে॥
তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
কলিযুগ ধর্ম হয় হরিসঙ্কীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥
তবে সে অদ্বৈতসিংহ আমার বড়াই।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাঙ হেথাই॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্বজীব উদ্ধারিয়া॥ (চৈতন্যভাগবত)

কলিযুগে হরিসঙ্কীর্তনের দ্বারা জীবের মুক্তির জন্য "সব প্রকাশিলেন, চৈতন্য-নারায়ণ"। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস দেখাইয়াছেন যে, চৈতন্যদেব

নবদ্বীপেই মাঝে মাঝে কৃষ্ণাবেশে তদেকাত্ম হইয়া সেইরূপ আচরণ করিতেন। ইতিপূর্বে তিনি গয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল। লোকে ইহাকে বায়ুরোগ বলিলেও বিচক্ষণ শ্রীবাস ঠিক বুঝিয়াছিলেন যে, নিমাই পণ্ডিতের নির্মোক এইবার খসিয়া পড়িতেছে এবং তাঁহার অন্তরে পরম ভক্তের আবির্ভাব হইতেছে। নবদ্বীপের ভক্তগণ তখনই তাঁহাকে কৃষ্ণাবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত ও শ্রীবাসের ব্যাকুলতাই ক্ষীরোদশয্যাশায়ী বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে; তিনি জীব উদ্ধারের জন্য পুনরায় কলিযুগে শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীবাস নৃসিংহাবতারের পূজা করিতেন। একদিন নিশীথে যখন তিনি ধ্যানে নিবিষ্ট, তখন নিমাই-পণ্ডিত ঈশ্বরাবেশে মত্ত সিংহের মতো গর্জন করিতে করিতে শ্রীবাসের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন:

> কাহারে পূজিস করিস কার ধেয়ান।
> যাহারে পূজিস্ তারে দেখ বিদ্যমান॥
> ... ...
> তোর উচ্চ সঙ্কীর্তনে নাড়ার* হুঙ্কারে।
> ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্বপরিবারে॥
> ... ...
> সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
> তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥ (চৈতন্যভাগবত)

ইহার পর শ্রীবাসের চৈতন্যাবতার সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইল। মুরারি গুপ্তও মহাপ্রভুর বরাহ-অবতার দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইলেও অভ্যাসবশে বোধহয় অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণরূপে ছাড়িতে পারেন নাই। তাই তিনি একদা চৈতন্যের অগোচরে শান্তিপুরে বসিয়া ছাত্রদিগকে দ্বৈতবাদের স্থলে অদ্বৈতবাদ এবং ভক্তির স্থলে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব শিখাইতেছিলেন। চৈতন্য শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া এই ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্যকে (তখন আচার্যের

---

* অদ্বৈতকে মহাপ্রভু সস্নেহে 'নাড়া' (ন্যাড়া?) বলিতেন—যদিও অদ্বৈত চৈতন্যদেব অপেক্ষা অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল।

বয়স অন্ততঃ পঁচাত্তর) শারীরিক নিগ্রহ করিলেন এবং ক্ষুব্ধ গর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন :

শুতিয়া আছিনু ক্ষীর সাগরের মাঝে।
আরে নাড়া নিদ্রাভঙ্গে মোর তোর কাজে॥
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস 'জ্ঞান' 'ভক্তি' লুকাইয়া॥
যদি লুকাইবি ভক্তি—তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে॥

তারপর আবিষ্টাবস্থায় মহাপ্রভু ঘোষণা করিলেন—তিনিই কংসনিধনকারী, তিনিই বারাণসী দাহন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্রেই মহাবল রাবণ নিহত হইয়াছিল, তিনিই বামহাতে গিরিগোবর্ধন ধারণ কবিয়াছিলেন, তিনিই বলিকে ছলিয়াছিলেন, হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়াছিলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, চৈতন্য দিব্যাবেশে কিন্তু কোথাও বৃন্দাবনলীলা, রাধা বা গোপীবিলাসের উল্লেখমাত্র করেন নাই। চৈতন্য যতদিন নবদ্বীপে ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে বৃন্দাবনের গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণাবতাররূপে না দেখিয়া ধর্মসংস্থাপনে অবতীর্ণ ভূভার-হরণকারী বিষ্ণুর অবতার রূপেই গ্রহণ করা হইয়াছিল।

চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে বাস করিতেছিলেন, তখনও গৌড়ীয় ভক্তগণ, বিশেষতঃ অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি তাঁহাকে কৃষ্ণাবতাররূপে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন। নীলাচলে তাঁহাকে পরম ভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করা হইলেও তখনও প্রকাশ্যে তাঁহাকে কৃষ্ণাবতাব বলা হয় নাই। অদ্বৈত ও শ্রীবাস প্রকাশ্যে মহাপ্রভুকে কৃষ্ণাবতাররূপে ঘোষণা করিলেন। অদ্বৈত বলিলেন :

শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায়॥
আজি আর কোনো অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব অবতারময়—চৈতন্য গোঁসাই॥
যে প্রভু করিল সর্বজগত উদ্ধার।
আমা সব লাগি যে প্রভুর অবতার॥

অদ্বৈতপ্রভু সেই কৃষ্ণাবতার শচীনন্দনের কীর্তন গাহিতে শুরু করিলেন। এই ব্যাপারে চৈতন্যদেব অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কৃষ্ণকীর্তন ছাড়িয়া চৈতন্য-

কীর্তনে তাঁহার লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা ছিল না। কিন্তু শ্রীবাস বলিলেন, করতলে কি সূর্যকে আচ্ছাদন করা যায়? সূর্য যে স্বপ্রকাশ। মহাপ্রভু আর কতদিন নিজ স্বরূপকে অপ্রকট করিয়া রাখিবেন? তাহার পর—

নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান ॥
... ...
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁহার কৃপায় হৈল সর্বলোক ধন্য ॥
জয় দীনবৎসল জগত হিতকারী।
জয় জয় পরম সন্ন্যাসিরূপধারী ॥

গৌড়ীয় ভক্তদের এই জয়ধ্বনির মধ্যে একথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, অংশী কৃষ্ণের অংশাবতার শ্রীচৈতন্য জীব-উদ্ধার করিবার জন্য নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত চৈতন্যের জীবৎকালে গৌড়ীয় ভক্তগণ বিশ্বাস করিতেন—এবং তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সানুচর সপারিষদ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; চৈতন্যের 'গণ'-দের মধ্যে কে কাহার অবতার তাহা লইয়াও নানা জল্পনা প্রচারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণের সখা-সখীগণ

কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে।
কেহো রাঢ়ে ওড্র দেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে ॥

এই অবতার-তত্ত্বকথা কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামক সংস্কৃত কাব্য, বিশেষতঃ 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'য় কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপরিকরগণ কলিযুগে কে কোন কোন্ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। এই মতে নিত্যানন্দ বলরামের, অদ্বৈত শিবের এবং শ্রীবাস নারদের অবতার। গদাধর রাধার অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের সখীগণ চৈতন্যের কোন্ কোন্ পরিকরের রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হইলেন, তাহাও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন—রূপ গোস্বামী—রূপমঞ্জরী, সনাতন—লাবণ্যমঞ্জরী, রঘুনাথ দাস—রতিমঞ্জরী, গোপাল ভট্ট—গুণমঞ্জরী, জীব গোস্বামী—বিলাস-মঞ্জরী, রঘুনাথ ভট্ট—রসমঞ্জরী[৪]।

---

[৪] অষ্টম অধ্যায়ে চৈতন্যজীবনকাব্য প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূরের গ্রন্থপরিচয়ে 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'য় বর্ণিত অবতারতত্ত্বের তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

পরবর্তী কালে শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবসম্প্রদায়, বিশেষতঃ নরহরি সরকার ও শিবানন্দ সেনের প্রভাবে যে গৌরনাগরভাবের সাধনা কিছুকাল গৌড়ে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় এবং এই সমস্ত বিচিত্র 'অবতার' তত্ত্বে। অদ্বৈত প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তগণ চৈতন্যকে কৃষ্ণাবতাররূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু নীলাচলে চলিয়া যাইবার পর তাঁহার অদর্শনে ভক্তগণের মধ্যে যে ব্যাকুলতা দেখা দেয়, মূলতঃ তাহা হইতেই কৃষ্ণাবতারের সঙ্গে রাধাতত্ত্বও খানিকটা প্রবেশ করিয়া যায়।

গৌরপারম্যবাদ ও গৌরনাগরবাদ ॥

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যের তিরোধানের অল্পকাল পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় খুব সম্ভব নানা উপদলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। অদ্বৈত, গদাধর, নিত্যানন্দ—ইঁহাদের ভক্তসম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে উপদলে পরিণত হইয়াছিল। কবিকর্ণপূর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' যে "পঞ্চতত্ত্বে"র কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ স্বরূপ-দামোদর পরিকল্পিত।[৫] বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্ব নামে পরিচিত—(১) চৈতন্যদেব, (২) নিত্যানন্দ, (৩) অদ্বৈত, (৪) শ্রীবাস, (৫) গদাধর।[৬] লোচনদাস তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গলে' শ্রীবাসের স্থলে নিজের গুরু নরহরি সরকারের নামটি বসাইয়া দিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর (পরমানন্দ সেন), লোচন, জয়ানন্দ

---

৫ কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা', শ্লোক-১৭

৬ কবিকর্ণপূর প্রদত্ত বিবরণ—

> ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ।
> ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।
> ভক্তাবতার আচার্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ।
> ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ।
> ভক্তশক্তির্দ্বিজাগ্রণ্যঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ।। (শ্লোক—১১শ)

অনুবাদ: যিনি নন্দনন্দন তিনিই ভক্তরূপে গৌরচন্দ্র, যিনি বৃন্দাবনে হলধর, তিনি ভক্তরূপে নিত্যানন্দ, যিনি শ্রীসদাশিব, তিনিই ভক্তাবতার রূপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীনিবাস প্রভৃতি যত ভক্ত, তাঁহারাই ভক্তরূপ এবং দ্বিজাগ্রগণ্য গদাধর পণ্ডিত ভক্তশক্তিরূপ।

এবং যাঁহারা চৈতন্যবিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শ্রীখণ্ড প্রভৃতি নানা অঞ্চল হইতে আসিলেও নবদ্বীপকেই কেন্দ্র করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাদিগকে আমরা নবদ্বীপ-সম্প্রদায় বলিয়া থাকি। বৃন্দাবনদাস কিয়দংশে ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অবশ্য বৃন্দাবন চৈতন্যের নাগরভাব স্বীকার করিতেন না[7]; এই নাগরভাগ চৈতন্য-তিরোধানের পর নবদ্বীপের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, চৈতন্য-তিরোধানের অল্প পরে বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনেকগুলি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি মতের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন: (১) নবদ্বীপ-গৌড়সম্প্রদায় (মুরারি, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদকারগণ); (২) বৃন্দাবনের সম্প্রদায় (রূপ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম, শ্রীনিবাস)। এই দুই দলের মধ্যে তত্ত্ব লইয়া অল্পবিস্তর মতভেদ হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও গদাধরের অনুচর ও ভক্তশিষ্যগণ উপসম্প্রদায়ের মতোই আচরণ করিতেন। তন্মধ্যে 'গৌরনাগরবাদী'দের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরহরি সরকার, লোচনদাস এবং আরও কতিপয় পদকর্তা এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের মুরারি গুপ্ত ও শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম 'গৌরপারম্যবাদ' সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[8] এই মতে কৃষ্ণকে উহ্য করিয়া গৌরাঙ্গকেই পরম তত্ত্বরূপে ('Ultimate Reality') গ্রহণ করা হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস প্রকৃতপক্ষে গৌরপারম্যবাদী ছিলেন না। কারণ, তাঁহার মতে চৈতন্য কৃষ্ণের অংশাবতার। কৃষ্ণ অংশী, চৈতন্য অংশ। বৃন্দাবনদাস 'গৌরনাগরভাব'-এরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। ব্রজধামের গোস্বামীরা 'গৌরপারম্যবাদ' বা 'গৌরনাগরভাব'—কোনটারই ধার ধারিতেন না। তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—অবশ্য শচীনন্দনকেও তাঁহারা হৃদয়কন্দরে ভক্তি করিতেন।

'স্ত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা—বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গনাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥ (চৈতন্যভাগবত, আদি-১৩)

৮ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—চৈতন্যচরিতের উপাদান, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৬৭

গৌরপারম্যবাদিগণ চৈতন্যদেবকে শুধু পরমতত্ত্ব বলিয়াই গ্রহণ করেন নাই, গোপালমন্ত্র ছাড়িয়া গৌরমন্ত্রকে কৌলিক আচার হিসাবে মান্য করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা আজও সেই আদর্শ চালাইয়া আসিতেছেন। মুরারি গুপ্ত কিরূপ 'গোঁড়া' গৌরপারম্য-বাদী ছিলেন তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কবিকর্ণপূর তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একবার মুরারি অদ্বৈতের সঙ্গে পুরীধামে আসিয়াছিলেন। ভক্তগণ সর্বাগ্রে জগন্নাথ দর্শনে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু মুরারি নরেন্দ্রসরোবর পর্যন্ত গিয়া বলিলেন যে, তিনি আর চলিতে পারিতেছেন না, জগন্নাথ-মন্দিরে যাইতেও অপারগ। তিনি পথিমধ্যে সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। ভক্তগণ জগন্নাথ-মন্দিরে গেলে মুরারি উঠিয়া গিয়া জগন্নাথ দর্শনের পূর্বেই মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন। এখানে লক্ষণীয় মুরারি যে-কোন কারণেই হোক সর্বাগ্রে জগন্নাথ দর্শন করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যাইতেছে, একদা রায় রামানন্দ জগন্নাথ দর্শনের পূর্বেই চৈতন্যকে দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে চৈতন্যদেব ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন :

রায় তুমি কি কর্ম করিলে।
ঈশ্বর না দেখি আসে এথা কেনে আইলে।।

রায় বলিলেন যে, তাঁহার প্রাণমন তাঁহাকে যেখানে টানিয়া আনিয়াছে, তিনি সর্বাগ্রে সেখানেই আসিয়াছেন :

আমি কি করিব মন ইহা লৈয়া আইল।
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈল।।

মহাপ্রভুর নির্দেশে রায় অতঃপর জগন্নাথ দর্শনে গেলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শুধু গৌড়-নবদ্বীপে নহে, নীলাচলেও কোন কোন ভক্ত চৈতন্যকে প্রকারান্তরে জগন্নাথ বিগ্রহের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। এই গৌরপারম্যবাদিগণ চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার কিশোরমূর্তিটির অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। ইঁহারা নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গকে পূর্ণতম, গয়াপ্রত্যাগত স্ব-ভাবাবেশমুগ্ধ গৌরাঙ্গকে পূর্ণতর এবং সন্ন্যাসিবেশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে পূর্ণ মনে করিতেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ চৈতন্যকে পরমতত্ত্বলাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন, গৌর-পারম্যবাদিগণ চৈতন্যকেই উপেয় বলিয়া মনে করিতেন।

স্পষ্টতঃ কিছু নির্দেশ করা না গেলেও অনুমান হয়, এই গৌরপারম্যবাদিগণ আরও ব্যক্তিগতভাবে যখন চৈতন্যকে কৃষ্ণনাগরভাবে এবং নিজেদের ব্রজমণ্ডলের গোপী বা নাগরীভাবে কল্পনা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা গৌরনাগর ভাবের পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কাশীর ভক্ত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে' "গৌরবরনাগর"-এর বন্দনা আছে :

কোঽয়ং পট্টধটি-বিরাজিত কটিদেশঃ করে কঙ্কণং
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎ পদে নূপুরম্।
ঊর্ধ্বীকৃত্য নিবদ্ধ কুন্তলভর-প্রোৎফুল্লমল্লীস্রগা-
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈনামাভিঃ ॥

(যিনি কটিদেশে পট্টবস্ত্র, করে কঙ্কণ, বক্ষস্থলে হার, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, ঊর্ধ্বীকৃত নিবদ্ধ কেশসমূহে প্রফুল্ল মল্লিকা মালা ধারণ করিয়াছেন, সেই কোন নাগরবর শ্রীগৌরহরি নিজ নামকীর্তন সহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন।)[৯]

এই নাগরভাবের কথা কাশীতেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যভক্ত প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্পষ্টতঃই গৌরনাগর সাধনার কথা উল্লেখ করিয়াছে।[১০] তবে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারই সকল নাটের গুরু। প্রধানতঃ তিনি এবং তাহার শিষ্য লোচনদাস গৌরনাগরভাবের অনেকগুলি আদিরসাত্মক পদ লিখিয়াছিলেন—যাহাতে চৈতন্যদেবকে পুরাপুরি শৃঙ্গাররসের নায়ক বানাইয়া তোলা হইয়াছে। ভাগবতে কৃষ্ণ যেমন গোপীদের লইয়া লীলা করিতেন,

৯ অনুবাদ—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

১০ প্রবোধানন্দ মনে করিতেন যে, চৈতন্যকৃপা লাভ না করিলে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যাইবে না। 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে' তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :

ভ্রাতঃ কীর্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দাম-নামাবলীং
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্মঙ্গলং।
হন্ত ! প্রেম-মহারসোজ্জ্বল-পদে নাশাপি-তে সম্ভবেৎ
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্যদি কৃপাদৃষ্টিং পতেন্ন ত্বয়ি ॥

অনু : হে ভ্রাতঃ, তুমি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অমিত প্রভাবশালী নামাবলী উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনই কর, অথবা তাঁহার ভুবনমঙ্গল পরম মধুর রূপ চিন্তাই কর, কিন্তু যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, তাহা হইলে সেই মহোজ্জ্বল রসময় ব্রজপ্রেম লাভের নিমিত্ত তোমার আশা পূর্ণ হাওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে।

এই সমস্ত গৌরাঙ্গবিষয়ক গানেও সেইরূপ চৈতন্যকে নাগরভাবে দেখিয়া এবং ভক্তগণ আপনাদিগকে গোপী মনে করিয়া বৃন্দাবনী আদিরসে মত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি নবদ্বীপের যুবতীরাও চৈতন্যপ্রেমে ডগমগ—অনেক পদে এরূপ বর্ণনাও আছে। লোচনদাস মাত্রা ছাড়াইয়া কটু আদিরসের ভিয়ান চড়াইয়া শৃঙ্গার-উদ্বোধক ঢামালির চটুল ছন্দে নদীয়া-নাগরীগণের গৌরাঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ দু' একটি পদের কয়েক ছত্র উল্লিখিত হইতেছে :

১। আর শুনেছ আলো সই গোরাভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গৌরী বসিল যতনে।
হলুদবরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপ মনপ্রাণ টানে।
ছন্‌ছনানি মনে লো সই ছটফটানি প্রাণে॥ (গৌরপদতরঙ্গিণী, পদ-৬৬)

২। এক নাগরী বলে দিদি নাইতে যখন যাই।
ঘোমটা খুলে বদন তুলে দেখেছিলেম ভাই॥
রূপ দেখে চমকে উঠে ঘরকে এলাম ধেয়ে।
দুটি নয়ন বাঁধা রইল গৌরপানে চেয়ে॥ (গৌরপদ. পদ—৭০)

৩। দুটি আঁখি ছলছলায়ে এক নাগরী বলে।
গৌরদেহের কিবা জানি, রসে অঙ্গ ঢলে॥
অনেক দিনের সাধ ছিল মোর অধররস পিতে।
মনের দুখে ভাবনা করে শুয়েছিলেম রেতে॥
যখন আমি মাঝনিশিতে ঘুমে হয়েছি ভোরা।
তখন আমি দেখছি যেন বুকের ওপর গোরা॥
নবকিশোর গা খানি তার কাঁচা ননী হেন।
ভুজলতায় বেঁধে কথা কয় ছেড়ে দিব কেন॥
... ...
হায় হায় হায় বলি উঠলাম চমকিয়ে।
হায়রে বিধি রসের নিধি নিলি কেন দিয়ে॥
প্রাণ ছন্ ছন্ করে আমার মন ছন্ ছন্ করে।
আধ কপালে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে॥ (গৌরপদ. পদ—৭৩)

লোচনের গুরু নরহরি সরকার একটি পদে (গৌরপদতরঙ্গিণী, পদ—১০০) অতি কদর্য চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গকে দেখিয়া নবদ্বীপের কোন এক পরিবারের শাশুড়ী, ননদী ও বধূ রসাবেশে বিবস্ত্রা হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা

শুধু কুরুচিপূর্ণ নহে, ইহাকে অতি জঘন্য 'বৈষ্ণব-অপরাধ' বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তাঁহার কোন কোন পদে (পদ—১০৫) আছে, পাছে বহুড়ীগণ চৈতন্যের জন্য পাগল হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহার ভয়ে নাকি কোন কোন শ্বশুর শিবের আরাধনা করিতেন। কিন্তু খোলের শব্দ শুনিলেই বধূগণের মন আনচান করিত। শ্বশুর টের পাইয়া বাহিরের দুয়ারে আগল তুলিয়া দিলেন। নরহরি বধূদিগকে সাহস দিয়া পলাইবার পথ বাতলাইয়া দিতেছেন—"নরহরি কহে, খিড়কীর পথে যাইতে কে করে মানা?" বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন এবং শ্রীখণ্ডের অন্যান্য ভক্তগণ চৈতন্যপ্রসঙ্গে—সকলেই এই উদ্দাম, আপত্তিকর, আবিল আদিরস আকণ্ঠ পান করিয়াছেন এবং ভক্তসমাজে বিলাইয়াছেন। এই আদিরসের অশুচি উদ্দামতা এক শতাব্দী পরে বৈষ্ণব সহজিয়াদের পদে উৎকট তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছিল। যাঁহারা এই সমস্ত অপদার্থ পদকেও উচ্চতর ভক্তির ব্যাপার বলিয়া সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করিতে উন্মুখ, তাঁহাদের ভক্তি বিস্ময়কর, কিন্তু রসবোধ বা রুচিবোধ—কোনটারই প্রশংসা করিতে পারা যায় না। এমন কি আধুনিক কালেও কোন কোন ভক্ত এই সমস্ত আদিরসাত্মক পদের মধ্যে বাস্তব সত্য আবিষ্কার করিতে গিয়াছেন। এইরূপ একটা কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। রাজীব-লোচন দাস নামক এক নিষ্ঠাবান আধুনিক গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব 'গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় (৬ষ্ঠ সংখ্যা) এই বিষয়ে বলিয়াছেন :

"রূপের আকর্ষণ, অতি সাহজিক, অতি বিষম। বিশেষতঃ রমণীগণ স্বতই রূপমুগ্ধ হয়। স্বরূপে রমণীর মন কেবল ভুলে না, ভুলিয়া মজে, মজিয়া রূপবানকে ভজিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ইহা প্রামাণিক খাঁটি সত্য। এ অবস্থায় রূপাভিলাষিণী সৌন্দর্যপ্রিয়া নদীয়া নাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে আকৃষ্টা না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না।... ...রূপমাধুরী অজ্ঞাতসারে নয়ন টানে—মন হরিয়া লয়। নাগরী-চকোরী গৌরচন্দ্র-সুধা পানে গৌরগতপ্রাণা, ঘাটে আসা যাওয়া ব্যাপদেশে গৌরের দর্শন সুলভ হইলেও তাহা এখন তাঁহাদের নিত্যকার্য মধ্যে গণ্য। গৌরাঙ্গ না দেখিলে নাগরীদের মন ছটফট করে, আনচান করে; এমন কি তাঁহারা সোয়াস্তি পান না।"[১১]

---

[১১] বর্তমানকালেও যাঁহারা নরহরি ও লোচনের নাগরীভাবের পদের মধ্যে যুক্তি আবিষ্কার করিতে যান তাঁহাদিগকে কী-ই বা বলা যাইতে পারে! ইঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ১৬শ শতাব্দীর নবদ্বীপ ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত বৃন্দাবন নহে। নবদ্বীপেও একটা সমাজ ছিল, এবং সর্বোপরি চৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপের ভিতরে ও বাহিরে 'পাষণ্ডী'রা ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। গৌরাঙ্গকে ঘেরিয়া নদীয়া-নাগরীগণ এইরূপ রসোদ্গার করিলে, শুধু শ্বশুরগণ নহে, গ্রামবৃদ্ধগণ পর্যন্ত লগুড় লইয়া খেদাইয়া যাইত।

বাঙলাদেশ চিরকাল আবেগবাদী ; বৈষ্ণবধর্মে বীর্য-পৌরুষ অপেক্ষা আবেগের প্রাধান্য ছিল বেশী ; কাজেই ফেনিল আবেগ স্বতঃই আদিরসের নালা বাহিয়া চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ ও মহৎ আদর্শকে এমনি করিয়া বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। আধুনিক কালেও যে এই সমস্ত পৌরুষনাশী, হানিকর ও দুর্নীতিপূর্ণ কৃত্যের প্রতি কাহারও কাহারও শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আছে—ইহাই আশ্চর্য !

বৃন্দাবনে চৈতন্যবাদ ॥

বৃন্দাবনের গোস্বামীসম্প্রদায় চৈতন্যদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত হইলেও কৃষ্ণকেই তাঁহারা পরম তত্ত্ব বা উপেয় ('Ultimate Reality') বলিয়াছেন। স্মৃতি, ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শন হইতে তাঁহারা এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু চৈতন্যদেবকে অবতার না বলিয়া পরম দৈবত বলিয়াছেন। ইঁহারা কাব্য, রসশাস্ত্র ও ভক্তিদর্শনে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলাকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, চৈতন্যলীলাকে তাঁহারা তত্ত্বব্যাখ্যায় স্থান দেন নাই। অবশ্য ষড়-গোস্বামীদের কেহ কেহ চৈতন্যকে কৃষ্ণাবতার, কখনও বা স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়াও বন্দনা করিয়াছেন। রূপ গোস্বামীর 'স্তবমালা'র অন্তর্ভুক্ত 'চৈতন্যাষ্টকে' বলা হইয়াছে যে, শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারাও চৈতন্যের পূজা করেন। এই অংশে রূপ গোস্বামী চৈতন্য ও কৃষ্ণকে প্রায় মিলাইয়া দিয়াছেন। সেখানে চৈতন্যদেবকে 'উজ্জ্বল গৌরবর্ণধারী কৃষ্ণ' (অকৃষ্ণাঙ্গঃ) বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অষ্টকের সপ্তম স্তবকে চৈতন্যের সন্ন্যাসিবেশের গুণকীর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয় ভক্তগণ চৈতন্যের যৌবনমূর্তির অধিকতর প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহারা যে চৈতন্যকে "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং" বলিয়া বন্দনা করিয়া তাঁহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা এই 'অষ্টকে' নির্দিষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণ গোপীপ্রেমের অনুরাগ উপলব্ধির জন্য এবং গোপীদের প্রতি তাঁহার নিজের অনুরাগের গাঢ়তা বুঝিবার জন্য কৃষ্ণবর্ণ লুকাইয়া শ্রীরাধার গৌরকান্তি গ্রহণ করিয়া একদেহে রাধাকৃষ্ণরূপে শ্রীচৈতন্য নামে অবতীর্ণ হন—এই তত্ত্বটি বাঙলাদেশের ভক্তসমাজেও প্রচলিত ছিল। রূপ ও রঘুনাথ দাসের স্তব-স্তুতিগুলিতে কিন্তু চৈতন্যকে কৃষ্ণরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য ইহাও দেখা যায় যে, চৈতন্য নিজে শেষ জীবনে রাধাভাবেই আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, প্রাণেশ কৃষ্ণকে, রাধা ও

গোপীদের আর্তির মতো, আকাঙ্ক্ষা করিতেন, স্মরণ-মনন কবিতেন। তাঁহার মধ্যে রাধাভাবের আবেগ দেখিয়া রায় রামানন্দ প্রভৃতি শৃঙ্গাররসের ভক্তগণ তাঁহাকে রাধা বলিয়াই কল্পনা করিয়াছিলেন—তদানীন্তন পদাবলীতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যাইবে। /

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ স্তব-স্তুতি ও স্তোত্রে চৈতন্যের ভগবত্তা স্বীকার করিয়াছেন, গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নানা তত্ত্ব, দর্শনগ্রন্থ, ভক্তিশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও প্রচার করিয়াছেন, চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এই সমস্ত গ্রন্থে সেরূপ কিছুই করেন নাই। এমন কি জীব গোস্বামীর মতো পণ্ডিত, রসিক ও তাত্ত্বিক তাঁহার ষট্সন্দর্ভে চৈতন্যতত্ত্ব ও চৈতন্য-কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে একেবারে নির্বাক। রূপ ও সনাতন নানা গ্রন্থে অবতার সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করিলেও চৈতন্যাবতার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কেবল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঈষৎ পরবর্তী কালে 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' সবিস্তারে চৈতন্যতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। বৃন্দাবনের গোস্বামি-গণ চৈতন্যদেবকে বিশেষ ভক্তি করিতেন, তাঁহার কৃপাতেই তাঁহারা ভক্তি-পথের পথিক হইয়াছিলেন ; কিন্তু রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যায় তাঁহারা চৈতন্যদেবকে বাদ দিয়া চলিয়াছেন। রূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে চৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়াও নাই—যদিও তিনি অগ্রজ এবং গুরু সনাতনের বন্দনা করিয়াছেন। অবশ্য 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র একটি শ্লোকে তিনি "তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্য-দেবস্য" বলিয়া চৈতন্য ও কৃষ্ণকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।[১২] আমাদের

[১২] অবশ্য রূপ-সনাতন কখনও কখনও চৈতন্য ও কৃষ্ণকে অভিন্ন বলিয়াই ভক্তি নিবেদন করিয়াছিলেন। 'বিদগ্ধমাধবে' রূপ গোস্বামী 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' প্রভৃতি শ্লোকে চৈতন্যকে "হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্বসংদীপিতঃ" বলিয়াছেন। কৃষ্ণই যে কলিযুগে জীবের প্রতি করুণাবশে (করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ") চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—রূপ গোস্বামী এই শ্লোকে স্পষ্টই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সনাতন 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে'র তৃতীয় নমস্ক্রিয়া শ্লোকে বলিয়াছেন :

স্ব-দয়িত-নিজ ভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥

[অনুঃ যতির বেশে যে হরি কনকবর্ণ ও কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি নিজ মধুর অনুভূতির দ্বারা তাঁহার প্রতি উদ্দিষ্ট প্রিয়াগণের অনুভূতি উপভোগ করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন সেই উপলব্ধির লোভে ভক্তের বেশে আবির্ভূত হইয়াছেন।]

মনে হয়, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ ব্যক্তিগত অনুভূতি ও দার্শনিক মননকে দুই ভাগে স্পষ্টতঃ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা আবেগ-আর্তির বশে চৈতন্যপ্রভুকে কোন কোন সময়ে কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিলেও দর্শন, ভক্তি-শাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র আলোচনায় সুকঠিন তত্ত্বদৃষ্টির দ্বারা চালিত হইয়াছেন এবং সেখানে চৈতন্যতত্ত্বের কোন উল্লেখ করেন নাই। জীব গোস্বামী 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' লিখিয়াছিলেন, কিন্তু 'চৈতন্যসন্দর্ভ' রচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সে যাহা হোক, বৃন্দাবনেও চৈতন্যের রাধাভাবকান্তি অঙ্গীকারের কথা প্রচলিত ছিল,—যদিও গোস্বামী-প্রভুরা এ বিষয়ে বিশেষ কোন তত্ত্বের উত্থাপন বা ব্যাখ্যা করেন নাই। চৈতন্য যদি কৃষ্ণাবতারই হন, তাহা হইলে গৌরকান্তি কেন? গৌড়ে এইজন্য রাধাভাবের এত প্রাধান্য সত্ত্বেও তাঁহাকে 'গৌরহরি' বলা হইয়াছে—অর্থাৎ কালো কৃষ্ণই গৌরবর্ণ হইয়া চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন—এইরূপ বিশ্বাস নবদ্বীপ, নীলাচল ও বৃন্দাবনেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখনও এই ব্যাপার লইয়া কোন তত্ত্বদর্শন গড়িয়া ওঠে নাই। মহাপ্রভুর এই দ্বৈত রূপ কৃষ্ণদাস কবিরাজই তাত্ত্বিকের দৃষ্টি লইয়া সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু স্বয়ং ভগবান"। 'স্বয়ং ভগবান' শব্দযুগল ইতিপূর্বে শুধু কৃষ্ণেই আরোপ করা হইত। কিন্তু কৃষ্ণদাসের সময়ে কৃষ্ণ ও চৈতন্যে ভেদ রহিল না। এমন কি, চৈতন্যের জীবদ্দশাতেই তাঁহার মূর্তি গড়াইয়া পূজার ব্যবস্থা করা হইল। নরহরি সরকার ও বংশীদাস চৈতন্যের মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। স্বপ্নাদেশের ফলে বংশীদাস কাষ্ঠের মূর্তি নিজে নির্মাণ করিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। শুনা যায় রাজা প্রতাপরুদ্র নাকি চৈতন্যের সুবৃহৎ মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।[১৩] মুরারি গুপ্তের কড়চায় আছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চৈতন্যদেবের বিগ্রহ পূজা করিতেন অম্বুয়া-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতও গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া আরাধনা করিতেন। সুতরাং চৈতন্যের জীবৎকালে বা তিরোধানের অল্প পরে বাঙলাদেশের বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁহার দারুময় মূর্তির পূজার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের তত্ত্বকথা অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ ও চৈতন্য

---

১৩ Dr. S. K. De. *Vaishnava Faith & Movement*, p. 333

দেবের মূলে স্বরূপগত একটা পার্থক্য আছে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ তাঁহাদের শক্তিদের (অর্থাৎ রাধা ও গোপীগণ) সাহচর্যে আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু গোপীগণের আনন্দ তো তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। চৈতন্যদেব কলিযুগে আবির্ভূত হইয়া দুই প্রকার আনন্দরসই ভোগ করিলেন, কারণ কৃষ্ণ ও রাধার দুই সত্তাই শ্রীচৈতন্যে আরোপিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রথমে উল্লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো
যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। .
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ
সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥[১৪]

(অনুঃ শ্রীরাধিকা যে প্রেমদ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, সেই প্রেমের মহিমাই বা কিরূপ, সেই প্রেমদ্বারা শ্রীরাধিকা কর্তৃক আস্বাদিত আমার অদ্ভুত মাধুর্য ও তাহার আস্বাদনই-বা কিরূপ এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধার সুখই-বা কিরূপ—এই তিনটি বিষয়ের লোভ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীশচীগর্ভসমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হইলেন।)

পরিশেষে প্রসঙ্গের উপসংহারে বলা যায় যে, বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্যকে কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য চৈতন্যের মধ্যে দ্বৈত সত্তা আরোপ করিয়াছিলেন। পুরাণে গোপী-কৃষ্ণের নিত্যবৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যের মধ্যে পৌরাণিক কৃষ্ণের অদ্ভুত ভাগবত ঐশ্বর্য ও শক্তি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমাবেগ অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। তাই বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়াছেন এইভাবে : চৈতন্যের বাহিরে রাধার ভাব-অঙ্গীকার, কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণেরই বিকাশ হইয়াছে। পরবর্তী কালে বৃন্দাবন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যপূজা

[১৪] কেহ কেহ বলেন যে, এই শ্লোক স্বরূপ-দামোদরের কড়চার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু স্বরূপ-দামোদরের কড়চার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণদাসের রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রচারিত হইলে চৈতন্যদেব যুগপৎ রাধা ও কৃষ্ণের বিগ্রহরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের গৌরবর্ণ এবং রাধার মতো হৃদয়ের আর্তি পৌরাণিক কৃষ্ণে পাওয়া যাইবে না। তাই ভক্তগণ মীমাংসা করিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব রাধা ও কৃষ্ণের যুগল-অবতার।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্যের অবতারত্ব, অংশী-অংশত্ব এবং রাধাকৃষ্ণের যুগল তত্ত্ব প্রমাণে ব্যস্ত হইলেও বাঙলাদেশের ভক্তগণ তাঁহার যৌবনমূর্তির পূজা-আরাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের লোচনানন্দ আচার্যের 'ভক্তিচন্দ্রিকা' নামক একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি বোধহয় নরহরি সরকারের নির্দেশে এই গ্রন্থে চৈতন্য-উপাসনার কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে মন্ত্রশুদ্ধি, মন্ত্রোদ্ধার, দীক্ষা (তান্ত্রিক দীক্ষা), চৈতন্যস্তোত্র, পুরশ্চরণ, বীজ প্রভৃতি তান্ত্রিক সংস্কারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।[১৫] এমনকি তান্ত্রিক মণ্ডলের মধ্যে কোথায় গদাধর, স্বরূপ, নরহরি, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, মাধবেন্দ্র পুরীর স্থান নির্ণয় করিতে হইবে তাহারও নির্দেশ আছে। জীবৎকালেই চৈতন্য সাধারণের কাছে দেবতারূপে পূজিত হইয়াছিলেন। সাধারণ ভক্ত, দার্শনিক ও তাত্ত্বিকগণ চৈতন্য-তত্ত্বকে বুদ্ধিবিবেচনার সাহায্যে বিচার করিয়া গ্রহণ করিলেও জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার অলোকসামান্য জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গালগল্প প্রচলিত ছিল—ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'ভক্তিচন্দ্রিকা' নামক তান্ত্রিক-বৈষ্ণব গ্রন্থ ঐরূপ একটি লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বৈষ্ণবসমাজে সহজিয়াগণ স্থান পাইবার পর, তাহারাও চৈতন্যকে উগ্র আদিরসাত্মক দেহসংস্কারের দ্বারা নিজেদের গূঢ়পন্থা ও রহস্যময় সাধনভজনের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল—এই ধারা বাউল-সাধনার মধ্য দিয়া লোকচক্ষুর অগোচরে প্রবাহিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন উপসম্প্রদায় চৈতন্যদেবকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইয়া তাঁহাকে কদাচিৎ উপায়—অধিকাংশ স্থলে উপেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। যিশু খ্রীষ্টকে লইয়া মধ্যযুগে যেমন নানা দল-উপদল সৃষ্টি হইয়াছিল, নানা দার্শনিক মত গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইরূপ বৃন্দাবন, নীলাচল ও বাঙলাদেশে বৈষ্ণবভক্ত ও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ

১৫ Dr. S. K. De—*Op. Cit.*, p. 339.

চৈতন্যদেবকে নানাভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছেন এবং এইরূপে বৃহৎ বৈষ্ণব-সমাজে একাধিক দল-উপদলের সৃষ্টি হইয়াছে।[১৬]

চৈতন্যের ভক্ত ও পারিষদবর্গকে কেন্দ্র করিয়াও যে নানা দল-উপদল সৃষ্টি হইয়াছিল, চৈতন্যভাগবতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। গৌর-নাগরবাদী নরহরি-লোচন প্রভৃতি মহাজনদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অদ্বৈত, গদাধর, নিত্যানন্দেরও সে পৃথক ভক্তসম্প্রদায় ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈতের সময়েই বোধহয় কোন কোন অদ্বৈত-ভক্ত চৈতন্যকে ততটা শ্রদ্ধা করিতেন না। অদ্বৈত আচার্য অদ্বৈতবাদ ত্যাগ করিয়া চৈতন্যপন্থানুবর্তী হইলে তাঁহার দুই জন প্রধান শিষ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস দুই স্থলে এইরূপ চৈতন্যভক্ত-প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন :

> এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
> বোলায় 'অদ্বৈতভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া॥

এমন কি

> যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব সিদ্ধি।
> হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি॥

এইরূপ বলিলেই এই সমস্ত অতি-উৎসাহী অদ্বৈতের 'গণ'—

> ইহা বলিতেই আইসে ধাইয়া মারিবারে।

অদ্বৈত যে চৈতন্যের একান্ত ভক্ত, "এ মর্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর"। এখানে বৃন্দাবনদাস অদ্বৈতভক্তদের চৈতন্য-প্রতিকূলতার কথা ইঙ্গিতে করিয়া-ছেন। আর একস্থলে বৃন্দাবন বলিতেছেন যে, গৌরচন্দ্রকে অবহেলা করিয়া যে ব্যক্তি কেবল অদ্বৈতকে ভজনা করে, সে অদ্বৈতের পুত্র হইলেও তাহার রক্ষা নাই :

---

১৬ কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ১১শ-১২শ অধ্যায়ে অদ্বৈত নিত্যানন্দ বীরভদ্র প্রভৃতির আচার্যদের গণ ও শাখার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজের সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার বৈষ্ণবসমাজ নানা উপদলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থই বলিয়াছেন, "১৫৩৩ হইতে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিত্যানন্দের দল, অদ্বৈতের দল, গদাধরের দল, নরহরির দল প্রভৃতিতে অল্পবিস্তর লোক ছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ বৈষ্ণবই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন।" ('ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য', পৃ. ৩১০)

অদ্বৈতেরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তেঁহো গেলা ॥

আরও এক স্থলে আছে :

করয়ে অদ্বৈতসেবা চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে ॥

এই সমস্ত প্রমাণের বলে মনে হয়, অদ্বৈত-শিষ্যগণ (যাহারা হয়তো অদ্বৈত-বেদান্তপন্থী ছিল) অদ্বৈতের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহাকে ভজনপূজন করিয়া চৈতন্যকে অবহেলা করিত।[১৭] বিশেষতঃ চৈতন্যের অনুপস্থিতির পর এবং পরিশেষে তাঁহার তিরোধানের পরে বাঙলাদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের দল-উপদলের মধ্যে নানা তত্ত্ব ও গুরুপ্রাধান্য লইয়া রীতিমত মতভেদ হইয়াছিল। স্বয়ং অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ এবং অন্তেবাসীদের মধ্যে নামপ্রচারের রীতি বোধহয় অনুমোদন করিতেন না। এই সমস্ত কারণে অদ্বৈত-নিত্যানন্দের ভক্তদের মধ্যে কিছু কিছু মতবিরোধ থাকা বিচিত্র নহে। নিত্যানন্দের ভক্তশিষ্য বৃন্দাবনদাস গুরুকে সমর্থন করিতে গিয়া বহু স্থলে নিত্যানন্দ-বিরোধীদের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এই নিন্দকদের মধ্যে 'পাষণ্ডীরা'ই ছিল সর্বাধিক, তেমনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরও কেহ কেহ নিত্যানন্দকে পুরাপুরি সমর্থন করিতেন না। যাহা হোক ব্রজ-বৃন্দাবন ও গৌড়ের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে তত্ত্ব, তথ্য ও আদর্শগত পার্থক্য থাকিলেও কখনও বিরোধিতা ছিল না, রূপ-সনাতন অদ্বৈত-নিত্যানন্দেরও বন্দনা করিয়াছিলেন—যদিও বিস্তারিতভাবে কিছু বলেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে জীব গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিলেও দল-উপদলের মধ্যে মতপার্থক্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই ; নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) সহজিয়া 'নেড়ানেড়ী'দিগকে দলে লইয়া সম্প্রদায়ের সীমা বাড়াইবার চেষ্টা করিলেও বৈষ্ণব ধর্ম ও সমাজকে ভাঙনের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

[১৭] জীব গোস্বামী তাঁহার 'বৈষ্ণববন্দনা'য় (শ্লোক ৭৭-৮০) বলিয়াছেন যে, অচ্যুত ছাড়া অদ্বৈতের অন্যান্য পুত্রগণ চৈতন্যদেবকে সর্বেশ্বর বলিয়া মানিতেন না এবং তাঁহাকে ভজনপূজনও করিতেন না। এইজন্য অদ্বৈত এই পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য: ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতকের পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ৩০৯)

অষ্টম অধ্যায়

চৈতন্য-জীবনীকাব্য

ভূমিকা ॥

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর জীবন ও সাধনায় চৈতন্যপ্রভাব কিরূপ সুগভীর ছায়াপাত করিয়াছিল। অতি প্রাচীন-কালে বাঙলাদেশে তান্ত্রিকতা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় মতই তন্ত্রের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে হিন্দু-তান্ত্রিকতার ফলে শাক্ত পূজাপদ্ধতি ও দেবীতত্ত্ব বাঙালীমানসকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছিল। চৈতন্যাবিভাবের পূর্বে শিষ্ট সমাজে ন্যায়চর্চা ও তান্ত্রিকতার বিশেষ প্রভাব দৃষ্টিগোচর হইবে। (কিন্তু চৈতন্য-প্রবর্তিত আবেগমূলক বৈষ্ণবধর্ম ক্রমে ক্রমে বাঙলার চিন্তাপ্রণালী ও আবেগের ধাতুধর্মকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া ফেলিল। শুধু জীবন ও ধ্যান-ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে, বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব চিরদিন অবিস্মরণীয় ঘটনারূপে পরিগণিত হইবে। চৈতন্যাবিভাবকে কেহ কেহ 'চৈতন্য-রেনেসাঁস বলিয়াছেন; একথা খুব যে অযৌক্তিক তাহা নহে। সেই নবজাগরণ ও চেতনার বিস্ফোরণ বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ্যেই ধরা পড়িয়াছে। চৈতন্যের প্রভাবেই বাংলা সাহিত্য তুচ্ছ মঙ্গলকাব্য ও নাথসাহিত্যের রহস্যময় 'কাল্ট' হইতে মুক্তি পাইয়া উদারতর পরিমণ্ডলে সম্প্রসারিত হইল। চৈতন্যের সাক্ষাৎ প্রভাবে ও অলোকসামান্য আদর্শে পরিকল্পিত চৈতন্য জীবনগ্রন্থগুলি এবিষয়ে দীপবর্তিকার মতোই সাহায্য করিয়া থাকে।) (চৈতন্যদেব অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষ হইলেও সর্বোপরি তিনি মানুষ এবং তাঁহার মানুষী ও ভাগবত লীলাকথার অপূর্ব বৃত্তান্ত চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলিকে একটা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়াছে।)

ভারতবর্ষে জীবনী রচনা যে খুব একটা অভিনব ব্যাপার তাহা নহে। প্রাচীন কবিগণ পৃষ্ঠপোষক রাজাদের জীবনী, বিবাহ, সমরযাত্রা, দানধ্যান প্রভৃতি বিষয়ের পল্লবিত বর্ণনা দিয়া সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে কিছু কিছু রাজচরিত

রচনা করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত', বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বাকপতিরাজের 'গৌড়বহ' (প্রাকৃতে রচিত), শঙ্কুকের 'ভুবনাভ্যুদয়' (পাওয়া যায় নাই, কিন্তু 'রাজতরঙ্গিণী'তে উল্লিখিত), হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত' (সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত), বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' (কাশ্মীর রাজবংশের ইতিবৃত্ত) জহ্লণের 'সোমপালবিলাস', অজ্ঞাতনামা কবির 'পৃথ্বীরাজবিজয়' এবং আরও অনেক অপ্রধান রাজ-জীবনীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজা বা রাজবংশের প্রতি অতিভক্তি বা আনুগত্যবশতঃ এই সমস্ত জীবনীতে জীবন বা ইতিহাসের উপাদান, ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হইয়াছে—এবং সেইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ইঁহারা যে সমস্ত রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বাস করিতেন, তাঁহাদের সামান্য জীবনকথাকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া অসামান্য করিয়া তুলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কেহ কেহ আবার রূপক-প্রতীকের সাহায্যে পার্থিব রাজাকে রূপকথার রাজকুমার বা ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবকুমার রূপেও বর্ণনা করিতেন। যখন উত্তরাপথে হিন্দুরাজ্যের আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিতেছিল, এবং নবোদিত ইসলামের অর্ধ-চন্দ্র-খচিত পতাকার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছিল, তখনও হিন্দুরাজগণ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে সভামণ্ডপে পাত্রমিত্রসহ আসীন হইয়া বশংবদ কবিদের প্রশস্তিবাক্য গলাধঃকরণ করিয়া পরম পুলকিত হইতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাঙলার কবি সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' উল্লেখ করা কর্তব্য। রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকরনন্দী এই কাব্যে দ্ব্যর্থবোধক শব্দের সাহায্যে একপক্ষে রঘুপতি রামচন্দ্র, আর-একপক্ষে গৌড়েশ্বর রামপাল ও তাঁহার পুত্র মদনপালের ঐতিহাসিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। রামপালের রাজনৈতিক জীবন ইহার মূল বক্তব্য বিষয়—সুতরাং ইহাতে রামপালদেবের ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে যে উল্লেখ-যোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য থাকিবে না, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু জীবিত বা অনতিকাল-পূর্বে-লোকান্তরিত কোন ধর্মগুরু সম্বন্ধে এত অধিকসংখ্যক জীবনীরচনা চৈতন্যযুগ ভিন্ন অন্য কোন যুগে সম্ভব হয় নাই—এবং কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই বিপুল জীবনীসাহিত্য রচিত হইয়াছিল? একজন ত্যাগী সন্ন্যাসী ইহার নায়ক—যাঁহার অশ্রুব্যাকুলতা ভিন্ন অন্য কোন সম্বল ছিল না। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক

তুচ্ছতার মধ্যে চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলি মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে। ইহাতে অলৌকিকতা ও অতিরঞ্জনের বাহুল্য আছে; জীবনীকারগণ চৈতন্যকে স্বয়ং কৃষ্ণ প্রমাণের জন্য অনেক সময় তথ্যাদির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। চৈতন্যের ভাবজীবনের গভীর তাৎপর্য ফুটাইবার জন্য ইঁহারা বাস্তব ঘটনাকে অলৌকিকতার মোড়কে পরিবেষণ করিয়াছেন; কেহ-বা ভাগবতের সঙ্গে চৈতন্যজীবনের একান্ত সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য মহাপ্রভুর জীবনকথাকে ভাগবতের ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন। তবু ইহাতে একজন মহাপুরুষের ভাবজীবনের গভীর ব্যাকুলতা, তাঁহার সর্বত্যাগী পার্ষদগণের পূত জীবনকথা, ভক্তিদর্শন ও বৈষ্ণবতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বৈষ্ণবসমাজ ও বৈষ্ণবসমাজের বাহিরে বৃহত্তর বাঙালী হিন্দুসমাজ, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই এই জীবনী-কাব্যগুলি শুধু জীবনী মাত্র হয় নাই,—ইহাতে গৌড়, বিশেষতঃ নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, নীলাচল ও ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাস, বিকাশ, পরিণতি, প্রভৃতি ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্যের যে-প্রকার বাহুল্য দেখা যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার করিতে হইবে, মধ্যযুগীয় বাঙলার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলে চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলির সাহায্য অপরিহার্য।

? এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইদানীং কোন কোন সমালোচক বলিতেছেন যে, চৈতন্য-জীবনকাব্যগুলিকে চরিতকথা হিসাবে খুব একটা মূল্যবান দলিলস্বরূপ গণ্য করা যায় না। ভক্ত কবিগণ চৈতন্য জীবনীর মোটামুটি রেখাচিত্র অবলম্বন করিয়া 'চরিতামৃত' রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এগুলি যথার্থ জীবনীসাহিত্য হইতে পারে নাই। চৈতন্যচরিতে অমৃতবাণী ভক্তহৃদয়ে আশা ও আশ্বাস সঞ্চার করিলেও ব্যক্তি-চৈতন্যের দৈনন্দিন জীবন, জীবনের আকাঙ্ক্ষা অভীপ্সা ইত্যাদি ফুটে নাই। কবিগণ নিজ নিজ বাসনা ও সংস্কার অনুযায়ী ভক্তির আবরণে মুড়িয়া চৈতন্যজীবনী বর্ণনা

[১] ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত আলোচনাপ্রসঙ্গে 'চরিত' ও 'চরিতামৃত' শব্দ দুইটি প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন, "It should, however, be remembered that it is not a *carita*, but a *caritamrita*, written more from the devotional than from the historical point of view."—*Vaishnava Faith & Movement*, p. 40.

করিয়াছেন। ফলে সাধারণ পাঠকের নিকট যে-সমস্ত বর্ণনা হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়, ভক্তের দৃষ্টি তাহাকেই ভক্তি-আবেগের বশে নূতন তাৎপর্য মণ্ডিত করিয়া ধন্য হয়। পার্ষদগণ ও সমসাময়িক ভক্তেরা মহাপ্রভুর অলোকসামান্য চরিত্র দর্শন করিয়া যে মনোভাবের বশে চৈতন্যলীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন, আধুনিক কালের মানুষ সে যুগধর্ম ও ঐতিহাসিক পরিবেশ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই এখন আমরা চৈতন্যের জীবনে নব্য-মানবতা (neo-humanism), সমাজসংস্কার, নীচ জাতিকে উচ্চশ্রেণীতে গ্রহণ করা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, পতিত-পতিতাকে পংক্তিতে স্থানদান ইত্যাদি আধুনিক সমাজ-মানসিকতার প্রভাব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি। কেহ কেহ আবার চৈতন্য-জীবনকথাকে 'ঐতিহাসিক সত্য' ও 'পারমার্থিক সত্য' এবং 'প্রকট লীলা' ও 'নিত্যলীলা'—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐতিহাসিক সত্য ও প্রকটলীলা আধুনিক ঐতিহাসিকের অধিকারভুক্ত।[২] অর্থাৎ তথ্যসন্ধানী ঐতিহাসিক যে-সমস্ত অলৌকিক কথাকে সরাসরি বাদ দিয়া থাকেন, ভক্তগণ তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। জীবনীকাব্যে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলি চৈতন্যদেবের জীবনে বাস্তবিক ঘটিয়াছিল কি না তাহা লইয়া আলোচনা করা বা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে বুদ্ধদেব যিশুখ্রীষ্ট হইতে শুরু করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দের জীবনের ব্যাখ্যাতীত ঘটনাগুলিকে সর্বাগ্রে বাতিল করিয়া দিয়া তাঁহাদের আধুনিক ও বাস্তবসম্মত জীবনী রচনা করিতে হয়। যাঁহারা যিশু খ্রীষ্টের অলৌকিকতা চক্ষুকর্ণ বুজিয়া গলাধঃকরণ করেন, তাঁহারা চৈতন্যজীবনীতে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনার সত্যাসত্য লইয়া এত বিব্রত হইয়া পড়েন কেন বুঝা যাইতেছে না। চৈতন্যদেব অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের মানুষ; তাই সন্দিগ্ধ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার জীবনের বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতার প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কিন্তু এযুগেও কি আমরা একালের ধর্মগুরু সম্বন্ধে অলৌকিক গালগল্প পরম আগ্রহে সেবন করি না? সত্যই কি মহাপ্রভু চারিটি ক্ষুরসহ বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া মুরারি গুপ্তের বাটীর আঙিনায় খটখট করিয়া বেড়াইয়াছিলেন?[৩]

---

[২] ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (১ম সংস্করণ), পৃ. ১২-১৩

[৩] মুরারি গুপ্ত বরাহরূপী মহাপ্রভুর চারিখানি ক্ষুরও দেখিয়াছিলেন—"গর্জে যজ্ঞ-বরাহ প্রকাশে খুর চারি" (চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৩য় অধ্যায় ।

ভক্তগণ তাঁহাকে কৃষ্ণাবতাররূপে বিশ্বাস করিতেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সংশয় ছিল না। এইরূপ সংশয়হীন ভক্তচিত্তে সামান্য ব্যাপারও অসামান্য হইয়া পড়ে, নিতান্ত লৌকিক ঘটনাও তাঁহাদের নিকট অলৌকিকের মর্যাদা লাভ করে। তাহা না হইলে রূপ-সনাতনও চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণাবতাররূপে বন্দনা করিবেন কেন? তাঁহারা গৌড়ীয় ভক্তদের মতো মুগ্ধতার আবেশে চৈতন্যদেবকে স্বয়ং-কৃষ্ণ বলিয়া উল্লসিত হইতেন না। তাঁহাদের গ্রন্থাদিতেও চৈতন্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা নাই। তাঁহারা ভক্তিদর্শনের সাহায্যে কৃষ্ণলীলাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-ব্যাকুলতা হইতে তাঁহারা আদর্শ পাইয়াছিলেন, চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমের আর্তি দেখিয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছিলেন, অন্যান্য বৈষ্ণবকে সেই আবেগের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাই সনাতন গোস্বামী চৈতন্যদেবকে স্বয়ং-কৃষ্ণ বলিয়া 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে'র মঙ্গলাচরণে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন এবং রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র ("তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য") ও জীব গোস্বামীর 'ক্রমসন্দর্ভে' মহাপ্রভুকে "স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবতম্" বলিয়া অশেষ ভক্তি করা হইয়াছে। এ বিষয়ে ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদার মহাশয়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য-জীবনীকাব্যে বর্ণিত ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়প্রসঙ্গে ডক্টর মজুমদার বলিয়াছেন, "তবে ইঁহারা (অর্থাৎ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ) আধুনিক যুগের লোকের মনোবৃত্তি লইয়া মধ্যযুগের ঘটনা বুঝিতে চাহিয়াছেন, ইহাই ইঁহাদের আলোচনার প্রধান ত্রুটি। মধ্যযুগের কোন ঘটনা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মধ্যযুগের ভাবধারায় অবগাহন করিতে হইবে। সে যুগের লোকের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আলোচনা-প্রণালী এ যুগের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে সত্যের একদেশ মাত্র দর্শন করা হইবে। ভগবান স্বয়ং সশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একথা এ যুগের লোকের পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন; কিন্তু মধ্যযুগের লোকে ইহা সহজেই মানিয়া লইতেন। মধ্যযুগে যে যুক্তিবিচারের প্রয়োগ ছিল না, তাহা নহে, তবে সে যুক্তিবিচারের ধারা আমাদের ধারা হইতে পৃথক ছিল।"[৪] কার্লাইলের মতে "History is the essence of innumerable biographies." এই সূত্র ধরিয়া কেহ কেহ নিরস্ত না হইয়া বলিবেন যে, চৈতন্য-

৪ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ১ম সং, পৃ. ১১।

জীবনীকাব্যে সেই হিষ্ট্রির পারম্পর্য নাই, বরং তথ্যগত বিশৃঙ্খলাই অধিক, বাস্তব ঘটনা সেখানে অলৌকিকতার সূত্র যোগাইয়াছে মাত্র। কাজেই চৈতন্যজীবনীর কাব্যত্ব, দার্শনিকতা ও সমাজচিত্র অতিশয় প্রশংসনীয় হইলেও এগুলিতে যথার্থ জীবনীসাহিত্যের স্বরূপ ধরা পড়ে নাই। এ বিষয়ে মনে হয় যে, অনেকেই ঠিক প্রশ্নটি উত্থাপন করেন নাই, ফলে ঠিক উত্তরটিও মিলে নাই। ইংরেজীতে Hagiography[৫] গুলির (সন্তজীবনী) যেরূপ মর্যাদা, বাংলা চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলিকে সেই দৃষ্টিতেই দেখা উচিত। Hagiography-তে সন্ত-সাধকদের ভাবজীবনের বর্ণনার সময় দৈনন্দিন বাস্তব ঘটনার তথ্যগত যাথার্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় না, এবং তাহার প্রয়োজনও হয় না। সন্ত-জীবনী মূলতঃ সাধকদের ভাবজীবনের ইতিহাস; তাই লেখক ও ভক্তগণ সমস্ত তথ্যকে ভাবজীবন ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করিয়া থাকেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করিলে এই ধরণের 'চরিতামৃত' বা Hagiography-র মধ্যে অসঙ্গতি আবিষ্কার করা এমন কোন দুরূহ ব্যাপার নহে। কিন্তু চৈতন্যজীবনীর মতো ধর্মগুরু ও সাধক-জীবনী আলোচনা করিতে হইলে বাস্তব মানুষের জীবনী বিচারের সংস্কারকে অনেকটা পাল্টাইয়া লইতে হয়—তাহা না হইলে স্তরভেদ জনিত মূল্যবোধে বিভ্রান্তি ঘটিতে পারে।[৬] একজন খুনী ডাকাত বা খেলোয়াড়ের জীবনী

---

৫ গ্রীক *Hagios* শব্দের অর্থ পবিত্র।

৬ এ বিষয়ে 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের মন্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত; "বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কিংবা লোচনদাস—কেহই ইতিহাস লিখিতে যান নাই। প্রতীচ্যের বর্তমান উন্নত ধারণা (conception) অনুসারে উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করিতে গেলেও শুধু নীরস ঘটনাবলী ও উহাদের কালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা চলে না। ইতিহাসের নায়কদিগের চরিত্রের সহৃদয়তাপূর্ণ বিশ্লেষণ ও চিত্রণ ব্যতীত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি জীবনচরিত সম্বন্ধে একথা যে আরও অধিক প্রযোজ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি উক্ত গ্রন্থকারগণ চৈতন্যদেবের প্রতি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, কেবল তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর নীরস বিবরণ দ্বারাই তাঁহাদিগের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা চৈতন্যদেবের জীবনের এক একটা 'রোজনামচা' না হউক, এক একটা 'মাসকাবারী' বা 'সালতামামী' পাইতে পারিতাম; কিন্তু চৈতন্যদেবের যে জীবন-চরিত পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার ভক্ত ও শরণাগত হইতেছেন, উহা পাওয়া যাইত না।" (পদকল্পতরু, ৫ম)

রচনার উপাদান যেরূপ হইবে এবং যেভাবে এই উপাদানকে ব্যবহার করিতে হইবে, কোন মহাপুরুষের জীবনী কখনই সেই রীতি অনুসরণ করিবে না। সে যাহা হোক, আধুনিক বাস্তবধর্মী ও যুক্তিবাদী মনের নিকট যেরূপই লাগুক না কেন, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলি প্রশংসনীয় সম্পদ-রূপেই গণ্য হইবে। অতঃপর আমরা চৈতন্যের সংস্কৃত ও বাংলা জীবনগ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

চৈতন্যের সংস্কৃত জীবনী

চৈতন্যদেবের সংস্কৃত জীবনীগুলি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যের প্রথম জীবনী সংস্কৃতে রচিত হয়—বাংলায় নহে। তখন চৈতন্যমহাপ্রভু জীবিত ছিলেন। চৈতন্যের লীলাকালে নরহরি সরকার চৈতন্যবিষয়ক পদ লিখিলেও তখনও শাস্ত্রাচারী দলে চৈতন্যপ্রভাব বিশেষভাবে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু সংস্কৃতে কাব্যনাটকের আকারে চৈতন্যজীবনকথা রচিত হইলে শুধু বাঙলায় কেন, বাঙলার বাহিরেও সংস্কৃতভাষার মারফতে চৈতন্যলীলা প্রচার-লাভ করিল এবং চৈতন্যের অবতারত্ব সম্বন্ধে অন্য সম্প্রদায়ের মনেও সংশয়ভাব নিদূরিত হইল।

প্রথমে সংস্কৃতে রচিত স্তবস্তুতিগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন। রঘুনাথদাস অনেকগুলি স্তব ও স্তোত্র ('স্তবমালা') রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশই বৃন্দাবন ও রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক। তন্মধ্যে 'চৈতন্যাষ্টকে' ও 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু'তে স্তবস্তুতির সঙ্গে চৈতন্য-জীবনকথারও কিছু কিছু বর্ণনা আছে। রূপগোস্বামীর 'স্তবমালা'র অন্তর্গত প্রথম তিনটি অষ্টকে চৈতন্য বর্ণনা আছে। শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও চৈতন্যকে বন্দনা করিতেছেন এবং কৃষ্ণ ও চৈতন্য অভিন্ন—ইহাই এই তিনটির মূল বক্তব্য। প্রথম অষ্টকে চৈতন্য-পরিকর অদ্বৈত, শ্রীবাস, স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় অষ্টকে বলা হইয়াছে, এমন কতকগুলি দৈত্যস্বভাব দুর্জন আছে যাহারা চৈতন্যকে 'অকৃষ্ণাঙ্গ' কৃষ্ণ (অর্থাৎ গৌরবর্ণের কৃষ্ণ) বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। এই অষ্টকের তৃতীয় স্তবকে বলা হইয়াছে যে, গোপীদের অনুরাগ উপলব্ধির জন্যই কৃষ্ণ গৌরাঙ্গবেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৃতীয় অষ্টকে

রূপ গোস্বামী শচীনন্দনকে সরাসরি 'মুকুন্দ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদে উপনিষদে যে ভক্তিরস যথাযথ ব্যাখ্যাত হয় নাই, কোনও অবতার তাহা ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই, চৈতন্যপ্রভু সেই ভক্তিরস বর্ষণ করিয়াছেন। এই স্তবগুলিতে চৈতন্যের প্রতি ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে, দুই-একস্থলে জীবনপ্রসঙ্গও আছে, কিন্তু সংস্কৃতে রচিত জীবনীকাব্য ও নাটক-গুলিতেই তাঁহার জীবনের ঘটনাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা প্রধানতঃ মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর রচনা আলোচনা করিব।

মুরারি গুপ্তের কড়চা বা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥

চৈতন্যের জীবনীসমূহের মধ্যে আদিতম মুরারি গুপ্তের কড়চা[৬] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীহট্টের অধিবাসী মুরারি চৈতন্যদেবের সঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন এবং সম্ভবতঃ রামোপাসক ছিলেন। চৈতন্য-জীবনগ্রন্থে তাই তাঁহাকে হনুমানের অবতার বলা হইয়াছে। প্রথম জীবনে তিনি বোধ হয় অদ্বৈতপন্থী ছিলেন। যৌবনের গোড়ার দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠী বৈদ্যবংশীয় মুরারিকে প্রায়ই পরিহাসে পরিহাসে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। গৌরাঙ্গের বয়স তখন অনধিক ষোল বৎসর। সমস্ত পড়ুয়াকেই তিনি তর্কে হারাইয়া দিতেন, কিন্তু মুরারি কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া গৌরাঙ্গের চাপল্য হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে তিনিও নিমাই পণ্ডিত অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন ছিলেন না—চৈতন্য তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে বড় একটা কাবু করিতে পারিতেন না। শেষ পর্যন্ত বাল-চপল নিমাই বৈদ্য মুরারিকে জাতের খোঁটা দিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেন—

> প্রভু বলে, বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পঢ়।
> লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দঢ় ॥
> ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
> কফ পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥
> মনে মনে চিন্ত তুমি কি বুঝিবে ইহা।
> ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া ॥

[৬] এখানে মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণের (৫৪৫ গৌরাঙ্গ) পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

বেদান্তপন্থী মুরারি পরে চৈতন্যপ্রভাবে ভক্তিপন্থা গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু এই জন্য নাকি মুরারির সমস্ত কর্মপন্থা অনুমোদন করিতেন না। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে আছে যে, (১০ অঙ্ক, ৭৬-৭৯ শ্লোক) চৈতন্যদেব মুরারির ভক্তিরসের স্বল্পতার জন্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—"মুরারের্মনসি ন সিদ্ধ্যতি ভক্তিরসো রসোন দৌর্গন্ধ্যমিব বিসারিকাটবমধ্যাত্ম ভাবনাবনাগ্রহিলত্বমেবাস্তি যদয়মত্যাপ্যনুক্ষণং ক্ষণমেব বাশিষ্ঠ বিষয়ে।" অর্থাৎ মুরারির অন্তঃকরণে ভক্তিযোগের অবস্থিতি নাই। কারণ রশুনের দুর্গন্ধের মতো অতি কটু অধ্যাত্মভাবনাতে ইঁহার অতীব আগ্রহ রহিয়াছে। কারণ—

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীডতো মৃতাম্ভোধৌ কিমন্যৈঃ খাদকোদকৈঃ।।

যে নিরন্তর অমৃত সমুদ্রে বিচরণ করিতেছে তাহার যেমন ক্ষুদ্র গর্তের জলে তৃপ্তি হয় না, সেই রূপ সর্বমঙ্গলপতি ভগবান হরিতে যাহার ভক্তি আছে, তাহার কখনই অধ্যাত্মযোগে অভিলাষ থাকে না।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত মুরারি চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন এবং অধ্যাত্মবাদ (অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ) ত্যাগ করিয়া চৈতন্যপ্রবর্তিত ভক্তিবাদের শরণ লইয়াছিলেন। এমন কি তিনি পুরীধামে গিয়া সর্বাগ্রে জগন্নাথ দর্শন না করিয়া চৈতন্যকেই সাক্ষাৎ করিতেন।[৭] গৌরপারম্যবাদের অন্যতম প্রচারক রূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলে মুরারি গুপ্ত বিশেষ শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর বাল্যকৈশোর ও যৌবনের সমস্ত সংবাদ জানিতেন বলিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে চৈতন্য-তথ্য ও তত্ত্বের খনি বলিয়া মনে করিতেন।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' মুরারি গুপ্তের কড়চা নামে অধিকতর পরিচিত।[৮] দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে মুরারি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 'কড়চা' বলিতে সংক্ষিপ্ত 'নোট' বুঝায়, কিন্তু এই কাব্য সংক্ষিপ্ত নহে। ইহাতে চারিটি 'প্রক্রম' এবং মোট আটাত্তরটি সর্গ আছে। বস্তুতঃ বাল্য হইতে তিরোধান পর্যন্ত চৈতন্যজীবনের প্রায় সবটাই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থটি চৈতন্যজীবনীসমূহের আদিতম এবং আকরগ্রন্থ।

---

৭ কবিকর্ণপূর-বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য', ১৪।৭৭।৮৪

৮ কবিকর্ণপূর ইহাকে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় (শ্লোক ৯৪) 'চৈতন্যচরিতামৃত' বলিয়াছেন।

এইজন্য বৈষ্ণব-জীবনীকারগণ মুরারির গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন, কেহ কেহ ইহা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে—

আদিলীলার মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত্র।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥

'চৈতন্যমঙ্গলে' জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে, মুরারি চৈতন্যের "জন্ম হইতে বালক চরিত্র" পর্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। অথচ মূল কাব্যে চৈতন্যজীবনীর আদ্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থটির রচনাকালের সন-তারিখ এবং আরও নানা বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। ঢাকার উথালীনিবাসী অদ্বৈত প্রভুর বংশধর মধুসূদন গোস্বামীর নিকট মুরারির গ্রন্থের একখানি পুঁথি ছিল। বাংলা ১৩০৩ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বৈষ্ণবভক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উক্ত পুঁথির একখানি নকল সংগ্রহ করেন। ইহার অল্প পরে বৃন্দাবন হইতে দেবনাগরী হরফে লেখা আর-একখানি পুঁথি সংগৃহীত হয়। অবশ্য পুঁথি দুইখানিতে অনেক অশুদ্ধি ছিল। নিত্যানন্দের বংশজাত শ্যামলাল গোস্বামীর উপর এই গ্রন্থসম্পাদনের ভার অর্পিত হয়। তিনি ১৩০৩ সালে দেবনাগরী হরফে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহার পরে ১৩১৭ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৩৩৭ সালে তৃতীয় সংস্করণ (মৃণালকান্তি ঘোষের সম্পাদনায়) প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণেও প্রচুর ভুলভ্রান্তি আছে। ইহাতে মনে হয়, ছাপাগ্রন্থে পণ্ডিতের সংশোধনের ছাপ পড়ে নাই। গ্রন্থের প্রথম দুই সংস্করণের শেষে, 'চতুর্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চবিংশতি বৎসরে' অর্থাৎ ১৪২৫ শকাব্দের (১৫০৩ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখ ছিল। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে সন-তারিখ বদলাইয়া গিয়াছে—

চতুর্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অর্থাৎ ১৪৩৫ শকাব্দের (১৫১৩ খ্রীঃ অঃ) আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার অষ্টমবর্ষের সংখ্যায় 'পঞ্চত্রিংশতি' পাঠ ছিল বলিয়াই বোধহয় মৃণালকান্তি তৃতীয় সংস্করণে এই পাঠ ছাপাইয়াছিলেন। এই দুইটির মধ্যে কোন্ তারিখটি অধিকতর প্রামাণিক তাহা লইয়া কিছু মতভেদ আছে। ঢাকা ও বৃন্দাবনের মূল পুঁথি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহাতে যথার্থ কোন্ শকের উল্লেখ ছিল বুঝা

যাইতেছে না। যদি গ্রন্থটি ১৪২৫ শকে রচিত হয়, তাহা হইলে ইহাতে চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাও ঐ পর্যন্ত (১৫০৩ খ্রীঃ অঃ) বর্ণিত হওয়া উচিত, ১৪৩৫ শকাব্দ (১৫১৩ খ্রীঃ অঃ) সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। অথচ ইহাতে চৈতন্যের তিরোধান পর্যন্ত উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

> তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠৈস্থৈঃ প্রসাধিতঃ।
> জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহদ্ধিমৎ॥ (প্রথম প্রক্রম)

সুতরাং এই গ্রন্থ নিশ্চয়ই ১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দ বা তাহার পরবর্তী রচনা। কিন্তু গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ অনুসারে ইহাকে ১৫০৩ বা ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলিতে হইবে। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করিতেন যে, ইহাতে ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাই (চৈতন্যের আঠার বৎসর বয়সের কাহিনী) বর্ণিত হইয়াছিল— অবশিষ্ট বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে "জন্ম হইতে বালক চরিত্র" উক্তিটিও ইহাই সমর্থন করিতেছে। বিশেষতঃ এই কাব্যের শেষাংশ খুবই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, পূর্বাংশের মতো বিস্তৃত নহে, বরং সূত্রাকারে বর্ণিত। এইজন্য কেহ কেহ ছাপা গ্রন্থের আগোপান্ত নির্ভেজাল রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। অথচ ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' মুরারির চতুর্থ উপক্রমেরও (অর্থাৎ মহাপ্রভুর বৃন্দাবনদর্শন) উল্লেখ আছে। তাহা হইলে সপ্তদশ শতাব্দীতেও মুরারির গ্রন্থের প্রায় সবটাই প্রচলিত ছিল, ছাপা পুস্তকে বিশেষ অদল বদল করা হয় নাই। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল হইতেও অনুমান হয় যে, মুরারির গোটা কাব্যটি পূর্বে প্রচলিত ছিল, আধুনিক কালে উহাতে কোন প্রক্ষিপ্ত অংশ অনধিকার প্রবেশ করে নাই। লোচনও তাঁহার কাব্যে ইহাতে বর্ণিত চতুর্থ প্রক্রমের ২১ অধ্যায়ের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, এই কাব্যের শেষার্ধ প্রক্ষিপ্ত, নরহরির 'ভক্তিরত্নাকর' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল' তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবে। তবে ইহাতে অল্পবিস্তর হস্তক্ষেপ ঘটাই সম্ভব—মধ্যযুগের কোন্ গ্রন্থেই বা প্রক্ষেপ প্রবেশ করে নাই? ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে অবশ্য কিছু কিছু সন্দেহ রহিয়াছে। উল্লিখিত দুইটি সনের মধ্যে (১৫০৩ ও ১৫১৩ খ্রীঃ অঃ) কোন্‌টি অধিকতর নির্ভরযোগ্য তাহা নির্ধারণ করা দুরূহ। কড়চার তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক মৃণালকান্তি ঘোষ ভূমিকায়

বলিয়াছেন, "মুরারির কড়চার শেষে আছে ১৪৩৫ শকে[৯] এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর-পরে অর্থাৎ ১৪৩৫ শকে তিনি জননী, জন্মভূমি ও জাহ্নবী দেখিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে গমন করেন। তাহা হইলে এই সময় পর্যন্ত প্রভুর লীলা এই গ্রন্থে থাকিবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বর্ষের গম্ভীরা লীলার কথাও এই গ্রন্থে আছে। ইহাতে বোধহয় ১৪৩৫ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয় নাই, তাহার বহু বৎসর পরে মুরারি ইহা শেষ করিয়াছিলেন।" ইহাতে চৈতন্যদেবের শেষ জীবন ও তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ) কথা আছে। সুতরাং গ্রন্থটি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় কি করিয়া? বাধ্য হইয়া মৃণালকান্তিকে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার নানা আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা মনে করেন, "মুরারির গ্রন্থ ১৫৩৩ হইতে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল......অনুমান হয় মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসরের মধ্যে গ্রন্থলেখা শেষ হয়। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, মুরারির ন্যায় অন্তরঙ্গ ভক্তের পক্ষে শোক সামলাইতে এক বৎসর ও গ্রন্থ রচনা করিতে এক বৎসর লাগিতে পারে।"[১০] ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে মুরারির গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে; তবে মুরারির শোক সামলাইতে এক বৎসর লাগিয়াছিল—ইহা নিতান্তই অনুমান মাত্র। ডক্টর মজুমদার মহাশয়ের অনুমান, "১৪৩৫ শকটি পরবর্তীকালে কেহ বসাইয়া দিয়াছে।" বলা বাহুল্য এ সমস্ত অনুমানে পুরাপুরি আস্থা স্থাপন করা যায় না। তবে একটা প্রসঙ্গের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। চারি উপক্রমে বিভক্ত এই কাব্যের তিনটি উপক্রমে (চৈতন্যের রামকেলি পরিভ্রমণ পর্যন্ত) বিস্তারিতভাবে চৈতন্যলীলাকথা বর্ণিত হইয়াছে। অনুমান ১৪৩৫ শকে বা ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব রামকলিতে আসিয়াছিলেন। চতুর্থ উপক্রমে মহাপ্রভুর বৃন্দাবনযাত্রা ও পুরীধামে স্থায়িভাবে বসবাসের কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। যদি কেহ এরূপ অনুমান করেন যে, প্রথম তিনটি উপক্রম চৈতন্যের জীবৎকালে ১৪৩৫ শকের মধ্যে (১৫১৩ খ্রীঃ অঃ) রচিত হয়, এবং শেষ অর্থাৎ চতুর্থ উপক্রমটি চৈতন্যের তিরোধানের পর রচিত

---

৯ ১ম ও ২য় সংস্করণে ১৪২৫ শক ছিল।

১০ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

হয়, তাহা হইলে সন-তারিখের সংশয় অনেকটা দূর হইতে পারে। কারণ সর্বশেষ উপক্রমটি অত্যন্ত সংক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থরচনার বেশ কয়েক বৎসর পরে এই অংশটুকু জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া সম্ভবতঃ ইহাতে শেষের ঘটনাটি সূত্রাকারে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই অনুমানের বিরুদ্ধে আর-একটা যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, কড়চার প্রথম উপক্রমের দ্বিতীয় সর্গেই চৈতন্যের তিরোধানের কথা বলা হইয়াছে। অতএব সমগ্র গ্রন্থটিই চৈতন্যতিরোভাবের পর রচিত হয়—ইহাই আমাদের ধারণা। সন-তারিখ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না, কারণ মিলাইয়া দেখিবার মতো কোন প্রামাণিক পুঁথি পাওয়া যায় নাই।[১১]

"মুরারি মহাপ্রভুর অনুচর এবং তাঁহার নবদ্বীপলীলার প্রধান সাক্ষী। সেই-জন্য কবিকর্ণপূর, দামোদর পণ্ডিত, জয়ানন্দ, লোচনদাস, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ—সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলাপ্রসঙ্গে মুরারির গ্রন্থকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া চৈতন্যজীবনী রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের বাল্যজীবনের বর্ণনা এবং নবদ্বীপলীলা এই কাব্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এবং হৃদ্যতার সঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, মুরারি বোধহয় প্রথম জীবনে অদ্বৈতপন্থী ছিলেন, রামচন্দ্রের পূজা করিতেন এবং শেষজীবনে চৈতন্যপ্রভাবে ভক্ত হইয়া-

১১ ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁহার *Vaishnava Faith & Movement*-এ বলিয়াছেন, "The genuineness of the date or of the subsequent account, therefore, is open to serious doubt." ডঃ দে মুরারির কড়চার শেষ অংশের প্রামাণিকতায় কিছু সন্দিহান। এবিষয়ে তিনি বলিতেছেন, "The genuineness of the fourth and last section (as possibly also of the third), therefore, is not altogether beyond question." কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও নরহরির ভক্তিরত্নাকর হইতে প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ উপক্রম পরে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, উহা ১৬শ-১৭শ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। কাজেই ডঃ দের সংশয় যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

ছিলেন।[১২] কিন্তু বিশ্বম্ভরের কৈশোর ও যৌবনলীলা দর্শনে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল—ইনি নারায়ণের অবতার, কখনও 'ভগবান্ স্বয়ম্', কখনও 'হরি-, বংশ' কখনও-বা

নমামি চৈতন্যমজং পুরাতনং চতুর্ভুজং শঙ্খ গদাব্জচক্রিণম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্ম্যাঙ্কিতবক্ষসং হরিং সপ্তালসংলগ্নমণিং সুবাসসম্।।

বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। চৈতন্য সম্বন্ধে তাঁহার আরও কিছু কিছু উক্তি ও অভিমত উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের মাঝে মাঝে আবেশ হইলেও তিনি অন্য সময়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকিতেন। বস্তুতঃ তিনি চৈতন্যকে শৈশব হইতেই ভগবানরূপে চিত্রিত করেন নাই, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরাবেশের প্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার একজন চাক্ষুষ দর্শক ছিলেন, এইজন্য তাঁহার কাব্যে বর্ণিত মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলার প্রামাণিকতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। চারিটি উপক্রম, ৭৭ সর্গে এবং সাড়ে আঠারশত শ্লোকে সমাপ্ত এই বিরাটকাব্যে মুরারি গুপ্তের পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের বর্ণনা (বিশেষতঃ নবদ্বীপলীলা) বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। তিনি চৈতন্যের সহচর ছিলেন এবং তাঁহার বাল্য হইতে যৌবনলীলা পর্যন্ত জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহার নিকট চৈতন্যের ভগবৎ-সত্তা জলের মতো স্বচ্ছ হইয়াছিল। তাঁহার কতকগুলি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদও বৈষ্ণব পদসাহিত্যে সুপরিচিত। চৈতন্যের বাল্যলীলার পদটি স্নিগ্ধমধুর ও বাস্তব-গুণান্বিত :

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি।।

[১২] চৈতন্যদেব মুরারিকে রামচন্দ্রের উপাসনা ছাড়িয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসক হইতে বলেন। এই ব্যাপারে মুরারির মনে অত্যন্ত সঙ্কট দেখা দেয়। তাই মহাপ্রভু তাঁহাকে রঘুনাথের উপাসনা করিতে অনুমতি দেন। কিন্তু পরিশেষে মুরারির অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তাহা হইলেও তিনি বৈষ্ণবসমাজে রামসেবক হনুমানের অবতার বলিয়া পূজিত হন। তাঁহার শারীরিক শক্তিও পবননন্দনকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি হনুমানের আবেশে শ্রীগৌরাঙ্গকে কাঁধে করিয়া শ্রীবাসের আঙিনায় উন্মত্তবৎ বিচরণ করিতেন।

এখানে শিশু নিমাইয়ের মূর্তিটি চমৎকার ফুটিয়াছে। তিনি যে শেষ পর্যন্ত চৈতন্যপ্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই বিখ্যাত পদটি :

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ান পুতলি করি লইনু মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতিকুলশীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনুটি ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
যাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কয় পীরিতি এমতি হয়
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন॥

চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান পার্ষদ শিবানন্দ সেনের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ সেন (দাস) কবি ও নাট্যকার রূপে মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত ছিলেন। চৈতন্যদেব বাঙলায় ফিরিয়া একবার তাঁহাদের বাড়ীতেও পদধূলি দিয়াছিলেন। শিবানন্দ প্রতিবৎসর বাঙলার ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া পুরীধামে চৈতন্যদর্শনে লইয়া যাইতেন। যাঁহারা 'গৌরপারম্যবাদ'[১৩] প্রচার করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, বৈষ্ণবসমাজে তাঁহার কিরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহার তিন পুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ দাস।[১৪] পরমানন্দের পুরীদাস নামে আরও একটি নাম নাকি প্রচলিত ছিল। পুরীধামে শিবানন্দের পত্নী গর্ভধারণ করেন এবং সেই গর্ভে পরমানন্দের জন্ম হয়।

১৩ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

১৪ চৈতন্যচরিতামৃতের মতে (আদি, ১০ম)।

তাই মহাপ্রভু পরিহাস করিয়া এই পুত্রটির নাম দিয়াছিলেন পুরীদাস। কেন এই পরিহাস, সে সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে মিলিত হইতেন, তখন তাঁহারা চারি মাস অবস্থান করিতেন এবং 'চাতুর্মাস্য' অবলম্বন করিতেন—অর্থাৎ এই চারি মাস তাঁহারা সংযত জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিতেন। তৎসত্ত্বেও শিবানন্দের পত্নী সসত্ত্বা হন বলিয়া মহাপ্রভু (শিবানন্দকে একটু পরিহাস করিয়া) এই পুত্রটির নাম রাখিয়াছিলেন পুরীদাস। অবশ্য কেহ কেহ এসমস্ত কথার প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দিহান। কারণ এই নামটি যথার্থ মহাপ্রভু-প্রদত্ত হইলে পরমানন্দ মহাগৌরবে এই নাম সর্বত্র ব্যবহার করিতেন।[১৫] চৈতন্যচরিতামৃতে পরমানন্দ দাস সম্বন্ধে আরও একটি ঘটনা আছে। পুরীধামে বালক পরমানন্দকে মহাপ্রভু অনেক বার 'কৃষ্ণ' বলাইতে চাহিলেও বালক কিছুতেই কৃষ্ণ উচ্চারণ করে নাই। স্বরূপ-দামোদর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, বালক পরমানন্দ মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র পাইয়া মনে মনে জপ করিতেছে, বাহিরে প্রকাশ করিতেছে না— "মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।" ডঃ মজুমদার 'পুরীদাস' নাম এবং পরমানন্দের বাল্যবয়সে মহাপ্রভুর সমীপে কৃষ্ণনামোচ্চারণে অসম্মতির ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিযাছেন, "...শ্রীচৈতন্যের সাম্প্রদায়িক ধর্ম স্থাপন ও প্রচার করিবার জন্য তাঁহার প্রাচীনতম চরিতাখ্যায়ক কবিকর্ণপূর ও মুরারি গুপ্তের গ্রন্থগুলি চাঁপা দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল। এই দুই জন লেখকের জীবনীর সহিত শ্রীচৈতন্যের জীবনী অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট; শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখিতে গেলে এই দুই জনের সম্পর্কিত ঘটনা বা ইঁহাদের গ্রন্থকে বাদ দেওয়া খুব কঠিন কাজ। সেইজন্য কোন কোন বৈষ্ণব এরূপ দুই-একটি কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহাতে ইঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার কিছু হ্রাস হয়।"[১৬] কিন্তু ডঃ মজুমদারের এ মন্তব্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য বৈষ্ণব আচার্যগণ ইচ্ছা করিয়াই ইঁহাদিগকে অন্তরালে রাখিয়াছিলেন এবং অলীক গল্পকথা চালাইয়াছিলেন—এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত নহে। পরমানন্দের

[১৫] ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

[১৬] ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৮৪-৮৫

প্রতি অশ্রদ্ধা থাকিলে তাঁহাকে বাল্যকালেই অমিত কবিপ্রতিভাশালী বলিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইত না।

পরমানন্দ সেন 'কবিকর্ণপূর' নামে বৈষ্ণবসাহিত্য ও সমাজে অধিকতর পরিচিত। এই নামসংক্রান্ত কাহিনীটি এখানে বলা যাইতেছে। পরমানন্দের তখন সাত বৎসর বয়স। পিতা শিবানন্দ সেনের সঙ্গে বালক পরমানন্দ পুরীধামে আসিয়াছেন। মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে সাত বৎসরের বালকের মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারিত হইল ঃ

> শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
> বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ।।

অনুঃ যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনরমণীদের দুই কর্ণের কুবলয়, দুই অক্ষির অঞ্জন, বক্ষের শ্রেষ্ঠ মণিদাম,—সমস্ত মণ্ডনস্বরূপ—তাঁহার জয় হোক।

বালকের কবিত্বে প্রীত হইয়া মহাপ্রভু পরমানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত 'শ্রবসোঃ কুবলয়ম্'-শব্দ-দুইটির অনুরূপ 'কবিকর্ণপূর' (অর্থাৎ কবিদের কর্ণাভরণতুল্য) নামে এই বালক-কবিকে অভিহিত করিয়াছিলেন। কর্ণপূর অল্প বয়সেই কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে তিনি নিজেকে 'শিশু' বলিয়াছেন।

কবিকর্ণপূরের নামে অনেকগুলি গ্রন্থ চলিলেও[১৭] 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নামক বৈষ্ণব পরিকরের বিবরণ (গৌরাঙ্গপার্ষদ ও ভক্তগণের অবতারত্বের তালিকা) বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মুরারি গুপ্তের পরেই তাঁহার গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় নাই।

কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য ১৪৬৪ শকের আষাঢ় মাসে (১৫৪২ খ্রীঃ অঃ) সমাপ্ত হয়। কাব্যটির আয়তন অল্প নহে—ইহাতে বিশটি সর্গ এবং উনিশ শতেরও অধিক শ্লোক আছে। মনে হয় ইহা কবিকর্ণপূরের অল্প বয়সের রচনা। ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ধরিয়া লইলে[১৮]

---

[১৭] কবিকর্ণপূরের নামে প্রচারিত গ্রন্থসমূহ: আর্যাশতক, অলঙ্কারকৌস্তুভ, আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, চমৎকারচন্দ্রিকা (?), বর্ণপ্রকাশ (?), বৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা (?)।

[১৮] Dr. S. K. De. *op. cit.* p. 33.

এ কাব্য রচনাকালে কবির বয়স হইয়াছিল প্রায় আঠার বৎসর। এইরূপ ধরিয়া লইবার কারণ, এই কাব্যে কবি নিজেকে 'শিশু' বলিয়াছেন ; অর্থাৎ তখন তিনি বয়সের দিক দিয়া হয়তো কিশোর পর্যায়েই ছিলেন। আঠার-উনিশ বৎসর বয়সের পূর্বে এরূপ কাব্য রচনা সম্ভব নহে। এই সমস্ত অনুমানের দ্বারা মনে হয়, চৈতন্যদেবের তিরোধানের বেশ কিছুদিন পরে তরুণবয়স্ক কবি এই বিরাট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আঠার-উনিশ বৎসর বয়স্ক কিশোর বা নবীন যুবকের পক্ষে এই কাব্য বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। আকারে ইহা মুরারির কড়চার অনুরূপ। কাব্যের প্রথম দিকের প্রায় সবটাই মুরারির কাব্য হইতে গৃহীত ; কিন্তু শেষার্ধে কবি নিজ কল্পনা অনুসারে অগ্রসর হইয়াছেন। চৈতন্যদেবের প্রায় সমস্ত জীবনটাই ইহার মূল বর্ণিতব্য বিষয়। কবি অল্পবয়সে কাব্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও রচনাশক্তি অর্জন করিলেও তরুণ বয়সের প্রভাবে বাগবৈদগ্ধ্য, শব্দকৌশল ও আলঙ্কারিক ঐশ্বর্যের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই জন্য কোন কোন আধুনিক সমালোচক এ কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য ভিন্ন কাব্যমূল্যের বিশেষ প্রশংসা করিতে চাহেন না।[১৯] অবশ্য নিছক শাব্দিক ব্যায়াম ব্যতীত ইহার কাব্যমূল্য বিশেষ প্রশংসনীয় নহে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে এ কাব্য কবির তরুণ বয়সের রচনা, মুরারির কড়চা পরিণত বয়সের সৃষ্টি। তাই তরুণ কবি কবিকর্ণপূর কৃত্রিম কাব্যপ্রকরণ লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিলেও তাঁহার নবীন বয়সের দিকে চাহিয়া সেটুকু মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কবিকর্ণপূর চৈতন্যাবতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য ত্রিতাপদগ্ধ কলিযুগের মানুষের উদ্ধারের জন্য নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যদিও কবি প্রথমেই চৈতন্যকে 'ব্রজবধূ প্রাণনাথ' বলিয়াছেন, কিন্তু জীব-উদ্ধারই যে চৈতন্যাবতারের প্রধান উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যুক্তির দ্বারা চরম তত্ত্ব জানা যায় না। তাই দেখা যাইতেছে যে, কবিকর্ণপূর অল্প বয়সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের সূক্ষ্ম তাৎপর্য সুচারুরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যশক্তি লইয়া মতভেদের অবকাশ থাকিলেও, পৌগণ্ড দশা অতিক্রম করিয়া তিনি যেরূপ সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন,

---

১৯ Dr. S. K. De, *Op cit.*, pp. 432-433.

তাহাতে তাঁহার অপরিপক্ক নবীন বুদ্ধি যে প্রবীণ মুরারি গুপ্তের সুচিন্তিত চিন্তা ও তত্ত্বাদর্শ অপেক্ষা খুব নিকৃষ্ট তাহা মনে হয় না।

কবিকর্ণপূরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক কৃষ্ণমিশ্রের রূপকনাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র আদর্শে রচিত হয়। চৈতন্যদেবের তিরোধানে উড়িষ্যার রাজা এবং মহাপ্রভুর গুণগ্রাহী ও ভক্ত প্রতাপরুদ্র ব্যাকুল হইয়া পড়িলে তাঁহার শোকাপনোদনের জন্য এই নাটকের পরিকল্পনা, রচনা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। প্রতাপরুদ্র ১৫৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেহরক্ষা করেন। সুতরাং এই নাটক ইহার পরে রচিত হইতে পারে না। অপরদিকে তাঁহার 'চৈতন্য-চরিতামৃত' মহাকাব্য ১৫৪২ সালে সমাপ্ত হয়। এইজন্য কেহ কেহ চৈতন্য-চন্দ্রোদয়'কে কবির প্রথম রচনা বলিতে চাহেন। কবি নাটকের শেষে কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে দুইটি সন পাওয়া যাইতেছ, ১৫৭২-৭৩ অথবা ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ।[20] এ বিষয়ে নানা মত আলোচনা করিয়া ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ১৫৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দকেই 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' রচনার কাল বলিতে চাহেন।[21] ইহা সত্য হইলে কবিকর্ণপূরের কাব্যরচনার পূর্বে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অভিমত মানিয়া লওয়া কঠিন। কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য অপেক্ষা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক অনেক পরিপক্ক রচনা; ইহাতে শিল্পগত ত্রুটিবিচ্যুতি অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই শুধু প্রতাপরুদ্রের তিরোধান-কাল ধরিয়া গ্রন্থের রচনা-সন চূড়ান্তরূপে মীমাংসা করা যায় না। সেই জন্য আমরা 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়'কে কবিকর্ণপূরের দ্বিতীয় গ্রন্থ এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যের পরবর্তী রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহি।[22]

দশ অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকে সংক্ষেপ চৈতন্যজীবনের সমগ্র ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য অপেক্ষা নাটকের কাহিনী বন্ধন অধিকতর প্রশংসনীয়। প্রথম পাঁচটি অঙ্কে চৈতন্যের পুরীধামে বসবাস পর্যন্ত

---

[20] শাকে চতুর্দশশতে রবিবাজিযুক্তে গৌরোহরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলাগ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥

[21] ডঃ মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান।

[22] ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় তাঁহার *Vaishnava Faith & Movement* গ্রন্থে এই নাটককে ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে রচিত বলিয়াছেন।

বর্ণিত হইয়াছে এবং শেষ পাঁচ অঙ্কে চৈতন্যদেবের শেষ কয় বৎসরের কাহিনী নাটকাকারে উপস্থাপিত হইয়াছে।) মধ্যযুগে কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র আদর্শ ও রচনাপ্রকরণ সংস্কৃতজ্ঞ মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। কবিকর্ণপূর চৈতন্যলীলাকথাকে পুরাপুরি রূপকনাটকের ঢঙে রচনা করেন। প্রথম অঙ্কেই দেখা যাইতেছে কলি ও অধর্ম মহানন্দে উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু কলির ভয়—

নবদ্বীপে জগন্নাথনাম্নো মিশ্রপুরন্দরাৎ।
জাত শচ্যাং কুমারোঽয়ং মম কর্মাণি কৃন্ততি॥

(অনুঃ নবদ্বীপে পুরন্দর মিশ্র উপাধিক জগন্নাথ হইতে শচীর গর্ভে এক কুমার জন্মিয়াছে। সেই বালক আমার সমস্ত কর্মই নষ্ট করিতেছে।)

ইহার পরে কি করিয়া কলি ও অধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইল এবং চৈতন্যাবতার প্রেমধর্ম প্রচার করিলেন, তাহাই ইহাতে রূপকের ছলে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও কর্ণপূর পতিত-উদ্ধার ও প্রেমধর্ম-প্রচার মহাপ্রভুর মুখ্য আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যদেব যে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রজবধূগণের আবেগ ও আর্তি উপলব্ধি করিয়াছেন—এই নাটকে তাহারও ইঙ্গিত আছে। নাটকে আছে, রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যপ্রসঙ্গে কাশী মিশ্রকে বলিয়াছিলেন—

গৌর কৃষ্ণ ইতি স্বয়ং প্রতিফলন্ পুণ্যাত্মানাং মানসে
নীলাদ্রৌ নটতীহ সংপ্রথয়তে বৃন্দাবনীয়ং রসঃ।
আদ্যঃ কোঽপি পুমান্ নবোৎসুকবধূকৃষ্ণানুরাগব্যথা
স্বাদী চিত্রমহোবিচিত্রমহো চৈতন্যলীলায়িতম্॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়—১০ম অঙ্ক)

(অনু: এই গৌরচন্দ্র, পুণ্যাত্মাদিগের হৃদয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়া বৃন্দাবনীয় সুমধুর রস বিস্তারপূর্বক নীলাচলে নৃত্য করিতেছেন এবং স্বয়ং আদিপুরুষ হইয়াও নবীনা ব্রজরমণী-গণের কৃষ্ণানুরাগজনিত অপূর্ব বেদনা অনুভব করিতেছেন। অতএব শ্রীচৈতন্যের লীলা অতীব বিচিত্র।)[২৩]

২৩ ডঃ মজুমদার মনে করেন, "শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ প্রভৃতি বাঞ্ছাত্রয় পরিপূরণার্থ শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একথার ইঙ্গিত কবিকর্ণপূরে নাই।" (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ১০১)। জীব-উদ্ধারের কথা 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যে প্রধান হইলেও 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটকে গোপীদের আবেগ-আর্তি উপলব্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যরূপে আবির্ভাব স্পষ্টতঃই স্বীকৃত হইয়াছে।

এই নাটকের আর-একটি বৈশিষ্ট্য, ইহাতে বৈধী ও রাগানুগাভক্তির পার্থক্যবিচার (৩য় অঙ্ক, ১৯শ শ্লোক) স্থান পাইয়াছে। নিম্নে 'মৈত্রী' ও 'প্রেমভক্তি'র কথোপকথনের সাহায্যে দুই প্রকার ভক্তির বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হইতেছে :—

মৈত্রী—দেবী ণ কৃখু অঅং সত্থীঅ মগ্গো।

প্রেমভক্তি—শ্রূয়তাং।

শাস্ত্রীয়ঃ খলু মার্গঃ পৃথগনুরাগস্য মার্গোঽন্যঃ।

প্রথমোঽর্হতি সনিয়মতা মণিমযমতামন্তিমো ভক্ততে ।।[২৪]

অবশ্য কেহ কেহ এই নাটকপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ে'র তুলনায় কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র ঘটনা অধিকাংশ স্থলেই বিবৃতিধর্মী ; নাটকীয় ঘটনাসংঘাত প্রায় কোথাও জমিতে পারে নাই। মানবচরিত্র ও রূপকচরিত্রের (যেমন, কলি, অধর্ম, বিরাগ, ভক্তি, মৈত্রী, প্রেমভক্তি ইত্যাদি) কথোপকথনের সাহায্যে চৈতন্যদেবের জীবনকথা বিবৃত হইয়াছে, ঘটনাসংঘাতের সাহায্য লওয়া হয় নাই। ফলে নাট্যধর্ম একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।[২৫] ইহাতে ধর্ম ও তত্ত্বের কথা অনেক আছে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব প্রায় কোথাও রসে পরিণত হয় নাই। কারণ কবি নাট্যরস সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। চৈতন্য-জীবনকথা, ভক্তিধর্ম প্রভৃতি বর্ণনাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তাঁহার নাটকে পুরাপুরি নাট্যগুণ পাওয়া যাইবে না। উপরন্তু চৈতন্যজীবনীতে নাটকীয় ঘটনার বিশেষ প্রাচুর্য নাই। এরূপ জীবনকথা লইয়া রূপক নাটক রচনা করিলে ঘটনাসংবেগের (action) স্থলে বিবৃতি (naration), আবেগ ও তত্ত্বকথা প্রাধান্য পাইবেই। তবু তিনি যে রূপক-

[২৪] মৈত্রী—দেবি, শাস্ত্রে তো এরূপ বিধি নাই।

প্রেমভক্তি—শ্রবণ কর, শাস্ত্রোক্ত প্রণালী ও অনুরাগের প্রণালী এই উভয়ের পরস্পর বিশেষ বিভিন্নতা আছে। কারণ শাস্ত্রোক্ত প্রণালী বিবিধ নিয়মের অপেক্ষা করে। কিন্তু অনুরাগের পথে নিয়মের কোন আবশ্যকতা নাই। (অনুবাদ)

[২৫] ডঃ দে-র মত অতিশয় যুক্তিযুক্ত—"Kavikarnapura writes for purely literary effect with a consciously affected, but conventional diction, and is often indifferent to the realities of life or drama ; while his religious ardour is not passionate enough nor his poetic fancy enchanting enough to invest his drama with a higher poetic naturalness".—*Vaishnava Faith & Movement*, p. 437.

নাটকের আদর্শ কিয়দংশে অনুসরণ করিয়াছেন, এবং সুকৌশলে বাস্তব চরিত্র ও রূপক চরিত্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ইহাও অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

কবিকর্ণপূরের অবশিষ্ট রচনার মধ্যে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটিতে কৃষ্ণ ও তাঁহার সখাসখীগণের সঙ্গে চৈতন্যাবতার ও চৈতন্যপরিকরদের অবতারত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। চৈতন্যদেব যখন ব্রজেন্দ্রনন্দনের সঙ্গে একীভূত হইয়া গেলেন, তখন চৈতন্য-পারিষদবর্গও যে দ্বাপরের কৃষ্ণ-সখাসখীর অবতার বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ? বৃন্দাবনের গোস্বামী-সম্প্রদায় এই ধরণের আধুনিক অবতারবাদ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ বিরাগবশতঃ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যতিরোধানের অল্প পরেই গৌড়বঙ্গে চৈতন্যের মাতাপিতা, শিক্ষক, গুরু, অনুচরবৃন্দ—সকলেই পুরকালীন ব্রজনরনারীর অবতাররূপে ব্যাখ্যাত হইলেন। এই গ্রন্থটি রূপ গোস্বামীর নামে প্রচারিত 'রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা'র ('শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা' নামেও পরিচিত) আদর্শে রচিত হইয়াছিল।[২৬] বহরমপুর হইতে প্রকাশিত কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র শেষে ১৪৯৮ শকে গ্রন্থ সমাপ্তির কথা আছে।[২৭] তাহা হইলে ইহা কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য (১৫৪২)

---

২৬ বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে রূপ গোস্বামীর নামে 'রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা' প্রকাশিত হইয়াছে। ডঃ দে-র মতে ইহা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রচিত (*Vaishnava Faith & Movement*, ৩৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা)। কিন্তু ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ নহে। গ্রন্থটি যে কিঞ্চিৎ সংশয়পূর্ণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ শ্রীজীব-গোস্বামী রূপ গোস্বামীর যে গ্রন্থতালিকা দিয়াছেন, তাহাতে ইহার উল্লেখ নাই। মুদ্রিত গ্রন্থে রূপ নিত্যানন্দের বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসহোদিতম্"। রূপ অন্যান্য গ্রন্থের কোথাও এরূপভাবে নিত্যানন্দের বন্দনা করেন নাই। অবধূত নিত্যানন্দের অশাস্ত্রীয় আচার-আচরণ রূপের ভাল না লাগিবারই কথা। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ডঃ মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' (পৃ. ১৪০-৪৪) দ্রষ্টব্য।

২৭ শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য ঘস্রাৎ।
চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমগ্নিচিত্তৈঃ
শোধ্যঃ সমাকলিতগৌরগণাখ্য এষঃ ॥

রচনার পর ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। কারণ কবির 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং শ্রীবাসকে যথাক্রমে বলরাম, শিব এবং নারদের অবতার বলা হইয়াছে। কেহ কেহ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' কবিকর্ণপূরের গ্রন্থ কিনা যে বিষয়ে সংশয় তুলিয়াছেন।[২৮] কাহারও কাহারও মতে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ নাকি ইহা রচনা করিয়া কর্ণপূরের নামে চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অনুমান যথেষ্ট প্রামাণিক নহে। কারণ নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' এবং কৃষ্ণদাসের 'ভক্তমালে' স্পষ্টতঃই এই কাব্যকে কর্ণপূরের রচনা বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা যে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনের রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কবি গ্রন্থারম্ভে নিজ জনকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশপ্রদীপকং।
বন্দেঽহং পরয়া ভক্ত্যা পাষদগ্র্যং মহাপ্রভোঃ ॥

(অনুঃ যিনি মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি আমার পিতা, সেনবংশপ্রদীপ শ্রীশিবানন্দ সেনকে ভক্তিসহকারে বন্দনা করি।)

দুই শত পনেরটি শ্লোকে রচিত এই ক্ষুদ্র কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, চৈতন্য-তিরোধানের পর শুধু চৈতন্যকেই নহে, চৈতন্য-সম্পর্কিত প্রায় সকলকে লইয়া কিরূপ অবতারচক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বাঙলাদেশে চৈতন্যপরিকরগণও কীভাবে দেবদেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহার কৌতূহলজনক পরিচয় পাওয়া যাইবে। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ এইসমস্ত গৌড়ীয় অবতারলীলা নিশ্চয় বিশ্বাস করিতেন না, স্বীকারও করিতেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই পুস্তিকার নামও উল্লেখ করেন নাই।

কবিকর্ণপূর এই পুস্তিকায় দ্বাপরের বৃন্দাবনের নরনারীর সঙ্গে কলিযুগে চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্যভক্তদের একীকরণ করিয়াছেন। দ্বাপরের গোপগোপী ও দেবতারা নবদ্বীপে চৈতন্যলীলায় কে কোন্ মর্ত্যভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কর্ণপূর খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

---

[২৮] কাশিমবাজার সাহিত্যসম্মিলনীতে রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ 'বৈষ্ণবসাহিত্য' নামক আলোচনায় প্রকাশ্যে এই সংশয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পরে কেহ কেহ সাংখ্যতীর্থের এই সংশয় সমর্থন করিয়াছিলেন।

আমরা এখানে কবিকর্ণপুর-কথিত দ্বাপর ও কলিযুগের অবতারের তালিকা উল্লেখ করিতেছি।

কৃষ্ণাবতারে বৃন্দাবনের চরিত্র		চৈতন্যাবতারে কলিযুগের চরিত্র
কৃষ্ণ	...	চৈতন্য
বলরাম	...	নিত্যানন্দ
শিব	...	অদ্বৈত
পর্জন্য (কৃষ্ণের পিতামহ)	...	শ্রীহট্টের উপেন্দ্র মিশ্র (চৈতন্যের পিতামহ)
বরীয়সী (কৃষ্ণের পিতামহী)	...	কলাবতী (চৈতন্যের পিতামহী)
যশোদা	...	শচীদেবী
নন্দ	...	জগন্নাথ-পুরন্দর
অম্বিকা (শ্রীকৃষ্ণের স্তনদাত্রী)	...	মালিনী (শ্রীবাসের পত্নী)
কিলিম্বিকা (ইনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন)	...	নারায়ণী (বৃন্দাবন দাসের জননী)
লক্ষ্মী	...	লক্ষ্মী (চৈতন্যের প্রথমা পত্নী)
সত্যভামা	...	বিষ্ণুপ্রিয়া
সান্দীপনি মুনি	...	কেশব ভারতী
বারুণী ও রেবতী (বলরামের দুই পত্নী)	...	বসুধা ও জাহ্নবী (নিত্যানন্দের দুই পত্নী)
হনুমান	...	মুরারি গুপ্ত
সুগ্রীব	...	গোবিন্দানন্দ
বিভীষণ	...	রামচন্দ্রপুরী
বেদব্যাস	...	বৃন্দাবন দাস
উদ্ধব	...	পরমানন্দপুরী
ইন্দ্রদ্যুম্ন	...	প্রতাপরুদ্র
বৃহস্পতি	...	বাসুদেব সার্বভৌম
অর্জুন	...	রায় রামানন্দ

কৃষ্ণাবতারে বৃন্দাবনের চরিত্র		চৈতন্যাবতারে কলিযুগের চরিত্র
সুবাহু (ব্রজের গোপ)	•••	উদ্ধারণ দত্ত (নিত্যানন্দের ধনী ভক্ত)
শ্রীরাধা	...	গদাধর পণ্ডিত
বিশাখা	...	স্বরূপ গোস্বামী
বীরাদূতী (যিনি গোপীদিগকে কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতেন)	...	শিবানন্দ সেন (কবি-কর্ণপূরের পিতা)
মধুমতী	...	নরহরি সরকার
রূপমঞ্জরী	...	রূপ গোস্বামী
রতিমঞ্জরী বা লবঙ্গমঞ্জরী	...	সনাতন গোস্বামী
	...	গোপাল ভট্ট
রাগলেখা ও কলাকেলী (রাধার দুই জন দাসী)	...	শিখি মাহাতী ও তাঁহার ভগিনী
সৈরিন্ধ্রী (মথুরায় কৃষ্ণপ্রিয়া)	...	পুরীর কাশী মিশ্র

এখানে লক্ষ্য করা যাইবে কর্ণপূর শুধু দ্বাপরের নহে, ত্রেতা যুগের হনুমান ও বিভীষণ প্রভৃতিকে গৌড়ে শ্রীহট্টে অবতার হইতে বাধ্য করিয়াছেন। অবশ্য কৃষ্ণের সখীগণ বা রাধার বয়স্যাগণ নবদ্বীপলীলায় পুরুষরূপ গ্রহণ করাতে আধুনিক পাঠক কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করিবেন। এইজন্য কর্ণপূর একটি শ্লোকে একথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

গৌরেণ তৎপ্রিয়ৈঃ সার্ধং ধৃতপুরুষবিগ্রহাঃ।
খেলান্ত স্ম স্বভাবানুসারাত্তাঃ ক্রমশো যথা॥

(অনুঃ তাঁহারা অর্থাৎ গোপীরা পুরুষদেহ ধারণ করিয়া স্বভাবানুসারে গৌরাঙ্গের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিলেন।)

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে ও তত্ত্বাদর্শে নানারূপ বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের কারণ স্বরূপ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' তদানীন্তন লোক-সমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। দ্বাপরের ব্রজধাম এবং কলিযুগের নবদ্বীপ ও নীলাচলকে একসূত্রে মিলাইয়া দিয়া এবং চৈতন্য-পার্শ্বচরগণকে এক-একটি দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবিকর্ণপূর যে নব-অবতারমালা গ্রন্থন করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালের বৈষ্ণবসমাজ, বিশেষতঃ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও

গদাধরের 'গণে'রা তাহা হইতে প্রচুর উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব-ইতিহাস ও সমাজগঠনে কবিকর্ণপূরের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী ॥

কাশীবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন এবং চৈতন্যমহিমা অবলম্বনে 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' নামক একখানি স্তবগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে গোপালভট্ট প্রসঙ্গে আমরা প্রবোধানন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছি। চৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণে গিয়া ত্রিমল্লভট্টের গৃহে বর্ষা যাপন করিয়াছিলেন। গোপাল ত্রিমল্লের কনিষ্ঠ পুত্র। ইহারা সকলেই চৈতন্যের ভক্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্য প্রবোধানন্দের উপর বালক গোপালের শিক্ষার ভার দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অল্পাধিক সংশয়-সন্দেহ আছে। বাস্তবিক প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোপালের পিতৃব্য কিনা তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।[২৯] তবে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, প্রবোধানন্দ কাশীতে বাস করিতেন, গোপাল তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। 'হরিভক্তিবিলাসে' গোপাল প্রবোধানন্দকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পিতৃব্য বলিয়া পরিচয় দেন নাই, বা তাঁহার সহিত কোনপ্রকার আত্মীয়তার কথাও স্বীকার করেন নাই।

কেহ কেহ প্রবোধানন্দের সঙ্গে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।[৩০] চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য, ১৭শ) বৈদান্তিক ও চৈতন্যদ্বেষী প্রকাশনন্দ সরস্বতীর চৈতন্যভক্তে পরিণত হইবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।[৩১]

[২৯] এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

[৩০] ৪০৪ চৈতন্যাব্দে রামদয়াল ঘোষ প্রবোধানন্দের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' মুদ্রিত করিয়া তাহাতে সংস্কৃত শ্লোকগুলিকে বাংলা পয়ারে অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দকে একই ব্যক্তি বলিয়াছেন।

[৩১] চৈতন্যভাগবতে বরাহ-অবতাররূপে চৈতন্য মুরারি গুপ্তের কাছে অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দের কার্যের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন :

> হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
> বেদে মোরে এই মত করে বিড়ম্বন ॥
> কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
> সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
> বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
> সর্ব সঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥

প্রকাশানন্দ দশনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপশাখা 'সরস্বতী' সম্প্রদায়ভুক্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন এবং কাশীধামে শিষ্যপরিবৃত হইয়া অদ্বৈত তত্ত্বালোচনায় কালাতিপাত করিতেন। তিনি চৈতন্যের আবেগ-ব্যাকুলতা ও নৃত্যগীতাদিতে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কাশীতে লোকে দলে দলে চৈতন্যদর্শনে ধাবিত হইতেছিল, মায়াবাদী প্রকাশানন্দ তাহা সহিতে না পারিয়া চৈতন্যসম্বন্ধে অসূয়াবশে উগ্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন :

সন্ন্যাসী নামে মাত্র—মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ॥[৩২]
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

চৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন :

ভাবকালী বেচিতে আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লৈয়া যাব ঘরে ॥
ভারি বোঝা লইয়া আইলাম কেমনে লৈয়া যাব।
অল্পস্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব ॥

চৈতন্যবিরোধী প্রকাশানন্দও পরিশেষে মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি।[৩৩]

প্রবোধানন্দ চৈতন্যকে বিশেষ ভক্তি করিতেন, 'গৌরপারম্যবাদে'র তিনিও অন্যতম প্রচারক। তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' ১৪৩ শ্লোকে সম্পূর্ণ চৈতন্য-ভক্তিবিষয়ক স্তোত্রকাব্য। স্তুতি, নীতি, আশীর্বাদ, গৌরাঙ্গভক্তমহিমা, গৌরাঙ্গ-অভক্ত নিন্দা, দৈন্য, উপাস্যনিষ্ঠা, লোকশিক্ষা, চৈতন্যোৎকর্ষ, অবতার-মহিমা, রূপোল্লাস, শোচক—মোট বারটি অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই স্তুতিকাব্য চৈতন্যজীবনী আলোচনায় অবহেলিত হওয়া উচিত নহে। যদিও কবি প্রবোধানন্দের কবিতাগুলি সাহিত্যবিচারে বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারিবে না, তবু চৈতন্যের প্রতি একান্ত ভক্তি ও আত্মনিবেদন কবির অন্তরটিকে মেলিয়া ধরিয়াছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অপেক্ষা গৌড়ীয়

---

৩২ ভণ্ডামি, বুজরুকি।

৩৩ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র সম্পাদক ও অনুবাদক উক্ত পুস্তিকার ভূমিকায় বলিয়াছেন—"শ্রীপ্রকাশানন্দ নামের পরিবর্তে শ্রীপ্রবোধনন্দ সরস্বতী রাখিলেন।" (ঐ, ভূমিকা, পৃ. ১) সম্পাদকের এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অমূলক।

বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রভাবই তাঁহার উপর অধিকতর কার্যকরী হইয়াছিল। চৈতন্যদেবকেই তিনি 'পরম তত্ত্ব' (Ultimate Reality) বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রকাশ্যে চৈতন্যপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। এইজন্য বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই, এমন কি তাঁহার শিষ্য (ভ্রাতুষ্পুত্র ?) গোপাল ভট্টও তাঁহার সম্বন্ধে মিতবাক। তিনি শুধু 'গৌরপারম্যবাদে'ই[৩৪] আসক্ত ছিলেন না,—প্রবোধানন্দ মনে করিতেন যে, কৃষ্ণই ব্রজমণ্ডলের সখাসখীদের লইয়া মর্ত্যলোকে চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যথা—

সর্বে শঙ্কর নারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি প্রাপ্তা দেব-
হলায়ুধোঽপি মিলিতোজাতাশ্চ তে বৃষ্ণয়ঃ।
ভূয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপালগোপ্যাদয়ঃ
পূর্ণ প্রেমরসেশ্বরেঽবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি॥

(অনুঃ প্রেমরসে পূর্ণ শ্রীগৌরচন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার সঙ্গে শঙ্কর, নারদ, লক্ষ্মী, বলরাম, ব্রজবাসী, বৃষ্ণিবংশের আর আর সকলে, গোপ ও গোপীগণও আবির্ভূত হইলেন।)

কবিকর্ণপূর তাঁহার 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় এই তত্ত্বটিকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রবোধানন্দ আরও দুই একটি শ্লোকে চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের যুগলতনুর ভাবমূর্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সাক্ষাদ্রাধামধুরিপুবপুর্ভাতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ" এবং "বিভ্রৎকান্তিং বিকচ কনকাম্ভোজ গর্বাভিরামামেকীভূতং পুরুধত্ত বো রাধয়া মাধবস্ত" শ্লোকই তাহার প্রমাণ। কবি প্রবোধানন্দ 'গৌরনাগর'[৩৫] মতেও বিশ্বাসী ছিলেন। এই স্তবমালার ১৩২ শ্লোকে উক্ত "ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যান্নিজৈর্নামভিঃ" পংক্তি তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে। চৈতন্য কৃপালাভের পূর্বে প্রবোধানন্দ যে বৈদান্তিক ও মুমুক্ষু ছিলেন, তাহাও তিনি একটি শ্লোকে স্বীকার করিয়াছেন[৩৬] :

তাবদ্ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্নতিক্তী ভবেত্তাবচ্চাপি
বিশৃঙ্খলত্ব ময়তে নোলোকে বেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা বহির্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজ প্রিয়জনো যাবন্নদৃগ্‌গোচরঃ॥

৩৪-৩৫ ইতিপূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

৩৬ এই জন্য কেহ কেহ বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ এবং কবি প্রবোধানন্দের মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

(অমুঃ যতদিন শ্রীচৈতন্যের পদাম্বুজ ভক্তগণের নয়নপথে পতিত হয় না, ততদিন ব্রহ্মকথা, মুক্তিবিচার কাহারও নিকট তিক্ত বোধ হয় না, ততদিন বেদস্থিতি, ততদিন শাস্ত্রজ্ঞগণের শাস্ত্রবিদ্যা-বহির্বর্ত্মে মিথ্যা কোলাহল।)

প্রবোধানন্দের ক্ষুদ্র স্তবকাব্যটিতে বৃন্দাবনসম্প্রদায়ের অননুমোদিত তত্ত্বকথা ইত্যাদি ছিল বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব লেখকগণ নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার নামে আরও কয়েকখানি কাব্য প্রচলিত আছে—'সঙ্গীতমাধব', 'বৃন্দাবনমাহমামৃত, 'গোপালতাপনী'র টীকা, 'বিবেক-শতক' ইত্যাদি। ইহার মধ্যে 'সঙ্গীতমাধবে' শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি প্রণাম নিবেদন করা হইয়াছে, এবং 'বৃন্দাবনমহিমামৃতে' কৃষ্ণলীলার বিষয়ীভূত বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা রহিয়াছে। এই দুইখানি কাব্য প্রবোধানন্দের রচিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু অপরগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। এই কাব্য ও স্তোত্রগুলিতে তাঁহার চেষ্টাকৃত কবিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু স্তোত্রকাব্য হিসাবে 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র যেরূপ মূল্যই থাক না কেন, চৈতন্যতত্ত্বের বিকাশ জানিবার জন্য ইহার উল্লেখ প্রয়োজন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ 'গৌরপারম্য-বাদ' ও 'গৌরনাগরভাব' না মানিলেও কাশী ও গৌড়ে এই প্রকার চৈতন্যতত্ত্ব বিশেষভাবে প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রবোধানন্দের এই পুস্তিকা হইতে জানা যাইবে।

স্বরূপ-দামোদর ॥

স্বরূপ-দামোদরের 'কড়চা' লইয়া অত্যন্ত জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে; তাহার কারণ এই গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, অথচ নানাস্থানে ইহার উল্লেখ ও প্রসঙ্গ রহিয়ছে। স্বরূপ-দামোদরের পূর্বনাম পুরুষোত্তম আচার্য, নিবাস নবদ্বীপ। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যে আছে যে, পুরুষোত্তম আচার্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'রসরূপতা' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বরূপ-দামোদর নামে কথিত হইতেন।[৩৭] স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভু অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ

৩৭ 'রসরূপতা'র অর্থ—কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। চৈতন্যচরিতামৃতে স্বরূপ সম্বন্ধে আছে :

সন্ন্যাস করিল শিখাসূত্র ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে 'যোগপট্ট' (সন্ন্যাসীরা জানু উর্ধ্বে করিয়া যে দৃঢ় বস্ত্রদ্বারা পৃষ্ঠ ও জানু বেড় দিয়া বাঁধিয়া থাকেন তাহার নাম 'যোগপট্ট') লইতে হয়। কিন্তু তিনি যোগপট্ট না লইয়া নিজ স্বরূপ অর্থাৎ নিজের পূর্বরূপে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বরূপ নাম হইয়াছিল।

ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরেও কিছুকাল জীবিত ছিলেন এবং শেষ দিন কয়টি বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পুরীধামে স্বরূপ নিত্য নিয়ত মহাপ্রভুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। নৃত্যগীতে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। বৈষ্ণব তত্ত্ব, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের আদি ভাষ্যকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কেহ কেহ বলেন যে, কৃষ্ণদাসের চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রথমে উল্লিখিত যে শ্লোক দুইটির উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে[৩৮], তাহা নাকি স্বরূপ-দামোদরের রচনা। অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ হইয়াছে। চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের যুগলতনু—এই তত্ত্ব-কথাটি বোধহয় স্বরূপের আবিষ্কার এবং তাঁহার দ্বারাই ইহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। রঘুনাথ দাস চৈতন্যদেবের উপদেশপ্রার্থী হইলে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণবধর্ম ও রসতত্ত্বে স্বরূপ-দামোদরের অভিজ্ঞতা তাঁহার অপেক্ষাও অধিক, সুতরাং তিনি রঘুনাথকে স্বরূপের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে উপদেশ দিলেন :

হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থান।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে।

স্বরূপ-দামোদর প্রথম জীবনে 'দণ্ডী' শাখাভুক্ত অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। পরে চৈতন্যলীলা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পুরীধামে মহাপ্রভুর সেবাব্রত গ্রহণ করেন। চৈতন্যের ভাবোন্মত্ত জীবনের সম্পূর্ণ ভার লইয়া তিনি মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠতম সাহচর্যে আসিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ তাঁহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। অভিনব প্রেমধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথা তাঁহার যতটা জানা ছিল, অন্য কেহ ততটা জানিতেন না। কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' এবং

---

৩৮ রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহ-ভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপং॥ ৫॥ চৈ. চ.
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ
সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ ৬॥ চৈ. চ.

রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে স্বরূপের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিকর্ণপূর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত 'পঞ্চতত্ত্বে'র উদ্ভাবয়িতা হইতেছেন স্বরূপ-দামোদর। এই 'পঞ্চতত্ত্ব' বা পাঁচটি প্রধানতত্ত্ব যথাক্রমে—(১) চৈতন্য (২) নিত্যানন্দ (৩) অদ্বৈত (৪) গদাধর (৫) শ্রীবাস।

চৈতন্যসম্প্রদায়ের নিকট স্বরূপ অতিশয় মান্য ছিলেন। চৈতন্যতত্ত্বের নিগূঢ় নির্যাসের তিনিই ছিলেন ভাণ্ডারী। তাঁহার শিষ্য রঘুনাথ দাস 'স্তবাবলী'-তে চৈতন্যদেবকে "স্বরূপস্য প্রাণার্বুদকমলীনীরাজিত মুখঃ" এবং 'গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরু'-তে "স্বরূপে যঃ স্নেহঃ গিরিধর ইব শ্রীল সুবলে" বলিয়া অশেষ শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁহার গ্রন্থের নানা স্থলে স্বরূপের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন :

অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥

এ কথা অবশ্য সত্য যে,

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥

সংস্কৃতে রচিত মুরারির 'কড়চা' পাওয়া গিয়াছে। স্বরূপ দামোদরও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহা 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন :

প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥

তাঁহার আরও অভিমত যে, স্বরূপ গোঁসাই ও রঘুনাথ দাসের কড়চাতে চৈতন্য-লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইজন চৈতন্যলীলার অন্ত্যপর্ব্বের সাক্ষী ছিলেন। অন্যান্য রচনাকারগণ দূরে থাকিতেন, সুতরাং মহাপ্রভুর নীলাচলের গূঢ় গহন লীলা স্বরূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ যতটা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন অন্য ভক্ত ও লেখকগণ ঠিক ততটা জানিতেন না, বা প্রত্যক্ষ করেন নাই। কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—"স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।" অর্থাৎ স্বরূপ সংস্কৃতে সূত্রাকারে এই 'কড়চা' রচনা করেন এবং রঘুনাথ দাস তাহার বৃত্তি বা ব্যাখ্যা রচনা করেন। অথচ দেখা যাইতেছে রঘুনাথ 'স্তবাবলীতে' (চৈত-

ন্যাষ্টক) ও 'গৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরু'-তে মোট কুড়িটি শ্লোকে চৈতন্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্বল্প রচনাকে বৃত্তি বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃতে রঘুনাথের 'গৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরু' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, অথচ যে-স্বরূপ চৈতন্যতত্ত্বের ভাণ্ডারী, তাঁহার কোন শ্লোক উল্লেখ করেন নাই।[৩৯] কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টতই স্বরূপের কাছে ঋণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন :

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসার।
রামানন্দ-মিলন লীলা করিল প্রচার॥

কিন্তু তাঁহার কোন উক্তি চৈতন্যচরিতামৃতে কেন উদ্ধৃত হয় নাই. তাহা বুঝা যাইতেছে না।

স্বরূপের তথাকথিত 'কড়চা' না পাওয়াতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের যুগলতনু-বিষয়ক চৈতন্যতত্ত্বের যে অভিনব পরিকল্পনা স্বরূপের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং তিনি সেই তত্ত্বকে কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা কৌতূহলী পাঠকের জানিবার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন, রঘুনাথের শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন, যাঁহার পাণ্ডিত্য চৈতন্যদেবেরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ যাঁহার অবলম্বিত চৈতন্যতত্ত্বকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। অবশ্য বটতলা হইতে তান্ত্রিক ও সহজিয়া বৈষ্ণবপন্থার গূঢ় সাধনভজন সংক্রান্ত যে সমস্ত পুস্তিকা 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অর্বাচীন কালের অপদার্থ রচনা। মূল গ্রন্থটির সন্ধান নাই বলিয়া এইরূপ বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় আর একটি বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। মালদহ জেলার অধিবাসী হারাধন দাসবৈষ্ণব 'আশ্রয়-সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়'

[৩৯] কেহ কেহ মনে করেন যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৫-৬ শ্লোক দুইটি (ইতিপূর্বে উল্লিখিত) নাকি স্বরূপ দামোদরের রচনা এবং সম্ভবতঃ তাঁহার 'কড়চা'র (পাওয়া যায় নাই) অন্তর্ভুক্ত। এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে, কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র কোন প্রাচীন পুঁথিতে এই শ্লোক যে, স্বরূপের রচনা—এরূপ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। দ্রষ্টব্য : ডঃ সুশীলকুমার দে প্রণীত *Vaishnava Faith & Movcment*, p 31 (foot note) এবং *Indian Historical Quarterly*, 1933

নামক বাংলা পয়ারে রচিত চারিখণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকেই হারাধন দাস মহাশয় স্বরূপ-দামোদরের কড়চা বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন। এরূপ বিশুদ্ধ জালিয়াতি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনেক চলিয়াছিল।[৪০] সে যাহা হোক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে স্বরূপকে 'চৈতন্য-লীলারত্নসার' বলিয়াছেন এবং আধুনিক যুগের গবেষক যাঁহাকে "শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা"[৪১] বলিয়াছেন, নানা তথ্যের খনি এই কড়চাখানি আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহার কি নাম ছিল তাহাও জানা যাইতেছে না। পরবর্তী কালে ইহা কেন প্রচারিত হয় নাই, কেনই-বা বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার উদ্ধৃতি নাই, তাহার কারণ অজ্ঞাত। সে যাহা হোক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলে বিশেষতঃ চৈতন্যতত্ত্বদর্শনে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য সে যুগের বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হইয়াছিল। বৃন্দাবনের সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীরা মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইলেও তাঁহারা মূলতঃ কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যায় সমস্ত প্রচেষ্টা, মনন ও তত্ত্বদর্শনকে পরিচালিত করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বরূপদামোদরের প্রভাবে বৃহত্তর বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যতত্ত্ব যে অধিকতর গুরুত্ব ও প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

চৈতন্যদেবের বাঙলা জীবনীকাব্য

ইতিপূর্বে আমরা যে সংস্কৃত জীবনীগুলির আলোচনা করিলাম—সেগুলির কোনটি মহাকাব্য, কোনটি স্তোত্রকাব্য, কোনটি-বা নাটক। সংস্কৃতে রচিত হওয়ার জন্য সাধারণ পাঠকগণ তাহা হইতে যে বিশেষ লাভবান হইত তাহা মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এই সমস্ত গ্রন্থের প্রত্যক্ষ যোগও ততটা দৃষ্টিগোচর নহে। বাঙলার বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যদেবের বাংলা জীবনীকাকাব্যগুলিই অতিশয় প্রচার লাভ করিয়াছিল। এগুলি বাঙলাভাষায় রচিত হইয়াছিল, কোনটি-বা সুরে-তালে গীত হইত, কোনটিতে প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসৃত হইয়াছে। কাজেই সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তিও এই বাংলা জীবনীগুলি হইতে চৈতন্যের

৪০ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ৩৩২ (পাদটীকা)

৪১ ঐ

অলৌকিক জীবনকথা এবং বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব ও রহস্য বুঝিতে পারিতেন। বৈষ্ণব সমাজের বাহিরেও সাধারণ পাঠকমহলে এই জীবনীগুলির কিছু কিছু চাহিদা ছিল। বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইহাদের নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। বাঙালীর জীবন, সমাজ ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক মৌলিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই জীবনীগ্রন্থগুলিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়াছে। ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব-পদসাহিত্য, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ইত্যাদির গঠন ও ক্রমবিকাশে এই জীবনীসমূহ দীপ-বর্তিকার মতো আলোক দান করিয়াছিল। কাজেই নানা দিক দিয়া চৈতন্যের বাংলা জীবনীকাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবিস্তারে আলোচিত হওয়া কর্তব্য। বর্তমান প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ পরিসরের জন্য আমরা সংক্ষেপে চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলির পরিচয় লইতেছি।

বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত ॥

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বাংলায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আদিতম। গ্রন্থটি অতিশয় সুললিত ভাষায় রচিত হইয়াছিল—বৃন্দাবন উৎকৃষ্ট রচনাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার কাব্যে চৈতন্যজীবনের প্রধান ঘটনা, বিশেষতঃ আদিপর্বের কাহিনীকে সরস ও স্বচ্ছন্দ গতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে তত্ত্বের নিগূঢ় আলোচনা অপেক্ষা চৈতন্য-জীবনকাহিনী ও চৈতন্য ভক্তদের নানা কথা অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। ফলে সাধারণ বৈষ্ণব-সমাজে এই গ্রন্থের সর্বাধিক প্রচার হইয়াছিল। এখনও এ গ্রন্থের গৌরব ও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে। চৈতন্য-জীবনীর যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই চৈতন্যভাগবতের পুঁথি।[৪২] সুতরাং গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা সহজেই বুঝা যাইতেছে। অবশ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একখানি সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ; পাণ্ডিত্য, মনীষা, ভূয়োদর্শন, মননের গভীরতা, দার্শনিক তত্ত্বনিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধিৎসা বিচারে কৃষ্ণদাস অদ্যাপি অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ স্বল্পশিক্ষিত জনের জন্য নহে; উপরন্তু তিনি চৈতন্যজীবনকথা অপেক্ষা চৈতন্যতত্ত্বকথার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—যাহা সূক্ষ্ম-

---

৪২ ডঃ মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ১৭৫

বুদ্ধির পণ্ডিতের আদরের সামগ্রী। এই জন্য বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত সাধারণ ভক্তসমাজে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

বৃন্দাবনদাসের পরিচয়॥ চৈতন্য-জীবনীকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থ মধ্যে নিজেদের বংশতালিকা, পরিচয় ইত্যাদি স্বল্পপরিসরে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে আমরা অতি অল্প তথ্যই জানিতে পারিয়াছি; উপরন্তু তাঁহার পিতৃপরিচয় কোথাও উল্লিখিত না থাকাতে (তিনিও নিজ গ্রন্থ মধ্যে পিতার নাম করেন নাই, মাতার নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন), সে যুগের সমাজে বোধহয় একটু সংশয়ের গুঞ্জন উঠিয়াছিল। নবদ্বীপে শ্রীবাসের আঙ্গিনা বৈষ্ণবসমাজের তীর্থস্থান; এখানে গৌরাঙ্গ সপারিষদ লীলা করিয়াছিলেন। শ্রীবাসেরা চারিভাই; চারিজনই চৈতন্যের পরম ভক্ত। শ্রীবাসের তিন ভাইয়ের নাম লইয়াও বৈষ্ণবগ্রন্থে কিছু গোলমাল আছে। স্বয়ং বৃন্দাবন শুধু দুই জনের নাম করিয়াছেন—শ্রীবাস ও শ্রীরাম। কবিকর্ণপূর শ্রীপতি বলিয়া আর এক ভাইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। 'প্রেমবিলাসে' শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত—এই চারি ভাইয়েরই নাম পাওয়া যাইতেছে।[৪৩] এই 'প্রেম-বিলাসে'র মতে শ্রীবাসের আর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম নলিনী পণ্ডিত। তিনি পূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা নারায়ণী, বৃন্দাবনদাস এই নারায়ণীর পুত্র। কেহ কেহ নারায়ণীকে শ্রীরামের কন্যা বলিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে সেরূপ কোন উল্লেখ নাই।[৪৪] বৃন্দাবন চৈতন্যভাগবতের কয়েকস্থলে মাতা নারায়ণীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, অন্ত্যখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটু বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন:

সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবনদাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত॥

মধ্যখণ্ডের ২য় অধ্যায়ে নারায়ণীর বালিকাবয়সের একটি কাহিনী আছে। নবদ্বীপে রটনা হইল, বৈষ্ণবদের কীর্তন ও নামগানে ক্রুদ্ধ হইয়া স্থলতানের চরগণ তাঁহাদিগকে ধরিতে আসিতেছে; ইহাতে ভক্তগণ কিছু শঙ্কিত হইলে

---

৪৩ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে এই চারি ভ্রাতার নাম—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। (আদি, ১০ম)

৪৪ এই বিষয়ে আলোচনার জন্য ডঃ মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' (পৃ. ১৭৬) দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যদেব দিব্যাবেশে নিজ মহিমা ও বিভূতি প্রকাশ করিলেন এবং ভক্তগণের রাজভীতি এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মোর শক্তি দেখ্ এবে নয়ন ভরিয়া।" তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে চারি-বৎসরের বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল :

সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম নারায়ণী॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী'॥
সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ।
আজ্ঞা কৈল 'নারায়ণি কৃষ্ণ বলি কাঁদ'॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদে নাহিক সম্বিত॥[৪৫]

এই নারায়ণীই হইতেছেন বৃন্দাবনের গর্ভধারিণী—শ্রীবাস বৃন্দাবনের জ্যেষ্ঠ মাতামহ। কিন্তু গোল বাধিয়াছে ইহার পর হইতে। বৃন্দাবন তাঁহার গ্রন্থের আর একস্থলে মাতার উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যের ভুক্তাবশিষ্ট বালিকা নারায়ণী আহার করিয়াছিলেন :

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান॥

অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাব ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥[৪৬]

এই বর্ণনার পর বৃন্দাবন দাস ধৈর্য হারাইয়া অবিশ্বাসীদের গালি দিয়াছেন-যাহা বৈষ্ণব-বিনয় ও সহিষ্ণুতার ঘোর বিরোধী :

---

[৪৫] মুরারি গুপ্ত তাঁহার 'কড়চা'তে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে :
শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াভর্তৃকা মধুর দ্যুতিঃ
প্রাপ্য হরেঃ প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা॥

[৪৬] চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে :
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥

এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সন্ত অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥

বৃন্দাবন প্রায়শঃই এইরূপ প্রসঙ্গে অবিশ্বাসীদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। তাহার গূঢ় কারণটি এখানে ইঙ্গিত করা যাইতেছে। অবশ্য এই ব্যাপারটি বৈষ্ণবসমাজে কিছু গোপনীয়তা অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও বিপজ্জনক। বৃন্দাবনদাস কোথাও পিতার নাম উল্লেখ করেন নাই। যদিও চৈতন্যভাগবতের চার-পাঁচ স্থলে মাতা নারায়ণীর কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। নারায়ণী বাল্যকাল হইতেই চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। চৈতন্যদেব চারিবৎসরের নারায়ণীকে কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদাইয়াছিলেন। কিন্তু কাহার সঙ্গে নারায়ণীর বিবাহ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে প্রামাণিক উৎসগুলি একেবারে নীরব। কৃষ্ণদাস কবিরাজও "বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন" বলিয়াই মৌন হইয়াছেন। সুতরাং বৃন্দাবনের পিতৃপরিচয় লইয়া যে কিছু গণ্ডগোল ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' ইতিহাস হিসাবে খুব প্রামাণিক না হইলেও ইহাতে বৃন্দাবনের পিতার উল্লেখ আছে। এই মতে নারায়ণী শ্রীবাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিনী পণ্ডিতের কন্যা। নারায়ণীর বয়স যখন একবৎসর তখন তাঁহার মাতাপিতা দেহত্যাগ করেন, এবং শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনীদেবী বালিকা নারায়ণীকে লালনপালন করেন। কুমারহট্টবাসী বৈকুণ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে নারায়ণীর বাল্যকালেই বিবাহ হয়:

কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ যেঁহো।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
বৃন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠনাথ চলি গেল স্বর্গে॥ ('প্রেমবিলাস')

এই বর্ণনা অতিশয় স্বাভাবিক—কোথাও কোন গোল নাই। পরবর্তী কালে গোলযোগ দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছিলেন 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র। এই ভদ্র মহোদয় উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বিভিন্ন পদকর্তা সম্বন্ধে লোকশ্রুতি ও গালগল্পকে বেদবাক্যবৎ বিশ্বাস করিয়াছেন। বৈষ্ণবসমাজে নাকি বৃন্দাবন-দাসের জন্মঘটিত কিছু কুৎসা প্রচলিত ছিল। জগদ্বন্ধু ভদ্র এই সমস্ত গালগল্পকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকায় তাহার স্থান দিয়াছিলেন,

সম্ভবতঃ একটু অতিরঞ্জনেরও আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহার মন্তব্যটি দীর্ঘ হইলেও পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এখানে উদ্ধৃত হইতেছে:

বৃন্দাবনদাস এহেন নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভজ সন্তান। ১৪২৭ শকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করেন। পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী তখন বিধবা; তাঁহার বয়ঃক্রম নয়, কি দশ বৎসর। একদা নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে তিনি বালবিধবা নারায়ণীকে 'পুত্রবতী হও' বলিয়া অন্য মনে আশীর্বাদ করিলেন। আশীর্বাদ শুনিয়া নারায়ণী নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! এ কি সর্বনেশে আশীর্বাদ!" অবধূত কহিলেন, "বৎসে, ভয় নাই। তুমি অসতী হইবে না; কেহ তোমায় কুৎসা করিতে পারিবে না; আমার আশীর্বাদে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ ভক্ষণে তোমার গর্ভসঞ্চার হইবে, এবং সেই গর্ভে দ্বিতীয় ব্যাসতুল্য এক পুত্ররত্ন জন্মিবে।" ইহার কিছুদিন পরে মহাপ্রভুর চর্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া নারায়ণী ঠাকুরাণী গর্ভবতী হয়েন, এবং সেই গর্ভে ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশীতে বৃন্দাবনদাস অষ্টাদশ মাস গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হয়েন। নারায়ণীর গর্ভ যখন সাত-আট মাসের, তখন নবদ্বীপস্থ তদানীন্তন কাজী এই অদ্ভুত গর্ভসঞ্চারের সংবাদ পাইয়া শ্রীমতী নারায়ণী দেবীকে কাছারীতে লইয়া যান। প্রভু নিত্যানন্দ কাজীর গৃহে উপস্থিত হইয়া কাজীকে ভৎর্সনাপূর্বক কহিলেন, "অবোধ! তুমি স্বেচ্ছায় কেন জ্বলন্ত পাবকে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছ? মাতা নারায়ণীর গর্ভে স্বয়ং বেদব্যাস উদিত, তুমি কি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও?" নিত্যানন্দ প্রভুর মুখ হইতে এই বাক্য বহির্গত হইতে না হইতে গর্ভস্থ শিশু হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। কাজী একান্ত ভীত হইয়া শিবিকা-যোগে নারায়ণীকে শ্রীবাস গৃহে প্রতিপ্রেরণ করিলেন। কিছু দিনান্তর নারায়ণী মাতুলালয়ে শ্রীহট্টে যাইয়া বাস করিলেন, এই স্থলেই কবির জন্ম। বৃন্দাবন দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে জারজ সন্তান বলিয়া লোকে তাঁহার মাতাকে নানা নিন্দা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। লোকনিন্দা হইতে মুক্তিপ্রাপ্তি, তথা ভক্তিরসে মন নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে দেড় বৎসরের শিশু সন্তান লইয়া শ্রীহট্ট মাতুলালয় পরিত্যাগ-পূর্বক নারায়ণী ঠাকুরাণী ১৪৩০ শকের আশ্বিন মাসে নবদ্বীপের সন্নিকট মামগাছি গ্রামে আসিয়া কাঙ্গালিনীর বেশে বাস করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমেই নারায়ণী ঠাকুরাণী মামগাছির বাসুদেব দত্তের গৃহে পুত্রসহ বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উক্ত গ্রামে 'নারায়ণীর পাট' বর্তমান।[৩৭]

জগদ্বন্ধু সন-তারিখ সম্বন্ধে যেরূপ নিরঙ্কুশ, তাহাতে তিনি যে প্রচলিত উপকথাকে ইতিহাসের মর্যাদা দিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু বৃন্দাবনদাসের জন্মকথা যে কিঞ্চিৎ রহস্যাচ্ছন্ন তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

জগদ্বন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকা।

পিতার ঔরসে তাঁহার জন্ম হয় নাই, 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উল্লিখিত উদ্ধব দাসের (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) একটি পদে স্পষ্টতঃই স্বীকৃত হইয়াছে :

প্রভুর চর্বিত পান স্নেহবশে কৈলা দান
নারায়ণী ঠাকুরাণীর হাতে।
শৈশব বিধবা ধনী সাধ্বী সতী-শিরোমণি
সেবন করিল সে চর্বিত ॥
প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা বালিকা গর্ভিণী হৈলা
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল।
দশ মাস পূর্ণ যবে মাতৃগর্ভ হৈতে তবে
সুন্দর তনয় এক হৈল ॥
সেই বৃন্দাবনদাস ত্রিভুবন সুপ্রকাশ
চৈতন্যলীলার ব্যাস যেই।
উদ্ধব দাসেরে দয়া করি দিবে পদছায়া
প্রভুর মানসপুত্র সেই ॥

উদ্ধবদাস অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। তাঁহার এই পদ হইতে জানা যাইতেছে যে, চৈতন্য-তিরোধানের প্রায় দুইশত বৎসর পরেও বৃন্দাবনদাসের জন্ম-সংক্রান্ত এই কাহিনী বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত ছিল। নারায়ণী চৈতন্যের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি "গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী" নামে পরিচিত। উদ্ধবদাস বলিয়াছেন, বালবিধবা নারায়ণী মহাপ্রভু-চর্বিত তাম্বূল সেবন করিয়া গর্ভবতী হন। যথাকালে তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। "প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা"—কথাটির ব্যঞ্জনা অত্যন্ত রহস্যময়। মহাপ্রভুর শক্তি সঞ্চারের ফলে অলৌকিকভাবে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। উদ্ধবদাসের মতে, ইহার জন্য লোকসমাজে নারায়ণীর কলঙ্ক হয় নাই—"লোকমাঝে কলঙ্ক নহিল।" কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন বৃন্দাবনের জন্মের ব্যাপারে সমাজে বেশ ঘোঁট পাকাইয়াছিল, তাহা জগদ্বন্ধু ভদ্রের মন্তব্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে। উপরন্তু দেখা যাইতেছে, নারায়ণী পুত্র-জন্মের পর পিতৃগৃহ শ্রীবাসের নবদ্বীপের বাটিতে বাস না করিয়া অদূরে মামগাছিতে বাসুদেব দত্তের গৃহে পুত্র সহ বাস করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ রেলস্টেশন হইতে তিন মাইল ও নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়া হইতে দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে মামগাছি গ্রাম। এখনও সেখানে নারায়ণীর পাট আছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে

বাসুদেব দত্তই এই শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং "নারায়ণীর উপর সেবার ভার অর্পণ করিয়া সমাজপরিত্যক্ত বিধবার ভরণপোষণের উপায় করিয়া দেন।"[৪৭] বলা বাহুল্য ডঃ মজুমদার জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছেন, ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানের চেষ্টা করেন নাই এবং তিনশত বৎসর পরে এ বিষয়ে কিছু সন্ধান করাও দুরূহ। নারায়ণী ও বৃন্দাবন, বাসুদেব দত্তের সহৃদয়তার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। কারণ বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বাসুদেবকে এরূপ ভাষায় প্রশংসা করিয়াছেন যে অন্য কাহারও সম্বন্ধে সেরূপ উচ্চগ্রামে স্বর বাঁধেন নাই :

জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত।
সর্বভূতে কৃপালু চৈতন্যরসে মত্ত॥
গুণগ্রাহী অদোষ-দরশী সভা প্রতি।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতিমতি॥

সুতরাং বৈষ্ণবসমাজ ও ভক্তগোষ্ঠীতে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বৃন্দাবন ও তাঁহার বহুমান্যা জননী নারায়ণী সম্বন্ধে যে কিছু সংশয় ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। বৃন্দাবন শুধু পিতা নহে, মাতামহ সম্বন্ধেও নির্বাক—যদিও শ্রীবাসের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। ডঃ মজুমদারের অনুমান নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাঁহার মতে, "শ্রীবাসের সকল ভ্রাতাই যখন মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন, তখন বৃন্দাবনদাস মাতামহের নাম উল্লেখ করিলেন না কেন? ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করার জন্য বৃন্দাবনদাস ও তাঁহার মাতার সহিত শ্রীবাসের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কোন সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না।"[৪৮] তাহা না হইলে নারায়ণী শিশুপুত্র লইয়া শ্রীবাসের গৃহ ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের অদূরে মামগাছিতে বাসুদেব দত্তের আশ্রয়ে যাইবেন কেন? ডঃ সুকুমার সেন বৃন্দাবনদাসের জন্মঘটিত কলঙ্কে বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মতে "কেহ কেহ অনুমান করেন চৈতন্যের গৃহত্যাগের কিছুকাল পরে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। বৃন্দাবনের বাপের নাম কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। প্রধানতঃ এই কারণেই বৃন্দাবনের জন্ম সম্বন্ধে আধুনিক কালের আলোচনাকারী অনেকে নিশ্চিন্ত নন। ইঁহারা কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির গূঢ় এবং কদর্থ

[৪৭] ডঃ মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ ১৮২

[৪৮] ডঃ মজুমদারের গ্রন্থ, পৃ. ১৭৭

কল্পনা করিয়া বলেন যে ব্যাসের মতই বৃন্দাবনদাস কানীন পুত্র। 'সাত-প্রহরিয়া' ভাবাবেশের সময়ে চৈতন্য নারায়ণীকে উচ্ছিষ্ট তাম্বূল দিয়াছিলেন।[৪৯] তাহা খাইয়া নারায়ণী কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, এ ব্যাপারেও তাঁহারা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু নারায়ণীর বয়স তখন চার বছর। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, নিত্যানন্দের নিষেধের জন্যই বৃন্দাবনদাস চৈতন্যকে দেখিতে কখনও নীলাচলে যান নাই। ইঁহাদের এই সিদ্ধান্ত চৈতন্যভাগবতের এক ছত্রের ভুল পাঠের উপর নির্ভর করিতেছে।"[৫০] চৈতন্যভাগবতের বহরমপুর সংস্করণে আছে :

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥

ডক্টর সেনের মতে আসল পাঠ 'মুখ' নয়—'সুখ'। 'সুখ' বা 'মুখ' যাহাই হোক না কেন, বৃন্দাবনদাস যে পিতার কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই (উদ্ধবদাসের পদটিও মারাত্মক) তাহা অস্বীকার করা যায় না। ডক্টর সেন যে ভাবে দুই কথায় এই ব্যাপার উড়াইয়া দিয়াছেন, সে-ভাবে ইহাকে লঘু করা যায় না। বৃন্দাবনদাস যে নারায়ণীর বৈধব্যজীবনের সন্তান[৫১], সেরূপ কাণাঘুষা বৈষ্ণবসমাজে অনেক কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র ('গৌরপদতরঙ্গিণী'), অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ('বঙ্গরত্ন'), দীনেশচন্দ্র সেন ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য')—সকলেই বৃন্দাবনদাসকে নারায়ণীর বিধবা-অবস্থার সন্তান বলিয়াছেন। চৈতন্যের চর্বিত তাম্বূল খাইয়া, ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া, নিত্যানন্দের আশীর্বাদে—যে কোন দুর্জ্ঞেয় কারণেই হোক, বৃন্দাবন যে নারায়ণী বিধবা হইবার পর জন্মলাভ করিয়াছিলেন, নানা প্রমাণ দৃষ্টে এরূপ সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এ সমস্ত গালগল্পে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে বৃন্দাবনদাস মাতৃগর্ভে

[৪৯] চৈতন্যভাগবতে তাম্বূলচর্বণের কথা নাই—সেখানে আছে যে নারায়ণী মহাপ্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। উদ্ধবদাসের পদে তাম্বূল চর্বণের কথা আছে। ডক্টর সেন উদ্ধবদাস বর্ণিত তাম্বূল চর্বণের ঘটনাটি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সেই উদ্ধবদাসের 'বালিকা গর্ভিণী হৈল' ছত্রটি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

[৫০] ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩১৮-১৯

[৫১] ডক্টর সেন কথিত 'কানীন পুত্র' নহে।

থাকা কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। প্রভুপাদ 'প্রেমবিলাসে'র (২৩শ বিলাস) সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।[৫২] অনেকের মতে 'প্রেমবিলাসে'র এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত।[৫৩] অতুলকৃষ্ণ যাহার উপর ভিত্তি করিয়া বৃন্দাবনের জন্মের বৈধতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহারই প্রামাণিকতার বিশেষ সংশয় রহিয়াছে। 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় উক্ত গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে (পৃ. ১৭৮) বলিয়াছেন "বৈষ্ণবসমাজে বৃন্দাবনদাসের জন্ম লইয়া এইরূপ অদ্ভুত একটা কিংবদন্তীর উদ্ভব কেন হইল, সেই রহস্যটার কোনই সুমীমাংসা পাওয়া যাইতেছে না। আমাদিগের একজন সুপরিচিত ঐতিহাসিক বন্ধু সমস্ত অনুমানমূলে যে অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা উহা লিখিয়া গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে ব্যথা দিতে ইচ্ছা করি না।··· আমরা এখানে শুধু ইহা বলিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে চাহি যে, বৈষ্ণবদাসের (sic)[৫৪] জন্ম যেভাবেই হইয়া থাকুক, তাঁহার পূতচরিত্র ও বৈষ্ণবসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব হেতু তিনি চিরকাল পূজিত হইবেন।" 'বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে ব্যথা' লাগিলেও তথ্য ও ইতিহাসের খাতিরে সতীশচন্দ্র যদি তাঁহার ঐতিহাসিক বন্ধুর অনুমান আভাসেও লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে হয়তো এই ব্যাপারে আর এক দিক দিয়া চিন্তা করা যাইত। ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি ("এ ব্যাপারেও তাঁহারা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন") বোধহয় উক্ত ঐতিহাসিকের মতামতের প্রতি উদ্দিষ্ট। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতামত একটু খোলাখুলি হইলেও সমস্ত দিক বিবেচনায় যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়. "শ্রীবাসের ভ্রাতৃতনয়া, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্রী নারয়ণীদেবী বিধবা অবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন একথা মানিয়া লইতে বৈষ্ণব লেখকগণের কষ্ট হয়, তাই তাঁহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, বৃন্দাবনদাস বৈধ বিবাহের ফলে জাত।" পরমভক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এ সমস্ত গ্রামবার্তা সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া 'দুষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তি' ও 'অতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবদের'

৫২ "বৃন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলি গেল স্বর্গে।। ('প্রেমবিলাস')

৫৩ ডঃ মজুমদারের গ্রন্থ, পৃ. ১৭৭

৫৪ ইহা সম্ভবতঃ ছাপার ভুল—বৃন্দাবনদাস হইবে। গোকুলানন্দ সেন বৈষ্ণবদাস ভণিতায় পদ লিখিতেন, বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণবদাস নামে পরিচিত ছিলেন না।

উপর ইহার দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, "যদি এই সকল প্রবাদ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন না কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। হয়তো কোন সময়ে কোন দুষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্মের অমঙ্গলের চেষ্টায় ঐ সকল প্রবাদ সৃষ্টি করে এবং তৎপরে অতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তাহা স্বীকৃত হইয়া পরম্পর কর্ণাকর্ণী হইয়া আসিতেছে।" এ সমস্ত অভিমত ভক্তের বিশ্বাসের কথা, ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর যুক্তি নহে। 'দুষ্ট মতাবলম্বী' ব্যক্তিরা বৈষ্ণবধর্মের কুৎসা রটনার জন্য আরও অনেক জোরালো পথ বাছিয়া লইতে পারিত, খোদ চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের চরিত্রে কলঙ্ক দিতে পারিত; তাহা না করিয়া বাছিয়া বাছিয়া বৃন্দাবনের পিতৃত্বে খোঁচা দিবার কী-ই বা কারণ থাকিতে পারে? যাহা হোক, উপসংহারে এইটুকু উল্লেখ করিয়া এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাইতে পারে যে, বৃন্দাবনের জন্মের ব্যাপারে কিছু রহস্য ছিল, এবং তাহাতে অলৌকিকতার প্রলেপ এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দের আশীর্বাদের মোড়ক দিয়াও বৈষ্ণবসমাজ সংশয়-সন্দেহের সমস্ত রন্ধ্র বন্ধ করিতে পারেন নাই—এ যুগেও তাহার তরঙ্গ আসিয়া পৌছিয়াছে।

এবার বৃন্দাবনের জন্মকাল আলোচনা করা যাক। নারায়ণীর কয় বৎসর বয়সে বৃন্দাবনের জন্ম হয়, তাহা অনুমান সাপেক্ষ। জগদ্বন্ধু ভদ্র, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের অনুমান, ১৪২৯ শকের (১৫০৭ খ্রীঃ অঃ) বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশীতে বৃন্দাবন জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে দীনেশচন্দ্রের মতে ১৪৫৭ শকে (১৫৩৫ খ্রীঃ অঃ) এবং ডঃ সুকুমার সেনের মতে ১৫০৭-১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন।' শ্রীবাসের বাটীতে চৈতন্যের স্নেহের পাত্রী চারিবৎসরের নারায়ণী গৌরাঙ্গের প্রসাদ খাইয়া কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস চারি বৎসরের কথা বলিয়াছেন। তখন মহাপ্রভুর বয়স তেইশ বৎসরের মতো (১৫০৯ খ্রীঃ অঃ)। জনশ্রুতিমতে মহাপ্রভুর চর্বিত তাম্বূল খাইয়া "শৈশবে বিধবা ধনী সাধ্বী সতীশিরোমণি" (উদ্ধবদাস) নারায়ণী গর্ভবতী হন। এই মত অতি অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়। চারি বৎসরের বালিকার সসত্ত্বা হওয়া কোন লৌকিক-অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারাই সম্ভব নহে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার একটা অনুমানিক সন-তারিখ খাড়া

করিয়াছেন। ধরিয়া লওয়া যাক ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণীর বয়স চারিবৎসর হইয়াছিল। অন্ততঃ চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্বে তাঁহার মাতৃত্ব লাভ সম্ভব নহে। অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর বৃন্দাবনের জন্ম হইতে পারে। বৃন্দাবন পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন ঃ

> 'হইল পাপিষ্ঠ জন্ম' নহিল তখনে।
> হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥

অর্থাৎ চৈতন্যের এই সমস্ত লীলার (নবদ্বীপলীলা) সময়ে বৃন্দাবনের জন্ম হয় নাই। চৈতন্যের জীবৎকালে বর্তমান থাকিয়াও তিনি লীলা দর্শন করিতে পারেন নাই। কারণ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব নীলাচলে ছিলেন। তাই বৃন্দাবন তাঁহার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়েই তাঁহার জন্মগ্রহণ সম্ভব। তাহা হইলে মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় (১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার বয়স হইবে চৌদ্দ-পনের। নিত্যানন্দ চৈতন্য-তিরোধানের পরেও প্রায় আটবৎসর জীবিত ছিলেন। তাহা হইলে নিত্যানন্দের তিরোধানের সময় বৃন্দাবনের বয়স হইবে প্রায় বাইশ-তেইশ। নিত্যানন্দের নির্দেশেই বৃন্দাবন চৈতন্যলীলাচিত্র অঙ্কনে অগ্রসর হন। নিত্যানন্দ বাইশ বৎসরের নবীন যুবকের হস্তে এইরূপ গুরুতর ভার অর্পণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা বৃন্দাবনকে চৈতন্যের অবতার প্রমাণের জন্য ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনের জন্ম বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিত্যানন্দের তিরোধানের কথা ভাবিয়া দেখেন না। এই সময়ে বৃন্দাবনের জন্ম হইলে নিত্যানন্দের তিরোধানের সময়ে বৃন্দাবনের বয়স হইবে মাত্র চার-পাঁচ বৎসর। নিত্যানন্দ একজন বালখিল্যকে চৈতন্যজীবনী রচনার গুরুতর ভার দিবেন, ইহা কদাচ বিশ্বাস্য নহে। সুতরাং ডঃ মজুমদারের অভিমতটি আমরা উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম—"শ্রীচৈতন্যভাগবতের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যবিচারপূর্বক আমি বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল ১৪৪০ শকের বা ১৫১৮ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি স্থির করিতে চাহি।"[৫৫] দীর্ঘজীবী বৃন্দাবনদাস ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে অনুষ্ঠিত খেতুরী উৎসবেও উপস্থিত ছিলেন।

নবদ্বীপের অদূরে মামগাছি গ্রামে বৃন্দাবনের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহারই কাছে যে বড়গাছি গ্রাম ছিল, সেখানে মাঝে মাঝে

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ, ১৮০

নিত্যানন্দ বাস করিতেন। সেই সূত্রে কবি অল্পবয়সে নিত্যানন্দের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র এই দেনুড় গ্রামে বৃন্দাবনের বসবাস সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। একদা নিত্যানন্দ গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মহাপ্রভু দর্শনে নীলাচলে চলিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কিশোর বৃন্দাবনও ছিলেন। বর্ধমান জেলার মন্ত্রেশ্বরের নিকট দেনুড় বা দেলুড় গ্রামে আসিয়া তাঁহারা পানভোজন করিলেন। আহারান্তে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনের কাছে মুখশুদ্ধি চাহিলে বৃন্দাবন একটি হরীতকী দিয়া বলিলেন যে, ঐ হরীতকীটি পূর্বদিনে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে নিত্যানন্দ বলিলেন, "বৃন্দাবন, তুমি এখনও সঞ্চয়ী, অদ্যাপি তোমার সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে নাই। সুতরাং অচিরাৎ তোমাকে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ইচ্ছা হয় ত এই দেনুড় গ্রামে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ ও তদীয় লীলা বর্ণনা কর।"[৫৬] জগদ্বন্ধু ভদ্র এ গল্প কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহা বলেন নাই। চৈতন্য জীবনীতেও দেখা যাইতেছে গোবিন্দ ঘোষের সঞ্চয়ীদোষ ছিল বলিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবার পথে তাঁহাকে অগ্রদ্বীপে রাখিয়া যান, সঙ্গে লন নাই। বোধ হয় এই কাহিনীর প্রভাবে দেনুড় গ্রামে বৃন্দাবনের বসবাসের গল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বৃন্দাবনদাসের জন্মকথা রহস্যমণ্ডিত হইলেও প্রবীণ জীবনে তিনি বাঙলার বৈষ্ণবসমাজে অতিশয় মান্য ছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি কর্ণপূর রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় তাঁহাকে বলা হইয়াছে— "বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।" কবি তখনই বেদব্যাসের অবতার বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপরিচয় ॥ বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রথমে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ কাব্যকে চৈতন্যমঙ্গল বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন;

১। বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥ (চৈ. ম.)

২। ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস॥
চৈতন্যমঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥ (ঐ)

---

[৫৬] জগদ্বন্ধু সম্পাদিত 'গৌরপদতরঙ্গিণী' (২য় সংস্করণ), পৃ, ২১৫

'প্রেমবিলাসে'র সমস্ত উক্তি নির্বিচারে মানিয়া লওয়া যায় না বটে, কিন্তু এই উদ্ধৃতির কিছু মূল্য স্বীকার করিতে হইবে :

চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥ ('প্রেমবিলাস')

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুমতি না পাইলে এ দেশের কোন বৈষ্ণবগ্রন্থ শিষ্ট সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহারা এই গ্রন্থে ভাগবতের প্রভাব ও লীলাপর্যায় দেখিয়া ইহার 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম বদলাইয়া 'চৈতন্য-ভাগবত' নামকরণ করেন—'প্রেমবিলাসে'র ইহাই অভিমত। এ বিষয়ে আরও জনশ্রুতি প্রচারিত আছে। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'ও প্রায় একই সময়ে রচিত হয়, অথবা সামান্য পরবর্তী হইতে পারে। দুইখানি কাব্যের এক নাম দেখিয়া নারায়ণী নিজপুত্রের কাব্যের নাম বদলাইয়া চৈতন্যভাগবত রাখেন। এই অভিমত ইতিহাসিক তথ্য হিসাবে খুব নির্ভরযোগ্য নহে। লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গলে' কিন্তু বৃন্দাবনের গ্রন্থকে 'চৈতন্যভাগবত' বলা হইয়াছে—

শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগৎ মোহিত যাঁর 'ভাগবত' গীতে ॥ (চৈতন্যমঙ্গল, সূত্রখণ্ড)

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের কল্পনা দূরগামী ও বিচিত্র সৃষ্টিক্ষমতাশালী। তাহারা সামান্য ব্যাপার হইতে অনেক কিছু কল্পনা করিয়া লয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও এ দোষে কম দোষী নহেন। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর প্রণীত 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ গল্প রচিত হইয়াছে। লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' সমাপ্ত করিয়া ইহা পড়িয়া দেখিবার জন্য গুরু নরহরি সরকারকে দিলে তিনি লোচনকে বৃন্দাবনদাসের অনুমতি লইতে বলেন, কারণ ইতিপূর্বেই বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস নাকি লোচনের গ্রন্থ দেখিয়া স্বেচ্ছায় নিজ গ্রন্থের নাম পাল্টাইয়া 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থ হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইতেছে :

শ্রীবৃন্দাবনদাস বলিলেন, 'লোচন! তুমি নরহরির অনুগ্রহে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছ, কারণ গৌর-নিত্যানন্দকে তুমি অভেদ মূর্তিতে বর্ণনা করিয়াছ। অদ্য হইতে তোমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও আমার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইল।' যখন এই ঘটনা হয় তখন শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে এবং ইহার সৌরভ শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট পঁহুছিয়াছে। এইজন্য

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে 'চৈতন্যমঙ্গল' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দকে অভেদমূর্তিতে বর্ণনা করায় লোচনের নিকট নিত্যানন্দগতপ্রাণ বৃন্দাবনদাসের আর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। এইজন্য তিনি এক ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন যে. আমি প্রভুর ভগবত্তা বর্ণনা করিয়াছি এবং লোচন মাধুর্য বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব আমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইল। বৃন্দাবনদাসের এই ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।[৫৭]

বলা বাহুল্য এ সমস্ত উক্তি বৈষ্ণব ভক্তগণের স্বকপোলকল্পিত, ইহার কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। এ সমস্ত অলস জল্পনা কল্পনা ছাড়িয়া বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু এই মাত্র বলা যায় যে, পূর্বে এই গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল, পরে 'চৈতন্যভাগবত' নামে পরিচিত হইয়াছে।[৫৮] বৃন্দাবনদাস ভাগবতের লীলার অনুসরণে চৈতন্যলীলার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা চৈতন্যভাগবত নামে কথিত হইয়াছে। এইরূপ অনুমান ভিন্ন অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

চৈতন্যভাগবত ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, কোথাও কোন সন-তারিখের উল্লেখ বা প্রসঙ্গ নাই। ফলে রচনাকাল নির্ণয়ে নানা গণ্ডগোল সৃষ্টি হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব') ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দ, জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দ, দীনেশচন্দ্রের মতে ১৫৩৫ বা ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দই চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল। ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেন—"চৈতন্যভাগবতের রচনাসমাপ্তিকাল ১৫৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ ধরিতে হয়······তবে মোটামুটি বলা যায় যে, নিত্যানন্দের জীবৎকালেই (আনুমানিক ১৫৪১-৪২

---

৫৭ গৌরগুণানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব (২য় সংস্করণ)

৫৮ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেন—"আমার মনে হয় বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতেই চৈতন্যভাগবত ছিল—কিন্তু চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক গান যেমন চণ্ডীমঙ্গল, মনসার মাহাত্ম্যসূচক গান মনসামঙ্গল, তেমনি শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক বাঙ্গালা বইকে চৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করা যায়। এইজন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের বইয়ের নাম ·চৈতন্যমঙ্গল বলিয়াছেন।" (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান)। কিন্তু আমাদের মনে হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ পুস্তকের আসল নাম (বিশেষতঃ ভাগবতাখ্য) ছাড়িয়া মঙ্গলকাব্যের নামযুক্ত চৈতন্যমঙ্গল নাম রাখিবেন এবং গ্রন্থ মধ্যে একাধিক স্থানে চৈতন্যমঙ্গল,ব্যবহার করিবেন—ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এ গ্রন্থ কৃষ্ণদাসের সময়েও 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে অভিহিত হইত, এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক।

খ্রীষ্টাব্দ) চৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল।[৫৯] ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে বৃন্দাবনের জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনের বয়স—ষোল-সতের বৎসর এবং ১৫৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স হইবে তেইশ-চব্বিশ বৎসর। ষোল-সতের বৎসর বয়সের কিশোরের পক্ষে এ কাব্য রচনা করা প্রায় অসম্ভব। বরং তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সের যুবক এ কাব্য রচনা করিতে পারেন। আর তা ছাড়া বৃন্দাবন মাঝে মাঝে যেরূপ অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থ রচনাকালে তাঁহাকে যুবাবয়সী বলিয়াই মনে হয়।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় এই কাব্যের রচনাকালের সন-তারিখ লইয়া যে গবেষণা করিয়াছেন, নানা দিক দিয়া তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বৃন্দাবনদাসকে ব্যাসের অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার এবং তাঁহার গ্রন্থের খ্যাতি অতিশয় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং গ্রন্থটি নিশ্চয় ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছুদিন পূর্বে (বিশ-ত্রিশ বৎসর ?) রচিত হইয়াছিল। ডঃ মজুমদার চৈতন্যভাগবতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা[৬০] স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোধানের দশ-পনের বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থ মধ্যে বৃন্দাবনদাস পরস্পর বিবদমান অদ্বৈতপন্থী, নিত্যানন্দপন্থী গদাধরপন্থী, গৌরনাগরপন্থী প্রভৃতি নানা দল-উপদলের সঙ্কীর্ণতার নিন্দা করিয়াছেন। চৈতন্য-নিত্যানন্দের তিরোভাবের বেশ কিছুদিন পরেই বৈষ্ণব সমাজে ঐরূপ দল-উপদলের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য রচনা করেন। তিনি ইহাতে বৃন্দাবনের বা চৈতন্যভাগবতের কোন উল্লেখ করেন নাই, অথচ তিনিই আবার ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'গৌরাগণোদ্দেশদীপিকা'য় বৃন্দাবনদাসকে ব্যাসের অবতার বলিয়া ভক্তি করিয়াছেন। অনুমান কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পূর্বে বৃন্দাবনের চৈতন্যভাগবত রচিত হয় নাই। এই প্রমাণের বলে চৈতন্যভাগবতকে ১৫৪২ সালের পরবর্তী রচনা বলা যায়। অবশ্য স্বয়ং কবি বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন :

---

৫৯ ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র প্রথমার্ধের প্রথম খণ্ডে (পৃ, ৩২০) ভ্রমক্রমে এই সনটি ১৪৩৪-৩৫ ছাপা হইয়াছে।

৬০ ডঃ মজুমদারের চৈ, চ, উ, পৃ, ১৮৬-৮৮

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে ॥

তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রন্থটি নিত্যানন্দের আদেশেই রচিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু সমাপ্তির সময় সম্ভবতঃ নিত্যানন্দ জীবিত ছিলেন না। উপরন্তু গ্রন্থটি কবির তরুণ বয়সের রচনা তাহাতেও সংশয় নাই, কারণ বহুস্থলে বয়োধর্মানুসারে তিনি অবৈষ্ণবোচিত অবিনয় ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছেন। এবিষয়ে বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের অভিমত যথার্থ, "কবি যদি যৌবনের মধ্যে বা শেষভাগে গ্রন্থ লিখিতেন তাহা হইলে অধিকতর ধৈর্য ও ক্ষান্তি প্রদর্শন করিতেন।"[৬১] ডক্টর মজুমদারের উক্তি অনুসারে আমরাও সিদ্ধান্ত করিতেছি, "১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল।"[৬২] তবে ইহা বিশ্বাসযোগ্য অনুমান মাত্র, এবং অনুমান কখনও প্রত্যক্ষ প্রমাণের মর্যাদা পাইতে পারে না, তাহাও স্বীকার্য।

গ্রন্থের পরিকল্পনা ॥ বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত চৈতন্যদেবের প্রথম বাংলাজীবনী। ইতিপূর্বে সংস্কৃতে চৈতন্যবিষয়ক কাব্য-নাটক-স্তোত্র রচিত হইয়াছিল, কিছু কিছু বাংলা পদও রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু পুরাপুরি জীবনী হিসাবে চৈতন্যভাগবত সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কবি তিনখণ্ডে কাব্যের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন: (১) আদিখণ্ড (পনের অধ্যায়ে সম্পূর্ণ), (২) মধ্যখণ্ড (ছাব্বিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ) এবং (৩) অন্ত্যখণ্ড (দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ)—মোট একান্নটি অধ্যায়ে বিভক্ত—ছত্রসংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। শেষখণ্ডটি আকস্মিক ভাবে সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিছুকাল পূর্বে চৈতন্যভাগবতের যে দুইখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অন্ত্যখণ্ডে আরও তিনটি অতিরিক্ত অধ্যায় যুক্ত হইয়াছে। দেনুড়পাটের অধিকারী অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী এই দুইখানি পুঁথির অতিরিক্ত অধ্যায়গুলিকে 'চৈতন্যভাগবতের অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়' নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এই

[৬১] ঐ, পৃ, ১৮৫
[৬২] ঐ, পৃ, ১৯২

তিনটি অধ্যায়ের প্রামাণিকতায় অনেকেই বিশেষ সন্দিহান—কারণ ইহার কোন বর্ণনা মূলগ্রন্থের সঙ্গে মিলিতেছে না।[৬৩]

আদিখণ্ডে চৈতন্যজন্ম হইতে তাঁহার গয়াগমন এবং নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশটুকু প্রত্যক্ষবৎ, বাস্তবধর্মী ও শিল্প-গুণান্বিত। বস্তুতঃ চৈতন্যদেবের জীবনের এই অংশটুকু আর কোন চৈতন্য-জীবনীতে এতটা জীবন্তভাবে অঙ্কিত হয় নাই। গৌরাঙ্গের জন্ম-বাল্যলীলা, নিত্যানন্দের জন্ম-বাল্যলীলা ও প্রথম যৌবনে তীর্থ ভ্রমণ, গৌরাঙ্গের বিদ্যা-বিলাস, লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহ, গৌরাঙ্গের শুষ্ক বিদ্যানুশীলনে ভক্তগণের ক্ষোভ, বায়ুরোগের প্রকাশ, তাঁহার নিকট দিগ্বিজয়ীর পরাভব, গৌরাঙ্গের পূর্ব-বঙ্গ গমন ও সেখানে খ্যাতিলাভ, লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু, তাঁহার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ (বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী), যবন হরিদাসের মহিমা বর্ণন এবং পিতৃপিণ্ডদানের জন্য গৌরাঙ্গের গয়াগমন, গয়াধামে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং সেখানে সর্বপ্রথম কৃষ্ণপ্রেমাবেশের আবির্ভাব, ঈশ্বরপুরীর নিকট চৈতন্যের মন্ত্রগ্রহণ এবং প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন—আদি খণ্ডে কাহিনীর পরিকল্পনা এই পর্যন্ত।

মধ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গের গয়া প্রত্যবর্তন হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা চৈতন্যের বিদ্যাদর্প ত্যাগ, অধ্যাপনা বন্ধ, তাঁহার প্রেমাবেশকে কেহ কেহ বায়ুরোগ বলিলেও শ্রীবাস কর্তৃক ইহাকে ঈশ্বর-প্রেম রূপে ব্যাখ্যা, নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন ও নিতাই-গৌরের মিলন, শ্রীগৌরাঙ্গের 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব বা প্রথম মহিমা প্রকাশ, চৈতন্যের চারিদিকে ভক্তগোষ্ঠীর বেষ্টন, চৈতন্যের আদেশে নিত্যানন্দ ও হরিদাস কর্তৃক নবদ্বীপে হরিনাম কীর্তন, নিত্যানন্দের জগাই-মাধাই উদ্ধার, ভক্তগণকে প্রেমধর্ম শিক্ষা-দান, মহাপ্রভু কর্তৃক কীর্তন আরম্ভ, কাজীর বিরোধিতা, কাজীদলন ও উদ্ধার, গৌরাঙ্গের গোপীভাব, সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য অভিপ্রায় জ্ঞাপন, সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদে শচীমাতার বেদনা, পরিশেষে মাতা, স্ত্রী ও ঘর ছাড়িয়া গৌরাঙ্গের যতিবেশ ধারণ—মধ্যখণ্ডের সুদীর্ঘ বর্ণনায় মোটামুটি এই ঘটনাগুলি স্থান

[৬৩] ডক্টর সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ, ৩২৮ (পাদটীকা)

পাইয়াছে। আদি ও মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা ও গৃহজীবনের চিত্র ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিত কি করিয়া চৈতন্যদেব হইলেন বৃন্দাবনদাসের বিচিত্র বর্ণনায় তাহা অতি চমৎকার ফুটিয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডটি অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—মোট দশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত—বোধ হয় অকস্মাৎ সমাপ্ত। মহাপ্রভুর কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ, রাঢ়দেশে ভ্রমণ, নীলাচল যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ, নীলাচলের উদ্দেশে যাত্রা, উড়িষ্যায় প্রবেশ, জলেশ্বর, বাঁশদহ, যাজপুর, কটক ও ভুবনেশ্বর পরিক্রমার পর মহাপ্রভুর পুরীধামে জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন ও মূর্চ্ছা, সার্বভৌম কর্তৃক মহাপ্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন, মহাপ্রভু-সার্বভৌমের বিচারবিতর্ক, পরমানন্দপুরী ও স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন, তাঁহার পুনরায় গৌড়ে প্রত্যাবর্তন, রামকেলিগ্রামে কেশব ছত্রীর সাহচর্য, শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে মহাপ্রভুর উপস্থিতি, শচীমাতা ও চৈতন্যের সাক্ষাৎকার, কুমারহট্টে মহাপ্রভুর আগমন এবং শ্রীবাস প্রভৃতির সান্নিধ্যলাভ, শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, রাজা প্রতাপরুদ্রের চৈতন্য দর্শন, প্রতাপরুদ্র কর্তৃক মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ, মহাপ্রভুর উপদেশে নিত্যানন্দের গৌড়ে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের ভক্তগণসহ নীলাচলে যাত্রা ও মহাভুর সঙ্গলাভ, অদ্বৈত কর্তৃক চৈতন্যাবতারের মাহাত্ম্য ঘোষণা ও সর্বসমক্ষে চৈতন্যকীর্তন, রূপ-সনাতনের নীলাচলে আসিয়া চৈতন্য সঙ্গলাভ, মহাপ্রভুর প্রেমাবেশে কূপমধ্যে পতন ও উদ্ধার—এই সমস্ত ঘটনা অন্ত্যখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য শেষ খণ্ডটি অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, শেষের দিকে চৈতন্য-জীবনের অনেক গূঢ় কথা বাকি থাকিয়া গিয়াছে। উপরন্তু পরিব্রাজক চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস কিছুই বলেন নাই। এই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ শেষখণ্ডটি বিস্তারিত আকারে লিখিবার জন্য বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

এখন দেখা যাক কবি কোন্ উৎস হইতে এই জীবন-কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কবি মধ্যখণ্ডে বলিয়াছেন :

> বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
> তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে॥

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যলীলা প্রত্যক্ষ করেন নাই। কারণ তাঁহার বাল্যকালে চৈতন্যদেব পুরীধামে বাস করিতেছিলেন। নবদ্বীপের অদূরে মামগাছি গ্রামে বৃন্দাবনের বাল্যকৈশোর অতিবাহিত হয়, উপরন্তু তিনি শ্রীবাসের ভ্রাতার দৌহিত্র। সুতরাং নানা ভক্তমুখে তিনি চৈতন্যলীলা, বিশেষতঃ নবদ্বীপলীলা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই শুনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নিত্যানন্দ, গদাধর ও অদ্বৈতের নিকট চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা অবগত হইয়াছিলেন। এইরূপ তিনটি উল্লেখ উদ্ধৃত হইতেছে :

(১) নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাঙ সবার মহত্ত্ব॥

(২) যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥

(৩) সভার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীত বহুতর॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সর্বথা॥

বৃন্দাবনদাস মূলতঃ সমস্ত ঘটনা নিত্যানন্দের মারফতে শুনিয়াছিলেন, কাজেই নিত্যানন্দ চৈতন্যের জীবনের যে অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের সেই অংশগুলি অধিকতর প্রামাণিক। ডঃ মজুমদার মনে করেন, "বিশ্বম্ভর মিশ্রের গয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর অর্থাৎ তেইশ বৎসর বয়সের সময়ে নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে গ্রন্থের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনার মধ্যে অধিকাংশগুলির সহিত নিত্যানন্দ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে সকল ঘটনার সহিত নিত্যানন্দের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, কবি সেগুলি বাদ দিয়াছেন, না হয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।"[৬৪] ডঃ মজুমদারের এই অভিমত অনেকটা সত্য হইলেও সবটা নহে। কারণ বৃন্দাবন আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায় হইতে মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত চৈতন্যের বাল্য-কৈশোর-যৌবনলীলা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। গদাধর বা অদ্বৈতের নিকট তিনি হয়তো চৈতন্যের বাল্যলীলা শুনিয়া থাকিবেন।

[৬৪] ডঃ মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ১৯৪

বিশেষতঃ অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যদেবকে শিশুকাল হইতে দেখিয়াছেন, চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ অদ্বৈতের টোলে পড়িতেন, শিশু নিমাইও প্রায় প্রতিদিন অগ্রজের সঙ্গে টোলে যাইতেন। অদ্বৈতের পক্ষে চৈতন্যের বাল্যলীলার কাহিনী যতটা জানা সম্ভব, অন্য কাহারও পক্ষে ততটা সম্ভব ছিল না। বৃন্দাবন তাঁহার মাতামহ শ্রীবাস বা জননী নারায়ণীর নিকটেও অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। তবে শ্রীবাসের পরিবারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া মনে হয় না, যে কোন কারণেই হোক শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃগণ নারায়ণীর ওপর কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়াছিলেন। যাহা হোক বৃন্দাবন নারায়ণীর নিকটে অনেক তথ্য পাইয়া থাকিবেন। আরও একটি সংবাদ, বৃন্দাবনের জন্মের পূর্বেই মুরারি গুপ্তের কড়চা বা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' (১৫০৩ বা ১৫১৩ খ্রীঃ অঃ) রচিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা বৃন্দাবন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মুরারির উপক্রমবিভাগ অনুসারেই তিনি চৈতন্যভাগবতের খণ্ডগুলি সাজাইয়াছিলেন। মুরারির কাব্যের প্রথম প্রক্রমে চৈতন্যের বাল্যলীলা হইতে গয়া প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বর্ণনা রহিয়াছে। বৃন্দাবনের আদিখণ্ড এই পর্বের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়। মুরারি দ্বিতীয় প্রক্রমে গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর চৈতন্যের পরমভক্ত ও ঈশ্বর-প্রেমিক রূপে মহিমা প্রকাশের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই অংশটুকু চৈতন্যভাবতের মধ্যখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। মুরারির তৃতীয় প্রক্রমে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, বৃন্দাবনের অন্ত্যখণ্ডেও প্রায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। মুরারির চতুর্থ প্রক্রমে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন পরিক্রমা বর্ণিত হইয়াছে, বৃন্দাবনদাস এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই। কাজেই বৃন্দাবন গ্রন্থ পরিকল্পনায় অন্যের উপর যতটা নির্ভর করুন আর নাই করুন, মুরারি গুপ্তের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের দ্বারা যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, সেই আদর্শ অনুসারে পালা সাজাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ এই কাব্যের ঘটনাবিন্যাসে বৃন্দাবনদাসের কিছু কিছু ত্রুটি দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি রেখায় রেখায় ইতিহাস অনুসরণ করেন নাই, নিত্যানন্দ-মহিমার অন্তরাল হইতেই সমস্ত ঘটনা বিচার করিয়াছেন, চৈতন্যচরিতকে ভাগবতের আদর্শে ঢালিতে গিয়া শিশু নিমাইকে কৃষ্ণাবতাররূপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, অনেক স্থলে তিনি ঘটনার

ক্রমও রক্ষা করিতে পারেন নাই। ক্রম রক্ষার অক্ষমতা জানাইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন :

এ সব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে তে মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥
এ সব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের বল সে বাখানি ॥

খুঁটাইয়া দেখিলে চৈতন্যভাগবতের একাধিক স্থলে ক্রমভঙ্গদোষ আবিষ্কার করা যাইবে।[৬৫] তিনি নিত্যানন্দের ভক্তশিষ্য। কাজেই চৈতন্যচরিত গ্রন্থেও নিত্যানন্দের বিস্তারিত বর্ণনা থাকিবরে কথা এবং ইহাতে অনেকটা অংশ নিত্যানন্দের কাহিনী জুড়িয়া আছে। উপরন্তু কবি নিত্যানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে চৈতন্য-জীবনী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই বা অপরাধ কোথায়? গুরুর উপদেশে তিনি চৈতন্যভাগবত রচনায় ব্রতী হন, সুতরাং তাঁহার রচনায় গুরুর ভাবাদর্শ তো কিয়ৎপরিমাণে পড়িবেই। চৈতন্যদেব একবার শান্তিপুরে গিয়া দেখেন যে, অদ্বৈত ছাত্রদিগকে জ্ঞানবাদ ও মুক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধকে "স্বহস্তে কিলায়ে প্রভু উঠানে পড়িয়া।" কাজী-দলন প্রসঙ্গে তিনি কাজীর চূড়ান্ত দুরবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আপনার অনুচরদিগকে কাজীর ঘরে আগুন দিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন :

ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥
পুড়িয়া মরুক সর্বগণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেঢ়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে ॥

ডঃ মজুমদার এই সমস্ত ঘটনাকে অনৈতিহাসিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে "চৈতন্যের চরিত্রের সঙ্গে ঐরূপ ঘটনার এতই গভীর বিরোধ যে, উহাকে বৃন্দাবনদাসের ব্যক্তিগত আদর্শের ছাপ বলিয়া ধরিয়া লওয়াই অধিকতর সঙ্গত।"[৬৬] ডঃ মজুমদার প্রেমাস্পদস্বরূপ চৈতন্যের এই রুদ্রমূর্তি সহিতে পারেন নাই, এই জন্য বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিকতায় কিছু সন্দিহান হইয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব যেমন প্রেমাবতার

---

৬৫ ডঃ মজুমদার—চৈ. চ. উ. পৃ ২০০

৬৬ ডঃ মজুমদার—ঐ, পৃ ১৯৬

ছিলেন, তেমনি তাঁহার আর একটা কঠোর রুদ্রমূর্তিও ছিল। দুঃখের বিষয় বৈষ্ণবভক্তগণ চৈতন্যদেবকে রাধাভাবে বিগলিত প্রেমানন্দময়রূপে দেখিতে অধিকতর অভ্যস্ত। কিন্তু বৃন্দাবন তাঁহাকে জীব-উদ্ধারের জন্য অবতারিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মসংস্থাপন চৈতন্যাবতারের প্রধান উদ্দেশ্য—এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের কোন সংশয় ছিল না। কাজেই চৈতন্যদেবের চরিত্রে তিনি করুণ কোমলতার সঙ্গে সুকঠোর চরিত্র, বীর্য ও পৌরুষেরও পরিচয় দিয়াছেন। চৈতন্যের এই কঠোর দিকটি অনেক ভক্তের নিকট ততটা প্রীতিকর হয় না। সেইজন্য তাঁহাদের কাছে বৃন্দাবনের উল্লিখিত বর্ণনা কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চৈতন্যদেবের চরিত্রে কোমল ও কঠোর দুই প্রকার বৈশিষ্ট্যই ছিল এবং বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের সেই মূর্তিটি ফুটাইয়া তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। আর তা ছাড়া ইতিহাসের কথা বিবেচনা করিলে, বৃন্দাবন অনৈতিহাসিক কথা লিখিয়াছেন বলিয়া খুব বেশি নিন্দা করিবার কারণ থাকিবে না। ইতিহাসের ঘটনার যথাযথ বিবৃতি, যাহা অধুনা ইতিহাস নামে পরিচিত, মধ্যযুগে এ দেশে তাহাকে ইতিহাস বলিত না। ভক্ত বা অবতারকল্প মহাপুরুষের চরিত্রে অনেক সময় আদর্শ-লোকের মহিমা আরোপিত হইত, ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নির্ণয়ের দিকে ভক্ত-লেখকগণ বিশেষ দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। প্রায় সমস্ত চৈতন্য-জীবনীকাব্যেরই এই এক প্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। "বৃন্দাবনদাস বিশ্বম্ভরের মহিমা ও অলৌকিক ঐশ্বর্যদ্যোতক এমন কতকগুলি ঘটনা সর্বপ্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন যেগুলির সত্যতা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন"—[৬৭] এই কথা বলিয়া যাঁহারা বৃন্দাবনদাসের অলৌকিক বর্ণনার সত্যমিথ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, তাঁহারা গোড়াতেই একটা ভুল করিয়া বসেন। মধ্যযুগের কোন লেখক বা পাঠক আধুনিক বাস্তব ইতিহাস-বোধের দ্বারা চালিত হইতেন না, চৈতন্যের ভাবজীবন ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা অলৌকিক ঘটনাকেও প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইতেন। আসল কথা, সে যুগের লেখক ও পাঠক মহাপুরুষের জীবনকাব্যে কতটুকু যৌক্তিক এবং কতটুকু অলৌকিক, এ সব বিষয়ে বিশেষ কোন চিন্তা করেন নাই। চৈতন্য-মহিমাদ্যোতক যে-কোন কাহিনীকেই তাঁহারা স্বীকার করিতেন। বৃন্দাবন

[৬৭] ডঃ মজুমদারের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ, ২০৫ ও ২২২

সেই আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যও ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত। ডঃ মজুমদার এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট যুক্তিপূর্ণ মনে হওয়াতে এখানে তাহাই উপসংহার স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতেছে—"ঐতিহাসিকের বহির্মুখী দৃষ্টির নিকট খুঁটিনাটি ঘটনায় বৃন্দাবনদাসের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়িলেও ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত ঐতিহাসিক তথ্যের আকর স্বরূপ।"[৬৮]

চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যলীলার বৈশিষ্ট্য ॥ বৃন্দাবনদাস জগন্নাথ-শচীনন্দন বিশ্বম্ভরকে তাহার শৈশববর্ণনা হইতেই দেবভাবে পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্‌ভগবতের কৃষ্ণলীলার আদর্শে চৈতন্যলীলার বিভিন্ন পর্যায় সাজাইয়াছেন। ইতিপূর্বে মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, স্বরূপ-দামোদর এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরাপুরি কৃষ্ণলীলার ছাচে চৈতন্যলীলা সাজাইতে চাহেন নাই। চৈতন্যের তিরোধানের কয়েক বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তখনই চৈতন্যদেব অবৈষ্ণব সমাজেও অবতারকল্প মহাপুরুষরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ-বা তাহাকে রাধাকৃষ্ণের যুগলতনু বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস আরও অগ্রসর হইয়া চৈতন্যের বাল্য হইতে যৌবন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাকে ভাগবতের আদর্শে সাজাইয়াছিলেন। অবশ্য মুরারির 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতে' চৈতন্যের বাল্যলীলা বর্ণনার অনেক স্থলে ভাগবতের ছায়াপাত হইয়াছে। শৈশবে কৃষ্ণলীলার অনুসরণ,[৬৯] অন্য দ্রব্য ছাড়িয়া ভাগবত গ্রহণ,[৭০] গোপালের বেশ,[৭১] শৈশবে হরিধ্বনি শুনিলে সান্ত্বনা,[৭২]

---

৬৮ ড. মজুমদারের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২০৫ ও ২২২

৬৯ গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে

৭০ সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরি দিলেন আলিঙ্গন ॥

৭১ কমল নয়ন যেন গোপালের বেশ।

৭২ তাবৎ ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরিধ্বনি যাবৎ না শুনে ॥

বালক কৃষ্ণের মতো দুর্লালিত ভাব,[৭৩] বাল্যকালে নিজেকে গোয়ালা বলিয়া ঘোষণা,[৭৪] প্রভৃতি বর্ণনায় ভাগবতের গাঢ়তর ছায়া পড়িয়াছে। বালক নিমাই স্নানার্থিনী রমণীদেরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন,[৭৫] তাই রমণীগণ শচীমাতার নিকট অভিযোগ করিল :

পূর্ব্বে শুনিল যেন নন্দের কুমার।
সেই মত সব করে নিমাই তোমার॥

কবিও বিশ্বাস করিতেন :

এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বুলে॥
জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥

বালক নিমাইয়ের 'দত্তাত্রেয় ভাব' (আদি-৬ষ্ঠ) ইত্যাদি বর্ণনায়ও ভাগবতের পুরাপুরি অনুস্মৃতি লক্ষ্য করা যাইবে। ডঃ মজুমদার এবিষয়ে বলিয়াছেন, "অশুচি স্থানে বসিয়া কথা বলার সময় বিশ্বম্ভরের দত্তাত্রেয় ভাব, উপনয়ন সময়ে বামন ভাব, সাপের উপর শয়ন করিয়া অনন্তলীলা এবং পিতৃবিয়োগে ক্রন্দনের সময় রামভাব দেখাইয়া কবি প্রমাণ কবিতে চাহেন যে, শ্রীচৈতন্যে সকল অবতার বর্তমান। বিশেষ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ।"[৭৬] বৃন্দাবনদাস এই ভাবেই চরিত্রলীলার স্বরূপ আস্বাদন করিয়াছেন। ডঃ মজুমদার আর একস্থলে বলিযাছেন, "সেই জন্য মনে হয় বৃন্দাবনদাস ভক্তিভাবের আতিশয্য বশতঃ শিশু নিমাইকে ভক্তরূপে অঙ্কন করিয়াছেন।"[৭৭] কিন্তু বৃন্দাবনদাস প্রকৃতই চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী গৌরাঙ্গের বাস্তব জীবনকে কিছু কিছু রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য এই বিশ্বাস

---

৭৩ কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥

৭৪ হাসিয়া কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল।

৭৫ বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ।

৭৬ ডঃ মজুমদারের গ্রন্থে উল্লিখিত।

৭৭ ঐ

কোন কোন সময়ে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বরাহ-অবতার ভাবে মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া—

শূকর শূকর বলি প্রভু চলি যায়।
স্তম্ভিত মুরারি গুপ্ত চারিদিকে চায়॥
বিষ্ণু গৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জলভাজন সুন্দর॥
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জে যজ্ঞবরাহ প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে, "মোর স্তুতি করহ মুরারি॥

মুরারি ভীত কম্পিত হইয়া বরাহরূপী মহাপ্রভুর স্তবস্তুতি করিলে 'মহাবরাহ' বলিলেন :

'শুনরে মুরারি গুপ্ত' কহযে শূকর।
'বেদগুহ্য কাহ এই তোমার গোচর॥
আমি যজ্ঞবরাহ সকল বেদসার।
আমি যে করিনু পূর্বে পৃথিবী উদ্ধার॥'

এই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার পণ্ডশ্রম মাত্র। দেবকল্প মহাপুরুষের চরিত্র ও লীলাবিচারে বহির্মুখ ইতিহাসের 'পাথুরে প্রমাণ' নিতান্তই হাস্যকর। বর্তমান প্রসঙ্গে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, চৈতন্যের সঙ্গী অনুচরগণ, যাঁহারা তাঁহাকে সদাসর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাঁহারাও মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ; সুতরাং বৃন্দাবনদাস যিনি চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অচিন্তনীয় লীলা সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনিয়াছিলেন, তিনি তো চৈতন্যদেবকে অলৌকিক মহিমালোকে প্রত্যক্ষ করিবেনই।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের অন্ত্যলীলা বর্ণনায় তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমব্যাকুল আর্তিকে প্রাধান্য দিলেও মাঝে মাঝে তাঁহার মধ্যে দিব্য আবেশের দ্বারা কৃষ্ণভাবের অবতারণা করিয়াছেন। তখন তিনি গীতার মতো উদাত্ত কণ্ঠে পতিত মানব, 'পাষণ্ডী', হীন অন্ত্যজ, অহিন্দু—জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, "মামেকং শরণং ব্রজ।" শ্রীবাসের ভবনে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর প্রথম বিভূতি প্রকাশের কাহিনীতে সেই সর্বভূতাত্মা ব্রজেন্দ্রনন্দনের

রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে পাষণ্ডীদের উৎপাত ও অভক্তি দেখিয়া গৌরাঙ্গদেব দিব্যাবেশে গর্জন করিয়া উঠিলেন :

দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু, করয়ে হুঙ্কার।
'মুই সেই মুই সেই' বলে বারবার॥

তারপর ব্রহ্মভাবে উদ্দীপিত মহাপ্রভু নিশাকালে শ্রীবাসের আঙিনায় উপস্থিত হইয়া হুঙ্কার দিলেন :

কাহারে পূজিস্ করিস কার ধেয়ান।
যাহারে পূজিস তারে দেখ বিদ্যমান॥

ভীত স্তব্ধ শ্রীবাস দেখিলেন, এ তো জগন্নাথসুত বিশ্বম্ভর মিশ্র নহে :

দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর॥
গর্জিতে আছয়ে হেন মত্ত সিংহসার।
বামকক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার॥

দিব্যভাবে আত্মবিস্মৃত মহাপ্রভু ভীত ভক্তকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই—

সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই কর মোর স্তব॥

ভাবমুগ্ধ শ্রীবাস মহানন্দে স্তব পাঠ করিলেন :

তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদক গঙ্গাতীর্থবর॥

শ্রীবাস ও তাঁহার পরিজনবর্গ মহাপ্রভুর দিব্যরূপ দর্শনে ধন্য হইলেন, মহাপ্রভু সকলকে আহ্বান করিয়া নিজ মহিমা দেখাইলেন :

স্ত্রীপুত্র আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ করহ বাহির॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ চরণ আমার।
বর মাগ যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার॥

তখন নবদ্বীপে 'পাষণ্ডী'গণ মুষ্টিমেয় চৈতন্যসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, উপরন্তু রাজভয় এই নবীন সম্প্রদায়কে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। মহাপ্রভুর মধ্যে এই জন্য এই রূপ সর্বব্যাপক দিব্যভাবের আবেশ হইয়াছিল। এই দিব্য-

ভাবের বশেই তিনি মুরারি গুপ্তের গৃহদ্বারে বরাহ-অবতাররূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যলীলাকে সর্বত্র এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার মতো আরও অনেক চৈতন্যভক্ত ও অনুচর চৈতন্যদেবকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং গীতার উক্তির মতো, জীব উদ্ধার করিতে তাঁহার আবির্ভাব, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। চৈতন্যের মতো প্রচণ্ড অনুভূতিশীল আবেগপ্রধান শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাবের আবেশ মনস্তত্ত্ব সঙ্গত—এবং এরূপ আবেশের বশে তিনি মুরারি ও শ্রীবাসের বহির্দ্বারে হাজির হইলে আশ্চর্য্যের কি আছে, এবং তাহাতে অনৈতিহাসিকতাই বা ঘটিবে কেন? তবে শ্রীবাস ও মুরারি চৈতন্যকে যেরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বৃন্দাবনদাসের নিজের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে। কিন্তু রাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া কৃষ্ণের চৈতন্যরূপে আবির্ভাবের যে তত্ত্ব স্বরূপ-দামোদরের কড়চায় ব্যাখ্যাত হইয়াছিল,[৭৮] এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতে যাহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে, বৃন্দাবনদাস খুব সম্ভব সে আদর্শ অনুসরণ করেন নাই। পাষণ্ডী-পরিবেষ্টিত বৈষ্ণবসমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মহাপ্রভুকে জীবত্রাতা ও রুদ্ররূপে আঁকিতে হইবে; বৃন্দাবন তাহাই করিয়াছেন। অবশ্য চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে বলিয়াছেন:

> কৃষ্ণের বিরহে মুই বিক্ষিপ্ত হইয়া।
> বাহির হইনু শিখাসূত্র মুড়াইয়া॥

কিন্তু সার্বভৌম যখন তর্কে পরাভূত হইয়া চৈতন্যভক্ত হইলেন, তখন মহাপ্রভুর মধ্যে আবার কৃষ্ণাবেশের আবির্ভাব হইল। তিনি সার্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

> জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ প্রেমদাস।
> অতএব তোরে মুই হৈনু প্রকাশ॥
> সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
> চিন্তা কিছু নাহি তোর পড় মোর স্তব॥

সার্বভৌম চৈতন্যের 'অপূর্ব ষড়ভুজমূর্তি কোটিসূর্যময়', দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অন্ত্যখণ্ডে পুরীধামেও চৈতন্যের মধ্যে সর্বদা কৃষ্ণাবেশ

---

৭৮ এই কড়চা পাওয়া যায় নাই। পূর্বে স্বরূপ-দামোদর সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

হইত। এমন কি স্বাভাবিক অবস্থাতেও চৈতন্য নিজেকে 'ব্রহ্ম সনাতন' বলিয়াছেন। অন্ত্যখণ্ডের নবম অধ্যায়ে তিনি শ্রীবাসের কাছে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রে যোগ-নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় 'নাড়া'র (অদ্বৈত আচার্য) আহ্বানে জগন্নাথসুত রূপে চৈতন্যাবতার হইয়াছেন :

অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাড়ার হুঙ্কার॥
শয়নে আছিনু মুই ক্ষীরোদসাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে॥

কাজেই বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও স্বরূপ-দামোদরের মতো কোন দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে না গিয়া চৈতন্যলীলাকে ভাগবতের ছাঁচে ঢালিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে চৈতন্যের রাধাভাবের কথা বলিলেও তাঁহাকে সাক্ষাৎকৃষ্ণ বা ব্রহ্মসনাতন রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস তাঁহার গুরু নিত্যানন্দের নির্দেশ ও উপদেশে এই মহাগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে আমরা জগদ্বন্ধু ভদ্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, নিত্যানন্দ নাকি বিধবা নারায়ণীকে 'পুত্রবতী হও' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন এবং তাহার বলেই নাকি বৃন্দাবনের জন্ম হইয়াছিল। সামাজিক বা যে-কোন কারণেই হোক বিধবা নারায়ণী যখন শিশুপুত্রকে লইয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের অদূরে আশ্রয় লইলেন, তখন নিত্যানন্দ সম্ভবতঃ তাঁহাদের দেখাশুনা করিতেন, আশ্রয়ের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। পরে বৃন্দাবনের শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই নিত্যানন্দের কাছেই সমাপ্ত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরের নিকট বৃন্দাবন ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ বৃন্দাবনের শুধু গুরু নহেন, তাঁহার সমস্ত জীবনেই অবধূত নিত্যানন্দের প্রগাঢ় প্রভাব পড়িয়াছিল। তাই বৃন্দাবন চৈতন্য-ভাগবতে নিত্যানন্দের চরিতকথাও বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং নিত্যানন্দের সহযোগিতার ফলেই বৈষ্ণবমত এত দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ করে; বৃন্দাবন সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সমাজের অনেকে অবধূত নিত্যানন্দের শাস্ত্রাচার বহির্ভূত আচার-বিচার বোধ হয় বিশেষ সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না; তাঁহারা নীলাচলে গিয়া চৈতন্য-

দেবের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগও করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দভক্ত ও অদ্বৈতানুচরদের মধ্যেও কিছু মতবিরোধ ও রেষারেষি থাকা সম্ভব। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা লইতে যাত্রা করিলে নিত্যানন্দ শিষ্যগণ তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন এবং বিমাতার নিকট দীক্ষা লইতে বলিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে গুরু নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বৃন্দাবন কোন কটূক্তি সহ্য করিতে পারিতেন না, কোন কোন সময়ে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। তিনি বয়োধর্মগুণে চৈতন্যভাগবতে মাঝে মাঝে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। যাহারা চৈতন্যলীলা বিশ্বাস করিতে চাহিত না, তাহাদের জন্য তিনি অধঃপাতের ব্যবস্থা করিতেন বা তাহাদের শিরের উপরে লাথি মারিতে চাহিতেন :

(১) ইহাতে বিশ্বাস যার সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ সে অধঃপাতে যায়॥
(২) যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে পর দ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ি মরে॥
(৩) এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥

তিনি বারবার নিত্যানন্দকে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন :

চৈতন্যের প্রিয় দেহ নিত্যানন্দরাম।
হউ মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম॥

চৈতন্যদেবের সহিত সংশ্লিষ্ট আরও অনেক বৈষ্ণব আচার্য ও চৈতন্যানুচরদের জীবনের অনেক কথা এই গ্রন্থের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে বলিয়া বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাস হিসাবেও ইহার মূল্য অসাধারণ।

চৈতন্যভাগবতে সমাজচিত্র॥ ষোড়শ শতাব্দীর পশ্চিম-বঙ্গের সমাজচিত্র হিসাবে এই গ্রন্থ মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল স্বরূপ গণ্য হইতে পারে। ব্যাপক অর্থে বাঙলার, এবং সঙ্কীর্ণ অর্থে বৈষ্ণবসমাজের যে লিপিচিত্রগুলি ইহাতে চকিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৃন্দাবনদাসের সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি ও সমাজের অভিজ্ঞতার উচ্চ প্রশংসা করিতে হয়। এক হিসাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। কিন্তু কবিরাজ

গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ববিশ্লেষণে অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন, উপরন্তু তাঁহার কাব্যটি বৃন্দাবনধামে বসিয়া রচিত হইয়াছিল, কাজেই বাঙলাদেশের সমাজের সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না।

বৃন্দাবনদাস প্রথমেই চৈতন্যাবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সমাজচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন এবং চৈতন্যাবতারের আশু আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চৈতন্যের আবির্ভাব, এবং তাহার পূর্ব হইতে পাঠান শাসনের ফলে হিন্দুর ধর্মকর্ম বিশেষ ভাবে বাধা পাইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দুসমাজের মানসিক ঐতিহ্য কি প্রকার ছিল, বৃন্দাবনদাস সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণেরা স্মার্ত সংস্কার, নব্যন্যায় ও তান্ত্রিকতা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তখন নবদ্বীপ নব্য-ন্যায়ের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ব্যাকরণ ও অলঙ্কার অধ্যাপনায়ও এই বিদ্যাকেন্দ্রের বিশেষ খ্যাতি ছিল। চৈতন্যদেবও প্রথম জীবনে ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পণ্ডিতসমাজ শুষ্ক জ্ঞানানুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন, কেহ তন্ত্রাদির গোপনীয় অচার অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কেহ অদ্বৈততত্ত্ব লইয়া বৃথাপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেন। নবদ্বীপ তখন পরম ঐশ্বর্যময় স্থান হইলেও বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসম্প্রদায় এখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেম ও ভক্তিধর্মের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিত না। "ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।" তখন "কৃষ্ণনামভক্তি শূন্য সকল সংসার।" ইতিপূর্বে মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তিতত্ত্ব কিছু কিছু আমদানি করিলেও ব্রাহ্মণ ও উচ্চসমাজে এই ভক্তিধর্মের বিশেষ কোন প্রচার ছিল না। "কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।" জনসাধারণ কিরূপ ধর্মা চারণ করিত, বৃন্দাবন তাহাও সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন :

> ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
> দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোনো জন।
> পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥

চণ্ডীর গান, মনসা পূজা আর পুতুল নাচে লোকে প্রচুর অর্থব্যয় করিত।

> বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
> মস্ত মাংস দিয়া কেহো যক্ষপূজা করে॥

কিন্তু কৃষ্ণরসে কেহ আসক্ত নহে, সকলেই সকাম অভিলাষে উপধর্মের আশ্রয় করিয়া থাকে, 'পঞ্চ মকার' সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে। অভ্যাসবশে স্নানের সময় একবার মাত্র বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করে :

অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥

চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহার 'গণেরা' নানা স্থানে জন্মলাভ করিলেন। নবদ্বীপ, চট্টগ্রাম, রাঢ়, ওড্র, শ্রীহট্ট, পশ্চিম-ভারত—সর্বত্র চৈতন্যসেবকের জন্ম হইতে লাগিল। ইঁহাদের জন্ম যেখানেই হোক না কেন, সকলে চৈতন্যের লীলাভূমি নবদ্বীপে আসিয়া সমবেত হইতে আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, মুরারি—ইঁহাদের জন্ম শ্রীহট্টে; পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও বাসুদেব দত্ত জন্ম গ্রহণ করিলেন চট্টগ্রামে; বুঢন গ্রামে হরিদাসের এবং ত্রিহুতে পরমানন্দপুরীর আবির্ভাব হইল। তখনও চৈতন্যদেবের জন্ম হয় নাই। অদ্বৈত মাঝে মাঝে বলেন :

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥

শ্রীবাসের আঙিনায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্ত বৈষ্ণব মিলিত হইয়া রাত্রিকালে হরিনাম করেন। অবৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইত, ভয়ও পাইত। তাহারা মনে করিত, এইরূপ নামকীর্তন চলিলে যবনভূপতি নবদ্বীপ উৎসন্ন দিবে। ফলে শাক্ত ও অন্যান্য অবৈষ্ণবগণ এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ঘোরতর বিপক্ষতা করিত। 'পাষণ্ডী'রা (অর্থাৎ স্মার্ত ও শাক্ত) বলাবলি করিত :

এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ বামুনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবুক কীর্তন করি নানা ছলা পাতে।
... ...
কেহো বলে যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥

চৈতন্য ও তাঁহার সঙ্গীরা শ্রীবাসের বাটীতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নামগান করিলে 'পাষণ্ডী'রা আরও ক্রুদ্ধ হইত :

কেহো বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥
... ...
কেহো বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥[১৯]
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥

শ্রীবাসের বাটীতে নিশাযোগে কীর্তন ও নাম গান হইত বলিয়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীবাসের উপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল :

শ্রীবাস বামনার এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি নিযা ফেলাইমু স্রোতে॥

দেশে দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি হইলে সকলে এই ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসম্প্রায়ের উপর ক্ষিপ্ত হইত :

যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া কীর্তন।
দুর্ভিক্ষ করিল—সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়॥

গ্রামবাসীদেব চৈতন্যসম্প্রদায়-বিরোধিতার কারণ, তদানীন্তন স্মার্ত ও শাক্ত সমাজ বৈষ্ণবদের এই প্রকার উন্মাদ নর্তন-কীর্তনের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া ইহাদিগকে উপহাস করিত, বুদ্ধিজীবী ও স্মার্তকৃত্যপরায়ণ সমাজ আবেগবাদী বৈষ্ণবদের সহ্য করিবে কি করিয়া? ইহার আরও একটা কারণ ছিল। তখন হাবসী শাসন শেষ হইয়া হুসেনশাহী আমল আরম্ভ হইযাছে, দেশে শান্তি ফিরিলেও বৈষ্ণবদের প্রকাশ্য উৎসবে মুসলমান শাসক কখন ক্ষিপ্ত হইয়া নবদ্বীপের অহিত করে এই ভয়েই অন্য সকলে ভীত হইয়া থাকিত। এমন

---

[১৯] অবৈষ্ণবগণ মনে করিত যে, বৈষ্ণবেরা তন্ত্রসাধনার দ্বারা ভোজ্য-ভোগ্য যথেচ্ছা উপভোগ করিয়া থাকে। ইহারা রটাইত :

এগুলা সকলে 'মধুমতী' সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে॥

কি যখন চৈতন্যদেবের মহিমা নবদ্বীপে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে, তখনও চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, বৈষ্ণবদের ধরিয়া লইবার জন্য গৌড় হইতে নৌকাযোগে সুলতানের পাইক আসিতেছে। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "রাজনৌকা আসিবে বৈষ্ণব ধরিবারে।"

কেহো বলে থারে ভাই পাড়ল প্রমাদ।
শ্রীবা.সর লাগি হৈল দেশের উচ্ছাদ॥
আজি মুই দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥
শুনিলেক নদায়ার কীর্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥
যে তে দিকে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সবা লৈয়া সর্বনাশ উপস্থিত॥

এই রটনায় ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভয় পাইয়া গেল। শ্রীবাসও যে মনে মনে শঙ্কিত হন নাই তাহা নহে। তখন চৈতন্যদেবকে স্বমহিমা প্রকট করিয়া ভক্তগণকে আশ্বাস দিতে হইল। তিনি শ্রীবাসকে বলিলেন :

অহে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ-নাও॥

তারপর শ্রীবাসকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন :

মুই গিয়া সর্ব আগে নৌকায় চড়িমু।
এই মত গিয়া রাজগোচর হইমু॥
মোরে দেখি রাজা কি রহিবে নৃপাসনে।
বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেইখানে॥

এই সমস্ত বর্ণনায় দেখা যাইতেছে, চৈতন্যসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাহারা কুৎসা রটাইত, তাহারা যতটা রাজভয়ে ভীত হইয়া এ কাজ করিত, ধর্মবিশ্বাসের বশে ততটা নহে। হরিদাসের প্রতি কাজীর অত্যাচার এবং মহাপ্রভু কর্তৃক কাজীদলনের ঘটনায় বুঝা যাইতেছে, তখন শাসক মুসলমান সুযোগ পাইলেই শাসিত হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করিয়া এইভাবে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করিত। হিন্দুগণ প্রকাশ্যে নিজ নিজ ধর্মাচরণ করিলে কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিত :

মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে॥

গোড়ার দিকে চৈতন্যগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহারা স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও বণিক। ঠিক যাহাকে জনসাধারণ বলে তাহারা নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের দ্বারা বৈষ্ণবসমাজে স্থান পাইয়াছিল। চৈতন্যদেব শিখাসূত্র মুড়াইলেও কিছু কিছু শ্রেণীবিচার মানিয়া চলিতেন। পুরীধামে হরিদাস ও রূপ-সনাতন অন্য ভক্ত হইতে একটু পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিতেন; তাহাতে চৈতন্যদেব আপত্তি করিতেন না; বরং তিনি বোধ হয় অল্পস্বল্প সমর্থন করিতেন। তাই দেখা যাইতেছে চৈতন্য-দেবের জীবিতকালে বৈষ্ণবসমাজে জাতিধর্মের আহার বিহারে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। অবধূত নিত্যানন্দ নিয়মকানুনের বিশেষ ধার ধারিতেন না, তিনিই বৈষ্ণবসমাজের রক্ষণশীলতা বহুল পরিমাণে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ অবধূত হইয়া দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন, ধনী বণিককে শিষ্য করিয়াছিলেন, নিজেও বিলাসীর মতো বেশভূষা করিতেন। অপরদিকে চৈতন্য সুকঠোর যতিজীবন যাপন করিতেন, শিষ্যদেরও সেই পন্থা শিখাইতেন। জীবিতকালে তিনি বৈষ্ণবসমাজের বাহিরেও অবতারকল্প মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, নব্যন্যায়পন্থী অনেক পণ্ডিতও চৈতন্যের ভক্ত হইয়াছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌমের মতো নৈয়ায়িক ও অদ্বৈতবাদী প্রবীণ পণ্ডিত, সনাতন-রূপের মতো প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন রাজকর্মচারী এবং উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। স্বয়ং হুসেন শাহ পর্যন্ত চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাজেই পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় সর্বত্র চৈতন্যপ্রভাব অতি দ্রুতবেগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৃন্দাবনদাস ষোড়শ শতাব্দীর সমাজ-জীবন ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নানা তথ্য এই জীবনীকাব্যে আশ্চর্য দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাসের কবিত্ব ও প্রতিভা ॥ বৃন্দাবনকে চৈতন্যলীলার ব্যাস বলা হইয়াছে। কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় তাঁহাকে ব্যাসের অবতার বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক বৃন্দাবনদাস চৈতন্যজীবনের বিপুল ঘটনাকে যেভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবিত্ব ও রচনাশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার কাব্য কেবলমাত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও দার্শনিকের জন্য রচিত হয় নাই; ইহার প্রধান লক্ষ্য সাধারণ বৈষ্ণবসমাজ।

অথচ কাব্যটি তত্ত্বজ্ঞের নিকটও পরম আদরণীয়। চৈতন্য-জীবনকে পরিচ্ছন্ন ঘটনার মধ্য দিয়া সাজাইয়া কবি নিজ ভাবাদর্শ ও রুচি-প্রবণতা অনুযায়ী এই দীর্ঘ কাব্যটির রূপদান করিয়াছেন। এতবড় কাব্যে কিছু অনৈতিহাসিকতা বা ক্রমভঙ্গদোষ থাকিতে পারে—এবং আছেও। কবি মহাপ্রভুর উৎকল লীলা অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। ফলে চৈতন্যজীবনের শেষাংশের অনেক মূল্যবান তথ্য বাদ পড়িয়াছে। বৃন্দাবন সব সময়ে বৈষ্ণবজনোচিত বিনয় রক্ষা করিতে পারেন নাই, পাষণ্ডীদিগকে কটুভাষায় গালি দিয়া রচনার মধ্যে অসহিষ্ণু তারুণ্যের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। হয়তো তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে বৈষ্ণব-সমাজ বা বাহিরে কিছু কুৎসা প্রচলিত ছিল এবং অবৈষ্ণবগণ কানীনপুত্র ব্যাসের সঙ্গে বিধবাপুত্র 'কলিযুগ ব্যাসের' তুলনা দিয়া স্থূল হাস্যপরিহাসও করিত। উপরন্তু তাঁহার গুরু নিত্যানন্দের নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন উদ্দাম জীবনযাপনের প্রণালীও অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবসমাজে নিন্দিত হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে তাঁহার মন মাঝে মাঝে তিক্ত হইয়া উঠিত এবং সেই তিক্ততা তাঁহার লেখনীর মুখেও আত্মপ্রকাশ করিত। সে যাহা হোক স্বচ্ছন্দ বর্ণনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত, এ বিষয়ে তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ অপেক্ষাও নিপুণ। কৃষ্ণদাস মূলতঃ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। কাহিনী বলিতে বলিতে তত্ত্ব-দর্শনের গন্ধ পাইলে কবিরাজ গোস্বামী অমনি মননের গহনে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস বিবৃতি-মূলক পাঁচালীরীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীত-বিদ্যাতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে একটা স্বাদু মাধুর্য সঞ্চারিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের কিছু কিছু পদ বৈষ্ণবসাহিত্যেও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই কাব্যেও তিনি যে ত্রিপদীগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহার স্বাদবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। চৈতন্যাবতার দর্শনে উল্লাসিত দেবগণের নৃত্যগীতের বর্ণনা :

কেহো কান্দে কেহ হাসে দেখি মহাপরকাশে
কেহো মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঁই রে।
কেহো বলে ভাল ভাল গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল
ধন্য ধন্য জগাই মাধাই রে।।
নৃত্য গীত কোলাহলে কৃষ্ণযশ সুমঙ্গলে
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ রে।
মহা জয় জয় ধ্বনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি
অমঙ্গল সব গেল নাশ রে।।

ইহা অতি সুখপাঠ্য, তাঁহার গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক বিখ্যাত পদটি কবিত্ব বিচারে বিশেষভাবে প্রশংসিত হইবে :

বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
জিনি মদমত্ত হাতী গমন মন্থর গতি
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি যেন প্রভাতের রবি
গৌর অঙ্গে লহরী খেলায়॥
চলিতে নাহিক পারে গোরাচাঁদ হেলে পড়ে
বলিতে না পারে আধো বোল।
ভাবেতে অবশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল॥

মহাপ্রভুর ভাবাবেশ মুগ্ধ দিব্যোন্মত্ত চরিত্রটি এখানে চমৎকার ফুটিয়াছে।

বৃন্দাবনদাস ব্যবহৃত দুই একটি উপমা আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক। নবদ্বীপে চৈতন্যের আবির্ভাব সত্ত্বেও অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছে না। কবি উপমা দিয়া এই ব্যাপার বুঝাইতেছেন :

এত সব প্রকাশেও কেহো নাহি চিনে।
সিন্ধু মধ্যে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে॥

আর একটি উপমা :

শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্বত্র না করে বৃষ্টি—নাহি তার দোষে॥

কেহ কেহ নিত্যানন্দের বাহ্যিক আচার-আচরণে বিরক্ত হইয়া চৈতন্যদেবের নিকট অনুযোগ করিলে চৈতন্য একটি সুন্দর তুলনা দিয়া নিত্যানন্দের পরম পবিত্র নিঃস্পৃহ চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল॥

ভক্তিকথা, চৈতন্যলীলা, বৈষ্ণবসমাজ ও ধর্ম, চৈতন্য-পরিকরদের জীবনী ও বর্ণনা ইত্যাদি ব্যাপারে বৃন্দাবনদাসের রচনাশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করা

কর্তব্য। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরও একটি কারণে এই গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। চৈতন্যদেবের ভাগবতলীলা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও কবি মানবীয় রসের বাতায়ন হইতে চৈতন্যজীবনের অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বিশেষতঃ চৈতন্যের শৈশব ও বাল্যলীলা এত স্নিগ্ধ, মধুর ও কৌতুকাবহ যে, বৃন্দাবনদাস বাংলা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যকে শৈশব হইতেই কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন করিয়া আঁকিয়াছেন: নিত্যানন্দ, অদ্বৈতের নিকট তিনি সেইরূপ শিক্ষাই পাইয়াছিলেন। কিন্তু মানবীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি অনেক সময় সতর্ক ছিলেন। শিশু চৈতন্যের বর্ণনা :

গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
হাসি উঠে জননীর কোলের উপর।।

কিংবা,

ধূলাময় সর্ব অঙ্গ, মূর্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর।।

শিশু নিমাই পাঠশালা হইতে পড়িয়া আসিতেছেন :

ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন কালির বিন্দু শোভে মনোহর।।

বালক নিমাই দুষ্টামি করিয়া স্নানার্থিনী যুবতীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। তাহারা শচীমাতার নিকট অভিযোগ করিত। তন্মধ্যে এক-জনের অভিযোগ কিছু গুরুতর—"কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।" মহাপ্রভু তখন বয়সে বালক মাত্র—এই যা রক্ষা। না হইলে জগন্নাথ মিশ্র আদরের পুত্রকেও ছাড়িয়া দিতেন না। একদা শিশু নিমাই অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন, কিছুতেই শান্ত হন না। শেষে একটি নিরীহ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবতের সেদিন একাদশীর উপবাস। বিষ্ণুপূজার জন্য নানা ভোজ্যদ্রব্য সহ নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন, নিমাই তাহা ভোজনের অভিপ্রায় জানাইলেন :

একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার।।
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুই সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ।।

এই সমস্ত স্থানে বৃন্দাবনদাস ভক্তের দৃষ্টিতে বালক চৈতন্যের লীলা অঙ্কন করিলেও মানবীয় কৌতুকরসও পরম উপভোগ্য হইয়াছে। কৈশোরে নিমাইয়ের বিদ্যাদর্প, মুরারি গুপ্তের সঙ্গে পরিহাস ও ব্যঙ্গকৌতুক ভক্তিরসের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। নিমাই পণ্ডিত পড়ুয়াদের পথে পাইলেই 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। এইজন্য ছাত্রগণ দূর হইতে নিমাইকে দেখিলেই পলাইবার চেষ্টা করিত। নিমাই ভাবিতেন, "এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে ?" পূর্ব-বঙ্গ পরিভ্রমণের পর দেশে ফিরিয়া গৌরাঙ্গ পূর্ব-বঙ্গের কথার অনুকরণ করিয়া ঐ অঞ্চলের অধিবাসী-দিগকে পরিহাস করিতে লাগিলেন :

বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।।

ভক্ত চৈতন্যের প্রথম যৌবনের এই মানবরূপটি ফুটিয়াছে বলিয়াই চৈতন্য-ভাগবত সাহিত্যগ্রন্থ হিসাবেও সমাদর লাভ করিয়াছে।

চৈতন্য ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ হোন, আর স্বয়ং ঈশ্বর হোন, তিনি মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। কাজীর বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহাকে সপরিবারে পোড়াইয়া মারিবার জন্য তিনি অনুচর-দিগকে আদেশ দিয়াছিলেন (মধ্য, ২৩)। অদ্বৈত মুক্তি ও জ্ঞানতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন বলিয়া ক্রুদ্ধ মহাপ্রভু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রহার করিয়াছিলেন। নীলাচলে চৈতন্যদেব অদ্বৈতের মহিমা বৃদ্ধির জন্য শ্রীবাসকে একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতেরে ?" শ্রীবাস উত্তর দিয়াছিলেন, "শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয়।" ইহার পরে :

অদ্বৈতের মহিমা প্রহ্লাদ শুক যেন।
শুনি প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন।।
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এই মত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে।।

এখানে দেখা যাইতেছে বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তের গায়ে হাত তুলিতে তাঁহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইত না, তাঁহার হাতে চড়চাপড় বিলক্ষণ চলিত। তিনি শ্রীবাসকে শুধু এক চড় মারিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, "শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া।" ভক্তির দিক হইতে ইহার তাৎপর্য যেরূপই হোক না কেন, ক্রোধপ্রকাশের দ্বারা

মহাপ্রভু মর্ত্যের মানুষ হইয়া দেখা দিয়াছেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস—সকলেই চৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। এই বৃদ্ধদের প্রতি যুবক চৈতন্যের কিলচড় বর্ষণের সংবাদে আধুনিক পাঠক চমকিত হইবেন। কিন্তু সে যুগের ভক্তগণ এই শারীরিক নির্যাতনকে ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা বলিয়া পুলকিত হইতেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে ভক্ত চৈতন্যদেব ও বাস্তব নিমাইকে মিলাইয়া যে আলেখ্যটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

শচীমাতার বিষণ্ণ পুত্রশোকাতুরা মূর্তিটি গভীর বেদনার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। চৈতন্য সন্ন্যাস লইলে শচীমাতার বিলাপ করুণ রসোদ্রেকে যথেষ্ট সার্থক হইয়াছে। তাঁহার করুণ মিনতি অশ্রুবেদনায় পাঠকের অন্তরেও ব্যাকুলতা জাগাইয়া তোলে। যখন তিনি বিলাপ করিতে করিতে বলেন :

> না যাইহ না যাইহ বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
> পাপিনী আছয়ে সবে তোর মুখ চাইয়া॥
> তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
> বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
> তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
> তুমি গেলে প্রাণ মুই সর্বথা ছাড়িমু॥

তখন ভক্ত-ভগবান শ্রীচৈতন্যের চারিদিকে মানবজীবনের সুখদুঃখের পরিচিত জীবন-রসই ঘনাইয়া অসে।

চৈতন্যভাগবতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। মাত্র দুই এক স্থলে বিষ্ণুপ্রিয়ার উল্লেখ আছে :

> যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীকে অন্যোন্য উচিত।
> সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত॥

বাস্তবিক বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যভাগবতে 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। শচীমাতার বেদনা সান্ত্বনাতীত সন্দেহ নাই, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যথারও কি তুলনা আছে? তরুণ বয়সে স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসীর মাতৃদর্শন নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু পত্নী সম্ভাষণ একেবারেই চলিবে না। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস-গ্রহণের পর একবার মাতার সঙ্গে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, মাতাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন; তিনি শান্তিপুরে অবস্থান করিলে

নবদ্বীপের ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়াছিল। কিন্তু সেই দর্শকের মধ্যে আর দুইটি তৃষ্ণার্ত চক্ষু তো দৃষ্টি পাতিয়া অপেক্ষা করে নাই। চৈতন্যদেব যখন পুরীতে ছিলেন (মাতার প্রতি বিবেচনা করিয়াই পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন), তখনও প্রায়শঃই মাতার কাছে সংবাদ পাঠাইতেন, কিন্তু নিশ্চয়ই স্ত্রীর সংবাদ রাখিতেন না: বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কি করিতেন? গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে তাঁহার দুঃখবেদনা সম্বন্ধে কিছু পোষাকী বর্ণনা আছে। কিন্তু সহৃদয় বৃন্দাবনদাসও এই রমণীটির দুঃখকথার কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। শুনা যায় বিষ্ণুপ্রিয়া নাকি চৈতন্যের মূর্তি পূজা করিতেন। মানুষকে মূর্তির মধ্য দিয়া পাইবার চেষ্টা আরও শোকাবহ। পরবর্তীকালে তিনি বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন, তাই বলিয়া জাহ্নবীদেবীর মতো ভক্ত পরিবৃত হইয়া থাকিতেন না। অবরোধবাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর বৃন্দাবনদাসের নয়ন হইতে মুছিয়া গিযাছিলেন।[৮০]

বৃন্দাবনদাসের 'বংশবিস্তার' বা 'নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার' নামক একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। নিত্যানন্দের ভক্ত ও শিষ্য বৃন্দাবনদাস গুরুবংশের পরিচয় দিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ এই গ্রন্থের প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দিহান। ইহাতে এমন ভুলভ্রান্তি আছে যাহা নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাসের হইতেই পারে না। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের চরিতকথা ও পত্নী জাহ্নবীদেবীর কথাই ইহার মূল বর্ণনীয় বিষয়। এক বিষয়ে ইহার কিছু মূল্য আছে। বীরভদ্র (চৈতন্যের অবতার বলিয়া পরিচিত) অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য নৌকাযোগে শান্তিপুরে যাত্রা করিলে নিত্যানন্দের অনুচরেরা এই দীক্ষা লওয়ার অনুমোদন করিলেন না, নৌকা ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁহাদের কথায় বীরভদ্র অদ্বৈতের

৮০ এ বিষয়ে 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"বৃন্দাবন দাসের আদিলীলার বর্ণনা সুবিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট হইলেও, যে জন্যই হউক, তিনি চৈতন্যদেবের কিশোরী পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার প্রেম-সম্পর্কের কোনো ধারণা করিতে পারেন নাই; সুতরাং এ প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এজন্য তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানার একটা বিশেষ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।" (পদকল্পতরু, ৫ম)

নিকট দীক্ষা না লইয়া বিমাতা জাহ্নবীদেবীর কাছেই মন্ত্রদীক্ষা লইলেন। এই বর্ণনায় দেখা যাইতেছে অদ্বৈতের জীবৎকালের মধ্যেই অদ্বৈতশিষ্য ও নিত্যানন্দের অনুচরদের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল। চৈতন্য-পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইতিবৃত্তের অনেক উপাদান এই পুস্তিকায় প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। কিন্তু ইহা বৃন্দাবনের রচিত কিনা তাহাতে ঘোর সংশয় আছে।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ॥

লোচনদাসের[৮১] চৈতন্যমঙ্গল নানা কারণে আলোচনার যোগ্য। প্রথমতঃ ইহা সাধারণ বিশ্বাসপ্রবণ বৈষ্ণবভক্তের জন্য রচিত হইয়াছিল এবং মুখ্যতঃ ইহা পাঁচালীপ্রবন্ধ ও মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণে গীত হইত। দ্বিতীয়তঃ এইকাব্যে চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক তথ্যাদি থাক আর নাই থাক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শাখা বিশেষের ('গৌরনাগর') মতামত ও সাধনভজনপ্রণালীর জন্যও এই জীবনীকাব্যটির বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন।

লোচনদাসের পরিচয় ॥ ভক্তগণ প্রায়শঃই গালগল্পকে ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করেন বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাস ও তথ্যনির্ণয়ে নানা অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। লোচনদাসের জীবনকথার ব্যাপারেও নানারূপ গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে—যদিও কবি নিজে তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে নিজের বংশপরিচয় বিস্তারিত ভাবেই দিয়াছেন।

চারিখণ্ড কথা সায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে কহি গোরা-গুণগাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে॥

তিনি ত্রিলোচন নামেও অভিহিত হইতেন।

মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানা তীর্থ পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র।
সহোদর নাহি নাহি মাতামহের সুত্র॥

বাল্যকালে অত্যন্ত আদরে লালিতপালিত-হওয়ার জন্য বোধহয় কবির লেখা পড়া শিখিতে বিলম্ব হইয়াছিল। মাতামহ পুরুষোত্তম "মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।" তাঁহার দীক্ষাগুরু হইতেছেন চৈতন্য-পরিকর শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতা নরহরি সরকার—"নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তি দাতা।" কবির স্বলিখিত আত্মকথা সংক্ষিপ্ত হইলেও অসম্পূর্ণ নহে। কিন্তু ভক্ত-গণের কল্পনা এত সহজে ভক্তির পাত্রকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। জনশ্রুতি ক্রমে ক্রমে পল্লবিত হইয়া লোচন সম্বন্ধে বিরাট আখ্যানের রূপ ধরিয়াছে এবং আধুনিক কালের ব্যক্তিরাও সেই সমস্ত গালগল্পকে নির্বিচারে ইতিহাসের মর্যাদা দিয়াছেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র, অচ্যুতচরণ চৌধুরী, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রভৃতি ভক্ত ও পণ্ডিতগণ লোচনদাসের সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত উপকথাকে পরম সমাদরে পত্রস্থ করিয়াছেন। এইরূপ আখ্যান্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস হইতে লোচন-দাসের যে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রথমে একটি দীর্ঘ গল্পে লোচনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আমোদপুর কাকুটে গ্রামে অল্প বয়সে লোচনের বিবাহ হয়। নরহরি সরকারের উপদেশে তিনি সাধনভজন লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং স্ত্রীর সংবাদাদি ভুলিয়া যান। স্ত্রী পিত্রালয়েই থাকিতেন। একদা নরহরির আদেশে লোচন শ্বশুরবাড়ী স্ত্রী সম্ভাষণে চলিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক যুবতীকে 'মা' সম্বোধন করিয়া তিনি শ্বশুরবাড়ীর পথ জিজ্ঞাসা করেন। শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই যুবতী, যাঁহাকে তিনি মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন, তিনিই কবির ধর্মপত্নী! দীর্ঘদিন অদর্শনের ফলে তিনি স্ত্রীর আকার-আকৃতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হোক তিনি স্ত্রীকে জানাইলেন যে, তাঁহার আর সংসারজীবন যাপনের ইচ্ছা নাই। কিন্তু স্ত্রী অত্যন্ত রোদন করিতে থাকিলে লোচন গুরুশক্তির বলে স্ত্রীর মন হইতে দাম্পত্য বাসনার মালিন্য দূর করিয়া দিব্যভাব সঞ্চার

করিলেন। স্ত্রীর মন নির্মল হইলে লোচন ভার্যাকে বলিলেন, "তোমাকে আমি কখনও বিস্মৃত হইব না; তুমি নিরত আমার হৃদয়কন্দরে বাস করিবে এবং ইচ্ছা করিলে আমার সঙ্গলাভও করিতে পারিবে। তখন আমরা দুইজনে একত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান করিয়া অপ্রাকৃত সুখ লাভ করিব।" এই ব্যাপারে গুরু নরহরি আনন্দিত হইয়া শিষ্যকে আশীর্বাদ করিলেন। লোচন ইতিপূর্বে রচিত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া ততটা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ উহাতে চৈতন্যের 'নাগরভাবের'[৮২] কোন প্রসঙ্গ ছিল না। তিনি তখন চড়কডাঙ্গায় নরহরির সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে বটপত্রে ঝাঁটার কাঠি দিয়া লোচন পদ লিখিতেন (কেন, লিপিসরঞ্জামের দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল নাকি?)। "গুরুর আদেশে তিনি কোগ্রামে আসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে গৌর-অর্চনা করিতে লাগিলেন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা আরম্ভ করিলেন। নরহরি শিষ্যকে নিজের কাছে না রাখিয়া কোগ্রামে যাইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে বলিলেন কেন, তৎসম্বন্ধে ইহাই মনে হয় যে, নরহরি নিজে নাগরীভাবে গৌর ভজন করিতেন। তিনি জানিতেন যে, অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের সঙ্গ ব্যতীত মধুর রসের পুষ্টি সাধন হয় না। নরহরি বুঝিয়াছিলেন, লোচনের সহধর্মিণী প্রকৃতই তদ্‌গতপ্রাণা হইয়াছেন, এবং লোচনেরও এরূপ স্ত্রীর প্রতি এরূপ আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক। কাজেই এরূপ মর্মসঙ্গিনীর প্রভাবে লোচনের রচনা সরস ও মর্মস্পর্শী হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন।"[৮৩]

এই সমস্ত বর্ণনার কতটুকু ঐতিহাসিক, আর কতটুকু-ই বা বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত গাল-গল্পের উপাদান তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তিনি চৈতন্যমঙ্গলের সমাপ্তিতে যে আত্মপরিচয়টুকু দিয়াছেন, তাহার বাহিরে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রামগোপাল দাসের 'নরহরি-রঘুনন্দনের শাখানির্ণয়ে' লোচন সম্বন্ধে আর একটা নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে:

আর এক শাখা· বৈদ্য লোচনদাস নাম।
পূর্বে লোচনা সখী যার অভিমান॥

৮২ ইতিপূর্বে নাগরভাব আলোচনা করা হইয়াছে।

৮৩ 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র দ্বিতীয় সংস্করণে মৃণালকান্তি সংযোজিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য: পৃ. ২৪১-২৪৪

শ্রীচৈতন্যলীলা যেহ করিলা বর্ণন।
গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গি সদন ॥

এই শেষ দুই ছত্রের অর্থ করিতে গিয়া ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলিয়াছেন, গুরুর জন্য ('অর্থে') ফিরিঙ্গীদের নিকট তিনি প্রতিভূ ছিলেন, এইরূপ অর্থ করিলে বলিতে হয় যে, নরহরি সরকার ফিরিঙ্গীদের সহিত কোনরূপ ব্যবসা করিতেন।[৮৪] নরহরি পর্তুগীজদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করুন আর নাই করুন, ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে তাঁহার যে কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

মোটামুটি প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে জানা যাইতেছে যে, 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে লোচন, লোচনদাস, ত্রিলোচন ও সুলোচন ভণিতায় প্রায় একাত্তরটি পদ পাওয়া গিয়াছে। মৃণালকান্তি ঘোষ মনে করিতেন, এগুলি কবি লোচন-দাসেরই রচনা। হালকা চালে রচিত আদিরসাত্মক গৌরলীলা বিষয়ক পদগুলি একই কবির রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। এগুলি 'ধামালি' নামে পরিচিত। পরে এই ধামালিগুলিকে বাছিয়া 'লোচনদাসের ধামালি' কয়েকবার মুদ্রিতও হইয়াছে। এই ধামালিতে আদিরসের লঘুছাঁদের পদ আছে বলিয়া কেহ কেহ নাকি লোচনকে 'ব্রজের বড়াই' বলিয়া ডাকিতেন।[৮৫] তিনি নিজ স্ত্রীর সঙ্গে যে ধর্মাচরণ করিতেন এবং দাম্পত্যবন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, কোন কোন পুঁথিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মৃণালকান্তি এইরূপ কয়ছত্রের উল্লেখ করিয়াছেন :

আমার প্রাণভার্যা, নিবেদোঁ নিবেদোঁ নিজ কথা।
আশীর্বাদ মাঙ্গো যত যত মহাভাগ
তবে গাব গোরাগুণগাথা ॥

লোচনদাস গুরু নরহরির নিকট গৌরনাগরভাবের সাধনভজনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই আদর্শ অনুসারে ধামালি পদ লিখিয়াছিলেন, চৈতন্য-মঙ্গলেও তাহার প্রভাব রহিয়াছে। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে আছে, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব রাত্রে মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দাম্পত্যলীলা করিয়াছিলেন।

ডঃ মজুমদার—চৈ. চ, উপা.
গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সং)

সেই প্রসঙ্গে 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থের লেখক গৌরগুণানন্দ ঠাকুর বলিতেছেন :

> শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই ঘটনাটি জানিতেন না। লোচনের গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া সন্দেহবশতঃ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই কথা তাঁহার জননী নারায়ণী ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিলেন, লোচনদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সত্য ঘটনা; আমি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট নিজে একথা শুনিয়াছি এবং আমার একথা বেশ স্মরণ আছে। বৃন্দাবনদাস তখন ঠাকুর নরহরির একান্ত কৃপাপাত্র ও নিগূঢ় গৌরলীলারসগত লোচনানন্দকে ধন্য ধন্য বলিয়া সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন।[৮৬]

এ সমস্ত জনশ্রুতি আর যাহাই হোক ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। ঐতিহাসিক তথ্য যেখানে স্বল্পতম এবং সম্প্রদায়গত প্রচার যেখানে সর্বাধিক, সেখানে এ সমস্ত রূপকথা বর্জন করাই উচিত।

চৈতন্যমঙ্গল পরিচয় ॥ এই কাব্যের নাম ও রচনাকাল লইয়া আর একটা গোলমাল সৃষ্টি হইয়াছে। লোকশ্রুতি অনুসারে এ বিষয়ে একটা গল্প চলিয়া আসিতেছে। প্রথমে বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে চৈতন্যজীবনী-কাব্য রচনা করেন। তাহার কিছু পরে লোচনের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়। বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী দুই গ্রন্থের একই নামের গোলমাল মিটাইবার জন্য পুত্রের গ্রন্থের নাম পাল্টাইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত রাখেন। সুতরাং লোচনের গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামে প্রচারিত হইলে আর কোন সমস্যা উঠিবে না। কিন্তু অনেকেই এ কাহিনী স্বীকার করেন না। এই নাম পরিবর্তনের ঘটনাকে 'পদকল্পতরু'-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় 'কিংবদন্তীমূলক' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের নাম প্রসঙ্গে আমরা গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। সেই উদ্ধৃতিতে দেখা যাইতেছে যে, লোচনের গ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের পরে রচিত হয়। নরহরির নির্দেশে লোচন বৃন্দাবনকে নিজ গ্রন্থ দেখিতে দেন। বৃন্দাবন উক্ত গ্রন্থে

> অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
> শ্রীনিত্যানন্দ বন্দ রোহিণীর সুত ॥

[৮৬] গৌরগুণানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব
[৮৭] ঐ

শ্লোকটি দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং বলেন, "লোচন! তুমি নরহরির অনুগ্রহে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছ, কারণ গৌর-নিত্যানন্দকে তুমি অভেদমূর্তিতে বর্ণনা করিয়াছ। অদ্য হইতে তোমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল ও আমার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইল।[৮৭] বলা বাহুল্য এ সমস্ত উক্তির কোন প্রামাণিকতা নাই। বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়, পরিবার ও সমাজে বহুদিন হইতে নানা গালগল্প চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বৃন্দাবনদাস কখনই লোচনের গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন না। কারণ লোচন গৌরনাগরভাবের কবি ছিলেন। বৃন্দাবন এই আদর্শ বিশ্বাস করিতেন না। অতএব আমাদের অনুমান, লোচনের গ্রন্থের জন্যই বৃন্দাবনের গ্রন্থেব অভিধা পাল্টাইয়া গিয়াছিল ইহার স্বপক্ষে প্রমাণের অভাব রহিয়াছে। লোচনদাস নিজ গ্রন্থের মধ্যেই চৈতন্যভাগবতেব উল্লেখ করিয়াছেন :

শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে।।

নাম পরিবর্তনের কোন প্রসঙ্গ ঘটিলে লোচন কি তাহার উল্লেখ করিতেন না?

এখন দেখা যাক লোচনেব কাব্য আনুমানিক কবে রচিত হইয়াছিল। পুঁথিতে বা গ্রন্থের কোথাও সন-তারিখ সংক্রান্ত কোন উল্লেখ নাই, কাজেই পারিপার্শ্বিক কারণ বিচাবে অনুমানের শরণ লইতে হইবে। সতীশচন্দ্র রায় কোন উৎসের উল্লেখ না করিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "১৪৫৯ শকে অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়" (পদকল্পতরু, ৫ম, পৃঃ ২০৭)। কিন্তু কোন্ প্রমাণের বলে বা কোথা হইতে তিনি এই তারিখ পাইলেন, তাহা বলেন নাই। মৃণালকান্তি ঘোষ 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র (দ্বিতীয় সংস্করণ) ভূমিকায় বলিয়াছেন, "১৪৫৯ শকে চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়, তখন লোচনদাসের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। তাহা হইলে লোচনের জন্ম ১৪৪৫ শকে।" মৃণালকান্তি ১৪৫৯ এবং ১৪৭৫ শক দুইটি কোথায় পাইলেন, তাহাও অজ্ঞাত। আর তাহা ছাড়া, চৌদ্দ বৎসরের বালকের পক্ষে আদিরসের উগ্র চিত্র অঙ্কন নিশ্চয় অকাল-পক্কতার পরিচায়ক। এই সমস্ত উক্তি সরাসরি অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার একটি বিশ্বাসযোগ্য অনুমানের সাহায্য লইয়াছেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে রচিত কবিকর্ণপূরের

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় চৈতন্যানুচরগণের অবতাররূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র পর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসখাসখীগণ নবদ্বীপে কে কোন্ অবতারমূর্তি গ্রহণ করেন, প্রত্যেক নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবই তাহার সংবাদ রাখিতেন। লোচন এই অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

আমি অতি অল্পবুদ্ধি কি বলিতে জানি।
অবতার নির্ণয়কথা কেমনে বাখানি।
মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কাণে।
তাহা কহিবারে নারি সঙ্কোচ পরাণে।

এই সঙ্কোচ হইতে মনে হইতেছে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' রচনার (১৫৭৬ খ্রীঃ অঃ) পূর্বেই লোচনের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। কারণ ইহার পরে রচিত হইলে তিনি 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' হইতে অসঙ্কোচে অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তখনও কবিকর্ণপূরের উক্ত গ্রন্থ রচিত হয় নাই বলিয়া লোচনদাসকে মহান্তের নিকট শুনিয়া শুনিয়া অবতারতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কাজেই লোচনের চৈতন্যমঙ্গল ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কত পূর্বে? দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "কথিত আছে যে, তিনি ১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন" ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য')। এই সনকেও গ্রন্থের রচনাকাল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু দীনেশচন্দ্র কোন প্রমাণ দেন নাই বলিয়া এই তারিখকেও ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়া যায় না। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অভিমত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, "১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে যখন গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা লিখিত হয়, তখন তাহার দশ-পনের বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের রচনাকাল অনুমান করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ১৫৫০-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমি বিবেচনা করি।"[৮৮]

চৈতন্যমঙ্গল আকারে চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও নিতান্ত ক্ষীণকায় নহে। উহার চারিটি খণ্ড—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্য খণ্ড, শেষ খণ্ড। প্রায় এগার হাজার ছত্রে রচিত এই কাব্যটি মুখ্যতঃ স্বল্পশিক্ষিত

৮৮ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

সমাজে গান গাহিবার জন্য প্রচারিত হইয়াছিল। এই জন্য সর্বত্র রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, কিন্তু সর্গবিভাগ বা অধ্যায়বিভাগ নাই। রচনাধারা অনেকটা মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ। সূত্রখণ্ডটি মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের মতো। ইহাতে স্বর্গের কাহিনী ও চৈতন্যাবতারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কবি লোচন প্রথমেই মঙ্গলকাব্যের কবিদের মতো গণেশ, হরপার্বতী, সরস্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা ও মঙ্গলাচরণ করিয়া এবং নিজ গুরু "ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস প্রাণ-অধিকারী"কে প্রণাম জানাইয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। তারপর কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন এবং রাধাপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যার পর নারদ কর্তৃক হরি-হীন পৃথিবীর কথা বর্ণনার পর কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন যে, তিনি রাধাভাবে "নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম" লভিবেন এবং ঘোষণা করিলেন, "ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে"। পরে নারদ নানা স্থান ঘুরিয়া মহাবৈকুণ্ঠে গিয়া মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করিলেন। মহাপ্রভুর অবতার গ্রহণ সম্বন্ধে নারদ বলিলেন:

পাপময় কলিযুগে না দেখি নিস্তার লোকে
দয়া উপজিল প্রভুচিতে।
পালিব ভকতজন আর ধর্মসংস্থাপন
জনম লভিব পৃথিবীতে॥

শুধু ধর্মসংস্থাপন নহে, তিনি রাধাভাবও অঙ্গীকার করিবেন। নারদ সে বিষয়েও বলিলেন:

রাধা ভাব অন্তরে রাধাবর্ণ বাহিরে
অন্তর্বাহ্য রাধাময় হব।
সঙ্গে সখাসখীবৃন্দ আর ভক্ত অনন্ত
ব্রজভাবে অখিল মাতাব॥

কৃষ্ণের নির্দেশে তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার পূর্বেই নবদ্বীপ ও অন্যান্য অঞ্চলে জন্ম লইতে লাগিলেন। মহেশ্বর হইলেন কমলাক্ষ অর্থাৎ অদ্বৈত, স্বয়ং দুর্গাকাত্যায়নী হইলেন অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী, বলরাম জন্মিলেন নিত্যানন্দ রূপে, আর কবির গুরু, বৈদ্যবংশোদ্ভূত নরহরি সরকার বৃন্দাবনের সখী মধুমতীর অবতাররূপে শ্রীখণ্ডে আবির্ভূত হইলেন। ইহার পর আদিখণ্ড—এই অংশে চৈতন্যের জন্মগ্রহণ হইতে বয়ঃপ্রাপ্তি, গয়াগমন এবং গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশের ঘটনার মধ্যে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা কর্তব্য।

ইহাতে গৌরাঙ্গের নাগররূপের বর্ণনা আছে। বরবেশী গৌরাঙ্গকে দেখিয়া নদীয়া-নাগরীরা চিত্তচাঞ্চল্য বোধ করিয়াছিল :

নদীয়া··নগরে নাগরী আগোর
রসের সাগর সবে।
গৌরচন্দ্রলীলা দেখিয়া ভুলিলা
দম্ভ চূর গেল তবে।।
নাগরীর গুণ আদরে বাথান
বঙ্কিম আঁখি কটাক্ষে।
লাজের মন্দিরে আগুনি ভেজায়া
লোভে,·পড়ে লাখে লাখে।।

তাঁহাকে দেখিয়া "মদনবেদনে অধীর হইল নারী"। চৈতন্যের আর একটি নাগরভাবের বর্ণনা :

বসিলা সুন্দরী সব প্রভুর সমীপে।
সে অঙ্গবাতাসে রঙ্গিণীর অঙ্গ কাঁপে।
বসন· বচন সব স্খলিত হইল।
নয়নে অলসযুত কাহারও হইল।।
কেহো অঙ্গপরশে অনঙ্গরঙ্গ করে।
ঢুলিয়া পড়িলা বিশ্বম্ভরের উপরে।।

কবির গুরু নরহরি চৈতন্যের নাগরভাবের পদ লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য লোচন দাসও যে সুযোগ পাইলে নদীয়া-নাগরীগণের আদিরসার্দ্র আবেগ উৎসারিত করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের নদীয়া লীলা ও উৎকল লীলা দুই-ই স্থান পাইয়াছে, অবশ্য উৎকল লীলার শুধু প্রারম্ভ ভাগ এই অংশে গৃহীত হইয়াছে। নবদ্বীপে মহিমাপ্রকাশ, ভক্তগণের আগমন ও চৈতন্যের সঙ্গে মিলন প্রভৃতি এই অংশের প্রথম দিকে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যদেব ভাগবতের কৃষ্ণের মতো লীলা করিতেছেন—কোন কোন স্থলে এরূপ বর্ণনাও আছে। যেমন—বস্ত্রহরণ লীলা। অবশ্য রমণীগণের বস্ত্রহরণ নহে, নিজ 'গণে'রই বস্ত্রহরণ :

আচম্বিতে একদিন ধন্য রম্য খেলে।
নিজজন সঙ্গে ক্রীড়া করে সন্ধ্যাকালে।।

সবার অঙ্গের বস্ত্র নিলা ত কাড়িয়া।
আনন্দে হাসযে সবে বিবস্ত্র করিয়া।
সব জন লজ্জায় অবশ ভেল তনু।
করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ চাটু করে পুনু॥
বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ ত্রিজগৎ রায।
এমন করিতে প্রভু তোরে না জুয়ায়
এ বোল শুনিযা প্রভুর অধিক উল্লাস।
ক্ষণেক অন্তরে সব জনে দিল বাস॥

শ্রীচৈতন্য কর্তৃক তাঁহার ভক্তদেব বস্ত্রহরণ লীলার বর্ণনা হইতে মনে হয়, লোচনদাস ইতিহাসের ধার ধারিতেন না, ঔচিত্যবোধ ও রসবোধেও তিনি গ্রাম্যরুচির পরিচয় দিযাছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের সমালোচক-গণ (যেমন—দীনেশচন্দ্র) সকলেই লোচনের কবিত্বশক্তির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, কেহ-বা পাণ্ডিত্যেরও গুণগান করিয়াছেন (মৃণালকান্তি ঘোষ),[৮৯] কিন্তু লোচন বহুস্থলেই নিম্নগ্রামে সুর বাঁধিযাছিলেন এবং নাগরভাবর হানিকর প্রভাবে চৈতন্যচরিত্রের মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন নাই। চৈতন্য কর্তৃক বস্ত্রহরণলীলা ভাগবতের অক্ষম বিকৃত বর্ণনা এবং মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনৃতভাষণের অপচেষ্টা বলিয়া সকলেই কবিকে নিন্দা করিবেন। মহাপ্রভু কৃষ্ণাবেশে অনুচরদের বস্ত্রহরণ করিতেছেন, এবং ভক্তগণ নগ্নদেহে 'বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ' বলিয়া সলজ্জ প্রার্থনা জানাইতেছেন, এ দৃশ্য শুধু হাস্যকর নহে, অতিশয় জুগুপ্সাব্যঞ্জকে। সে যাহা হোক, মধ্যখণ্ডে নীলাচল লীলার প্রথমাংশ বর্ণিত হইয়াছে, বাসুদেব সার্বভৌমের মহাপ্রভুর শবণ গ্রহণ এই অংশের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কবি নবদ্বীপ লীলাকে এবং নীলাচল লীলাকে পৃথক পর্যায়ে রচনা করিলে কাব্যটি আরও পরিচ্ছন্ন হইতে পারিত।

শেষখণ্ডে মহাপ্রভুর দক্ষিণযাত্রা, রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন, সেতুবন্ধ পর্যন্ত ভ্রমণ এবং পুরীতে প্রত্যাবর্তন, পরে একবার গৌড় ঘুরিয়া আবার নীলাচলে অবস্থান, পরিশেষে চৈতন্যের অলৌকিক তিরোধান বর্ণিত হইয়াছে।

[৮৯] মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সং), পৃ ২৪৪

শেষখণ্ড আয়তনে ক্ষুদ্রতর। লোচন মুরারি গুপ্তের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' অবলম্বনে চৈতন্যমঙ্গলের কাহিনী সাজাইয়াছিলেন, সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, ভবিষ্যপুরাণ, জৈমিনি ভারত, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তিনি অনেক শ্লোক ব্যবহার করিয়াছেন। কবিতার কোন কোন স্থলে বিদ্যাপতিকেও অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু মুরারি গুপ্তের নিকট তাঁহার ঋণ সর্বাধিক এবং তিনি তাঁহার কাব্যের নানা স্থানে মুক্তকণ্ঠে সে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার কিছু কিছু অনুবন্ধ বিশেষ প্রশংসনীয়। রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকের একটি কবিতার ("কলয়তি নয়নং দিশি চলিতম্") অনুবাদ—"চললি ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জরবর গামিনী" সুখপাঠ্য হইয়াছে।[৭০]

চৈতন্যলীলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ॥ লোচনদাস সাধারণ মানুষের জন্য সুরে তালে গেয় পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্যের রীতির মিশ্রণে চৈতন্যমঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রামাণিকতা ও তত্ত্বাদর্শ বিচারে এ কাব্য পণ্ডিতের পাঠের সামগ্রী নহে, ভক্ত ও জনসাধারণের আনন্দগীতেষ্ক ভোজ্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য কবিগণ শুধু ভক্তিভাবমুগ্ধ চৈতন্যদেবের জীবনকথা বলিবার জন্যই কাব্যরচনায় ব্রতী হন নাই। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে চৈতন্যাবতারে কলিযুগলীলার কথা বলা হইয়াছে; ধর্মসংস্থাপন, প্রেম বিতরণ জীবউদ্ধার, কলিকল্মষ বিদূরণ, ইহাই চৈতন্যাবির্ভাবের মূল লক্ষ্য। কাজেই বৃন্দাবন সেখানে শাস্ত্রমার্গ অনুসরণ করিয়াছেন। লোচন বৃন্দাবনের কাব্য দেখিয়াও

[৭০] লোচনের কবিত্ব সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহারী একটু নির্মম মন্তব্য করিয়াছেন, "মুরারি বা রামানন্দ যে ভাব অতি অল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন, লোচন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ইংরাজী কাব্যের ভারতীয় নোট লেখকের মত ফেনাইয়া ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন" (চৈ, চ, উপা. পৃ. ২৫২-৫৩)। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সংস্কৃত শ্লোককে বাংলায় হুবহু অনুবাদ করিলে রসহানি হইত। আক্ষরিক অনুবাদ কাব্যে অচল। লোচন ভাবানুবাদ করিয়া ভালই করিয়াছেন। উপরন্তু সংস্কৃত ভাষার গাঢবন্ধ ছন্দালঙ্কার ও সমাস-সন্ধি-সমন্বিত ক্লাসিক বাক্‌রীতিকে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় হুবহু অনুবাদ করিলে তাহা অপাঠ্য হইবে। কাজেই লোচনের অনূদিত কবিতাকে নিন্দা করা যায় না।

থাকিতে পারেন। তাঁহার প্রাচীনতম পুঁথিতে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের উল্লেখ আছে।[৯১]

বৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥

কিন্তু নরহরি সরকারের শিষ্য লোচনদাস বোধহয় এই কাব্যের চৈতন্যলীলা পাঠে পুরাপুরি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। প্রথমতঃ ইহাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ নাই, দ্বিতীয়তঃ বৃন্দাবন এই কাব্যে চৈতন্যের নাগরভাবে-বিশ্বাসীদের ঈষৎ নিন্দাই করিয়াছেন। নবহরি সরকার 'গৌরনাগরভাব'-এর প্রধান প্রচারক ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব শিষ্টসমাজ তাঁহার মতে বোধহয় বিশ্বাস করিতেন না। নরহরি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার সাক্ষী ছিলেন, অথচ কোন চরিতকার তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। লোচন নিজ গুরুর যথাযোগ্য স্থান দিবার জন্য এই গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং সর্বত্র দেখাইয়াছেন যে, নরহরি নবদ্বীপ লীলায় গৌরাঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজ সুপরিচিত এবং স্বরূপ-দামোদর পরিকল্পিত 'পঞ্চতত্ত্ব'কেও (গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর) কবি লোচনদাস ঈষৎ বদলাইয়া শ্রীবাসের স্থলে নরহরির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। স্বরূপ-দামোদরের এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কবিকর্ণপূর 'গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা'য় কিন্তু নরহরির নাম করেন নাই, শ্রীবাসের কথাই বলিয়াছেন। আমাদের কবি নিজ গুরুর মহিমা বর্ণনার জন্য প্রচলিত মতবাদকেও ইচ্ছামতো বদলাইয়া লইয়াছেন।

চৈতন্যকে নাগরভাবের বাতায়ন হইতে দর্শন করিয়া লোচনদাস এই কাব্যে মহাপ্রভুকে এমন একটা অদ্ভুত স্থানে স্থাপন করিয়াছেন যে, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবগণের ক্ষুব্ধ হইবারই কথা। কবির গুরু নরহরি সরকার এই মতের প্রধান প্রচারক—গৌরনাগরভাবের অনেক পদ গুরুশিষ্য—উভয়েই রচনা করিয়াছিলেন।

---

[৯১] ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, "কিন্তু এ ছত্র কোন গায়েনের অথবা সংস্কর্তার প্রক্ষেপ বলিয়া মনে হয়" (বা সা. ইতি. প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৩৪৯)। কিন্তু কেন তাঁহার এরূপ সন্দেহ সে বিষয়ে তিনি কোন কারণ দেখান নাই। সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরু'তে (৫ম, পৃ. ২০৭) বলিয়াছেন যে, কোগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম কাঁকড়াগ্রামনিবাসী চৈতন্যমঙ্গল-গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর গৃহে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের একখানি প্রাচীন পুঁথি আছে। তাহাতেও উক্ত দুই ছত্র রহিয়াছে। মৃণালকান্তি ঘোষ 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র (২য় সং) ভূমিকাতেও (পৃ. ২৪১) এই দুই ছত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

চৈতন্যকে দেখিয়া নবদ্বীপের যুবতীসমাজ মদনরঙ্গে আলুথালু বেশ হইয়াছে, কেহ কেহ তাঁহার গাত্রেই ঢলিয়া পড়িতেছে, এবং চৈতন্য নির্বিকারভাবে তাহা সহ্য করিতেছেন, এইরূপ নাগর-নাগরীভাবের বর্ণনা অতি অশ্রদ্ধেয়। ভক্তির গঙ্গোদকে যৌনরঙ্গের আবিলতাকে কোন প্রকারেই পরিশুদ্ধ করা যায় না—লোচনদাসের ভক্তি বিচারে অনেক ভক্ত পাঠক এই কথাটা ভুলিয়া যান। অন্ধ ভক্তি মানুষকে কী পরিমাণে অন্ধ করিয়া ফেলে এই প্রসঙ্গে তাহার নজিব মিলিবে। চৈতন্য-সংক্রান্ত নাগবভাবের আদিবসাত্মক অশুচি গালগল্প ও পদকে কোন কোন পণ্ডিত কিন্তু সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন। আমরা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসাহিত্যবসজ্ঞ পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখ করিতেছি :

> বলা বাহুল্য যে, যে শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপগুণ ও নৃত্য-কীর্তনের প্রভাবে নদীয়ার পাষাণহৃদয় পুরুষদিগের চিত্তও বিগলিত না হইয়া পারে নাই, কোমল হৃদয়া প্রেমবতী যুবতীদিগের চিত্ত যে ইহার দ্বারা একান্ত মোহিত ও প্রেমাধীন হইয়া পড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সত্য বটে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার কোনও আচরণ দ্বারা নদীয়া-নাগরীদিগের সেই প্রেমের প্রতিদান করেন নাই,[৭২] কিন্তু তা বলিয়া তাঁহাদিগের সেই স্বার্থগন্ধহীন অপূর্ব প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।"
> (পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ২০৮)

'গৌরনাগরভাব' সম্বন্ধে আমরা এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত "গৌরনাগর ও গৌরপারম্যবাদ" নামক অনুচ্ছেদে আমাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, গৌরনাগরভাবই নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবধর্মের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। চৈতন্য ভক্তগণ যখন নিজেদের নাগরীভাবে কল্পনা করিয়া কাম ও প্রেমকে মিশাইতে গিয়া ভক্তিধর্মের সাত্ত্বিকতা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, তখনও তাহা ততটা মারাত্মক হয় নাই; কিন্তু লোচনের মতো যখন তাঁহারা নদীয়ার বিবাহিতা রমণীদিগকেও চৈতন্যপ্রেমে পাগলিনী করিয়া আঁকিলেন, তখন হইতেই মহাপ্রভু ও বৃন্দাবনের গোস্বামী-প্রভুদের বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও আচারনিষ্ঠা বৈষ্ণব সহজিয়াদের কবলগ্রস্ত হইল, মননশীল দার্শনিকতা ক্রমেই আবেগপ্রবণ ধর্মকৃত্য ও রহস্যাচারী 'কাল্ট্'-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমাজের সুড়ঙ্গের গভীরে চলিয়া গেল। নরহরি ও লোচন

---

[৭২] একথা ঠিক নহে। লোচনের বর্ণনায় দেখা যায় চৈতন্যও "নয়ন-সন্ধান শরাঘাত" করিয়াছিলেন। যুবতীরা তাঁহার গাত্রে ঢলিয়া পড়িলে তিনি যে তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন, এমন কোন কথা লোচন বলেন নাই।

এই ব্যাপারের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। কারণ হালকাচালে লেখা তাঁহাদের ধামালিপদ এবং লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত চৈতন্য-সম্পর্কে নদীয়া-যুবতীগণের রসোদ্‌গার জনসাধারণের ভক্তি ও আবেগকে ফেনিল ও উগ্র করিয়া তুলিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে একথা কখনই অস্বীকার করা যায় না।

চৈতন্যদেবের জীবনের আর একটি পর্যায় লোচনের কাব্যে অভিনব আকারে বর্ণিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে এ কাব্যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে যাহার অণুমাত্রও উল্লেখ নাই। বৃন্দাবনদাস বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ আর একটু বর্ণনা করিলে ভাল করিতেন, বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি তাঁহার অমূল্য কাব্যের একটা বিশেষ ত্রুটি বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। লোচন সে ত্রুটি সামলাইয়া লইয়াছেন—একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সামাল দিয়াছেন। এ কথা ঠিক যে, চৈতন্য-জীবনীকাব্যে তাঁহার দাম্পত্যজীবনেরও কিছু প্রসঙ্গ থাকা কর্তব্য। "লোচনদাস তাঁহার সহৃদয়তাজনিত চরিত্রানুমান শক্তির বলে চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে সেই গুরুতর ত্রুটি পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"[৯৩] 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের এ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। আধুনিক কালেও মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ এই আদর্শ অনুসারে তাঁহার 'অমিয় নিমাই চরিতে' সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বরাত্রে চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। এখন দেখা যাক এই অংশটিতে লোচন কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর সিদ্ধকাম হইয়াছেন।

মধ্য খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে, সন্ন্যাস গ্রহণের দুই একদিন পূর্বে এক রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া এই সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

কহ কহ প্রাণনাথ মোর শিরে দিয়ে হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা বিদরিতে চাহে হিয়া
আগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥
... ...
আমা হেন ভাগ্যবতী নাহি কোন যুবতী
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ।

[৯৩] পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ২০৮

বড় প্রতি আশা ছিল নিজ দেহ সমর্পিল
এ নব যৌবন দিবা হাত ॥

গৌরাঙ্গদেব পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন :

আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিয়া
একথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যবে তোমারে কহিব তবে
এখনে না মর মিছা শোকে ॥

এবং তাহার পর :

ইহা বলি গৌরহরি আশ্লেষ চুম্বন করি
নানা রস কৌতুকে বিথারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা লীলা লাবণ্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে ॥
বিনোদবিলাস রসে ভৈ গেল রজনী শেষে
পুন কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিয়ায় আগুনি আছে তে কারণে পুন পুছে
প্রিয় প্রাণনাথ মুখ চাইয়া ॥

সন্ন্যাসগ্রহণের মাত্র একদিন পূর্বে স্ত্রীকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য এই দাম্পত্য-লীলা চৈতন্যদেবের চরিত্রের ঘোর বিরোধী। কিন্তু ইহার পরে সন্ন্যাসগ্রহণের ঠিক পূর্ব রাত্রে চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার যে আসঙ্গরসের উন্মুক্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতেই লোচনদাসের রসবোধ, রুচি ও মানসিক আদর্শ ধরা পড়িয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণের কিছু পূর্বে চৈতন্যদেব এমনভাবে হাস্যপরিহাস ও অঙ্গরাগ করিতে লাগিলেন যে, "সবলোক জানিলেক—নহিব সন্ন্যাস।" সন্ন্যাসগ্রহণে পাছে ভক্ত-অনুচরগণ বাধা দেন, সেইজন্যই গৌরাঙ্গের এই ছলনা। রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া শয়নকক্ষে আসিলে "হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু—আইস আইস বোলে," এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে "পরম পীরিতি করি বসাইলা কোলে।" চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গরাগ করিয়া দিলেন, নানা অলঙ্কারে সাজাইলেন, তারপর স্ত্রীর অপূর্ব রূপ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন—ইহা কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বরাত্রির ব্যাপার :

ত্রৈলোক্য অদ্ভুত রূপ নিরীখে বদন।
অধর বান্ধুলী সাধে করয়ে চুম্বন ॥

ক্ষণে ভুজলতা বেঢ়ি আলিঙ্গন করে।
নবকমলিনী যেন করিবর কোরে॥
নানা রস বিথারয়ে বিনোদ নাগর।
আছুক আনের কাজ কাম অগোচর॥
সুমেরুর কোলে যেন বিজুরী প্রকাশ।
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস॥
হৃদয় উপরে থোয় না ছোঁয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে এক মজ্জা॥
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥

যখন চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য ব্যাকুল, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, মনে মনেও অতিশয় চিন্তান্বিত, সেই সময় তাঁহার এই 'নানা রস বিথার' শুধু অবিশ্বাস্য নহে, অস্বাভাবিকও বটে। লোচনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর 'বৈষ্ণব-অপরাধ'[৯৪] আর কী হইতে পারে?

এই বর্ণনা করিতে গিয়া লোচনের নিজেরও যে খটকা লাগে নাই তাহা নহে। এরূপ আদিরসাত্মক অসম্ভব কাহিনীর সপক্ষে সাফাই গাহিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন যে, বৈরাগ্যের পূর্বেও যে মহাপ্রভু স্ত্রীসঙ্গ করিলেন, ইহার একমাত্র কারণ—বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিতুষ্টি :

বৈরাগ্য সময়ে প্রেমা উভারে অধিক।
সন্ন্যাস করিব বলি উনমত চিত॥
এ সময়ে বিথারয়ে রঙ্গরস ভাব।
ইহার কারণ কিছু শুন লাভালাভ॥
যে জন যেমন ভজে—তারে তেন প্রভু।
ভজনে অধিক ন্যূন না করয়ে কভু॥

ইহার পরে কবি 'অধিকারীভেদ', 'অমায়া' 'সমমায়া ভক্তি', 'সবেদ', 'নির্বেদ' প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক তত্ত্বকথার আমদানি করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন :

---

৯৪ "বৈষ্ণবাপরাধ। কোনও বৈষ্ণবকে প্রহার করা, বৈষ্ণবের নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অনাদরবশতঃ বৈষ্ণবের অভিনন্দনাদি না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা, এবং বৈষ্ণবদর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করা—এই চারিটিকে বৈষ্ণবাপরাধ বলে।" (রাধাগোবিন্দ নাথ প্রণীত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা', পৃঃ ১৮৮)

এই সে কারণে বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ।
ইহা জানি মনে কেহো না কর প্রমাদ ॥

কিন্তু কবির অক্ষম যুক্তি মূল বর্ণনার রসভঙ্গ করিয়াছে এবং চৈতন্যচরিত্রকে মলিন করিয়া দিয়াছে—ইহা অস্বীকার করা যায় না। লোচনের ঔচিত্য-বোধেরই কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ছিল। আর একটা স্থূল বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতেছে—বালক নিমাইয়ের সরস দৌরাত্ম্যের কাহিনী।

একদা অদ্বৈতবাদী মুরারি গুপ্ত আপনমনে কোন তত্ত্বকথা আলোচনা করিতে করিতে পথ দিয়া যাইতেছিলেন। পথে বালক নিমাই এবং তাঁহার সঙ্গীরা মুরারিকে লইয়া পরিহাস করিলে গুপ্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন :

এ চ্ছারে কে বলে ভাল দেখিল ত ছাওয়াল
মিশ্র পুরন্দর সুত এই।
সর্বত্র শুনিয়ে কথা ইহার সে গুণগাথা
ভালে নাম ইহার নিমাই ॥

এই কথায় নিমাইও ভ্রূকুটি করিয়া জানাইলেন, "জানাইব ভোজনের ক্ষণে।" তারপর দ্বিপ্রহরে যখন মুরারি গুপ্ত ভোজনে বসিয়াছেন তখন নিমাই :

মধ্য ভোজনবেলা ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা
থাল ভরি মুত মুতিল ॥
কি-কি বলি ছি-ছি করি উঠিল সে মুরারি
করতালি দিয়া বলে·গোরা।
ভক্তিপথ ছাড়িয়া কর শির নাড়িয়া
যোগবল এই অভিপারা ॥

মুরারি গুপ্ত ভক্তিপথ ছাড়িয়া অদ্বৈত পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য বালক নিমাই তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজন মাটি করিয়া দিলেন। ইহাতেই মুরারির 'আক্কেল' হইল, তিনি ভক্তিপথ গ্রহণ করিলেন। এই সমস্ত বর্ণনা যে কতদূর ঘৃণ্য তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। লোচন সাধারণ মানুষের মোটা বুদ্ধির দিকে চাহিয়া এই মোটা হাতের কাব্য লিখিয়াছিলেন। কিন্তু রুচি ও তত্ত্ববোধ তাঁহার যেরূপই হোক না কেন, তিনি যে কিছু কিছু কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 'ধামালি' জাতীয় পদগুলির রুচি মাঝে মাঝে নিন্দনীয় হইলেও ভাষা, ছন্দ ও চিত্রকল্প বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা সুরে তালে

গীত হইয়া একদা সাধারণ ভক্তের অন্তর আকর্ষণ করিয়াছিল। গৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি মিশ্রিত অপূর্ব রূপবর্ননার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল-গো
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িছে গো
এক ভৈল শুধুই সুনেহা ॥
পুরুষ প্রকৃতিভাবে কান্দিয়া বিকল গো
নারী বা কেমনে মন বান্ধে ॥
... ...
না চাহে আঁখির কোণে সদাই সবার মনে
দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়।
আঁখির পিয়াস দেখি মুখের লালস গো
আলসল জরজর গায় ॥
কুলবতী কুল ছাড়ে পঙ্গু ধায় উভরড়ে
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ভূমিতে লোটায়া কান্দে কেহ থির নাহি বান্ধে
গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড ॥

সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদে শচীমাতার বিলাপ এই গানে চমৎকার ফুটিয়াছে :

এমন কেনে হলে গৌরাঙ্গ এমন কেনে হলে।
নটবর বেশ গোরা কি লাগি ছাড়িলে ॥
সুরধুনী তীরে নিমাই তিলেক দাঁড়াও।
চাঁদমুখ নিরখিয়ে তবে ছাড়ি যাও ॥
এক বোল বলি নিমাই যদি তুমি রাখ।
সন্ন্যাসেরে কাজ নাই ঘরে বসে থাক ॥
সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও ॥

অথবা বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ প্রার্থনা :

কি কহিব মুই ছার মুই তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর ডরে।
তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাঙ বিষ খাইয়া
সুখে নিবসহ নিজ ঘরে ॥

না যাইহ দেশান্তরে কেহো নাহি এ সংসারে
বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া।
কহিতে না পারে কথা অন্তরে মরম ব্যথা
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া ॥

এই সমস্ত বর্ণনায় ঘরোয়া চিত্র ও সবল সহজ মনের আবেগ জীবন্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

খুঁটিনাটি বিচারে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে ইতিহাস ও ঘটনাগত কিছু কিছু বৈষম্য আছে। এই প্রসঙ্গে দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। একটি—চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লোচনের ধারণা, আর একটি—চৈতন্যদেবের তিরোধান। চৈতন্যাবতারের প্রধান উদ্দেশ্য কি, তাহা লইয়া বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে দুইটি মত প্রচারিত ছিল। একটি হইতেছে ধর্ম সংস্থাপন, দুষ্টের দমন ইত্যাদি। আর একটি—স্বরূপ-দামোদর ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণের যুগল তনু ও অবতাররূপী চৈতন্যদেবের কথা। কবি এই দুই বৈশিষ্ট্যই উল্লেখ করিয়াছেন :

আপনে আপন রস করে আস্বাদন।
মুখ্য এই হেতু—কথা শুন সর্বজন ॥
জীব-উদ্ধারণ—হেতু গৌণ করি মানি।
এই হেতু বলি অবতার শিরোমণি ॥

এখানে চৈতন্য-অবতারের হেতু প্রসঙ্গে জীব-উদ্ধারকে গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়া নিজ রস আস্বাদনকেই প্রধান উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে। সূত্রখণ্ডে এই কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে :

পাপময় কলিযুগে না দেখি নিস্তার লোকে
দয়া উপজিল প্রভুচিতে।
পালিব ভকতজন আর ধর্ম সংস্থাপন
জনম লভিব পৃথিবীতে ॥

কৃষ্ণের চৈতন্যাবতার গ্রহণের এই একটি উদ্দেশ্য; তেমনি আর একটি উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও লোচনদাস অতিশয় সতর্ক :

রাধাভাব অন্তরে রাধা বর্ণ বাহিরে
অন্তর্বাহ্য রাধাময় হব।
সঙ্গে সখাসখীবৃন্দ আর ভক্ত অনন্ত
ব্রজভাবে অখিল মাতাব ॥

চৈতন্যের'অন্তর্বাহ্য রাধাময়' ভাব, লোচনের মতে, কলিযুগ-অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য এই জাতীয় তত্ত্বকথা স্বরূপ-দামোদর সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন এবং নীলাচলে প্রচারিত এই তত্ত্বকথা বাঙলাদেশের বৈষ্ণব গোষ্ঠীতেও সুপ্রচারিত হইয়াছিল।

আর একটা বৈশিষ্ট্য—চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে লোচনের নূতন কথা। এ বিষয়ে কবি বলিতেছেন :

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে ॥
সত্যত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্তন সার ॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আই এই দেহত শরণ ॥
এই বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হিয়ায় ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥

এখানে দেখা যাইতেছে আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভু জগন্নাথ কলেবরে লীন হইয়াছিলেন। চৈতন্যের কোন প্রাচীন জীবনীতে তাহার তিরোধান সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। কেবল লোচনদাস ও জয়ানন্দ মহাপ্রভুর লীলাসংবরণের কথা বলিয়াছেন। ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশে' আছে যে, একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিলে দরজা বন্ধ হইয়া গেল; কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলিলে সকলে দেখিল মহাপ্রভু লীলা সংবরণ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর ওড়িয়া ভক্ত অচ্যুতানন্দ 'শূন্যসংহিতা' নামক ওড়িয়া ভাষায় যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহাতেও এই রূপ ইঙ্গিত আছে :

চৈতন্যঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি বলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎপ্রায় মিশি গলে ॥*

সপ্তদশ শতাব্দীর আর এক ওড়িয়া লেখক দিবাকর দাসও এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, "এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন"। লোচনদাস

* ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' হইতে উদ্ধৃত।

বোধহয় লোকশ্রুতি অনুসারে চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিষয়ে জয়ানন্দের বর্ণনার সঙ্গে লোচনদাসের বর্ণনার অনেকটা সাদৃশ্য আছে, বার তিথিও মিলিয়া যায়। লোচন যে শুধু নাগরভাবের কবি ছিলেন তাহা নহে, 'দুর্লভসার', 'আনন্দলতিকা', 'বস্তু-তত্ত্বসার' প্রভৃতি পুস্তিকায় সহজিয়া ধবণের রাগানুগা পদ্ধতির. আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'দুর্লভসারে' রাগমার্গ সাধনার বিস্তৃত পরিচয় আছে। এ গুলির সাহিত্যিক মূল্য যেরূপ হোক না কেন, কবি লোচনদাসের অবলম্বিত ভাবধারা সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে এই পুস্তিকাগুলির সাহায্য প্রযোজন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ॥

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা প্রকাশিত হয় ১৩০৪-৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। তাহার পূর্বে বৈষ্ণব সমাজ বা প্রাচীন সাহিত্যামোদীদের মধ্যে এই কবি বা গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন তথ্যই জানা ছিল না। নগেন্দ্রনাথ বসু সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের পবিচয দেন এবং তাঁহার ও কালিদাস নাথের সম্পাদনায় এই গ্রন্থ ১৩১২ সনে সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয। তাঁহার পর কবি ও কবির বর্ণিত বিষয় লইয়া বহু আলোচনা, বিশ্লেষণ ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিযাছে। গ্রন্থটি লোচন অপেক্ষা বড একটা নিকৃষ্ট নহে। ইহাতে ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে অনেক নূতন কথাও আছে। এই সমস্ত কারণে প্রকাশের পর হইতে এই গ্রন্থেব প্রতি পাঠক, ঐতিহাসিক, গবেষক, ভক্ত—সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইযাছে।

জয়ানন্দের পরিচয় ॥ যদিও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে জয়ানন্দের কোন সংবাদ বা পবিচয় পাওয়া যায নাই, তবু কবি নিজ গ্রন্থ মধ্যে সংক্ষেপে আপনার যে পরিচয দিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায। এই কাব্যেব সন্ন্যাসখণ্ডে কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন :

বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র তপস্যার ফলে।
জয়ানন্দের মন হইল চৈতন্যমঙ্গলে ॥
শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
জয়ানন্দের জন্ম হইল সে দিবসে ॥

গুহিআ নাম ছিল মায়ের মডাছিআ বাদে।
জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে ।।
মা রোদনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী।
জার গর্ভে জন্মিঞা চৈতন্যানন্দে ভাসি ।।
খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্পভক্তি।
মহাপাষণ্ড তবো ধরে মহাশক্তি ।।
বাণীনাথ মিশ্র ষট্‌রাত্রি উপবাসে।
দুর্বাসা ভারতি ব্যাস জগত প্রকাশে।
জার পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব সুলক্ষণ ।।
তার ভাই ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতি।
অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে ।।
জেঠা বৈষ্ণব মিশ্র সর্বতীর্থ পূত।
ছোট খুড়া রামানন্দ মিশ্র ভাগবত ।।
বন্দিঘাটী বংশে রঘুনাথ উপাসক।
তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্যভাবক ।।

জয়ানন্দের মতে চৈতন্যদেব পুরী হইতে গৌড়ের পথে আসিবার সময় বর্ধমানে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গেও (বিজয় খণ্ড) জয়ানন্দ কিছু আত্মপরিচয় ও কুলপরিচয় দিয়াছেন :

বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে,
আমাইপুরা তার নাম।
তাহে যে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্বশিষ্য
তার ঘরে করিলা বিশ্রাম ॥
তাহার নন্দন গুআ জয়ানন্দ নাম থুঞা
রোদনী রাখিল তার লঞা।

এই দুইটি প্রসঙ্গ হইতে জয়ানন্দের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। জয়ানন্দ বর্ধমানের নিকট আমাইপুরা গ্রামে[৯৬] বন্দ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতা রোদনী। পিতা চৈতন্যভক্ত হইলেও কবির খুড়া জেঠারা

[৯৬] এখন এ গ্রাম নাই।—ডঃ সুকুমার সেনের মতে বর্ধমানের সাতগেছে থানার অন্তর্গত বাড়োয়া গ্রামের কাছে আমাইপুরা গ্রাম ছিল। (ডঃ সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ ৩৬২ (পা. টী)

চৈতন্যের প্রতি ততটা ভক্তিমান ছিলেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে সুবুদ্ধি মিশ্র নামক একজন চৈতন্য'গণে'র উল্লেখ আছে। ইনি চৈতন্যের টোলে পড়িতেন। জয়ানন্দের পিতা ও এই সুবুদ্ধি মিশ্র একই ব্যক্তি হইতে পারেন। জয়ানন্দের উক্তি অনুসারে চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে বাঙলায় ফিরিবার পথে বর্ধমানের আমাইপুরা গ্রামে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন জয়ানন্দ শিশু মাত্র, বয়স বোধ হয় অনধিক এক বৎসর। কারণ তাঁহার মতো রোদনী শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া চৈতন্যের জন্য রন্ধন করিয়াছিলেন। শৈশবে জয়ানন্দের নাম ছিল গুইয়া। চৈতন্যদেব কুৎসিত নাম বদলাইয়া জয়ানন্দ নাম দেন, কবি সেই নামেই পরিচিত হইয়াছেন। এখন কেহ কেহ জয়ানন্দের এই উক্তির যাথার্থ্যে বিশেষ সন্দিহান। কারণ চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে বাঙলায় ফিরিবার পথে পানিহাটি পর্যন্ত নৌকাযোগে আসিয়াছিলেন এবং কুমারহট্ট হইতে গৌড়ে, তারপর গৌড় হইতে পানিহাটি বরাহনগর পর্যন্ত স্থলপথে গিয়াছিলেন। খুব সম্ভব গৌড় হইতে নীলাচল প্রত্যাবর্তনের সময় মহাপ্রভু সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিযাছিলেন। জয়ানন্দ শৈশবের ঘটনা বলিতে গিয়া একটু আধটু গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। জয়ানন্দের পিতা গদাধরের শিষ্য ছিলেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কবি জয়ানন্দও গদাধরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কারণ তিনি নানাস্থানে গদাধরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন :

> চিন্তিযা চৈতন্য গদাধরের পদদ্বন্দ্ব।
> আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ॥

যদুনাথ দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃতে' জয়ানন্দ গদাধরের শিষ্য, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।[৬৭] কিন্তু কবি কোন কোন স্থলে নিত্যানন্দের পরিকর অভিরাম গোস্বামীকেও গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। কাজেই কেহ কেহ অভিরাম গোস্বামীকে কবির গুরু বলিয়া থাকেন। আদিখণ্ডে জয়ানন্দ বলিয়াছেন :

> শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদমালা পাঞা।
> শ্রীঅভিরাম গোসাঞির কেবল বল পাঞা॥
> গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
> শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গীত কিছু যে প্রচারি॥

৬৭ মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' (পৃ ২১৪-২৫) দ্রষ্টব্য।

বৈরাগ্যখণ্ডে :

> শ্রীঅভিরাম গোসাঞির পাদোদক প্রসাদে।
> পণ্ডিত গোসাঞির চৈতন্য আশীর্বাদে॥
> বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র তপস্যার ফলে।
> জয়ানন্দের মন হৈল চৈতন্যমঙ্গলে॥

বৈরাগ্য খণ্ডের 'পণ্ডিত গোসাঞি' হইতেছেন গদাধর। এই উল্লেখ হইতে কবির যথার্থ দীক্ষাগুরু কে, অভিরাম গোস্বামী, না গদাধর—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুষ্কর।

এখন দেখা যাক এই কাব্য কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, অথবা কোন্ সময়ে রচিত হওয়া সম্ভব। চৈতন্যদেব গৌড়ে ফিরিয়া যখন সুবুদ্ধি মিশ্রের বাটীতে বিশ্রাম লইয়াছিলেন, তখন কবির মাতা শিশুপুত্র 'গুইয়া'-কে কোলে লইয়া চৈতন্যের জন্য রন্ধন করিয়াছিলেন। তখন কবির বয়স বৎসর খানেক হইতে পারে। চৈতন্যদেব আনুমানিক ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। এই সময় জয়ানন্দের বয়স এক বৎসর হইলে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার সময় (আঃ ১৫৪৮) জয়ানন্দের বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল বৃন্দাবনের গ্রন্থের দশ এগার বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়া থাকিবেন। নিজ গ্রন্থ মধ্যে তিনি বীরভদ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। চৈতন্যের তিরোধানের এক বৎসরের মধ্যে বীরভদ্রের জন্ম হয়। তাহা হইলে কবি যখন গ্রন্থ লিখিতেছেন, তখন বীরভদ্র পঁচিশ বৎসরের যুবক; বীরভদ্র তরুণ বয়সেই নিত্যানন্দগোষ্ঠীর নেতা হইয়াছিলেন। কবি তরুণ নেতা বীরভদ্রকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও বলিয়াছেন, "অদ্বৈত আচার্যের অপ্রকট হইবার পর অর্থাৎ ১৪৮০ শকের পরে এবং ১৪৯২ শকের পূর্বে কবি জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রচার করিয়াছিলেন।" এই হিসাবও অযৌক্তিক নহে।

কাব্যপরিচয়॥ এই কাব্যটি বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত ছিল না, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। নগেন্দ্রনাথ বসু সর্বপ্রথম কয়েকখানি পুঁথি দেখিয়া ইহার সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে দুই খানি পুঁথি সংগ্রহ

করিয়াছিলেন। আর একখানি পুঁথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে ছিল। ইহা ছাড়াও ধ্রুবচরিত্র (বৈরাগ্য খণ্ড), ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার চরিত্র (তীর্থ খণ্ড) প্রভৃতি পৃথক পৌরাণিক পালার পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ এই সমস্ত পুঁথি অবলম্বনে সাহিত্য পরিষদ হইতে চৈতন্যমঙ্গল সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। কাজেই গোবিন্দদাসের কড়চার মতো জয়ানন্দের পুঁথির একেবারে সন্ধান মিলে নাই তাহা নহে; তবে সংখ্যা স্বল্পতম। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবসমাজে এ গ্রন্থ নানাকারণে জনপ্রিয় হয় নাই বলিয়া ইহার পুঁথির সংখ্যা অল্প। গ্রন্থটিতে নয়টি খণ্ড আছে, কবি নিজেই তাহার পরিচয় দিয়াছেন :

> প্রথমে ত আদি খণ্ড যুগধর্মকর্ম।
> দ্বিতীয়ে নদীয়া খণ্ড গৌরাঙ্গের জন্ম ॥
> তৃতীয়ে বৈরাগ্য খণ্ড ছাড়ি গৃহবাস।
> চতুর্থে সন্ন্যাস খণ্ড প্রভুর সন্ন্যাস ॥
> পঞ্চমে উৎকল খণ্ড গেলা নীলাচল।
> ষষ্ঠে প্রকাশ খণ্ড প্রকাশ উজ্জ্বল ॥
> সপ্তমে ত তীর্থখণ্ডে নানা তীর্থ করি।
> অষ্টমে বিজয় খণ্ডে গেলা বৈকুণ্ঠপুরী ॥
> নবমে উত্তর খণ্ডে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ।
> যুগাবতার যত করিলা গৌরাঙ্গ ॥
> এই নবখণ্ডগীতে চৈতন্যমঙ্গল।
> শুনিলে সকল পাপ যাএ রসাতল ॥

এই কাব্যও জনসাধারণের জন্য রচিত হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ গীত হইত। কবি সেই জন্য নানা রাগরাগিণীর উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে তিনি শিব, গণেশ, জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম, রাধাঠাকুরাণী, ব্রহ্মা, হর, মৎস্য, কূর্ম, নৃসিংহ, বামন, আদ্যাশক্তি, নারদ, বাল্মীকি, ব্যাস, পুলস্ত্য, গৌতম প্রভৃতি দেবদেবী, অবতার, পণ্ডিত ও কবিদের বন্দনা করিয়া অবতার প্রসঙ্গে অগ্রসর হইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের মতোই সর্বাগ্রে হর ও গণেশের বন্দনা, বিভিন্ন দেবদেবীর উল্লেখ, এমন কি আদ্যাশক্তিরও (যাহা কোন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ভক্ত কখনও করিতেন না) সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও কবির পিতা ও কবি পরম বৈষ্ণব ও চৈতন্যভক্ত ছিলেন, কিন্তু বোধহয় দেশাচারের অনুরোধে

শাক্তদেবী আদ্যাশক্তিরও বন্দনা করিয়াছেন। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে নারদ প্রথমে জানাইলেন যে, কলিযুগে অধর্মের ভার বাড়িয়াছে, চারিদিকেই অনাচার:

বৃক্ষ লতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।
মৎস্য-মাংসে প্রিয় হৈল বিধবা যুবতী॥
রাজা নাহি পালে প্রজা ম্লেচ্ছের আচার।
দুই তিন চারি বর্ণে হইল একাকার॥
দেবতা ব্রাহ্মণ হিংসা করে ম্লেচ্ছ জাতি।
ক্ষেত্রী যুদ্ধে শক্তিহীন নাহি যতি সতী॥
গো পোষণ বলি যজ্ঞ ছাড়িল বিশ্বদেবা।
শূদ্র সব ছাড়িলেক ব্রাহ্মণের সেবা॥
কপটী লোলুপ দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজন।
সর্বলোক হৈল শিশ্নোদরপরায়ণ॥

বলা বাহুল্য এখানে সমসাময়িক বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এহেন কলিকল্মষ হরণ করিবার জন্য:

গোলোকের ভগবান সর্বলোক পরিত্রাণ,
দ্বিজকুলে জন্মিব কলিযুগে।
ধরিব সন্ন্যাসী বেশ বিষ্ণুভক্তি পরবেশ
অকিঞ্চন নব অনুরাগে।

এই স্থানে আদিখণ্ডের সমাপ্তি। নদীয়াখণ্ডে চৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্টের বর্ণনা, নীলাম্বর চক্রবর্তী ও জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপে বাস্তুনির্মাণ এবং নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমান সুলতানের কিছু অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে:

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ-ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
... ...
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
বিষম পিরল্যাগ্রাম নবদ্বীপের কাছে।
ব্রাহ্মণে যবনে-বাদ যুগে যুগে আছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিলা মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥

গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকহ প্রমাদ হব পাছে ॥

এই গুজব রটিবার ফলে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ সমাজের উপর অত্যাচার হইতে থাকে। সুলতানের অত্যাচারের ভয়ে বাসুদেব সার্বভৌম উৎকলে পলায়ন করিলেন—আরও অনেকে নিরাপদ স্থানে পলাইয়া গেলেন। শেষে "কালী খড়্গখর্পর ধারিণী দিগম্বরী" স্বপ্নে সুলতানকে ভয় দেখাইলেন :

আজি তোর গলায় পেলিমু গৌড়পাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট ॥

যবনরাজা ভীত হইয়া "নাকে খত দিলা রাজা তবে কালী ছাড়ে।" নবদ্বীপ আবার বিপদ মুক্ত হইল। এই রাজা যে মুসলমান সুলতান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চৈতন্যের জন্মের অব্যবহিত পরে গৌড়ে দুরাচার হাবসী শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩) শুরু হইয়াছিল। এখানে জয়ানন্দ এইরূপ কোন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার উল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্ণনায় দেখা যাইতেছে, দেবী কালিকার স্বপ্নাদেশের ফলেই সুলতানের চেতনা হইয়াছিল। এখানেও কবি শাক্তদেবীর প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেনে। কবি বৈষ্ণব হইলেও জনসাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য কালিকার স্বপ্নাদেশের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই নদীয়াখণ্ডে চৈতন্যের জন্ম হইতে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর বৈরাগ্য খণ্ড। বৈরাগ্য খণ্ডের গোড়াতে গৌরাঙ্গদেব ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় জয়ানন্দের চৈতন্যতত্ত্ব সম্পর্কিত ভাবাদর্শ। চৈতন্যের উক্তি :

আরে রে সংসারে লোক দেখ মোর নাট।
ক্রয়বিক্রয় কর মোর প্রেম হাট ॥
কার মাতা কার পিতা স্বামী পুত্র সখা।
স্বপ্ন হেন সংসার কার সনে কার দেখা ॥
বাজিকর নাচাএ যেন কাষ্ঠের পুত্তলী।
তেমত সংসার নাচাএ কৃষ্ণ করে কেলি ॥
মিথ্যা ধন মিথ্যা জন মিথ্যা পরিবার।
যথাএ সম্পদ তথা বিপদ অপার ॥
কত জন্ম মরণ নিশ্চয় নাহি জানি।
রমণী জননী হয় জননী রমণী ॥

কমলপত্রের জল জেন স্থির নয়ে।
তেমত চঞ্চল জীব একত্র না রয়ে ॥
সম্পদ বিপদ যত সর্বকর্মফল।
আন গাছে নাহি লাগে আনের বাকল ॥
...   .
স্ত্রী কাল পুত্র কাল ধনজন কাল।
ইষ্টমিত্র কুটুম্ব-সকল মায়াজাল ॥
মায়াতে মোহিত জীব সতত সন্তাপ।
এক গুণ পুণ্য হয় সহস্র গুণ পাপ ॥
শিশু সব ক্রীড়া করে সতত ধূলায়।
খেলাদোলা ভাঙ্গিঞা মন্দিরে চলি যায় ॥
পুনরপি সেই শিশু ধূলা ক্রীড়া করে।
ধূলার মন্দির ভাঙ্গি চলিলা মন্দিরে ॥
এই মত কত কত জনম মরণ।
অসার্থক যাতায়াত জীবের সাধন ॥
সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণ যারে কৃপা করে।
সে জন কৃষ্ণে রহিয়ে কর্ম দেহ ধরে ॥

বলাবাহুল্য এই তত্ত্বাদর্শ ও মতবাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বা বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদর্শনের দুস্তর ব্যবধান। এই গ্রন্থ যে বৈষ্ণবসমাজে প্রচারিত হয় নাই, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ। বৈরাগ্যখণ্ডের মূল ঘটনা চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের প্রয়াস; কিন্তু কথা প্রসঙ্গে ধ্রুবের আখ্যানের বিস্তৃত বর্ণনা অনেকটা অংশ অধিকার করিয়াছে। এই অংশেই বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা বর্ণনাও কাব্যটিকে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়া পুরাণকাহিনী হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলেন যে, সস্ত্রীক ধর্মাচরণই শাস্ত্রের বিধি :

বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী   নূতন গামছাখানি
গৌরচন্দ্রে দিল ভক্তি করিঞা।
দণ্ডবৎ হঞা ভূমে   রহিলা প্রভুর বামে
নিবেদিল পদাম্বুজে ধরিঞা ॥
জথা তথা চল তুমি   সঙ্গে যাইব আমি
আমা না ছাড়িবে দ্বিজরাজ।

করিব তোমার সেবা সেহ যে আমার শোভা
গৃহপরিজনে পড়ু বাজ ॥

লোচনদাস যেখানে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বরাত্রে চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ায় বিলাস বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে জয়ানন্দ দেখাইয়াছেন :

বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী জত কৈলা নিবেদন।
দৃক্‌পাত না করে প্রভু না করে শ্রবণ ॥
শ্রবণযুগলে প্রভু দিঞা দুই হাথ।
জয়ানন্দ বলে প্রভু হা নাথ হা নাথ ॥

কবিত্বশক্তিতে জয়ানন্দ কিছু ন্যূন হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান যে লোচনদাস অপেক্ষা কিছু বেশি ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

'সন্ন্যাসখণ্ডে' কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের বর্ণনা ও কাটোয়া হইতে শান্তিপুর যাত্রার কথা এবং 'উৎকলখণ্ডে' নীলাচলে মহাপ্রভুর উপস্থিতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। 'প্রকাশখণ্ডে' ও 'তীর্থখণ্ডে' জগন্নাথের সঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার কন্যা সত্যবতীর বিবাহের আখ্যানের বিস্তৃত পরিচয় আছে। 'বিজয়খণ্ডে' বিষ্ণুদূত ও যমদূতের আখ্যানে জালীন্দ্র ও তাহার পতিব্রতা পত্নী তুলসী এবং বিষ্ণু কর্তৃক তুলসীকে ছলনার গল্পটি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুমাহাত্ম্য, অজামিল, মহাপ্রভুর নদীয়ায় আগমন এবং পুনরায় উৎকলে প্রত্যাবর্তন—পরে নিত্যানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। কবি শেষাংশে (উৎকল খণ্ড হইতে উত্তর খণ্ড পর্যন্ত) পৌরাণিক আখ্যানের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন এবং তাহার ফলে চৈতন্যের নীলাচল লীলা সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি বোধহয় এদিক দিয়া বৃন্দাবনদাসের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন; বৃন্দাবনও নীলাচল লীলার বিস্তৃত পরিচয় দেন নাই।

জয়ানন্দ কতকগুলি বিষয়ে এমন সমস্ত তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন যে, বৈষ্ণবভক্ত ও বাংলা সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা লইয়া কথা উঠিয়াছে। জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষকে উড়িষ্যার যাজপুরবাসী বলিয়াছেন :

চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ
আছিলা যাজপুরে।

শ্রীহট্টের দেশের পলাঞা গেলা
রাজা ভ্রমরের ডরে ॥

উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অপর নাম 'ভ্রমর'—তাঁহার গোপীনাথপুরের শিলালিপিতে এই 'ভ্রমর' নামটি পাওয়া গিয়াছে। কপিলেন্দ্র ১৪৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। এই সময়ে অর্থাৎ চৈতন্যের জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ রাজভয়ে শ্রীহট্টে পলাইয়া আসেন এবং শ্রীহট্ট হইতে চৈতন্যদেবের জনক জগন্নাথ মিশ্র আবার নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই তথ্য অন্য কোন চৈতন্যজীবনীতে পাওয়া যায় না, কিংবদন্তীও প্রচলিত নাই। সুতরাং এই তথ্যটি স্বীকার করা যায় না।[৯৮] জয়ানন্দ ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন না। জনসাধারণের জন্য রচিত কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্যের খুঁটিনাটি বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কাজেই কবি মাঝে মাঝে এমন সমস্ত চমকপ্রদ কথা বলিয়াছেন যে, তাহার প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দেহ হয়। এইরূপ কয়েকটি অভিনব তথ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। কবি বলিয়াছেন, শচীমাতা গদাধরের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন, নিত্যানন্দ সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে বিবাহ করিলেও সরখেলের চন্দ্রমুখী নাম্নী আর এক কন্যার প্রতি তাহার প্রীতি ছিল, জয়ানন্দের মতে নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম 'অনন্ত'। ইহা ছাড়া ছোটখাট আরও অনেক অসঙ্গতি আছে, যাহাকে ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা হয়। চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রের প্রধানা মহিষী চন্দ্রকলাকে নিজের মাল্য দান করিয়াছিলেন, এরূপ বিচিত্র অসম্ভব সংবাদও জয়ানন্দের লেখনীপ্রসূত :

রাজার শতেক স্ত্রী প্রধান চন্দ্রকলা।
গৌরচন্দ্র দিলা তাঁরে গলায় দিব্যমালা ॥

চৈতন্য সম্বন্ধে এ কথা কখনও সত্য নহে।

যে জন্য দীনেশচন্দ্র জয়ানন্দের গ্রন্থের ঐতিহাসিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ,[৯৯]

---

[৯৮] বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' দ্রষ্টব্য।

[৯৯] "চৈতন্যদেবের তিরোধান-সংক্রান্ত নানারূপ অলৌকিক গল্পে সত্যকাহিনী কুহকাচ্ছন্ন হইয়াছিল,—জয়ানন্দের লেখায় সেই ঘনীভূত তিমির রাশি এখন অন্তর্হিত হইবে।" দীনেশচন্দ্র—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ২০৪

তাহার কারণ ইহাতে চৈতন্য-তিরোধান সম্বন্ধে লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে :

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে ॥
অদ্বৈত চলিল গৌড় দেশে।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে ॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পরিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে ॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে।
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা ॥
নানা বর্ণে দিব্য মালা আইল কোথা হইতে।
কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে ॥
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ।
গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ ॥
মায়া-শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি ॥

আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন রথের অগ্রে নাচিতে নাচিতে চৈতন্যদেবের বাম পায়ে ইটের টুকরা বিদ্ধ হয়। তিনি বুঝিলেন তাঁহার অপ্রকট হইবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে। গৌড়ে গিয়া কি করিতে হইবে, তিনি অদ্বৈতকে তাহা নিভৃতে বলিয়া দিলেন। তারপর পারিষদবর্গ সহ নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া করিলেন। কিন্তু ষষ্ঠী তিথিতে পায়ের যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল। তিনি টোটা গোপীনাথ মন্দিরে আশ্রয় লইলেন এবং গদাধরকে বলিলেন যে, পরদিন (অর্থাৎ সপ্তমী তিথিতে) রাত্রি দশদণ্ডের সময় দেহরক্ষা করিবেন। তাহাই হইল, পরদিন রাত্রে চৈতন্যদেব মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া জম্বুদ্বীপ ছাড়িয়া গেলেন। এ বর্ণনা বেশ বাস্তব ও স্বাভাবিক। লোচনের সঙ্গে তাঁহার বর্ণনার স্থানে স্থানে মিল না থাকিলেও তিথি ও তারিখের মিল আছে। লোচন বলিয়াছেন, গুণ্ডিচা-বাড়ীতে চৈতন্যদেব জগন্নাথ শরীরে লীন হইয়াছেন, জয়ানন্দের মতে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে চৈতন্য দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু জয়ানন্দ চৈতন্যের তিরোধানকে জগন্নাথ শরীরে লীন হইবার কথা না বলিয়া পায়ে ইষ্টক বিদ্ধ হইয়া স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলিয়াছেন। ইহা সত্য হোক, বা না হোক—জয়ানন্দ চৈতন্যের জন্মগ্রহণের মধ্যে অলৌকিকতা রক্ষা করিলেও মহাপ্রভুর মৃত্যুকালে দেহদশাধীন মানুষের দেহনাশের কথাই বলিয়াছেন। এই জন্য বৈষ্ণবসমাজে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল আদৃত হয় নাই। তিনি চৈতন্যতত্ত্ব ও বৈষ্ণব রসসাধনা সম্বন্ধে সম্ভবতঃ সবিশেষ অবগত ছিলেন না, অথচ গদাধরের নিকট নানা বিষয়ে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যের মতো বর্ণনা প্রায় অনেক স্থলেই লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু তিনি শাক্তদেবী কালিকাকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। ইতিহাসের তথ্যভ্রান্তি, ক্রমভঙ্গদোষ এবং পরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের অনুপস্থিতির ফলেই এই কাব্য বৈষ্ণবসমাজে আদৌ প্রচার লাভ করে নাই। যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি লোচনের অনুরূপ হইত, তাহা হইলে হয়তো এ কাব্য আর একটু প্রচার লাভ করিতে পারিত। কিন্তু নীরস বিবৃতিধর্মী এই জীবনীকাব্য না হইয়াছে ইতিহাস, আর না হইয়াছে কাব্য। জনসাধারণের জন্য রচিত সাহিত্যে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা বা দার্শনিক তত্ত্বকথা না থাকাই স্বাভাবিক। তাহারা দার্শনিকতা বুঝে না, ঐতিহাসিক তথ্যাদির প্রতিও তাহাদের কৌতূহল নাই, মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য কিছু পাইলেই তাহারা খুশি হয়। জয়ানন্দ সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥

বাঙলাদেশের পরম সৌভাগ্য যে, মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো একজন দার্শনিক-কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। পাণ্ডিত্য মনীষা, দার্শনিক ভূয়োদর্শন, রসশাস্ত্রে অগাধ অধিকার প্রভৃতি বিবেচনা করিলে কবিরাজ গোস্বামীকে মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যেও তুলনাহীন মনে হইবে। চৈতন্যদেবের বস্তুগত তথ্যবহ ও ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী সঙ্কলন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার পূর্বে চৈতন্যদেবের অন্ততঃ তিনখানি বাংলা জীবনীকাব্য এবং তিনখানি সংস্কৃত-জীবনী (কাব্য ও নাটক) রচিত হইয়াছিল; তিনি প্রচলিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি না করিয়া চৈতন্য-জীবনাদর্শ, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তার গৌড়ীয় ভাষ্য এবং বৈষ্ণব মতাদর্শকে সংহত, দূরাভিসারী ও মনন-নিষ্ঠ আকারে

দিয়া বাঙালী-মনীষার এক উজ্জ্বলতম স্মারক চরিত্র হইয়া আছেন। যাঁহারা তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করেন এবং তাহা না পাইয়া মনঃক্ষুণ্ণ হন, তাঁহারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য, বৈষ্ণবধর্ম ও সন্তজীবনী রচনার রীতি ও প্রকরণ অবগত নহেন। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।"

। কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় ॥ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে নিজ জীবনের কিয়দংশ বিবৃত করিয়াছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটে যে নৈহাটী গ্রাম, তাহার নিকটে ঝামটপুর গ্রামে কবির বাস ছিল। তাঁহার পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল; কারণ তাঁহার গৃহদেবী শ্রীমূর্তি পূজার জন্য গুণার্ণব মিশ্র নামক এক পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অর্থের কিছু স্বচ্ছলতা না থাকিলে পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা সম্ভব হইত না। কবি নিজ বাটীতে নানা অনুষ্ঠান, নামসঙ্কীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থাও করিতেন। একদা কবির ভবনে অহোরাত্র সঙ্কীর্তনে নিত্যানন্দের এক শিষ্য মীনকেতন-রামদাস আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনিও পরম ভক্ত ছিলেন এবং কীর্তনের আসরে নৃত্যগীতে যোগ দিয়া :

> 'নিত্যানন্দ' বলি যবে করেন হুঙ্কার।
> তাহা দেখে সর্বলোক হয় চমৎকার ॥

কিন্তু তখন বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দবিরোধী দলেরও সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। কৃষ্ণদাসের পূজারী ব্রাহ্মণ গুণার্ণব মিশ্র এই দলভুক্ত ছিলেন; তিনি রামদাসকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নাই, বা সম্ভাষণও করেন নাই। রামদাস ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া গেল অল্প পরেই। কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতাও নিত্যানন্দকে বিশেষ ভক্তি করিতেন না; সেই আসরে রামদাসের সঙ্গে তাঁহার নিত্যানন্দ সংক্রান্ত কিছু বাদানুবাদ হইল। এই কনিষ্ঠ ভাই সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন :

> চৈতন্য প্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
> নিত্যানন্দ-বিষয়ে কিছু বিশ্বাস আভাস ॥

অর্থাৎ নিত্যানন্দ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ভক্তি বা বিশ্বাস ছিল না। ফলে রামদাস ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং নিজের বাঁশীটি ভাঙিয়া ফেলিয়া সক্রোধে আসর ত্যাগ করিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়েরই পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া অনুজকে ভর্ৎসনা করিলেন। সেই রাত্রে নিত্যানন্দ স্বপ্নযোগে কবির নিকট উপস্থিত হইয়া "নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে।" নিত্যানন্দ স্বপ্নেই কবিকে সান্ত্বনা দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন :

অরে অরে কৃষ্ণদাস না কর তুমি ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব লভ্য হয়।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর কবি বৃন্দাবন যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন এবং অচিরে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি গোস্বামীদের সাহায্য, উপদেশ ও কৃপায় তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্র ও দর্শনে নিষ্ণাত হইলেন। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশের ফলেই তিনি বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন; তাই তিনি পুনঃপুনঃ নিত্যানন্দকে প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন :

জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দরাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম॥

তিনি আজীবন অকৃতদার ছিলেন। (তাঁহার জীবনী এবং চৈতন্যচরিতামৃত হইতে তাঁহাকে আদর্শ বৈষ্ণব বলিয়া মনে হয়। প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও কবিরাজের হৃদয়টি শিশুর মতো সরল ছিল, দাম্ভিকতার লেশমাত্র তাঁহার শুভ্র সাত্ত্বিক চরিত্রে বিন্দুমাত্র কালিমা লেপন করিতে পারে নাই।)

এখন সন-তারিখের প্রশ্ন। কেহ কেহ মনে করেন যে, কৃষ্ণদাস যখন বৃন্দাবনে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরের কম নহে। কারণ তখন তিনি নিজ বাটীতে সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা করিতেন ("আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্তন") এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিত্যানন্দে 'বিশ্বাস আভাসে'র জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। কাজেই তখন তাঁহার বয়স ত্রিশের ন্যূন নহে বলিয়া অনুমিত হয়। দীনেশচন্দ্র অনুমান করিয়াছিলেন, ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়। কিন্তু নানা কারণে এই তারিখে সংশয় জন্মিতেছে। নিত্যানন্দ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে বলেন। তাহা হইলে এই সময়ে

(অর্থাৎ কৃষ্ণদাসের আনুমানিক বয়স যখন ত্রিশ বৎসর) নিত্যানন্দ জীবিত ছিলেন না। নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁহার কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। অথচ কাটোয়া হইতে খড়দহ খুব বেশি দূরবর্তী নহে, নিত্যানন্দ জীবিতাবস্থায় খড়দহ হইতে নবদ্বীপে যাতায়াত করিতেন। নিত্যানন্দের জীবিতকালের মধ্যে কৃষ্ণদাস বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কোন না কোন সময়ে নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ পাইতেন। কিন্তু নিত্যানন্দের পরম ভক্ত কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন বলিয়া কোথাও কোন উল্লেখ করেন নাই। দীনেশচন্দ্র উল্লিখিত ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণদাসের জন্ম হইলে নিত্যানন্দের তিরোভাবের (আনুঃ ১৫১২) সময় কবির বয়স হইত প্রায় পঁচিশ বৎসর। সুতরাং কবি নিশ্চয় তাঁহাকে চাক্ষুষ দর্শন করিতেন। কাজেই ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দের বেশ কিছু পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দের স্থলে ১৫২৭ খ্রীঃ অব্দ অনুমান করিতে চাহেন। তাহা হইলে কবির বয়স যখন প্রায় ত্রিশ বৎসর (১৫৫৭), তখন তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন. এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। ১৫৬০ খ্রীঃ অব্দের নিকটবর্তী কোন এক সময়ে তাঁহার 'গোবিন্দলীলামৃত' নামক সংস্কৃত কাব্য রচিত হয়। তখন রূপ-সনাতন জীবিত ছিলেন। বলা বাহুল্য এ সমস্ত সন-তারিখের জল্পনা নিতান্তই অনুমান মাত্র ; তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণদাসের জন্ম ১৪৯৬ খ্রীঃ অব্দে (১৪১৮ শক) এবং মৃত্যু ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে (১৫০৪ শক)।[১০০] তাঁহার পিতার নাম নাকি ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা এবং ভাইয়ের নাম শ্যামদাস। এই তথ্য গল্পপ্রিয় জগদ্বন্ধু লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা সংশয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। এই গ্রন্থ কবিকে সর্বত্র অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা দান করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গালগল্প প্রচলিত হইয়াছিল। 'আনন্দরত্নাবলী', 'বিবর্তবিলাস', প্রভৃতি অর্বাচীনকালের গ্রন্থে এইরূপ নানা অবিশ্বাস্য কাহিনী আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস বহু স্থলে ভোজ্যবস্তু ও রন্ধনের তালিকা

[১০০] সতীশচন্দ্র রায় ১৪৯৬ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণদাসের জন্মগ্রহণের কথা বলিয়াছেন। এ তারিখ কিছুতেই গ্রাহ্য নহে। তাহা হইলে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনার সময় কৃষ্ণদাসের বয়সের সীমা একশত বৎসরে পৌঁছাইবে। দ্রষ্টব্য : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য়।

দিয়াছেন। এইজন্য নাকি এখনও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন যে, কবিরাজী গোস্বামী কৃষ্ণলীলায় কস্তুরিকা মঞ্জরী ছিলেন এবং কৃষ্ণলীলায় তাঁহার কাজ ছিল রন্ধনকার্য পর্যবেক্ষণ। সেইজন্য কৃষ্ণদাস মর্ত্যজীবনে ভোজ্যদ্রব্যের এমন সুনিপুণ বর্ণনা দিয়াছেন।[১০১] এই সমস্ত গালগল্পের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণদাস পরবর্তীকালে বৈষ্ণবসমাজে কিরূপ শ্রদ্ধার্হ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যে নানা গল্পকাহিনী প্রচলিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাসের সাত্ত্বিক চরিত্র সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণদাসের মতো পাণ্ডিত্য, রসবোধ ও জ্ঞানগভীরতা মধ্যযুগের ভারতীয় মনীষিগণের মধ্যে দুর্লভ। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সুগভীর রসবোধ ও সুপ্রতীত দার্শনিক প্রত্যয় এবং তাহার সহিত আদর্শ বৈষ্ণব-জনোচিত বিনয় আধুনিক কালের পাঠককেও বিস্মিত করিবে। কবি বলিতেছেন :

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥
তৈছে এক কণ আমি ছুঁইল লীলার।
এ দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান ॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বলিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি ॥

তারপর অতিবৃদ্ধ অশক্ত কবি শ্রোতা ও পাঠকদের চরণে মিনতি করিয়া বলিয়াছেন :

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
তোমার এ অমৃত পীলে সফল হৈল শ্রম ॥

১০১ ডঃ মজুমদার—চৈ. চ. উপা. পৃ. ৩১৯ (পাদটীকা)

বৃন্দাবন দাসের "তবে লাথি মারে তার শিরের উপরে" এবং কৃষ্ণদাসের "তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে" উক্তি দুইটির সুর মিলাইয়া লইলেই বুঝা যাইবে কবিরাজের চিত্তে বিদ্যা ও বিনয় একই সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণদাসের এই বিনয় আধুনিক কালে অনেকের নিকট একটু বাড়াবাড়ি মনে হইতে পারে, কিন্তু কবি যে বাহবা পাইবার জন্য বিনয়ের ভেক ধারণ করেন নাই, তাঁহার বিদ্যাঋদ্ধ চিত্তটি সদাসর্বদা সন্নত হইয়া থাকিত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেহ কেহ কবিরাজের রচনায় ও ব্যক্তিত্বে নানা ত্রুটি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নাকি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দার্শনিক চিন্তা বেমালুম চৈতন্যের মুখে বসাইয়া দিয়াছেন।[১০২] কেহ-বা বলিয়াছেন, "মধ্যযুগের ধর্মবোধ যুক্তিবিচারকে সহ্য করিতে পারিত না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সে যুগের অন্যান্য লেখক অপেক্ষা যুক্তি বিচার সম্বন্ধে অধিকতর অসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি এমন অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন যাহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি একেবারেই নাই।"[১০৩] এই অভিযোগগুলির প্রত্যেকটি অংশতঃ সত্য। সত্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ, মতাদর্শ ও উক্তি অবলম্বনে চৈতন্য জীবনীকে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন এবং সেই তত্ত্বাদর্শের আলোকে চৈতন্যলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যের একখানি প্রামাণিক, সন-তারিখযুক্ত বাস্তব জীবনী রচনা কবিরাজের আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না—মধ্যযুগের কোন মহাজন-জীবনীর সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। সেই জন্য মহাপুরুষ ও সন্ত-সাধকদের জীবনী hagiography নামে পরিচিত। চৈতন্যজীবনীকে বৈষ্ণব আদর্শের নিরিখে উপস্থাপনা, বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে নিয়োগ করা—ইহাই ছিল কৃষ্ণদাস ও অন্যান্য জীবনীকারদের উদ্দেশ্য। কাজেই চৈতন্যজীবনীতে ঐতিহাসিক তথ্যাদি ও বাস্তব ঘটনার যে মাঝে মাঝে ক্রমভঙ্গদোষ ঘটিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু জীবনীকারগণ যে রসের রসিক ছিলেন, যে পথ ধরিয়াছিলেন, তাহাতে খুঁটিনাটি যথাযথ বর্ণনার স্থান ছিল না। কৃষ্ণদাস যদি চৈতন্যজীবনী ও চৈতন্যজীবনাদর্শ বর্ণনায় ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা না করিয়া

[১০২] "He does not even hesitate at the risk of anachronism and absurdity to put their subtle scholastic views in the mouth of Chaitanya himself." Dr. S. K. De—*Vaishnava Faith & Movement*, p 42.

[১০৩] ডঃ মজুমদার—চৈ. চ. উপা. পৃ. ৩১৫

থাকেন তাহা হইলে তাহাতে বিস্মিত বা বিমর্ষ হইবার কারণ নাই। বিশুদ্ধ ইতিহাস বা বাস্তব মানুষের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী রচনা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তবে সে যুগে তিনি যে যুক্তিবিচার ছাড়িয়া অধিকতর সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিয়াছেন—একথা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নহে। কবিরাজের বিপুল পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, 'শিক্ষাষ্টকে' বর্ণিত বৈষ্ণব আদর্শের সঙ্গে তাঁহার মনের হুবহু মিল হইয়াছিল। অহঙ্কার দাম্ভিকতার ধার দিয়াও তিনি যান নাই। বরং তাঁহার পূর্বস্থরী বৃন্দাবনদাস অসহিষ্ণু হইয়া এমন সমস্ত প্রগলভ উক্তি করিয়াছেন যাহা কোন বৈষ্ণবের পক্ষেই শোভন নহে।

কবিরাজ শুধু দর্শনে নহে, যুক্তিশাস্ত্রেও পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম ও রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর আলাপাদি বর্ণনায় তিনি যুক্তি-মার্গই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবাদর্শের মূলকথা যে বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, নিষ্ঠা ও রতি—তাহা ছাড়িয়া তিনি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবিজ্ঞানীর মতো শুধু প্রত্যভিজ্ঞামূলক বস্তু-প্রতীতিকেই অবলম্বন করিবেন, মধ্যযুগের এই চিন্তানায়কের নিকট তাহা আশা করা যায় না। সে যুগটা বস্তুপ্রত্যয়গত জ্ঞানবাদের ততটা অনুকূল ছিল না। কিন্তু এখনও কি আমরা গুরুপুরোহিত-স্মৃতিসংহিতা-আপ্তবাক্যের মোহ পুরাপুরি কাটাইতে পারিয়াছি? কৃষ্ণদাস নির্মোহ সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদ অবলম্বন করিলে চৈতন্যের জীবনী রচনার প্রয়োজন বোধ করিতেন না, লিখিলেও মধ্যযুগের কেহ পড়িত না, শুনিত না—তাহাতে শুধু আধুনিক কালের পুঁথির বিবরণী-লেখকের পরিশ্রম বাড়িত! 'বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর'—ইহাই বৈষ্ণবধর্মের সার কথা। আর শুধু বৈষ্ণবধর্মই বা কেন? সমস্ত ঈশ্বরবাদী ধর্মেরই মূলকথা—বিশ্বাস ও নৈষ্ঠিকতা; বিশ্বাসের সীমা শেষ হইবার পর যুক্তিবাদী দার্শনিকতার আবির্ভাব হয়। কবিরাজ বৈষ্ণবতত্ত্ব ও আদর্শ অনুসারে চলিয়াছেন; শুষ্ক যুক্তিক্রম অনুসরণ, তাঁহার কেন, মধ্যযুগের কোন লেখকেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। সত্য বটে, "তিনি এমন অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন যাহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি একেবারেই নাই।" কিন্তু এ অপরাধে তাঁহার পূর্বস্থরিগণ অধিকতর অপরাধী। তিনি চৈতন্য-তিরোধানের অর্ধ শতাব্দীরও পরে অতিবৃদ্ধ বয়সে বাঙলা হইতে বহু দূরে অবস্থান করিয়া এই জীবনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তখন চৈতন্যদেব অবতাররূপে পূজিত হইতেছিলেন,

অবৈষ্ণবেরাও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিত। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে বহু আলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস বিশেষ তত্ত্বাদর্শ ব্যাখ্যায় সেই সমস্ত আলৌকিক কাহিনীর কিছু কিছু প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ববর্তী রূপ-সনাতন, মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর, প্রবোধানন্দ এবং সমকালীন জীব গোস্বামী,—ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বচক্ষে মহাপ্রভুর নবদ্বীপ ও নীলাচল লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত অলৌকিক গল্পে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন কি প্রকারে? ইদানীন্তন কালে আমরা কি শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীঅরবিন্দের আচার-আচরণে অলৌকিকতা আরোপ করি না? আর আজ হইতে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে এক ভক্তকবি অলৌকিকতায় আস্থা স্থাপন করিয়া কি এমন মহাপাতক করিয়া ফেলিয়াছেন? অলৌকিক কাহিনী রচনা করিবার অপরাধে বৃন্দাবন ও লোচনকে যদি আমরা কোতল না করিয়া থাকি, তাহা হইলে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাসই বা কেন ঐ অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইবেন? যাঁহারা কৃষ্ণদাস বা অন্যান্য চৈতন্যজীবনীকারদের বর্ণিত ঘটনার অনৈতিহাসিকতা, অলৌকিকতা, অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারা মধ্যযুগের আদর্শ, জীবন ও ভাব-ভাবনা সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত নহেন। এই জীবনীকারগণ কেহই বস্‌ওয়েলের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই, চৈতন্যদেবও জনসনের সঙ্গে তুলনীয় নহেন; ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলাদেশের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডেরও কোন দিক দিয়াই সাদৃশ্য নাই। কৃষ্ণদাস তাঁহার কাব্যের কোন কোন স্থলে অলৌকিকতার অবতারণা করিয়াছেন, চৈতন্যের মুখে এমন সমস্ত উক্তি বা শ্লোক বসাইয়া দিয়াছেন, যাহা চৈতন্যের তিরোধানের পর রচিত হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যজীবনী অপেক্ষা চৈতন্যতত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রভৃতি দুরূহ তত্ত্ববাদ ব্যাখ্যাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক ক্রমের যাথার্থ্য রক্ষা করেন নাই। সে যুগের যুগমানস, সমাজ-ঐতিহ্য ও লোকসংস্কারের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার করিলে ইহার জন্য কৃষ্ণদাসকে কোন মতেই অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। সে যাহা হোক মধ্যযুগের এরূপ একজন সাধক প্রকৃতির কবি-দার্শনিক বাঙলাদেশে জন্মিয়াছিলেন, এই জন্য বাংলা সাহিত্য ধন্য হইয়াছে।

কৃষ্ণদাসের জীবনাবসান সম্বন্ধে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব গ্রন্থে একটা গল্প

চলিয়া আসিতেছে। 'প্রেমবিলাস', 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-ইতিহাস ও সমাজবিষয়ক গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এই কাহিনীগুলির খুঁটিনাটির মধ্যে নানা পার্থক্য থাকিলেও বর্ণিত ঘটনাটি যে একেবারে কাল্পনিক তাহা মনে হয় না। চৈতন্যচরিতামৃত সমাপ্ত হইলে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ ইহা অনুমোদন করিলেন। তখন কবিরাজের পুঁথি বাঙলাদেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। কিন্তু বনবিষ্ণুপুরের ডাকাত-রাজা বীর হাম্বীরের অনুচরগণ ঐশ্বর্যভ্রমে পুঁথির পেটিকা কাড়িয়া লয়। পুঁথি লুণ্ঠনের সংবাদ বৃন্দাবনে পৌছিলে সুবৃদ্ধ কৃষ্ণদাস এই মর্মান্তিক সংবাদ সহ্য করিতে পারেন নাই, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রাণত্যাগ করেন। অপর মতে তিনি নাকি রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন।[১০৪] আর এক মতে, দুঃসংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ঘটনার পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অল্পদিনের মধ্যে মর্ত্যদেহ ত্যাগ করেন। গল্পগুলি নিছক গল্প মাত্র। কৃষ্ণদাসের মূল পুঁথিটি গৌড়ে প্রেরিত হইল, বৃন্দাবনে পঠনপাঠনের জন্য তাহার কোন অনুলিপি রহিল না, ইহা কি সম্ভব? তবে পল্লবিত কাহিনীটির পশ্চাতে সত্যের আভাস থাকা সম্ভব। গল্পটি সত্য হোক আর নাই হোক, কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ উত্তর কালে এমন মহিমা লাভ করিয়াছিল যে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া এই রূপ নানাপ্রকার গল্প-উপকথা সৃষ্টি হইয়াছিল।

কৃষ্ণদাসের অতি বৃদ্ধ বয়সে দেহান্ত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্রের মতে ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে পঁচাশি বৎসর বয়সে কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ সমাধা হয়, মৃত্যুও ইহার অল্প পরে হইয়াছিল। গ্রন্থরচনাকাল আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিতেছি। জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর কথা লিখিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের কোন কোন পুঁথিতে গ্রন্থশেষে যে সংস্কৃত শ্লোকটি পাওয়া যায়, তাহাতে দুইটি সন কল্পিত হইয়াছে—১৫৮১ বা ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দ।[১০৫] ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ১৫২৭ খ্রীঃ অব্দের দিকে কৃষ্ণদাসের জন্ম হইয়াছিল। এই অনুমান যথার্থ হইলে গ্রন্থ সমাপ্তির সময় তাঁহার বয়স

---

১০৪ স্থিতধী পণ্ডিত ও কবি বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থশোকে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করিবেন—ইহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

১০৫ পরে দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিল, হয় ৫৪ বৎসর, আর না হয় ৮৮ বৎসর। তিনি যে গ্রন্থরচনার সময় অতি-বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সে সময়ে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনেকেরই দেহান্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ৫৪ বৎসর বয়সে এই কাব্য রচিত হইলে তিনি নিজেকে নানা রোগগ্রস্ত ও 'অতিবৃদ্ধ জরাতুর' বলিতেন না। সুতরাং তখন তাঁহার বয়স নিশ্চয় ৫৪ বৎসরের অনেক বেশি হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থরচনার কাল॥ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল, চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা এই কাব্যে সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, নীলাচল লীলার বর্ণনাও আছে, কিন্তু চৈতন্যজীবনীর অন্ত্যপর্ব ইহাতে অত্যন্ত সংক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে—মনে হয় বৃন্দাবনদাসের কাব্যটি যেন অকস্মাৎ সমাপ্ত হইয়াছে। উপরন্তু ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও চৈতন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ ও মননশীল আলোচনার অভাব আছে। চৈতন্যদেবের জীবনের অন্তিমপর্বেই তাঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা ঘটিয়াছিল, যখন তিনি চেতন-অচেতন যে—কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণরসে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। বৃন্দাবনের ভক্তগণ বাংলা ভাষায় এইরূপ একখানি জীবনীর প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন, যাহাতে চৈতন্যের উত্তর-জীবন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্বরস সরলভাবায় সাধারণের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করা হইযাছে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে বাঙলাদেশের আদর্শের প্রভাব পড়িয়াছে, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রভাবে কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইয়াছিল। গোস্বামিগণ কৃষ্ণদাসকে সেই গুরুভার অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণদাস তখন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি সংস্কৃত কাব্য ('গোবিন্দলীলামৃত') রচনা করিয়া পণ্ডিত ও রসিক বলিয়া বৃন্দাবনের গোস্বামিসমাজে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস ব্রজমণ্ডলের প্রাচীন বৈষ্ণব আচার্যদের নিকট যৌবন বয়সেই শিক্ষালাভ করিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র ও ভক্তি-রসে পরম প্রাজ্ঞ হইয়াছিলেন। সে যুগে তাঁহার মতো বহুদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি সারা উত্তর-ভারতেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। সুতরাং তাঁহার উপর এই গ্রন্থ রচনার ভার দিয়া বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আচার্যগণ সুবিবেচনারই

পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, সনাতন-রূপ-জীব ও গোপাল ভট্টের প্রামাণিক গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে রচিত, বাঙালী জনসাধারণ তাহার অর্থ বুঝে না। ফলে গোস্বামীদের উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তাই তাঁহারা এমন একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন যাহাতে চৈতন্যের দিব্যোন্মত্ত অন্ত্য জীবনপর্ব এবং বৃন্দাবনের গোস্বামী-উপস্থাপিত বৈষ্ণবদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ সরল বাংলায় বর্ণিত হইবে। এইজন্য তাঁহারা কৃষ্ণদাসকেই যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এখন দেখা যাক এই বিরাট গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন সন-তারিখের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা। চৈতন্যচরিতামৃতের মুদ্রিত সংস্করণের শেষে গ্রন্থ-সমাপ্তিসূচক একটি সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায় :

> শকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
> সূর্যেহহ্ন্যসিত-পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

সিন্ধু শব্দটি তারিখ নির্ণয়ে সাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে এই শ্লোক হইতে ১৫৩৭ শক বা ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু জ্যোতিষে 'চার' সংখ্যা সমুদ্র অর্থেও নিরূপিত হইয়া থাকে।[১০৬] তাহা হইলে এই সন হইবে ১৫৩৩ শক বা ১৬১২ খ্রীঃ অব্দ। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাহার গণিতজ্ঞ বন্ধু ফণিভূষণ দত্তের সঙ্গে আলোচনা ও গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৫৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে পঞ্চমী কৃষ্ণাতিথিতে রবিবার পড়িয়াছিল; তাই তিনি এই সন অর্থাৎ ১৬১২ খ্রীঃ অব্দ গ্রহণ করিতে চাহেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ও এই তারিখ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু 'প্রেমবিলাসের' এই শ্লোকটির নিম্নলিখিত পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে :

> শকেহগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
> সূর্যেহহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

ইহার অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে :

> কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন।
> পনর শত তিন শকাব্দে যখন ॥
> জ্যৈষ্ঠ মাসের রবিবার কৃষ্ণা পঞ্চমীতে।
> পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

---

১০৬ ডঃ মজুমদার—চৈ. চ. উপা. পৃ. ৩২০ (পা. টী)

তাহা হইলে 'প্রেমবিলাসের'র মতে ১৫০৩ শকাব্দে বা ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এখন দেখা যাক ১৫৮১, না ১৬১২ (১৬১৬), কোন্ সালে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

ছাপা গ্রন্থের পুষ্পিকায় মুদ্রিত কালজ্ঞাপক সংস্কৃত শ্লোকটি কোন কোন পুঁথিতে মিলিতেছে।[১০৭] অবশ্য ডঃ সুকুমার সেন কোন প্রাচীন পুঁথিতে এ শ্লোক পান নাই। তিনি ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত একখানি পুঁথি পরীক্ষা করিয়া তাহাতেও সন-তারিখ পান নাই। ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কোন কোন পুঁথির পুষ্পিকায় এই সন-তারিখ পাইয়াছেন, আবার অনেক পুঁথিতে এই সনতারিখ আদৌ নাই।[১০৮] ডঃ দে ও ডঃ সেন উভয়েই এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহারা মনে করেন এই সন গ্রন্থ-রচনার তারিখ নহে—লিপিকরণের তারিখ। অবশ্য দুই জনের মতের মধ্যেও পার্থক্য আছে। ডঃ দের মতে উক্ত তারিখ যাহাই হোক না কেন, "Krishnadas, therfore, could not have completed his work in 1581 A. D. The date Saka 1537 =1615 A. D., therefore, appearss to be more likely." অপর দিকে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, "১৫৬০-৮০ খ্রীঃ অব্দ রচনাকালের সীমা ধরিলে অন্যায় হয় না।" এই বিষয়ে প্রথমে একটা কথা পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাক। নানা পুঁথিতে যে শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা গ্রন্থ নকলের তারিখ, রচনার তারিখ নহে—ডঃ দে ও ডঃ সেন একথা কোথায় পাইলেন? প্রাচীনযুগের পুঁথিতে কখনও সন-তারিখ থাকিত, কখনও থাকিত না। সুতরাং সমস্ত পুঁথিতে এই শ্লোকটি মিলিতেছে না বলিয়া উহা লিপিকারগণের গ্রন্থ নকলের তারিখ, ইহা কোন প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় না। যেখানে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেখানেই "গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ" বলা হইয়াছে। সেখানে গ্রন্থরচনা সমাপ্তির কথাই আছে, গ্রন্থ নকলের কোন ইঙ্গিত নাই। ডঃ সুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ" এ উক্তি রচয়িতার পক্ষে যেমন খাটে, লিপিকর্তার পক্ষেও তেমনি খাটে, বোধ করিয়া বেশি করিয়া খাটে" (বাং. সা. ইতি. ১ম, পূর্বাধ, পৃ ৩৩৭)। তাঁহার এ সিদ্ধান্ত

১০৭ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম, পূর্বার্ধ, পৃ. ৩৩৭ (পা. টী.)

১০৮ Dr. S. K. De—*Vaishnava Faith & Movement*, p. 43 (f. n.)

আদৌ যুক্তিসহ নহে। 'লিপিকর্তার পক্ষে বেশি করিয়া খাটে' কেন, তাহা শ্রীযুক্ত সেন বুঝাইতে পারেন নাই। ডঃ সেন গোপাল ভট্টের শিষ্য (সেবক) বংশীদাসের পড়িবার জন্য বাংলা ১০২০ সনে (১৬১৩) লিখিত পুঁথিতে এই শ্লোকটি পান নাই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "শ্লোকটি কৃষ্ণদাসের মূল রচনার কালজ্ঞাপক হইলে ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে বৃন্দাবনে গোপাল ভট্টের শিষ্য (বা সেবক) বংশীদাসের পড়িবার জন্য লেখা পুঁথিতে থাকিবে না কেন?"[১০৯] কিন্তু ঐ পুঁথিতে শ্লোকটি নাই বলিয়াই কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উহা আর কোন পুঁথিতেই ছিল না? ডঃ সেন উক্ত পুঁথিটি "পাটনা গৌরাঙ্গ মঠের অধিকারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায়" দেখিয়াছেন ও পরীক্ষা করিয়াছেন। এত পুরাতন পুঁথি সম্বন্ধে তিনি আর একটু বিস্তারিত পরিচয় দিলে আমাদের সংশয়ের মুখ বন্ধ করা যাইত।[১১০] যাহা হোক ডঃ দে ও ডঃ সেনের অনুমান যুক্তিসহ নহে। উক্ত সনটি যখন অধিকাংশ পুঁথিতেই মিলিতেছে, তখন ইহার প্রামাণিকতায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

এখন অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রমাণের কথা বিবেচনা করা যাক। রাধাগোবিন্দ নাথ ও যোগেশচন্দ্র রায় জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা দেখিয়াছেন যে, ১৫০৩ শকের জৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী পড়ে নাই। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে জীব গোস্বামীর 'গোপালচম্পূ'র উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের পূর্বভাগ ১৫৮৮ খ্রীঃ অব্দে এবং উত্তর ভাগ ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। সেই জন্য একটা সূত্র পাওয়া যাইতেছে যে, চৈতন্যচরিতামৃত অন্ততঃ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হয় নাই।[১১১] আর একটা ঐতিহাসিক প্রমাণের কথা উল্লেখ

---

[১০৯] ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৩৩৭

[১১০] ডঃ সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটির কাগজ ("কাগজ পাতলা মাড়ের তৈয়ারি, ঠিক যেন মিলের কাগজ",—বাং. সা. ইতি. প্রথম, পূর্ব, পৃ. ১২৯) ও কালি ("কালিতেও প্রাচীন পুঁথির কালির মত গাঢ় উজ্জ্বলতার চিহ্ন মাত্র নাই", ঐ পৃ ১২৯) সম্বন্ধে যেরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন, পাটনা মঠের পুঁথি সম্বন্ধে সেরূপ কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া চৈতন্যচরিতামৃতকাব্যকে অন্ততঃ ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতাম।

[১১১] ডঃ সেন 'গোপালচম্পূ'র সমাপ্তির তারিখেও সন্দিহান। তাঁহার মতে 'গোপালচম্পূর' শেষে যে তারিখটি আছে তাহা নাকি শোধন সমাপ্তির পরে যোগ করা হইয়াছিল, রচনা সমাপ্তির

করা যাইতেছে। বৃন্দাবনে গোবিন্দমন্দির ও বিগ্রহ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন যে, এই বিগ্রহ ও মন্দিরে রাজোচিত ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটিয়াছিল, "রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার", "সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ" ইত্যাদি। এই মন্দিরটি আকবরের রাজ্যকালের ৩৪ বর্ষে ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে নির্মিত হয়। তাহা হইলে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা এই মন্দির নির্মাণের পর আরম্ভ হইয়াছিল।

আর একটা বড় প্রমাণের কথাও বিবেচ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে সমস্ত গোস্বামীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই কাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন (চৈ. চ., আদি। ৮), তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দমন্দিরের অধ্যক্ষ পণ্ডিত হরিদাস

তেঁহো অতি কৃপা করি আজ্ঞা দিলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥

কবি তাহার পর অন্যান্য গোস্বামীদেরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন :

তারিখ নহে (বাং. সা. ইতি. প্রথম, পূর্বাধ, পৃ. ৩৩৮)। কোন্ প্রমাণের বলে তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন বুঝা যাইতেছে না। ডঃ সেন 'গোপালচম্পূ' সংশোধনের জল্পনার ব্যাপারটিতে নলিনীনাথ দাশগুপ্তের (বিচিত্রা—শ্রাবণ, ১৩৪৫) একটি প্রবন্ধের অনুসরণ করিয়াছেন। নলিনীনাথের মতে চৈতন্যচরিতামৃত নাকি ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। কারণ জীবগোস্বামী বাঙলা দেশের শ্রীনিবাস আচার্যকে এই মর্মে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, গোপালচম্পূর উত্তর খণ্ডের সংশোধন বাকি আছে এবং সেই সময়ে ভূগর্ভ মিশ্রের দেহত্যাগের কথাও লিখিয়াছিলেন। ইহা নিশ্চয় ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দের পূর্ববর্তী ঘটনা, কারণ ঐ তারিখে উত্তরার্ধ সমাপ্ত হয়। তাহার কিছু পূর্বে গ্রন্থটি জীব গোস্বামী সংশোধন করিতেছিলেন। অপরদিকে দেখা যাইতেছে কৃষ্ণদাস ভূগর্ভের আদেশানুসারে চৈতন্যচরিতামৃত লেখা আরম্ভ করেন। এইজন্য নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে চৈতন্যচরিতামৃত রচনার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি—৮ম) দেখা যাইতেছে যে ভূগর্ভ মিশ্র নহে, তাঁহার শিষ্য গোবিন্দের সেবক চৈতন্যদাসের এবং আরও অনেকের "শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন।" সুতরাং নলিনীনাথ দাশগুপ্তের ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দ কিছুতেই দাঁড়াইতে পারে না। কিংবা যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, ভূগর্ভ মিশ্রের ইচ্ছায় কবি এই কাব্য রচনায় ব্রতী হন এবং ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে ভূগর্ভের মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে চৈতন্যচরিতামৃত সমাপ্ত হইয়াছিল একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে বরং আরম্ভ হইতে পারে। এত বড় গ্রন্থ শেষ হইতে পাঁচ হইতে দশ বৎসর লাগিয়া থাকিবে। যাহা হোক 'গোপালচম্পূ'র উত্তরার্ধের রচনাকাল (১৫৯২) ধরিয়া একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, অন্ততঃ ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দের পরে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইয়াছিল—তাহার পূর্বে কদাপি নহে। ডঃ সেন কথিত ১৫৬০-৮০ খ্রীষ্টাব্দ কোন দিক দিয়াই গৃহীত হইতে পারে না।

কাশীশ্বর গোঁসাইর শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাই।
গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সম নাই॥
যাদবাচার্য গোঁসাই শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী॥
পণ্ডিত গোঁসাইর শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাই।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই॥[১১২]
তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আচার্য গোঁসাইর শিষ্য চক্রবর্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে চৈতন্য-নিত্যানন্দ॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥

এই তালিকা হইতে মনে হয় কবি যখন এই গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হন, তখন জীব গোস্বামী ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন গোস্বামী জীবিত ছিলেন না. জীবিত থাকিলে কবি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিতেন। অবশ্য তখন তিনি কেন যে জীব গোস্বামীর উল্লেখ করিলেন না, তাহা রহস্যময়। যাহা হোক রূপ-সনাতনাদি তখন যে জীবিত ছিলেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'গোবিন্দ-লীলামৃতে' (১৫৬০) তিনি চারিজন গোস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাপ্ত উপাদান হইতে মনে হয়, চৈতন্যচরিতামৃত ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে রচিত হইতে আরম্ভ হয়, শেষ করিতে কবির বোধ হয় পাঁচ হইতে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহা ১৬১২ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল কিনা বলা যাইতেছে না। তবে রচনাসমাপ্তি ঐ সন হইতে খুব পশ্চাদবর্তীও হইবে না।[১১৩] 'গোপালচম্পূ'র সমাপ্তি কাল (১৫৯২) স্মরণ

[১১২] পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ভূগর্ভ যে কবিকে কাব্য লিখিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন, এখানে এমন কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং নলিনীনাথ দাশগুপ্তের অনুমান ধোপে টিকিতেছে না। ১১১ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[১১৩] গ্রন্থ-চুরির সংবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখও পাওয়া যাইবে। গ্রন্থাপহারক বীর হাম্বীর ১৫৮৭-১৬১৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বনবিষ্ণুপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রন্থটি ১৬শ শতাব্দীর শেষে বা ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়া থাকিবে। ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদারের মতে, "চরিতামৃত ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়" (চৈ. চ. উপা.)। যদি পুঁথি-সমাপ্তির সংস্কৃত শ্লোকটিকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে

রাখিয়া শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, চৈতন্যচরিতামৃত ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দের পরে রচিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার পূর্বে কদাপি নহে।

গ্রন্থের পরিকল্পনা ॥ 'অতিবৃদ্ধ জরাতুর' কৃষ্ণদাস কবিরাজ অসাধারণ মনীষার বলে এইরূপ একখানা বিরাট জীবনীকাব্যের পরিকল্পনা ও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, চৈতন্যলীলারসের পূর্বসূরিগণ ইতিপূর্বেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত তখন বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। এক হিসাবে বৃন্দাবনের গ্রন্থ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণের ক্ষুধা মিটিয়াছিল, চৈতন্যজীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনাই এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যজীবনের কোন্ অংশে আলোকপাত করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয় নাই, মনে হয় বৃন্দাবনদাস যেন অকস্মাৎ গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। অথচ চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলাই তাঁহার মর্মগূঢ় অধ্যাত্মচেতনার অমৃত-রসায়ন; ভক্ত, রসিক ও তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণবগণ নিশ্চয়ই এই অংশটি সবিস্তারে জানিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা বোধ করিতেন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মতো কবি ও মনীষী ভিন্ন চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার সম্যক্ রসাস্বাদন ও রসবিতরণে আর কেই-বা সমর্থ হইবেন? বৃদ্ধ কবি জীবনের প্রান্তে পৌঁছিয়া দুরূহ কর্মে ব্রতী হইলেন। চৈতন্যের দিব্যোন্মত্ত লীলাকথাকে প্রাধান্য দিবার জন্যই তিনি বৃন্দাবনদাসকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলেন। চৈতন্যলীলার ব্যাসস্বরূপ বৃন্দাবনদাসের মহা-গ্রন্থের পর তাঁহাকে পুনরায় চৈতন্যজীবনী লিখিতে হইতেছে বলিয়া কবিরাজের সঙ্কোচ ও দীনতার যেন সীমা নাই। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া তিনি আবার কেন নূতন নূতন করিয়া চৈতন্যজীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য :

> কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
> চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥

ডঃ মজুমদার কথিত সন দুইটি স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু পুঁথির-শ্লোকটির প্রামাণিকতায় সন্দেহ থাকিলে উক্ত সন দুইটিকে গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা উপস্থিত হইবে।

বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥
... ...
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহো মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

বৃন্দাবনদাস প্রথমে সংক্ষেপে চৈতন্যলীলার সঙ্কেত-সূত্র দিলেন এবং পরে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু—

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রোক্ত কোনো লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হৈল আবেশ।
চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥ (চৈ. চ.)

গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ফলে বৃন্দাবনদাস পূর্বে সূত্রাকারে রচিত অনেক ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেন নাই, বিশেষতঃ নিত্যানন্দলীলা বর্ণনে অধিকতর আবিষ্ট হওয়াতে তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যের অন্ত্যলীলা অবশিষ্ট রহিয়া গেল। এই অন্ত্যলীলা শুনিবার জন্য বৃন্দাবনের ভক্তগণ কৃষ্ণদাসকেই অনুরোধ করিলেন। কবি তখন বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া দুরূহ কর্মে ব্রতী হইলেন :

বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥

আর এক স্থলে কবি বলিতেছেন :

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িয়া যে যে স্থান।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্বণ ॥

কৃষ্ণদাস স্বরূপ-দামোদর ও মুরারি গুপ্তের গ্রন্থে বর্ণিত লীলাসূত্র অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু যে যে স্থানে বৃন্দাবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কবি তাহা ছাড়িয়া গিয়াছেন; কেবল বৃন্দাবন যেখানে কিছু বলেন নাই, কৃষ্ণদাস শুধু সেই অংশগুলির ঈষৎ বিস্তৃত বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী কিভাবে গ্রন্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে চৈতন্যের লীলা সবিস্তারে বর্ণিত হইলেও কবি কোন কোন স্থল গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে সংক্ষিপ্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যের অন্ত্যলীলা সম্যক্ বর্ণিত হয় নাই। চৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনাই কৃষ্ণদাসের মুখ্য উদ্দেশ্য; অথচ গ্রন্থের ক্রম রক্ষার জন্য সমগ্র চৈতন্য-জীবনেরও সংক্ষিপ্ত সূত্র থাকা প্রয়োজন। তাই তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত ঘটনাকে শুধু সূত্রাকারে উল্লেখ করিলেন এবং বৃন্দাবন যে অংশগুলিকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন শুধু সেইগুলির ঈষৎ বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন।[১৪] কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষেপে

---

[১৪] মধ্যলীলার প্রারম্ভে কবি পাঠককে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন :

পূর্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র মধ্যেই কহিল ॥
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥
সেই ভাগের ইহা সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব ॥

বর্ণনা করিলেও চৈতন্যের অন্ত্যলীলায় পৌঁছাইবার পূর্বেই কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়া চলিল। বৃদ্ধ কবি শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য চৈতন্যের অন্ত্যলীলা বর্ণনা; অথচ আদি ও মধ্যলীলা বর্ণনায় বহু সময় অতিবাহিত হইতেছে। যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার এতদিনের সাধনা বিফল হইবে।

শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ বিস্তারিত লীলা শেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়॥
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলা সার সূত্র মধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ ধন॥
সংযোগ এই সূত্র কৈল যেই ইহা না লিখিল
আগে তার করিব বিস্তার।
যদি ততদিন জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥

সব সময়েই তাঁহার ভয়, পাছে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার দিব্যোন্মাদ দশা বর্ণনার পূর্বেই তাঁহার জীবনান্ত হয়। এই জন্য তিনি অন্ত্যখণ্ড আরম্ভের পূর্বেই মধ্যখণ্ডে অন্ত্যখণ্ডেরও কিঞ্চিৎ লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণদাস বিবৃতিমূলক জীবনী রচনার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, চৈতন্য-জীবনের তাৎপর্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূল তত্ত্ব, চৈতন্য শাখা নির্ণয় এবং মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা সম্বন্ধেই অধিকতর অবহিত হইয়াছিলেন। অবশ্য চৈতন্যচরিতামৃতে কাহিনী বা বিবৃতি যে নাই, তাহা নহে—কিন্তু কবি নিজ প্রয়োজন ও তত্ত্ব ব্যাখ্যানের জন্যই কাহিনী বা আখ্যানের সাহায্য লইয়াছেন। কৃষ্ণদাস মূলতঃ দার্শনিক, শুধু বিবৃতিমূলক জীবনীকার নহেন। সেইজন্য চৈতন্য-চরিতামৃত জীবনী ও দর্শনের যুগপৎ সমন্বয়ে এক

অপরূপ গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। এইবার সংক্ষেপে তিনটি খণ্ডের বিষয়বস্তুর পরিচয় লওয়া যাক।

চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা মোট সতেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা ও কৈশোরকাহিনী সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। আদিলীলার শেষ পরিচ্ছেদে (সপ্তদশ) কাজীদলন এবং চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্পের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই অংশে চৈতন্যের বাল্য হইতে তেইশ বৎসর পর্যন্ত জীবনকথা স্থান পাইয়াছে—এই অংশকে চৈতন্যদেবের নদীয়ালীলা বলা যাইতে পারে, তখনও চৈতন্যদেব 'কৃষ্ণচৈতন্য' হন নাই, তখন তিনি বিশ্বম্ভর ও নিমাইপণ্ডিত নামে অধিকতর পরিচিত। কৃষ্ণদাস সূত্রাকারে চৈতন্যের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের মুখ্য কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ তাঁহার পূর্বে বৃন্দাবনদাস বিস্তারিত আকারে চৈতন্যের নদীয়ালীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই পর্বে প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বারটি পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস মূলতঃ বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শন, চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা এবং চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দের অনুচর-পরিকর ও শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। এই আদিলীলা পাঠেই কৃষ্ণদাসের চৈতন্যজীবনী রচনার উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও গতিপ্রবণতা বুঝা যাইবে। তিনি ঘটনাবিন্যাসপূর্ণ জীবনী বর্ণনা না করিয়া চৈতন্যাবতারের তাৎপর্য, শাস্ত্রমার্গীয় স্মার্ত বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় রাগানুগা বৈষ্ণবধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, চৈতন্য ও কৃষ্ণের সম্পর্ক চৈতন্যাবতারের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রেমধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ববিশ্লেষণে অধিকতর প্রবণতা ও নিপুণতা দেখাইয়াছেন। এই পর্বটি দুইটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে ইহাতে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বৃন্দাবনের গোস্বামী-সম্প্রদায় ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও রসতত্ত্ব বিশ্লেষিত, বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে রচিত কোন বাংলা গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ববাদ আলোচিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীব-উদ্ধারের জন্যই চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা, বৃন্দাবনদাসের মতো এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়াও তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগলতনুরূপে চৈতন্যাবির্ভাবের তত্ত্বটির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ চৈতন্যদেব ও তাঁহার বিভিন্ন ভক্তদের শাখা নির্ণয় ও অনুচর-পরিকরগণের পরিচয় দিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্ম ও সমাজের ক্রমবিকাশের স্তরপরম্পরা দেখাইয়া

দিয়াছেন। চৈতন্য, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দ—ইঁহাদের ভক্ত ও 'গণ'দের সম্বন্ধে তিনি অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। ইহাতে কবি দুই একটি নূতন কাহিনী যোগ করিয়াছেন, পুরাতন কাহিনীর নূতন রূপ দিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। এই অংশের কাহিনীর মধ্যে কাজী-দলন ও কাজী-উদ্ধার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তত্ত্বের দিক দিয়া প্রথম হইতে চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিশেষ মূল্যবান। কারণ এই চারিটি পরিচ্ছেদে তিনি স্বরূপদামোদর-সনাতন-রূপ গোপাল ভট্ট-জীব গোস্বামী প্রবর্তিত ও ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবতত্ত্বদর্শন ও রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বকে যথাসম্ভব সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পর্বেই (৮ম পরিচ্ছেদ) কবি সংক্ষেপে গ্রন্থরচনা ও নিজের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছেন।

মধ্যলীলায় মোট পঁচিশটি পরিচ্ছেদ আছে, সুতরাং এই পর্বটি আকারে প্রথম পর্ব অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। কাহিনীর দিক হইতে এই অংশের বিস্তার অল্প নহে। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ, রাঢ়দেশ ভ্রমণ, নীলাচলে গমন, সার্বভৌমকে স্বমতে আনয়ন, দক্ষিণ ভারত যাত্রা, রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব আলোচনা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, পরে বৃন্দাবনে যাত্রার পূর্বে রাঢ়দেশে পুনরায় আগমন, গৌড় হইতে বৃন্দাবন যাত্রা, কাশীতে কিছুকাল অবস্থান, পরে ব্রজমণ্ডলে উপস্থিতি, বৃন্দাবনধামকে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা, প্রত্যাবর্তনের পথে স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে মিলন, এবং নীলাচলে প্রত্যাবর্তন—এই পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বর্ণিত হয় নাই, ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাও খুব বিস্তারিত নহে। সে দিক হইতে কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতের তথ্যগত গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তথ্য বা কাহিনীর জন্য মধ্যলীলার গৌরব নহে। ইহাতে কৃষ্ণদাস বিস্তারিত আকারে গৌড়ীয় ভক্তিবাদ, রাগানুগা ভক্তির ক্রম ও নীতি-আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পর্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার ও তাঁহাকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদে আনয়ন, অষ্টম পরিচ্ছেদে গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও রসপর্যায় ব্যাখ্যা, বিংশ-চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনকে উপদেশের ছলে মহাপ্রভু কর্তৃক জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় রহিয়াছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, চৈতন্যদেব মূলতঃ ভক্ত ও ঈশ্বর-প্রেমিক 'বিরক্ত' সন্ন্যাসী ছিলেন, ঠিক তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ছিলেন না।

বাসুদেব সার্বভৌম এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও রসালাপে তিনি কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন 'কড়চা' নাই। তবে প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক বাসুদেব ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর সেবক হইয়াছিলেন, এবং সুখ্যাত পণ্ডিত, রসিক ভক্ত অভিজাতবংশীয় রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে দেবতাবৎ ভক্তি করিতেন, ইহা মিথ্যা নহে। বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌমকে চৈতন্যদেব প্রেমিক ভক্তে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন; তবে সূক্ষ্ম দার্শনিক তর্কবিতর্কের দ্বারা, অথবা প্রেমপূত ভক্তি আচরণের দ্বারা—কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে বাসুদেব সার্বভৌম ভক্তিপথের পথিক হইলেন, তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে। চৈতন্যভক্ত কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবকে সুতার্কিক, প্রাজ্ঞ, দার্শনিক ও তাত্ত্বিকরূপে অঙ্কিত করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বাসুদেব সার্বভৌমের মতো ভারতবিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত অতি সহজে অদ্বৈতবাদ ত্যাগ করিয়া চৈতন্যপন্থী হইয়া রাধাকৃষ্ণ ভজিবেন, ইহা পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে তিনি চৈতন্যদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার পাবনী চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন—এইমাত্র।[১১৫] বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্য প্রভাবে অদ্বৈতবাদ ত্যাগ করিয়া দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন —ইহা ঐতিহাসিক সত্য। প্রথমে বাসুদেব এই উন্মাদ বাউল সন্ন্যাসীকে বেদান্ত সম্বন্ধে অবহিত করিতে সচেষ্ট হইলেন :

বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥

সাতদিন চৈতন্যদেব সার্বভৌমের নিকট নীরবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন, কোন বাদপ্রতিবাদ করিলেন না। অষ্টম দিন সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে প্রশ্ন করিলেন :

---

১১৫ "In the orthodox accounts, however, it appears that the great Vedantist was not fully convinced by the metaphysics of the young enthusiast, but that he was finally overpowered when Caitanya revealed himself to his vision as the divine Krishna. Apart from miracles, what probably happened was that Sarbabhauma was finally won over from the path of dry doctrines to that of passionate devotion, not so much by theological arguments as by the irresistible appeal of Caitanya's impassioned religious personality". Dr. S. K. De—*Vaishnava Faith & Movement* (p. 66). ডঃ দে-র এই সিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ শেষের কয় পংক্তি যে নিতান্তই অনুমান মাত্র, ইহাকে প্রমাণ হিসাবে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কিনা বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি ॥

তদুত্তরে মৌন সন্ন্যাসী যাহা কহিলেন তাহা বাসুদেবের পক্ষে মর্মান্তিক। চৈতন্যদেব বলিলেন, বেদান্তসূত্রের অর্থ তো জলের মতো পরিষ্কার, তাহাতে বুঝিবার কোন গোল নাই। কিন্তু সার্বভৌম যে টীকাভাষ্য করিতেছেন তাহাতেই গোল বাধিয়াছে—এক কথায় বাসুদেব বেদান্তসূত্রের অপব্যাখ্যা করিতেছেন :

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ে ত বিকল ॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন ॥
... ...। ... ...
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন ॥

চৈতন্যদেব বলিলেন যে, ঈশ্বর নিরাকার ও নির্বিশেষ—ইহা শ্রুতির যথার্থ অর্থ নহে—"প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন।" তাঁহার সার সিদ্ধান্ত :

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
... ...
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

তাই মহাপ্রভু সার্বভৌমকে প্রশ্ন করিলেন :

ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥

ব্রহ্মের তিন শক্তি—পরা, অপরা, মায়া। ঈশ্বরের স্বরূপ তিনিটি—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ অর্থাৎ ঈশ্বরের নিত্য অস্তিত্ব, চিৎ অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানময়তা, আনন্দ অর্থাৎ ঈশ্বর সতত আনন্দময়। তাঁহার চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি

তিনভাগে প্রকটিত করিয়াছে। আনন্দ-স্বরূপশক্তি 'হ্লাদিনী', সৎ-স্বরূপ-শক্তির নাম 'সন্ধিনী' এবং চিৎ-স্বরূপশক্তির নাম সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান। তিনি মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। গীতাতে জীবকে ঈশ্বরের শক্তি বলা হইয়াছে। বাসুদেব সার্বভৌম কিনা সেই ঈশ্বর ও শক্তিকে অদ্বয়সম্পর্কযুক্ত করিতে চাহেন—"হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে?" বৌদ্ধেরা বেদ মানে না—তাহারা নাস্তিক। কিন্তু বেদকে আশ্রয় করিয়াও যাহারা কার্যতঃ নাস্তিক্যবাদ গ্রহণ করে তাহারা তো বৌদ্ধেরও অধম। তাই চৈতন্যদেব সুকঠোর ভাষায় বলিলেন, "মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।" 'পরিণাম'বাদই হইল বেদান্ত সূত্রের যথার্থ অর্থ। জগৎ ঈশ্বরের পরিণাম বা বিকার—ইহারই নাম পরিণামবাদ। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ পাদে "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" এই ২৬শ সূত্রের অর্থ হইল পরমাত্মা বা ব্রহ্ম নিজেকেই জগৎরূপে পরিণত করিয়াছেন, অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি বা বিকার। কিন্তু বাসুদেব পরিণাম-বাদ ছাড়িয়া একটা মনগড়া 'বিবর্তবাদ' বা ভ্রমাত্মকবাদে যাইতে চাহেন। বিবর্তবাদের অর্থ—"অবস্থান্তর-ভাবস্তু বিবর্তো রজ্জু-সর্পবৎ" ('পঞ্চদশী'), অর্থাৎ কোন বস্তু অন্যরূপ অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়াও অন্য অবস্থা প্রাপ্তের ন্যায় বোধ হইলে তাহাকে 'বিবর্ত' বলে—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। তাই মহাপ্রভু বাসুদেবকে বলিলেন, "পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।" বিবর্তবাদ স্বকপোল-কল্পিত ভ্রমবাদ মাত্র, "বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।" কিন্তু বাসুদেব সহজে হটিলেন না, অনেক তর্কবিতর্ক করিলেন। দুঃখের বিষয় কৃষ্ণদাস বাসুদেবের তর্কের ধারার বিশেষ কোন পরিচয় দেন নাই, দিলে পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের যুক্তিবাদের তুল্যমূল্য বিচার করা যাইত। চৈতন্যদেব শেষ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিলেন :

ভগবান 'সম্বন্ধ', ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম 'প্রয়োজন', বেদে তিন বস্তু কয়॥

সম্বন্ধ হইলেন ভগবান, অভিধেয় হইল সাধনভক্তি এবং প্রয়োজন হইল ভগবৎ-প্রেম—ইহাই পুরুষার্থ। তাই তিনি বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

ভট্টাচার্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরম পুরুষার্থ হয়॥

বাসুদেবের অদ্বৈততত্ত্ব ও জ্ঞানবাদ শিথিল হইল, তিনি পরম ভক্ত ও প্রেমিক

হইয়া

অশ্রু স্তম্ভ স্বেদকম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি ॥

এবং পরিশেষে শ্রীচৈতন্যের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিলেন :

জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্প কার্য
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য ॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥

কৃষ্ণদাস বর্ণিত এই আখ্যানে তর্কজীবী ও বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী বাসুদেব সার্বভৌমের কৃষ্ণভক্তি গ্রহণের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু কিছু ভক্তির আতিশয্য থাকিলেও বাসুদেব তর্কে পরাভূত হইয়া চৈতন্যের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই পরিচ্ছেদে বেদান্তসূত্রের দ্বৈতবাদী তত্ত্বনিরূপণ, জীব ও ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা কৃষ্ণদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তিকেই সরলভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন।

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান্। এই পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রসতত্ত্ব ও রসপর্যায়ের সুবিস্তারিত আলোচনা স্থান পাইয়াছে। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়া গোদাবরীতীরে প্রসিদ্ধ রাজকর্মচারী, পণ্ডিত ও রসিক রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হন। নীলাচলে বাসুদেব সার্বভৌম মহাপ্রভুর প্রেম ও রসের তৃষ্ণা মিটাইতে না পারিয়া পরমভক্ত ও রসিক পণ্ডিত রায় রামানন্দের নাম করেন। দৈবক্রমে রায় রামানন্দের সঙ্গে গোদাবরী তীরে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইল, পরস্পরে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তারপর চলিল রসতত্ত্বের আলোচনা ও নিবিড় আস্বাদনের পুলকানুভূতি। চৈতন্যদেব পণ্ডিত-রসিক রামানন্দের মুখ হইতে ঠিক কথাটি বাহির করিয়া লইবার জন্য 'বাকোবাক্যের' সাহায্য লইলেন। দুই জনে রহঃস্থানে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু রায়কে সাধ্যসাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। রায় রামানন্দ প্রথমে মূল রহস্য হাতছাড়া করিলেন না, শাস্ত্রমার্গ ধরিয়া বাঁধা পথে চলিতে লাগিলেন। স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে সর্ব কর্মার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর প্রেম লাভ হয়—রায় রামানন্দের এই সমস্ত চিরাচরিত স্মার্ত পন্থা মহাপ্রভু সরাসরি নাকচ করিয়া দিলেন, "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" তখন রায় একটু একটু করিয়া

স্বতা ছাড়িতে লাগিলেন—"রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার।" এইবার প্রভু বলিলেন, "এহো হয় আগে কহ আর।" তখন আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল। রায় প্রেম-ভক্তির কথা ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। দাস্য-প্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম প্রভৃতির সোপান পার হইয়া রায় রামানন্দ শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌছিলেন,—"রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।" পরে তিনি তত্ত্বদর্শনের পটভূমিকায় এই কান্তাপ্রেমের ব্যাখ্যা করিলেন :

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তারতম ॥
পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি রস। ইহার মধ্যে পূর্বপূর্ব-রসের গুণ পরের রসেও দেখা যায়। যেমন শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে ও বাৎসল্যের গুণ মধুরেও দেখা যায়। শান্তের গুণ একটি, দাস্যের গুণ দুইটি, সখ্যের গুণ তিনটি, বাৎসল্যের গুণ চারিটি ও মধুরের গুণ পাঁচটি।—এই রূপ পর পর বাড়িয়া বাড়িয়া মধুরে পাঁচটি গুণ বর্তিয়া থাকে। তাই রামানন্দ বলিলেন :

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥

কিন্তু মহাপ্রভু আরও জানিতে চাহেন, এখনও যে শেষ কথাটি বলা হয় নাই :

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥

রায় রামানন্দ বিস্মিত হইলেন; যে ইহার পরের অবস্থা জানিতে চাহে সে কিরূপ ব্যক্তি !

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এত দিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥

এইবার রায় শেষ কথাটির ইঙ্গিত দিলেন—"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য-

শিরোমণি।" তখন দুইভক্তে নিরালায় বসিয়া রাধা প্রেমের রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। ইহা যে রূপগোস্বামী-কথিত "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ"— "সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।" তাহারই অপূর্ব আলোচনা মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে অসাধারণ রসজ্ঞতা ও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান"—ইহা যথার্থ বটে, তেমনি একথাও সত্য—

আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥

এই কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি—ইহার প্রভাবে বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্যময় ধামের সৃষ্টি। মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং পরিচালিত হইতেছে; ইহা কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না, বাহিরেই থাকিয়া যায়—তাই ইহা বহিরঙ্গা শক্তি। জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তির প্রভাবে জীবসমূহে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে। সর্বজীবেই এই জীবশক্তি বিরাজমান। ইহাকে তটস্থা শক্তি বলে; কারণ তট যেমন জল ও স্থল উভয়কে স্পর্শ করে, সেইরূপ এই জীবশক্তি চিৎশক্তির স্পর্শে কতক জীবকে কৃষ্ণবিষয়ে উন্মুখ করে এবং মায়াশক্তির স্পর্শে কতক জীবকে-বা বহির্মুখ কর। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির (চিচ্ছক্তি) তিন রূপ :

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥
... ...
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম রস 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥

কিন্তু মহাপ্রভু কি এইখানেই সন্তুষ্ট হইলেন? "প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।" রায় বলিলেন, প্রেমবিলাস-বিবর্তের কত ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাতেও তোমার সুখ হইল না? তখন তিনি স্বরচিত একটি পদ গান করিয়া প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্বের ইঙ্গিত দিলেন :

পহিলহিঁ রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহুমন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন।
দুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥

এইপদটি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে মাথুরের পদ, রাধামোহন ঠাকুরের মতে কলহান্তরিতার পদ।* কৃষ্ণবিরহে রাধা দূতীকে বলিতেছেন—কৃষ্ণের নয়ন-কটাক্ষে তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেই অনুরাগ দিন দিন বাড়িয়াই চলিল; তাহার যেন অবধি নাই, সীমা নাই। তাঁহাকে আমি আমার নায়ক বলিয়া ভাবি নাই, তিনিও আমাকে তাঁহার নায়িকা বলিয়া ভাবেন নাই, অর্থাৎ দুইজনের পৃথকসত্তা যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল, মদন আসিয়া আমাদের দুইজনের মনকে পেষণ করিয়া এক করিয়া ফেলিল। তাই শ্রীরাধা দূতীকে বলিয়া পাঠাইতেছেন, হে সখি, কানুর কাছে আমাদের এই প্রেমের কথা বলিও, কিছুই ভুলিও না।' সেদিন আমরা কোন দূতীর সাহায্য লই নাই, অন্য কাহাকেও খুঁজি নাই, দুইজনের মিলনে মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন পঞ্চবাণ। আজ আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ নাই; তাই এখন দূতী খুঁজিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। সুপুরুষের প্রেম এই রূপই বটে!

রাধার এই অভিমান-ধিক্কারের মধ্যে 'না সো রমণ না হাম রমণী'—রামানন্দ-গীত এই বাক্যাংশেই মহাপ্রভু ব্যাকুল হইয়া "প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল"। তার পর মহাপ্রভুর অনুরোধে রামানন্দ 'কৃষ্ণপ্রেমা' লাভের কথা ব্যাখ্যা করিলেন, কৃষ্ণলীলায় সখীর ভূমিকার গুরুত্ব বিস্তারিত ভাবে বুঝাইলেন, এই সখীভাব বা গোপীপ্রেম কৃষ্ণরতি লাভের উপায়।

*নবম অধ্যায়ে 'রাধাকৃষ্ণপদাবলীর পালাপর্যায়' 'মাথুর', 'কলহান্তরিতা' প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

এই রূপে পরস্পরে কৃষ্ণকথারসে মত্ত হইয়া রহিলেন। শ্রীচৈতন্য রায়-রামানন্দকে কৃষ্ণপ্রেমরসে অতিশয় আসক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু রায় মহাপ্রভুর আত্মগোপন-প্রয়াসী চাতুরী ধরিয়া ফেলিলেন। স্বয়ং চৈতন্যদেব যে রাধাকৃষ্ণের যুগলতনু, তাহা রসজ্ঞ রায়ের কাছে লুকানো রহিল না।

রায় কহে, প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥

ভক্তের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট রামানন্দকে নিজ যুগলরূপ দেখাইলেন, রায় আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন চৈতন্যদেব রামানন্দকে এই নিগূঢ় কথা গোপন রাখিতে বলিলেন :

মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥
গৌর-অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্যরস করি আস্বাদন॥
তোমার ঠাঁই আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সব মর্ম॥
গুপ্তে রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুলচেষ্টা লোক-উপহাস॥
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥

ঠিক এই কথাগুলি চৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে বলিয়াছিলেন কিনা, তাহা প্রশ্ন নহে; প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের মতো কৃষ্ণদাস কল্পনা ও ঘটনাকে মিশাইয়া দিয়া যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কবিরাজ-গোস্বামী মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের রসের পর্যায়, রাধাপ্রেম ও সখীসাধনা সম্পর্কে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পরবর্তী কালের বৈষ্ণবধর্ম, তত্ত্ব ও সমাজকে সংহত আকার

দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। একথা অবশ্য ঠিক, কৃষ্ণদাস কবিকর্ণপূর, স্বরূপ-দামোদর ও রূপ গোস্বামীর গ্রন্থ হইতে এই সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু সমস্ত উপাদানকে তিনি যে-ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মননশক্তি ও দার্শনিকতাব উচ্চ প্রশংসা করিতে হয়।

চৈতন্যচবিতামৃতের অন্ত্যলীলা বিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই অন্ত্য-লীলাকে সুবিস্তৃত আকারে বর্ণনা করাই ছিল বৃদ্ধ কবিরাজের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। চৈতন্যদেবেব শেষ বাবো বৎসর প্রায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিযাছে। কবিবাজ-গোস্বামী মহাপ্রভুব সেই অপার্থিব ও ভাগবত জীবন-কথাব গূঢ় বহস্য ব্যাখ্যা ও আস্বাদন কবিতে চাহিয়াছিলেন। এই খণ্ডেব বিশটি অধ্যায়েব মধ্যে মোট শেষেব সাতটি অধ্যায়ে (চতুর্দশ-বিংশ পবিচ্ছেদ) এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় পযন্ত বর্ণিত অংশে কিছু কিছু ঘটনাব উল্লেখ থাকিলেও শেষ অধ্যাযগুলিতে ঘটনা অপেক্ষা মহাপ্রভুব প্রেমাবেগই অবিকতর ফুটিযাছে। প্রথম হইতে ত্রয়োদশ অব্যায পযন্ত কিছু কিছু ঘটনাকাহিনী, ভক্তদেব কথা, গৌড়ীয় ভক্তদেব নীলাচলে আগমন ও মহাপ্রভুব সঙ্গে মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্দশ পবিচ্ছেদ হইতে মহাপ্রভুব যথার্থ দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হইযাছে।

উন্মত্তের প্রায প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নানভোজনকৃত্য ॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দেরে লইয়া।
আপন মনের কথা কহে উঘাড়িযা ॥

এই ভাবে মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তের মতো রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময় রায় রামানন্দ ভক্তির শ্লোক পড়িতেন, স্বরূপ গোঁসাই কৃষ্ণলীলা গান করিতেন, তখন মহাপ্রভু একটু শান্ত হইয়া শয়ন করিতেন। কখনও তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেন, কখনও তাঁহার দেহে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইত, অল্প চেতনার পরই তিনি আবার ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হইতেন, কখনও ভাবাবেশে মনে মনে কৃষ্ণের গোপীলীলা প্রত্যক্ষ করিতেন—কখনও রাধাভাবের আবেশে অভিমানে কৃষ্ণকে বলিতেন :

সব ত্যজি ভজি যাঁরে যে আপন হাতে মারে
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।

তাঁর লাগি আমি মরি উলটি না চাহে হরি
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়।।
কৃষ্ণে কেনে করি রোষ আপন দুর্দ্দৈব দোষ
পাকিল এ মোর পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তাঁরে হৈল উদাসীন
এই মোর অভাগ্য প্রবল।।

এই দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা দিয়া কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর কৃষ্ণার্তির গভীরতা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। চৈতন্যের শেষজীবন চেতন-অচেতন অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছে। কবি কৃষ্ণদাস সেই মহাভাবের কথা অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তগণের চৈতন্যের শেষ জীবনের অপার্থিব লীলাকাহিনী শুনিবার বাসনা ছিল; কৃষ্ণদাস কবিরাজ সে বাসনা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। এই জন্য তিনি বৈষ্ণবসমাজে অতিশয় মান্য, বাংলা সাহিত্যেও তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। চৈতন্যদেবের শেষজীবনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, কৃষ্ণের প্রতি তদেকাত্ম আবেগ-অনুভূতি এবং কৃষ্ণরসে সমস্ত সত্তার বিলুপ্তির বর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার প্রয়োজন। কৃষ্ণদাস সেই দুর্লভ কবিপ্রতিভার অধিকারী। কারণ যাহা ব্যাখ্যাতীত, সূক্ষ্মতম ও অশরীরী—মহাপ্রভুর সেই দিব্যোন্মাদ মনোভাবকে বৃদ্ধ কবিরাজ-গোস্বামী আশ্চর্য তীক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকতা ও অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১১৬] যদিও কবি গ্রন্থশেষে সবিনয়ে বলিয়াছেন :

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান।।
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে, মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির।।
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি।।

তবু বৃদ্ধ জরাতুর কবি যে অতন্দ্র নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম মননশীলতা ও সংহত বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং যে-ভাবে ইতিহাস, রসতত্ত্ব ও দর্শনকে একসূত্রে মিলাইয়া

১১৬ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থ বলিয়াছেন—'চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা রসিকজনের চিত্তহারী, কবিগণের কল্পলোক ও সাধক-ভক্তের কণ্ঠহার।"—চৈ. চ. উপা. পৃ. ৪০০

দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিতে হইবে; আধুনিক কালেও বাঙলাদেশে তাঁহার মতো অসাধারণ প্রতিভা লইয়া কয় জনই-বা জন্মিয়াছেন?

কৃষ্ণদাসের কবিত্ব ॥ উপসংহারে কবিরাজের কবিত্ব সম্পর্কে দুই এক কথা বলা যাইতে পারে। বাংলা গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে কৃষ্ণদাস সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে—ত্রয়োবিংশ সর্গে সমাপ্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সংক্রান্ত কাব্য 'গোবিন্দলীলামৃত' এবং (লীলাশুকের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র টীকা 'সারাঙ্গ-রঙ্গদা') রঘুনাথ দাসের 'মুক্তাচরিতে' কৃষ্ণদাসকে 'কবিভূপতি' বলিয়া বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। তাই মনে হয় রঘুনাথ দাসের 'মুক্তাচরিত' এবং রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র পূর্বে তাঁহার 'গোবিন্দ-লীলামৃত' রচিত হইয়াছিল। তেইশ সর্গে বিভক্ত এবং ২৪০৮ শ্লোকে সম্পূর্ণ এই বৃহৎ কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও অষ্টকালিক লীলা প্রচুর পাণ্ডিত্য সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।[১১৭] চৈতন্যচরিতামৃত রচনাকালে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় এত বড় একখানা গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক জীবনীকাব্য রচনা যে কিরূপ দুরূহ তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কবি প্রায় সমস্ত জীবনটাই ব্রজমণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন, কাজেই এই কাব্যের দুই এক স্থলে দুই চারিটি ব্রজভাষার শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া এই মন্তব্যও মানিয়া লওয়া যায় না: "His long residence outside Bengal, as well as his greater familiarity with languages other than Bengali, is perhaps responsible for its quaint and laboured

[১১৭] অবশ্য আধুনিককালের সমালোচক এই কাব্য সম্বন্ধে বলিতে পারেন, "Whatever may be its value to the devotee of the faith, the stupendous work is not a poem, but a poetical curiosity ot Sastric knowledge, legendary lore, salacious fancy, technical facility and uninspired ingenuity." (Dr. S. K. De, *Vaishnava Faith & Movement*, p. 459).

diction."[১১৮] বৃদ্ধ বয়সে কবি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া জীবনীর ছাঁচে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও রসতত্ত্বের যে সুনিপুণ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ 'prosiness'[১১৯] থাকিলেও, ইহার বহু স্থলে উৎকৃষ্ট কাব্য-লক্ষণ আছে, বিশেষতঃ আবেগব্যাকুল ত্রিপদীগুলির কাব্যমূল্য স্বীকার করিতে হইবে। এখানে এইরূপ কয়েকটি উৎকৃষ্ট ত্রিপদীর কিয়দংশ উদাহরণ স্বরূপ উল্লিখিত হইতেছে :

১। সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কেলুঁ প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত
এবে যায়, না রহে পরাণ।।
অগ্নি যৈছে নিজ ধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখসমুদ্রেতে ডারে।।

২। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য়।।

৩। কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।।
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়।।

---

[১১৮] দীনেশচন্দ্রও কৃষ্ণদাসের ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে বলিয়াছেন, "তাঁহার ভাষা হিন্দীর সঙ্গে মিশিয়া খিচুড়ী হইয়া গিয়াছিল" ('গোবিন্দদাসের কড়চা'র ভূমিকা)। কোন্ যুক্তির বলে দীনেশচন্দ্র এরূপ অদ্ভুত মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। চৈতন্যচরিতামৃতে মাঝে মাঝে দু'চারিটি 'ব্রজভাষা'র শব্দ (হিন্দী নহে) থাকিলেও তাহাকে 'খিচুড়ীভাষা' বলিলে ভাষাজ্ঞানের অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে।

[১১৯] Dr. S. K. De—Ibid.

৪। নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ দলিতাঞ্জন চিক্কণ
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমারগণ হরে সবার নয়ন
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি, কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক মোর নেত্রচাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥

উল্লিখিত ত্রিপদীগুলি বিচার করিলেই কবিরাজের প্রশংসনীয় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। অবশ্য একথা ঠিক, সূক্ষ্ম দর্শন ও তত্ত্বব্যাখ্যায় কৃষ্ণদাস যে পয়ারগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্বত্র সুশ্রাব্য হয় নাই, ছন্দ ও ভাষারও কিছু কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যায় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ স্থাপনে তিনি যদি পল্লবিত কবিত্বের কারুকর্ম ফলাইতে যাইতেন, তাহা হইলে এ গ্রন্থ মহৎ সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত কি? গদ্যভাষা ছাড়া ছন্দে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা অতিশয় দুরূহ, আধুনিক ভাষায় প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। কবিরাজ অতিশয় দুরূহ কর্মে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতি বৃদ্ধাবস্থায় রোগজীর্ণ শরীরে কবি যে-ভাবে চিন্তাত্মক গদ্যময় বিষয়কে কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ মনীষা, সৃজনীশক্তি ও কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত হইয়াছে। দুরূহ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যার সময় তিনি যথাসম্ভব পরিমিত স্বল্পাক্ষর গাঢ়বন্ধ বাক্‌রীতি ব্যবহার করিযাছেন। স্থানে স্থানে তাঁহার উক্তি প্রায় 'সূক্তি'র আকারে বাংলা সাহিত্যে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ দুই একটি 'সূক্তি'র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে:

১। এহো বাহ্য আগে কহ আর।

২। দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাঁহা করি যে গণন॥

৩। পরকীয়া ভাব অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

৪। কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তম, প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥

৫। অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।

উল্লিখিত পয়ারবন্ধগুলিতে কৃষ্ণদাসের নিপুণ রচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। কবিত্ব শক্তিতে কবিরাজ গোস্বামী কিঞ্চিৎ ন্যূন—এরূপ একটা অমূলক কথা চলিয়া আসিতেছে। বৃন্দাবনদাস বা লোচনদাসের গীতোচ্ছলতার সঙ্গে কৃষ্ণদাসের ঈষৎ গাঢ় রচনার তুলনা দিয়াই বোধ হয় এইরূপ অভিমত জ্ঞাপন করা হয়। কৃষ্ণদাসের রচনার বহু স্থলে উৎকৃষ্ট লীরিক মাধুর্য আছে (পূর্বে উদ্ধৃত ত্রিপদীগুলি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও তিনি উৎকৃষ্ট রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মননধর্মী তত্ত্বকথাকে এরূপ কাব্যত্বের সঙ্গে পয়ারত্রিপদীর বাঁধনে বাঁধিয়া রাখার নিপুণতা অন্য কোন বৈষ্ণবচরিতকার দেখাইতে পারেন নাই। বৃন্দাবনদাস বিবৃতিমূলক রচনা ও ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টিতে যতই কৃতিত্ব দেখান না কেন, এরূপ দুরূহ দার্শনিকতাকে কাব্যে রূপ দিতে পারিতেন না। বৈষ্ণব সাহিত্যে গীতিরসসিক্ত ও ভক্তিভারার্দ্র পদ প্রচুর আছে, আবেগধর্ম বাঙালীর অনেকটা স্বভাবধর্ম বলিয়া এরূপ রচনায় তাহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ও পটুত্ব দেখা যায়। কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শন বিশ্লেষণ এবং সেই তত্ত্বকে পয়ারত্রিপদীর নমনীয় রচনার মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া যে কত দুরূহ তাহা কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সঙ্গে অন্যান্য চৈতন্যজীবনীকাব্য মিলাইয়া পড়িলেই বুঝা যাইবে। কোন এক সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্যের ভাবকে আস্বাদন করিয়া যদি সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া আর গতি নাই।"[১২০] তাই এই মহাগ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজের উপনিষদ রূপে আজ তিনশত বৎসর ধরিয়া শ্রদ্ধাভরে পঠিত হইতেছে। কিন্তু সম্প্রদায়গত প্রভাব ছাড়িয়া দিলেও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এ গ্রন্থ অবিস্মরণীয় কীর্তি বলিয়াই

---

১২০ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

গণ্য হইবে ; বাঙালীর মনন, দর্শন, তত্ত্বজ্ঞান ও রসবোধের এরূপ বিপুল পরিচয় আধুনিক যুগেও খুব সুলভ নহে।

গোবিন্দদাসের কড়চা ॥

"বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' ও গোবিন্দদাসের কড়চা লইয়া যত আলোচনা ও আন্দোলন হইয়াছে এত আর অন্য কোন গ্রন্থ লইয়া হয় নাই।"[১২১] ডঃ মজুমদারের এই মন্তব্য অতিশয় যথার্থ, বরং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা গোবিন্দদাসের কড়চা লইয়া অধিকতর ঘোঁট পাকাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রামাণিকতা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কাব্যের রুচিবোধ লইয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে, বড়ু চণ্ডীদাসকে শুধু তাহার জন্য বিচারের কাঠ-গড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছে। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে আর বাংলা সাহিত্য হইতে সরাইয়া রাখিবার উপায় নাই ; রাখিলে আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও বাংলাভাষার দৃষ্টান্তই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু গোবিন্দদাসের কড়চা সম্বন্ধে নানা সংশয় তুলিয়া সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বিষম গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিয়াছেন। এ গ্রন্থটি আদৌ প্রামাণিক ও পুরাতন নহে, ইহা একখানা অর্বাচীন গ্রন্থ, আধুনিককালের কোন ব্যক্তির রচনা—অধুনা সাহিত্যিক সমাজে এ মতবাদটি প্রায় সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্য আমরা মহাপ্রভুর জীবনীপ্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের কড়চার কিছু বিস্তারিত আলোচনা করিবার প্রয়াসী।

কড়চার পুঁথি ও মুদ্রণ ॥ ১৮৯৫ সালে (১৮১৭ শক) কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী হইতে 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম-ভারত ভ্রমণ বিষয়ক পয়ারছন্দে রচিত একখানি নাতিদীর্ঘ কাব্য প্রকাশিত হইলে বাঙলার সাহিত্য সমাজে যতটা আলোড়ন উঠা সম্ভব ছিল, তখনও ততটা আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্ক উদ্দাম হইয়া ওঠে নাই—যদিও তখন প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকেই কৌতূহলী ও অবহিত হইয়াছিলেন। অবশ্য প্রাচীন পুঁথির মুদ্রণবিশুদ্ধি ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কাহারও

---

[১২১] ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—চৈ. চ. উপা.

বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এই সময়ে ১৮৯৫ সালে শান্তিপুর নিবাসী স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত অদ্বৈতবংশীয় জয়গোপাল গোস্বামী কর্তৃক 'গোবিন্দদাসের কড়চা' প্রকাশিত হইল। কিন্তু প্রকাশের পূর্ববর্তী ইতিহাস আছে।

কড়চা প্রকাশের দুই বৎসর পূর্বে ১৮৯৩ সালে কার্তিক মাসের 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় পরমবৈষ্ণব শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় সর্বপ্রথম গোবিন্দদাস রচিত এই কড়চার কথা ঘোষণা করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। জয়গোপাল গোস্বামী বৈষ্ণব বংশাবতংস, উপরন্তু নিজেও সুলেখক ছিলেন। শান্তিপুরের আর একজন অধিবাসী ও বৈষ্ণবধর্মানুরক্ত কালিদাস নাথ একদা জয়গোপালের নিকট কয়েকখানি পুঁথি লইয়া আসেন। তন্মধ্যে 'গোবিন্দদাসের কড়চা' ও 'অদ্বৈতবিলাসে'র প্রাচীন পুঁথিও ছিল। গোস্বামী মহাশয় কালিদাসের নিকট পুস্তক দুইখানি দেখিতে চাহেন, কিন্তু অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর জয়গোপালকেও "কালিদাস প্রথমতঃ পুস্তক দুইখানি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করেন।"[১২২] যাহা হোক গোস্বামীজীর সনির্বন্ধ অনুরোধে পুঁথি দুইখানি নাথ মহাশয় তাঁহার নিকট রাখিয়া যান। জয়গোপাল অতি দ্রুত নকল করিতে পারিতেন। তিনি কয়েকদিনের মধ্যে উক্ত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' ও 'অদ্বৈতবিলাসে'র প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হইতে দুইখানি অনুলিপি প্রস্তুত করেন, কিন্তু এই গ্রন্থকে কোথাও আলোচনা বা প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র শিশির কুমার ঘোষ তখন আধুনিক শিক্ষিত বৈষ্ণবভক্ত বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয়গোপাল শিশিরকুমারকে গুণগ্রাহী ও চৈতন্যভাবরসিক জানিয়া উক্ত কড়চার কপি করা কয়েক পৃষ্ঠা (প্রায় দুই ফর্মার মতো) শিশিরকুমারকে দেখিতে দিলেন, শিশিরকুমার ঐ পত্রগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন এবং সাতদিনের মধ্যেই রেজেষ্টারি ডাকে উহা গোস্বামী মহাশয়কে ফিরাইয়া দিবার অঙ্গীকার করিলেন। ইতিমধ্যে ঐ পৃষ্ঠাগুলি তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র *Rais and Ryot* পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিশিরকুমারের নিকট হইতে পড়িবার জন্য গ্রহণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহা তিনি হারাইয়া

---

১২২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত "গোবিন্দদাসের কড়চা উদ্ধারের ইতিহাস" পঠিতব্য।

ফেলেন। তখন জয়গোপাল গোস্বামী হতাশ হইয়া পড়িলেন। কারণ কালিদাস নাথ যাহাদের নিকট হইতে মূল পুঁথিখানি পাইয়াছিলেন, জয়গোপাল কপি করিয়া লইবার পর তাহা পুঁথির মালিকদের ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরে অনুসন্ধান করিয়া এই পুঁথির খোঁজ পাওয়া গেল না, যাঁহাদের পুঁথি, তাঁহাদের কবল হইতে পুঁথিখানাকে আর বাহির করা সম্ভব হইল না। গোস্বামী মহাশয় এখন খণ্ডিত পুঁথির নকলটিকে কেমন করিয়াই বা প্রকাশ করিবেন? এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। ইহার অল্পদিন পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে, শান্তিপুরের পাগলা গোস্বামীদের বাড়ীতে হরিনাথ গোস্বামীর নিকট গোবিন্দদাসের কড়চার আর একখানি পুঁথি আছে। পুঁথিখানির পাঠ অতিশয় অশুদ্ধ ছিল বলিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট, "যে কিছু কিছু নোট ছিল, তাহার সহিত ঐ পুঁথির লেখা মিলাইয়া কষ্টেসৃষ্টে নষ্ট পত্রগুলির পুনরুদ্ধার করা হয়। পরে সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারির অধ্যক্ষদিগকে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। গোবিন্দদাসের কড়চা এইভাবে ১৮১৭ শকে (১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত হয়।"[১২৩] ঐ বৎসরই কার্তিকমাসে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় শিশিরকুমারের অনুজ ভক্ত মতিলাল ঘোষ এই কড়চার আলোচনা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, মুদ্রিত গ্রন্থের "কিয়দংশ যে অলীক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অলীক অংশ গোড়ার ৫০ পাতা।" গ্রন্থটি ছাপা হইবার কয়েক মাসের মধ্যেই সর্বপ্রথম মতিলাল গ্রন্থটির প্রথমাংশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনিলেন। তিনি ঐ সমালোচনায় জয়গোপাল ও গোবিন্দদাসের কড়চা সম্বন্ধে এমন কতকগুলি সংবাদ দিলেন যে, গ্রন্থটির প্রতি অনেকেরই সন্দেহ জাগ্রত হইল। মূল পুঁথিটিকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া গোস্বামী মহাশয় শিশিরকুমার এবং মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। মতিলাল এক সময়ে জয়গোপালকে নষ্ট পাতাগুলি বাদ দিয়াই কড়চা প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন। ইহাতে গোস্বামী মহাশয়ের অমত হয় নাই। হঠাৎ একদিন তিনি ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, হারানো পাতার কয়েকখানির সকল তিনি কোনও প্রকারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা মূল পুঁথির হুবহু সকল কিনা বলিতে

[১২৩] গোবিন্দদাসের কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত জয়গোপালের পুত্র বনোয়ারীলাল গোস্বামী লিখিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' উদ্ধারের কাহিনী দ্রষ্টব্য।

পারেন না। গোস্বামী মহাশয় কেন এইরূপ সংশয়পূর্ণ নকলটুকু মূল গ্রন্থের সঙ্গে মুদ্রিত করিতে সম্মত হইলেন, সে বিষয়ে মতিলাল ঘোষ বলিতেছেন "নকলটি যদি প্রকৃতই অলীক হয়, তবে উহা প্রকাশিত হইলে কোন না কোন ব্যক্তি এই ভুল ধরিয়া দিবেন, এবং এইরূপে আসলটুকু হয়তো বাহির হইয়া পড়িবে।" কিন্তু মুদ্রণের পর মতিলাল ঘোষ ছাপা অংশ (অর্থাৎ যে দ্বিতীয় ক্ষেপটুকু গোস্বামী মহাশয় কোথা হইতে স গ্রহ করিয়াছিলেন) এবং পূর্বে নকলকরা কপির মধ্যে বহু গরমিল দেখিলেন। ইতিপূর্বে গোস্বামী-প্রদত্ত অংশটুকু মতিলাল অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়িয়াছিলেন ; তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। সুতরাং ছাপা অংশ এবং তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডারে রক্ষিত অংশের সঙ্গে রীতিমতো পার্থক্য দেখিয়া তিনি সন্দিহান হইলেন : তাহা হইলে কি জয়গোপাল গোস্বামী নিজ কল্পনা ও কবিত্ব শক্তির সাহায্যে মূল পুঁথির সঙ্গে ঐক্য রাখিয়া হারানো পাতাগুলি নিজেই রচনা করিয়া গোবিন্দদাসের নামে চালাইয়াছেন? মতিলাল ঐ 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় দেখাইলেন যে, গোস্বামী বলিয়াছেন, তিনি অন্য কোথা হইতে হারানো পাতাগুলির নকল উদ্ধার করিয়াছেন—তাহা ঠিক নহে। তিনি উহা উদ্ধার করিতে পারেন নাই, উক্ত পত্রগুলি নিজের বুদ্ধি কৌশলের দ্বারাই রচনা করিয়া এই অংশটুকুও গোবিন্দদাসের মূল রচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মতিলাল আরও দেখাইলেন, মূল পাতাগুলিতে ছিল, গোবিন্দদাস কায়স্থ—কর্মকার নহেন ; পত্নীর গালি খাইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন নাই, স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁহার পুত্রবধূ সংসারের কর্ত্রী হন, এবং শ্বশুরের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতে আরম্ভ করেন। বাধ্য হইয়া গোবিন্দদাস গৃহত্যাগ করেন। কিন্তু মুদ্রিত অংশে সম্পূর্ণ ভিন্ন আখ্যান দেওয়া হইয়াছে। হারানো পাতাগুলিতে এক রজকের গল্প ছিল, কিন্তু ছাপার পর তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়। মতিলাল ঘোষ উক্ত কড়চার পাণ্ডুলিপি উত্তমরূপে পড়িয়াছিলেন, ইহার অনেক অংশ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, এই রজকের গল্প অবলম্বনে তিনি গোবিন্দদাসের কড়চা ছাপা হইয়া বাহির হইবার দুই বৎসর পূর্বেই 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় 'প্রভু ও রজক' নামক একটি আখ্যায়িকাও লিখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কথা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাঁহার মতে হারানো পৃষ্ঠাগুলি (গোড়া হইতে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত অংশ) গোস্বামী কখনই সংগ্রহ

করিতে পারেন নাই, নিজে সুলেখক ছিলেন, কয়েকখানি গদ্য ও পদ্য গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। কাজেই এই অংশটুক স্মৃতি নির্ভর করিয়া তিনি নিজে লিখিয়া গোবিন্দের নামে চালাইয়াছিলেন। মতিলালের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে অনেকেই জয়গোপাল প্রকাশিত মূল পুঁথি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কারণ তখন শিক্ষিত মহলে ও বৈষ্ণব সমাজে মতিলাল ঘোষ অতিশয় মান্য ছিলেন। তিনি যে একটা অলীক ও অনৃত কথা বিনা প্রমাণে প্রচার করিবেন, তাহা মনে হয় না।

গোস্বামী ও তাঁহার প্রকাশিত কড়চাকে কেন্দ্র করিয়া কাগজে কিছু কিছু আলোচনা ও তর্কবিতর্ক শুরু হইয়া গেল। বলা বাহুল্য এ আন্দোলনের কেন্দ্র হইল অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস। কিন্তু জয়গোপাল আর কোথাও মুখ খুলিলেন না, গ্রন্থ সম্বন্ধে একেবারে নীরবতা অবলম্বন করিলেন। অনেকের সন্দেহ বাড়িল আরও একটি কারণে। গোবিন্দদাসের কড়চার মতো একখানি দুষ্প্রাপ্য অভিনব গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া জয়গোপাল মুদ্রিত করিলেন, অথচ গ্রন্থের আরম্ভে কোন ভূমিকা যোগ করিলেন না, গ্রন্থের কিয়দংশ খোয়া যাইবার কথাও তুলিলেন না, মতিলাল ঘোষের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-আলোচনার কোন সূত্রই উল্লেখ করিলেন না।

গ্রন্থ প্রকাশের তিনবৎসর পরে ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসের *Calcutta Review* পত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'The Diary of Govindadas' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "The Ms. of the Diary was obtained from an obscure village in the Burdwan District. But unfortunately, like most Bengali mss, it has not escaped the hand of improvers, and the improvements, mostly perceptible to experts, are the clumsiest things in the whole work." যদিও শাস্ত্রী মহাশয় কড়চার কোন পুঁথি দেখেন নাই, তবু তিনি বোধহয় মতিলালের প্রবন্ধ ও আলোচনার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে, গোবিন্দদাসের কড়চার পুঁথিতে অনেক আধুনিক হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, এবং ঐ আধুনিক হস্তক্ষেপ অত্যন্ত কুৎসিত। এখানে তিনি প্রকারান্তরে জয়গোপালকে দোষী করিয়াছেন। ইতিমধ্যে যখন চারিদিকে কড়চা লইয়া প্রখর তর্কবিতর্ক শুরু হইল, তখন জয়গোপাল দীনেশ-

চন্দ্রকে সাহিত্যের ঐতিহাসিক জানিয়া একদা তাঁহার শ্যামাপুকুরস্থিত বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়া "করুণ ভাবে সমস্ত কথা জানাইয়াছিলেন।"[১২৪] দীনেশচন্দ্র এই সাক্ষাৎকারের পর অথবা অন্য কোন সময়ে সাহিত্য পরিষদে ১৯০০ সালের ৭ নভেম্বর গোবিন্দদাসের কড়চা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রামাণ্য কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।"[১২৫] এখানে দীনেশচন্দ্র প্রকারান্তরেই বলিতেছেন যে, উক্ত হারানো পাতাগুলি মুদ্রিত সংস্করণে অবশ্য গৃহীত হয় নাই, অর্থাৎ গোস্বামী মহাশয় কতক অংশ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া কন্ডূয়ন-কণ্ডূয়ন সংবরণ করিতে পারেন নাই, খুব সম্ভব নিজেই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদের উক্ত সভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। তিনিও বলেন, "গ্রন্থখানি অতি চমৎকার। তবে স্থানে স্থানে সন্দেহ হয়।" সুতরাং দেখা যাইতেছে কড়চা প্রকাশের পর ইহার কিয়দংশের প্রতি প্রাচীন সাহিত্যামোদী পণ্ডিতদের বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, গোস্বামী মহাশয় উক্ত পত্রগুলি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া একটা ছোট রকমের জালিয়াতি করিয়াছেন—কড়চার কিয়দংশ নিজে রচনা করিয়া সেটুকু মূল কড়চার অন্তর্ভুক্ত করিয়া গোবিন্দদাসের নামে চালাইয়াছেন—অনেকটা কিশোর কবি চ্যাটার্টনের মতো।

ইহার পর কেহ কেহ কড়চার স্বপক্ষেও কথা বলিলেন; যেমন 'গৌরপদ তরঙ্গিণী'র সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র, *Dacca Review* পত্রে প্রকাশিত স্টেপলটন সাহেবের প্রবন্ধ ইত্যাদি। কিন্তু এই কাব্যের তথ্যগত ভুলভ্রান্তি লইয়া ১৩১৭ সালের 'সাহিত্যে' আবার প্রখর আলোচনা শুরু হইল। বহুদিন ধরিয়া দাক্ষিণাত্যবাসী অমৃতলাল শীল 'সাহিত্যে'(১৩১৭ আষাঢ়) দেখাইলেন, কড়চায় বর্ণিত মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ অনেক স্থলেই ভুলভ্রান্তিতে পূর্ণ।

১৩৩৩ সালে দীনেশচন্দ্র সেন ও জয়গোপালের জ্যেষ্ঠপুত্র বনোয়ারীলাল গোস্বামীর যুগ্ম সম্পাদনায় 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে দুই পক্ষের লড়াই জাঁকিয়া উঠিল। ১৩৩৭ সালে 'সেবা' পত্রিকায়

---

[১২৪] গোবিন্দদাসের কড়চা, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২১

[১২৫] কিন্তু দীনেশচন্দ্র ১৩০৮ সালের 'সাহিত্যে' (আষাঢ় সংখ্যা) বলেন যে, কড়চা শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিতগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক।

যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় কড়চাকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিলেন এবং জয়গোপালের প্রতি সরাসরি অবিশ্বাস ব্যক্ত করিলেন। ১৩৪২ সালে চারুচন্দ্র শ্রীমানি 'শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণভ্রমণে' (২য় খণ্ড) গোটা কড়চাখানাকেই অলীক অসত্য বলিয়া বাতিল করিয়া দিলেন।✓

১৩৩৪ সালে মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ 'গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া দীনেশচন্দ্র ও বনোয়ারীলালকে সুকঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন এবং প্রমাণ করিতে চাহেন যে, শুধু প্রথমদিকের কিয়দংশ নহে, গোটা কড়চাখানাই একটি প্রকাণ্ড জাল-গ্রন্থ এবং জালিয়াত স্বয়ং মৃত জয়গোপাল—তস্য পুত্র বনোয়ারীলাল হইলেন 'abettor'। সুতরাং বৃদ্ধ বনোয়ারীলালও পিতার অপরাধে মৃণালকান্তির গোলাগুলির সম্মুখীন হইলেন। ঢাকা হইতে বিপিনবিহারী গুপ্ত *Govindadas's Kadcha—a Black Forgery* (1938) নামক পুস্তিকাতেও কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদকদ্বয়কে সুকঠোর ভাষায় আক্রমণ করিলেন।

১৯২৬ সালে দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঘটা করিয়া গোবিন্দদাসের কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তাহার গোড়াতে জয়গোপালের জ্যেষ্ঠপুত্র বনোয়ারীলাল গোস্বামীর সাফাই ('গোবিন্দদাসের কড়চা উদ্ধারের ইতিহাস') জুড়িয়া দিলেন, নিজেও প্রায় সত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিরাট ভূমিকা ফাঁদিয়া বলিতে চাহিলেন যে, এই গ্রন্থের আদ্যন্ত গোবিন্দদাস কর্মকার নামক চৈতন্যপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সেবকেরই রচিত, কিন্তু দুই এক স্থলে দুই একটি শব্দ বুঝিতে না পারিয়া জয়গোপাল শুধু তাহা নিজে বসাইয়া দিয়াছিলেন—প্রাচীন গ্রন্থসম্পাদকেরা সেরূপ করিয়া থাকেন। "স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় অনেক স্থলে পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে শব্দ যোজনা করিয়াছেন, কোন কোন জায়গায় কীটদষ্ট ছত্রটি বুঝিতে না পারিয়া সেই ছত্র নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছেন, একথা তিনি নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বনোয়ারীলাল গোস্বামী ও মধ্যমপুত্র মোহনলাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয়ও জানাইয়াছেন। কড়চা প্রকাশ করার সময় বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় ৪০ বৎসর বয়স্ক ছিলেন এবং তিনি তাঁহার পিতার সহায়তা করিয়াছিলেন। যে সকল স্থানে ঐরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার যতটা মনে আছে, ততটা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা পূর্বেই লিখিত

হইয়াছে, তদনুসারে বর্তমান সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।"[১২৬] দীনেশচন্দ্র জয়গোপাল গোস্বামীকে জালিয়াতিরূপ দারুণ কলঙ্ক হইতে মোচন করিবার জন্য ঐ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলিতেছেন, "পূর্বেই উক্ত হইয়াছে এইরূপ পরিবর্তন সেকালের সমস্ত পুস্তকেই হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী ও পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তকে এইরূপে পরিবর্তনের অবধি নাই। চৈতন্যামৃত বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ইহার পাঠ খুব সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইয়াছে। এজন্য ইহাতে পরিবর্তন কম দেখা যায়। তাহা সত্ত্বেও পাঠান্তর বিস্তর আছে। সেকালের সমস্ত পুস্তকেই ন্যূনাধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তখন সেই পাপে কেবল কড়চাকেই বা কেন অপরাধী করা যাইবে?" ইচ্ছাপূর্বক পাঠ পরিবর্তন করিলে পুঁথির সম্পাদক নিশ্চয়ই তর্জিত হইবেন, এবং কেন হইবেন, তাহা আমরা ইহার পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিতেছি। যাহা হোক দীনেশ-চন্দ্রের স্বীকৃতি হইতে এইটুকু অন্ততঃ বুঝা গেল যে, অদ্বৈতবংশাবতংস "অশেষ নিগ্রহ ও অকৃতজ্ঞতা-লাঞ্ছিত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত প্রভুপাদ স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাভাগ—যিনি তদীয় পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষের ছন্দানুবর্তী হইয়া ভক্তিগঙ্গার ক্ষুদ্র শাখাস্বরূপ—বিস্মৃতির বালুকাস্তরে লুক্কায়িত গোবিন্দদাসের কড়চা আবিষ্কার পূর্বক গৌরাঙ্গ ঠাকুরের নরলীলার চিত্রালেখ্য উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন"[১২৭]—কিন্তু তিনি যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং রূপে গ্রন্থটি মুদ্রিত করেন নাই, অনেক স্থলেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন—এবং ঠিক কোন কোন শব্দ বুঝিতে না পারিয়া, বা গোটা পংক্তির পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহার কোন নির্দেশ দেন নাই; কাজেই মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ আধুনিক কালের লেখকের ইচ্ছাকৃত হস্তাবলেপে যে লাঞ্ছিত, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দীনেশচন্দ্র কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনা কালে মৃত সুহৃৎ জয়গোপালের হইয়া 'ব্রিফ্' লইলেও গোস্বামীকে সমর্থন করিতে গিয়া তিনি নিজেই অযুক্তি ও কুযুক্তির জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি যাঁহারা পরবর্তীকালে চৈতন্যজীবনী লইয়া গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা ইতিহাস ও সত্যের অনুরোধেও দীনেশচন্দ্রের যুক্তিবিরোধী একগুঁয়েমির প্রতিবাদ করেন

---

[১২৬] গোবিন্দদাসের কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত দীনেশচন্দ্রের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[১২৭] কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গ পত্রে দীনেশচন্দ্র জয়গোপাল গোস্বামীকে এই ভাবে অলঙ্কার আভরণে সাজাইয়াছেন।

নাই। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতো প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্বজনশ্রদ্ধেয় গবেষকও দীনেশচন্দ্রকে সরাসরি প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ঐতিহাসিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানে' চৈতন্যের জীবন ও জীবনীতে বর্ণিত বাস্তব ঘটনার যাথার্থ্য আলোচনা করিয়াছেন। চৈতন্যের প্রামাণিক জীবনী সমূহেও, যেখানে তিনি অযথার্থ, অনৈতিহাসিক ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখিয়াছেন, সেখানে তিনি মুক্তকণ্ঠে পাঠককে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো বিরাট গ্রন্থ এবং উক্ত গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ রচনাকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকেও ডঃ মজুমদার ছাড়িয়া দেন নাই। কিন্তু তিনি 'গোবিন্দদাসের কড়চা'কে অনৈতিহাসিক ও সন্দেহজনক গ্রন্থ জানিয়াও আলোচনায় ইহার বিরুদ্ধে সেরূপ কোন তীব্র নির্মম মন্তব্য করেন নাই। ডঃ মজুমদার যখন তাহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' লইয়া গবেষণা করিতে-ছিলেন, তখন দীনেশচন্দ্র সেন ও মৃণালকান্তি ঘোষের মধ্যে কড়চা লইয়া তীব্র বাদানুবাদ চলিতেছিল। মজুমদার মহাশয় এই দুইজনেরই স্নেহভাজন ছিলেন, কাজেই ইতিহাসের প্রয়োজনেও খোলাখুলি সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া এক পক্ষকে চটাইতে চাহেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমি বাল্যকাল হইতে ডাঃ সেনের ও শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবুর স্নেহ পাইয়া আসিতেছি। এই গ্রন্থ (অর্থাৎ 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান') লেখার জন্য উভয়েই কৃপা করিয়া আমাকে গ্রন্থাদি ও উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। ঐতিহাসিক যতই সত্যানুসন্ধিৎসু হউন না কেন, সংসর্গ ও আবেষ্টনীর প্রভাব তিনি সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন না। সেইজন্য আশঙ্কা হয় যে, এ সম্বন্ধে আমার বিচার হয়তো নিরপেক্ষ হইবে না" (চৈ চ উপা পৃ ৪.৩-১৪)। এ বিষয়ে ডঃ মজুমদার অকপটে সহজ সত্য স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহাদের নিকট তিনি গ্রন্থ সাহায্য পাইয়াছেন, বাল্যকাল হইতে স্নেহলাভ করিয়াছেন, প্রয়োজন স্থলেও তিনি সঙ্কোচ বশতঃ নির্মম সত্য শুনাইতে পারেন নাই। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বড় হইয়া ঐতিহাসিকের কলম চাপিয়া ধরিয়াছে—দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। ডঃ মজুমদার কৃষ্ণদাস কবিরাজের ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে কামান দাগিয়াছেন। তাহার মুখ কড়চার দিকে ফিরাইলে জয়গোপাল,

বনোয়ারীলাল এবং দীনেশচন্দ্র একসঙ্গে উড়িয়া যাইতেন। কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ তিনি তাহা হইতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহার বিনয় ও সৌজন্য শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক শেষ পর্যন্ত চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া সত্য কথা বলিতে বিরত হইলেন ইহাই পরিতাপের কথা। যাহা হোক এখন দীনেশচন্দ্র ও মৃণালকান্তি স্বর্গত হইয়াছেন, এখন আর সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই।

কড়চার প্রামাণিকতা॥ কিছুকাল পূর্বে গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা লইয়া এদেশে সাহিত্যিক মহলে যে কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল, তাহা সেযুগের অনেকেই স্মরণ করিতে পারিবেন। দীনেশচন্দ্র এবং জয়-গোপালের জ্যেষ্ঠপুত্র বনোয়ারীলাল গোস্বামীর যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উক্ত কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে কড়চার বিরুদ্ধে নূতন করিয়া প্রবলতর আন্দোলন শুরু হইল। এ বিষয়ে সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করা যাক।

"কড়চার প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর মতিলাল ঘোষ গ্রন্থটি সম্বন্ধে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'য় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, কড়চাটি একেবারে বাজে অমূলক রচনা নহে। তবে গোড়ার দিকে যে পাতাগুলি হারাইয়া গিয়াছিল, সম্পাদক জয়গোপাল খুব সম্ভব সেগুলি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া খণ্ডিত আকারে পুঁথিটি ছাপাইতে চাহেন নাই, হারানো অংশটুকু যতটা তাহার স্মৃতিতে ছিল, তাহার সহিত নিজ কল্পনা ও রচনাশক্তির খাদ মিশাইয়া এই অংশটুকু 're-write' করিয়া ছাপাইয়াছিলেন।"

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর দীনেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, প্রথমাংশ (প্রথম সংস্করণের গোড়ার ৫০ পৃষ্ঠা) খুব নির্ভরযোগ্য না হইলেও গ্রন্থটির পরবর্তী অংশ বিশুদ্ধ। অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রও প্রথম দিকে অনুমান করিয়াছিলেন—পুঁথিটির মুদ্রিত রূপ নির্ভেজাল নহে, উহার প্রথম দিকে কিছু 'কারচুপি' থাকা সম্ভব। কারণ তখন কড়চার অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ সকলেই জানিতেন যে, গ্রন্থের প্রথম পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি খোয়া গিয়াছিল, এবং জয়গোপাল কোনপ্রকারে তাহার কপি জোগাড় করিয়া ছাপাইলেও মুদ্রিত পাঠ সংশয়াতীত নহে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র যখন মৃত গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বনোয়ারী-লালের সহযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণ

বাহির করিলেন, তখন তিনি নিজের পূর্বের মন্তব্য সরাসরি প্রত্যাহার করিয়া বলিলেন যে, মুদ্রিত গ্রন্থ অতি বিশুদ্ধ, কেবল গোস্বামী মহাশয় পাণ্ডুলিপির দুই চারি স্থল বুঝিতে না পারিয়া নিজে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন; প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদকেরা প্রায়ই সেইরূপ করিয়া থাকেন।

কড়চার প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতার ঘোর প্রতিবাদী মৃণালকান্তি ঘোষ নানা তথ্য, সাক্ষ্য সাবুদ জোগাড় করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস হইতে 'গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য' (১৩৬৩) প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দৃঢ়রূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গোবিন্দদাসের মুদ্রিত কড়চা সম্পূর্ণ জাল গ্রন্থ, জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিজেরই রচনা। গোবিন্দদাস কর্মকার নামক কেহ মহাপ্রভুর সেবক হইয়া দাক্ষিণাত্যে যায় নাই, বা গোবিন্দদাস-রচিত কড়চা নামক কোন গ্রন্থ বা 'রোজনামচা' পাওয়া যায় না। সাহিত্যের ঐতিহাসিকের অনেকেই এই গ্রন্থকে সরাসরি বাতিল করিয়া দিয়াছেন।[১২৮] কেহ-বা ইহার মধ্যে প্রক্ষেপ-সংযোজন ঘটিয়াছে স্বীকার করিয়াও গ্রন্থটিকে খাঁটি, প্রামাণিক ও প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। ডঃ সুশীলকুমার দে এই বিষয়ে দ্বিধায় পড়িয়াছেন। তিনি ইহাতে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বিষয়ে যেরূপ বাস্তব বর্ণনার পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, "It certainly contains much new, but plausible information, which has the characteristic of not being inspired by devotional propagandism, but which was probably the result of vivid personal knowledge"[১২৯] গোবিন্দদাস এই কড়চায় চৈতন্যদেবকে মানুষ হিসাবে আঁকিয়াছেন বলিয়া ডঃ দে গোবিন্দদাসের নামে প্রচারিত সংশয়পূর্ণ গ্রন্থটিকেও স্বীকৃতি দিয়াছেন, "It certainly, gives a most human picture of one who has been so often and so grotesquely deified, and presents a plain and vivid narration by sincere lover of the Master, who was dominated neither by learned dogmatics nor by excessive fanatical devotion."[১৩০]

১২৮ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ)

১২৯ Dr S. K. De—*Vaishnava Faith & Movement*

১৩০ Ibid

চৈতন্যের এই মানবীকরণের জন্য দীনেশচন্দ্রও ভক্তি-বিজড়িতকণ্ঠে বলিয়াছেন, "কড়চা আমাকে চৈতন্যপ্রভুর যে স্বরূপ দেখাইয়াছে, অন্যত্র কোথাও তাহা পাই নাই। নানা জটিল অবতারবাদ স্থাপনের চেষ্টা ও কুহকের মধ্যে অন্যত্র মহাপ্রভুর জীবনের আভাসমাত্র পাওয়া যায়। কাদম্বিনী পংক্তির মধ্যে ক্ষণস্ফুরিত বিদ্যুদ্দামের মত সেই আভাস পরক্ষণেই নানারূপ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা ও অবতারবাদের কুজ্ঝটিকার মধ্যে বিলীন হইয়া পড়ে। কিন্তু কড়চার এই প্রেমের পাগলকে একবার দেখুন। ইনি যেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন।"[১৩১]

দীনেশচন্দ্রের এই মন্তব্যের উপর নির্ভর করা যায় না। কারণ তিনি মুগ্ধভাবে এই গ্রন্থের উপাসনা করিয়াছেন, যুক্তির ধার দিয়াও যান নাই। 'ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' এ কথা সাধনমার্গ বা ভক্তিতে চলিতে পারে; কিন্তু ইতিহাস ও তত্ত্বালোচনায় এই জাতীয় ভক্তিবাদ সর্বথা পরিত্যাজ্য। দীনেশচন্দ্র সে পথে না গিয়া ভক্তিরসে আকণ্ঠ ডুবিয়া ইতিহাসের যুক্তি-তর্ক ত্যাগ করিয়া কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অন্তরের বিশ্বাসকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন। তিনি কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "যদিও এই ভূমিকায় আমরা কড়চার প্রামাণিকতা দেখাইতে যাইয়া বিবিধ বাহিরের প্রমাণ দিয়াছি, তথাপি আমার নিকট ঐ সকল প্রমাণের কোনই দরকার নাই। যেরূপ অগ্নির সম্মুখীন হইলে চক্ষু বুজিলে তাপ দ্বারাই অগ্নির অস্তিত্ব বুঝা যায়, এই পুস্তকের অপূর্ব প্রেমমাদকতাই আমার নিকট ইহার প্রামাণিকতার বড় সাক্ষী।" ইহার পর আর কোন কথা চলে না। কিন্তু ডঃ দে-র মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন যুক্তিবাদী পণ্ডিতও, কড়চায় যেহেতু মহাপ্রভুর মানবীয় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সেই হেতু ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণগুলি উল্লেখ করিয়াও গ্রন্থটির মর্যাদা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি জানেন, "though no particular motive for the alleged forgery is suggested, the original manuscript or manuscripts have disappeared, that no other manuscript is forthcoming, and that the printed text has undoubtedly been modified and modernised (probably as suggested, by the well intentiond but entirely misdirected

[১৩১] গোবিন্দদাসের কড়চা, দ্বিতীয় সংস্করণ

zeal of its first editor) and presents an appearance of modernity"—এবং "The probability of interpolation is also not excluded; as a matter of fact there are some passages which have almost identical phrasing with those in Krishna Dasa Kavirajas' work, and look suspiciously like direct incorporation" কিন্তু তবু তাঁহার মতে, "It seems probable that some of the matter it contains is old, and this internal evidence itself, in the absence of other proofs, makes the genuineness of the general substance of the work extremely plausible" কড়চার কোন্ অংশটি 'old' এবং ইহার 'internal evidence' বলিতে ডঃ দে কি নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। সেই জন্য তাহার উল্লিখিত মন্তব্যে কিছু স্ববিরোধ প্রতীয়মান হইতেছে।

এখন কড়চার প্রামাণিকতার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের কারণগুলি বিশ্লেষণ করা যাক। জয়গোপালের মৃত্যুর পর কড়চার পুরাপুরি স্বপক্ষে ছিলেন জয়গোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র বনোয়ারীলাল গোস্বামী এবং দীনেশচন্দ্র সেন। ইঁহারা দুইজনে মিলিয়া কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ সংস্করণের গোড়ায় বনোয়ারীলালের স্বাক্ষরিত 'গোবিন্দ দাসের কড়চা উদ্ধারের ইতিহাস' এবং দীনেশচন্দ্র লিখিত ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছিল। দুইজনের বক্তব্য হইতে কড়চার পুঁথি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যাইতেছে।

বনোয়ারীলালের মতে কড়চার পাণ্ডুলিপির প্রায় দুই ফর্মা হারাইয়া গেলে যখন জয়গোপাল হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি শান্তিপুরের হরিনাথ গোস্বামীর নিকট গোবিন্দদাসের কড়চার আর একখানি পুঁথি পাইলেন। "ঐ পুঁথিখানি অত্যন্ত পার্যবিকৃতি দোষে দুষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট যে কিছু কিছু নোট ছিল, তাহার সহিত ঐ পুঁথির লেখা মিলাইয়া কষ্টেসৃষ্টে নষ্টপত্রগুলির পুনরুদ্ধার করিয়া" গোবিন্দদাসের কড়চা মুদ্রিত হয়। বনোয়ারীলাল হলপ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র, আমার বয়স এখন ৭০। কিছুকালের জন্য প্রাচীন পুঁথি আমাদের বাড়ীতে ছিল। আমিও তাহা দেখিয়াছিলাম।" কালিদাস নাথ জয়গোপালকে কড়চার যে পুঁথিখানি মাত্র কয়েকদিনের জন্য

দিয়াছিলেন, এবং গোস্বামী মহাশয় তাহা নকল করিয়া লইয়াছিলেন, এখানে বনোয়ারীলাল সেই পুথির কথা বলিতেছেন—হরিনাথ গোস্বামীর বাড়ীতে রক্ষিত অশুদ্ধ পাঠযুক্ত পুথি নহে। তাহা হইলে গোবিন্দদাসের কড়চার দুইখানি পুঁথির সন্ধান মিলিল। এখানে পাঠককে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বনোয়ারীলালের সাক্ষ্য অনুসারে তাঁহার পিতা জয়গোপাল পুঁথির পাঠ বিকৃত, রূপান্তরিত, বর্জিত বা সংযোজিত করিয়াছিলেন—"পুস্তকের কোন কোন স্থানে প্রাচীন জটিল শব্দ তিনি সম্পাদন কালে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। হয়ত কখনও কোন কীটদষ্ট ছিন্নাংশ লুপ্ত হওয়াতে তাহা তিনি পূরণ করিয়াছেন।" 'হয়তো' নহে, গোস্বামী মহাশয় নিশ্চয়ই পাঠ বদলাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরিমাণ কতটা—খোল-নলিচা সবটাই কি? বনোয়ারীলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পিতার অপরাধ ঢাকিতে পারেন নাই। আমরা দেখিতেছি, হারানো পাণ্ডুলিপি যখন খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, কালিদাস নাথ সংগৃহীত তথাকথিত পুঁথিটিও যখন রহস্যজনকভাবে উধাও হইল, তখন হঠাৎ শান্তিপুরের হরিনাথ গোস্বামীর বাড়ীতে কড়চার আর একখানি পুঁথি মিলিল—তবে পাঠ অশুদ্ধ ও বিকৃত। এই অশুদ্ধ পুথির কিছু কিছু পাঠ লইয়া, এবং গোস্বামী মহাশয় প্রথম পুঁথি হইতে যে কিছু কিছু নোট লইয়াছিলেন, তাহার সহিত মিলাইয়া "কষ্টেসৃষ্টে নষ্ট পত্রগুলির পুনরুদ্ধার" করিলেন। বনোয়ারীলালের এই উক্তিটি মারাত্মক। প্রথম পুঁথি হইতে জয়গোপাল মাত্র একখানি নকল তৈয়ারি করিয়াছিলেন, কলিকাতায় মতিলাল ঘোষের হেফাজত হইতে এই নকলের খানিকটা হারাইয়া গেলে জয়গোপাল হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রথম পুঁথিটাও আর পাওয়া গেল না দেখিয়া, যেটুকু নকল রহিয়াছে, তিনি অগত্যা তাহাই ছাপিতে রাজি হইলেন। এখানে 'নোট' করিবার কথা কেন আসিল, কোথা হইতে আসিল? তাহা হইলে নকল হারাইয়া যাইবে মনে করিয়াই কি অতিশয় বিচক্ষণ জয়গোপাল পূর্ব হইতেই উক্ত পুঁথির কোন কোন অংশ 'নোট' করিয়া রাখিয়াছিলেন? ঐ নোট কিরূপ? শুধু ঘটনার তালিকা, না মূল পুঁথির ভাষাও তিনি নোট করিয়াছিলেন? দুইখানি পুঁথির কোনখানি পাওয়া যায় না, ইহার মধ্যে কোনখানিই যথার্থ কাহারও হস্তগত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ হয়। কালিদাস নাথ জয়গোপালের নিকট কড়চার প্রাচীন পুঁথি আনিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে

যখন কড়চার পুঁথির প্রামাণিকতা লইয়া গোলমাল চলিতেছিল, তখন নাথ মহাশয় অমৃতবাজার পত্রিকার অফিসে কর্ম করিতেন। তিনি শিশিরকুমার ও মতিলালের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। যদি তিনি জয়গোপালকে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে এই গোলমালের সময় তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন না। আমাদের মনে হয় কালিদাস নাথের পুঁথি সংগ্রহের বৃত্তান্ত দীনেশচন্দ্র ও বনোয়ারীলালের জল্পনা। আর না হয় ধরিয়া লইলাম, কালিদাস নাথের সংগৃহীত পুঁথির খোঁজ পাওয়া গেল না, তাহার মালিকেরও সন্ধান মিলিল না, বা মালিকের অনিচ্ছার জন্য দ্বিতীয়বার উহার দর্শন লাভ ঘটিল না। কিন্তু দ্বিতীয় পুঁথিখানি? শান্তিপুরের হরিনাথ গোস্বামীর নিকট কড়চার অশুদ্ধপাঠ যুক্ত দ্বিতীয় পুঁথিখানি ছিল। যখন কড়চার পুঁথি সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন জয়গোপাল সে পুঁথির সন্ধান দিলেন না কেন? তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বনোয়ারীলাল সমস্ত ব্যাপার জানিতেন, তিনিই-বা চুপ করিয়া রহিলেন কেন? প্রথম পুঁথিখানি রহস্যময়, দ্বিতীয় পুঁথিও সেইরূপ।

দীনেশচন্দ্র তৃতীয় পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য এ সমস্ত প্রমাণই পরোক্ষ, অন্যের নিকট শ্রুত—সুতরাং বাজাইয়া দেখা প্রয়োজন। দীনেশচন্দ্র কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিবার সময় শুনিলেন যে, বাকলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কচূড়ামণি নাকি কড়চার আর একখানি পুঁথির সংবাদ জানিতেন। বৃদ্ধকে দীনেশচন্দ্র চিঠি লিখিলে পণ্ডিত মহাশয় তদুত্তরে জানাইলেন, "৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে নগরীর [illegible] কেওট য় আমার অবস্থান কালে ৺গোরাচাঁদ চক্রবর্তী নামক এক হরিভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণের নিকট গোবিন্দদাসের কড়চার পুঁথি দেখিয়াছিলাম। ঐ পুঁথিখানি কীটদষ্ট ও জীর্ণ ছিল। তিনি ঐখানি নকল করিতেন এবং অনেক সময় অস্পষ্টপদ উদ্ধারের জন্য আমাকে ডাকিতেন, সেই জন্য উহার অনেক কথা আমার মনে আছে। বর্তমান সময়ে ৺জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্কলিত গোবিন্দদাসের কড়চাখানি মুদ্রিত দেখিতে পাই। চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট যে পুঁথি দেখিয়াছিলাম তাহা ও এই ছাপা পুঁথি এক বলিয়া মনে করি। জয়গোপাল গোস্বামী সঙ্কলিত পুস্তকখানি যতই পড়িতেছি, ততই আমার পূর্বের লিখিত সংস্কার জাগিয়া উঠিতেছে" (গো. কড়চা, ২য় স. ভূমিকা)। দীনেশচন্দ্র পণ্ডিতমহাশয়ের এই চিঠিখানিকে গোবিন্দদাসের কড়চার

প্রামাণিকতার অকাট্য প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করিয়াছেন। পণ্ডিতমহাশয়ের কথা না হয় সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া গেল। হইতে পারে গোরাচাঁদ চক্রবর্তীর নিকট গোবিন্দদাসের কড়চার আর একখানি পুঁথি ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কচূড়ামণি এমনই শ্রুতিধর যে, ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বে কবে একখানি পুঁথির দুই চারিটি পাঠ বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দীর্ঘকাল পরে তিনি যেমনই জয়গোপাল-সম্পাদিত মুদ্রিত কড়চা পড়িলেন, অমনি তাঁহার 'পূর্ব সংস্কার' জাগিয়া উঠিল, ঐ পুঁথি ও জয়গোপালের গ্রন্থ একই বস্তু বলিয়া চিনিয়া তিনি ফেলিলেন? ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বে যখন তিনি উক্ত পুঁথির অস্পষ্ট পাঠ কাহাকেও বলিয়া দিতেছিলেন, তখনই কি মনে করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহাকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হইবে, অতএব পুঁথির ব্যাপার ভাল করিয়া স্মৃতিজাত করা যাক? এই তৃতীয় পুঁথির কাহিনীও বিশ্বাসযোগ্য নহে। মোট কথা তিনখানি পুথির কোনখানিই আর দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাহার প্রামাণিকতায় বিশ্বাস করা যায় কি?

দীনেশচন্দ্র সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি জয়গোপালের পুঁথির বিশুদ্ধি প্রমাণের জন্য আরও দুইটি সাক্ষী তলব করিলেন। রংপুরের সরকারী উকিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জয়গোপালের বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি হয়তো এই ব্যাপারে আসল সংবাদ জানিতে পারেন, এই মনে করিয়া দীনেশ-চন্দ্র তাঁহাকে চিঠি লিখিলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার উত্তরে লিখিলেন, "Yes, I knew the late Pandit Joygopal Goswami of Shantipur rather intimately in my young days and I had the honour and the privilege of enjoying his confidence too. I remember to have seen an old Ms. of Govinda Das's Karcha with him, which he was then engaged in making a copy of for the purpose of editing and publishing it. It was over 40 years now that I saw it with him and it was then in a very worn out condition and that is why I believe he was making a copy of it". সরকারী উকিল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি সত্য হইতে পারে। জয়গোপাল কোন পুঁথি হইতেই নকল করিতেছিলেন ইহা না হয় বিশ্বাস করা গেল। কিন্তু তিনি যে যথাযথ নকল করিতেছিলেন, এবং ছাপাগ্রন্থ ও সেই

পুঁথি একই—এ কথা উকিল মহাশয়ের পত্রে ব্যক্ত হইতেছে না। উপরন্তু আসামী-ফরিযাদীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত 'intere-ted party'-র কথায় কোর্ট-কাছারী আস্থা স্থাপন করিতে চাহে না। চট্টোপাধ্যায মহাশয় বাল্যকাল হইতে জয়গোপালের সঙ্গে 'intimately' পরিচিত ছিলেন এবং তিনি গোঁসাইজীব 'confidence'-ও 'enjoy' করিয়াছেন। অতঃপর পাঠকেব কাঠগডায় সরকারী উকিলের এ সাক্ষ্য টিকিবে কি?

দীনেশচন্দ্র শান্তিপুর নিবাসী হবিলাল গোস্বামীর চিঠির উল্লেখ করিয়াছিলেন, "কডচার পাণ্ডুলেখা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শান্তিপুরে এখনও জীবিত আছেন। তাহা ছাডা বনোয়ারীলাল গোস্বামী, যাঁহার বয়স এখন ৭০, এবং তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোস্বামী যাঁহার বযস এখন ৬০, তাঁহার তো এই পুঁথি দেখিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে সমস্ত ঘটনাই বিদিত আছেন।" কিন্তু বিস্ময়ের কথা, দীনেশচন্দ্র উক্ত হবিলাল গোস্বামীর চিঠিটি মুদ্রিত কবেন নাই। তাঁহার বা জয়গোপাল গোস্বামীব বিরুদ্ধে যাইতে পারে, উহাতে কি এমন কোন কথা ছিল? দীনেশচন্দ্র এই চিঠি মুদ্রিত করেন নাই, স্বতরাং এ প্রমাণ অগ্রাহ্য। দ্বিতীয়তঃ বনোযাবীলাল ও মোহনলাল বাহিরের কেহ নহেন, স্বয়ং জয়গোপালেবই জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র। তন্মধ্যে বনোয়ারীলাল আবার কডচাব দ্বিতীয সংস্কবণের অন্যতম সম্পাদক। যাঁহাদের পিতাব বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহাদেব ঐ সম্পর্কিত কোন কথাই চূডান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। দীনেশচন্দ্র উত্থাপিত এই প্রমাণগুলি অত্যন্ত দুর্বল।

তাহা হইলে দেখা গেল, দীনেশচন্দ্র যে তিনখানি পুঁথির কথা বলিয়াছেন, তাহাদের কোনখানির কেশাগ্রও দেখিবার উপায় নাই। প্রাচীন সাহিত্যামোদীদেরও কেহ দেখেন নাই। যাঁহারা দেখিয়াছেন বলিতেছেন, তাঁহাদের কেহ জযগোপালের পুত্র, কেহ বন্ধু, কেহ-বা পূবপবিচিত। স্বতরাং তাঁহাদের উক্তি বা চিঠিপত্র বিনা প্রমাণে সত্য ও চূডান্ত বলিযা গ্রহণ করা যায় না। অতএব দীনেশচন্দ্রের সমস্ত যুক্তিজাল স্মরণ রখিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে:—

(ক) গোবিন্দদাসের কডচা নামক কোন একখানি পুঁথি জয়গোপাল গোস্বামী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তাহা নকল করিয়া লইয়াছিলেন। এই নকলের খানিকটা হারাইয়া গেলে তিনি নিজেই সেটুকু লিখিয়া দিয়াছিলেন

এবং তাহা গোবিন্দদাসের কড়চার সঙ্গে ছাপিয়া গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে পুঁথির যে অংশ বুঝিতে পারেন নাই, এবং যে অংশ দুরূহ মনে হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

(খ) গোবিন্দদাসের কড়চা নামক কোন পুঁথি কোথাও পাওয়া যায় নাই, সুকবি গোস্বামী মহাশয় চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম-ভারত ভ্রমণকে (যাহা অন্যান্য চৈতন্যজীবনীকাব্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয় নাই) কেন্দ্র করিয়া পুরাতন পয়ারের ছাঁদে নিজেই লিখিয়া কল্পিত গোবিন্দদাস কর্মকারের নামে চালাইয়াছেন।

'ক' চিহ্নিত মন্তব্যটিকে কড়চার পক্ষপাতীরাও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এমন কি 'খ' চিহ্নিত মন্তব্যটিও যে একেবারে অমূলক তাহা মনে হয় না। আমরা প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী রায়বাহাদুর রসময় মিত্রের একটি 'সাংঘাতিক' সংবাদ উল্লেখ করিতেছি। একদা জয়গোপাল স্বরচিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক কলিকাতা হিন্দুস্কুলের পাঠ্য করিবার জন্য প্রধান শিক্ষক রসময় মিত্র মহাশয়কে অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন। রসময় মিত্র গোবিন্দদাসের কড়চা পড়িয়া বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন।[১৩২] তাই তিনি জয়গোপালকে কাছে পাইয়া অকপটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোস্বামী মহাশয়! যদি অকপটভাবে আমাকে

[১৩২] মৃণালকান্তি ঘোষের 'গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্যে' (পৃ ১৪৬-৪৭) আছে যে, হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার রায় বাহাদুর রসময় মিত্রের নিকট জয়গোপাল গোস্বামী একদা তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণ 'অনুক্রমণিকা' পাঠ্য করিবার জন্য গিয়াছিলেন। "রসময়বাবু কড়চা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিলে তিনি বলিলেন, "বইখানা আমার কাছে ছিল, শিশিরবাবুদের পড়িতে দিযাছিলাম। অনেকগুলি পাতা হারাযে যাওযায সেগুলি রচনা করে দেওয়া হযেছে।" তখন রসময মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "নষ্টপত্রগুলি কি আপনিই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন?" গোস্বামী মহাশয ফাঁপরে পড়িযা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন, "আমাকে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।" এত কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। সম্ভবতঃ কড়চা সম্বন্ধে রসময়বাবু পাছে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, এই আশঙ্কায আর সেখানে থাকিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না" (মৃণালকান্তি ঘোষ রচিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য')। কড়চার ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী মৃণালকান্তির এই বর্ণনা হয়তো কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইতে পারে। কিন্তু রসময় মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে জয়গোপাল যে যথার্থ জবাব দিতে পারেন নাই, প্রকারান্তরে মিত্র মহাশয়ের অনুমান মানিয়া লইয়াছিলেন, তাহা রসময় মিত্র মহাশয়ের বিবরণ পড়িলেই বুঝা যাইবে। (দ্রষ্টব্য—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৩১, ৩রা ফাল্গুন)

একটি প্রকৃত কথা বলেন, তাহা হইলে আমি আহ্লাদ সহকারে আপনার বইখানি হেয়ার ও হিন্দুস্কুলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া দিব। কড়চা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা কি তাহা আমাকে বলুন—আমার উহার সম্বন্ধে একটা বিশেষ সন্দেহ আছে।"[১৩৩] তখন তাঁহার নিকট গোস্বামী মহাশয় অস্পষ্টভাবে স্বীকার করেন যে উক্ত কড়চার খানিকটা তাঁহারই রচিত। জয়গোপালের সঙ্গে রসময় মিত্রের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা মিত্রমহাশয় প্রবন্ধাকারে বাহির করিয়াছিলেন। সুতরাং রসময় মিত্র মিথ্যা কথা বলেন নাই। তাঁহার ন্যায় বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষিত সমাজের নেতা এই সামান্য বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় লইবেন তাহা কখনও সম্ভব নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে স্বয়ং গোস্বামী মহাশয় রসময় মিত্রের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে, গোবিন্দ-দাসের কড়চার কিয়দংশ জাল—তাঁহারই রচনা।

কিন্তু আরও বিপজ্জনক প্রমাণ আছে—যাহা সত্য হইলে গোবিন্দদাস কর্মকার কল্পনালোকে উড়িয়া যাইবেন এবং সে আসন অধিকার করিবেন অদ্বৈতবংশোদ্ভূত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়। এইবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

জয়গোপাল গোস্বামীর এক প্রিয় ছাত্র বিশ্বেশ্বর দাস মাষ্টার মহাশয়কে পথে বসাইয়াছেন। বিশ্বেশ্বর স্কুলের মেধাবী ছাত্র ছিলেন, পরে সেই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক হইয়াছিলেন, তখনও জয়গোপাল গোস্বামী শান্তিপুরের সেই স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কর্ম করিতেছিলেন। বিশ্বেশ্বর চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কৌতূহলী হইলে জয়গোপাল তাঁহার ছাত্র ও প্রধানশিক্ষক বিশ্বেশ্বরকে বলিলেন, "মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কবিতায় লিখিত একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে। তুমি তাহা পাঠ করিলে নিশ্চয় আনন্দ লাভ করিবে।" দাস মহাশয় এই পাণ্ডুলিপি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন, ইহাই সেই কড়চার গোস্বামীকৃত পাণ্ডুলিপি। দাস মহাশয়ও গোড়ার দিকের কয়েকখানা পৃষ্ঠা পান নাই। এই প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বর দাসের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য: "ঐ পাণ্ডু-লিপিতে নিবদ্ধ বেদান্ত সম্মত বহুল উপদেশ আমার হৃদয়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় মৌখিকভাবে কখন কখন ঐ সকল উপদেশ আমাদিগকে শুনাইতেন।" তাহা হইলে কড়চার চৈতন্যের মুখে যে সমস্ত

[১৩৩] 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র দ্বিতীয় সংস্করণের ২৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বকথা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি জয়গোপালের নিজের অভিমত এবং নিজেরই রচনা? পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ হারাইয়া গিয়াছে দেখিয়া বিশ্বেশ্বর দাস পণ্ডিমহাশয়কে বলিলেন, "সমগ্র পাণ্ডুলিপি খানি যখন আপনি পরিজ্ঞাত আছেন, তখন এই পাণ্ডুলিপি বর্ণিত কিয়দংশ যদি আপনি রচনা করিয়া দেন, তাহাতে ক্ষতি কি?" বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত মহাশয়কে কেন এরূপ দুষ্কর্মে মতি দিলেন? তাহার কারণ "ঐ পাণ্ডুলিপি খানি পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত বলিয়া আমার সম্পূর্ণ ধারণা ছিল।" কেন বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয়ের মনে হইল যে, গোবিন্দদাসের কড়চা কোন প্রাচীন লেখকের রচনা নহে, তাঁহারই পূজ্যপাদ শিক্ষক ও সহকর্মী জয়গোপালেরই রচনা? কেনই-বা তিনি গোস্বামী মহাশয়কে লুপ্ত অংশটুকু লিখিয়া দিবার অনুরোধ করিলেন? নানা কারণে দাস মহাশয়ের ধারণা হইয়াছিল, জয়গোপালের কাছে রক্ষিত গোবিন্দদাসের কড়চার খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিটি পণ্ডিতমহাশয়েরই রচনা। জয়গোপালের মোটা-মুটি রচনাশক্তি ছিল। বিশ্বেশ্বর দাসের মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত হইল :—

> "এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পণ্ডিত মহাশয়কে করচার পাণ্ডুলিপির লুপ্ত অংশ সংযোজিত করিতে বলায়, তিনি কোনও আপত্তি করিলেন না এবং অপরের রচিত পাণ্ডুলিপিতে তিনি কিরূপে নিজের রচিত বিষয় সংযোজিত করিবেন একথাও আদৌ উল্লেখ করিলেন না। এই সকল কারণে আমি গোবিন্দদাসের করচাকে পণ্ডিত মহাশয়ের নিজস্ব বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলাম।
>
> "কিছুদিন পর পণ্ডিত মহাশয় একদিন আমাকে কহিলেন, 'বিশ্বেশ্বর' করচা সম্পূর্ণ হইয়াছে, উহা ছাপিতে দিয়াছি; শীঘ্রই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত পুস্তকাকারে দেখিতে পাইবে।' বাস্তবিকই কিছু দিবস পরে গোবিন্দদাসের করচা মুদ্রিতাকারে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। পাণ্ডুলিপির মৌলিক অংশ এবং পরে সংযোজিত অংশ তুলনা করিয়া উভয় অংশই আমার একজনের রচনা বলিয়া ধারণা হইল।
>
> "বিশেষতঃ মুদ্রিত পুস্তকে পণ্ডিত মহাশয় কোন ভূমিকা লেখেন নাই। কি সূত্রে, কোথায়, পণ্ডিত মহাশয় উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার আদৌ কোন উল্লেখ না থাকায় আমার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল যে, উহা পণ্ডিত মহাশয়েরই রচিত।
>
> "প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার ভার লইয়া পণ্ডিত মহাশয় কেন উহার ভূমিকা লিখিলেন না, এই কথা আমার সর্বদা মনে হইত। পণ্ডিত মহাশয় তৎকালে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি গণিতবিজ্ঞান হইতে কাব্য দর্শন প্রভৃতি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইলে তাহার যে একটি

সমীচীন ভূমিকা লেখা আবশ্যক, তাহা পণ্ডিত মহাশয় বিলক্ষণ জানিতেন। তথাপি গোবিন্দদাসের করচার ভূমিকা কেন পণ্ডিত মহাশয় লিখিলেন না, ইহা বিশেষরূপে আলোচনা করিবার যোগ্য।

"আজকাল অনেকে করচার মূল পাণ্ডুলিপি দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু করচার ১ম সংস্করণে একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কোন ভূমিকা লিখিলেন না, ইহার হেতু কেহ কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন?"

বিশ্বেশ্বর দাস আর একবার জয়গোপালের কাছে কড়চার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন ঃ—

"পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয়ের পরলোকগমনের পূর্বে করচার প্রকৃত রচয়িতা কে, জানিবার জন্য আমি পণ্ডিত মহাশয়কে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন,—'আমি উহা রাঢ়দেশে একজন শিষ্যের নিকটে পাইয়াছি।' আমি উত্তর করিলাম, 'আমার বিশ্বাস, উহা আপনারই রচিত।' ইহাতে তিনি বিরক্তির সহিত অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বলা বাহুল্য তখন করচা লইয়া বৈষ্ণবসমাজে তুমুল আলোচনা চলিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় বিরক্ত বা বিপন্ন হইতেছেন দেখিয়া আমি ঐ বিষয়ে তাঁহার সহিত আর কোন প্রসঙ্গ করি নাই।"

জয়গোপাল গোস্বামীর অন্যতম মেধাবী ছাত্র এবং পরে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর দাসের এই উক্তি সত্য হইলে 'গোবিন্দদাসের কড়চা' ময়ূরভট্টের নামে প্রচারিত 'শ্রীধর্মপুরাণে'র[১৩৪] মতো বায়ুলোকে উড়িয়া যাইবে। বিশ্বেশ্বর বাবুর স্থির বিশ্বাস, গোটা কড়চা খানাই জয়গোপালের লেখনীপ্রসূত। কেহ কেহ মনে করেন যে, যে হারানো অংশটুকু গ্রন্থের প্রারম্ভে যোজিত হইয়াছিল, ইহা জয়গোপালের রচিত হইতে পারে, বাকি অংশ বিশুদ্ধ। কিন্তু বিশ্বেশ্বর বাবু দুই অংশ মিলাইয়া দেখিয়াছেন, সমগ্র রচনার মধ্যে একহাতের ছাপই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদেরও মতে, বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয়ের এই অনুমান অযৌক্তিক নহে। যদি ধরা যায় দ্বিতীয় সংস্করণের ১-২১ পৃষ্ঠার অর্ধেক পর্যন্ত (চৈতন্যের প্রথম জীবন হইতে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে

---

[১৩৪] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্ম পুরাণ' মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে জানা গিয়াছে যে, উহা একখানি জাল গ্রন্থ, প্রাচীন ময়ূরভট্টের নামে একজন আধুনিক লেখকের রচনা। এ বিষয়ে আমরা তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

সাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত) জয়গোপালের রচনা এবং বাকি অংশ (২২-৮৬ গোবিন্দদাস কর্মকারের রচনা, তাহা হইলে এই দুই অংশের মধ্যে রচনাগত বিশেষ পার্থক্য থাকা উচিত, কারণ প্রথমাংশ ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগের একজন পণ্ডিত ব্যক্তির রচনা, এবং বাকি অংশ ১৬শ শতাব্দীর অশিক্ষিত গোবিন্দদাস কর্মকারের রচনা। কিন্তু এই দুই অংশে রচনার দিক দিয়া কোন পার্থক্য নাই। হয় গোটা গ্রন্থখানাই জয়গোপালের রচনা, আর না হয় ইহার কোন অংশই তাঁহার রচনা নহে—বিশ্বেশ্বর দাসের উক্তি হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। কিন্তু গোটা কড়চাই যদি গোস্বামী মহাশয়ের নিজের রচনা হইত, তাহা হইলে প্রথম দিকের কিয়দংশ হারাইয়া গেলে তিনি এত ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিয়াছিলেন কেন, কেনই-বা গ্রন্থটি ছাপাইতে বিলম্ব করিয়াছিলেন? তিনি তো পূর্বেই সেটুকু রচনা করিয়া গ্রন্থটি ছাপাইতে পারিতেন। অবশ্য জয়গোপাল যদি সমস্ত সংশয়ের দ্বার রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তীক্ষ্ণতর বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কুটিলতার পথ ধরিয়া থাকেন তো স্বতন্ত্র কথা। হয়তো তিনি মনে করিয়াছিলেন, হারানো অংশ নূতন করিয়া লিখিয়া কড়চা তো তিনি প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে হারানো অংশ যদি আবার বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দুইটি রচনার মধ্যে কিছু কিছু গরমিল ধরা পড়িবেই, কেননা কবিরা কাব্য রচনা করিয়া সমস্তটা কিছু কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন না। হারানো অংশ তাঁহাকে লিখিতে হইলে নূতন করিয়াই লিখিতে হইত এবং হারানো অংশের সন্ধান মিলিলেই মুদ্রিত অংশ ও ফিরিয়া পাওয়া পাণ্ডুলিপিতে গরমিল দেখিলে অনেকে তাঁহার কৌশল ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন। বিশ্বেশ্বর দাস অনেক দূর আগাইয়াছেন, কিন্তু তিনি ধরিতে পারেন নাই—"পণ্ডিত মহাশয় অসম্পূর্ণ কড়চা কেন সম্পূর্ণ করেন নাই, অথবা কেন এতদিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহার হেতু নির্দেশ করা সহজ নহে।" উপরে আমরা আমাদের অনুমান ব্যক্ত করিলাম।

পূর্বে আমরা যে হেতু নির্দেশ করিয়াছি, তাহা স্বীকার করিয়া হইলে এই রহস্যের খানিকটা কিনারা হয়। এখন কথা হইতেছে, জয়গোপাল গোস্বামী সম্পূর্ণ কল্পনার বলে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বিষয়ক একখানা গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিলেন—ইহাই-বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? কড়চার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও তথ্যে অল্পাধিক ভুলত্রুটি আছে, গ্রন্থে 'উল্লিখিত রসালকুণ্ড' যে আধুনিক রাসেল কোণ্ডা'

(Russell Conda) তাহা সকলেই বুঝিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া একরূপ একখানি গ্রন্থ নিছক কল্পনার দ্বারা রচনা করিতে গেলে বহু কাঠখড় পুড়াইতে হয়, বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতে হয়, তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়, নিপুণভাবে ভৌগোলিক সংবাদ রাখিতে হয়। জয়গোপাল কি ভবিষ্যতে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া প্রাচীন কল্পিত কবির নামে চালাইবার জন্য গোপনে গোপনে এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন? অবশ্য তাঁহার ছাত্র ও প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর দাসের মতানুসারে ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী ও মানচিত্রের প্রতি গোস্বামী মহাশয়ের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। বিশ্বেশ্বর বাবু বলিতেছেন—"ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক তত্ত্ব সকল অবগত হইবার জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা বা কৌতূহল ছিল। তিনি অনেক সময়ে ভূচিত্র বা ম্যাপ লইয়া একাগ্রচিত্তে উহা দর্শন করিতেন। তাঁহার 'চরিত গাথা' নামক কবিতাপুস্তকে 'ভূচিত্র' নামক একটি কবিতা আছে।......কোন ভ্রমণকারী বা নূতন লোক দেখিলেই পণ্ডিত মহাশয় তাহার মুখে কোন নূতন কথা শুনিবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই রূপে সংগৃহীত তত্ত্ব সকল করচায় বর্ণিত মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ বর্ণনায় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।.... বালস্বভাবহেতু পণ্ডিত মহাশয় কখন কখন অদ্ভুত বা আজগুবি বিষয়ের অবতারণা করিতে ভাল বাসিতেন। তাই বোধহয় মহাপ্রভুর দক্ষিণভ্রমণের সঙ্গী 'গোবিন্দ' সাজিয়া তাঁহার করচা গ্রন্থের নায়করূপে আবির্ভাব।"

বিশ্বেশ্বর দাসের উল্লিখিত মন্তব্য হইতে দেখা যাইতেছে, ভূগোল, ইতিহাস ভ্রমণকাহিনী ও মানচিত্রে অতিশয় অনুরক্ত এবং আজগুবি গল্পে পারঙ্গম বালস্বভাব গোস্বামী মহাশয় নিজেই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁজিপুঁথি ঘাঁটিয়া কাল্পনিক গোবিন্দদাস কর্মকার খাড়া করিয়া নিজে তাহার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কড়চার পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ হারাইয়া না গেলে এতটা ঘোঁট পাকাইত না, লোকে জয়গোপালের কারসাজি বুঝিতেই পারিত না। অবশ্য সম্পূর্ণ কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া প্রাচীন ও আধুনিক ভূগোলকে মিলাইয়া দিতে গেলে যতদূর কৌশল ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তাহা পণ্ডিতমহাশয়ের ছিল কিনা জানা যাইতেছে না। কাব্যের জগতে একজনের বকলমে স্বচ্ছন্দে লেখা যায়, তরুণ রবি ভানুসিংহ সাজিতে পারেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বৃদ্ধ কমলাকান্ত চক্রবর্তীও সাজিতে পারেন,

কিন্তু যেখানে ভূগোল ইতিহাসের খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া কারবার, সেখানে এত বড ব্যাপারটাকে একক চেষ্টার দ্বারা ধামা চাপা দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ ইংরেজীতে লেখা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, সাভেয়ার জেনারেলের মানচিত্র, জরিপ ও তালিকা, বিভিন্ন ভ্রমণকারীদের ইংরেজীতে রচিত ভ্রমণবৃত্তান্ত জয়গোপাল পড়িয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। সংস্কৃতের হেডপণ্ডিত জয়গোপাল ১৮৯০-৯৫ সালে কতটুকু ইংরেজী জানিতেন, তাহাও সন্দেহের বিষয়। এই জন্য গোটা বইখানা তিনি আগাগোড়া নিজেই লিখিয়া দিয়াছেন, সেরূপ প্রমাণ থাকিলেও, বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। অবশ্য কড়চার ভৌগোলিক তালিকায় অনেক ভুল ভ্রান্তি ও জল্পনা আছে। ১৩১৭ সালের 'সাহিত্যে' (আষাঢ়) অমৃতলাল শীল 'গোবিন্দদাসের কড়চা' প্রবন্ধে দাক্ষিণাত্যের স্থান বর্ণনায় অনেক ত্রুটি দেখাইয়াছেন। চারুচন্দ্র শ্রীমানি 'শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কড়চার সমস্তটাকেই জাল বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই ভ্রমণ বর্ণনায় গোলমাল আছে বলিয়াই কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহা জয়গোপালেরই রচনা; একজনের পক্ষে এরূপ বিচিত্র ব্যাপারের সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নহে। কড়চার বাদী-প্রতিবাদিগণের কেহ আর জীবিত নাই, সুতরাং প্রকৃত ব্যাপারের যথার্থ সংবাদ পাইবারও সম্ভাবনা অল্প। তবে গোটা গ্রন্থখানি গোস্বামী মহাশয় জাল করিয়াছিলেন, একথা যদি সত্য নাও হয়, অন্ততঃ ইহার বহু অংশ তিনি কল্পিত গোবিন্দদাসের স্বকলমে লিখিয়াছিলেন, এবং সে সত্যটি সর্বপ্রকারে গোপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই নির্মম সত্যকথাটা স্বীকার করিতে হইবে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলিয়াছেন, "যে রীতিতে আমি শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য জীবনীর বিচার করিয়াছি, সেই রীতিতে দৃঢ়নিষ্ঠ হইলে কড়চাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন হয়" (চৈ, ৪. উপা, পৃ ৪১৮)। সহজ জ্ঞানের দ্বারাই এই কড়চাকে বাতিল করিয়া দেওয়া যায়, কোন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক রীতির প্রয়োজন নাই। সে যাহা হোক, এই কড়চার সর্বত্র এত অধিক আধুনিক হস্তক্ষেপের চিহ্ন আছে যে, পাঠকের মন ইহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিবেই। ইহাতে চৈতন্যদেবকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মানবিক করা হইয়াছে, এবং এইজন্য দীনেশচন্দ্র, ডঃ সুশীলকুমার দে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগে চৈতন্য বা অন্যান্য বৈষ্ণব

মহাজনের জীবনীতে অধ্যাত্ম বা অলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পাইয়াছে; কোথাও মানবিক লীলা যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু মূল গ্রন্থগুলিতে মানবাতীত ঐশ্বরিক চেতনার কথাই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কড়চা সেরূপ নহে, ইহা যেন মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় না, আধুনিক যুগের ভাব ও ভাষার সঙ্গেই ইহার অধিকতর মিতালি।[১৩৫] প্রথমে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :—

১। এত কৃপা কেন মোরে অহে দয়াময়।
অধমের নামটি গোবিন্দদাস হয়॥
ছিলাম গৃহস্থ গৃহে নানা কর্ম করি।
এবে কিন্তু হইয়াছি পথের ভিকারী॥
বিষয় ছাড়িয়া এনু প্রভু দরশনে।
এবে স্থান দেহ প্রভু ও রাঙ্গা চরণে॥

২। বিশাল নয়নে যেই দিকে যবে চায়।
সেই দিকে নালপদ্ম বরষিয়া যায়॥

৩। রাজায় দরিদ্রে ভেদ কিছুমাত্র নাই।
ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানতা করি দেয় ভাই॥
এক মুষ্টি অন্নে পূরে রাজার উদর।
তাতেই দরিদ্র হয় সন্তুষ্ট অন্তর॥
ভূতলে শুইয়া নিঃস্ব সুখে নিদ্রা যায়।
রাজার নাহিক নিদ্রা অমূল্য শয্যায়॥
রাজা নাহি খায় সোনা হীরা পান্না মতি।
ধনমদে নাহি ভাবে অখিলের পতি॥

৪। নাপিতে বলিলা তবে চৈতন্য গোঁসাই।
মুণ্ডন করহ দেব ব্রজে চলে যাই॥
ভারতীর আজ্ঞা পেয়ে নাপিত তখন।
বসিলা নিয়ড়ে গিয়া করিতে মুণ্ডন॥

---

১৩৫ বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত *Govindadas's Kadcha—a Black Forgery*-তে দেখাইয়াছেন যে, কড়চার প্রথম সংস্করণে আধুনিক শব্দসমূহ (পেয়ে, খেয়ে, ওহে) ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে দীনেশচন্দ্র গ্রন্থটিকে প্রাচীনত্বায় মোড়ক দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই শব্দগুলিকে পুরাতন রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দাশগুপ্ত মহাশয় এরূপ ৫২টি 'কারচুপি' বাহির করিয়াছেন।

যখন নাপিত শেষে কেশে ক্ষুর দিলা।
অমনি রমণীগণ ফুকারি উঠিলা ॥
নারীগণ বলে নাপিত এ কাজ করো না।
এমন চুলের গোছা মুড়ায়ে ফেলো না ॥

৫। এই যে সাধের দেহ ঢাকা চর্ম দিয়া।
কিছুদিন পরে ইহা উঠিবে পচিয়া ॥
দেহ হতে প্রাণপাখী উড়ে যাবে যবে।
হয় কীট নয় ভস্ম নয় বিষ্ঠা হবে ॥

৬। পার্থিব সুখের বশীভূত নহ তুমি।
তোমাকে দেখিলে তুচ্ছ হয় স্বর্গভূমি ॥

৭। দারা বল পুত্র বল বেদিয়ার খেলা।
দিন দুই তরে করে সংসারেতে মেলা ॥
খাবার লাগিয়া ছল করে পরিবার।
ভাব দেখি ভাই তুমি কে হয় তোমার ॥
গলে দিয়া প্রেমফাঁসি নারী জোরে টানে।
সেই টানে বোকা কর্তা মরেন পরাণে ॥
মুখেতে মধুর ভাষা অন্তরেতে বিষ।
অর্থ না পাইলে হাতে কর খিশমিশ ॥
রমণীর প্রেম হয় গরল সমান।
অমৃত বলিয়া তাহা মূর্খে করে পান ॥
মৃত্যুকালে পুত্রকন্যা নিকটে আসিয়া।
বলে বাবা মোর তরে গেলা কি করিয়া ॥[১৩৬]

৮। তুমি কার কে তোমার কেবা আত্মপর।
মায়া বিটি খেলিতেছে যেন বাজীকর ॥

৯। তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে।
প্রভু কন্যাকুমারী চলিলা দেখিবারে ॥
পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই।
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই ॥

[১৩৬] জয়গোপাল পাঠককে নিতান্ত বুদ্ধিহীন ভাবিয়াছিলেন, দীনেশচন্দ্রও এই কলে পা দিয়াছিলেন। এ রচনা যিনি ১৬শ শতাব্দীর বলিয়া চালাইতে চাহেন তাঁহার ভাষাজ্ঞানের বহর দেখিয়া অবাক হইতে হয়। 'গলে দিয়া প্রেমফাঁসি নারী জোরে টানে। সেই টানে বোকা কর্তা মরেন পরাণে ॥' —এই ধরণের বাক্যবিন্যাস ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে হইতেই পারে না। বড় জোর ভারতচন্দ্র এইরূপ বাক্‌রীতি ব্যবহার করিতে পারিতেন।

বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া সেইখানে।
ঈশ্বরের গুণগান করিছে সজ্ঞানে ॥
সেই ভাব দেখিলে চিত্ত হয় আনন্দিত।
ভাবের উদয়ে দেহ হৈল পুলকিত ॥
পর্বত সমান বালি হয়ে স্তূপাকার।
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার ॥
হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর।
কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য দেখে যার শুদ্ধ মন ॥[১৩৭]

১০। কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরি রাজে।
ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে ॥[১৩৮]

... ...

নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা ॥

১১। মায়ার যবনিকা মধ্যে আছে একজন।
যবনিকা তুলে তাঁরে কর দরশন ॥

আর অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই, কম্বলের লোম বাছিয়া কি লাভ? পাঠকগণ গোবিন্দদাসের কড়চার যে-কোন স্থান উল্টাইলেই দেখিবেন ইহার ছত্রে ছত্রে আধুনিক বাক্যবিন্যাস, শব্দযোজনা, বাক্‌রীতি ও বাগ্‌ধারা। তত্ত্বকথা ব্যাখ্যায় জয়গোপাল খানিকটা বৈদান্তিক মায়াবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, বাকি অংশগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার অক্ষম paraphrase করিয়া দিয়াছেন। রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাধ্যসাধন তত্ত্ব আলোচনা চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, জয়গোপালের গোবিন্দদাস যেন অলৌকিক শক্তিবলে বহুপূর্বেই অবিকল

[১৩৭] গোবিন্দদাসের এই নিসর্গ সৌন্দর্যবোধ একেবারে হাল আমলের ব্যাপার। বিশেষতঃ শেষে দুই পংক্তি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির আধুনিক গীতিকবিতার ঢঙে রচিত।

[১৩৮] জয়গোপালের কবিতারচনার হাত নিতান্ত মন্দ নহে। দ্বিতীয় সংস্করণের ৭১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে "জঙ্গলের শোভা হয় অতি মনোহর" হইতে পর পর কয়েক পংক্তিতে যে অরণ্যের বর্ণনা আছে, তাহা কদাপি মধ্যযুগের রচনা হইতে পারে না।

সেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকপাঠিকারা চৈতন্যচরিতামৃতের সঙ্গে নিম্নলিখিত কড়চাংশটি মিলাইয়া দেখিলেই সমস্ত ব্যাপারটার কিনারা করিতে পারিবেন :—

প্রভু কহে কোন তত্ত্বে শুদ্ধ হয় মন।
রায় বলে সেই তত্ত্ব সাধুর মিলন॥
তাহাতেও সূক্ষ্মতর চাই তব ঠাঁই।
রায় কহে ত্যাগ বিনু আর তত্ত্ব নাই॥
প্রভু কহে সূক্ষ্মতত্ত্ব হয় অনুরক্তি।
রায় কহে তাহাতেও উচ্চ প্রেমভক্তি॥
প্রভু কহে আরো সার কহ মহামতি।
রায় কহে সর্বসার রাই রসবতী॥
রামরায় আরো সার বলিবারে চায়।
অমনি বদন চাপি ধরে গোরা রায়॥

এখানে "তা হতেও সূক্ষ্মতর চাই তব ঠাঁই" এবং "অমনি বদন চাপি ধরে গোরা রায" দুইটি পংক্তি চৈতন্যচরিতামৃতের 'এহো হয় আগে কহ আর' এবং 'প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল' পংক্তিদ্বয়ের কাঁচা রকমের নকল। একদা রসময় মিত্র মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃতের সঙ্গে জয়গোপালের গোবিন্দদাসের কড়চার মিল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। জয়গোপাল বৈষ্ণবসাহিত্য—বিশেষতঃ চৈতন্যচরিতামৃত ভাল করিয়াই পড়িয়াছিলেন। সেই আদর্শ এই গ্রন্থে পুরাপুরি বজায় রাখিয়াছেন। এইরূপ অসংখ্য আধুনিক দৃষ্টান্তের জন্য পাঠকের গুরুতর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক—গোটা কড়চাখানাই জয়গোপালের রচনা নহে তো? যাহা হোক ইহার ভাষা, নিখুঁত পয়ার ছন্দ, মার্জিত বাগ্‌ভঙ্গি প্রভৃতি বিচার করিলে জয়গোপালের সততা ও সত্যভাষণের প্রতি যে-কোন পাঠকের বিশেষ সন্দেহ হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, কড়চা পুরাপুরি জয়গোপালের রচিত যদি নাও হয়, অন্ততঃ ইহার অধিকাংশ স্থলে পণ্ডিত মহাশয়ের পরিপক্ক এবং আধুনিক রচনা উঁকি দিতেছে। এরূপ একখানা জালগ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একদা ইহাকে অবলম্বন করিয়া বাংলা সাময়িকপত্রের অনেক পৃষ্ঠা বৃথা নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইল।

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্তগণ ইহার তথ্য ও তত্ত্বগত নানা ত্রুটি ধরিয়াছেন। মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ তো কড়চাকে ধূলিশায়ী করিবার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'গোবিন্দদাসের কড়চারহস্য' ও ঢাকার বিপিন-বিহারী গুপ্তের *Govindadas's Kadcha—a Black Forgery* প্রকাশিত হইবার পর কড়চা আর সে ধূলিশয্যা হইতে উঠিতে পারে নাই। বৈষ্ণব সমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্যগণ এই কড়চার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

জয়গোপাল চৈতন্যদেবকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, মহাপ্রভু পাপীতাপীর ত্রাণ এবং প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ বিষয়েও তিনি অন্যান্য বৈষ্ণবদের মতোই দৃঢ়নিষণ্ণ ছিলেন। কতবার চৈতন্যদেব দুর্বিনীত দস্যুতস্করকেও প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিতেছেন, এ বর্ণনা অস্বাভাবিক বা অনৈতিহাসিক নহে। কিন্তু গোল বাধিয়াছে অন্যত্র। কড়চার কয়েক স্থলে আছে যে, চৈতন্যদেব নারীসমাজে, এমন কি বারাঙ্গনাদিগকেও কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিতেছেন। যিনি চৈতন্যের জীবনকথা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও জানেন, তিনিই বুঝিবেন, চৈতন্যদেবের চরিত্রের এরূপ বর্ণনা কিরূপ অন্যায়, কুৎসিত ও রুচিবিরোধী। সন্ন্যাসজীবনে নারী সম্বন্ধে মহাপ্রভু অতি সতর্ক ছিলেন, তিনি নিজেও যেমন নারীসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতেন. তেমনি অনুচরদিগকেও সাধ্যমতো দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ছোট হরিদাসের প্রতি তাঁহার নির্মম ব্যবহার আমাদের মনে বেদনা সঞ্চার করে। কিন্তু নারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন, তাঁহার এইরূপ নিষ্ঠুরতা কোন কোন সময় অযৌক্তিক মনে হয়। গোবিন্দদাস কর্মকার সেই চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম-ভারত ভ্রমণ কিরূপভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন দেখা যাক।

ঢুণ্ঢিরাম স্বামীকে উদ্ধারের পর মহাপ্রভু যখন বটেশ্বর তীর্থে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেখানে এক ধনীব্যক্তি সত্যবাঈ ও লক্ষ্মীবাঈ নাম্নী দুই জন পণ্যারমণী সঙ্গে লইয়া হাজির হইল। সেই ধনীর নির্দেশে :

কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন।
সত্যারে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥

ইহাতে সত্যবালার অভূতপূর্ব পরিবর্তন হইল। তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, লক্ষ্মীও ভয় পাইল। তখন "ধেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে।" মহাপ্রভুও উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন :

খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর॥
সবে এলোথেলো হল প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরিহরি।
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥
গিয়াছে কৌপীন খসি কোথা বহির্বাস।
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বয়ে শ্বাস॥

… … … …

ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল।
চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল।
চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্য জ্ঞান।
হরে বলে বাহু তুলে নাচে আগুয়ান॥
সত্যারে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি।
হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি।
অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি॥

আধুনিক পাঠকও এই বিবরণ পড়িয়া প্রায় অজ্ঞানের মতোই হইবেন, এই বর্ণনা অসম্ভব, অনৈতিহাসিক, অস্বাভাবিক ও কুরুচিপূর্ণ।[১৩৯] শুনা যায় জয়-

[১৩৯] কড়চা অনুসারে মহাপ্রভু বারমুখী নামে আর এক বারাঙ্গনাকেও নাকি হরিনাম দিয়া উদ্ধার করেন। এই বারমুখী—

বেশ্যাবৃত্তি করি সাধিয়াছে বহু ধন।
বহু মূল্য হয় তার বসনভূষণ॥
প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে বারমুখী থাকে।
হরিতে ধনীর ধন ফিরে পাকে পাকে॥

সে মহাপ্রভুর অলোকসামান্য ভক্তিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া নিজ পাপব্যবসায়কে ধিক্কার দিয়া সন্ন্যাসিনী হইবার জন্য মহাপ্রভুর পদতলে পড়িল। মহাপ্রভু তাহাকে তুলসী কাননে হরি ভজিতে উপদেশ দিলেন। এ সব গল্প শুনিতে মন্দ নহে। কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবনে কোন দিনই এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই।

গোপাল নাকি বৈষ্ণব শাস্ত্র ও চৈতন্যজীবনী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। আমাদের কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ হয়। চৈতন্যজীবনী ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে যাঁহার সামান্যতম জ্ঞান আছে, তিনিই বুঝিবেন যে, চৈতন্যদেব একজন গণিকাকে 'বাহুতে ছাঁদি' তাহাকে হরিনাম পান করাইবার জন্য মত্ত হইবেন, ইহা মহাপ্রভু সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড আজগুবি 'লাইবেল'। গোস্বামী মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয় বলিয়াছেন, "বালস্বভাবহেতু পণ্ডিত মহাশয় কখনও কখনও অদ্ভুত বা আজগুবি বিষয়ের অবতারণা করিতে ভাল বাসিতেন।" উল্লিখিত বর্ণনাটি সেই কিম্ভূত আজগুবির অন্তর্গত—এ সমস্তই পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীহস্তের কারসাজি তাহাতে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

চৈতন্যদেব মহোৎসাহে বেশ্যা-সেবাদাসী উদ্ধার করিয়া বেড়াইতেছেন, এরূপ ঘটনাও গোবিন্দদাসের কড়চায় খুব ফলাও করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জিজুরাতে খাণ্ডবা নামক দেবমন্দিরে দেবদাসীগণ তীর্থযাত্রীদের লইয়া বেশ্যাবৃত্তি করিত; সে যুগের প্রথামতো অনেকে পুণ্যকর্ম হইবে মনে করিয়া নিজ নিজ কন্যাদিগকেও ঐ মন্দিরে সেবাদাসী করিয়া দিত। ঐ বেশ্যাদের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। গোবিন্দ কত নিষেধ করিল ("মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই"), কিন্তু কাহার সাধ্য মহাপ্রভুকে ফিরাইয়া আনে! তিনি বেশ্যাপল্লীতে গিয়া তাহাদের মধ্যে হরিনামের প্রচার করিবেন-ই:

নারীগণে বলে প্রভু কর হরিনাম।
নাম বলে অবশ্য পাইবে নিত্যধাম॥

সমস্ত বেশ্যা কৃষ্ণ ভজিতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে প্রধানা বেশ্যা ইন্দিরাবাঈ অনুতপ্তচিত্তে মহাপ্রভুর পদ ধারণ করিল:

আসিয়া ইন্দিরা বাঈ করজোড়ে কয়।
দয়া কর আমারে সন্ন্যাসী মহাশয়॥
বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি কুকর্ম করিয়া।
উদ্ধার করহ মোরে পদধূলি দিয়া॥
এত বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়।
নাম দিয়া প্রভু উদ্ধারিল ইন্দিরায়॥
হরিনাম পেয়ে তবে ইন্দিরা সুন্দরী।
গৃহ থেকে বাহিরিল সব ত্যাগ করি॥

চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এই সমস্ত অপদার্থ বর্ণনা মধ্যযুগের কোন কবির লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না। দীনেশচন্দ্র বালসুলভ আবেগে এই সমস্ত বর্ণনা মোদকখণ্ডবৎ গলাধঃকরণ করিয়াছেন, ইহাতেই দুঃখ হয়।

ভাষার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার ছত্রে ছত্রে আধুনিক হস্তক্ষেপ, শব্দ-যোজনাতেও আধুনিকতা অতি স্পষ্ট। দুই এক স্থলে পুরাতন শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা মূল রচনার সঙ্গে আদৌ খাপ খায় নাই। অভিজ্ঞ ভাষাজ্ঞানী পাঠক একটু বাজাইলেই ভাষাকে ইচ্ছাকৃত পুরাতন করিবার অপচেষ্টা সহজেই ধরিয়া ফেলিবেন। 'জানালা', 'গেলাস', 'আড্ডা', 'পেটুক', 'খড়ম', 'হানাপানা', 'হাঁসফাঁস', 'পেছু পেছু যাই', 'উত্তরীয় ভিজে যায়', 'থুতনি', প্রভৃতি আধুনিক শব্দের ছড়াছড়ি সর্বত্র লক্ষ্য করা যাইবে। ভৌগোলিক অনৈক্য, বৈষম্য, ভুলত্রুটি সম্বন্ধে নানাজনে আলোচনা করিয়াছেন। এখানে তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। শুধু দুইটি ভৌগোলিক ভ্রান্তির কৌতুককব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। কড়চায় 'পূর্ণনগর' (অর্থাৎ আধুনিক পুনা) এবং রসালকুণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে। এ বিষয়ে যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মন্তব্য মারাত্মক :

> Russell-Konda is quite a modern town, founded in 1836 and named after a Madras Civil Servant, Mr. George Russell. It had no existence in 1511, in which yeaı Jaygopal Goswami makes our saint visit it.

'পুণ্যনগরী' সম্বন্ধে স্যর যদুনাথ বলিতেছেন :

> In 1511 Poona was a very small and obscure village with a scanty population and without any temple to attract pilgrims.[১৪০]

ইহার পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, জয়গোপাল হয়তো সত্যই কোন কীটদষ্ট পুঁথি পাইয়াছিলেন, কিন্তু যে সমস্ত স্থান বুঝিতে পারেন নাই, অথবা মনে করিয়াছিলেন যে, জনসাধারণের নিকট পুরাতন শব্দ দুরূহ মনে হইবে—শুধু সেইগুলি বদলাইয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে দুই চারিটি আধুনিক শব্দ ও বর্ণনা প্রবেশ করিয়াছে। এ অনুমান যুক্তিবিরোধী নহে। কিন্তু জয়গোপাল প্রথম সংস্করণে

১৪০ বিপিনবিহারী দাশগুপ্তের *Govindadas's Kadcha—a Black Forgery* গ্রন্থে স্যর যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

এ বিষয়ে একটি কথাও বলেন নাই, এমন কি দুই ছত্রের ভূমিকাও যোগ করেন নাই। সুতরাং এ সমস্ত কথা আধুনিক লেখকের জল্পনা মাত্র, জয়গোপালকে অনৃতাচারের দোষ হইতে মুক্তি দিতে হইলে এরূপ অনুমানের সাহায্য লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। না হয় দুই চারিটি আধুনিক শব্দ ছাড়িয়া দেওয়া গেল। ধরিয়া লইলাম "হয়ত তিনি তাঁহার ভাষাকে আধুনিক জনের সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং যেখানে পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই, সেখানে নিজে 'জানালা' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া পয়ার রচনা করিয়া দিয়াছেন।"[১৪১] কিন্তু আমাদের অভিযোগ দুই চারিটি শব্দ পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ নহে। গ্রন্থের বারো আনা অংশের ভাষাভঙ্গিমা, ছন্দোবিন্যাসও বাগধারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ভাষার সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায় বলিয়া আমরা সন্দেহ করি—গোটা কড়চাখানা যদি জাল নাও হয়, তবু ইহার অধিকাংশই এমন একজন আধুনিক যুগের প্রাচীন-শিক্ষিত ভক্তবৈষ্ণবের রচিত যিনি চৈতন্যকে বিশেষ ভক্তি করিতেন, কিন্তু চৈতন্যাদর্শের নিগূঢ় তত্ত্ব ভাল বুঝিতেন না, এবং যাঁহার ধর্মতত্ত্বের আদর্শ কিঞ্চিৎ বেদান্ত এবং বাকিটুকু চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে গৃহীত।

গোবিন্দদাসের কড়চার মধ্যে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক স্বাভাবিক বর্ণনা আছে, গোবিন্দ কর্মকারের পেটুকপনা মাঝে মাঝে বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে, মহাপ্রভু প্রায় সব সময়ে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর মতো "কা তব কান্তা কস্তে পুত্র" ঘোষণা করিয়াছেন। প্রাকৃতিক বর্ণনা, সাগর পর্বতের চিত্র অনেকটা নবীনচন্দ্র সেন ও গোবিন্দচন্দ্র দাসের মতো, দুইচার স্থলে ঈশ্বর গুপ্তের মতো মৃদু পরিহাসও আছে। জয়গোপালের কবিতার হাত নিতান্ত মন্দ ছিল না। দুই-একটি উক্তি বেশ গাঢ় ও অর্থবহ :

১। জড়ে আর চৈতন্যে গাঁইট লাগায়েছে।
সে খুলিতে পারে যার রজস্তম গেছে॥

২। এলাইয়া দিলা কেশ বারমুখী দাসী।
স্থির বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘরাশি॥ (বারমুখী বেশ্যার বর্ণনা)

৩। প্রেম প্রেম করে সবে প্রেম জানে কেবা।
প্রেমের কি তত্ত্ব হয় রমণীর সেবা॥

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ৪১৯

অভেদ পুরুষনারী যখন জানিবে।
তখন প্রেমের তত্ত্ব অবশ্য স্ফুরিবে।

এই পরিচ্ছন্ন পয়ার ও শব্দগ্রন্থন মধ্যযুগীয় কবির রচিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তথাকথিত পুঁথির নকল দেখিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশের পর জয়-গোপাল নানাজনের বাদপ্রতিবাদ ও আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াও এবিষয়ে কদাচ মুখ খুলেন নাই; তদুপরি বর্ণনা, শব্দযোজনা ও আদর্শে এমন আধুনিকতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে গোবিন্দদাসের কড়চাকে চৈতন্যদেবের প্রাচীন, প্রামাণিক ও বিশুদ্ধ জীবনী বলিয়া কিছুতেই গণ্য করা যায় না।

'গোবিন্দদাস কর্মকারের পরিচয়॥ কড়চা অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, বর্ধমানের কাঞ্চননগরের মূর্খ কর্মকার গোবিন্দদাস স্ত্রী শশিমুখীর কাছে গালি খাইয়া অভিমানে ঘর ছাড়িয়া[১৪২] নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবক হন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলে গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গী হইলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পূর্বে নিত্যানন্দ যখন মহাপ্রভুকে বলিলেন:

দক্ষিণ যাত্রায় তুমি যাবে অতি দূর।
সঙ্গে যাক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥

কিন্তু মহাপ্রভু শুধু গোবিন্দকেই সঙ্গে লইতে চাহিলেন:

যে যাক সে নাহি যাক গোবিন্দ যাইবে।
আমার যে কায তাহা গোবিন্দ করিবে॥

অথচ চৈতন্যের কোন প্রামাণিক জীবনীতে মহাপ্রভুর দক্ষিণযাত্রার সঙ্গী হিসাবে গোবিন্দ কর্মকার নামক কোন ভৃত্যের নামমাত্রও উল্লেখ নাই। বৃন্দাবনদাস দক্ষিণভ্রমণ বাদ দিয়াছেন, সেখানে এ প্রসঙ্গই নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কালা কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন; এই ব্রাহ্মণই মহাপ্রভুর দক্ষিণ-যাত্রার সঙ্গী হইয়াছিলেন। অবশ্য গোবিন্দ নামে প্রভুর একাধিক ভক্তপরিকর ছিলেন (গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানন্দ ও দ্বারপাল গোবিন্দ)। কিন্তু ইঁহাদের কেহই কর্মকার গোবিন্দ নহেন, এবং কেহ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-যাত্রার সঙ্গী হন নাই। প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী'তে যে গোবিন্দের

---

[১৪২] মতিলাল ঘোষ এ বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছিলেন। জয়গোপাল তাঁহাকে প্রথমে যে পাণ্ডুলিপি দিয়াছিলেন, এবং পরে যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, এই শশিমুখীর কোন প্রসঙ্গ নাকি তাহাতে ছিল না। মৃণালকান্তি ঘোষের 'গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য' (পৃ. ৩-৪) দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ আছে এবং কড়চার গোবিন্দদাস যে এক ব্যক্তি তাহা প্রমাণ করা যায় না। দীনেশচন্দ্র অবশ্য দুইটি 'অকাট্য' প্রমাণের উল্লেখ করিয়া গোবিন্দকে খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটি প্রমাণ—বলরামদাসের পদের কয়ছত্র :

নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লঞা
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।

এই পদটি পুরা আকারে শুধু 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, আর কোথাও এই পদ বা অনুরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কাজেই ইহার প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নহে। কারণ ভদ্র মহাশয় এই বৃহৎ পদ সঙ্কলনে অনেক সময়ে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই—যেমন তিনি 'সঙ্কর্ষণ' ভণিতাযুক্ত একজন আধুনিক ছদ্মবেশী কবির রচনাকে প্রাচীন বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

আর একটি প্রমাণ—জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' গোবিন্দ কর্মকারের উল্লেখ :

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য আর গোবিন্দ কর্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাঁটোয়া গঙ্গাপার ॥

অন্যত্র :

মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে পার হইলা গৌরচন্দ্র ॥

কিন্তু বৃন্দাবনদাসের মতে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস লইয়া দেশ ত্যাগের সময় পাঁচজন অনুচর তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন—নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, গদাধর ও ব্রহ্মানন্দ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে—নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, জয়ানন্দ কথিত গোবিন্দ কর্মকার ও কড়চার গোবিন্দ একই ব্যক্তি, তাহা হইলেও জয়ানন্দ তো একথা কোথাও বলেন নাই যে, এই গোবিন্দ কর্মকার মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সুতরাং দীনেশচন্দ্র জয়ানন্দের এই উল্লেখটিকে 'তুরুপ' হিসাবে কেন ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন বুঝা যাইতেছে না। জয়ানন্দের গ্রন্থ চৈতন্যজীবনী হিসাবে আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে। গ্রন্থটির কাব্যমূল্য যৎসামান্য, দার্শনিকতা বা তত্ত্বকথার নামগন্ধও নাই। সুতরাং ইহারই দেড়খানি উক্তির উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দদাস কর্মকারকে কড়চার লেখক-

রূপে প্রমাণ করা যায় না। অবশ্য কেহ কেহ কিছু গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলের চারিস্থানে গোবিন্দের নাম আছে :

১। মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার ॥

২। মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গী নিত্যানন্দ।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে পার হৈল গৌরচন্দ্র।

৩। সঙ্গে গোবিন্দানন্দ সিংহদ্বার.তলে।

৪। সঙ্গে গোবিন্দানন্দ সিংহদ্বার তলে।

এই চারিটি দৃষ্টান্তের প্রথমটিতে 'গোবিন্দ কর্মকার' আছে, আর সর্বত্র গোবিন্দানন্দ রহিয়াছে। জয়ানন্দের দুইখানি পুঁথিতে 'গোবিন্দ কর্মকার' আছে এবং একখানিতে 'গোবিন্দানন্দ আর' আছে। 'গোবিন্দ কর্মকার' প্রকৃত নাম হইলে জয়ানন্দ অধিকাংশ স্থলে কর্মকার বলিয়াই উল্লেখ করিতেন—তাই মনে হয় ইঁহার পুরা নাম গোবিন্দানন্দ। ইনি গোবিন্দানন্দ হউন, আর গোবিন্দ কর্মকারই হউন, ইনি যে কড়চার রচয়িতা এবং মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী, তাহার স্বপক্ষে সুদৃঢ় প্রমাণের অভাব রহিয়াছে। দীনেশচন্দ্র পুরীর দ্বারপাল শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে কড়চার গোবিন্দের একীকরণ করিতে গিয়াছেন বটে, কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ গোবিন্দের বিদ্যাবুদ্ধির সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "গোবিন্দের বাঙ্গালার সামান্যরূপ অক্ষর পরিচয় মাত্র ছিল।" অথচ কড়চার গোবিন্দ কর্মকার বেদান্ত সূত্র অক্লেশে ব্যাখ্যা করিতেছেন, ন্যায়শাস্ত্রের 'কোটেশন' দিতেছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে :

১। কেহ কারু নহে এই প্রমেয়ের ধারা।
না হয় করিতে সিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা ॥

২। অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়।
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তুলি চৈতন্য বুঝায় ॥

৩। কৃষ্ণতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়া জড়জগৎ হয়।
তার প্রতিবিম্ব স্বপ্ন বেদে ইহা কয়।

৪। যারা অবয়বে অবয়বী জ্ঞান করে।
চিরবাস করে তারা নরক ভিতরে।

৫। দ্বা সুপর্ণা এ শ্রুতির মর্ম যদি জান।
তবে কেন দুই তত্ত্ব এক বলি মান।

৬। সর্বদা শাম্ভবী মুদ্রা নয়ন মাঝারে।
না রহিল পাপীতাপী হেরিয়া ইহারে॥

৭। মৎসর যাহার চিত্তে সদা খেলা করে।
পিতৃপতি[১৩৩] নিজ হস্তে তার দণ্ড করে।

এখানে লক্ষ্য করা যাইবে 'মূরুথ নির্গুণ' এবং 'অস্ত্রহাতা বেড়ী গড়া' গোবিন্দ কর্মকার ন্যায় ও দর্শনের প্রমা, প্রমেয়, প্রমাণ, অদ্বৈত-দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিম্ব-প্রতিবিম্বতত্ত্ব, অবয়ব-অবয়বী, উপনিষদের 'দ্বাসুপর্ণা' শ্লোক, শাম্ভবী মুদ্রা প্রভৃতির সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। এ দিক দিয়াও তাঁহার অস্তিত্ব সংশয়পূর্ণ।

নূতন কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে কড়চা ও কড়চার কবি গোবিন্দদাস কর্মকারের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। পরিশেষে আমরা ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি: "যুক্তিতর্কের উপরে বিশ্বাসকে স্থান না দিলে গোবিন্দদাসের কড়চাকে খাঁটি বলা অসম্ভব।...সুতরাং বর্তমান কালের বিচারক যদি সরল বিশ্বাসকে সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ না করিয়া সম্পাদক-প্রকাশক জয়গোপাল গোস্বামীকে গোবিন্দদাসের কড়চার উদ্ভাবক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তবে ন্যায় সঙ্গতই হইবে" (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ)।

চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয় (ভুবনমঙ্গল)॥

ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' (১৯৫৭) প্রকাশিত হইবার পর পাঠক সমাজ আর একখানি প্রাচীন চৈতন্য-জীবনীকাব্যের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। ইহার মাত্র একখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, প্রাচীন কোন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই, কাজেই পাঠক সমাজে এই গ্রন্থ এবং কবির নাম অজ্ঞাত থাকিবার কারণ

[১৩৩] পিতৃপতি—যম।

রহিয়াছে। অবশ্য 'পদকল্পতরু'তে[১৪৪] চূড়ামণি দাসের ব্রজবুলিতে রচিত একটি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পদকর্তা চূড়ামণি দাস এবং 'গৌরাঙ্গবিজয়ে'র কবি চূড়ামণি দাস একই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ 'গৌরাঙ্গবিজয়ে'র অনেক স্থলে ব্রজবুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, 'পদকল্পতরু'র পদটিও ব্রজবুলিতে রচিত। কবির বোধহয় ব্রজবুলির প্রতি অধিকতর আকর্ষণ ছিল।

চূড়ামণি দাস বৈষ্ণবপদসাহিত্যে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। পদকল্পতরু, রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি পদসঙ্কলন গ্রন্থে চূড়ামণি ভণিতাযুক্ত মোট ৯টি পদ পাওয়া গিয়াছে।[১৪৫] তাঁহার চৈতন্যজীবনীকাব্যের কথাও দীনেশচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছিলেন।[১৪৬]

১৪৪ ।। নাটিকা বেলোয়ার ।।

নাচত মোহন নন্দদুলাল মেরো কান।
নাসা বিরাজিত মোতিম ভূষণ
কটি মাঝে ঘুঙ্গুর রসাল ।।
সুন্দর উরপর বর রুক নখপদ
সরুরুহ রতনমঞ্জীর।
নব নব বচ্ছ- পুচ্ছ ধরি ধাযত
পতন অঙ্গুলী ধূলিধূসর শরীর ।।
মরকত চান্দ সুন্দর মুখমণ্ডল
পরিসর কুঞ্চিত অলক হিলোল।
ব্রজ রমণী পরবোধ করায়ত
নয়ন ফিরায়ত আধ আধ বোল ।।
অভিনব নীল জলদ জিনি তনুরুচি
কহিল মহিল রূপ কিয়ে নিরমাণ।
কত কত ভকত যতন করি ধ্যাওত
সবে চূড়ামণি দাসের এই নিবেদন ।। পদকল্পতরু, পদ—১১৪২

১৪৫ দীনেশচন্দ্র—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

১৪৬ "চূড়ামণি দাস গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব লেখকগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উপলক্ষ্যে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।" (দীনেশচন্দ্রের উক্তগ্রন্থ, পৃ ৩০) দীনেশচন্দ্র চূড়ামণি দাসের এই পুঁথি দেখিয়াছিলেন। কারণ চূড়ামণি দাসের এই গ্রন্থের একাধিক স্থলে বৌদ্ধদের প্রতি কটূক্তি উচ্চারিত ও বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে।

মূল পুঁথির (এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুঁথি সংখ্যা—৩৭৩৬) অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ডঃ সেন অনুমান করেন পুঁথির অনুলিপিটি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু অক্ষরের সুগঠিত রূপ দেখিয়া ইহাকে আরও আধুনিক কালের বলিয়া মনে হয়। পুঁথির গোড়ার দিকের কিছু অংশ নষ্ট হইয়াছে এবং ভিতরের দুই-তৃতীয়াংশই খোয়া গিয়াছে, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ খণ্ডিত আকারে কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছে। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডের মধ্যে শেষের দুইটি খণ্ড যেখানে লুপ্ত হইয়াছে, সেখানে শুধু আদি খণ্ডের যৎসামান্য অংশের আলোচনা করিয়া লাভ নাই। তবু ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা করিবার জন্য এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অবতারণা করা যাইতেছে।

গ্রন্থটির যথার্থ কি আখ্যা ছিল তাহা প্রথমে বুঝা যায় না। গ্রন্থের মধ্যে দুই একস্থলে 'ভুবনমঙ্গল' নামটি উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ) ইহাকে 'ভুবনমঙ্গল' নামেই অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের যেটুকু রক্ষা পাইয়াছে তাহার শেষ পৃষ্ঠায় আছে :

আদি খণ্ড-মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড কহিব।
গৌরাঙ্গবিজয় তিন খণ্ড পূর্ণ হৈব ॥

এখানে স্পষ্টই 'গৌরাঙ্গবিজয়' নাম রহিয়াছে। ডঃ সেনও সম্পাদিত গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' তৃতীয় সংস্করণেও এ গ্রন্থকে 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। চূড়ামণি দাস ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ধনঞ্জয় পণ্ডিত তাঁহার গুরু। নিত্যানন্দের যে দ্বাদশজন ভক্ত 'দ্বাদশ গোপাল' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ধনঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। কবি তাঁহার গুরুর নিকট চৈতন্য ও নিত্যানন্দের জীবন-বিষয়ক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বোধহয় নিত্যানন্দ-সেবক গদাধর দাস-রামদাসও তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। জীবিত কালে নিত্যানন্দ যখন তাঁহার শিষ্য গদাধর ও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতেন, তখন চূড়ামণি দাসও তাহার কিছু কিছু শুনিয়া থাকিবেন। তারপর নিত্যানন্দের তিরোধানের পর তাঁহার স্বপ্নাদেশের ফলে চূড়ামণি 'গৌরাঙ্গ-

বিজয়' রচনা করেন। কবি এই কাব্যে খুব সংক্ষেপে কিছু কিছু নিজের কথা বলিয়াছেন :

আবালক কাল হৈতে স্বভাব আমার।
অলস অদক্ষ অজ্ঞ আকৃতীর সার ॥

তাঁহার গুরু ধনঞ্জয় 'অলস অদক্ষ' কবিকে কৃপা করিয়া ভরসা দিলেন যে, "কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে তোর হৈব সত্য বোধ।" নিত্যানন্দের তিরোধানের কিছু পরে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সুতরাং মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইহা সমাপ্ত হইয়া থাকিবে।

কাব্যটির যে সামান্য অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তথ্যের দিক দিয়া দুই চারিটি নূতন কথা পাওয়া যায়। ইহার প্রথমাংশে বেশ ফলাও করিয়া মাধবেন্দ্র পুরীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মাধবেন্দ্রের সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, মাধবেন্দ্রই চৈতন্যের উপনয়ন সংস্কার করিয়াছিলেন—এরূপ বর্ণনাও ইহার অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। বলা বাহুল্য এ সমস্তই অলীক ব্যাপার। চূড়ামণি দাস প্রায় চৈতন্যের সমসাময়িক; চৈতন্য-তিরোধানের ষোল-সতের বৎসরের মধ্যে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে, অথচ তিনি চৈতন্যজীবনীর প্রধান ঘটনা সম্বন্ধেই তথ্যের সততা রক্ষা করিতে পারেন নাই। নিত্যানন্দ সম্বন্ধেও তাঁহার পরিবেশিত তথ্যের অনেকটাই এইরূপ গালগল্পের সমাহার মাত্র। ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য—চৈতন্যের বাল্যকৈশোরলীলা এবং পুরন্দর মিশ্রের ঘরবাড়ীর বাস্তব বর্ণনা। কিন্তু তাহাও কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা যায় না। তাঁহার বর্ণনায় দেখা যাইতেছে চৈতন্যের পিতৃদেব জগন্নাথ (পুরন্দর) মিশ্র বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন; প্রচুর ঐশ্বর্য, নানা দাসদাসী চাকর-নফরের বর্ণনা পড়িয়া তাঁহাকে ধনী বলিয়াই মনে হইতেছে। নিমাইয়ের উপনয়নে তিনি বিস্তর ধন ব্যয় করিয়াছিলেন, অনেক জাঁক হইয়াছিল। আহারাদির পর নিমাই সুচিক্কণ কুঞ্চিত বস্ত্র পরিয়া ও সূক্ষ্ম চাদর গায়ে দিয়া খাটে বিশ্রাম করিতে গেলে চাকর-নফরে তাঁহার পদসেবা করিত, দাসীরা শচীর পরিচর্যা করিত—এরূপ অনেক বর্ণনা রহিয়াছে। অথচ চৈতন্যদেবের প্রায় সমস্ত জীবনীতে তাঁহাদের সামান্য অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে—ধন-ঐশ্বর্য, চাকর-নফরের বিলাসিতা করিবার মতো আর্থিক অবস্থা জগন্নাথ মিশ্রের আদৌ

ছিল না। কাজেই চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়ে'র নূতন তথ্যগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে বাজাইয়া দেখা প্রয়োজন।

প্রথম খণ্ডেই কাব্যটি খণ্ডিত হইয়াছে, ইহার সামান্য রক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং কবির কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কবি মাঝে মাঝে ব্রজবুলি ব্যবহার করিলেও প্রায় কোথাও কবিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। নিছক বিবৃতিধর্মী ভাষায় কোনপ্রকারে কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। এক মুহূর্তের জন্য আখণ্ডল আচার্যের আবির্ভাব নীরস গদ্যাত্মক বর্ণনার মধ্যে কিঞ্চিৎ লঘু বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছে। কাব্য বা তথ্যগ্রন্থ হিসাবে 'গৌরাঙ্গবিজয়' বৈষ্ণবসমাজে কিছুমাত্র প্রচার লাভ করিতে পারে নাই, কেহ ইহার নামও জানিত না। আধুনিক কালের পাঠক এই নীরস কাব্যে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারিবে না—যদিও বাস্তব ও চাক্ষুষ বর্ণনায় চূড়ামণি দাসের রচনা নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। শুধু তথ্য ও বাস্তবতার সঙ্গে তাঁহার রসদৃষ্টি যুক্ত হইতে পারে নাই বলিয়া এই কাব্য জনস্মৃতি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

চৈতন্যের বাংলা জীবনীগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় সমালোচনা করা হইল। পুরীধামে দীর্ঘকাল বাস করিবার ফলে বহু ওড়িয়া ভক্ত ও সজ্জন মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিযাছিলেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ ওড়িয়া ভাষাতে মহাপ্রভুর অলোকসামান্য জীবনকাব্য রচনা করিয়া চৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়াছিলেন। চৈতন্যের পূর্বেই উড়িষ্যায় রাধাকৃষ্ণাশ্রয়ী বৈষ্ণবভক্তিধর্ম প্রচলিত ছিল—তাহার বড় প্রমাণ রায় রামানন্দ। রামানন্দ চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই সাধ্যসাধনতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও সখীসাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন, বরং তাঁহার সখীসাধনার ভাবটি বাঙালী ভক্তদের অধিকতর প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। শুনা যায়, উড়িষ্যায় যাঁহারা 'পঞ্চ সখা' (জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত দাস) নামে পরিচিত, তাঁহাদের সঙ্গে নাকি চৈতন্যের পরিচয় ছিল। এই 'পঞ্চ সখা' বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা চৈতন্য মতকে কখনও পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে অবশ্য চৈতন্যের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। যে কয়খানি ওড়িয়া গ্রন্থে চৈতন্যের জীবনকথা বর্ণিত

হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাধবের 'চৈতন্যবিলাস'[১৪৫], ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্য ভাগবত', দিবাকরদাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত'[১৪৬] এবং গোবিন্দদেবের 'গৌরকৃষ্ণোদয় কাব্যম্'[১৪৭] উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রায় সকলেই চৈতন্যের নীলাচল লীলার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন, কারণ তাঁহারা শুধু সেইটুকুই জানিতেন। তবে ইঁহাদের বিবরণ হইতে মনে হয় যে, এই সময় বোধহয় চৈতন্যের গৌড়ীয় ভক্ত ও উৎকলীয় ভক্তদের মধ্যে কিঞ্চিৎ রেষারেষি সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ দিবাকর দাস 'জগন্নাথ চরিতামৃতে' বলিয়াছেন যে, চৈতন্য ওড়িয়া ভক্তদের অতিশয় স্নেহ করিতেন বলিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর উপর ক্ষুব্ধ হইয়া পুরী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। এ সমস্ত জল্পনা হয় পুরাপুরি অলীক, আর না হয় অতিরঞ্জিত। যাহা হোক, চৈতন্যদেব যে শুধু গৌড়ীয় নহেন, উড়িষ্যাও তাঁহাকে দাবি করিতে পারে এবং ভক্তির দৃষ্টিতে সে দাবি অগ্রাহ্য করা যাইবে না, তাহা ওড়িয়া ভাষায় রচিত চৈতন্য-সংক্রান্ত প্রাচীন ওড়িয়া কাব্য হইতেই বুঝা যাইবে।

আসামী গ্রন্থেও চৈতন্যদেবের নানা প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। আসামের ভক্ত-সাধক ও কবি শঙ্করদেবের সঙ্গে চৈতন্যের নাকি পুরীধামে সাক্ষাৎ ও আলাপাদি হইয়াছিল, প্রাচীন আসামী গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ-ভারতীর 'সন্তনির্ণযে' শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা আছে। অবশ্য ইহা কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহাও বিবেচ্য। আসামী কবিদের প্রায় কেহই চৈতন্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ জানিতেন না, যদিও মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবনের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও আকর্ষণ ছিল। ভারতের পূর্ব প্রান্তেও যে তাঁহার ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল এবং আসাম অঞ্চলের অনেকেই তাঁহার পুণ্যস্মৃতিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।[১৪৮]

চৈতন্যজীবনী শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই বিশিষ্ট সম্পদ। একদা বাঙালী মর্ত্যলোক হইতে সুদূর স্বর্গের প্রতি হাত বাড়াইয়াছিল, চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলিতে সেই মর্ত্য ও অমর্ত্যলীলার রাখীবন্ধন হইয়াছে।

---

১৪৫ বোধহয় লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ওড়িয়া ভাষান্তর।

১৪৬ এই কাব্যের প্রথম সাত অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের বর্ণনা আছে।

১৪৭ এই কাব্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের স্বচ্ছন্দ সংস্কৃত অনুবাদ।

১৪৮ বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'

নবম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী : ভূমিকা

সূচনা ॥

শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের মর্মগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, আপাততঃ তাহাই বৈষ্ণব পদাবলীর গূঢ় তাৎপর্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে : "শাক্ত ধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণব ধর্মে এই ভেদকে নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্য স্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমাজের সকল অংশকে স্থান করিয়া দিয়াছেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবল বেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলঙ্কারশাস্ত্রের পাষাণ-বন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল ? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রাচীন সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীতপ্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।" রবীন্দ্রনাথের এ বিশ্লেষণ আদৌ অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন নহে। বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে গতানুগতিক জীবনের ক্লান্ত রোমন্থন হইতে রক্ষা করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যের ভূমিচারী কল্পনাকে ভৌম বৃন্দাবনে উধাও হইতে সাহায্য করিয়াছে এবং অনুবাদ-সাহিত্যের পুনরাবৃত্তির স্রোতকে নিত্য নব নব প্রাণ-চাঞ্চল্যে পূর্ণ করিয়াছে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদাবলী বাঙালীর একটা বিশেষ ধরণের

মানসিক সংস্কার, যাহা সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যেও একক মহিমায় আসীন। মঙ্গলকাব্য কবিকল্পনায় সমৃদ্ধিশালী নহে, ইহা হইতে গ্রামীণ মনোভাব মুছিয়া যায় নাই। অনুবাদ-সাহিত্য মূলতঃ উত্তরাপথের আদর্শের উপর আসন করিয়া লইয়াছে—অবশ্য বাঙালী-জীবনের আদর্শ, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদকে কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহাও স্বীকার্য। কিন্তু অনুবাদ-সাহিত্য বাঙালী-মনের মৌলিক আবিষ্কার নহে। এতদ্ব্যতীত লোকধর্মাশ্রয়ী বৌদ্ধ, নাথ, আউল-বাউল শ্রেণীর একপ্রকার গীতি ও পাঁচালি-সাহিত্য বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, তাহার ধর্মকৃত্য বাদ দিলে, বিশুদ্ধ সাহিত্য ও শিল্পাদর্শে এগুলি খুব একটা প্রশংসা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু শিল্পরস, অধ্যাত্ম সংস্কার, ধর্মীয় কৃত্য প্রভৃতির পটভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্য এমন একটা অনন্যসাধারণ চরিত্র লাভ করিয়াছে যে, মধ্যযুগের চারি শত বৎসরের বিপুলায়তন পুঁথি-আশ্রয়ী সাহিত্যের মধ্যে এক-মাত্র বৈষ্ণব পদাবলীই দেশকালের সীমা ছাড়াইয়া নিখিল মানবচিত্তের মধ্যে ঠাঁই পাইয়াছে। অবশ্য এ কথা যথার্থ—"বৈষ্ণব ধর্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণব ধর্মকে বাদ দিয়া এ সাহিত্যের আলোচনা চলে না।"[১] বৈষ্ণব ধর্ম, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল তাৎপর্য সম্বন্ধে অনবহিত থাকিলে বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ রসাস্বাদন একটু দুরূহ হইবে। বৈষ্ণব ধর্ম, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব এবং চৈতন্য-'কাল্ট্' সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকিলে বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ স্বরূপ বুঝা যাইবে না। তবু এই পদগুলির ভাষা, বাক্‌রীতি, কল্পনার উত্তরণ, ছন্দের মাধুর্য, রূপক-প্রতীকের শিল্পায়ন—সর্বোপরি মর্ত্য ও অমর্ত্য আবেগের সমন্বয় সাধারণ রসিক পাঠককেও আনন্দ দিতে সমর্থ। কিন্তু ভারতীয় মানস, ভাগবত ধর্ম, রাধাকৃষ্ণকথা প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঠকের কিঞ্চিৎ বিশ্বাস বা অভিজ্ঞতা না থাকিলে বৈষ্ণব পদাবলীর অনেকটাই নিছক লাম্পট্য বা ইন্দ্রিয়াসক্তির উত্তেজক রসায়ন বলিয়া মনে হইবে। সুইনবার্ণের কবিতা ও অমরুশতকের তুলনায় বৈষ্ণব পদাবলী সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী না হইলেও এই জগতের মধ্যেই যেন ইহার একটা স্বতন্ত্র স্থান রহিয়াছে। বৈষ্ণব পদাকারগণ মর্ত্যভূমিকে স্পর্শ করিয়া মহাকাশের চন্দ্রলোকের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিলেন। হয়তো তাঁহাদের কেহ কেহ গোষ্পদের আবিল জলে প্রতি-

---

১ সুশীলকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'বৈষ্ণব সাহিত্যে' অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ভূমিকা।

ফলিত চন্দ্রাভাসকে চন্দ্র বলিয়া রোমান্টিক ভাববাদের লূতাতন্তুজালে আপনা-দিগকে সহস্রপাকে জড়াইয়াছেন, তবু কল্পনা ও আবেগের উৎসার মধ্যযুগীয় বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীকে যে ভাবে অর্গলমুক্ত করিয়াছে, সেরূপ বন্ধনহীন চেতনার আবেগধর্ম প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তো দূরের কথা, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেও এরূপ গভীরতা, একনিষ্ঠতা ও তদেকাত্মভাব পাওয়া যায় না। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ-কাল-ধর্ম ঐতিহ্যের যেমন একটি সীমা ও স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি দেশকাল নিরপেক্ষ নিখিল মানবচিত্তের রসানুভূতির সঙ্গেও ইহার নিবিড় আত্মীয়তা লক্ষিত হইবে।

(বাঙলাদেশে চৈতন্যের পূর্বে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদসাহিত্য ছিল, আখ্যান-কাব্য ছিল, অনুবাদ-সাহিত্যও (ভাগবত) অনুশীলিত হইত। চৈতন্যের প্রভাবে ইহার ব্যাপকতা ও প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, চৈতন্যপ্রবর্তিত রাগানুগা ভক্তিধর্ম ও 'কাল্ট্'-এর একটা গভীর ছাপ পড়িয়াছে। তার পরে যে ধরণের সাহিত্যই রচিত হোক না কেন, কোন-না-কোন দিক দিয়া তাহার উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাব ও ভাষাগত প্রভাব পড়িয়াছে।) বৈষ্ণবদের সঙ্গে শাক্ত কবিদের বিরোধিতা না থাকিলেও খুব কিছু প্রীতির সম্পর্ক ছিল না; তাঁহারাও কিন্তু সর্বগ্রাসী আবেগবাদী প্রেমধর্মের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত পদসাহিত্য। অবশ্য (সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণব পদাবলী ক্রমে ক্রমে কৃত্রিম কাব্যকলার কবলগ্রস্ত হইলেও শ্রেণী-ধর্ম-নির্বিশেষে বাঙালী-মানসে ইহার অসাধারণ প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।) ধনী জমিদার, ভূস্বামী ও রাজসভার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ভাগ্যবান শ্রোতার সমাজে উত্তরাপথের মার্গসঙ্গীত অনুশীলিত হইলেও বৈষ্ণব পদাবলী-কীর্তন সাধারণ বাঙালী-মানসকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিক সমাজের আবির্ভাবে এবং সংস্কৃতিহীন বণিকশ্রেণীর প্রাধান্যে যে কবিসঙ্গীত সহসা নাগরিক স্থূল রুচিকে গ্রাস করিয়া শিল্প ও সাহিত্যের দীর্ঘ-কালাশ্রিত ঐতিহ্যকে প্রায় ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল, তাহাতেও বৈষ্ণব পদাবলীর বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে; হয়তো তাহার অনেকটাই অক্ষম অনুকরণ; নাগরিক রুচির উত্তেজনা মিটাইবার জন্য এবং নগদ বিদায়ের লোভে কবিওয়ালাদের দ্বারা উচ্চকণ্ঠে গীত হইত। তবু স্থূলরুচির কবিগানেও মাঝে মাঝে যে যথার্থ প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শ ও প্রভাব।

উনবিংশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলী কীভাবে ইংরেজী-শিক্ষিত আধুনিক বাঙালীকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস কৌতূহলজনক মনে হইতে পারে। গত শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের মধ্যে কলিকাতা ও শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্র হইতে কিছু কিছু প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ করে ; তন্মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্য উনবিংশ শতকের প্রথম দুই-তিন দশকের মধ্যে সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ও মহাজন পদাবলী অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলী এবং রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীত ঐ শতাব্দীর তিন-চারি দশকের মধ্যে ধর্মগ্রন্থরূপে কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রচুর পরিমাণে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে থাকে। তারপরে উনবিংশ শতকের চার-পাঁচ দশকের মধ্যে 'বটতলা' যখন ধর্মগ্রন্থ, গল্পকাহিনী ও ফারসী 'কেচ্ছা'র প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল, তখন বৈষ্ণব পদাবলী উচ্চ-শিক্ষিত মহলে না হইলেও, মধ্যমশিক্ষিত নাগরিক ও গ্রামীণ সমাজে বেশ প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ বটতলা হইতে প্রচারিত বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালী কুলধর্মে হয় বৈষ্ণব, আর না হয় শাক্তমতাবলম্বী ছিল। তন্মধ্যে বৈষ্ণবসমাজ নিজ নিজ মত, কৃত্য, গ্রন্থাদি প্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। উপরন্তু কলিকাতা হইতে চুঁচুড়া পর্যন্ত অঞ্চলের বিত্তবান সুবর্ণবণিক সমাজ, বর্ধমান-নদীয়া জেলায় অবস্থিত নানা 'বৈষ্ণব পাট', ঢাকার সাহা-উপাধিক শঙ্খবণিক-সমাজ ইত্যাদি নানা অঞ্চলেই বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রভাব প্রচার ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হইবে। ফলে ১৮৫০ সালের মধ্যেই বণিক সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু কিছু বৈষ্ণব গ্রন্থ, পদাবলী, চৈতন্য-জীবনীকাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

রামমোহন তন্ত্রাদির আনুকূল্য করিলেও বৈষ্ণবমত ও দর্শনের ঘোরতর প্রতিবাদী ছিলেন। যে সমস্ত বৈষ্ণব "দীর্ঘ তিলকছাপা খোল করতালের সহিত নগর কীর্তন" করিয়া বেড়ায়[২], কিংবা "যুক্তি হইতে এককালে চক্ষুর্মুদ্রিত করিয়া দুর্জয় মানভঙ্গ যাত্রা ও স্বুবলসম্বাদ" প্রভৃতি লীলাকীর্তন করেন[৩] এবং "বড়াই বুড়ীর যাত্রায়" উন্মত্ত হন[৪], তাঁহাদের প্রতি রামমোহনের কিছুমাত্র

২-৪ রামমোহন প্রণীত 'কবিতাকারের সহিত বিচার' দ্রষ্টব্য।

শ্রদ্ধা ছিল না।[৫] এমন কি বৈষ্ণবমতাবলম্বী চৈতন্যভক্তগণের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হওয়াও অর্থহীন পণ্ডশ্রম মনে করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাহার শব্দব্রহ্ম, তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে" ('পথ্যপ্রদান')। ঘোরতর অদ্বৈতবাদী রামমোহনের পক্ষে দ্বৈতবাদী ও ভক্তিপথাবলম্বী চৈতন্যতত্ত্বকে মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি বিরাগের ধারা ব্রাহ্মসমাজেও সম্প্রসারিত হইয়াছিল। মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিবার সিদ্ধান্ত করিলে ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বসু তাঁহাকে এই অশ্লীল ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মধুসূদন তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When we sit down to read poetry, leave aside all religious bias." অবশ্য মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' নিছক মানবীয় রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রচিত হইয়াছিল; ইহার পরিকল্পনার মূলে কোন প্রকার ভাগবতী লীলা বা দার্শনিক মনোভাবের চিহ্নমাত্রও ছিল না। তবে এইটুকু লক্ষণীয় যে, খ্রীষ্টান মধুসূদনের রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনীর প্রতি বৈষ্ণবসুলভ নিষ্ঠা না থাকিলেও কবিসুলভ আকর্ষণ ছিল। শুধু ব্রজাঙ্গনাতেই নহে, তাঁহার অধিকাংশ রচনায় প্রয়োজনস্থলে রাধাকৃষ্ণ ও ব্রজলীলার চিত্রকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যরচনা 'বাসুদেব-চরিত' ভাগবতের কিয়দংশের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চৈতন্যচরিত গ্রন্থ ও বৈষ্ণব পদাবলী শিক্ষিত-সমাজেও ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভূদেব মধুসূদনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পার?" ব্রাহ্মসমাজে রাধাকৃষ্ণলীলা অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর মতো অতিশয় অশ্রদ্ধেয়

---

৫ "বালিশে পৃষ্ঠ প্রদান ও তাম্রকূট পানপূর্বক আপন আপন ইষ্টদেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করাইয়া আমোদ করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? এবং দুর্জয় মানযাত্রায় নাপিতানীর বেশ ইষ্টদেবতার করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? ও বেসো, কেসো, বড়াইবুড়ী ইত্যাদির দ্বারা ইষ্টদেবতার উপহাস করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়?" ('পথ্য প্রদান') এখানে রামমোহন কৃষ্ণযাত্রায় বর্ণিত মানভঞ্জন, নৌকাবিলাস, সুবলমিলন ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন।

ছিল ; কিন্তু কেশবচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মহামানব বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, চৈতন্যের প্রতিও তাঁহার ভক্তির অভাব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে রুচি ও ঐতিহ্যের হাওয়া ফিরিতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের শিষ্য গৌর-গোবিন্দ রায় ১৮৮৯ সালে কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত করিবার জন্য 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া ব্রাহ্মমতে-বিশ্বাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও কৃষ্ণবিষয়ে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র, বঙ্কিম-চন্দ্র প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকগণ কৃষ্ণলীলার প্রতি আধুনিক মনের দিক হইতেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের গোপী-সংক্রান্ত বৃন্দাবনলীলা বঙ্কিমচন্দ্রের ততটা প্রীতিকর না হইবার কথা। এই জন্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে তিনি কৃষ্ণ-গোপীলীলাকে পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি গোপী-কৃষ্ণের ব্রজলীলার কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি দিয়াও বলিয়াছিলেন, "যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব। এতকাল আমাদের জন্মভূমি সেই মদনধর্মোৎসব-ভারাক্রান্ত।" তাঁহার মতে পুরাণকারগণ কৃষ্ণের গোপীলীলার যে অধ্যাত্ম-রসায়ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বাঙলাদেশের বৈষ্ণবদের হাতে পড়িয়া তাহা ফেনময় হইয়া উঠিয়াছিল, "কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না, তাঁহার রোপিত ভক্তিপঙ্কজের মূল অতলজলে ডুবিয়া রহিল—উপরে কেবল বিকশিত কামকুসুমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে—তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুসুমদামের মালা গাঁথিয়া ইন্দ্রিয়-পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম প্রস্তুত করিল" (কৃষ্ণচরিত্র)। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণের কোনদিন ব্যত্যয় হয় নাই ; সেই আদর্শে তিনি 'মৃণালিনী'-তে পদ লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 'কমলাকান্তের দপ্তরে'ও "একটি গীতে" বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুরলীলার দুঃখবেদনাকে সমগ্র জাতির অন্তর্বেদনার রূপকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কবি ও শিল্পী-সত্তা বৈষ্ণব পদাবলীকে সার্থক গীতিকবিতা বলিয়া বরণ করিয়াছিল, কিন্তু সংস্কারক ও দেশনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ভগবান বাসুদেবকে মহাভারতের সূত্রধার ও অনুশীলন ধর্মের উদ্‌গাতা রূপে অঙ্কন করিয়াছেন। এই সময়ে একদিকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমবায়ে গঠিত কৃষ্ণবাসুদেবের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বাঙলার পৌরাণিক ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল, তেমনি নবীনচন্দ্র কৃষ্ণচরিত ও ভাগবত আদর্শকে একটা আবেগবাদী রূপ দিবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের *The Lilcrature of Bengal (1880)*, রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩), জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'মহাজনপদাবলী', 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাপতি', প্রবন্ধ, সারদাচরণ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রকাশিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য সংগ্রহে' সঙ্কলিত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদসংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পদরত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারের ফলে শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব-পদাবলী—বিশেষতঃ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী অতি দ্রুতবেগে জনপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিল। শিশিরকুমার ঘোষ শুধু 'অমিয়-নিমাই-চরিত' রচনা করিয়াই নহে, ব্যক্তিগত জীবন ও আদর্শে বৈষ্ণব নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এমন কি বীরসন্ন্যাসী বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী স্বামী বিবেকানন্দও গোপীপ্রেম ও বৈষ্ণব সাহিত্যকে মানবজীবনের এক তুরীয় অবস্থার ভাগবত উপলব্ধি বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। গোপীপ্রেম ও রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব লাবণ্যলীলার প্রতি সাধারণ ও শিক্ষিত হিন্দুর যে বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাহা স্বামীজীর নানা উক্তি হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন যে, বৃন্দাবনের চিরকিশোর-কিশোরীর প্রেমলীলা অশুদ্ধচিত্ত মানুষের পক্ষে অবধারণ করা সম্ভব নহে : "Who can understand the throes of the love of the Gopis,—the very idea of love, the love that wants nothing, love that even does not care for heaven, love that does not care for anything in this world, or the world to come? And here my friends, through this love of the Gopis has been found the only solution of the conflict between the Personal and the Impersonal God." বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত গোপীপ্রেমের নিবিড় রসাস্বাদন এখানে চমৎকার ফুটিয়াছে। তাই, যাহারা গোপীপ্রেমের মর্মমধু উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহাকে অশুচি অপবিত্র মনে করে, সেই মূঢ় 'বরাকী' দিগকে ধিক্কার দিয়া বিবেকানন্দ সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, "People with ideas of sex, and of money, and of fear bubbling up every minute in the heart, daring to criticise and under-

stand the love of the gopis! That is the very essence of the Krishna Incarnation. Even the Gita, the great philosophy itself, does not compare with that madness..." (*The Complete Works of Swami Vivekananda*, Mayabati Memorial Edition, Vol. III)

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর রসমাধুর্য নিজে উপভোগ করিয়াছেন, ইহার বাকসৌন্দর্য নিজ শিল্পপ্রকরণে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নানা সময়ে বৈষ্ণব পদাবলীর রস ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাদর্শ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কৈশোরে তিনি ব্রজবুলি পদগুলির ধ্বনিঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' সেই মুগ্ধতার আবেশে রচিত। পরে তিনি নানা সময়ে বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে কখনও রসালোচনা করিয়াছেন, কখনও ইহার রূপ-নির্মিতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কখনও-বা কবির দিক হইতে ইহার তত্ত্বের দিক আলোচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বকথাকে রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিধর্মের সঙ্গে একীভূত করিয়া এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

> আমরা যাহাকে ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের সম্পর্কের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয় মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে, যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর 'দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর' রসপর্যায়টিকে নিজের মতো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। অবশ্য গৌড়ীয় তত্ত্বাদর্শের সঙ্গে ইহার হয়তো পুরাপুরি মিল হইবে না। 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি বলিয়াছেন :

এই গীতি-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে......

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর গীতি-উৎসবে শুধু রাধাকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান, মর্ত্যের ভক্ত কেবলমাত্র মঞ্জরীভাবে বা সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবার অধিকারী। মীরাবাঈ যেমন গিরিধারীলালকে নিজ পতিভাবে সাধনা করিয়াছিলেন, মধ্যযুগের *Bride of Christ* সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তিমতী সেবিকাগণ যেভাবে আপনাদিগকে খ্রীষ্টের দয়িতা মনে করিতেন, সুফীসাধকগণ যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহাদের প্রেমের আদান-প্রদানের সম্পর্ককে ধর্মসাধনার অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন,[৬] গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা ঠিক সেরূপ নহে। এই 'গীতি-উৎসবের মাঝে' ভক্তের একমাত্র কাজ সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলারসে সহায়তা করা। সে যাহা হোক, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রদায়গত তত্ত্বের দিকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, বরং তিনি রাধাকৃষ্ণকে গভীর প্রেমাসক্তির রূপক বলিয়া মনে করিতেন। একদা কবি নবীনচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের allegory মনে করি।" তাহার উত্তরে নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "উহা রূপক মনে করিয়া যদি আপনার তৃপ্তি হয় ক্ষতি নাই। আপনি সেইভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যে যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না। আমার সেই কালো পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না! আমার জন্য উহা রাখিয়া দিউন।"[৭] এখানে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণকে রূপক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একবার লিখিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তি-সঙ্গত হেতু দেখা যায় না—যাহার সহিত পূর্বকৃত কোন সম্বন্ধ-বন্ধন জড়িত নাই —এমন কি, যাহা সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দুরূহ দুরাশায় আত্মবিসর্জন করিতে যায়, বৈষ্ণব কবিগণ পৃথিবীর সেই ভালবাসাকেই পরমাত্মার প্রতি

[৬] ইসলাম সংস্কৃতিতে সুপরিচিতা ভক্তিমতী নারী রাবেয়া (মৃত্যু—৮০১ খ্রীঃ) ভগবানকেই পতি বলিয়া মনে করিতেন। দক্ষিণ-ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধিকা আণ্ডাল ভগবানকে অনুরূপ দয়িতভাবে ভজনা করিতেন।

[৭] নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী 'আমার জীবন' দ্রষ্টব্য।

আত্মার অনিবার্য নিগূঢ় ভালবাসার আদর্শ রূপকস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।"[৮] রবীন্দ্রনাথ-কথিত পরমাত্মা-আত্মার রূপকসম্পর্কই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী ও দর্শনের মূল তাৎপর্য নহে, তাহা অবশ্য বিশেষজ্ঞগণ বুঝিবেন।[৯] সে যাহা হোক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বাহিরে শিক্ষিত ও মার্জিত সমাজে বৈষ্ণব পদাবলীকে একটি রসসমৃদ্ধ সারস্বত উপলব্ধি রূপে পরিগণিত করার বিশেষ গৌরব রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। আধুনিক কালে এখনও বৈষ্ণবসমাজ, আখড়া, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীতে রসসাধনা ও তত্ত্বাদর্শরূপে বৈষ্ণব পদাবলী অনুশীলিত হইলেও শিক্ষিত বাঙালী পাঠকসমাজে বৈষ্ণব পদাবলীর রসতত্ত্ব অপেক্ষা শিল্পরূপই অধিকতর পরিচিত।

২ ॥ বৈষ্ণব পদাবলীর স্বরূপ

আদিরসাশ্রিত ভক্তি-সাহিত্য ভারতবর্ষে নূতন নহে—গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরও সৃষ্টি নহে। প্রাচীন সংস্কৃতে ভক্তি-অনুসারী আদিরসাত্মক সাহিত্য ও সাধনার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।[১০] তন্মধ্যে তামিলভাষায় ভক্তকবি আলোয়ারদের কবিতা ও সাধনমার্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের কবিতা ও সাধন-ভজনপদ্ধতি অতি প্রাচীনকালেও প্রায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুরূপ রীতি ও প্রকরণ গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় প্রাকৃত নরনারীব প্রেমজীবন সম্বন্ধে অনেক উদ্ভট কবিতা অনেক কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই সমস্ত প্রকীর্ণ প্রেমের কবিতা নানা সময়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সঙ্কলনে সংগৃহীত হইয়াছিল। সংস্কৃতে রচিত 'শৃঙ্গারশতক', 'অমরুশতক', 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সুভাষিত মুক্তাবলী,' 'শারঙ্গধরপদ্ধতি' এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত হালের 'গাথা সত্তসঈ' ও জয়বল্লভ সঙ্কলিত 'বজ্জলগ্‌গ' নামক শ্বেতাম্বর জৈনদের গ্রন্থে নরনারীর প্রেম-

---

৮ ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৩৮৮) উদ্ধৃত।

৯ এ বিষয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই একটু দূর হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—রাধার ভাব কেহই অবলম্বন করিতে চাহেন নাই।...সখী বা মঞ্জরীর অনুগভাবে সাধন করিয়া নিত্য যুগললীলা আস্বাদন করাই ছিল বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণের সাধ্যসার।"—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ।

১০ এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' প্রথম খণ্ডে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

বিরহ অবলম্বনে রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোক একদা জনসমাজে অত্যন্ত প্রচার লাভ করিয়াছিল।

সঙ্গীতশাস্ত্রে গানকে 'পদ' বলা হইয়াছে: গন্ধর্বশাস্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে ভরত "যৎ কিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎ সর্বং পদসংজ্ঞিতম্" বাক্যে 'পদ'কে গান অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালিদাসের মেঘদূতেও "মদ্গোত্রাঙ্কনং বিরচিতপদং গেযমুদ্গাতুকাম" শ্লোকে 'পদ' শব্দটি সঙ্গীতকেই নির্দেশ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে জয়দেবের "মধুরকোমলকান্তপদাবলীং" এই শ্লোকাংশ স্মরণ হইবে। প্রাচীন যুগে সাধারণতঃ গানের জন্য রচিত ক্ষুদ্র স্তবককে পদ বলিত। এই জাতীয় পদ বাঙলাদেশে জয়দেবের কিছু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। চর্যাগীতিকায় 'ধ্রুবপদ', 'পদ' প্রভৃতি শব্দ ইহাই নির্দেশ করিতেছে। তবে জয়দেবের সময় হইতে সুরেতালে গেয় পদাবলী ক্রমেই জনপ্রিয় হইতেছিল এবং পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ভজনকীর্তন গানে 'পদ' শব্দ স্বাভাবিকভাবেই প্রবেশ করিয়াছিল। মিথিলাতে যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক পাওয়া গিয়াছে, তাহার গানগুলি কিন্তু পদ অনুসরণে মৈথিলীতে রচিত হইয়াছিল। ধ্বনি-ঝঙ্কারের জন্য জয়দেবের 'পদ' শিষ্টজনের মন হরণ করিয়াছিল। পরবর্তী কালের অর্বাচীন সংস্কৃত কবিতা ও নাটকে এই জাতীয় পদ বা গানের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। মহাপ্রভুর সহচর রায় রামানন্দ প্রণীত সংস্কৃত নাটক সমূহেও জয়দেবের অনুকরণে সংস্কৃত গান রচিত হইয়াছিল। এইরূপ কিছু কিছু গীতিধর্মী শ্লোক রূপগোস্বামী-সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তেও স্থান পাইয়াছে। এই 'পদ্যাবলী'তে 'ধ্রুবগীতি' নামে উল্লিখিত গানটি জয়দেবকেই স্মরণ করাইয়া দিবে :

রসিকেশ কেশব হে।
রসসবসীমিব মামুপযোজয়
রসমিব রসনিবহে॥

প্রাদেশিক ভাষায় যথার্থতঃ পদসাহিত্যের আদি স্রষ্টা বিদ্যাপতি। জ্ঞানী, গুণী ও স্মার্ত ভক্ত বিদ্যাপতি বৈষ্ণব হউন, আর না হউন, রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া তিনি মৈথিলী ভাষায় যে সমস্ত পদ বা গান লিখিয়াছিলেন, বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর গঠনপ্রকৃতি, স্তবকবন্ধন, ধ্রুবপদ প্রভৃতি প্রায় সেই গীতিপ্রকরণ অনুসরণ করিয়াছে।[১১]

---

[১১] বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ পদাবলীকে অনেক মৈথিলী পণ্ডিত ও হিন্দী সাহিত্যসেবিগণ নিছক প্রাকৃত প্রেমের কবিতা বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-এর প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক, লীরিক, রোমান্টিক, মীস্টিক প্রভৃতি আদর্শে বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ স্বরূপ কি প্রকার।

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণবসমাজে মহাজনপদাবলী এবং বৈষ্ণব কবি-মোহান্তগণ মহাজন নামে পরিচিত; বৈষ্ণব পদাবলী মূলতঃ গীতিসাহিত্য অর্থাৎ গান করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল—শুধু পাঠ বা আবৃত্তির জন্য নহে। সে যুগে ধর্মসাহিত্য মাত্রই গীত হইত। কোন্ যুগেই বা ধর্মসাহিত্য সঙ্গীতের আশ্রয় লাভ না করিযাছে? আদিতে কবিতা মাত্রই গীতিসাহিত্য ছিল, সুরের দাসত্ব প্রাচীন কবিতার প্রধান লক্ষণ।[১২] বাঙলাদেশে চর্যাগীতিকা গান করা হইত, জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদগুলি সুরেতালে রাগরাগিণীর সহযোগে গান করা হইত। কবিতার সঙ্গে সুরতাল যুক্ত হইলে কবিতা ও গান মিশিয়া গিয়া একটা মিশ্র রূপ লাভ করে। পরে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও জটিলতা বৃদ্ধির ফলে কবিতার প্রাচীন সহচর সঙ্গীত কবিতা হইতে অল্পে অল্পে বিদায় লয়। তখন লীরিক আর 'লায়ার' বীণা সহযোগে গীত হয় না। 'মুরজমুরলী মধুরা'র সহযোগে গীতিকবিতা আর সুরের ভোজে পরিবেষিত হয় না, সেই দিক দিয়া বিচার করিলে বৈষ্ণব-পদাবলীতে আদিলীরিকের লক্ষণ লক্ষ্য করা যাইবে, কিন্তু আধুনিক লীরিকের কুলপরিচয় ইহাতে পুরাপুরি ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রাচীন লীরিক কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য সঙ্গীত—কখনও একক সঙ্গীত, কখনও-বা বহুজনের মিলিত সঙ্গীত। পরে ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাইল, এবং লীরিকের আকারগত পরিবর্তনের সঙ্গে একটা প্রচণ্ডতর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল।

প্রাচীন লীরিক মূলতঃ ধর্মাশ্রয়ী। তাই তাহাতে সম্প্রদায়, দেবতা ও ব্যক্তিগত ঈশ্বরের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। কিন্তু আধুনিক কালের লীরিক প্রধানত ব্যক্তি-আশ্রয়ী, আবেগধর্মী ও গাঢবন্ধ কবিতা বিশেষ। কেহ কেহ বৈষ্ণব পদাবলীকে বিশুদ্ধ লীরিকের আদর্শে বিচার-বিশ্লেষণ ও রসসম্ভোগ করিয়াছেন।[১৩] আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণব পদাবলীকে বিশুদ্ধ লীরিকের

---

[১২] অদ্যাপি ভারতের কোন কোন আধুনিক ভাষায় কবিতাকে প্রাচীন কালের মতো গানের সুরে আবৃত্তি করা হয়—কবিগণই করিয়া থাকেন। এই সমস্ত আধুনিক সাহিত্য হইতে এখনও আদিম সংস্কার লোপ পায় নাই।

[১৩] শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা লীরিকের গোড়ার কথা' দ্রষ্টব্য।

আদর্শে বিচার করা যায় না। লীরিকের মূল কথা—কবিমানসের প্রাধান্য। জগৎ ও জীবন একটি অনুভূতিপ্রবণ কল্পনাসরস কবিমনে প্রতিফলিত হইয়া কবির আপনার সামগ্রী হইয়া ওঠে। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিই লীরিক কবিতার প্রাণ। অবশ্য কেহ কেহ বলেন যে, এই ব্যক্তিমানসের প্রাধান্য—ইহা তো আধুনিক কালের ব্যাপার। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিপ্রাধান্য য়ুরোপেও রেনেসাঁসের পূর্বে বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রয়োগ এবং প্রজ্ঞার যুগে (The Age of Enlightenment) যখন মানুষই সৃষ্টিলীলার নেমিচক্রে পরিণত হইল, তখন কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধি, আশার উল্লাস ও ব্যর্থতার বেদনা, নিকটকে দূরে রাখিয়া এবং দূরকে নিকটে আনিবার প্রয়াসই গীতিকবিতার প্রাণস্বরূপ হইল। রাস্‌কিন গীতিকবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "Lyric poetry is the expression by the poet of his own feelings" এই 'অস্মিতা' ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফল। তাই এই শতকের ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান গীতিকবিগণ অজস্র কবিতায় শুধু আপনাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, আপনাকেই শতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—ইহাই আধুনিক মনের ধর্ম। প্রাচীনকালের গীতিকবিতায় এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ততটা পরিচয় পাওয়া যায় না।

উল্লিখিত মন্তব্যটি কিন্তু পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না। প্রাচীন লীরিক শুধু যে গান করা হইত তাহা নহে, তাহাতেও 'expression by the poet of his own feelings' ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রীসের লীরিক কবিগণ (সাফো, পিণ্ডার, বাখিলাইড্‌স্) এবং রোমের গীতিকবিরাও (নেভিয়াস, ক্যাটালাস, হোরেস) তাঁহাদের অজস্র কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাই বলিয়াছেন। স্ত্রী-কবি সাফোর ছোট ছোট কবিতায় তাঁহার ব্যক্তিগত বাসনার উত্তপ্ত স্পর্শ রহিয়াছে। প্রাচ্যেও প্রাচীন যুগের লীরিকের মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির অভাব ছিল না; উদাহরণস্বরূপ চৈনিক কবি লী পোর (খ্রীঃ ৭০১-৬২ অব্দ) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি ব্যক্তিগত আবেগ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল। ইরাণি সুফী কবিগণ মূলতঃ সাধক হইলেও তাঁহাদের সাধনসঙ্গীতে গীতিকবিতার

ব্যক্তিগত সুরের রেশ উপলব্ধি করা যাইবে।[১৪] আমাদের দেশে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের উদ্ভট কবিতায় কবিদের যৎসামান্য মনোভাব ফুটিয়াছে বটে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সাধক-সাধিকাদের তামিল ভাষায় রচিত ভজন-গীতিকা সাধনার অঙ্গ হইলেও তাহাতে ব্যক্তিজীবনের আর্তি প্রায় বিশুদ্ধ লীরিকরসে নিষিক্ত হইয়াই দেখা দিয়াছে।[১৫] অবশ্য মধ্যযুগের সন্ত-সাধক ও বাঙলাদেশের বৈষ্ণব মহাজনগণ পদ-দোঁহা-চৌপাঈ রচনার সময় সাধনার অঙ্গ হিসাবে ধর্মজীবনের গাঢ় অনুভূতির আভাস দিয়াছেন, কিন্তু কবিদের ব্যক্তিগত অনুভূতির বিশেষ কোন ইঙ্গিত নাই বলিয়া ইহাতে গীতিকবিতার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও কবিচেতনার স্পষ্ট উপস্থিতি নাই। তাই ইহা বিশুদ্ধ লীরিকের আদর্শে বিচার্য নহে। কবিগণ তো রাধাকৃষ্ণ লীলায় 'মঞ্জরী'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মুছিয়া না গেলে তো তাহারা বৈষ্ণব নামের অধিকারী বলিয়াই বিবেচিত হইবেন না। দু'এক স্থলে তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের কৃপাকণা কামনা করিয়া বা চৈতন্যপ্রভুর করুণা ভিক্ষা করিয়া মাঝে মাঝে নিজেদের অনুশোচনা ব্যক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের সাধনজীবনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইলেও মর্ত্যজীবনের প্রতি সেরূপ কোন বাসনা বা মর্ত্যানুভূতির প্রতি তাঁহাদের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বৈষ্ণব কবিতা'য় প্রশ্ন করিয়াছেন :

[১৪] প্রসিদ্ধ সুফী কবি রুমির একটি উৎকৃষ্ট ভক্তিরসের কবিতা উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন এখানে কবির ব্যক্তিগত মনোভাবটি কী চমৎকার ফুটিয়াছে :

Happy was I
In the pearl's heart to lie ;
Till, lashed by life's hurricane,
Like a tossed wave I ran,
The secret of the sea
I uttered thundereously ;
Like a spent cloud on the shore
I slept, and stirred no more.

[১৫] আলোয়ার সম্প্রদায় সম্বন্ধে এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্তরাতে মিলন শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।

ইহা আধুনিক কালের কবির প্রশ্ন। সে যুগের বৈষ্ণব কবিগণ নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতির নিরিখে পদ রচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এইজন্য বৈষ্ণব পদাবলীতে গীতিধর্মিতা থাকিলেও পুরাপুরি গীতিকবিতার লক্ষণ ফুটে নাই।

বৈষ্ণব পদ ও রোমাণ্টিকতা॥

আধুনিক যুগের পাঠক ও সমালোচকগণ বৈষ্ণব কবিতাকে বিশুদ্ধ রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনের দিক দিয়া বিচার করিবার অভিলাষী। বৈষ্ণব কবিতা মূলতঃ সাধনভজনের ব্যাপার, বিশেষ তত্ত্বদর্শনের সঙ্গেই ইহার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা। ধর্ম ও দর্শনের অনুভূতিও রোমাণ্টিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে। কল্পনার ঐশ্বর্য, আবেগের গভীরতা, সৌন্দর্যের নিবিড়তা এবং সুদূরের ব্যঞ্জনা—মোটামুটি এইগুলি রোমাণ্টিক মনোভাবের লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। রোমাণ্টিকতা রচনারীতি নহে—একপ্রকার মানস-প্রতীতি। রোমাণ্টিক কবি বা শিল্পীর মর্ত্যচেতনাই প্রধান 'আলম্বন'। কিন্তু সুদূরের আকাঙ্ক্ষা, দুর্জ্ঞেয়ের প্রতি অভিসার, অপ্রাপণীয়ের জন্য ব্যাকুলতা—রোমাণ্টিক প্রকৃতির ইহাই মূল বৈশিষ্ট্য। মর্ত্যচেতনা রোমাণ্টিকতার প্রধান উপাদান হইলেও ধর্মানুভূতি ও ভাগবতচেতনাও রোমাণ্টিক লক্ষণযুক্ত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আলোয়ার ও সুফীদের ভজনগীতিকা এবং উইলিয়াম ব্লেকের

কবিতা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে অনুভূতি ও শিল্পাদর্শ মর্ত্য-চেতনার বাহিরের অনুভূতিকেও মর্ত্যরসের প্রতীকের মারফতে পরিবেশন করিতে পারে তাহাই রোমান্টিক প্রকৃতি। বৈষ্ণব কবিগণ বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় প্রত্যয় ও অনুভূতির শীর্ষ হইতেই পদ রচনা করিয়াছিলেন, অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ ও মর্ত্যমানব গৌরহরির দিব্য লীলাকথা তাঁহাদের পদাবলীর প্রধান উপাদান। কাজেই 'সেক্যুলার' রোমান্টিকতার মানদণ্ডে তাঁহাদের পদ পুরাপুরি বিশ্লেষণ করা যায় না।

রোমান্টিক প্রেম-বিরহ-মিলন-সংক্রান্ত বহু শ্লোক ও খণ্ডকাব্য সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে সংস্কৃত-প্রাকৃতে রচিত সঙ্কলনগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমস্ত পদসঙ্কলনগ্রন্থে ভক্তি-প্রেমের শ্লোক যে নাই, তাহা নহে—কিন্তু বাস্তব নরনারীর বিরহ-মিলনের ফেনিল রসই তাহাতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। অমরুর শৃঙ্গাররসের শ্লোক বা 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র 'অসতীব্রজ্যা'র অন্তর্ভুক্ত পদগুলিতে বাস্তব জীবনই তাহার আলো-অন্ধকার, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ও রমণীয়তা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হালের সত্তসঈ'তে তো সামাজিকতা ও ভব্যরুচির মর্যাদাও সব সময়ে রক্ষিত হয় নাই। (সংস্কৃত সাহিত্যে বহুকাল হইতে এইরূপ একটি মর্ত্যজীবনকেন্দ্রিক রোমান্টিক গীতিধর্মী শ্লোকাবলীর অনুশীলন চলিয়া আসিতেছিল।) অজ্ঞাতপরিচয় কবির রচিত (কোথাও কোথাও মহিলা কবি শীলভট্টারিকার নামে প্রচারিত) এই শ্লোকটি আলোচনা করা যাইতে পারে :

> যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
> স্তে চোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
> সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
> রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

অনুবাদ যে আমার কৌমারহর (অর্থাৎ যে আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল), সেই আজ আমার বর, আজও সেই চৈত্রনিশি, সেই বিকশিত মালতীর সুরভি, সেই কদম্ববনের পরিণত বা বর্ধিত বায়ু, আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবা নদীতটের বেতসীতরুতলে যে সব সুরতব্যাপারের লীলাবধি, তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।[১০]

এখানে মর্ত্যকেন্দ্রিক রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাই তো ধ্বনিত হইতেছে।

এক মানিনী নায়িকার উক্তি :

গইউরসচ্ছহে জোব্বণম্মি অইপবসিএসু দিঅসেসু।
অণিঅত্তাসু অ রাঈসু পুত্তি কিং দড্ঢমাণেণ ॥

অনু: নদী-জলের উদ্বেলতার মতো নারীর যৌবন; দিনগুলি চিরকালের জন্য চলিয়া যাইতেছে, রাত্রিও আর ফিরিবে না, এই অবস্থায় এই পোড়া মান দিয়া আর কি হইবে?"[১৭]

কিংবা 'অমরুশতকে' বিরহিণী মানিনী নারীর উক্তি:

নিশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং নির্মূলমুন্মথ্যতে।
নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং রাত্রিন্দিবং রুদ্যতে ॥

অনু: নিশ্বাসগুলি আমার বদন দহন করিতেছে; হৃদয় নির্মূলভাবে উন্মথিত হইতেছে; নিদ্রা আসিতেছে না, প্রিয়মুখ দেখা যাইতেছে না, রাত্রিদিন শুধু রোদন করিতেছি।'[১৮]

সংস্কৃত ও প্রাকৃত সঙ্কলনগ্রন্থ হইতে এইরূপ মর্ত্যজীবনকেন্দ্রিক অজস্র রোমান্টিক কবিতা উদ্ধৃত হইতে পারে। 'গীতগোবিন্দ' (জয়দেব), 'আর্যাসপ্তশতী' (গোবর্ধন), 'পদ্যাবলী' (রূপগোস্বামী সঙ্কলিত) ইত্যাদি সংস্কৃত আখ্যানকাব্য ও প্রকীর্ণ শ্লোকসংগ্রহে ধৃত অনেক শ্লোককেই বিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেমের কবিতা বলিয়া ধরিতে হইবে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপদাবলী বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্মী হোক আর নাই হোক, ইহার পশ্চাতে জয়দেবের মতো একটি রোমান্টিক সৌন্দর্যলিপ্সু কবিমন ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাঙলার চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলীতে একটা বিশেষ রকমের ধর্মীয় কৃত্যকেন্দ্রিক সাধনভজনপ্রণালীর প্রভাব থাকিলেও সংস্কৃত ও প্রাকৃতে যে রোমান্টিক শ্লোকাবলীর ঐতিহ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবপদাবলীর রূপ ও রীতিতে তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং অন্যান্য প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতার প্রভাবে বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন, প্রাকৃতিক সৌন্দয, আবেগ ও আর্তিকে যে শিল্পপ্রকরণের সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন—তাহাকে রোমান্টিক-আশ্রয়ী বলিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর রূপকল্পে রোমান্টিক সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনা অনুসৃত হইয়াছে। অবশ্য রাধাকৃষ্ণের পদাবলী পুরাপুরি রোমান্টিক এবং 'সেক্যুলার' কিনা তাহা আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিব। কিন্তু বাক্‌নির্মিত, ছন্দকৌশল, শব্দযোজনা ও আবেগের নিবিডতা বিচার করিলে বৈষ্ণব পদাবলীকে রোমান্টিক না বলিয়া পারা যায় না।

১৭—১৮ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' হইতে উদ্ধৃত।

বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদাবলী যে অবৈষ্ণব, এমন কি অভারতীয় পাঠকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার অন্যতম কারণ ইহার অন্তর্নিহিত রোমান্টিক কল্পনা ও বাস্তব আবেগ। অবশ্য এই জাতীয় রোমান্টিক লক্ষণ শুধু বৈষ্ণব-পদাবলীরই একচেটিয়া অধিকার নহে, সংস্কৃতে রচিত নারদীয় ভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্রের আধ্যাত্মিক শ্লোকেও নিবিড় অনুভূতির রস মিলিবে। নারদীয় ভক্তিসূত্রে যে বার বার বলা হইয়াছে—'তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাম্' (তাহাই সাধনা কর, তাহাই সাধনা কর), সেই সাধনার বস্তুটি কি? তাহা 'অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্', তাহা 'মূকাস্বাদনবৎ', তাহা 'নিত্যকান্তা-ভজনাত্মকং বা প্রেম এব কার্যং প্রেম এব কার্যমিতি।' এই যে 'কান্তাপ্রেম', নারদীয় সূত্রে পুনঃপুনঃ ইহার গুণকীর্তন করা হইয়াছে। সুফী কবিদের সাধনভজনবিষয়ক শ্লোকেও মর্ত্যচেতনার ঐশ্বর্য ও আবেগের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণব পদাবলীর পশ্চাদপটে যদিও সদাসর্বদা নিত্যবৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর অখণ্ড সত্তা বিরাজ করিতেছে, তবু নিসর্গ সৌন্দর্য, রাধাকৃষ্ণের নিবিড় মিলনরস এবং তীব্র বিরহ-বেদনা ক্ষণেকের জন্যও ভাববৃন্দাবনকে মর্ত্যধূলিতলে টানিয়া আনে। গোবিন্দদাসের রাধাতনুকান্তি বর্ণনার সৌন্দয মর্ত্যরসেই ভরপুর :

আজু নব শ্যামবিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু- যূথ-শত-সেবিত
লাবণি বরণি না যাই॥
কবরি বকুলফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণি রণরণি বোল॥
পদপঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
রণঝন খঞ্জন ভাষ।
মদনমুকুর জনু নখমণি-দরপণ
নীছনি গোবিন্দদাস॥

অথবা জ্ঞানদাসের পদে বর্ণিত রাধার মর্ত্যপ্রেমের রসরহস্য :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

এ সমস্তই রোমান্টিক মর্ত্যবাসনার অমৃত-রসায়ন। সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন—"দ্বাদশ শতকের জয়দেব ব্যতীত অন্যান্য কবিগণ রচিত রাধা-প্রেমের কবিতা এবং দ্বাদশ শতকের বহু পূর্ব হইতে রচিত রাধাপ্রেমের কবিতা সমসাময়িক পার্থিব প্রেমের কবিতার সহিত সমসূত্রেই গ্রথিত; জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কবিতার সহিতও ভারতীয় চির প্রচলিত পার্থিব প্রেমকবিতার ধারার গভীর মিল রহিয়াছে।"[১৯] এখানে 'পার্থিব প্রেমের কবিতা' বলিতে রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের মিলন বিরহের নানা বৈচিত্র্য ও লীলাকাহিনীর পাশে পাশেই একটা বিশেষ যুগমানসের পটভূমিকা, শাশুড়ী-ননদী তর্জিত রাধার প্রেমসঙ্কট, সমাজ ও নীতির বক্রচক্ষুর ফলে রাধার বিড়ম্বনা, সর্বোপরি মানুষের আর্তনাদ—এ সমস্তই জীবনরসে উত্তপ্ত রোমান্টিক কবি প্রকৃতিকেই স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়াছে। তাই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমগীতিকায় ভক্তিরসের সঙ্গে একটা পরিচিত মর্ত্যধরিত্রীর মেদুর স্পর্শ রহিয়াছে, ভক্তির সঙ্গে রোমান্টিক মনোভাবের এরূপ বিচিত্র সমন্বয় বিশ্বগীতিসাহিত্যের এক পরম সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবার দাবি রাখে।

বৈষ্ণব পদাবলী ও ভক্তিবাদ॥

বৈষ্ণব ভক্ত কবিগণ কেহই নিছক মর্ত্যপ্রীতি ও বাস্তবজীবনের পক্ষ হইতে রাধাকৃষ্ণলীলাকথা অঙ্কন করেন নাই, সে যুগে এবং এযুগে পাঠকও বৈষ্ণব সাহিত্যকে অতীন্দ্রিয় ভাবরস ও মীস্টিক তত্ত্বের পটভূমিকায় রাখিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ও প্রাকৃতে দৈনন্দিন ও জীবনকেন্দ্রিক এবং মর্ত্যরসিক বিরহ-মিলনের অসংখ্য প্রকীর্ণ কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু নানা সঙ্কলনগ্রন্থে স্থান পাইয়া বিস্মৃতির কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। সুতরাং অনুমান করিতে বাধা নাই যে, একদা এই ধরণের মর্ত্যবাসনাময় শ্লোক প্রচুর রচিত হইয়াছিল। সে যুগের পাঠকসমাজ এইরূপ বাস্তব জীবনরসসিক্ত পদগুলিকে

---

[১৯] ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ

বাস্তব উপভোগের দৃষ্টি দিয়াই গ্রহণ করিত, ও বিষয়ে বিশেষ কোন অধ্যাত্ম চেতনা বা মরমিয়া তত্ত্ববাদের অনাবশ্যক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিত না। অনেকে মনে করেন যে, এই মর্ত্যজীবনকেন্দ্রিক রোমান্টিক প্রেমের সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোকগুলিই পরবর্তী কালে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমগীতিকায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সে যুগের প্রকীর্ণ শ্লোকের কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে প্রধানতঃ কাব্য রচনার *motif* বা উপাদান কারণ হিসাবেই ব্যবহার করিতেন। বিভিন্ন সঙ্কলন গ্রন্থে ('কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি', 'সুভাষিতাবলী' 'গাহা সত্তসঈ') সংগৃহীত রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত পদগুলিতে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা, লোকোত্তর চেতনা এবং মরমিয়ারসের কোন সংস্পর্শই ছিল না। এই সমস্ত প্রেমের শ্লোককে সঙ্কলনকর্তারা 'অসতীব্রজ্যা'য় স্থান দিয়াছেন। পূর্বে উল্লিখিত 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটি রূপগোস্বামী-সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে যাহা ভক্তির কবিতা বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং মহাপ্রভু যে কবিতাটিতে তীব্র ভক্তিরস আস্বাদন করিতেন,[20] জীব গোস্বামীর 'গোপালচম্পূ'তে সেই উগ্র আদিরসের (এবং সম্ভবতঃ প্রাগ্‌বৈবাহিক অসামাজিক প্রেম) সেই শ্লোক রাধার উক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাকে কিন্তু ভক্তির শ্লোক বলিয়া গণ্য করা যায় না— 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' অসতী রমণীদের অর্থাৎ সামাজিকা নায়িকাদের পর্যায়েই ইহা বিন্যস্ত হইয়াছে। রূপ গোস্বামী এবং অন্যান্য বৈষ্ণবকবি ও সাধকগণ এইরূপ অনেক বাস্তব প্রেমের কবিতাকে ভক্তির কবিতারূপে এবং এই সমস্ত শ্লোকে বর্ণিত বাস্তব নায়িকাদের রাধা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জয়দেবও এইরূপ অনেক পদ লিখিয়াছিলেন। 'গীতগোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণের অধ্যাত্ম মোড়ক থাকিলেও আসলে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'মদনবর্মোৎসব'। এ বিষয়ে সমালোচকের এই মন্তব্যটি আলোচনার যোগ্য। "সাহিত্যের দিক হইতে তাই বিচার করিলে আমরা রাধার পরিচয়ে বলিতে পারি রাধা হইল ভারতীয় কবিমানস-ধৃত নারীরই একটি বিশেষ রসময় বিগ্রহ। বৈষ্ণব সাহিত্যে যত শৃঙ্গার বর্ণনা রহিয়াছে, রসোদ্গার, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতির বর্ণনা রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভারতীয় কাব্যসাহিত্য এবং রতিশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই প্রাকৃত রতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা বৈচিত্র্যময় সুনিপুণ বর্ণনা যে সর্বদা প্রাকৃত

[20] এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না বুঝে ইহার॥ চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ১৩শ

প্রেমের দৃষ্টান্তে অপ্রাকৃত প্রেমের একটা আভাস দিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল একথা স্বীকার করা যায় না। প্রথমে ইহা ভারতীয় প্রেমকবিতার ধারার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, পার্থক্যরেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে অনেক পরে।) পরবর্তী কালে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ কর্তৃক যখন রাধাতত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও সাহিত্যের ভিতরে রাধা তাহার ছায়াসহচরী মানবী নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; কায়া ও ছায়া অবিনাবদ্ধভাবে একটা মিশ্ররূপের সৃষ্টি করিয়াছে।"[২১] এ কথা অতিশয় যুক্তিযুক্ত। (বাস্তবিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বতন প্রাকৃত প্রেম-কবিতাই উজ্জ্বলরসের মন্ত্রে পরিশুদ্ধ হইয়া একাধারে আদি ও ভক্তিরসের সমন্বয়ী রূপ ধারণ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ যেমন প্রশংসনীয় কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তেমনি একটি বিশেষ ভক্তিমণ্ডলেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজেই রাধাকে তাহারা তিল তিল করিয়া মর্ত্যসৌন্দর্যের দ্বারাই সাজাইয়াছেন, বৃষভানুসুতার হৃদয়ে মর্ত্যকামনাই ভরিয়া দিয়াছেন, রসতীর্থের এই 'প্রৌঢ়া পারাবতী'র নিশ্বাস-প্রশ্বাসে মর্ত্যের উত্তাপই সঞ্চারিত করিয়াছেন, এবং করিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলী নিছক ভজনসাধনের ধর্মগীতিকায় পরিণত হয় নাই—ইহা সর্বোপরি শিল্পের রূপে লাভ করিয়া সৌন্দর্য ও আবেগের বিষয়ীভূত হইয়াছে।)

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে মানবীয় আকাঙ্ক্ষাকেই একটু অদলবদল করিয়া ধর্মসাধনায় প্রয়োগ করা হইত। ধর্মাচার যখন মনোলোকের অনুভূতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আবেগের তীব্রতা বুঝাইবার জন্য ইহাতে আসক্তির রক্তিমা সঞ্চার একটা স্বাভাবিক রীতি বলিয়া গৃহীত হইল। প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মাচার এবং নানা কৃত্যকেন্দ্রিক আচরণে আদিরসের উল্লাস ও আসঙ্গলিপ্সা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সৃষ্টিরহস্যের চাবিকাঠি মানবের হাতে নাই বটে, কিন্তু ভক্ত যাহাকে সব্যঙ্গে বলিয়াছেন "minute philosopher not six feet high"—সেই সীমাবদ্ধ স্বল্পায়ু এবং খর্বকায় মানবকটি মানুষেরই সৃষ্টি—এ রহস্যের মালিকানা স্বত্ব-স্বামিত্ব মানুষেরই উপর বর্তাইয়াছে,—এবং সেই অপার সৃষ্টিরহস্য শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর আদিম বা সভ্যযুগেও নানা ধর্মাচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে। পরবর্তী

[২১] ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ

কালে মানুষের সামাজিক নিষেধ বা নৈতিক সংগুপ্তির জন্য ইহার স্থূল দিকটা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইলেও, ইহার আবেগটি কিন্তু রহিয়া গেল এবং শিল্প, সংস্কৃতি ও ধর্মসাধনাকে প্রবলবেগে নানা সৃষ্টি-বিসৃষ্টির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের ধাপে ধাপে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তাই খ্রীষ্টান সাধুসন্তগণ নিজেদের খ্রীষ্টের দয়িতা কল্পনা করিয়া আদিরসের মধ্যেই সাধনার সফলতা খুঁজিতেন। মধ্যযুগে খ্রীষ্টানসমাজে এই রূপ সাধনা প্রচারিত হইয়াছিল। ভক্ত ও ভগবানের মিলনকে খ্রীষ্টানী ভক্তিসাহিত্যে mystic marriage বলা হইয়াছে। সেণ্ট জন্[২২] এইরূপ আবেগ ও আর্তির বশে বলিয়াছিলেন, "It may please Thee to unite me to Thyself, making my soul Thy bride ; I will rejoice in nothing till I am in Thine arms." সেণ্ট থেরেসা, সেণ্ট ক্যাথারিন—প্রভৃতি ভক্তিমতী প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলারাও আদিরসের মধ্যেই খ্রীষ্টকে পতিভাবে ভজনা করিতেন।[২৩] বাইবেলের সলোমন গীতিকাও কি আদিরসার্দ্র নহে ?

By night on my bed I sought him whom my soul loveth . I sought him but I found him not

ইহা তো মর্ত্যপ্রেমের বাসনারঞ্জিত। কিংবা নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকুতেও কি মর্ত্যকামনার উত্তপ্ত স্পর্শ নাই ?

How beautiful are thy feet with shoes, O prince's daughter ? The joints of thy thighs are like jewels, the work of thy hands of a cunning workman.

Thy naval is like a round goblet, which wanteth not liquor ; thy belly is like a heap of wheat set about with lilies

Thy two breasts are like two young roes that are twins. ....

How fair and how pleasant art thou, O love, for delights !

This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes.

---

[২২] St. John of the Cross

[২৩] ক্যাথারিন খ্রীষ্টকে প্রকৃতই স্বামী ভাবে দেখিতেন, তাঁহাকে সেইভাবে ভজনা করিতেন।

" In the growing intensity of these solitary meditations she thought and spoke of Christ as her heavenly lover, she exchanged hearts with Him, saw herself, in vision, married to Him ....." (Will Durant—*The Renaissance*, p. 63)

I said I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof; now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apple;

And the roof of thy mouth like the best wine of my beloved, that goeth down sweetly, easing the lips of those that are asleep to speak

(*Old Testament*, 'The song of Solomon', Chap. VII)

নিষ্ঠাবান ভক্ত এই তীব্র আসক্তির রক্তিমা হইতে বৈরাগ্যের গৈরিক আবেগ লাভ করিয়া থাকেন।

ইরাণের সুফী সাধকগণও স্বর্গ কামনা করেন নাই, মুক্তি চাহেন নাই, শুধু ভগবানকে ভালবাসার মধ্য দিয়া পাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের একান্ত কামনা :

If I worship Thee from fear to hell, burn me in it; if I worship Thee from hope of paradise, exclude me from it, if I worship Thee for Thy own sake, withhold not from me Thy eternal beauty.

ইহারাও ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কটি মর্ত্য প্রেমিক-প্রেমিকার ('মাশুক'-'আসেক'), উত্তপ্ত কামনারাগের মধ্য দিয়াই পাইতে চাহিয়াছিলেন। ঈশ্বরপ্রেমে ইহারাও বৈষ্ণবদের মতো 'বাউল' হইয়া গিয়াছিলেন। স্মরণ-কীর্তন-নর্তনের মধ্য দিয়া সুফীগণ ভগবানের প্রেমগান করিতেন, কেহ কেহ আবেগের অতিরেকে 'দশা' পাইতেন, তখন তাহাদের বাহ্যিক চেতনা থাকিত না। রাগানুগাপন্থী বৈষ্ণবদের মতো ইহারাও গ্রন্থ অপেক্ষা অন্তরের অনুরাগের অধিকতর মূল্য স্বীকার করিতেন। সুফী মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আহ্‌মদ হানবল (মৃত্যু—৮৫৫ খ্রীঃ অ.) তাহার 'কিতাব-অল্-জুহ্‌দ্' গ্রন্থে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর-প্রেমকেই জীবনের একমাত্র শরণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য সুফীগণের সাধনার শেষ কথা—'ফনা', ইহার অর্থ—ক্ষুদ্র অহং-এর আবরণভঙ্গ এবং বৃহত্তর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলন, একীকরণ। ইহারা প্রথমে ভগবানকে ভয় ('তাকোয়া') করিয়াছেন, তার পর সংযম ('ওয়ারা'), ত্যাগ ('জুহ্‌দ্'), আশঙ্কা ('খউফ'), দুঃখ ('হুজ্‌ন্'), বাসনা ('ইরাদ'), স্মরণ ('যিক্‌র্'), প্রার্থনা ('দু-আ') প্রভৃতি সাধনার ক্রমিক স্তর পার হইয়া পরিশেষে 'মহব্ব্' (প্রেম) এবং 'শাক্' (আর্তি) লাভ করিয়াছেন। এই ভাগবত প্রেম উপলব্ধি করিয়া সুফী কবি য়াহ্যা মুআধ বলিয়াছেন :

About God's Love I Hover
while I have breath,
To be His perfect lover
until my death.

ইঁহাদের বহু কবিতায তীব্র মর্ত্যবাসনাই ভগবৎ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা রূপে আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে।[২৪] বৈষ্ণব কবিরা যেমন শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া ব্যাকুলা-বিবশা রূপে অঙ্কন করিয়াছেন, ঈশ্বরপ্রেমিক সুফী সাধকগণও সেইরূপ দয়িতের বাঁশীর ডাক শুনিয়াছেন :

Hearken to this Reed forlorn,
Breathing, ever since 't was torn
From its rushy bed, a strain
of impassioned love and pain.

The secret of my song, though near,
None can see and none can hear.
Oh, for a friend to know the sign,
And mingle all his soul with mine.

'Tis the flame of Love that fired me,
'Tis the wine of Love inspired me.
Wouldst thou learn how lovers bleed,
Hearken, hearken to the Reed!

তবে বৈষ্ণবপদের প্রেমভক্তি ও সুফী সাধকগণের প্রেমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সুফী ভক্তগণ নিজেদের প্রেমিক ('আসিক') এবং ভগবানকে 'মাসুক' বা প্রেমিকা বলিয়াছেন।[২৫] কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এই জাতীয় লীলারস কখনও স্থান পায় নাই। (রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলায়

[২৪] সুফীমতে বহুস্থলে রোমান্টিক গল্পের নায়ক-নায়িকা বা স্বামী স্ত্রীর মর্ত্য সম্পর্ককে ঈশ্বরপ্রেমের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। যুসুফ-জুলেখা, মজনু-লাইলা প্রভৃতি ফারসী রোমান্টিক গল্পের নায়ক-নায়িকাদের প্রেমের আবেগকে সুফী সাধকগণ নিজ নিজ সাধনায় গ্রহণ করিয়াছেন।

[২৫] এ বিষয়ে অরবেরি সাহেব যথার্থ বলিয়াছেন, "The language of human love was used freely to describe the relations between the mystic and his Divine Beloved." (A. J. Arberry—*Sufism*)

কবিগণ শুধু 'মঞ্জরী' বা সখীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন, দূর হইতে সেই অচিন্ত্য অদৃষ্টলীলা মানসনয়নে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেরা কখনও ভগবানের প্রেমিকা হইবার বাসনা করেন নাই। বোধহয় পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমানুরক্ত মীস্টিক সাধনার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর এইস্থানে দূরতম পার্থক্য।)

প্রাচীন ভারতেও প্রেমিক-প্রেমিকার রূপকে ভগদ্‌ভক্তি ব্যাখ্যার সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিবে।[২৬] উপনিষদে বলা হইয়াছে, প্রেমিক পত্নী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া মানুষ যেমন আপনপর ভুলিয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম-জীবের সম্পর্ক। 'শাণ্ডিল্যসূত্র' ও 'নারদীয় ভক্তিসূত্রে' যে ভক্তিধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেখানেও ব্রজগোপীদের মতো ভগবানকে ভালবাসার কথা বলা হইয়াছে ('যথা ব্রজগোপিকানাম্')। শাণ্ডিল্যসূত্রেও বল্লবীযুবতীদের প্রেমের সঙ্গে ভক্তের আকর্ষণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে; এই ভক্তি কিরূপ? "সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা" (নারদীয়); ভক্তির অর্থ ভগবানের প্রতি পরম প্রেম।

দক্ষিণ-ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায়ের কথা সুপরিচিত। দক্ষিণ-ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভক্তিসাধনার কেন্দ্র, ভক্তিদর্শনের উৎসভূমি। খ্রীষ্টীয় শতাব্দী হইতেই এই অঞ্চলে তামিলভাষী আলোয়ার নামক ভক্তসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। তামিলভাষায় রচিত ইঁহাদের প্রেমভক্তিবিষয়ক অতি উৎকৃষ্ট ভজনগীতিকা আছে, যাহার ভক্তির গভীরতা, প্রেমের আর্তি, শিল্পসৃষ্টির অপূর্ব নিপুণতা বাঙলার মহাজনপদাবলীর সহিত তুলনীয়। এই সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষ, সকলেই স্থান পাইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধা মহিলা আলোয়ার আণ্ডালের নাম ভক্তিশাস্ত্রে সুপরিচিত। ইঁহারাও রাগানুগা ভক্তির বশে কৃষ্ণ-গোপীর লীলাগান করিতেন। অবশ্য ইঁহারা কৃষ্ণ-গোপীলীলাগান লিখিলেও কুত্রাপি রাধার উল্লেখ করেন নাই। তামিল সাহিত্য 'নাপ্পিন্নাই' নাম্নী এক প্রধানা গোপীর নাম পাওয়া যাইতেছে, যাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণের আসক্তিলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইনিই বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধা। স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রভাবে আলোয়ারগণ কৃষ্ণবল্লভাকে স্থানীয় নামকরণের দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। তবে ইঁহাদের ভক্তিবাদ আর বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর ভক্তিবাদ

---

[২৬] এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র প্রথম খণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে এ বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

একটু স্বতন্ত্রধরণের। আলোয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা যেমন কৃষ্ণের গোপীলীলা স্মরণ-মনন-কীর্তন করিতেন, তেমনি আবার কৃষ্ণকে পরম দয়িতরূপে এবং আপনাদিগকে কৃষ্ণপ্রেয়সীরূপে কল্পনা করিয়া অনেক উৎকৃষ্ট গান লিখিযাছিলেন। পূর্বকথিত আণ্ডাল (বা গোদা) ভগবান রঙ্গনাথকেই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) তনুমনযৌবন সঁপিয়া দিযাছিলেন। তিনি রঙ্গনাথের প্রেয়সী, পত্নী—তাই তিনি আর বিবাহই করেন নাই। এখানে দেখা যাইতেছে আলোয়ার সম্প্রদায়েব কবি ও সাধকগণ অনেকটা সুফীদের মতো ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রিয় প্রিয়াব সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের যথার্থ আদর্শ নহে।

এইরূপ সাধনার ইঙ্গিত মধ্যযুগের সাধিকা মীরাবাঈযেব বহু ভজনে পাওযা যায়। মীরাও রাধার মতো 'সব তেয়াগিযা একমন হইয়া নিশ্চয হইলাম দাসী' এই ধরণেব বহু উক্তি করিযাছেন। 'মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর'—এইরূপ ভণিতা দিয়া মীরাবাঈ প্রায পদেই কৃষ্ণেব প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন—সেখানে তিনি ও রাধা এক হইয়া গিয়াছেন। বাংলার বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সঙ্গে এই স্থানেই খ্রীষ্টান ভক্তিধর্ম, সুফী সাধনা, আলোয়ার সম্প্রদাযেব তত্ত্ব ও মীরার ভজনের প্রধান পার্থক্য। চৈতন্যযুগেব বাঙালী বৈষ্ণব কবিগণ কেহই নিজেদেব রাধাভাবে কল্পনা করেন নাই, কৃষ্ণকে আপন আপন দয়িতভাবে কামনা তাঁহাদেব কল্পনাব অতীত। তাঁহারা শুধু রাধাকৃষ্ণলীলার সখীমাত্র। কেহ-বা তাহাও নহেন। শুধু 'মঞ্জরী'র দাসীদের ভূমিকাটুকু ভিন্ন কৃষ্ণলীলার নিগূঢ় অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার তাঁহাদের ছিল না।[২৭] "ভগবানকে পতি ও আপনাকে পত্নী বা নায়িকা বোধে ভজন করা শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়—"[২৮] একথা গৌড়ীয়

[২৭] গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় 'মঞ্জরী' ও 'সখী' প্রায়ই এক অর্থে ব্যবহৃত হইলেও উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে। সখীগণ নিত্যসিদ্ধা, সুতরাং রাধাকৃষ্ণলীলার তাঁহারা নিগূঢ় সাক্ষী, অপরদিকে মঞ্জরীগণ সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন। সুতরাং কৃষ্ণলীলায় তাঁহারা যেন বাহিরের পরিচারিকার ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরে সাধনা ও সুকৃতির বলে তাঁহারা সখীত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

[২৮] 'বৈষ্ণব রসসাহিত্যে' খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবিষয়ে আলোচনার জন্য ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' (পৃ. ১৭৪) দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবধর্ম, ও বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে আদৌ প্রযোজ্য নহে। এইরূপ দয়িত-ভাবের সাধনা বিশ্বের নানা ধর্ম-উপধর্মে দেখা যায়, ভারতেও এরূপ ধর্মপ্রণালী দুর্লভ নহে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, সাধনা ও সাহিত্যের প্রেমধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের তত্ত্বাদর্শ। ইহার *Dolci Amora*র সমস্তটাই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনের নিত্যলীলা, ভক্ত ও মহামানবগণ সেই লীলাকে দূর হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, লীলার সেবক হইয়াছেন—এই মাত্র। এই সাধনাই 'সখীসাধনা' নামে পরিচিত, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা চৈতন্যদেবের মৌলিক কবি-কল্পনাই হোক, অথবা রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে তিনি ইহা রায়ের নিকটে ইহার পূর্ণ স্বরূপ অবগত হউন, মোটকথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সাহিত্য প্রেমধর্ম ও মীস্টিক সাধনার পর্যায়ভুক্ত হইলেও অন্যান্য প্রেমধর্মের সঙ্গে ইহার যে কুলগত পার্থক্য রহিয়াছে তাহা সবাগ্রে বুঝিয়া লইতে হইবে। এই বিশেষ ভাবধর্মটি সম্বন্ধে অবহিত হইলেই ইহাকে আর স্থূল মতের ছায়ায় বর্তিত বলিয়া মনে হইবে না।

চৈতন্যদেবের সমকালে এবং পরে বৈষ্ণব পদাবলী প্রেমধর্মের ভাষ্যরূপেই বাঙলাদেশে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ পদকারগণ চৈতন্যদেবের ভাবাবেগ ও আর্তির আলোকেই বৈষ্ণবপদ ও রাধাকৃষ্ণলীলার স্বরূপ বুঝিয়া লইয়াছেন, নরহরি সরকার যথার্থ-ই বলিয়াছেন:

গৌরাঙ্গ নহিত যে মোন হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

গৌড়ের রাধাকৃষ্ণলীলা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ও পার্থক্য অবলম্বন করিয়াছিল, চৈতন্যদেবই তাহার মুখ্য কারণ। এইজন্য ভক্ত কবিগণ কৃতজ্ঞতাবশে রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন গান আরম্ভের পূর্বে তদনুরূপ ভাবাত্মক গৌরাঙ্গবিষয়ক গান গাহিয়া লইতেন। ইহাই গৌরচন্দ্রিকা।[২৯]

২৯ পরে দ্রষ্টব্য।

বাস্তবিক গৌরচন্দ্রিক পদের জন্যই বৈষ্ণব পদাবলী একটা বিশেষ ধারণার ইঙ্গিত দিয়াছে। খ্রীঃ ১৬শ শতকের প্রারম্ভ হইতে ১৮শ শতাব্দী—প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া অসংখ্য কবি অজস্র পদ রচনা করিয়াছিলেন; তাহার কোনটি ভক্তিরসে আনত, কোনটি তত্ত্বসাধনায় তুঙ্গ, কোনটি বা মর্ত্যরসে লাবণ্যময়। জ্ঞানদাসের

তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা লয়্যা রাখি বুকে॥

রাধার আর্তি একাধারে ভক্তিরস ও মর্ত্যরসে মিশিয়া গিয়াছে। কিংবা পদাবলীর চণ্ডীদাসের

তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
একুলে ওকুলে মোর কেবা আছে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥

এ সমস্তই একটা দেহতন্মাত্রহীন বাক্‌পথাতীত আবেগ—যাহা বিশেষ ধ্যানধর্মশীল-সাধনার দ্বারাই বোধগম্য। পদাবলীর চণ্ডীদাস একটি পদে যথার্থই বলিয়াছেন যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনা মানুষী প্রেমে কতটুকুই-বা পাওয়া যাইবে?

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহু না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥

গোবিন্দদাসের পদে বৈরাগ্যের চেয়ে বিলাস বেশি, ভক্তির ঐকান্তিকতার সঙ্গে শিল্পোৎকর্ষের লীলালাবণ্য মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার অভিসার ও মিলনের

পদে বিদ্যাপতির পদের মতোই একটা মর্ত্যচেতনার উল্লাস লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু সেই গোবিন্দদাসের পদেও দেহকেন্দ্রিক অথচ বৈদেহী আবেগের আশ্চর্য ব্যঞ্জনা রহিয়াছে :

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনুমন মাতল
না শুনে ধরম লবলেশ ॥
নাসিকা হো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদন না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধিল মঝুমনে
ধরম রহব কোন ঠাম ॥
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে
অন্তরে উপজয় হাস।
তঁহি এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ
পূছব গোবিন্দ দাস ॥

বৈষ্ণব পদাবলী শুধু মর্ত্যবাসনার কাব্য নহে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় রসতত্ত্ব, সাধনপ্রণালী এ কবিতার মর্ত্যপ্রেমের রক্তিমাকে গৈরিক রেণুরঞ্জিত করিয়াছে। তাই বলিয়া তাহা পুরাপুরি বৈরাগ্যধর্মী ভক্তিসাধনার ব্রহ্মসূত্রে পরিণত হয় নাই। মর্ত্যকামনাকে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতর করিয়া আদিরসকে আবেগের ভিযানে চাপাইয়া ধীরে ধীরে ইহাকে উজ্জ্বলরসে পরিণত করার বিচিত্র প্রণালী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা ও সাহিত্যের মর্মকেন্দ্র। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে চৈতন্যযুগের পদসাহিত্যকে শুধু রোমান্টিক ও 'সেক্যুলার' বলা চলিবে না, আবার আবেগ-উত্তাপহীন সুকঠোর যতিধর্মও ইহার মূল প্রেরণা নহে। রোমান্টিক চেতনার বিস্ময়রস ('spirit of wonder') এবং ভক্তিকাব্যের আত্যন্তিক আত্মসমর্পণ—এই দুইটি রূপ বৈষ্ণবপদাবলীতে মিলিত হইয়াছে। পদকারগণ সমাজসংসারের মধ্য দিয়া বাস্তব প্রতীকের

সাহায্যে মর্ত্য-রসরূপের আধারে এই অভিনব ভক্তিরস পরিবেষণ করিয়াছেন।[৩০] তাই বিশ্বের ভক্তিসাহিত্য ও প্রেমসাহিত্যের গঙ্গা-যমুনাধারা বৈষ্ণব পদাবলীতে একাকার হইয়া গিয়াছে।))

অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর এই সহজরসের সুরটি হারাইয়া গিয়াছে। একদিকে বুদ্ধির দীপ্তি, অলঙ্করণের কারুকর্ম এবং অপরদিকে সহজিয়া বৈষ্ণব ও শ্রীখণ্ডসম্প্রদায়ের প্রভাবে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বাশ্রয়ী দেহমানসিক কৃত্য ও রহস্যময় আচার-আচরণ প্রবেশ করায় জন্য ইহা অনেক সময়ে গূঢ়চারী হইয়া পড়িল, কোথাও-বা সাধনমার্গের মধ্যে হারাইয়া গেল। সে যাহা হোক, বৈষ্ণব পদাবলীকে পুরাপুরি মর্ত্যপ্রেমের নিরিখে বুঝা যাইবে না, আবার শাস্ত্ররসাস্পদ ভক্তির নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মনিবেদনও ইহার একমাত্র পরিচয় নহে—উভয়ের সংমিশ্রণে, প্রেমের বিষামৃতের তীব্রতায় ইহা অনন্যসাধারণ। শ্রীরাধার অঙ্গাবরণের এক পিঠে রসরঙ্গের রক্তিম উচ্ছ্বাস, আর এক পিঠে গৈরিক বৈরাগ্য। বৈষ্ণব পদাবলী প্রেমের গান—স্বয়ং রাসরসশেখর শ্রীভগবান যে প্রেমের নায়ক; বৈষ্ণব পদাবলী ভক্তির গান—মর্ত্যবাসনাজর্জর আদিরসের সঙ্গে যে ভক্তির সহজ মিতালি। রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটি :

বড় শক্ত বুঝা—
যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা—

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদসাহিত্যে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে।

৩০ বৈষ্ণবপদে রাধাচরিত্রে এই মর্ত্যরূপটির যথার্থ স্বরূপ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঠাকুরাণীর কথায়' চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তিনি (অর্থাৎ রাধা ঠাকুরাণী) আপনাকে বড় করিয়া ঈশ্বরী বলিয়া জানেন না, এবং গোবিন্দকেও ঈশ্বর বলিয়া জানেন না; নাগর বলিয়াই, প্রিয় বলিয়া জানেন; এবং দেবতা বলিয়া জানিলে যতটা না ভয়ে ভয়ে আদর করিতে পারিতেন, ত্রাসরহিতভাবে প্রিয়সখা বুঝিয়া প্রিয়দেবতা বুঝিয়া ততোধিক লজ্জামাখা আদর সোহাগ করেন।" ক্ষেত্রমোহন রাগানুগা বৈষ্ণব প্রকৃতির গূঢ় তাৎপর্যটিও অল্প কথায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বে দেখিলেন পীতবসন; সোনার বরণ পীতবসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন তাহা বসন নহে, তাহা শ্রীরাধা—হ্লাদিনী ভালবাসাঠাকুরাণী।" ('অভয়ের কথা'র অন্তর্গত "ঠাকুরাণীর কথা")

৩॥ বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়

বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে স্পষ্টতঃ দুইটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী ধারা, আর একটি চৈতন্যযুগের ধারা। প্রাক্-চৈতন্যযুগে 'গীতগোবিন্দ' ও ভাগবতকে অনুসরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের যে লীলাপর্যায় প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি স্বরূপ লক্ষণগত বিশিষ্টতা আছে, যাহা চৈতন্যযুগের ভাবাদর্শের বিপরীত না হইলেও উভয়ের মধ্যে রূপ, রীতি ও তত্ত্বের দিক দিয়া বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। চৈতন্যের পূর্বে সম্ভবতঃ মাধবেন্দ্রপুরী বাঙলাদেশে অনুরাগমূলক ও ভাগবতাশ্রিত প্রেমধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন।[৩১] বাঙলায় বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি ভক্তি-সংক্রান্ত পুরাণ-গ্রন্থ এবং সঙ্কলনগ্রন্থে ধৃত সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ শ্লোকে লৌকিক ভাবাপন্ন রাধাকৃষ্ণ বা কৃষ্ণগোপী-সংক্রান্ত কাহিনী ও আদর্শ নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। 'গীতগোবিন্দে' গৌড়ীয় মতাদর্শের পরিস্ফুটন হওয়া সম্ভব ছিল না, উপরন্তু সংস্কৃত আদিরসের কাব্যকাহিনী ও উদ্ভট শ্লোকাবলী ইহার কায়ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছে, কাজেই ইহাতে চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের সাক্ষাৎ লাভ করা যাইবে না। ইহাতে ভক্তিরস নাই, 'সেক্যুলার' চিত্ত-প্রবণতাই ইহার মূল লক্ষ্য, রাধাকৃষ্ণের রূপকে কবি ইহাতে ফেনিল বিষামৃত পরিবেষণ করিয়াছেন, 'বিলাসকলাকুতূহলা'র আবেগে জয়দেব কান্তকোমল পদাবলী লিখিয়াছিলেন—ইদানীন্তন কালে কেহ কেহ এইভাবে জয়দেবকে বিচার করিতেছেন। এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র[৩২] বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রসঙ্গক্রমে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, 'গীতগোবিন্দে'ও একপ্রকার ভক্তি আছে,—যে ভক্তি ঐশ্বর্য মিশ্রা ও আদিরসাত্মক। চৈতন্যের পূর্বে বৈষ্ণবপদে 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাবই অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ পদাবলী এবং বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কিয়দংশ (বিশেষতঃ 'রাধাবিরহে') 'গীত-গোবিন্দে'র ভাষা-ভঙ্গীর কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে।

বিদ্যাপতি স্মার্ত সংস্কারে বর্ধিত হইয়াছিলেন, শৈবধর্মানুকূল সমাজ ও পরিবারে বাস করিয়াছিলেন; তবু তাঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদে উত্তপ্ত দেহ-

৩১ ৩২ লেখক প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

প্রাধান্য সত্ত্বেও একপ্রকার ভক্তিরস আছে—যাহা মূলতঃ 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাবেই পরিকল্পিত হইয়াছে। কবি যে 'অভিনব জয়দেব' বা 'নব জয়দেব' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। বস্তুতঃ তাঁহার রাধাকৃষ্ণ চরিত্র, পদাবলীর রূপনির্মিতি এবং রসপরিণাম পদে পদে জয়দেবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আসল কথা, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র অপ্রতিহত প্রভাবে ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র পূর্বভারত পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, পশ্চিম-ভারতও বাদ যায় নাই। মিথিলার বিদ্যাপতির পদে এবং বাঙলার বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কিয়দংশে সেই প্রভাব স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যাইবে।

বিদ্যাপতির পদসাহিত্য ও ভাগবতের অনুবাদে (মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়) কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমিশ্রা অপ্রতিহত শক্তির লীলাই পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের পরকীয়া লীলা এই পর্বের প্রধান লক্ষণ, এবং তাহাতে মর্ত্যবাসনানুরঞ্জনের চেষ্টাও লক্ষ্য করা যাইবে। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা পুরাপুরি পরকীয়া নায়িকা, কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত সামান্যা নায়িকার সঙ্গে ইনি সমতুল্যা নহেন। প্রাক্-চৈতন্যযুগেও রাধাকৃষ্ণের পদাবলীতে মর্ত্যরূপ ও রসের সঙ্গে একপ্রকার ভক্তির স্পর্শ ছিল—তবে তাহা তখনও চৈতন্য-সম্প্রদায়ের দ্বারা রূপান্তরিত বা প্রভাবিত হইয়া ভজনগীতিকা বা কীর্তনে পরিণত হয় নাই। বিদ্যাপতি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত সাধারণ রসের পর্যায় অনুসারেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, রাধা-কৃষ্ণকে অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকার নিত্যলীলার তুঙ্গশীর্ষে স্থাপন করেন নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, 'অমরুশতক' বা 'গাথা-সত্তসঈ'-এর শৃঙ্গার রসের শ্লোকের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদগুলিকে একশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। বিদ্যাপতি আনুষ্ঠানিক ভাবে বৈষ্ণব ছিলেন না, কিন্তু এই পদাবলীর মধ্যেও একপ্রকার আত্মনিবেদন-মূলক আবেগ আছে যাহা নারদীয় ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র অথবা লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' এবং আলোয়ার সম্প্রদায়ের 'দিব্যপ্রবন্ধমে'র প্রায় সমগোত্রীয়।

গৌরচন্দ্রিকা ও চৈতন্যবিষয়ক পদাবলী ॥

চৈতন্যপ্রভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী যথার্থতঃ কায়া, কান্তি ও প্রাণ লাভ করিয়াছিল। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র রসপর্যায় অনুসারে এবং

চৈতন্যদেবের ভক্তি ও তত্ত্বাদর্শের প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণব পদাবলী শুধু কাব্যশাখারূপে পরিগণিত হয় নাই, অতঃপর রাধাকৃষ্ণ একটা বিশেষ তত্ত্বদৃষ্টির দ্বারা পরিমার্জিত হইয়া নবকলেবর লাভ করিলেন। ইতিপূর্বে বৈষ্ণবসাহিত্য বিশেষ কোন 'কাল্ট্'-এর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, ভারতবর্ষে যে ধরণের কৃষ্ণাশ্রয়ী ভক্তিবাদ প্রচলিত ছিল, প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য সেই আদর্শই গ্রহণ করিয়ছিল, এবং করিযাছিল বলিয়াই এই যুগের পদ ও সাহিত্যে প্রতিফলিত রাধাকৃষ্ণলীলাকে কেহ কেহ সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করিতে চাহেন ; ইহা যে কোন প্রকার ভক্তিরসের দ্বারা অনুস্যূত, ইহাও কেহ কেহ স্বীকার করেন না। কিন্তু চৈতন্যপ্রভাবে তাঁহার সমকালেই বৈষ্ণব পদাবলীব একটা অভিনব পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথমতঃ, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর কথা ধরা যাক। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'গৌবচন্দ্রিকা' নামে পরিচিত। লক্ষণীয় যে,(বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্যের লীলাসংক্রান্ত এবং স্তুতিবাচক পদগুলিকে 'চৈতন্যচন্দ্রিকা' না বলিয়া 'গৌরচন্দ্রিকা' বলিয়াছেন। বাঙলাদেশে যতিবেশী চৈতন্য অপেক্ষা যৌবনমূর্তি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলাই পদকর্তাদের অধিকতর শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিযাছিল। অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে রাগানুগা ভক্তিতত্ত্ব ও বৈষ্ণবসাধনার ভাবরূপ প্রত্যক্ষ হইল। সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী-ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব চৈতন্যদেবেরই অন্তর্জীবনের ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। মহাপ্রভুর আবেগ-আর্তির মধ্যে কবিগণ মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারই স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া ধন্য হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, চৈতন্যদেবের আবেগ-আর্তি পুরাপুরি শ্রীরাধার সঙ্গেই তুলনীয়। মহাপ্রভুর ভক্তি ও দিব্য-বিরহের পটভূমিকায় তাঁহাবা রাধাকৃষ্ণ-লীলারসের অর্থ সন্ধান করিতে চাহিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া কৃষ্ণলীলার গান করিতে পারিতেন না। বিশেষ বিশেষ পালাকীর্তনের পূর্বে তাঁহারা চৈতন্যদেবের হৃদয় ও আচরণে অনুরূপ ভাব আরোপ করিয়া মহাপ্রভুর একখানি কাল্পনিক চিত্র আঁকিতেন। ধরা যাক, পূর্বরাগেব পদ গান হইতেছে —রাধার পূর্বরাগের বর্ণনা দিয়া গান আরম্ভ করিবার পূর্বে কীর্তনীয়াগণ 'তদুচিত শ্রীগৌবচন্দ্র' অর্থাৎ অনুরূপ রস বা পর্যায়ের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ আরম্ভ করিলেন।)

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর ॥

শ্রীগৌরাঙ্গও যেন রাধার মতো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ আবেগ বোধ করিয়াছেন। শ্রীরাধার পূর্বরাগের সমস্ত লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য গৌরাঙ্গে আরোপ করিয়া এই যে পদগুলি রচিত হইল—ইহাই গৌরচন্দ্রিকা। গুরুত্ব, ঐশ্বর্য ও মূল্যের দিক দিয়া রাধাকৃষ্ণ পদাবলী ও গৌরচন্দ্রিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, বরং গৌরচন্দ্রিকার পদ অধিকতর মূল্যবান। কারণ গৌরাঙ্গের আবির্ভাব না হইলে "রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে?" এইজন্য মূল রাধাকৃষ্ণলীলা-পর্যায়ের সুরের সঙ্গে সমতা রাখিয়া রূপকার্থে গৌরাঙ্গবিষয়ক এই জাতীয় পদ পদাবলী-সাহিত্য, বৈষ্ণব-সমাজ ও কীর্তনীয়াদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কোন কীর্তনের আসরে প্রথমে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ না গাহিলে কেহই রাধাকৃষ্ণলীলা শুনিতে চাহিত না, শ্রোতা ও ভক্তগণ ধর্মকৃত্যের অঙ্গহানি হইল বলিয়া মনে করিতেন। আরও একটা কথা, বৈষ্ণব পদাবলী মূলতঃ ভক্তির গান হইলেও ইহাকে রক্তমাংসের রূপকের আধারেই পরিবেষণ করা হইয়াছে, পূর্বাহ্নে চৈতন্যলীলা গীত হওয়ার জন্য রাধাকৃষ্ণলীলার মূল বর্ণনাগুলি চৈতন্যভক্তির আলোকে মার্জিত হইয়া নবরূপ লাভ করিত। অর্থাৎ গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলিকে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের চাবিকাঠি বলা যাইতে পারে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেক্সপীয়ারের সনেট সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "with this key Shakespeare unlocked his heart" শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে একথা সত্য হোক আর নাই হোক, গৌরচন্দ্রিকার সাহায্যে যে বৈষ্ণব পদাবলীর রস উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে চৈতন্যের ভাবাবেশমুগ্ধ চরিত্রের দিব্যভাব চমৎকার ফুটিয়াছে। পদকারগণ চৈতন্য ও শ্রীরাধার আবেগের সাদৃশ্য দেখাইতে গিয়া কখনও কখনও কষ্টকল্পিত তুলনার সাহায্য লইয়াছেন। যথা—

পূর্বরাগের পদ :

আজু হাম পেখলুঁ নবদ্বীপ চন্দ্র।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥
পুনপুন গতাগতি কর ঘর পন্থ।
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়নকমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥

অভিসারের পদ :

ব্রজ-অভিসারিণী- ভাবে বিভাবিত
নবদ্বীপ চাঁদ বিভোর।
অভিনয় ঐছন করত পুলকি তনু
নয়নহি আনন্দ লোর ॥

খণ্ডিতার পদ :

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
পূরব প্রেম ভরে মৃদু চলি যায় ॥
অরুণ নয়ন মুখ বিরস হৈয়া।
রোখে কহয়ে পহুঁ গদগদ হিয়া ॥
জানলুঁ তোহারে তোর কপট পিরীতি।
যা সঞে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর গতি ॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গরগর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ ॥

রাধা-ভাবে ভাবিত চৈতন্যের মাথুর পদ :

হরি হরি কি কহব গৌর চরিত।
অক্রুর অক্রুর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবহি পূরব পিরীত ॥
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ লেই যাওই
ডারই শোকহি কূপে।
কো পুন বছন বোলে নাহি ঐছন
সব জন রহল নিচুপে ॥

রাধামোহনের একটি পদে চৈতন্যের রাধাভাবটি চমৎকার ফুটিয়াছে :

কান পাতি গৌর হরি
বলে ওই শুন নিকুঞ্জ মন্দিরে
বাজিছে শ্যামের বাঁশরী ॥
মুরলীর নাদ কানেতে পশিয়া
মরমে বাজিল মোর।
আয় সখি আয় গৃহে থাকা দায়
যাওব বঁধুর ওর ॥
শ্যাম অভিসারে যাওব এখনি
কলঙ্কে নাহিক ডরি।
বঁধুয়া নিকুঞ্জে আমি গৃহমাঝে
কভু কি রহিতে পারি ॥
ইহা বলি মুখে অরুণ বসনে
আবরি সকল অঙ্গ।
ধায় গোরাচাঁদ এ রাধামোহন
পাছে ধরে তার সঙ্গ।

এই সমস্ত পদে পুরাপুরি রাধাকৃষ্ণলীলা কীর্তনের ছাঁচে রচিত এবং প্রত্যেকটি পালার উন্মোচন ও সূচক হিসাবেই ইহার প্রধান প্রয়োজন। চৈতন্যদেবকে রাধাভাবে অঙ্কিত করিয়া বৈষ্ণব পদসমূহের ভূমিকা হিসাবে গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োগই ইহার একমাত্র সার্থকতা এবং চৈতন্যলীলা ও রাধা-চরিত্রের রেখায় রেখায় মিল দেখাইবার জন্য ভক্ত-কবিগণ কখনও কখনও কল্পনার সীমাকে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করিয়া লইয়াছেন। আবার কিছু কিছু গৌরচন্দ্রিকাপদে চৈতন্যকে কৃষ্ণরূপে এবং ভক্তগণকে গোপীরূপে অঙ্কিত করাও হইয়াছে। যেমন—কৃষ্ণের মতো গোরাও 'দানী' সাজিয়া "দান দেহো দান দেহো" বলিয়া নবদ্বীপবাসীকে ডাক দিতেছেন :

আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল ॥
দান দেহ বলি ডাকে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরণী ॥

গোপীভাবে ভাবিত হইয়া ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণরূপে দেখিয়া বলিতেছেন :

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরাচাঁদ না দেখিলে
মরমে মরিয়া যেন থাকি'।
সাধ হয় নিরন্তর হেমকান্তি কলেবর
হিয়ার মাঝারে সদা রাখি ॥
পলকে না হেরি তায় পাঁজর ধ্বসিয়া যায়
ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি।
অনুরাগের তুলি দিয়ে অন্তর বাহির হিয়ে
না জানি তার কত ধার ধারি ॥
সুরধুনী নীরে যেয়ে কুল দিব ভাসাইয়ে
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সমুখে করি দেখিব নয়ান ভরি
বাসু নাহি চায় আন কাজে ॥

ভক্তগণের গোপীভাবের উৎকট আতিশয্য শেষ পর্যন্ত গৌরনাগরবাদের স্থূলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। পরবর্তীকালে সহজিয়াপন্থী বৈষ্ণবদের হাতে পড়িয়া চৈতন্যপদাবলী গূঢ়তর সাধনভজনে পরিণত হইয়াছিল।

গৌরচন্দ্রিকা পদের সঙ্গে চৈতন্যজীবনীবিষয়ক পদসাহিত্যও উল্লেখযোগ্য। কবিগণ যেমন চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে চৈতন্যজীবনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তেমনি যে সমস্ত কবি ও পরিকর চৈতন্যের নদীয়ালীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পালার আকারে চৈতন্যের জীবনীকে গাঁথিয়াছিলেন। নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতা বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ বসু, বংশীবদন চট্টো—ইঁহারা সকলেই চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। ইঁহাদের পদে চৈতন্যের বাস্তব জীবন ভক্তির দৃষ্টির সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যের জন্ম, বাল্য, বিবাহ, ভক্তগণ কর্তৃক অভিষেক, কীর্তন, নামপ্রচার প্রভৃতি ঘটনা এই সমস্ত পদের প্রধান অবলম্বন। এই পদগুলি ঠিক গৌরচন্দ্রিকার মতো ভাবরসসমৃদ্ধ নহে; ভাষা, ছন্দ ও কল্পনার উৎকর্ষও ততটা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু ইহাতে চৈতন্যের বাস্তব জীবনের একটি স্বচ্ছ আবেগধর্মী বিবৃতি আছে, যাহার সহজ রসের মূল্য তুচ্ছ করা যায় না।

৩

'পদকল্পতরু'র পুঁথির পাটায় অঙ্কিত কৃষ্ণলীলার চিত্র (পৃঃ ৫১৯)

চৈতন্যের জীবনের ঘটনাবিষয়ক এই পদগুলিকে চৈতন্য-জীবনীকাব্যের তুলনায় কিছু ম্লান মনে হইতে পারে। উপরন্তু লীলাকীর্তনের সূচকপদ হিসাবে গৌরচন্দ্রিকার পদগুলির বর্ণাঢ্য কল্পনার চমৎকারিত্ব, ভাষা ও অলঙ্করণের কারুকর্ম এবং তদ্‌গত ভক্তির গভীরতা চৈতন্যের এই সমস্ত জীবন-বিষয়ক পদে ততটা সুলভ নহে বলিয়া ইহাদের যেরূপ জনপ্রিয়তা হওয়া উচিত ছিল, ততটা জনপ্রিয়তা হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও অবারিত মানবীয় আবেগ, সহজ প্রাণের দুঃখবেদনা এবং চৈতন্যের স্নেহপ্রেমঘন পারিবারিক তথা *গার্হস্থ্যরূপটি এই সমস্ত পদে চমৎকার ফুটিয়াছে।*

রাধাকৃষ্ণলীলার পালা-পর্যায় ॥

চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে এদেশের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানে প্রধানতঃ অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত নায়ক-নায়িকা প্রকরণ ও লীলাপর্যায় অনুসৃত হইত। বিদ্যাপতি কোন পালাপর্যায় অনুসারে রাধাকৃষ্ণপদ রচনা না করিলেও তিনিও অলঙ্কার-শাস্ত্রের রীতি অনুসরণ করিয়া পূর্বরাগ হইতে বিরহ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য বিদ্যাপতির বিচ্ছিন্ন পদাবলীর মধ্যেও ভাবের দিক দিয়া মোটামুটি একটা বিন্যাস ও ক্রম রক্ষিত হইয়াছে।

চৈতন্যযুগে রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র প্রভাবে বৈষ্ণব পদকারগণ রাধাকৃষ্ণ লীলাকথাকে ঈষৎ নূতনভাবে বিন্যস্ত করিতে আরম্ভ করেন। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়ক-নায়িকা প্রকরণে শৃঙ্গার রসকে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ—এই দুই প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিপ্রলম্ভের চারিটি উপবিভাগ—(১) পূর্বরাগ, (২) মান, (৩) প্রেমবৈচিত্ত্য, (৪) প্রবাস। সম্ভোগেরও নানা বৈচিত্র্য ও পর্যায় আছে—তন্মধ্যে 'সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ' বৈষ্ণব পদসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পরবর্তী কালে কীর্তনীয়া মহলে রাধাকৃষ্ণলীলাকে পালার আকারে কাহিনীর ক্রম-অনুযায়ী বিন্যস্ত করার রীতি প্রচার লাভ করিলে বৈষ্ণব-পদকারগণ যেমন গৌরচন্দ্রিকা লীলাপদ রচনা করিয়া কৃষ্ণলীলারসের মুখবন্ধ করিতেন, তেমনি আবার অলঙ্কারশাস্ত্রের কাঠামো মোটামুটি অনুসরণ করিয়া

রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'-বর্ণিত লীলাপর্যায় ও অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ভাববৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিতেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব না হইলে বৈষ্ণব পদাবলী কোনদিনই এরূপ উৎকৃষ্ট রসরূপ লাভ করিতে পারিত না—তাহা ঠিক বটে, তেমনি রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' রচিত না হইলে বৈষ্ণব পদের লীলাপর্যায় এবং পালাকীর্তন এমন সুষ্ঠু বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিত না। বাসু ঘোষ যেমন পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রাখিয়া চৈতন্যজীবনের গোড়ার দিকের কাহিনীকে পালার আকারে বর্ণনা করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর কবিগণ সেইরূপ নিখুঁতভাবে পালা-বিন্যাস করেন নাই। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র এক-একটি পর্যায় অনুসারে মোটামুটি পালাটির সঙ্গতি বজায় রাখিয়া পদকারগণ বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে নানা পালার পদ রচনা করিয়াছিলেন। লীলাকীর্তনীয়াগণ এই সমস্ত পদকে আভ্যন্তরীণ ভাব অনুসারে সাজাইয়া এবং প্রতি পর্যায়ের আরম্ভেই 'তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র' অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকার গান গাহিয়া রাধাকৃষ্ণলীলার উদ্বোধন করিতেন। এই পালাগানের ভূমিকা হিসাবেই গৌরচন্দ্রিকার অধিকাংশ পদ রচিত হইয়াছিল। পরে 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র' প্রভৃতি পদসঙ্কলন গ্রন্থে পদগুলি সেই পর্যায় অনুসারে সজ্জিত হইয়াছিল।

রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে নায়ক-নায়িকাপ্রকরণ, রসতত্ত্ব ও শৃঙ্গারভেদ—এই তিনভাগে বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রকে বিভক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের মোটামুটি আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি রাধাকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকারূপে এবং তাঁহাদের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগলীলাকে নিত্যলীলারূপে বিবিধ পর্যায়ে সাজাইয়া, সংজ্ঞা দিয়া, ব্যাখ্যা করিয়া এবং সংস্কৃত কাব্যনাটক হইতে প্রচুর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া (তন্মধ্যে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত তাঁহারই গ্রন্থ হইতে গৃহীত) রসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে সেই আদর্শই বৈষ্ণব পদাবলীতে অনুসৃত হইয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণকে নিত্যবিভাব ধরিয়া নিম্নলিখিতরূপে রস ও লীলাপর্যায় আলোচিত হইয়াছে :

১। নায়ক ভেদ

২। সহায়ভেদ (অর্থাৎ নায়কের সহায়তাকারিগণ)

৩। কৃষ্ণবল্লভা (অর্থাৎ কৃষ্ণের দ্বারকাধামের বিবাহিতা পত্নী এবং বৃন্দাবনের রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, গোপালী, ধর্মিষ্ঠা এবং পালিকা।)

৪। রাধাপ্রকরণ

৫। নায়িকাভেদ

৬। যূথেশ্বরী ভেদ (রাধাদি অষ্ট যূথেশ্বরীর বর্ণনা।)

৭। দূতীভেদ

৮। সখীপ্রকরণ

৯। হরিবল্লভাপ্রকরণ

১০। উদ্দীপনপ্রকরণ (কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদের উদ্দীপন-বিভাবের আলোচনা।)

১১। অনুভবপ্রকরণ (অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুভাবকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদের লীলারসের পটভূমিকায় ব্যাখ্যা।)

১২। উদ্ভাস্বরপ্রকরণ ('উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ'—ভাববিশিষ্ট জনের দেহে যাহা যাহা প্রকাশ পায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে উদ্ভাস্বর বলেন।)

১৩। সাত্ত্বিকপ্রকরণ (সাত্ত্বিক ভাব)

১৪। ব্যভিচারিভাব

১৫। স্থায়িভাব ("স্থায়িভাবোঽত্র শৃঙ্গারো কথ্যতে মধুরা রতিঃ"—শৃঙ্গার রসে মধুরা রতিকে স্থায়িভাব বলে।)

১৬। শৃঙ্গারভেদ

'শৃঙ্গারভেদ' নামক শেষ অধ্যায়টিতে বর্ণিত লীলাপর্যায়ই বৈষ্ণব পদাবলীর পালাকীর্তন ও লীলা-বিন্যাসকে সাহায্য করিয়াছে। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

রূপ গোস্বামী শৃঙ্গার বা উজ্জ্বলরসকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) বিপ্রলম্ভ (২) সম্ভোগ।

বিপ্রলম্ভ ॥

বিপ্রলম্ভের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলা হইয়াছে :

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥

অনুবাদ : (নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের অযুক্ত এবং যুক্ত সময়ে পরস্পর অভিমত আলিঙ্গন, চুম্বনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকটিত হয় তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলে। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক।)

(বিপ্রলম্ভ মিলনের বিপরীত। তথাপি বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ কায়িক বা মানসিক দূরত্ব না থাকিলে মিলন (সম্ভোগ) সার্থক হইতে পারে না। রূপ গোস্বামী একটি চমৎকার উপমা দিয়া বিপ্রলম্ভের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছেন—"কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে।" অর্থাৎ রঞ্জিত বস্ত্রের পুনর্বার রঞ্জনে রঙের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পায়, তেমনি বিপ্রলম্ভের দ্বারা অনুরাগ ও মিলনের আনন্দ গাঢ়তর হয়। এই বিপ্রলম্ভ চার প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস।)

পূর্বরাগ॥ (পূর্বরাগের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে :

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।)

অনু. : যে রতি সঙ্গমের পূর্বে দর্শন এবং শ্রবণাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া নায়ক-নায়িকা উভয়ের উন্মীলন অর্থাৎ বিভাবাদির মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে পূর্বরাগ বলেন।)

নিম্নে পূর্বরাগের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রকরণ নির্দিষ্ট হইতেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বরাগের বিভিন্ন পর্যায় ও শ্রেণীর গান রচিত হইয়াছিল। এখানে পূর্বরাগের বিভিন্ন পর্যায়ের দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

চিত্রপট দর্শন :

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি হরি এমন কেনে বা হৈল।
বিষম বাডব আনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ।
বয়সে কিশোর বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ॥

এখানে বিশাখা-আনীত কৃষ্ণের চিত্র দেখিয়া রাধিকা কৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রবণ :

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে বা পাসরিব তারে॥

বিরহের মতো পূর্বরাগের নানা দশা পরিকল্পিত হইয়াছে :

প্রোক্তা স্তুতনুরোধেন তাসাং লক্ষণমুচ্যতে।
লালসোদ্বেগ জাগর্যাতানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

পূর্বরাগের দশ দশা—(১) লালসা, (২) উদ্বেগ, (৩) জাগর্যা, (৪) তানব, (৫) জড়তা, (৬) ব্যগ্রতা, (৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মোহ, (১০) মৃত্যু।

রূপ গোস্বামী আরও বলিয়াছেন যে, যদিও সর্বপ্রথমে কৃষ্ণের পূর্বরাগ উৎপন্ন হয়, তবু নায়িকাদের পূর্বরাগ প্রথমে বর্ণিত হইলে চারুত্ব বর্ধিত হয় :

অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তা স্যাচ্চারুতাধিকা।

মান ॥ মানের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলা হইয়াছে :

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষ বীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥

অনু (পরস্পর-অনুরক্ত একত্রে অবস্থিত যে দম্পতি অর্থাৎ নায়ক-নায়িকা, তাহাদের স্বীয় অভিমত আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদি রোধকারীকে মান কহে)

এই মানে নির্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ (ক্রোধ), চপলতা, গর্ব অসূয়া, অবহিত্থা (ভাবগোপন), গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব লক্ষিত হয়।[৩৩]
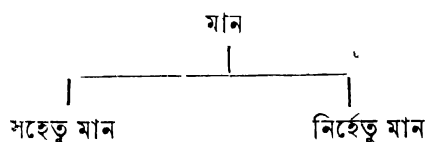
মানের দুইটি উপবিভাগ—সহেতু মান ও নির্হেতু মান। রাধা বা চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণ ছলনা করিলে কারণবশে কৃষ্ণবল্লভা অভিমানিনী হইলে তাহার নাম সহেতু মান--অর্থাৎ যে মানের কারণ আছে। সখীদের মুখে বা অন্য কোন প্রকারে কৃষ্ণের 'কৈতব' (ছলনা) বুঝিয়া ইঁহারা মান প্রকাশ করেন। সহেতু মানের আটটি উপাঙ্গ—সখীমুখে শ্রবণ, শুকমুখে শ্রবণ, মুরলীধ্বনি শ্রবণ, বিপক্ষগাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন, প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন, গোত্র স্খলন, স্বপ্নে দর্শন, অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন।

কিন্তু কারণ না থাকিলেও (বা 'কারণাভাস' থাকিলেও) প্রেমের অতি-রেকের বশে যে অভিমান, তাহা নির্হেতু মান। কৃষ্ণ অপরাধ করিয়াছেন, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রি যাপন করিয়াছেন, অন্য রমণীর ভোগচিহ্ন লইয়া পরদিন প্রভাতে রাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন—ইত্যাদি কারণে রাধার মানিনী

[৩৩] স্নেহের উৎকর্ষ হইতেই মানের উৎপত্তি হয়।

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ॥

হইবার অনেক পদ বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। জ্ঞানদাসের রাধা অপরাধী কৃষ্ণকে কঠোর কথা শুনাইয়া মানিনী হইয়াছিলেন :

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কী ফল আছয়ে এত পরিহার ॥
পাওলুঁ তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লুঁ সরবস নিরমল কুল ॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমর তিয়াস ॥
অলপে বুঝলুঁ হাম তুয়াক পিরীত।
নামহি যৈছে অন্তরে সোই রীত ॥

কৃষ্ণের ছলনায় রাধার মানিনী হওয়ার চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের প্রীতিকর হয় নাই। তাঁহার মতে, "আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণরাধার প্রেমকাব্যের সৌন্দর্যও খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রী অবমানিত হইয়াছে।" কিন্তু নির্হেতু মানের পদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত এতটা তীব্র নহে, "যতক্ষণ নায়কের প্রেমের প্রতি নায়িকার যথার্থ দাবি থাকে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে ক্রীড়াচ্ছলে অথবা স্বল্প অপরাধের দণ্ডচ্ছলে পুরুষের প্রেমাবেগকে কিয়ৎকালের জন্য প্রতিহত করিলে সে অভিমানের একটা মাধুর্য দেখা যায়। কিন্তু গুরুতর অপরাধ অথবা বিশ্বাসঘাতের দ্বারা নায়ক যখন সেই প্রেমের মূলেই কুঠারাঘাত করে, তখন যথারীতি অভিমান প্রকাশ করিতে বসিলে নিজের প্রতি একান্ত অবমাননা প্রকাশ করা হয় মাত্র, এই জন্য তাহাতে কোনো সৌন্দর্য নাই এবং তাহা কাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।" রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য সত্য ; যেখানে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাই প্রেমের আলম্বন-বিভাব, সেখানে নায়কের ছলনা নিতান্তই 'কৈতব' মাত্র। তাহাকে স্থূল কামুকতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু বৈষ্ণব পদকারগণ অপ্রাকৃত লীলারস ব্যাখ্যা ও বিস্তার করার সময় সহেতু মানকে ঠিক এই দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তবে নির্হেতু মানের পদেই রসের গাঢ়তা ও প্রেমের বৈচিত্র্য অধিক। কারণ সেখানে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাকে ছলনা নাই—প্রেমের অতিরেক বশতঃই কৃষ্ণের কাল্পনিক অপরাধে

রাধা মান করিয়া বসেন এবং কৃষ্ণের সামান্য চাটুবাণীতে সে মান উড়িয়া যাইতে বিলম্ব হয় না। মান যথার্থই সম্ভোগ-পুষ্টিকারক।

প্রেমবৈচিত্ত্য ॥ প্রেমবৈচিত্ত্য বৈষ্ণব পদাবলীর এক বিচিত্র ব্যাপার। ইহার সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলা হইয়াছে :

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥

অনু : (প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয়ের সন্নিধানে তাহার সহিত বিচ্ছেদভয়ে যে বেদনার উপলব্ধি, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।)

বৈষ্ণবপদাবলীর সেই 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' পংক্তিগুলি প্রেমবৈচিত্ত্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। প্রেমবৈচিত্ত্যের মূলকথা প্রেমের উৎকর্ষ এবং প্রেমের উৎকর্ষের জন্য নিজের ভাগ্যের প্রতি আক্ষেপ—সুতরাং ইহাতে প্রচ্ছন্ন বিরহের সুর আছে। ইহাই বৈষ্ণব পদাবলীর 'আক্ষেপানুরাগ'। রূপ গোস্বামীর মতে প্রেমবৈচিত্ত্য হেতু রাধার মনে আটটি বিষয়ে আক্ষেপের আবির্ভাব হয়। যথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ, দূতীর প্রতি আক্ষেপ, মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ এবং গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ। আক্ষেপের স্বরটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : "প্রিয়তমের দর্শন না পাইলে ক্ষণমাত্রকে যুগ বলিয়া মনে হয়, আবার মিলন হইলে সন্দেহ হয়, পাইয়াছি তো? অভাগীর অদৃষ্টে এ সুখ স্থায়ী হইবে কি? হয়তো এখনই হারাইব। মিলনের দীর্ঘসময়কেও পল বলিয়া মনে হয়। মনে হয় এই তো এখনই ফুরাইয়া গেল। সংসারে কেহ আপনার নাই, অপরে পরের ভাল দেখিতে পারে না। বিধাতাও বিরূপ, অন্য সব ছাড়িয়া যাহাকে আপনার বলিয়াছিলাম—আজ সেই পর বলিয়া মনে করিতেছে। তাহার ছায়াও দেখিতে পাই না। আমার যৌবন, এই বৃন্দাবন, অই যমুনা, অই কদম্ব কানন, অই বংশীধ্বনি—আর সর্বোপরি সুন্দর শ্যাম। সখি, আমি আপনা খাইয়া সর্বস্ব হারাইলাম। ব্রজে আর তো কত যুবতী আছে। যমুনায় জল আনিতে কে যায় না; মুকুন্দ-মুখারবিন্দ কে দেখে না, বংশীধ্বনি কে শোনে না—কিন্তু কার এত জ্বালা? বাঁশী কেন আমারই নাম ধরিয়া ডাকে?"[৩৪] ইহাই

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—পদাবলী পরিচয়

আক্ষেপানুরাগের মূল তাৎপর্য। (পদাবলীর চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের অসংখ্য পদ আছে—যাহাতে প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়ের আক্ষেপানুরাগের পদগুলি কাব্যসৌন্দর্য ও একনিষ্ঠ আবেগে অতি চমৎকার হইয়াছে। রাধার এইরূপ একটি আক্ষেপ :

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥)
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।

কিংবা—

(এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥)
যথা তথা যাই আমি যত দুখ পাই।
চাঁদমুখে হাসি হেরি তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে মন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥

প্রবাস॥ প্রবাসের সংজ্ঞায় রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন :

পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানস্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে॥

অনু : পূর্বে মিলিত হইয়াছিলেন, এমন নায়ক-নায়িকার দেশ ও স্থানান্তরের ব্যবধানকে প্রবাস বলে।
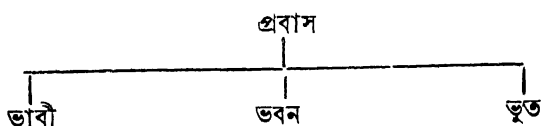
প্রবাসের অর্থ বিরহ। এই প্রবাস সুদূর হইতে পারে অথবা কিয়দ্দূর হইতে পারে। যখন কৃষ্ণের মথুরা যাইবার সংবাদ রটিয়া যায়, তখন ভাবী বিরহ স্মরণ করিয়া রাধার যে বিরহ কল্পনা তাহাকে ভাবী বিরহ বলা হয়। যখন কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়াছেন, তখন রাধা যে বিরহ ভোগ করেন, তাহার নাম ভবন্ বিরহ—অর্থাৎ যখন বিরহ ভোগ চলিতেছে। ভূতবিরহের অর্থ—কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, কিন্তু 'আসিব' বলিয়াও ফিরিয়া আসেন নাই। নিম্নে ভূতবিরহের একটি পদ উল্লিখিত হইতেছে :

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদতি পিঞ্জর শূকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সোই যমুনার কূলে।
গোপগোপী নাহি বুলে॥

সাধারণতঃ বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহ 'মাথুরলীলা' নামে অধিকতর পরিচিত। কারণ কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরা যাত্রার ফলেই এই বিরহের উৎপত্তি। বিরহের দশটি দশা কল্পিত হইয়াছে :

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহমৃত্যুর্দশাদশঃ॥

অনু : প্রবাসাখ্য বিরহের দশটি দশা—চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব (কৃশতা), মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ এবং মৃত্যু।

সম্ভোগ॥

বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত চারিটি পর্যায়ের পর সম্ভোগ পর্যায় আলোচিতব্য। সম্ভোগের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে :

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে॥

অনু : দর্শন এবং আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যের জন্য নায়ক-নায়িকাদের যে ব্যাপার, তাহার উল্লাসের উপরে যে ভাব আরোহণ করে, তাহার নাম সম্ভোগ।

দর্শন-আলিঙ্গনাদি দেহভোগজনিত উল্লাসকে সম্ভোগ বলা যাইতে পারে—চলিত কথায় ইহাকে রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা বলা হয়। সম্ভোগ দুই প্রকার—মুখ্য সম্ভোগ ও গৌণ সম্ভোগ।

মুখ্য সম্ভোগ চারি প্রকার: (১) সংক্ষিপ্ত, (২) সঙ্কীর্ণ, (৩) সম্পন্ন, (৪) সমৃদ্ধিমান। ভয়, লজ্জা ও অসহিষ্ণুতা হেতু যে মিলন স্বল্প—তাহা সংক্ষিপ্ত। যেখানে নায়িকা সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না, সেখানে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। অদূর প্রবাস হইতে নায়ক-নায়িকা ফিরিলে উভয়ের যে পূর্ণ মিলন তাহা সম্পন্ন সম্ভোগ এবং দুর্লভ-দর্শন ও দীর্ঘকাল বিযুক্ত নায়ক-নায়িকার যে চরম মিলন তাহাই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

গৌণ সম্ভোগের অর্থ স্বপ্নসম্ভোগ—'স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোঽস্য হরের্গৌণ ইতীযতে'—স্বপ্নবিষয়ে হরির প্রাপ্তি বিশেষকে গৌণ সম্ভোগ বলে। ইহারও সাধারণ ও বিশেষ, এইরূপ দুই শ্রেণী আছে এবং মুখ্য সম্ভোগের মতো সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান এই চারিভাগও পরিকল্পিত হইয়াছে। নিম্নে মুখ্য ও গৌণসম্ভোগের তালিকা দেওয়া যাইতেছে :
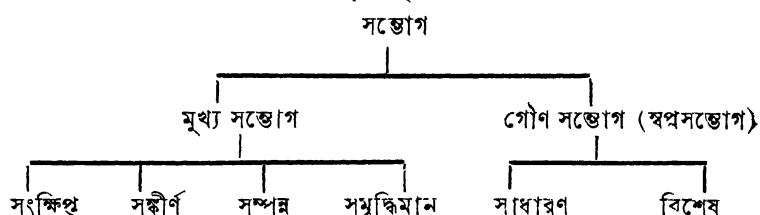
বৈষ্ণব পদাবলীতে স্বপ্নসম্ভোগ থাকিলেও ভাবসম্মেলন পর্যায়ের পদগুলি এই গৌণ সম্ভোগের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। কারণ ভাবসম্মেলনে রাধাকৃষ্ণের প্রকৃত মিলন হয় নাই, রাধা মনে মনে মিলনের কথা চিন্তা করিতেছেন—এই ভাবে ভাবসম্মেলনের পদগুলি রচিত হইয়াছে। সুতরাং ভাবসম্মেলনে প্রকৃত মিলন নাই বলিয়া ইহাকেও গৌণ সম্ভোগের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলীকার ও অলঙ্কারশাস্ত্রীরা এত সহজে সম্ভোগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহেন। তাই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগাদির আবার নানা উপশ্রেণী কল্পিত হইয়াছে। যথা:—

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ: বাল্যাবস্থায় মিলন, গোষ্ঠে গমন, গোদোহন, অকস্মাৎ চুম্বন, হস্তাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষণ, বর্ত্মরোধ, রতি।

সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ : মহারাস, জলক্রীড়া, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশী অপহরণ, নৌকাবিলাস, মধুপান, সূর্যপূজা।

সম্পন্ন সম্ভোগ : সুদূর দর্শন, ঝুলন, হোলি, প্রহেলিকা, পাশা খেলা, নর্তক রাস, রসালস, কপট নিদ্রা।

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ : স্বপ্নে মিলন, কুরুক্ষেত্র, ভাবোল্লাস, ব্রজে আগমন, বিপরীত মিলন, ভোজন-কৌতুক, একত্রে নিদ্রাবস্থা, স্বাধীন ভর্তৃকা।)

বৈষ্ণব কবিগণ 'উজ্জ্বলনীলমণি'র এই আদর্শে রাধাকৃষ্ণের লীলারস পর্যায় অনুসারে সাজাইয়াছেন। পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, রাসলীলা, মাথুরলীলা, ভাবসম্মেলন প্রভৃতি নানা লীলা ও পালার পর্যায় অনুসারে রাধাকৃষ্ণের লীলাকে একটি পূর্বাপর সঙ্গতিযুক্ত আকার দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে গুরুত্ববোধে অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতার সংজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে। বলাবাহুল্য, এই বর্ণনা, সংজ্ঞা ও আলোচনায় রূপ গোস্বামী-প্রদর্শিত পন্থা অনুসৃত হইতেছে।

অভিসার ॥

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগবেশাভিসারিকা ॥

অনু : যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায় অথবা স্বয়ং অভিসার করে তাহাকে অভিসারিকা বলা যায়। এই অভিসারিকা জ্যোৎস্না ও অন্ধকারে গমনযোগ্য বেশদ্বারা জ্যোৎস্নী ও তামসী ভেদে দুইপ্রকার।

বৈষ্ণবপদে অভিসারিকায় আটটি রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে : জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা ও সঞ্চরা। গোবিন্দদাস কবিরাজের অভিসারের পদ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সুপরিচিত। তন্মধ্যে আবার তাহার বর্ষাভিসারের পদগুলি ঐশ্বর্যে প্রায় তুলনাহীন। রায়শেখরের দুই একটি বর্ষাভিসারের পদ গোবিন্দদাসকেও ম্লান করিয়া দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে রায়শেখরের একটি উৎকৃষ্ট বর্ষাভিসারের পদ উদ্ধৃত হইতেছে :

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥

সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্তা নি- তান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥

বাসকসজ্জা ॥

'বাসকসজ্জা'র অর্থ—যে কান্তা কান্তের ইচ্ছা বশতঃ কুঞ্জভবনে অবস্থান করিয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করে এবং আত্মদেহ ও বাসগৃহ সজ্জিত করে।

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥

বাসকসজ্জিকা নায়িকা নায়কের সঙ্গে মিলনের সঙ্কল্প করে, কখনও-বা কান্তের পথ নিরীক্ষণ করে, সখীর সঙ্গে নায়কবিষয়ে আলাপ করে, কখনও দূতীকে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করে।

বিপ্রলব্ধা ॥

সঙ্কেত করিয়াও যদি কৃষ্ণ না আসেন, তখন রাধার অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হয়—বঞ্চিতা রাধাকে তখন বিপ্রলব্ধা নায়িকা বলে।

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানন্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ॥

জ্ঞানদাসের বিপ্রলব্ধা পর্যায়ের এই পদটিতে বঞ্চিতা রাধার চিত্রটি চমৎকার ফুটিয়াছে—

বিফলে সাজায়লুঁ কুঞ্জ।
কি ফল উপচারপুঞ্জ ॥
কি ফল অঙ্ক সমীপ।
উজোরলুঁ রতনপ্রদীপ ॥
গাঁথলুঁ মালতীমাল।
মরমে রহি গেল শাল ॥

খণ্ডিতা ॥

পরদিন প্রভাতে অন্যের ভোগচিহ্ন লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধার কুঞ্জের দুয়ারে উপনীত হইলে রাধাকে খণ্ডিতা নায়িকা বলা হয়—"ভোগ লক্ষণাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা।" নিম্নলিখিত পদে খণ্ডিতা রাধা ক্রুদ্ধ হইয়া বিপর্যস্ত বেশবাসের জন্য কৃষ্ণকে ধিক্কার দিতেছেন :

'আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুর দহনা।
চন্দনচান্দ মাঝ মৃগমদ লাগল
তাহে বেকত তিন নয়না ॥
মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণ্যফলে প্রাতরে ভেটলুঁ
দূরহি দূরে রহু সেবা ॥

কলহান্তরিতা ॥

কলহান্তরিতার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে :

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা ॥

অনু. (যে নায়িকা সখীদের সমক্ষে পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে।)

অপরাধী শ্রীকৃষ্ণ কৃতকর্মের জন্য অনুনয়-বিনয়, ক্ষমাপ্রার্থনা, এমন কি পদতলে পতিত হইলেও কোপনা রাধা তাঁহার প্রতি অনুকূল হইলেন না। নিরাশ কৃষ্ণ চলিয়া গেলে তখন রাধার অনুতাপ হইল। তিনি কখনও প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রাধার এই বিলাপটি গোবিন্দদাসের একটি পদে চমৎকার ফুটিয়াছে :

যাকর চরণ- নখরুচি হেরইতে
মুরছিত কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণি লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম ॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুলনন্দন চান্দ উপেখলুঁ
দারুণ মানকি লাগি।

কাতর দীঠে মীঠ বচনামৃতে
কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ- সীম নাহি আনলুঁ
অব হিয়ে তুষদহ দাহ ॥
সো হেন রসিক পিয়া কাঁহা রহু কাঁহা করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুরে।
গোবিন্দদাস কহ শুন বরনাগরি
সো পহুঁ তোহারি অদূরে ॥

ভাবসম্মেলন ॥

সর্বশেষে ভাবসম্মেলন বা ভাবোল্লাস উল্লেখ করিতে হয়। 'পদকল্পতরু'র চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবে ধৃত পদসমূহকে 'ভাবোল্লাসে'র পদ বলা হইয়াছে। 'উজ্জ্বলনীলমণি' তে এই পর্যায়ের কোন উল্লেখ নাই। ('উজ্জ্বলে' ও 'ভক্তি রসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীরাধার প্রতি সখীদের স্নেহাতিশয্যকে 'ভাবোল্লাস' বলা হইয়াছে।) কিন্তু বৈষ্ণবপদকারগণ মাথুরের বিরহে রাধাকৃষ্ণলীলা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা 'ভাবসম্মেলন' নামক এক অভিনব পর্যায়ের পরিকল্পনা করিয়াছেন। শ্রীরাধা বিরহবিকারের আবেশে কল্পনা করিতেছেন যেন, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং উভয়ের পুনর্মিলন হইয়াছে। অবশ্য ইহা বাস্তব মিলন নহে, শ্রীরাধার কল্প (ভাব)-জগতের মিলন-আকাঙ্ক্ষাই এই পর্যায়ের পদে ব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের একটি পদে শ্রীরাধার এই ভাবোল্লাস বর্ণিত হইয়াছে :

আজু পরভাতে কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সোধাইতে
উড়িয়া বৈঠল ঠায় ॥
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দিরে আওব
কপালি কহিয়া গেল ॥[৩৫]

রাধা চারিদিকে সুলক্ষণ দেখিতেছেন :

---

[৩৫] এই পদটি ঈষৎ রূপান্তরসহ চণ্ডীদাসের ভণিতায়ও পাওয়া যায়।

আজুক প্রাতর সময়ে।
বাম বাহু সঘনে কাঁপয়ে।।
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ।
পুলকে পুরয়ে সব অঙ্গ।।
বাম নয়ন করু পন্দ।
সঘনে খসয়ে নিবিবন্ধ।।
এ লখণ বিফলে না যাব।
মাধব নিজ গৃহে আব।।

ভাবসম্মেলনের পদগুলির আবেগের নিষ্ঠা ও রসের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ এই পদসমূহে বিরহ ও মিলনের রস একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। কৃষ্ণের মথুরাগমনের পর রাধা ও কৃষ্ণের আর মিলন হয় নাই বটে, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্ত-কবিগণ এই বিরহের হাহাকারে কেমন করিয়া সমাপ্তির রেখা টানিবেন? তাই তাঁহারা ভাবসম্মেলন বা ভাবোল্লাস নামক এক পৃথক পর্যায়ের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ভাবলোকে, মনোজগতে, কল্পনার আকাশে শ্রীরাধা কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া মনে করিতেছেন, যেন কৃষ্ণ সত্যই দীর্ঘ বিরহের ব্যবধানের পর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিতেছেন—চারিদিকে তাহারই শুভ সূচনা। কিন্তু কৃষ্ণ তো মথুরা হইতে ফিরেন নাই। ব্রজের রাখাল বৃন্দাবনের রাজ্যপাট ছাড়িয়া মথুরা-দ্বারকার রত্নসিংহাসনে বসিয়া, ষোল হাজার এক শত আট মহিষী,[৩৬] অসংখ্য সখী ও দাসীর দ্বারা সেবিত হইয়া আভীর বালাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পদকর্তা এ নির্মমতা সহ্য করিবেন কি করিয়া? তাই এই পর্যায়ের পদে রাধা-কৃষ্ণের কাল্পনিক মিলনের চিত্র আঁকিয়া তাঁহারা লীলারসের উপসংহার করিয়াছেন।

এখানে আমরা মোটামুটি বৈষ্ণব পদাবলীর লীলাপর্যায়ের সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ করিলাম। কিন্তু মূল লীলার পরিপুষ্টির জন্য পদকারগণ আরও অনেক গৌণলীলার পরিকল্পনা করিয়াছেন। যেমন, সখী বা দূতী সংবাদ, কৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য, বংশীশিক্ষা, কৃষ্ণের পূর্বগোষ্ঠ ও উত্তর গোষ্ঠ, দানখণ্ড, নৌকাবিলাস, বসন্তলীলা, হোলিকা, ঝুলনলীলা, রাসলীলা ইত্যাদি। এ সমস্ত লীলাপর্যায়ের

৩৬ তাস্তু শ্রীযদুবীরস্য সহস্রাণাস্তু ষোড়শ।
অষ্টোত্তর শতাগ্রাণি দ্বারবত্যাং সুবিশ্রুতাঃ।।
('উজ্জ্বলনীলমণি')

খানিকটা ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ধারা অনুসরণ করিয়াছে। বেশীরভাগ বৈচিত্র্য রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিছুটা পদকর্তা ও কীর্তনীয়াগণ নিজেরা পরিকল্পনা করিয়াছেন। এ কবিকল্পনার পশ্চাতে একটা শিথিল ধরণের কাহিনী-বিন্যাস লক্ষ্য করা যাইবে, যাহার ফলে রাধাকৃষ্ণলীলা বিচ্ছিন্ন পদসমষ্টি না হইয়া একটি ধারাবাহিকতার সূত্রে বিধৃত হইয়াছে। অবশ্য পদকর্তাগণ নিজেরা চেষ্টা করিয়া এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন নাই। এক-একটি পর্যায়ের আবেগে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন পদই রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে কীর্তনীয়া ও পদসঙ্কলকগণ একই ভাব, রস ও পর্যায়ের পদসমূহকে এক একটি পালায় বিভক্ত করিয়া পৃথকভাবে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন, অনেকটা তাঁহাদের চেষ্টার ফলেই পদকর্তাদের বিচ্ছিন্ন পদগুলি একটি ভাব ও রসের মধ্যে গৃহীত ও সজ্জিত হইয়াছে। ফলে চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদ শুধু লীরিক কবিতা না হইয়া কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে এবং সমগ্রতা লাভ করিয়াছে।

আধুনিক পাঠকের নিকট পূর্বরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর ও ভাবসম্মেলন পর্যায়ের পদগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। মান, দান নৌকাবিলাস, দূতী ও কৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য একদা ভক্ত-পাঠক সমাজে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিলেও ইদানীন্তন কালের পাঠক তাহার প্রতি কৌতূহল বোধ করিবেন না। দানখণ্ড একদা কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহার প্রমাণ— বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর পদ ও পদসঙ্কলনে এই পর্যায়ের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু যুগ, সংস্কৃতি ও মানসিক প্রবণতাভেদে সাহিত্য ও রসেরও রূপান্তর হয় : বৈষ্ণব-পদাবলীর নানা পর্যায় ইদানীং ভক্ত ব্যতীত সাধারণ রসিকপাঠকের নিকট অত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হইবে। কিন্তু এই পালাপর্যায়ের মধ্যে যেখানে নিখিল মানব-মানবীয় ভাব ও রসের 'সাধারণীকরণ' হইয়াছে, সেখানেই তাহা স্থান ও কালের সীমা পার হইয়া জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত রসিক মানুষকেই আকর্ষণ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে একটা কাহিনী-পর্যায় অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া এই ধর্মীয় ভজনগীতিকা রোমান্টিক রসে সিক্ত হইয়া মর্ত্যপিপাসা মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই স্থানে সুফীদের সঙ্গীত, মীরার ভজন, আলোয়ার সম্প্রদায়ের 'নালায়ির প্রবন্ধমে'র সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর পার্থক্য। পরবর্তী

কালে শাক্ত পদাবলী নানা দিক দিয়া বৈষ্ণব পদাবলী হইতে গুরুতর পার্থক্য অবলম্বন করিলেও, রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্ত পদকারগণ বৈষ্ণব লীলাপর্যায়ের কোন কোন শ্রেণী অনুসারে পদরচনা ও বিন্যাস করিয়াছেন—যেমন গোষ্ঠলীলা। কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার মতো শাক্তপদেও কালিকার গোষ্ঠলীলা পরিকল্পিত হইয়াছে।[৩৭]

৪ ॥ বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তন

বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর সার্থকতা কীর্তনগানে। কীর্তনগানের বাহিরে পদাবলী সাহিত্যের কোন স্থান নাই; অধুনা আমরা বৈষ্ণবপদালীর সাহিত্যিক মূল্য ও কাব্যরস ধরিয়া বিচার করি, মুগ্ধ হই, আবৃত্তি করি। কিন্তু মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলীর অর্থই ছিল কীর্তনগান। এই কীর্তনের তাৎপর্য—ভগবৎ-লীলাকীর্তন। তাই কেহ কেহ বলেন যে, এই কীর্তনপদাবলী একাধারে গীতিকবিতা, কীর্তনগান এবং ভজন। এখনকার কীর্তনে নৃত্য নাই, কিন্তু মধ্যযুগে কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। এখন বাউল গানে সেই নৃত্যের ধারাটি কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। মধ্যযুগে কেন, প্রাচীন যুগেও ভগবানের নামগান, গুণব্যাখ্যান ও স্মরণমননকে কীর্তন বলিত। ভাগবতে বিষ্ণুভক্তিব নয়টি লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চনা, বন্দন, দাস্য, সখ্য।

> শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
> অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
> ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণোঃ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
> ক্রিয়তেভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

প্রাচীন যুগ হইতেই ভগবানের নাম বা গুণকীর্তন করিয়া তাঁহাকে ভক্তি নিবেদনের রীতি চলিয়া আসিতেছে। মহারাষ্ট্রে এখনও সাধু তুকারামের 'অভঙ্গ'গুলি কীর্তন নামেই চলে। রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে বলিয়াছেন, "নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।" উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নামলীলা ও গুণসমূহের অনুশীলনের নাম কীর্তন। চৈতন্যদেবের পূর্বেই ভগবদ্‌ভক্তি বিষয়ক এই ধরণের কীর্তনের রীতি প্রচলিত ছিল। একদা

[৩৭] এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে শাক্তপদাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা থাকিবে।

'গীতগোবিন্দ' তো কীর্তনের ঢঙে গীত হইত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও ঝুমুর (কীর্তনের একটি শাখা) ঢঙে গান করা হইত। চৈতন্যদেবের পূর্বে আবির্ভূত মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় অনুবাদ-কাব্য ও আখ্যানধর্মী হইলেও ইহাতে কীর্তনের উপযুক্ত অনেক পদ ছিল।

বাঙলাদেশে কীর্তনগান তিনভাগে বিভক্ত। (১) নামকীর্তন বা সঙ্কীর্তন, (২) পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন (রসকীর্তন), (৩) সূচককীর্তন। বৈষ্ণব-পদ মূলতঃ গান। কীর্তনগানেই ইহার একমাত্র সার্থকতা, তাই এই প্রসঙ্গে কীর্তন সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

নামকীর্তন বা সঙ্কীর্তন ॥

দলবদ্ধভাবে সকলে মিলিয়া ভগবানের নামগান ও গুণকীর্তন নামকীর্তন বা সঙ্কীর্তন নামে পরিচিত। বৈষ্ণব মতে নামকীর্তন বা সঙ্কীর্তনকে ঈশ্বর-ভক্তির প্রধান সোপান বলা হইয়াছে—"কলিযুগ ধর্ম নাম-সঙ্কীর্তন সার।" সকলে মিলিয়া হরিনাম গান করাই সঙ্কীর্তন। নামগান হইতেই প্রেমের উৎপত্তি, নাম হইতেই ভক্তি-রতি। তাই "নামীর চেয়ে নাম যে বড় তাহার বড় নাই রে।" কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে "নামের ফলে কৃষ্ণপদে মন উপজয়।" বস্তুতঃ নামকীর্তন বা সঙ্কীর্তন সামাজিক উৎসব বিশেষ। সকলে মিলিয়া ভক্তিভরে শ্রীভগবানের নামগান করিতে করিতে ভক্তির বশীভূত হইয়া পড়ে। তখন জাতিধর্মের ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়। সঙ্কীর্তনে জাতিপাঁতির কোন ভেদ-বৈষম্য নাই,—যে-কেহ এই নামকীর্তনে যোগ দিতে পারে। অবশ্য সঙ্কীর্তনে গান, কথা বা সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য ততটা নাই; সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নামোচ্চারণ, জয়ধ্বনি, গুণবর্ণনা—ইহাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে সঙ্গীতরস বা সাহিত্যগুণ গৌণ হইবেই। সঙ্কীর্তনের সময়ে ভাবরসে মাতোয়ারা হইয়া কেহ কেহ উন্মত্তবৎ নৃত্যে ব্যাকুল হয়, কেহ-বা দশা পায়, কেহ অকারণে অশ্রু বিসর্জন করে। ধর্মাচার যেখানে ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, ভক্তি যেখানে গোষ্ঠীগত, সেখানে এইরূপ সঙ্কীর্তনের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। বাঙলার বাহিরে এখন যে সমস্ত অঞ্চলে ভজন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও কিয়দংশে সঙ্কীর্তনের মতো। তবে তাহাতে সুর ও কথার প্রাধান্য আর একটু বেশি।

বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, বাঙলাদেশে সঙ্কীর্তন বা নামকীর্তন মহাপ্রভুরই সৃষ্টি, নিত্যানন্দও এই কীর্তনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে চৈতন্য-নিত্যানন্দ বন্দনায় বলিয়াছেন :

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদতৌ
সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।

এই 'সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ' চৈতন্য-নিত্যানন্দ বৃন্দাবনদাসের মতে সঙ্কীর্তনের জনক। অবশ্য চৈতন্যদেবের পূর্বেও ভগবানের নামগান-সংক্রান্ত নামকীর্তন প্রচলিত ছিল। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে নিমাইয়ের জন্ম হইলে চারিদিকে "উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরিকীর্তন।" সেদিন চন্দ্রগ্রহণ এবং দোলপূর্ণিমা। নবদ্বীপবাসীরা—

গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দিকে হরিসঙ্কীর্তন ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে চৈতন্য-নিত্যানন্দের আবির্ভাবের পূর্বেই হরিসঙ্কীর্তন প্রচলিত ছিল। যদিও বৃন্দাবন বলিয়াছেন :

কলিযুগে সর্বধর্ম হরিসঙ্কীর্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্যনারায়ণ ॥

তবু তাঁহার চৈতন্যভাগবতেই (আদি, ২য়) দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই অদ্বৈত, শ্রীবাসেরা কয়ভাই, চন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ, —ইঁহারা সকলেই রাত্রিকালে মিলিত হইয়া শ্রীবাসের আঙিনায় "আপনা-আপনি সবে করেন কীর্তন।" এই কয়জন সঙ্কীর্তন করিতে করিতে ভাবিতেন :

কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা কীর্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সঙ্কীর্তন ॥

এই ভক্তগণ মনের দুঃখে শ্রীবাসের আঙিনায় আসিয়া মিলিত হইতেন এবং "নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চস্বরে।" রাত্রিকালে এই নামগান শুনিতে পাইয়া 'পাষণ্ডীগণ' বিষম ক্রুদ্ধ হইত। সুতরাং চৈতন্যভাগবত অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যের জন্মের পূর্বেই বৈষ্ণবপন্থী ভক্তসমাজে নামসঙ্কীর্তন

প্রচলিত ছিল। তবে চৈতন্যদেবের দ্বারা নামকীর্তন জনপ্রিয়তা লাভ করে, গণধর্মের আবেগের আকারে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

চৈতন্যদেব সর্বপ্রথম হরিকীর্তনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন গয়াধাম হইতে ফিরিবার পর। কিন্তু যখন তিনি ব্যাকরণ অলঙ্কার অধ্যাপনা করিতেন তখনও শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হরিসঙ্কীর্তনে মগ্ন ছিলেন, হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করিতেন। ইতিমধ্যে নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে নূতন মানুষ হইয়া ফিরিলেন, অধ্যাপনা বন্ধ হইল, তিনি কৃষ্ণভক্তি ও নামকীর্তনে মগ্ন হইলেন। শিষ্য ও পড়ুয়াদিগকে নিমাই পণ্ডিত হাততালি দিয়া নামকীর্তন শিখাইতে লাগিলেন :

হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

তিনি কীর্তন গাহিবার রীতি দেখাইয়া দিলে সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্তন করিতে লাগিল। সেই নামকীর্তন শুনিয়া সকলেই কৌতূহলী হইয়া কি ব্যাপার দেখিতে আসিল। এতদিন শ্রীবাসের আঙিনায় গোপনে মিলিত হইয়া ভক্তগণ নামকীর্তন করিতেন। এবার চৈতন্যদেব প্রকাশ্যে সংকীর্তনের রীতি প্রচলিত করিলেন—"এবে সঙ্কীর্তন হইল নদীয়া নগরে।" চৈতন্যদেব কীর্তনের সৃষ্টি না করিলেও ইহাকে সুবিভক্ত ও সুবিন্যস্ত করিয়াছিলেন, সঙ্কীর্তনের সময় তিনি আবেগের বশে নিজেও নৃত্য করিতেন। পরে নৃত্য সঙ্কীর্তনের প্রধান অঙ্গে পরিণত হইয়াছিল। চৈতন্য শ্রীবাস অঙ্গনে তিন জনের নেতৃত্বে তিনদলে কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—শ্রীবাস, মুকুন্দ এবং গোবিন্দ দত্ত তিন দলের অগ্রবর্তী ছিলেন। কাজি দলনের দিনেও অদ্বৈত হরিদাস এবং শ্রীবাসকে লইয়া তিনটি কীর্তনের দল গঠিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত অভিযানটি অনেকটা আধুনিক কালের আইন-অমান্য-আন্দোলনের মতো, কাজির আদেশ উপেক্ষা করিয়াই চৈতন্য সদলবলে সঙ্কীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন। অবশ্য এ আন্দোলন নিতান্ত অহিংস ছিল না। পুরীধামেও তিনি জগন্নাথমন্দিরে উন্মত্তবৎ নৃত্য ও সঙ্কীর্তন করিতেন, তাঁহার চারিদিকে চারিটি কীর্তনসম্প্রদায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কীর্তন গাহিত। এই চারিসম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন যথাক্রমে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর ও শ্রীবাস। মাঝখানে থাকিতেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। জগন্নাথের রথযাত্রার সময় মহাপ্রভুর নির্দেশে সাতটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া তাঁহার অনুচর কীর্তনীয়াগণ গান করিতেন।

সুতরাং চৈতন্যদেবের প্রভাব ও নেতৃত্বে গৌড়ে ও উৎকলে সঙ্কীর্তন ও নাম-কীর্তন যে অতিশয় জমিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরকে চৈতন্য নাম-সঙ্কীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসঙ্কীর্তন কলির পরম উপায়॥
সঙ্কীর্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সঙ্কীর্তন হইতে সর্বানর্থ নাশ।
সর্বশুভোদয় কৃষ্ণের পরম উল্লাস॥
সঙ্কীর্তন হইতে পাপ সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্‌গম।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥ (চৈ. চ. অন্ত্য।২০শ)

এই সঙ্কীর্তন পরবর্তী কালে আধুনিক যুগে শুধু বৈষ্ণবসম্প্রদায় নহে, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণ এই সঙ্কীর্তনের রীতিটি গ্রহণ করিয়াছিলেন; এখনও নানা ধর্মসম্প্রদায় এই সঙ্কীর্তনের ধারা বজায় রাখিয়াছেন। অবশ্য অধুনা কালবশে রাজনীতি ও অন্যান্য সমাজঘটিত আন্দোলনও সংকীর্তনের নিয়মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহা আধুনিক নাগরিক পরিস্থিতিতে নগর-সঙ্কীর্তন নামে পরিচিত হইয়াছে। জনতাকে একভাব ও রসে উদ্দীপিত করিতে হইলে—তা সে ধর্মই হোক, বা রাজনৈতিক আন্দোলনই হোক—দলবদ্ধভাবে গণসঙ্কীর্তনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বৈষ্ণব আচার্যগণ ইহার ব্যবস্থা করিয়া বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়াছিলেন।

লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন॥

বৈষ্ণবসাহিত্যের বিশেষ গায়নপদ্ধতির নাম লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বা কাহিনী পালার আকারে গীত হয় বলিয়া ইহাকে পালাকীর্তনও বলে। ভাগবতে গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিয়াছিলেন, কৃষ্ণলীলা স্বয়ং অভিনয় করিয়াছিলেন (ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়)।

চৈতন্যদেব অন্যান্য ভক্তপরিকরদের সঙ্গে লীলাকীর্তন করিতেন, আর বহিরঙ্গ ভক্তদের লইয়া 'উদ্দণ্ড সঙ্কীর্তন' বা লীলাকীর্তনে মত্ত হইতেন :

অন্তরঙ্গ সনে লীলারস-আস্বাদন।
বহিরঙ্গ লৈয়া হরিনাম-সঙ্কীর্তন ॥ (প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা)

এই উল্লেখ হইতে মনে হইতেছে সঙ্কীর্তনের মতো চৈতন্যদেবই লীলাকীর্তনের উদ্ভাবক। অবশ্য তাঁহার পূর্বেই নামকীর্তনের রীতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু লীলাকীর্তনের ধারা তাঁহার দ্বারাই প্রবাহিত হইয়াছে। পরে খেতুরীর উৎসবে নরোত্তমের চেষ্টায কীর্তনের পালাবন্দ রীতিটি রীতিমতো মার্গগায়ন-রীতির ক্লাসিক আকার লাভ করে। তাই কেহ কেহ মনে করেন যে, লীলাকীর্তনের যে রূপটি অদ্যাপি নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ বজায় আছে, তাহা খেতুরী উৎসবে নরোত্তম অবলম্বিত পদ্ধতি।[৩৮] চৈতন্যের তিরোধানের অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে লীলাকীর্তন নিশ্চয় প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু নরোত্তম ঠাকুরই লীলাকীর্তনকে যথার্থ গীতবন্ধ রূপদান করিয়াছিলেন। নরোত্তম উত্তর-বঙ্গের খেতুরীর জমিদার কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তিরোধানের পর বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্বভার পড়িয়াছিল নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের (বীরভদ্র) উপর। তাঁহার নির্দেশে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ বাঙলা ও বাঙলার সীমান্ত অঞ্চলে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস পশ্চিমবঙ্গে (বিষ্ণুপুর), নরোত্তম উত্তরবঙ্গে (রাজসাহী জেলার অন্তর্গত খেতুরী-গোপালপুর) এবং শ্যামানন্দ উড়িষ্যায় বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। ইঁহাদের মধ্যে নরোত্তম সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনজনেই বৃন্দাবনে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। নরোত্তম ষোড়শ শতাব্দীর ৮ম-৯ম দশকে খেতুরী গ্রামে কয়েকটি মূর্তিপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে বৈষ্ণবদের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করেন, এই উৎসবের নেত্রী হইয়াছিলেন নিত্যানন্দ-পত্নী বীরচন্দ্রের বিমাতা জাহ্নবীদেবী। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষ্ণব সাধক, মহাজন ও কীর্তনীয়া-মৃদঙ্গবাদক—প্রায় সকলেই এখানে সমবেত হইয়াছিলেন। এই

---

[৩৮] কাহারও কাহারও মতে ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দের দিকে এই উৎসব হইয়াছিল। ডঃ সুকুমার সেনের মতে আরও বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে এই উৎসব হইয়া থাকিবে। অপর্ণা দেবী ও সুধীর সরকার ('কীর্তনপদাবলী') মনে করেন যে, ১৫৮৩-৮৪ খ্রীঃ অব্দে খেতুরী উৎসব হইয়াছিল। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আমরা বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

উৎসবে নরোত্তম নিজে পালাবদ্ধ কীর্তনপদাবলী ও তৎপূর্বে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী (গৌরচন্দ্রিকা) গাহিয়াছিলেন।

নরোত্তম-নির্দিষ্ট পদাবলী-কীর্তন (লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন) লোকসঙ্গীত নহে—ইহা রীতিমতো মার্গপদ্ধতি অনুযায়ী গীত হইত। সঙ্গীতশাস্ত্রে 'প্রবন্ধ' বা বিশুদ্ধ সঙ্গীত দুইভাগে বিভক্ত—'নিবদ্ধ' ও 'অনিবদ্ধ'। অনিবদ্ধ সঙ্গীতের অর্থ—শুধু স্বর সাধনা বা বর্ণন্যাস স্বরালাপ[৩৯]—যাহাতে কোন কথা থাকে না। 'নিবদ্ধ' সঙ্গীতে শব্দ যোজনা করা হয়। সে যুগে কীর্তনের পূর্বে প্রথমে অনিবদ্ধ সঙ্গীত অর্থাৎ স-ঋ-গ-ম ('সারগম') প্রভৃতির দ্বারা শুধু আলাপচারি করা হইত; তারপর তানে কথা যুক্ত হইত। নরোত্তম প্রথমে অনিবদ্ধ সঙ্গীত অর্থাৎ স্বর সঞ্চালন করিয়া তারপর নিবদ্ধ অর্থাৎ কথাযুক্ত কীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখনও পুরাতনপন্থী কীর্তনীয়ারা মূল পালা গাহিবার পূর্বে সকলে একসঙ্গে স্বরসাধনা করিয়া লন, উহার নাম 'মেল' বা 'মেলজমাট'। তান ধরিয়া সুরটিকে গাঢ়বদ্ধ (জমাট) করার পর কথাসহ পদ গীত হইতে আরম্ভ হয়। নরোত্তমের পূবে রাধাকৃষ্ণলীলাকথা পালার আকারে গাহিবার প্রথা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু নরোত্তম শাস্ত্রীয় মার্গরীতিকে কীর্তনে প্রয়োগ করিয়া উহার একটা বিশেষ গায়নপদ্ধতির রীতি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। পদাবলী কীর্তনে রাধাকৃষ্ণলীলাকে বিচিত্র পর্যায়ে সাজাইয়া গান করা হয় এবং প্রত্যেক পর্যায় বা পালার পূর্বে অনুরূপ গৌরাঙ্গ লীলাগান ('গৌরচন্দ্রিকা' বা 'তদুচিত গৌরচন্দ্র') করিয়া শ্রোতাকে পূর্বেই বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, অতঃপর আসরে কোন্ পালা গীত হইবে। পালগানের পূর্বে গৌরাঙ্গলীলা গাহিবার রীতিটিও বোধহয় নরোত্তম পরিকল্পিত।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলাই পালার আসরে গীত হয়। কীর্তনীয়াগণ নানা কবির একই ভাবের পদ একসঙ্গে গাঁথিয়া এক-একটি পালার পর্যায়ে সাজাইয়া থাকেন। এই লীলাকে এইভাবে বিভক্ত করা যায়—জন্ম-লীলা, নন্দোৎসব, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, রাধাকুণ্ডে মিলন, সূর্যপূজা, জলক্রীড়া, পাশাক্রীড়া, দানলীলা, সুবলমিলন, উত্তরগোষ্ঠ, নৃত্যরাস, মহারাস, বসন্তলীলা, বাসন্তী রাস, রাসলীলা, হোলিলীলা, হোলির নৃত্যরাস, ঝুলন, কুঞ্জভঙ্গ বা নিশান্তলীলা, পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, কলহান্তরিতা,

---

[৩৯] 'ভক্তিরত্নাকর' দ্রষ্টব্য।

বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, মান, বিরহ (মাথুর), বংশীশিক্ষা, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি। এখানে লক্ষ্য করা যাইবে রাধাকৃষ্ণের জন্ম হইতে কৃষ্ণের মথুরাগমন পর্যন্ত কাহিনী ক্রমে ক্রমে পালা অনুসারে সাজান হইয়াছে।

কাহিনীর দিক দিয়া যেমন উল্লিখিতভাবে পালা সজ্জিত হয়, তেমনি বিভিন্ন পর্যায়ের আখ্যান ও রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন মনোভাব ও রসনিষ্পত্তি ধরিয়া কীর্তনে চৌষট্টি প্রকার রসলীলা পরিবেষিত হয়। রাধিকার বিভিন্ন মনোভাব ও আচরণকে কেন্দ্র করিয়া আটটি পযায় এবং প্রত্যেক পর্যায়ে আটটি করিয়া উপপর্যায়—মোট চৌষট্টি রসপর্যায় পরিকল্পিত হইয়াছে। যথা :

অভিসারিকা ॥ (১) জ্যোৎস্নাভিসারিকা, (২) তামসাভিসারিকা, (৩) বর্ষাভিসারিকা, (৪) দিবাভিসারিকা, (৫) কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, (৬) তীর্থযাত্রাভিসারিকা, (৭) উন্মত্তাভিসারিকা (বংশী শ্রবণের ফলে), (৮) অসমঞ্জসাভিসাভিসারিকা (যাহার বেশভূষা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে)।

বাসকসজ্জা ॥ (১) মোহিনী (সুবেশধারিণী), (২) জাগ্রত্তিকা (প্রতীক্ষায় জাগ্রতা), (৩) রোদিতা (রোদনপরায়ণা), (৪) মধ্যোক্তিকা (কৃষ্ণ আসিয়া মধুর বাক্য বলিবেন এইরূপ চিন্তা ও আলাপযুক্তা), (৫) সুপ্তিকা (কপটনিদ্রায় নিদ্রিতা), (৬) চকিতা (নিজের অঙ্গচ্ছায়ার কৃষ্ণভ্রমে ত্রস্তা), (৭) সুরসা (সঙ্গীতপরায়ণা), (৮) উদ্দেশা (দূতী প্রেরণকারিণী)।

উৎকণ্ঠিতা ॥ (১) দুর্মতি (কেন খলের বাক্যে বিশ্বাস করিলাম—এই চিন্তায় ব্যথিতা), (২) বিকলা (পরিতাপযুক্তা), (৩) স্তব্ধা (চিন্তিতা), (৪) উচ্চকিতা (তরুলতার পত্রপতনে সন্ত্রস্তা), (৫) অচেতনা (দুঃখাভিভূতা), (৬) সুখোৎকণ্ঠিতা (কৃষ্ণ ধ্যানমুগ্ধা ও গুণকথনযুক্তা), (৭) মুখরা (দূতী সঙ্গে কলহপরায়ণা), (৮) নির্বন্ধা (খেদযুক্তা)।

বিপ্রলব্ধা ॥ (১) বিফলা (কান্ত না আসায় সমস্ত বিফল হইল, এইরূপ খেদযুক্তা), (২) প্রেমমত্তা (অন্য নায়িকার সঙ্গে কান্তের মিলন আশঙ্কাযুক্তা), (৩) ক্লেশা (সব বিষময় বোধ হইতেছে—এইরূপ ক্লেশযুক্তা), (৪) বিনীতা (বিলাপযুক্তা), (৫) নির্দয়া (কান্ত নির্দয় এইরূপ ভাবিয়া খেদযুক্তা) (৬) প্রখরা (বেশভূষা বাসকসজ্জাদি অগ্নি বা যমুনায় নিক্ষেপ করিতে উদ্যতা), (৭) দূত্যাদরা (দূতীকে আদরকারিণী), (৮) ভীতা (প্রভাত দেখিয়া ভয়যুক্তা)।

খণ্ডিতা ॥ (১) নিন্দা (কান্তকে নিন্দাকারিণী), (২) ক্রোধা (অনুনয়-পরায়ণ কান্তকে তিরস্কারকারিণী) (৩) ভয়ানকা (কান্তকে সিন্দূর-কাজলে ভূষিতা দেখিয়া ভীতা), (৪) প্রগল্‌ভা (কান্তের সঙ্গে কলহরতা), (৫) মধ্যা (অন্যা নায়িকার সম্ভোগচিহ্নে লজ্জান্বিতা), (৬) মুগ্ধা (রোষবাষ্পমৌনা), (৭) কম্পিতা (কম্পিতাহৃদয়ে রোদনকারিণী). (৮) সন্তপ্তা (ভোগচিহ্ন যুক্ত নায়কদর্শনে তাপযুক্তা)।

কলহান্তরিতা ॥ (১) আগ্রহা (আগ্রহযুক্ত কেন ত্যাগ করিলাম), (২) ক্ষুব্ধা (পাদপতিত কান্তকে কেন দুর্বাক্য বলিলাম), (৩) ধীরা, (পাদপতিত কান্তকে কেন দেখি নাই), (৪) অধীরা (সখীর দ্বারা তিরস্কৃতা), (৫) কুপিতা (কান্তের মিথ্যা কথায় কোপযুক্তা), (৬) সমা (কান্তের একার দোষ নাই—আমার, দূতীর—সকলের দোষ আছে), (৭) সখ্যুক্তিকা (যাঁহার সখী কান্তের নিকট গিয়া তাঁহার কথা নিবেদন করে), (৮) ভাবোল্লাসা (ভাবসম্মেলনে উল্লসিতা)।

স্বাধীনভর্তৃকা ॥ (১) কোপনা (বিলাসে বাহ্যরোষযুক্তা), (২) মানিনী (নায়কের অঙ্গে নিজকৃত চিহ্ন দর্শন), (৩) মুগ্ধা (নায়ক যাহার বেশবিন্যাস করেন), (৪) মধ্যা (নায়ক যাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ), (৫) সমুক্তিকা (সমীচীন উক্তিযুক্তা), (৬) সোল্লাসা (কান্তের ব্যবহারে উল্লসিতা), (৭) অনুকূলা (যাঁহার নায়ক অনুকূল), (৮) অভিষিক্তা (অভিষেকপূর্বক নায়ক যাঁহাকে চামরব্যজনাদি করেন)।

বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রের নায়িকাপ্রকরণ ধরিয়া রাধাকে কেন্দ্র করিয়া নানা-ভাবের ও লীলার এই যে পালা-পরিকল্পনা—ইহার অনেকটাই আধুনিক পাঠকের নিকট অনাবশ্যক ও জটিল বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ভক্তির দৃষ্টিতে এবং সাধনমার্গের নানা আচার-আচরণের দিক হইতে ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কীর্তনীয়া ও পদসঙ্কলকগণ বিভিন্ন পদকার রচিত অসংখ্য পদকে এইভাবে সাজাইয়া লইয়া পালাবন্দী রাধাকৃষ্ণলীলা গান সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ পদই যে পাওয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ—কীর্তনীয়াদের সংগ্রহ এবং সঙ্কলকদের গ্রন্থে এই সমস্ত পদ গৃহীত, সজ্জিত ও রক্ষিত হইয়াছে। অবশ্য

কীর্তনীয়া ও নকলকারীদের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের ফলে অনেক পদের পাঠ বদলাইয়া গিয়াছে ; ভণিতার গোলমালের জন্য কবিদের স্বরূপ-নির্ণয় রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। তবু পদগুলি পালার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া কালবশে সবকিছু হারাইয়া যায় নাই।

সূচক কীর্তন ॥

কীর্তনের আর একটি শ্রেণী আছে। ইহাকে সাধারণতঃ সূচক কীর্তন এবং এইরূপ পদকে সূচক পদ বলা হয়। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহান্ত, ভক্ত ও সাধকদের তিরোভাব উৎসবে তাঁহাদের লীলাকথা ও জীবনকাহিনী-বিষয়ক ও স্মৃতিবন্দনা ধরণের পদাবলী-কীর্তনকে সূচক কীর্তন বলে। সনাতন, রূপ, জীব, নরোত্তম ঠাকুরের স্মৃতির উদ্দেশে এইরূপ সূচক পদ গাহিবার রীতি আছে। এগুলি শুধু বৈষ্ণব মহাপুরুষদের তিরোধান উৎসবেই গীত হয়। বলাই বাহুল্য করুণ রসের উৎসারই ইহার প্রধান লক্ষ্য ও অবলম্বন।

কীর্তনের উপাঙ্গ ॥

লীলাকীর্তনের ছয়টি উপাঙ্গ কীর্তনীয়া সমাজে সুপরিচিত—(১) কথা, (২) দোঁহা, (৩) আখর, (৪) তুক, (৫) ছুট, (৬) ঝুমুর।

কীর্তনে একপদ হইতে অন্যপদে যাইতে হইলে মাঝে মাঝে কীর্তনীয়াগণ দুই পদের সংযোগ রক্ষা করিতে গিয়া কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন কোন সময় তাঁহারা নায়ক, নায়িকা বা দূতীর উক্তিকেও নিজেরা বলিয়া দেন, বা বর্ণনা করেন। কীর্তনে ইহাই 'কথা' নামে ব্যবহৃত। কখনও-বা কোন একটি দুরূহ পদকে তাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া দেন। ইহাকেও 'কথা' বলে।

কোন কোন গায়ক পদাবলী গাহিতে গাহিতে হিন্দী দোঁহা, চৌপাই বা সংস্কৃত শ্লোক বা কোন বাংলা বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে দুইচারি পংক্তি আবৃত্তি করেন। ইহাই দোঁহা। দোঁহার কাজ কীর্তনের মূল সুর অনুসরণ করা এবং সুরকে রসমূর্তি দিতে সাহায্য করা।

'আখর' দেওয়া কীর্তনগানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—অনেকটা মার্গ সঙ্গীতের তানবিস্তারের মতো। ব্রজবুলিতে রচিত পদ বা জয়দেব প্রভৃতি কবিদের সংস্কৃত গান বা অন্য কোন সূক্ষ্ম রসের পদাবলী গাহিতে গাহিতে ভাবা-

বেগের বশে গায়ক গদ্যে অথবা পদ্যে মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। লীলাপর্যায়ের বিভিন্ন পদ বিভিন্ন গায়কের অন্তরে এক-একটি বিচিত্র রসসৃষ্টি করে, তখন তিনি তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া মালার মতো আবেগবহুল কথা, কখনও সুরে তালে, কখনও-বা সহজ সুরে বলিয়া যান। বস্তুতঃ আখরের দ্বারা রসকীর্তন মূর্তি পরিগ্রহ করে, আখরেই কীর্তনীয়ারা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিপ্রবণতা ফুটাইয়া তোলেন। খেয়ালের তানবিস্তার ও কীর্তনের আখর প্রায় একই মনোভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অবশ্য খেয়ালগানের তানবিস্তারের মূল লক্ষ্য সুরের বৈচিত্র্য, যাহা গায়কের ব্যক্তিগত প্রবণতার দ্বারা বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কীর্তনের আখরের মূল লক্ষ্য ভাব ও রসের অভিনবত্ব, গায়ক কীর্তনগান করিতে করিতে যখন তন্ময় হইয়া যান, তখন তিনি পদের গভীর তত্ত্ব-রসের স্থানে ব্যাখ্যা জুড়িয়া দেন; অবশ্য তাহার জন্য তাঁহাকে বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হয় না, আবেগের বশে তাঁহার মুখ হইতে তদ্‌ভাবানুকূল ভাষা বাহির হইয়া যায়। কীর্তনগান এই আখরের জন্য এত বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। এক-একটি কীর্তন-গায়কের পরিবারে এক-একপ্রকার আখর দিবার রীতি আছে, এবং ব্যক্তিভেদে এই আখরেরও নানা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কীর্তন ধরণের গানে আখর ব্যবহার করিয়াছেন।

কীর্তনের আর একটি বিচিত্র উপাঙ্গ আছে; ইহার নাম তুক বা তুক্ক। ইহাকে আমরা 'পদ্যে আখর' বলিতে পারি। কীর্তন গাহিতে গাহিতে পদের মধ্যে কীর্তনীয়াগণ অনুপ্রাস ও ছন্দোময় দুই চারিছত্র পদ (কখনও স্বরচিত) গাহিয়া থাকেন। ইহা অন্য কোন পদের অংশ নহে, একটি বিশেষ পদ গাহিতে গাহিতে ভাবাবেশে আখরে ছন্দ এবং অন্ত্যানুপ্রাস যোগ করিয়া দুই-চারি ছত্র গাওয়া হয়, ইহাই তুক। অনেক অজ্ঞাতনামা কীর্তনীয়ার তুক এখনও গায়কগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

'ছুট'—কীর্তনগানের একপ্রকার হালকা চালের উপাঙ্গ। গায়কগণ অনেক সময় গোটা পদটি না গাহিয়া ছোট তালে ('তাল-ফেরতা') পদের অংশবিশেষ গাহিয়া থাকেন, ইহার নাম 'ছুট'। বড় তালের মধ্যে ছোট তালের গানে বৈচিত্র্য সৃষ্টিই এই 'তাল-ফেরতা' ছুটের লক্ষ্য।

'ঝুমুর বা ঝুমুরী' একপ্রকার হালকা চালের সুর। কিন্তু কীর্তনে ঝুমুরের অর্থ অন্যপ্রকার। সাধারণতঃ কীর্তনের আসরে নানা পালা গাহিয়া মিলন

গানে আসর সমাপ্ত হয়। কিন্তু যেখানে দুই-তিনদলে মিলিয়া গান করে, সেখানে প্রত্যেক দলই মিলন গাহিয়া পালা শেষ করিবার মতো সময় পায় না। তখন উপসংহার করিবার জন্য গায়কগণ দুইচারি পয়ার পংক্তি, ত্রিপদী ইত্যাদি গাহিয়া থাকেন। অর্থাৎ সময়াভাব বা অন্য কোন কারণে পালা-সমাপ্তির (মিলন) সুযোগ না থাকিলে তাঁহারা সংক্ষেপে ঝুমুর দিয়া শেষ করেন, কিন্তু শেষের গায়ককে মিলন গাহিয়া পালা শেষ করিতে হয়।

এখানে কীর্তনের যে সমস্ত আঙ্গিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, ইদানীং সেরূপ সূক্ষ্মভাবে গায়নরীতি অনুসৃত হয় না। কীর্তনাঙ্গ বা ভাঙা কীর্তন গাহিয়া শ্রোতার মনোরঞ্জন করার দিকেই অনেক কীর্তনীয়ার লক্ষ্য। সকলেই সহজ রসের রসিক। জটিল গায়নপদ্ধতি, রাগরাগিণী, সুরতাল সম্বন্ধে সাধারণ শ্রোতার যেমন কোনরূপ কৌতূহল নাই, তেমনি কীর্তনীয়াগণও আর ততটা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে কীর্তনের সঙ্গোপাঙ্গ অনুশীলন করেন না। এইভাবে মার্গরীতির সার্থক শাখা কীর্তনের সাধনসাপেক্ষ দিকটি আজকাল উপেক্ষিত হইতেছে। উপরন্তু কীর্তনপদাবলী একটা বিশেষ ধরণের ধর্মসঙ্গীত; তাহাও আধুনিক কালের শ্রোতারা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই কীর্তন বর্তমানযুগে শুধু একটা গায়ন-পদ্ধতি রূপেই সাধারণ সমাজে প্রচলিত আছে।

কীর্তনের নানা 'ঘরানা' ॥

স্থানভেদে কীর্তনপদাবলী গাহিবার রীতি-নীতির পাঁচটি ভেদ কল্পিত হইয়াছে। যথা—(১) গড়েরহাটী (গরাণহাটী), (২) মনোহরশাহী, (৩) রেণেটী, (৪) মান্দারণী, (৫) ঝাড়খণ্ডী। পাঁচটি অঞ্চলের নামানুসারেই এই পাঁচপ্রকার কীর্তনের স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক-একটি অঞ্চলে কোন একজন বিশেষ কীর্তনগায়ক একটা বিশেষ ধরণের গাহিবার রীতির প্রবর্তন করিলে সেই অঞ্চলে অনেকেই তাহা অনুসরণ করে, এবং সেই অঞ্চলের নামে একটা পৃথক গায়ন-পদ্ধতি গড়িয়া ওঠে। বলা বাহুল্য সঙ্গীতের প্রধান কেন্দ্র রাঢ়ভূমি এই সমস্ত কীর্তন রীতিকে মার্গরীতির সাহায্যে একপ্রকার উচ্চতর সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছে। অবশ্য কালক্রমে কীর্তনের অঞ্চলভেদে বিশুদ্ধ রীতি-বৈশিষ্ট্য লোপ পাইতে বসিয়াছে।

কীর্তনের পাঁচপ্রকার রীতির মধ্যে 'গড়েরহাটী' বা 'গরাণহাটী' পদ্ধতি বোধহয় নরোত্তম কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। গড়েরহাট পরগণার (রাজশাহী) অন্তর্গত খেতুরী গ্রাম। নরোত্তম এই খেতুরীতে বাস করিতেন, এখানে তিনি কীর্তন উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে তিনি এবং তাঁহার অনুচরগণ ধ্রুপদ গায়নরীতির সাহায্যে বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘ ছন্দে বিশুদ্ধ রাগরাগিণীকে অনুসরণ করিয়া এই রীতির প্রবর্তন করেন। ইহা বিশুদ্ধ মার্গরীতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙলাদেশে ও বৃন্দাবনধামে 'গড়েরহাটী' কীর্তন পদ্ধতি একদা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মনোহরশাহী পরগণা অঞ্চলে প্রচলিত কীর্তনধারা 'মনোহরশাহী' রীতি নামে পরিচিত। খেতুরী উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আর একটি কীর্তনপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। শ্রীখণ্ড, কান্দারা (কাঁদড়া), এবং ময়নাডালের (তিনটি গ্রামই একদা বীরভূমের অন্তর্গত ছিল) কয়েকজন গায়ক এই নূতন রীতির জনপ্রিয়তা বর্ধিত করেন। ইহার মধ্যে শ্রীখণ্ড ও কান্দারা মনোহরশাহী পরগণার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই রীতির নাম মনোহরশাহী ঢঙ। অদ্যাপি কান্দারা, ময়নাডাল এবং শ্রীখণ্ড মনোহরশাহী কীর্তনের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত। কোন কোন মতে শ্রীনিবাস আচার্য মনোহরশাহী পদ্ধতির উদ্ভাবয়িতা। জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রভাবে মনোহরশাহী পদ্ধতি জনপ্রিয়তায় অন্য সমস্ত পদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। এখনও মনোহরশাহী পদ্ধতির সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে। ইহার রীতি অনেকটা খেয়াল গানের মতো, লয় ও ছন্দ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। ইহাতে গড়েরহাটীর মতো বিলম্বিত লয় ব্যবহৃত হয় না। বলা বাহুল্য ইহাতেও কিঞ্চিৎ জটিলতা আছে।

বর্ধমান জেলায় রাণীহাটী পরগণায় প্রচলিত কীর্তনপদ্ধতি 'রেণেটী' পদ্ধতি নামে পরিচিত। শুনা যায় পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ এই রীতির উদ্ভাবন করেন। পরে বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দ সেন), উদ্ধব দাস (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) প্রভৃতি পদকর্তাগণ এই রীতিটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। কেহ কেহ সহজ সরস ভাবের জন্য ইহাকে ঠুংরী রীতির সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। ইহার রীতিপদ্ধতি কিছু লঘু, আখরের বাড়াবাড়িও অল্প। ইদানীং রেণেটীধারা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ সরকার মান্দারণ বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন অঞ্চলে (মেদিনীপুর) মান্দারণী কীর্তন রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। মান্দারণীর স্থর ও তাল সহজ। বিশেষজ্ঞের মতে ইহাই রাঢ়ের প্রাচীন স্থর। মঙ্গলকাব্যাদিতেও ইহার ব্যবহার আছে। ঈষৎ লোকসঙ্গীতের ধার ঘেঁষিয়া থাকার জন্যই হোক, বা যে-কোন কারণেই হোক, এ পদ্ধতি এখন আর অনুসৃত হয় না।

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের রীতি অনুসারে 'ঝাড়খণ্ডী' বলিয়া আর একটি কীর্তন-পদ্ধতির কথা শুনা যায়। বহুদিন পূর্বে এই পদ্ধতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত দুইটি পদ্ধতি (মান্দারণী ও ঝাড়খণ্ডী) এখন আর অনুসৃত হয় না। এই দুইটি ঠাটেই লোকসঙ্গীতের প্রাধান্য ছিল। ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত সেরগড় পরগণায় (মেদিনীপুর) এই ঠাটের একদা বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল।

অধুনা কীর্তনীয়া সমাজে কোন একটি বিশুদ্ধ ঠাট বিশেষ প্রচলিত নাই। কীর্তনীয়াগণ জনরুচির চাহিদা অনুসরণ করিয়া এবং বিশুদ্ধ রীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য এক ঠাটের সঙ্গে অপর ঠাট মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। "ফলে গরাণহাটী গায়ক মনোহরশাহীর কারুকার্য দ্বারা গান সাজাইয়া থাকেন। মনোহরশাহী গায়কও রেণেটি বা মান্দারণী সুরের ভাঁজ আমদানি করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ফলে হইয়াছে এই যে, এই সকল সুরের স্বাতন্ত্র্য ঠিক ধরিতে পারা যায় না।"[৪০]

ঢপকীর্তন নামে কীর্তনের আর একটা লঘুরীতি উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল এবং এখনও ঢপকীর্তন শুনা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যশোহরবাসী মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান নামক এক গায়ক নিজের পরিবারের সকলকে লইয়া কীর্তনের দল তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ইহা সে যুগে মধুকানের দল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহার অবলম্বিত পদ্ধতি ঢপকীর্তন নামে পরিচিত হইয়াছিল। তিনি কীর্তনের মার্গরীতি ততটা অনুসরণ করিতেন না। বৈঠকীগানের হালকা স্থর-তান-লয় প্রয়োগ করিয়া মধুকান ঢপকীর্তনকে সাধারণ সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও 'সূদন' ভণিতা দিয়া এই ধরণের কিছু কিছু কীর্তন-পদাবলী রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রীতি মূলতঃ বৈঠকীরীতি হইলেও ইহার গায়নপদ্ধতিতে তিনি নিজস্ব রীতিও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। উনবিংশ এবং

৪০ খগেন্দ্রনাথ মিত্র—কীর্তন

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শহর অঞ্চলে কীর্তনওয়ালীরা ঢপ গাহিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। এখনও হিন্দুর শ্রাদ্ধবাসরে ঢপকীর্তনের ব্যবস্থা দেখা যায়। বলাই বাহুল্য যে, ঢপকীর্তনে জনরুচির অধিকতর প্রাধান্য ছিল বলিয়া ইহাতে বিশুদ্ধ গায়নপদ্ধতি বড একটা অনুসৃত হইত না। ইদানীং কোন কোন কীর্তনীয়া আবার বিশুদ্ধ রীতিকে জিয়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি আধুনিক কালের কবিগণও নিজ নিজ সঙ্গীতসাধনায় কিয়ৎপরিমাণে কীর্তনের রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। যদি বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া কোন ধারাকে গণ্য করিতে হয়, তবে কীর্তনপদ্ধতিকেই সে গৌরবের অগ্রভাগ দিতে হইবে।

৫ ॥ বৈষ্ণব পদাবলীর শিল্পরূপ

বৈষ্ণব পদাবলী একদা যে ধর্মসঙ্গীতরূপেই আদৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রীতিও এই পদসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সুরের সহযোগিতা না পাইলেও শুধু গীতিকবিতা হিসাবেও ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। আদি লীরিক কবিতায় গীত হওয়ার উপরই তাহার কবিত্ব নির্ভর করিত, পরে গীতি-কবিতা হইতে গীত অর্থাৎ সুর স্খলিত হইয়া পড়িলেও ইহাতে ভাষার ঐশ্বর্য, আবেগের গভীরতা ও কল্পনার উৎসার এমন একটা বিশিষ্ট কাব্যমূর্তি নির্মাণ করিয়াছে যে, কাব্যের অন্যান্য শাখা উপশাখাকে আড়াল করিয়া গীতিকবিতাই অধিকতর প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে। বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী একদা কেবল গীত হইত, পঠিত হইত না। আধুনিককালের পাঠকসমাজ পদাবলী-কীর্তনের ভক্ত হইলেও ইহার লীরিক মাধুর্য ও শিল্পরূপের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। মহাজনগণ শুধু ধর্মীয় আবেগের বশে পদাবলী সাহিত্য সৃষ্টি করিলেও আসলে তাঁহারা ছিলেন স্বভাব-কবি। তাই এই ধরণের ধর্মসঙ্গীতেও অপূর্ব শিল্পরূপ প্রত্যক্ষ করা যাইবে। পদাবলীতে প্রকাশিত শিল্পরূপ এই কাব্যধারাকে একটা সর্বজনীনতা দিয়াছে; তাহা না হইলে ইহা সম্প্রদায়-বিশেষের সাধন সঙ্গীত হইয়া থাকিত, সর্বশ্রেণীর শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিত না।

প্রথমতঃ ইহার বাকরীতি ও বাণীমূর্তির কথা ধরা যাক। বৈষ্ণব পদা-

বলীর একটা বড় অংশ ব্রজবুলি নামক কৃত্রিম কবিভাষায় রচিত।[৪১] বাংলার সঙ্গে কিছু কিছু মৈথিলী শব্দ সংমিশ্রণে উৎপন্ন কৃত্রিম বাংলা-ব্রজবুলি ষোড়শ শতাব্দী হইতেই এদেশে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাই দেখা যাইতেছে বাঙলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলী দুই ভাষায় রচিত হইয়াছে—একটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা, আর একটি ব্রজবুলি। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'র সংস্কৃত শ্লোকগুলিও পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। কোন কোন পদকর্তা তৎসম শব্দকে বাংলা পদে এমন নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন যে, গোটা পদটাকে স্বচ্ছন্দে সংস্কৃতে রচিত বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। যেমন গোবিন্দদাসের এই পদটি :

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধনিন্দিত অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বুকন্দর
নিন্দি সুন্দর ভঙ্গ ॥
প্রেম-আকুল গোপগোকুল
কুলজ কামিনী কান্ত।
কুসুম রঞ্জন মঞ্জুবঞ্জুল
কুঞ্জমন্দির সন্ত ॥

জয়দেবের অনুপ্রাসমুখর ভাষা বৈষ্ণব পদকারদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। কেহ কেহ পুরা সংস্কৃত ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত এইরূপ একটি সংস্কৃত বৈষ্ণব পদের উল্লেখ করা যাইতেছে :

জননি দেহি নবনীতম্।
জঠরানল উপ- দহতি কলেবর-
মনুপালয় সুত গীতম্ ॥
মম নীরস মুখ- মচিরমপাকুরু
দধি বিতরয় নিজ ডিম্ভে।
চলয়তি মৃদু পব- নোঽপি তনুং মম
ভোজনসময় বিলম্বে ॥
দশন-বসন-রস- নে নচ রস ইহ
জীবয় নিজ পরিবারম্।

[৪১] 'ব্রজবুলি' সম্বন্ধে লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

স্তমপি লঘুতর- ময়ি মনুষে কিল
ধনমতি গুরু দধিসারম্ ।।
অয়ি কঠিনে ময়ি করুণা লবমপি
নহি কুরুষে যদি তোকে।
সহচর দীন- বন্ধুরপযশ ইতি
সদসি বদিষ্যতি লোকে ।।[৪২]

যে সমস্ত বৈষ্ণব পদে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে আঞ্চলিক বা উপভাষার প্রভাব নাই বলিলেই চলে। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, কীর্তনপদাবলী উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গের অঞ্চলভেদে নানা ঠাট, ঘরানা ও বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভাষার দিক দিয়া রাঢ়ের মার্জিত বাক্‌রীতিই ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। তবে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্কলন-গ্রন্থে এই সমস্ত পদ পুনঃপুনঃ লিপিকৃত হইবার জন্য ইহাতে নানা পরিবর্তন হইয়াছে, এবং সেই জন্যই বৈষ্ণব পদাবলীতে বিশেষ যুগের ভাষা-চিহ্ন বড একটা মিলে না। পদাবলীর চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস—ইঁহাদের পদাবলী আজ হইতে অন্ততঃ তিনচারিশত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ভাষাকে একেবারে আধুনিক কালের ভাষা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। যথা :

(১) পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়সী করিব
তা বিনে সকলি পর ।। (পদাবলীর চণ্ডীদাস)

(২) তুমি সব জান কানুর পিরীতি
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি জীবন
তাহারে সেঁাপিয়াছি ।। (জ্ঞানদাস)

(৩) তোমরা কে বট ধনি পরিচয় দেহ আগে জানি।
এহেন বিনোদ সাজে কোথা যাবে কোন কাজে
বল বল বল গো তা শুনি ।। (বলরাম)

(৪) প্রভাতে উঠিয়া বিনোদ নাগর
চলিলা নাগরী পাশ।

[৪২] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী', পৃ. ৯৬১

ঘুমে ঢুলু ঢুলু যুগল লোচন
মুখে মৃদু মৃদু হাস ॥ (রায়শেখর)

এই ভাষাতে যুগচিহ্ন কোথাও নাই, থাকা সম্ভবও নহে। বারবার গীত হইয়া নানা সঙ্কলন ও কীর্তনীয়াদের পুঁথির মধ্যে স্থান পাইয়া কালধর্মানুসারে বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা ক্রমে ক্রমে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। অতিশয় জনপ্রিয় সাহিত্যের ইহাই বিড়ম্বনা। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষার বিশেষ পরিবর্তন না হইবার কারণ, ইহা নানা অঞ্চলে প্রচারিত হয় নাই, বহু জনের হাতে পুনঃপুনঃ লিপিকৃত হয় নাই। কিন্তু পদাবলীর ভাষা যে রীতি-মতো বদলাইয়া গিয়াছে, তাহা যে-কোন সঙ্কলনগ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

(ব্রজবুলির ভাষাগত বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। কারণ এ ভাষা কোনদিন মুখের ভাষা ছিল না, শুধু বৈষ্ণবপদ ভিন্ন অন্য সাহিত্যকর্মে ব্রজবুলি ব্যবহৃত হইত না। মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার কিছু কিছু সংমিশ্রণের ফলে এই ব্রজবুলির উৎপত্তি। অবশ্য ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষাতেও ব্রজবুলি আছে। বাংলা ব্রজবুলির মতো ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার সঙ্গে মৈথিলী শব্দ মিশিয়া গিয়া এই কবিভাষার উৎপত্তি হয়, যাহা প্রায়শঃই পদাবলী সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত। বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণ গীতিকার প্রভাবে বাঙলাদেশে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে এই কৃত্রিম ব্রজবুলি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। এমন কি কোন কোন বাঙালী কবি বাংলা অপেক্ষা ব্রজবুলিতে পদ লিখিতে অধিকতর আনন্দ বোধ করিতেন—যেমন গোবিন্দদাস কবিরাজ। এই ব্রজবুলি পরবর্তী কালে, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও আধুনিক মনোভাবাপন্ন কবিরাও ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহার কারণ মৈথিলী ও বাংলা শব্দের সংমিশ্রণের ফলে ভাষার ধ্বনিঝঙ্কার বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রজবুলি পদ-গুলিতে মৈথিলী শব্দের জন্য পাঠে বা গীতে উহাকে কিঞ্চিৎ রহস্যময় মনে হইত, এবং দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। তৃতীয়তঃ, সে যুগের লোকে মনে করিত যে, দ্বাপরযুগে ব্রজধামের গোপগোপীরা ব্রজবুলিতেই কথা বলিতেন, এবং সেই জন্য ইহার প্রতি বাঙালী পদকার ও শ্রোতার শ্রদ্ধামিশ্রিত আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ব্রজবুলি ও ব্রজভাষার (ব্রজ্ ভাখা) মধ্যে রীতিমতো

পার্থক্য রহিয়াছে। ব্রজবুলি মাগধী অপভ্রংশ-জাত কৃত্রিম কবিভাষা, ব্রজ্‌ভাখা পশ্চিমা অপভ্রংশ-জাত মথুরা অঞ্চলের বাস্তব মানুষের কথ্য ভাষা।

ব্রজবুলি রচনায় গোবিন্দদাস কবিরাজ, বলরামদাস, রায়শেখর এবং পরবর্তী কালের রাধামোহন ঠাকুর বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার ছন্দচাতুর্য, ধ্বনিঝঙ্কার ও চিত্রকল্প বাংলা পদ অপেক্ষা অনেক সময় উৎকৃষ্ট মনে হয়। নিম্নে এইরূপ দুই-চারি ছত্র ব্রজবুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :)

(১) চম্পকসোণ কুসুমকনকাচল
জিতল গৌরতনু লাবণি রে।
উন্নতগীম সীম নাহি অনুভব
জগমনোমোহনী ভাঙনী রে॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবনমণ্ডন কলিযুগকাল-
ভুজগভয় খণ্ডন রে॥ (গোবিন্দদাস কবিরাজ)

(২) বিদ্যাপতি পদ- যুগল সরোরুহ
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমণি নাগর নাগরী
লীলা স্ফুরব কি মোয়॥ (গোবিন্দদাস কবিরাজ)

(৩) সুন্দরি বেকত গোপত লেহা।
বঞ্চিত আজু করণে নাহি পারবি
সাখি দেয়ল তুয়া দেহা॥ (ধ্রু)॥
অলস মলিন সখি তুয়া মুখমণ্ডল
গণ্ড অধর ছবি মন্দ।
কত রস পান কয়ল রসমোহিত
রাহু উগারল চন্দ॥ (রায়শেখর)

এখানে লক্ষ্য করা যাইবে যে, পদকারগণ কিছু কিছু মৈথিলী শব্দকে একটু-আধটু রূপান্তরিত করিয়া বাংলাভাষার প্রাণবস্তুর সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন এবং মৈথিলী শব্দের ধ্বনিঝঙ্কার ও শব্দপ্রতীকগুলি শিল্পরসের দিক দিয়া অতীব প্রশংসনীয় হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টান্ত দুটির 'গীম', 'ভাঙনী', দ্বিতীয়টির 'তছু', 'মঝু', 'মাতল',

'পিবত', 'করু', 'কিয়ে', 'হোয়', 'স্ফুরব', 'মোয়', এবং তৃতীয়টির 'বেকত', 'গোপত', 'আজু', 'দেয়ল', 'তুয়া' 'কয়ল', 'উগারল' প্রভৃতি মৈথিলী শব্দগুলি বাংলা বাক্‌রীতির সঙ্গে নিপুণভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এ ভাষারীতিকে কেহ কেহ কৃত্রিম বলিয়া থাকেন, কারণ বাংলা-মৈথিলী-মিশ্রিত ব্রজবুলি নিতান্তই কবিকল্পিত সাহিত্যের ভাষা; কেহ কোন দিন এ ভাষায় কথা বলে নাই। তাহা ঠিক বটে, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ কৃত্রিমতা কিন্তু পদাবলীকে কৃত্রিম বস্তু করিয়া তোলে নাই। পদাবলীর সুর ও ছন্দের সঙ্গে ইহা চমৎকারভাবে মিশিয়া গিয়াছে; তিনশত বৎসর ধরিয়া বাংলা পদাবলী-সাহিত্যকে এই কৃত্রিম রীতিই নব নব উৎকর্ষ দান করিয়াছে। বস্তুতঃ, বাংলা পদাবলীসাহিত্য হইতে ব্রজবুলি স্খলিত হইয়া গেলে ইহার মাহাত্ম্য অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হইত। এযুগের মহাকবি এই ভাষার মোহে মুগ্ধ হইয়াই নিজের কবিজীবনে প্রথম মুক্তির স্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। এখনও যাঁহারা মৈথিলী ভাষা জানেন না, তাঁহারাও পদাবলীর ব্রজবুলি বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন না, কারণ বাংলা পদাবলীর শব্দের সঙ্গে ইহার এমন একটা অন্তরঙ্গতা হইয়া গিয়াছে যে, মৈথিলী শব্দের অর্থ জানা না থাকিলেও পদের সমগ্র অর্থ ও রসের কোন হানি হয় না। একটি কৃত্রিম মিশ্র ভাষার এতদিন ধরিয়া কাব্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার বাস্তবিক বিস্ময়কর।

সর্বোপরি বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ ও রূপকল্প সম্বন্ধে বিস্ময়মুগ্ধ শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিনাশ হইলেও শুধু বৈষ্ণব পদাবলী রক্ষা পাইলেই আমরা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ সম্বন্ধে অবহিত হইতাম। কারণ, মধ্যযুগের অনুবাদ-সাহিত্য অভিনব মৌলিক ব্যাপার নহে—উত্তর ভারতীয় সংস্কারের উপর বাঙালী মনের পালিশ পড়িয়াছে, এইটুকু মৌলিকতা। মঙ্গলকাব্যের বিপুল কলেবর সত্ত্বেও ইহা কবিপ্রতিভা ও সৃষ্টিকর্মের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত নহে; কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী ভাব, ভাষা, অলঙ্করণ, শিল্পরূপ ও অনুভূতির নিবিড়তায় বিচিত্র বাঙালী-মানসকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব পদকারগণ ভক্তির গান লিখিয়াছেন, কিন্তু সে ভক্তি বৈরাগীর গেরুয়ায় আবৃত নিঃস্পৃহ ভগবদ্‌ভক্তি নহে; তাহাতে সুর আছে, রং আছে, রস আছে। তাই পদকারগণ অপূর্ব বাণীমূর্তি রচনা করিয়া ভক্তিকে আবেগের অনুরাগে প্রীতি-রতি-নিষ্ঠায় আস্বাদনের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দেরই বা কত কারুকলা। যেন ভক্ত রাধাকৃষ্ণের যুগল তনুকে পরম মমতা ও ভক্তিশ্রদ্ধায় 'শিঙার' বেশে সাজাইতেছেন। কখনও পদকার সরল বাংলা পয়ারত্রিপদীতে মনের ভাবটি সহজভাবে ব্যক্ত করিতেছেন :

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী॥

কখনও প্রাকৃত পজ্ঝটিকা ছন্দের ধ্বনিঝঙ্কার :

আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত থর থর কাঁপে॥
হঠ পরিরম্ভণে নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিণী হরিহিয়ে ডোল॥

কিংবা চৌপাইয়ের ছন্দ-হিল্লোল :

রজনী কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিশ পড়য়ে দুরবার।
গরজ তরজ মন রোষে বরিষ ঘন
সংশয় পড়ু অভিসার॥

কিংবা লঘুত্রিপদীর চঞ্চলগতি :

স্ফুট চম্পক দলনিন্দিত
উজ্জ্বল তনু শোভা।
পদপঙ্কজে নূপুর বাজে
শেখর মনোলোভা॥

এই সমস্ত পংক্তিগুলি উচ্চারণ মাত্রই একটি ধ্বনিতরঙ্গ ও সুরমাধুরী চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া ফেলে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে সাধারণতঃ অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষর-মাত্রার সংমিশ্রণ এবং ছড়ার ছন্দ (শ্বাসাঘাত) ব্যবহৃত হইত। অবশ্য এই ছন্দপ্রকরণে আধুনিক পাঠকের কান সায় দিবে না। কারণ বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ কানে শুনিলে কোন কোন সময়ে কিছু ত্রুটিযুক্ত মনে হইবে। সে যুগে বৈষ্ণবপদ গীত হইত, পঠিত হইত না। কাজেই গানের সময় মাত্রাকে কোথাও টানিয়া, কোথাও-বা হ্রস্ব করিয়া কীর্তনীয়ারা ইচ্ছামতো লয়কে বাড়াইয়া কমাইয়া লইতেন। তাহা হইলেও কবিগণ মোটামুটি ছন্দের ক্রম রক্ষা করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই চর্যাপদ হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণবিজয় পর্যন্ত আমরা চৌদ্দ মাত্রার পয়ার লক্ষ্য করিয়াছি। এই পয়ার হিন্দী চৌপাই বা পাদাকুলক—যেখান হইতেই গৃহীত হোক না কেন, পয়ার ত্রিপদীর ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্ব হইতেই লক্ষ্য করা যাইতেছে। এমন কি 'গীত-গোবিন্দে'ও কোন কোন স্থলে ত্রিপদীর সুর ধ্বনিত হইয়াছে :

চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং
শীলয় নীল নিচোলম্।

ইহা তো বাংলা ত্রিপদীর হিল্লোল। পয়ার ত্রিপদী ছাড়িয়া দিলেও ব্রজবুলির পদগুলিতে অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ছন্দের লঘুগুরু মাত্রাপদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মাত্রারীতি অবশ্য সমস্ত ব্রজবুলিতেই সূক্ষ্মভাবে অনুসৃত হয় নাই। সংস্কৃত মতে আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অনুস্বর-বিসর্গযুক্ত স্বর এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী বর্ণ সর্বদাই দ্বিমাত্রিক; কিন্তু ব্রজবুলিতে মোটামুটি এই রীতি ব্যবহৃত হইলেও সুরতাল অনুসারে প্রয়োজন স্থলে পদকারগণ মাত্রাকে ইচ্ছামতো বাড়াইয়া কমাইয়া লইতেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ, রায়শেখর, জ্ঞানদাসের ব্রজবুলির পদেও কোন কোন স্থলে সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের লঘু-গুরু মাত্রা রক্ষিত হয় নাই। ছান্দসিক দেখিয়াছেন যে, বৈষ্ণব পদাবলীর পয়ারজাতীয় ছন্দে চৌদ্দ অক্ষরী পয়ার, আট অক্ষরী ও একাদশ অক্ষরী একাবলী, ছাব্বিশ অক্ষরী দীর্ঘ ত্রিপদী, কুড়ি অক্ষরী লঘু ত্রিপদী প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর হইবে। তেমনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও ষোড়শ মাত্রার চৌপাই, বিষমচতুষ্পদী (১২ + ১৬), অষ্টাদশ মাত্রার ত্রিপদী, পঁচিশ মাত্রার মিশ্র ত্রিপদী প্রভৃতি নানা ছন্দকৌশল লক্ষ্য করা যাইবে। ইহা ছাড়া 'ধামালি' ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছড়ার ছন্দেও কিছু কিছু পদ রচিত হইয়াছিল। নিম্নে বিভিন্ন ছন্দের সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

অক্ষরবৃত্ত বা পয়ারজাতীয় ছন্দ ॥

(১) ১৪ অক্ষরের পয়ার :

প্রতি অঙ্গ কোন্ বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয় বরিষে॥

(২) ৮ অক্ষরের একাবলী :

না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত ॥

(৩) ১০ অক্ষরের একাবলী :

কহ কহ সুবদনী রাধে।
কিবা তোর হইল বিয়াধে ॥

(৪) ১১ অক্ষরের একাবলী :

অপরূপ তুয়া মুরলিধ্বনি।
লালসা বাড়িল শবদ শুনি ॥

(৫) ১৬ অক্ষরের দীর্ঘত্রিপদী (৮+৮+১০=২৬)

কি খেনে দেখিলুঁ গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত পাব সুরধুনী তীরে ॥

(৬) ২০ অক্ষরের লঘুত্রিপদী (৬+৬+৮=২০):

কদম্বের বনে থাকে কোন্ জনে
কেমন শব্দ আসি।
একি আচম্বিতে শ্রবণের পথে
মরমে রহল পশি ॥

মাত্রাবৃত্ত-ছন্দ ॥

(১) ৮ মাত্রার ছন্দ :

জলকেলি সাধে।
চলু ধনী রাধে ॥
উজবল তীরে।
পহিরল চীরে ॥

(২) ১৬ মাত্রার ছন্দ :

শুনইত চমকই গৃহপতি রাব।
তুয় মঞ্জীর রবে উনমতি ধাব ॥

(৩) ২৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী :

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন অভরণ সাজ

অরুণ নয়ন পাঁতি বিজুরি চমক জিতি
দগধল কুলবতী লাজ ॥

(৪) ২৫ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী :

মুদির মরকত মধুর মুরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লি মালতী মালে মধুমত
মধুপ মনমথ ফান্দ ॥

(৫) ৪৭ মাত্রার দীর্ঘচতুষ্পদী :

দেখত বেকত গৌর চন্দ।
বেঢল ভকত নখতবৃন্দ
অখিল ভুবন উজরকারি কুন্দকনক কাঁতিয়া।
অগতি পতিত কুমুদ বন্ধু
হেরি উছক রসক সিন্ধু
হৃদয়-কুহর তিমিরহারি উদিত দিনহি রাতিয়া ॥

ধামালি ছন্দ ॥

এক নগরী বলে, দিদি নাইতে যখন যাই।
ঘোমটা খুলে বদন তুলে দেখেছিলেম তাই ॥
রূপ দেখে চমকে উঠে ঘরকে এলাম ধেয়ে।
দুটি নয়ন বাঁধা রইল গৌরপানে চেয়ে ॥
গা থর থর করে আমার অঙ্গ সকল কাঁপে।
নাসার নোলক ঝলক দিয়ে মনের ভিতর ঝাঁপে ॥

শুধু ছন্দের কারুকলা নহে, অলঙ্করণ, রূপনির্মিতি ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে বৈষ্ণব পদাবলী শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। বৈষ্ণব সাহিত্যে মণিমুক্তার মতো ইতস্ততঃ বিকীর্ণ এইরূপ অপূর্ব বাক্‌রীতির দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময় ॥ (পদাবলীর চণ্ডীদাস)

(২) হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেমপ্রহরি রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি ॥ (গোবিন্দদাস কবিরাজ)

(৩) কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি।। (গোবিন্দদাস কবিরাজ)

(৪) রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।। (জ্ঞানদাস)

উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের সাহায্যে পদকারগণ বৈষ্ণব-পদাবলীকে রসিকজনের উপভোগের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন; আধুনিক কালের পাঠক, যিনি বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত নহেন, তিনিও বৈষ্ণব পদাবলী হইতে আনন্দ লাভ করেন, তাহার কারণ বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্নিহিত শিল্পরস। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর পরে বৈষ্ণব পদাবলীর স্বতোৎসারিত এবং স্বাভাবিক কবিত্ব, পাণ্ডিত্য বুদ্ধির কসরৎ ও অনুকরণের দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়াছিল, বাঁধাবাঁধি গতানুগতিক নিয়ম রক্ষার দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়াতে উত্তর-চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবের ঐকান্তিকতা এবং রচনা-ভঙ্গিমার বিস্ময়কর ঐশ্বর্য কৃত্রিমতার চাপে ক্রমে ম্লান হইয়া গিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও মতবাদে যেমন ভাঁটা পড়িতে লাগিল, তেমনি বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যেও প্রাণের গভীর অনুভূতির স্থলে বক্রোক্তির চিত্তচমৎকারী কলাকৌশলই একমাত্র কবিত্ব বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

দশম অধ্যায়

প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী

সূচনা ॥

ইতিপূর্বে আমরা বৈষ্ণব পদসাহিত্যের মূল স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা প্রাক-চৈতন্যযুগের প্রসিদ্ধ পদকর্তাদের সম্বন্ধে দুই-চারি কথা আলোচনা করিব। অবশ্য নানা পদসঙ্কলনগ্রন্থে ধৃত এত অসংখ্য পদকারের পদ সংগৃহীত হইয়াছে যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের স্বল্পতম পরিচয় দেওয়াও একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। উপরন্তু অনেক পদকার সুলভ অনুকরণের মোহে এমন ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, প্রতিভাবান কবিদের পদ অনুকরণ করিয়াই অসংখ্য পদ লিখিয়াছেন, কোন দিক দিয়া বিশেষ মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। এইজন্য আধুনিক কালের পাঠক নির্বাচিত সঙ্কলন ছাড়া বিরাট পদাবলী-সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করিতেই ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়েন, রসে অবগাহন তো দূরের কথা। এই স্থলে মধ্যযুগের ভক্ত পাঠক ও শ্রোতা এবং এযুগের রসিক পাঠকের প্রধান পার্থক্য। মধ্যযুগের শ্রোতারা একটা বিশেষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে পদাবলীর রসাস্বাদন করিতেন; কাজেই ভালোমন্দ—সমস্ত পদই ভক্তদের দ্বারা শ্রদ্ধানত চিত্তে আস্বাদিত হইত। কিন্তু আধুনিক কালে সাহিত্য মূলতঃ সারস্বত এষণা হইতে জন্ম লাভ করে—ইহা এখন আর একান্তভাবে ধর্মসাধনার অঙ্গ নহে। তাই এখন রস ও শিল্পের কষ্টিপাথরের নিরিখে যে সমস্ত পদকার ছাড়পত্র পাইয়াছেন, শুধু তাঁহাদের পদই আধুনিক সমাজে পঠিত হয়।

মধ্যযুগে ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষার বশে কীর্তনীয়াগণ বহুপদ নিজেরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কেহ কেহ আবার বহুকবির একই পালাভুক্ত পদ একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া নানা পালায় সাজাইয়া বিরাট পদসঙ্কলনগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে কোন পদসঙ্কলনগ্রন্থের নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায় না। সাত-আটখানি প্রসিদ্ধ পদসঙ্কলনগ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও

কিছু কিছু সঙ্কলনপুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] নিম্নে কয়েকখানি বৈষ্ণবপদাবলী-সংগ্রহের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে:—

১। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ('হরিবল্লভ') সঙ্কলিত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'। বিশ্বনাথ ৪৫ জন কবির ৩০৯টি পদ লইয়া এই পদাবলী গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইহা সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। এই সঙ্কলনে বিশ্বনাথ নিজে 'হরিবল্লভ' ভণিতায় ৫১টি পদ রচনা করিয়াছিলেন।

২। শ্রীনিবাস আচার্যের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্র' কীর্তনীয়া সমাজে সুপরিচিত। রাধামোহন মহারাজ নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। ইঁহার সঙ্কলনগ্রন্থও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে গৃহীত ৭৬৪টি পদের মধ্যে ২২৮ পদই স্বয়ং রাধামোহনের রচিত।

৩। নরহরি চক্রবর্তী ('ঘনশ্যাম দাস') সঙ্কলিত 'গীতচন্দ্রোদয়ে' পূর্বরাগ সম্বন্ধেই ১১৬৯টি পদ গৃহীত হইয়াছে; তিনি আরও পালার পদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। ইহা বোধ হয় 'পদামৃতসমুদ্রে'র পর সঙ্কলিত হইয়াছিল।

৪। বৈষ্ণব পদসঙ্কলনের মধ্যে গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত সুবৃহৎ গ্রন্থ 'পদকল্পতরু' বাঙলাদেশে সর্বাধিক পরিচিত। ৩১০১টি পদের সঙ্কলন এই বৃহৎ গ্রন্থ বৈষ্ণবপদের উৎসভূমি।

৫। গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দে'র ১১১৯টি পদ গৃহীত হইয়াছিল। ইহা 'পদকল্পতরু'র কিছু পূর্বে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে।

৬। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে দীনবন্ধুদাস 'সঙ্কীর্তনামৃত' নামক সঙ্কলনে বিভিন্ন পদকর্তার ২৮৪টি এবং নিজের ২০৫টি মোট ৪৮৯টি পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ইহার পরেও পদসঙ্কলনের রীতি পরিত্যক্ত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কমলাকান্ত দাস ১৩৫৮টি পদ লইয়া 'পদরত্নাকর' এবং বৃন্দাবনের নিমানন্দ দাস ২৭০০ পদ লইয়া 'পদরসসার' সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ছাপার যুগে যেমন প্রাচীন সঙ্কলনগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল, তেমনি কেহ কেহ আধুনিক কালের রুচির দিকে চাহিয়া ঈষৎ স্বল্প পরিসরে কিছু কিছু সঙ্কলন মুদ্রিত

[১] এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বৈষ্ণব পদসঙ্কলনগ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইবে।

করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত গৌরমোহন দাসের 'পদকল্পলতিকা' (৩৫০টি পদ) সে-যুগে পাঠকসমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এইরূপ পদসঙ্কলনের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার ফলে উনবিংশ শতকের সপ্তম অষ্টম দশকের মধ্যে আধুনিক মনোভাবের উপযোগী করিয়া এবং পালাক্রমে সাজাইয়া একাধিক পদসঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সমস্ত সঙ্কলনের মধ্যে প্রয়োজন ও মৌলিকতার দিক দিয়া জগদ্বন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত 'গৌরপদতরঙ্গিণী' (১৯০২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যবিষয়ক যাবতীয় প্রাচীন ও অর্বাচীন পদের সংগ্রহ সঙ্কলন করিয়া জগদ্বন্ধু একটা বড় অভাব দূর করেন। ইহার সঙ্গে সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদিত 'প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ' (১৮৭১), সারদাচরণ মিত্রের 'বিদ্যাপতির পদাবলী' (বাংলা ১২৮৫), রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'পদরত্নাবলী' (বাংলা ১২৯২), জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' রমণীমোহন মল্লিকের চণ্ডীদাসের পদসংগ্রহ (বাংলা ১৩০৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবপদাবলীকে মোটামুটি তিনটি শাখায় বিভক্ত করিতে পারা যায়—(১) চৈতন্যপূর্ববর্তী পদসাহিত্য, (২) চৈতন্যের জীবিতকালের মধ্যে আবির্ভূত পদকারগণ এবং (৩) চৈতন্যতিরোধানের পর আবির্ভূত পদকারগণ॥ ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুর বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং এই শতকের অষ্টম দশক হইতে বৈষ্ণব পদাবলী অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। শ্রীনিবাস-নরোত্তমপর্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হইবে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের সংস্কৃত বৈষ্ণব পদ ॥

চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে মিথিলার বিদ্যাপতি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণাদি হইতে আদর্শ ও উপাদান লইয়া অসংখ্য রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে [২] বিদ্যাপতির পদ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখানে সে বিষয়ে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

[২] এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

তবে বর্তমান প্রসঙ্গে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, শুধু চৈতন্যদেবই বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে দিব্যানুভূতি লাভ করেন নাই, সমগ্র পদাবলী সাহিত্যও বিদ্যাপতির নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। বস্তুতঃ, বাঙলার বৈষ্ণব পদসাহিত্য ততটা ভাগবতের অনুগত নহে, যতটা বিদ্যাপতির ঘনিষ্ঠ অনুগামী। বাংলা পদাবলীর যে বিপুল কলেবর ব্রজবুলির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, মৈথিলী বিদ্যাপতির সঙ্গে পরিচয় না হইলে বাঙালী এরূপ অপূর্ব পদসাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিত না। কাজেই যাঁহারা বিদ্যাপতিকে মৈথিলা ভাষার কবি বলিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে বাদ দিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদের অভিমত যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করি না।

চৈতন্যের পূর্বে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রায় রামানন্দের সংস্কৃত নাটকের গানগুলি এবং রূপ গোস্বামী-সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে বৈষ্ণব পদেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। গীতগোবিন্দে যাহাকে 'পদম্' বলা হইয়াছে, তাহাকে বাংলা বৈষ্ণবপদাবলীর আদি উৎস বলা যাইতে পারে।

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥

'গীতগোবিন্দে'র এ সুর তো বৈষ্ণব পদাবলীর সুর। রায় রামানন্দও সংস্কৃত নাটকে জয়দেবের অনুসরণে রাধার অভিসারের বর্ণনা দিয়াছিলেন :

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্।
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতম্॥
কেলীবিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা॥

কিংবা 'পদ্যাবলীতে' উল্লিখিত রূপ গোস্বামীর শ্লোক :

হন্ত ন কিমু মন্থরয়সি
সন্ততমভিজল্পম্।
দন্তরোচি রন্তরয়তি
সন্তমসমনল্পম্॥

রাধে পথি মুঞ্চ ভূরি
সম্ভ্রমমভিসারে।
চারয় চর- ণাম্বুরুহে
ধীরং সুকুমারে ॥

কিংবা :

রাধে নিজকুঞ্জপয়সি তুঙ্গীকুরু রঙ্গং
কিঞ্চ সিঞ্চ পিঞ্ছ মুকুটসঙ্গীকৃত ভঙ্গম্।
অস্থ পশ্য ফুল্ল কুসুম রুচিতোন্নত চূড়া
ভীতিভিরতি নীলনিবিড় কুন্তলমনুগূঢ়া ॥

এই সমস্ত দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে যে, জয়দেবের প্রভাবে মধ্যযুগের কেহ কেহ সংস্কৃতভাষায় পদাবলী রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে এইরূপ কয়েকটি পদ আছে।[৩] গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষা, শব্দসম্ভার ও ছন্দে গীতগোবিন্দের ঝঙ্কার দুর্লক্ষ্য নহে। এবার প্রাক-চৈতন্যযুগের বাংলা পদসাহিত্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব পদ ॥

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়[৪] চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু দিব্যোন্মত্ত অবস্থায় যে সমস্ত কাব্য-কবিতা শুনিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেন, তাহার মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ প্রধান। এ চণ্ডীদাস কোন্ চণ্ডীদাস, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিব। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যদেবের পূর্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রমাণ করিয়াছি। চণ্ডীদাসের গীতি বলিতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কিয়দংশ, বিশেষতঃ রাধা বিরহের কোন কোন পদ চৈতন্যদেব আস্বাদন করিতেন কিনা জানা যায় না। অন্তরের তদ্গত ভক্তি, আর্তি ও আত্মনিবেদন বিবেচনা করিলে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্ভুক্ত 'রাধাবিরহে'র কোন কোন অংশ পদাবলী-সাহিত্যের মাথুর বা আক্ষেপানুরাগের সঙ্গে সমতুলিত হইতে পারে।

---

৩ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১ম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

(১) বড়ায়ি গো ॥
কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
সোঞ নারী বড় অভাগিনী ॥

(২) কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসন্তী বাশে।
আন পানী মোকো একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে ॥
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

(৩) যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞা পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আনি দেব যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবোঁ আর জরমে ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষাংশে রাধার বিলাপে যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে পদাবলীর সুরের বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহের রাধার বিলাপ এবং পদাবলীর রাধার দুঃখবেদনা ঠিক এক জাতীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-চন্দ্রাবলী মূলতঃ মানবী, তাঁহার আর্তনাদ বাস্তব রমণীর দুঃখবেদনাকেই তীব্রতম করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যযুগে রাধার বিরহের পদে বাস্তবাতীত ব্যঞ্জনাই একটা বিচিত্র রস ও মাধুর্য সৃষ্টি করিয়াছে। অন্তরের দিক হইতে এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও বাহিরের দিক হইতে কিছু সাদৃশ্য আছে। তাই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে সমাপ্তি, চৈতন্যযুগের পদাবলীর সেখান হইতেই আরম্ভ। কথাটা অযৌক্তিক নহে।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' ভাগবতের আখ্যান অনুসৃত হইলেও তাহাতেও স্থানে স্থানে বৈষ্ণব পদাবলীর সুরের আভাস পাওয়া যাইবে। নিম্নে এইরূপ দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) আজি শূন্য হইল মোর গোকুল নগরী।
গোকুলের রত্ন কৃষ্ণ যায় মধুপুরী ॥

আজি শূন্য হইল মোর রসের বৃন্দাবন।
শিশু সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন॥
*　　　　*　　　　*
আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেবগনাধরে॥
আর না দেখিব সখী সে চান্দ বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন॥

(২) কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সঙ্গেতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ॥
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥

এই পংক্তিগুলি সহজ পয়ারে রচিত হইলেও ইহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর স্বাদ পাওয়া যায়।

প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে রচিত বলিয়া একজন পদকর্তার দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে। এখানে সে বিষয়ে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে প্রাক্‌-চৈতন্যযুগের আর একজন পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নাম যশোরাজ খান। সপ্তদশ শতাব্দীর পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' নামক বৈষ্ণব অলঙ্কারগ্রন্থে ইঁহার একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এ পর্যন্ত এই পদকার সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই। তাঁহার পদের শেষে এইভাবে ভণিতা দেওয়া হইয়াছে :

শ্রীযুত হুসন　　জগত ভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর　　ভোগ পুরন্দর
ভনে যশোরাজ খান॥

ইহাতে অনুমিত হয়, তিনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের রাজ্যকালে (১৪৯৩-১৫১৯) এই পদটি লিখিয়াছিলেন। যশোরাজ খান নামটি মালাধর বসুর গুণরাজ খান নামের মতো সুলতান প্রদত্ত কিনা ইহা লইয়াও নানা সন্দেহ রহিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে হুসেন শাহের মন্ত্রী বা কোন উচ্চ কর্মচারী বলিতে চাহেন।[৪] কিন্তু সেরূপ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

---

৪ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী, সাহিত্য পৃ. ২৯৭

কাহারও মতে তিনি নাকি একখানি কৃষ্ণচরিত কাব্য লিখিয়াছিলেন।[৫] কিন্তু তাহাও আনুমানিক। কবি যশোরাজ হুসেন শাহের রাজ্যাঙ্কে বর্তমান ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ বাঙালী ছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণকে দেখিবার আগ্রহে রাধা অঙ্গরাগ ও সাজসজ্জা অসমাপ্ত রাখিয়াই বাহিরের দেহলীতে উৎকণ্ঠিতভাবে পদচারণা করিতেছেন, এইভাবে এক সখী কৃষ্ণের কাছে গিয়া রাধার কথা বলিতেছেন :

এক পয়োধরে চন্দন লেপিত
আরে সহজই গোর।
হিমধরাধর কনক ভূধর
কোরে মিলল জোর॥
মাধব তুআ দরশন কাজে।
আধ পদচারি করত সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীলধবল কমল যুগলে
চান্দ পূজল কাম॥

এই পদের রচনা-ভঙ্গিমা বিদ্যাপতিকে স্মরণ করাইয়া দেয় বটে, কিন্তু পদের মধ্যে গৌড়ীয় মনোভাব লক্ষ্য করা যাইবে। পদটি ব্রজবুলিতে লিখিত, চৈতন্যযুগের পূর্ববর্তী বাংলা ব্রজবুলির একটি নিপুণ দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহা উল্লেখযোগ্য। "আধ পদচারি করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে"—এই পংক্তিটিতে রাধার কৃষ্ণ দর্শনের উৎকণ্ঠা চমৎকার ফুটিয়াছে। অর্ধসমাপ্ত অঙ্গরাগের বর্ণনাকৌশলও বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনীয়। দুঃখের বিষয় ইহার এই একটি পদ ভিন্ন আর কোন পদ পাওয়া যায় নাই।

এই যুগে রচিত বাঙলার বাহিরে দুইজন পদকর্তার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্কলিত মৈথিল কবি লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে যশোধর নামক এক কবি "ভৃঙ্গসম নাগর সাহ হুসান"—এর নাম উল্লেখ করিয়া ভণিতা দিয়াছেন। কেহ কেহ যশোরাজ

[৫] ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ১০৯

ও যশোধর একই কবি, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিতান্তই অনুমান। উপরন্তু পদটি পুরাপুরি মৈথিলীতে রচিত, সুতরাং এখানে ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় আর একজন প্রাচীন পদকর্তার একটি পদের সন্ধান পাইয়াছেন। কাশী হইতে প্রকাশিত এবং সুভদ্রা ঝা সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি গীত সংগ্রহে'র পরিশিষ্টে ত্রিপুরার রাজা ধনমাণিক্যের এক রাজ-পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত একটি মৈথিলীপদ স্থান পাইয়াছে। ইহা ধনমাণিক্যের কোন সভাকবির রচিত হইতে পারে। ধনমাণিক্য ১৪৯০ হইতে ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন; কবিও এই সময়ের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। ইঁহার পদটি মৈথিলীতে রচিত হইলেও এখানে উল্লেখযোগ্য:

প্রথম তোহর প্রেমগৌরব
গৌরব-বাড়লি গেলি।
অধিক আদরে লোভে লুবুধলি
চুকলি তে রতি-খেড়ি॥
খেমহ এক অপ- রাধ মাধব
পলটি হেরহ তাহি।
তোহ বিনা জঞো অমৃত পিবএ
তৈঞো ন জীবএ রাহি॥

অবশ্য বাংলা পদসাহিত্য আলোচনায় যাহার সহিত বাংলার যোগাযোগ নাই, এমন মৈথিলী পদ আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। তবে কবি সম্ভবতঃ বাঙালী ছিলেন না, মিথিলা হইতে বাঙলায় আসিয়া ত্রিপুরারাজের সভায় বাস করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহা উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এ সমস্ত পদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে হইলে মিথিলার প্রসিদ্ধ নাট্যকার উমাপতি উপাধ্যায়ের নাটকের কথাও উল্লেখ করিতে হয়; তাঁহার সংস্কৃত নাটকে মৈথিলীভাষায় রচিত গানগুলিতে ব্রজবুলি পদের রূপ-রস আস্বাদ করিতে পারা যায়।

চৈতন্যের সঙ্গে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের যখন সাধ্যসাধনতত্ত্ব লইয়া আলোচনা চলিতেছিল, তখন তিনি চৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে রাধা-কৃষ্ণতত্ত্বের শেষ কথাটি স্বরচিত একটি গানেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন:

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ।।
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি ।।

ইহা নিশ্চয় চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকারের অনেক পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। এখানে লক্ষণীয় যে, ইহার ভাষার মধ্যে পুরাপুরি ব্রজবুলির ভাষাদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। ভাবের মধ্যে চৈতন্যযুগের ভাবনাচিন্তার প্রভাব পড়িয়াছে। অথচ তাঁহার ভক্তি-প্রেমের নাটক 'জগন্নাথবল্লভ' চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। রায় রামানন্দ দক্ষিণ-ভারত হইতে প্রবাহিত ভক্তিরসে সিঞ্চিত হইয়াছিলেন, চৈতন্য-সাক্ষাৎকারের পূর্বেই তিনি রাগমার্গ ধর্মসাধনা ও সখীসাধনা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত উক্ত পদ হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

একাদশ অধ্যায়

পদাবলীর চণ্ডীদাস

সূচনা ॥

আধুনিক যুগে বাঙলাদেশে চণ্ডীদাসের পদাবলী অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে কিছুই জানে না, কোন কবির কোন গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পায় নাই, সেও চণ্ডীদাসের নাম জানে, তাঁহার কীর্তন-পদাবলীর দুই চারি পংক্তি আবৃত্তি করিতে পারে। ফলে, চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙালীর কাছে পরম ভক্তি, আরাম ও আনন্দময় শিল্পরসে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদে বাঙালী বিস্মিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে সে মনের প্রশান্তি, স্নিগ্ধতা ও আত্ম-নিবেদনের একনিষ্ঠতা খুঁজিয়া পাইয়াছে; চণ্ডীদাসের পদাবলী তাই শুধু পদাবলী মাত্র নহে, সারস্বত বৈশিষ্ট্যই ইহার একমাত্র ফলশ্রুতি নহে—"চণ্ডী-দাসের ভাবসম্মেলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধহয় অন্যায় হইবে না, সেগুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্মপুস্তকেও বিরল" (দীনেশচন্দ্র)। চণ্ডীদাসকে তাই আধুনিক সমালোচক শুধু কবি না বলিয়া 'কবিতাপস' রূপে সম্বোধন করিয়া তৃপ্তি পাইতে চাহেন।[১] তাঁহাকে 'আধ্যাত্মিক', 'মীস্টিক', 'মৌনের মহান সঙ্গীতকার' বলিয়াও সমা-লোচকের তৃপ্তি হয় না। চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করিয়া কত গল্পকাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে, কত অর্বাচীন কবির পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে, 'চণ্ডীদাস' নামসহি করিয়া কত কবি পদাবলীর চণ্ডীদাসের গৌরবের যজ্ঞভাগ লইতে আসিয়াছেন। পদাবলী সাহিত্যের আর কোন পদকারের কবিব্যক্তিত্ব তাঁহাদের পদে এত নিবিড় করিয়া প্রতিফলিত হয় নাই, বা অন্য কাহারও কবিকথা জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে এতাবৎকাল পর্যন্ত নানা

---

[১] "চণ্ডীদাস কবিতাপস। এত অনাবরণ, অনির্বাণ, আত্মবান কবি আর কে?...... এত শান্ত, সুস্থির, শিশিরবিন্দুর সুকুমারতায় স্নিগ্ধ পদকার আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। চণ্ডীদাসের পদে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ার অমর প্রেমের দীপশিখা।"—শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি'

গল্পকাহিনী 'মিথ্' সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ঢেউ এযুগেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অভিনয়, চলচ্চিত্রে এই সমস্ত কাহিনী নির্বিচারে গৃহীত ও পরিবেষিত হইয়াছে—সাধারণ বাঙালী চণ্ডীদাস-সংক্রান্ত গালগল্পগুলিকে পরম আনন্দে বিশ্বাস করিয়াছে। এমন কি চণ্ডীদাস নামক বিশেষ কবি আজ হারাইয়া গিয়াছেন ; বহুপদ, বহুনাম—একাধিক ভণিতা— সবই চণ্ডীদাস-সঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পদাবলীর চণ্ডীদাসের কবিব্যক্তিত্ব লইয়া যে সংশয়, সন্দেহ ও সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যেও সেরূপ কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। সে যুগে পুঁথিপত্রের বিশুদ্ধি বা ভণিতার যাথার্থ্যের প্রতি লিপিকার বা কীর্তনীয়াদের বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল না, পুঁথির বিশুদ্ধ রক্ষার প্রতিও তাঁহারা উদাসীন ছিলেন। উপরন্তু পদসাহিত্য প্রধানতঃ গীত হইত বলিয়া ইহাতে সহজেই প্রক্ষেপ প্রবেশ করিয়াছে। ভণিতা দেখিয়া সে যুগের রচনার মালিকের সন্ধান করা হয়। ভণিতার বিশৃঙ্খলাও সাধারণ ব্যাপার। কোন পদকর্তার পদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হইলে লোকমুখে তাহার ভাষা যেমন পাল্টাইয়া যাইত, তেমনি ভণিতারও অদল-বদল হইত। একই ভাবের ও ভাষার দুইজন কবি হইলে তো কথাই নাই, অতি সহজেই এইরূপ পরিবর্তন ঘটিত। সঙ্কলকগণ বা কীর্তনীয়ারা বা অল্পপ্রতিভা-শালী কবিরাও, কখনও ইচ্ছা করিয়া, কখনও-বা অজ্ঞাতসারে ভণিতার গোলমাল করিয়া ফেলিতেন, কখনও কোন প্রতিভাহীন কবিযশঃ-প্রার্থী ব্যক্তি জনপ্রিয় ও সুপ্রচারিত কবির ভণিতা দিয়া অমরত্বের সুলভতম পন্থা অবলম্বন করিতেন। ফলে বৈষ্ণব পদাবলীর কবিপরিচয় গ্রহণ একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ॥

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, পুরীধামে মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইলে স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দ তাঁহাকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদ গান করিয়া, 'গীতগোবিন্দ', 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' (লীলাশুক) ও রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ-বল্লভ' প্রভৃতি নাটক-কাব্যের অংশবিশেষ পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর ভাবোন্মত্ত

চিত্তে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করিতেন। কখনও কখনও মহাপ্রভুও গানে যোগ দিতেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র সেই উল্লেখগুলির কয়েকটি উদ্ধৃত হইতেছে :

(ক) চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ (মধ্য।২য়)

(খ) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥ (মধ্য। ১০ম)

(গ) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥ (অন্ত্য।১৭শ)

(ঘ) ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি গীতগোবিন্দের গীতি
শুনি প্রভুর জুড়াইল কান ॥ (মধ্য।১৭শ)

(ঙ) কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোকগীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥

উল্লিখিত 'ঘ' ও 'ঙ' উল্লেখদ্বয়ে গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির নাম থাকিলেও চণ্ডীদাসের কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহার পূর্বে বা পরে কোন কোন গ্রন্থে ও পদে চণ্ডীদাসের পদ ও কীর্তনের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে :

১। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥

২। নরহরি সরকারের চণ্ডীদাস বন্দনা—

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় পণ্ডিত সকল গুণে।
শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাস
যে রচিল বিবিধ মতে।
কবিবর চারু- নিরূপম মহী
ব্যাপিল যাঁহার গীতে ॥

৩। 'নরোত্তমবিলাস'—

জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে ॥

৪। পদকর্তা প্রসাদদাসের (পরসাদ দাস) চণ্ডীদাস বন্দনা—

দ্বিজকুলসুত রসময় চিত
জয় জয় চণ্ডীদাস।
মধুর মধুর শব্দে গাইলা
যুগলরসের ভাষ ॥
কিবা অপরূপ কবিতা মাধুরী
আখর পিরীতিমাখা।
অমিয়া জানিয়া দিলা বিতরিয়া
অনূপ বচন ভাখা ॥
বরজ যুগল পিরীতির খনি
সে মুখ শারদশশী।
কবিতা পঠনে হেন লয় মনে
চিত যায় যেন খসি ॥
বাশুলী আদেশে যুগল পিরীতি
গাইল যে কবিচন্দ।
রস কবিকুল মত্ত মধুকর
পীয়ে ঘন মকরন্দ ॥

৫। দীন গোবিন্দদাসের পদ—

চণ্ডীদাস চরণ- রজ চিন্তামণিগণ
শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে হীন অকিঞ্চনে
করুণা করি পূরব আশা ॥

৬। কানুদাসের পদ—

কবিকুলে রবি চণ্ডীদাস কবি
ভাবুকে ভাবুকমণি।
রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক
সাধকে সাধক গণি ॥
উজ্জ্বল কবিত্ব ভাষার লালিত্য
ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে
উভয় অধীন যেন ॥

সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল
প্রসাদগুণেতে ভরা।
যেই পশে কানে সেই লাগে প্রাণে
শুনামাত্র আত্মহারা॥
রামতারা ধনী রাধা স্বরূপিণী
ইষ্ট বস্তু যাঁর হয়।
যাঁহার দরশে চণ্ডী রসে ভাসে
কবিতার স্রোত বয়।

৭। নরহরির (চক্রবর্ত্তী) পদ—

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যাক যশ রসায়ন
গাওত জগত জনে।
নান্নুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে
বাশুলী প্রসন্ন হৈয়া।
রাইকানু দুহুঁ নওল চরিত
কহয়ে নিকটে গিয়া॥
শুনি ভাবে মনে জানি পুন দেবী
কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা ধুবনী দরশে
ফুরিতে বিবিধ মতে॥

৮। নরহরির আর একটি পদ—

বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পূজিত
যুগল পিরীতি দাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি
কি দিয়া গড়িল ধাতা॥

* * * *

শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাসযে,
বর্ণিল বিবিধ মতে॥
শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপপতি
শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া।
যার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ লৈয়া॥

* * *

চণ্ডীদাস পদে   যার রতি সেই
পিরীতি পরম জানে।
পিরীতি বিহীন·   জন ধিক রহু
দাস নরহরি ভণে ।।[১]

৯। বৈষ্ণবদাসের পদ—

জয় জয়দেব কবি   নৃপতি শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস   রসশেখর অখিল
ভুবনে অনুপাম।।
যাকর রচিত   মধুর রস নিরমল
গদ্যপদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র   আস্বাদিল
রায়স্বরূপ সহিত।

এই সমস্ত পদ ছাড়াও বৈষ্ণব সহজিয়া মতের পুস্তক-পুস্তিকায় চণ্ডীদাস ও রামী রামতারা-তারাধুবনী সংক্রান্ত অনেক গল্প কাহিনী পাওয়া যাইতেছে। পরে এবিষয়ে আমরা আলোচনা করিব।

আধুনিক যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালী বৈষ্ণব-সাহিত্যের সম্পূর্ণ রস ও আনন্দের সংবাদ পাইয়াছে মুখ্যতঃ চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে। ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের জীবনচরিত সংগ্রহে তৎপর হইলেও বৈষ্ণবপদাবলী ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। ১৮৫৮ সালের বৈশাখমাসের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'ই বোধহয় চণ্ডীদাসের কবিত্ব সম্পর্কে প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না, কাজেই ইহা সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচিত হওয়াই সম্ভব। রাজেন্দ্র-লাল বৈষ্ণববংশের সন্তান, তাঁহার পিতামহ ও পিতা বৈষ্ণব পদ রচনা করিতেন। কাজেই রাজেন্দ্রলালের পক্ষে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা দুরূহ হয় নাই। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'কবিচরিতে' চণ্ডীদাসের নাম ও পদ উল্লিখিত হইয়াছিল। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত

১ এই পদগুলিতে চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনীরূপে তারা, রামতারা এই দুইটি নাম পাওয়া হইতেছে, এবং এই তারা-রামতারা যে রজককন্যা তাহাও বুঝা যাইতেছে।

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাসে'ও চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। ১৮৭২ সালে জগদ্বন্ধু ভদ্র কলিকাতা হইতে 'মহাজনপদাবলী' (১ম খণ্ড) প্রকাশ করেন। ইহাতে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিতার বিচারবিশ্লেষণ ও বিদ্যাপতির অনেক পদের সঙ্কলন থাকিলেও চণ্ডীদাসের পৃথক কোন সঙ্কলন ছিল না। ভূমিকাতে তিনি বলেন যে, পদাবলী ছাড়াও 'কৃষ্ণকীর্তন' নামে চণ্ডীদাসের আর একখানি গ্রন্থ ছিল।[৩]

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৭৩)। ক্রমে ক্রমে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর চিত্ত আকৃষ্ট হইল। ১২৮৫ সালে (১৮৭৮ খ্রীঃ অঃ) অক্ষয়চন্দ্র সরকারের চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র হইতে তাঁহার ও সারদাচরণ মিত্রের সম্পাদনায় চণ্ডীদাসের পদাবলী ('প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'—প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হইল। ইহা প্রকাশিত হইলে শিক্ষিত বাঙালী বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হইয়া পড়িল। উক্ত সংগ্রহে অক্ষয়চন্দ্র চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি রাগাত্মিকা পদও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইহার পরে উল্লেখ করিতে হয় রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী'। ১৮৮৫ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ মুদ্রাযন্ত্র হইতে এই সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকা শ্রীশচন্দ্র লিখিত, কিন্তু পদবিন্যাস ও পাঠান্তর-উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ কৃত। ইহাতে চণ্ডীদাসের মোট ১৪টি পদ গৃহীত হইয়াছে। যুবক রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের কোন্ পদগুলি নির্বাচিত করিয়াছিলেন তাহা

৩ জগদ্বন্ধু ভদ্রের এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের পালা কাহিনীর আবিষ্কারক ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ উক্ত কাব্যখানিকে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বলিয়া মনে করিয়া উহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। বিদ্বদ্বল্লভের মন্তব্য—"দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস বিরচিত 'কৃষ্ণ-কীর্তন'-এর অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এতদিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা আলোচ্য পুঁথিই 'কৃষ্ণকীর্তন' এবং সেইহেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দেশ করা হইল।"—ভূমিকা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কিন্তু বিদ্বদ্বল্লভের এই নূতন নামকরণ যে গ্রহণযোগ্য নহে তাহা আমরা 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' প্রথমখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গে সবিস্তারে দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নহে।

জানিতে পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। তাই এখানে এই ১৪টি পদের প্রথম পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে:—

(১) এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে, (২) কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান, (৩) দেখিলে কলঙ্কিনীর মুখ কলঙ্ক হইবে, (৪) পিরীতি পিরীতি সব জন কহে পিরীতি সহজ কথা (রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংগ্রহ), (৫) পিরীতি বিষম কাল, (৬) বঁধু কি আর বলিব আমি, (৭) বিবিধ কুসুম যতনে, (৮) রমণীমোহন বিলসিতে মন, (৯) রমণীব মণি পেখলুঁ আপনি, (১০) রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা, (১১) শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি, (১২) সজনি ও ধনি কে কহ বটে, (১৩) সখি কহবি কানুর পায়, (১৪) নিত্যই নূতন পিরীতি দুজন।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ 'পদরত্নাবলীতে' চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত একটিও রাগাত্মিকা পদ গ্রহণ করেন নাই। হয়তো সহজিয়া মতের পরিপোষক পদগুলিকে তিনি পদাবলীর চণ্ডীদাসের বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইহার পরে দীনেশচন্দ্রই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬) চণ্ডীদাস সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়া অধ্যাত্মরসের প্রেমিক কবি রামী রজকিনীর বঁধু ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাসের পদ ও জীবনী পর্যালোচনা করেন। মূলতঃ তাঁহার এই গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিশ-শতকের গোড়ার দিকে শিক্ষিত-কাব্যরসপিপাসু ও প্রাচীন-সাহিত্যামোদী পাঠকসমাজে চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং রামীচণ্ডীদাস-ঘটিত কাহিনী পল্লবিত আকারে বিস্তার লাভ করে।

চণ্ডীদাস-সমস্যার উৎপত্তি ॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা অল্পস্বল্প কৌতূহলী, তাঁহারা নিশ্চয় চণ্ডীদাস-সমস্যা নামক একটি উৎকট সাহিত্যিক প্রহেলিকা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত আছেন। এই সমস্যার উৎপত্তি হইয়াছে মাত্র চল্লিশ বৎসর পূর্বে। তাহার পূর্বে শিক্ষিত বাঙালী চণ্ডীদাসের পদে মুগ্ধ হইলেও চণ্ডীদাস এক, না একাধিক—তাহা লইয়া কোন পাঠক বা গবেষকের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ উত্থিত হয় নাই। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণ (১৮৯৬) প্রকাশের পরেও পাঠকগণ চণ্ডীদাসকে এক ও অভিন্ন বলিয়া

জানিতেন। রামী রজকিনীর সঙ্গে পিরীতিতন্ত্রের সাধক নান্নুর গ্রামের (বীরভূম) অধিবাসী চণ্ডীদাস পূর্ব-চৈতন্যযুগে আবির্ভূত হইয়া চৈতন্যের আগমনী রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে গঙ্গাতীরে বিদ্যাপতি-কবিরঞ্জনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, দুইজনেই পিরীতিতন্ত্রের গূঢ়রহস্য আলাপ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন,—এইরূপ নানা গল্পকাহিনী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বেশ জনপ্রিয় ছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে'র প্রথম সংস্করণে (১৮৭৩) চণ্ডীদাস-রামীঘটিত কাহিনীর কোন উল্লেখ না করিলেও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে (বোধহয় দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের প্রভাবে) চণ্ডীদাসের রামী-প্রেমসাধনার উল্লেখ দেখা যায়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারও চণ্ডীদাসের পদ-সঙ্কলনের শেষভাগে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত রাগাত্মিকা পদ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন।

১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম হইতে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক (ইহার প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ') এক বৃহৎ পালাগানের পুঁথি আবিষ্কার করেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে ইহা তাঁহার সম্পাদনে ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা সহ সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইলে প্রাচীন-সাহিত্যরসিক সমাজে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হইল। প্রকাশিত কাব্যের ভাব, ভাষা—কিছুই যে পরিচিত চণ্ডীদাসের সঙ্গে মিলিতেছে না। তাহা হইলে ইহা কি জাল গ্রন্থ? চণ্ডীদাস কি দুইজন? একজন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস, আর একজন পদাবলীর চণ্ডীদাস? এইভাবে দুই পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হইয়া গেল।

অবশ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার ও সম্পাদনার পূর্বেই ছোট আকারে চণ্ডীদাস-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সঙ্গে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং নানা স্থান হইতে চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রহ করিতেছিলেন, তাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চণ্ডীদাসের পদের প্রামাণিকতা ও ভণিতার সততা সম্বন্ধে কিছু কিছু সংশয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কারণ, তাঁহাদের সংগৃহীত চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত বহুপদে চণ্ডীদাসের সুর ধরা পড়ে নাই। বলিতে কি এইরূপ অসংখ্য পদে শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতাটুকু ছাড়া চণ্ডীদাসের আর কিছুই ছিল না। সুতরাং বৈষ্ণব গবেষকগণ এবিষয়ে সংশয়ান্বিত হইবেন, ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

আবিষ্কারের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই চণ্ডীদাসের পদাবলী-সংগ্রাহক ও গবেষকদের মধ্যে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বেশ কিছু সংশয় উদিত হইয়াছিল।

অক্ষয়চন্দ্রের পর রমণীমোহন মল্লিকের 'চণ্ডীদাস' (১৮৯৩) সঙ্কলনের প্রথম সংস্করণে ৩০১টি পদ এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ৩৪০টি পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। রমণীমোহন এই সঙ্কলনে ৫১টি রাগাত্মিকা পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহার পরে বাংলা ১৩১২ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদলহরী'তে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ৩৩৮টি পদ গৃহীত হইয়াছিল। তাহার পরে নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সর্বাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৩২১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে নীলরতনের সম্পাদনায় এই পদাবলী (৮৩৮টি পদের সঙ্কলন) প্রকাশিত হইলে লোকে চণ্ডীদাসের বহু নূতন পদের পরিচয় লাভ করিল। এই সঙ্কলন প্রকাশের ষোল বৎসর পূর্বে তিনি ১৩০৫ সালের দিকে নান্নুর গ্রাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণের নিকট চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত রাসলীলার ৭১টি পদ পাইয়াছিলেন। ১৩০৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ঐ পদগুলি 'চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী' নামীয় এক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইলে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন কোন পাঠকের মনে সামান্য একটু সংশয়ের মেঘোদয় হইল। ইতিপূর্বে চণ্ডীদাসের কোন পালাগানের পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, ভাবসম্মেলন প্রভৃতি পর্যায়ের নানা পদ প্রাচীন সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র, জগদ্বন্ধু ভদ্র, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই 'পদকল্পতরু', 'পদামৃতসমুদ্র', 'কীর্তনানন্দ' প্রভৃতি পুরাতন সঙ্কলনগ্রন্থ হইতেই চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত (দ্বিজ, বড়ু) পদ বাছিয়া লইয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলরতন মুখোপাধ্যায় ১৩০৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত রাসলীলার পুঁথিটি প্রকাশ করিলে বুঝা গেল যে, চণ্ডীদাস শুধু বিচ্ছিন্নভাবেই পদ রচনা করেন নাই, পালাও রচনা করিয়াছিলেন। নীলরতন বাবুও অনুমান করিলেন যে, অনুসন্ধান করিলে গ্রামাঞ্চল হইতে চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত অন্যান্য পালা আবিষ্কারও কিছু অসম্ভব নহে। এই রাসলীলার পালা মুদ্রণের পরে দুইটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। একটি—পদাবলীর চণ্ডীদাস পালাবদ্ধ রাধাকৃষ্ণলীলা রচনা করিয়াছিলেন, আর একটি—রাসলীলার পদগুলির ভাব-ভাষা পদাবলীর চণ্ডীদাসের প্রাণগলানো সুরের অনুরূপ নহে। এই পদ-

গুলির রচনা অত্যন্ত অপরিপক্ক, ভাষাও অতিশয় দুর্বল। তাই সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত এই পদগুলি পড়িয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চণ্ডীদাসের ভক্তপাঠকদের কাহারও কাহারও মনে উক্ত পদগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় জাগিয়াছিল। অতঃপর ঐ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নীলরতনবাবুর রাসলীলার পদের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া 'চণ্ডীদাসের চতুর্দশ পদাবলী' নামে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত আরও চৌদ্দটি পদ প্রকাশ করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করিলেন। তিনি এই চৌদ্দটি পদযুক্ত পুঁথি বিষ্ণুপুর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।) এই পুঁথিটিতে চণ্ডীদাস-রামীঘটিত কাহিনী এবং সহজিয়া মতের পিরীতিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছিল,—অর্থাৎ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বহু-প্রচলিত গল্প, 'ধোবিনী আবেশে' চণ্ডীদাসের সহজিয়া পিরীতি সাধন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক তাঁহাকে জাতে তুলিবার ব্যবস্থা—ইত্যাদি, ইত্যাদি। নীলরতন মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাসের আরও দুইখানি পুঁথিতে সহজিয়া চণ্ডীদাসের কাহিনী পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানি পুঁথিতে ১০০৯ সন ২রা বৈশাখ, অর্থাৎ ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ রহিয়াছে।[৪]

(১৩২১ সালের দিকে যখন নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীদাস পদাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে মুদ্রিত হইতেছিল, তখন চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত আবার দুইখানি পালাগানের পুঁথি আবিষ্কৃত হইল এবং ১৩২১ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় উহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইল। ইহার সামান্য কিছু পূর্বে ১৩২০ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ২য় সংখ্যায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ' নামক একটি প্রবন্ধে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সর্বপ্রথম স্পষ্ট ভাষায় সংশয় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদ এক চণ্ডীদাসের রচিত নহে।) এই প্রসঙ্গে তিনি ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত 'পদকল্পতরু'র ৫ম খণ্ডে লিখিয়াছিলেন :

> "চণ্ডীদাস ভণিতার সকল পদই কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচিত নহে। বড়ু চণ্ডীদাসের নিঃসন্দিগ্ধ রচনার আদর্শ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সে পর্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায়, আমরা

---

৪ উক্ত পুঁথিটির পুষ্পিকা এই রূপ :

"ইতি শ্রীচণ্ডীদাসস্য চতুর্দশপদাবলী সমাপ্তং। লেখক শ্রীগণেশরাম শর্মণঃ সাং কুতুলপুর। পঠনার্থ শ্রীদৈবকী নন্দন ঠাকুর মহাশঅ। ইতি ১০০৯। তারিখ ২ বৈশাখ। বেলা ৪ দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল।"

কেহই তখন মনে করিতে পারি নাই যে, চণ্ডীদাস ভণিতায় সর্বোৎকৃষ্ট পদাবলীর ভাষা ও ভাবের মধ্যেও এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে সেগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং মহাকবি চণ্ডীদাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য অপকৃষ্ট পদগুলি দেখিয়া তখন কেবল ইহাই অনুমান হইয়াছে যে, হয়ত গায়ক বা লিপিকারগণ অন্যের রচিত কতকগুলি অপকৃষ্টপদ চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন, এবং সম্পাদকদিগের অনবধানতাহেতু অপকৃষ্ট ও রসবিরুদ্ধ পদগুলি চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আমাদিগের উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের অল্প পরেই স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় চণ্ডীদাসের রচিত "শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড"* নামক পুঁথির সম্বন্ধে পরিষৎ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, উহা কোন মতেই পদাবলীর রচয়িতা কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই সময় হইতেই একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার্য হইয়া পড়ে।" (পদকল্পতরু—৫ম খণ্ড)

(১৩২১ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১ম সংখ্যা) ব্যোমকেশ মুস্তফী চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত 'জন্মলীলা'র* পদগুলি প্রকাশ করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ইতিপূর্বে চট্টগ্রামের মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় 'রাধার কলঙ্কভঞ্জন' নামক চণ্ডীদাসের আর একটি পালাগান আবিষ্কার করিয়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ১৩২১ বঙ্গাব্দের মধ্যে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত রাধাকৃষ্ণের পালাবিষয়ক তিনখানি পুঁথি মিলিল: জন্মলীলা, রাসলীলা ও রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন।)

ইহার সামান্য পূর্বে ১৩২০ সালেই সতীশচন্দ্র রায় পদাবলীর চণ্ডীদাস যে একাধিক, এরূপ একটি সংশয় তুলিয়াছিলেন। তাহারও কিছু পূর্বে ১৩১৮ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ২য় সংখ্যায় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আবিষ্কৃত বিরাট পুঁথি অবলম্বনে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যবিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল—লেখক উক্ত পুঁথির আবিষ্কারক স্বয়ং বসন্তরঞ্জন। ইতিমধ্যে ১৩২১ সালে নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের বিরাট পদাবলীতে প্রায় নয়শত পদ প্রকাশিত হইল। অতঃপর পাঠকগণ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে হতচকিত হইয়া পড়িলেন। চণ্ডীদাসের এত পদ ও নানা পালাগান আবিষ্কৃত হওয়ার পর পাঠকগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, সত্যই কি একাধিক

* প্রকৃত নাম—'জন্মলীলা'।

চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন ?) ১৩২৩ সালের মধ্যে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত এতগুলি পালাগান ও বিচ্ছিন্ন পদ উপস্থিত হইল :

১। রাসলীলা (১৩০৫ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত)

২। চণ্ডীদাসের চতুর্দশ পদাবলী (১৩০৫ সালের সা. প. প.)

৩। জন্মলীলা (১৩২১ সালের সা. প. প.)

৪। রাধার কলঙ্কভঞ্জন (১৩২১ সালের সা. প. প.)

৫। নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী (১৩২১)

৬। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (১৩২৩)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হইবার প্রায় বারো বৎসর পরে মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা হইতে দীন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত রাধাকৃষ্ণলীলার বিরাট পালাগানের দুইখানি পুঁথিতে কিছু কিছু পদ আবিষ্কার করিলেন এবং তাহা ১৩৩৩ ও ৩৪ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।) অতঃপর চণ্ডীদাসকে লইয়া সাহিত্যিক কাজিয়া খুব জমিয়া উঠিল।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ১৩০৫ সালে নীলরতন মুখোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যখন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত রাসলীলার পুঁথি প্রকাশ করেন, তখন চণ্ডীদাস কয় জন, তাহা লইয়া তাঁহার মনেও প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি নানাস্থান ঘুরিয়া চণ্ডীদাসের প্রায় ছয়শত নূতন পদ সংগ্রহ করেন। ইহাতে তাঁহার মনে এই সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। ১৩২১ সালে যখন তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত আট শতেরও অধিক পদ স্থান পাইল, তখন এতগুলি পদ একই চণ্ডীদাসের রচিত কিনা, সে বিষয়ে তিনি খুব গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি উক্ত সঙ্কলনের ভূমিকায় এই সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন, "একটা কথা উঠিয়াছে যে, চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই যে পদটা চণ্ডীদাসের হইল, ইহা বিবেচনা করা অন্যায়। এমন লোক অনেক ছিল, যাহারা নিজের রচিত পদ চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া চালাইয়া দিয়াছে। কথাগুলি যে সত্য, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।" অর্থাৎ নীলরতনবাবুর মতে পদাবলীর চণ্ডীদাস এক এবং অদ্বিতীয়। তবে কবিযশঃপ্রার্থীরা নিজের রচিত পদ চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া চালাইয়া দিয়াছে।

প্রায় একই সময়ে ব্যোমকেশ মুস্তফী 'জন্মলীলা'র পদ প্রকাশ করিয়া

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "আমি যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহাতে এখানিকে ('জন্মলীলা') সে চণ্ডীদাসের রচনা বলিতে একটুকুও সাহস হয় না।" তাঁহার মতে চণ্ডীদাস একজন নহেন—একাধিক, "চণ্ডীদাসের সুবিখ্যাত পদাবলী ব্যতীত চণ্ডীদাসের নামে ইতিপূর্বে আরও দুইখানি কাব্যের কথা সাধারণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। একখানির পরিচয় দিয়াছেন মুন্সী আবদুল করিম। সে গ্রন্থখানির নাম রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন।...যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পদাবলীর চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্জনের চণ্ডীদাস ও জন্মলীলার চণ্ডীদাসকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই ধরিয়া রাখা উচিত। বাংলা সাহিত্যে একদিন চণ্ডীদাস নামের কবির জোড়া ছিল না, এই কয়বৎসরের মধ্যে একেবারে দেড়জোড়া অর্থাৎ তিনজন অথবা দুইজোড়া অর্থাৎ চারিজন চণ্ডীদাস পাওয়া গেল" (সা-প-প-১৩২১)। মুস্তফী মহাশয়ের মতানুসারে মূল পদাবলীর চণ্ডীদাস, জন্মলীলার চণ্ডীদাস, রাসলীলা ও কলঙ্কভঞ্জনের চণ্ডীদাস —প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র কবি, পৃথক চণ্ডীদাস। ব্যোমকেশবাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাসকে এই তালিকা হইতে বাদ দিলেন কেন, বুঝা যাইতেছে না। তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হইলেও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার মারফতে এই কবির পরিচয় ১৩১৮ সালেই সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। বড়ু চণ্ডীদাসকে ধরিলে মুস্তফী মহাশয়ের মতে চণ্ডীদাস-খ্যাতির দাবিদার দাঁড়াইলেন পাঁচজন।

১৩২৩ সনে বসন্তরঞ্জনের সম্পাদনায় বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হইলে চণ্ডীদাসকে লইয়া তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হইয়া গেল। উক্ত কাব্যের গোড়াতেই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর একটা ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থ-আবিষ্কারক পণ্ডিত প্রবর বসন্তরঞ্জনকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে চণ্ডীদাস সম্পর্কে সংশয় উদিত হইয়াছিল। "তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন?"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাভঙ্গিমা, রুচি ও রসের ধারার সঙ্গে পদাবলীর চণ্ডীদাসের 'আসমান-জমিন ফারাক'। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ ইহার ভাষা ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বাশুলী-সেবক কোন-এক বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত—ইহাতে পূর্ব-চৈতন্যযুগের আদর্শ ও ধারা অনুসৃত হইয়াছে। ইহার লিপি, ভাষা, কাগজ, সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণব তোষণীতে'-

'কাব্য' শব্দের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত 'শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ড বিবিধ প্রকার' ইত্যাদির প্রমাণে বড়ু চণ্ডীদাসকে পূর্বচৈতন্যযুগে স্থাপন করা হইয়াছে। চৈতন্যদেব এই কাব্যের রস আস্বাদন করিতেন কিনা, স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর দিব্যোন্মত্ত অবস্থায় বিলাপের সময় বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাচন্দ্রাবলী ও কাহ্নাঞিঁর রঙ্গঢামালির গান গাহিয়া মহাপ্রভুর বিরহাতুর চিত্তে সান্ত্বনা দিতেন কিনা, তাহা লইয়া অনেক দিন ধরিয়া তর্ক চলিতেছে) এবং সম্ভবতঃ আরও অনেক দিন চলিবে।

(বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য চৈতন্যদেব আস্বাদন করুন আর নাই করুন, ইহা যে চৈতন্য-পূর্বযুগের কাব্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উদ্ধৃত দুইটি পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীর দুইটি পদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া দীনেশচন্দ্র অনুমান করিয়াছিলেন যে, চণ্ডীদাস এক। তবে প্রথম যৌবনে তিনি (যৌবনচাঞ্চল্য বশতঃ?) এই আদিরসের কাব্য লিখিয়াছিলেন, পরে বুদ্ধিবিবেচনা পরিপক্কতা লাভ করিলে আধ্যাত্মিক রসের সংমিশ্রণে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য, "কৃষ্ণকীর্তনের আগেও জানা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাসের নাম অনন্ত, তিনি 'বড়ু' উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং বাশুলী দেবীর আজ্ঞায় পদ রচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদেই বহু পূর্বে তাঁহার অনন্ত নাম পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার বড়ু উপাধি ও বাশুলীর আদেশ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের সকলেই অবশ্য জ্ঞাত আছেন। সুতরাং কবি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই।" ঠিক এই একই কথা দীনেশচন্দ্রের পূর্বেই রামেন্দ্রসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকায় বলিয়াছিলেন), "চণ্ডীদাস কি দুইজন ছিলেন? দুই জনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু? তাহা তো হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন, বাঙলা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে।···আমার মতে—কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস তাহা অস্বীকারের হেতু নাই, সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল। সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে একালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।"

(দীনেশচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের যেখানে কিছুমাত্র সংশয়ের হেতু ছিল না, পরবর্তী কালে তাহাতেই প্রচণ্ড সংশয় দেখা গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশের পর কেহ কেহ ইহার স্থূল রুচির জন্য এই কাব্য ধৈর্য ধরিয়া পড়িতেই পারিতেন না। কেহ বলিলেন, ইহাই আদি অকৃত্রিম চণ্ডীদাসের রচনা, চণ্ডীদাসের তথাকথিত পদাবলী ঝুঠামাল। নিতান্তই যদি পদাবলীর চণ্ডীদাসকে কোথাও ঠাঁই দিতে হয়, তবে তাঁহাকে চৈতন্যের পরবর্তী যুগে স্থাপন করিতে হইবে। চৈতন্যদেব যে-চণ্ডীদাসের গীতি আস্বাদন করিতেন, তিনি বড়ু চণ্ডীদাস—দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদি বিবিধ পালার সমন্বয়ে গঠিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা। সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষণী'র টীকা হইতেও তাহাই মনে হইতেছে।) অতঃপর বেশ কিছুকাল কৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও চণ্ডীদাস সমস্যা সাহিত্যের মজলিস উত্তপ্ত করিয়া রাখিতে না রাখিতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা হইতে মণীন্দ্রমোহন বসু দীনচণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালাগানের পুঁথির ভগ্নাংশ আবিষ্কার করিলেন—চণ্ডীদাস-সমস্যা নূতন পথে বাঁক ফিরিল।

(মণীন্দ্রমোহন দুই যুধ্যমান দলের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের এক অভিনব উপাদান পাইয়া গেলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় দুইখানি এবং দীনেশচন্দ্রের নিকট রক্ষিত একখানি পুঁথিতে উল্লিখিত চণ্ডীদাসের পদ ও ভণিতা বিচার করিয়া চণ্ডীদাস সমস্যায় নূতন আলোকপাতের চেষ্টা করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, পদাবলীর চণ্ডীদাস 'বড়ু' বা 'দ্বিজ' নহেন—আসলে ইনি হইতেছেন 'দীন চণ্ডীদাস'। এই দীন চণ্ডীদাস কৃষ্ণের পুরাণাশ্রয়ী লীলা অবলম্বনে এক বিরাট পালাগানের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই পদের সংখ্যা অন্যূন দুই হাজার। ইঁহার উৎকৃষ্ট পদগুলিই 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি পরবর্তী কালের পদসঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছিল, সেইগুলিই জনপ্রিয়তা ও প্রচারলাভ করিয়াছে,) বাঙালী কীর্তনীয়ার কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিয়াছে; রুচি ও আদর্শের নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও আজও এই পদগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হইয়াছে। (বাকি পদগুলি কবিত্বশক্তিতে তত উৎকৃষ্ট নহে বলিয়া সঙ্কলনে স্থান পায় নাই, এবং কালক্রমে লোকস্মৃতি হইতে অপসৃত হইয়াছে।) ইহাই মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের অভিমতের মোটামুটি পরিচয়। অর্থাৎ

(তাঁহার মতে পদাবলীর চণ্ডীদাসই দীন চণ্ডীদাস। ইনি চৈতন্যের পরবর্তী যুগে ১৬শ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন। এই কবি বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করেন নাই, কৃষ্ণলীলার পুরা পালাই পদাবলীর আকারে রচনা করিয়াছিলেন।) ইতিপূর্বে সেই সমস্ত পালার দুই এক টুকরা নীলরতন বাবু ('রাসলীলা'), মুন্সী আবদুল করিম ('রাধার কলঙ্কভঞ্জন'), ব্যোমকেশ মুস্তফী ('জন্মলীলা') সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের সঙ্গে ইহাদের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া না পাইয়া চণ্ডীদাস সমস্যা লইয়া বৃথাই মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছিলেন। দীন চণ্ডীদাস ভালোভাবেই পুরাণ অধিগত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকথাকেন্দ্রিক সংস্কৃত পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া, কিছুটা বাঙলার নিজস্ব সংস্কারের সাহায্য লইয়া রাধাকৃষ্ণলীলাকে নানা পালায় সাজাইয়া তিনি পূর্বাপর ধারাবাহিকতাযুক্ত একটা বড় কাহিনীতে গাঁথিয়াছিলেন, এবং রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক আদর্শ এবং স্বয়ং মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব গোস্বামিগণ-প্রবর্তিত রাগানুগাসাধনা ও মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার অপার্থিব লীলা-লাবণ্য অঙ্কন করিয়াছিলেন। (চৈতন্যদেব তাঁহার গীতিরস আস্বাদন করিতেন না, কারণ ইনি উত্তর-চৈতন্যযুগের কবি; মহাপ্রভু বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রসই উপভোগ করিতেন। পদাবলীর দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে বিরাট পদাবলী রচনা করেন, তাহারই কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ পরবর্তী কালে সারা বাঙলাদেশেই সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল।) অতঃপর মণীন্দ্রমোহনের মতে, "দুর্বোধ্য যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল।" মণীন্দ্রমোহন ও বসন্তরঞ্জন জ্যামিতিক রেখায় চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিলেন। (চণ্ডীদাস মোট দুইজন। একজন চৈতন্যের পূর্বগামী, বাশুলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস, আর একজন পদাবলী ও পালাগানের কবি দীন চণ্ডীদাস—যিনি উত্তর-চৈতন্যযুগের কবি।) এখন দেখা যাক এইভাবে চণ্ডীদাস-সমস্যার স্বরূপটি কিরূপ আকার ধারণ করিল।

চণ্ডীদাস-সমস্যার স্বরূপ ॥

ইতিপূর্বে আমরা যে যৎসামান্য ইঙ্গিত দিয়াছি তাহাতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে—(চণ্ডীদাস-সমস্যার গ্রন্থিমোচন সহজসাধ্য নহে। বড়ু চণ্ডীদাসের

কবিব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিধার অবকাশ অল্প।) ইতিপূর্বে[৫] আমরা প্রাপ্ত উপকরণের সাহায্যে দেখিয়াছি যে, (বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্বে আবির্ভূত হইয়া ভাগবত অবলম্বনে প্রচুর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বসহ রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক এক বিরাট আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।) এই লীলার বিন্যাস ও পর্যায় মোটামুটি পুরাণ-অনুসারী; কবি 'গীতগোবিন্দে'র দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থলে স্থানীয় লোকসংস্কারকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। (অলঙ্কার-শাস্ত্র, পৌরাণিক কাহিনী, সংস্কৃত ভাষা ইত্যাদিতে তাঁহার সবিশেষ নিপুণতা ছিল।) অবশ্য তাঁহার রুচি আধুনিক কালের পাঠকের প্রীতিকর হইবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা পদাবলীর চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের ভাবরসে অভিষিক্ত, তাঁহারা এই কাব্যে জুগুপ্সা ও রসাভাস লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ণ হইবেন। সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষণী'র টীকায় "শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ" উক্তিতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডকে নির্দেশ করা হইয়াছে কিনা সুদৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে তাহা বলা যায় না। চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের এই আখ্যানকাব্য আস্বাদন করিতেন, অথবা করিতেন না, তাহাও জোর করিয়া বলা মুশকিল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের কিছু কিছু পদে প্রাণঢালা বেদনার সুর যে নাই, তাহা নহে; সে সমস্ত পদে চৈতন্যদেবের বিরহতাপিত চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারিত। কিন্তু কাব্যপরিকল্পনায় কৃষ্ণচরিত্রাঙ্কনে এবং বৃন্দাবনখণ্ডের পূর্ববর্তী খণ্ডসমূহে কাহ্ন ও রাধাচন্দ্রাবলীর ব্যবহার, উক্তি ও আচরণে সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই, অলঙ্কারশাস্ত্রমতে এই সমস্ত বর্ণনার অনেক স্থলেই রসের ব্যতিক্রম হইয়াছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যাইতেছে যে, রসাভাসযুক্ত কাব্য শুনিলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। এইজন্য মহাপ্রভুকে কোন রচনা শুনাইবার পূর্বে স্বরূপ-দামোদর তাহা পাঠ করিয়া দেখিতেন, তাহাতে কোনও প্রকার রসের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে কিনা।

[৫] লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' প্রথম খণ্ডে বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কে নানা তথ্য আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত প্রণীত 'জাল বই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রামাণিকতার বিরোধী একখানি পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়াছি। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতামত আলোচনা করিব।

চৈতন্যদেবের মনোভাব বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত রাধার প্রতি কৃষ্ণের বলপ্রকাশ এবং স্থূল দেহাসক্তির অমার্জিত বর্ণনায় মহাপ্রভুর বিরহলীন চিত্তের প্রদাহ বাড়িত বই কমিত না। বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা ও বাক্‌রীতির মধ্যে একটা বলিষ্ঠ, স্থূল ও অমার্জিত স্বাভাবিক গ্রাম্যতা আছে, যাহার বিচিত্র রস বিস্ময়কর, শিল্পকৌশলও নিন্দনীয় নহে; কিন্তু ঠিক এই উদ্দাম দেহসম্ভোগ-জনিত অনাবৃত আকাঙ্ক্ষার উত্তপ্ত ফেনোচ্ছ্বাস মহাপ্রভু কতটা সহিতে পারিতেন, তাহাও চিন্তার বিষয়। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, চৈতন্য-দেব ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহের পদগুলি তো আস্বাদন করিতে পারিতেন। কারণ, উহাতে রাধার উক্তিসমূহে আত্মনিবেদন ও ব্যাকুলতার সকরুণ স্পর্শ রহিয়াছে। মহাপ্রভুর বিরহসন্তপ্ত চিত্ত রাধার বিরহবিলাপ হইতে কেন না সান্ত্বনা সংগ্রহ করিবে ?

এ সম্বন্ধে গবেষণা নিষ্ফল। কারণ, চৈতন্যদেব যথার্থতঃ কি করিতেন না করিতেন, চৈতন্যজীবনকাব্য ভিন্ন অন্য কোথাও সে সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই ; চৈতন্যজীবনীকাব্যও নির্ভরযোগ্য বাস্তবজীবনী হিসাবে পুরাপুরি গ্রহণ-যোগ্য নহে। তবু ভাব ও অনুভূতি দেখিয়া বিচার করিলে মনে হয়, চৈতন্য-চরিতামৃতকার বিদ্যাপতি-জয়দেব-লীলাশুকের সঙ্গে যে-চণ্ডীদাসের নাম করিয়াছেন, স্বরূপ ও রায় রামানন্দ যে-চণ্ডীদাসের গান গাহিয়া দিব্যোন্মাদ মহাপ্রভুকে শান্ত করিতে চাহিতেন, তিনি বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, অন্য কোন পদকর্তা হইবেন।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পুরাণাশ্রিত কাহিনী আছে। কৃষ্ণ 'মুগুধা' গোয়ালিনীকে বারবার বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সে আইহনের পত্নী নহে, সে গোলোকের বিষ্ণুর লক্ষ্মী, এবং গোপবালক কৃষ্ণই সেই বিষ্ণু। ইহার প্রেরণার মূলে একরূপ পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাসের প্রবণতা থাকিলেও সমস্ত কাব্যটি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষার উগ্র পরিবেশেই স্থাপিত হইয়াছে। রোমান্টিকতা ইহার মূল সুর, অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা ইহার ফলশ্রুতি নহে—যদিও নানা নীতি, উপদেশ, পুরাণের প্রসঙ্গ, কৃষ্ণের অবতারলীলা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয় তুলিতেছি না। বড়ুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পূর্ব-চৈতন্যযুগের কাব্য তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু চৈতন্যদেব এই কাব্য আস্বাদন করিতেন কিনা তাহাতে আমাদের

ঘোর সংশয় আছে। বস্তুতঃ ইহার সঙ্গে বিদ্যাপতি, জয়দেব, লীলাশুক ও রায় রামানন্দের নাটকের নানাদিক দিয়া বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়াই চৈতন্যদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ নিঃসংশয়ে স্থাপন করা যায় না। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পূর্ব হইতেই বহু পদাবলীতে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। (ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলিকেও প্রামাণিক ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ বড়ু চণ্ডীদাস শুধু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কোনও বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করেন নাই—অন্ততঃ সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।)

ডঃ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর নবতম সংস্করণে পদাবলীর চণ্ডীদাসকে পূর্ব-চৈতন্যযুগে স্থাপন করিয়া বড়ু চণ্ডীদাসকে উত্তর-চৈতন্যযুগের কবি বলিতে চাহিয়াছেন। তিনিও বড়ুকে উত্তর-চৈতন্যযুগের কবি বলিয়া সুপ্রমাণিত করিতে পারেন নাই। তিনি এবিষয়ে যে যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই সন্দেহ আছে। তাই তিনি বলিয়াছেন, "যদি আমার এই যুক্তি গ্রহণীয় বিবেচিত না হয়, তাহা হইলেও বড়ু চণ্ডীদাসকে আমি প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের পরবর্তী কালের লোক বলিব। একজন সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস ছিলেন বলিয়াই দানখণ্ডাদির কবিকে 'বড়ু' এই বৈশিষ্ট্যদ্যোতক বিশেষণ ব্যবহার করিতে হইয়াছে।" ডঃ মজুমদারের যুক্তি গৃহীত না হইলেও তিনি বড়ু চণ্ডীদাসকে পদাবলীর চণ্ডীদাসের পরবর্তী কালের কবি বলিবেন—ইহা জেদের কথা, যুক্তির কথা নহে। কোন কোন প্রচলিত পদে বড়ু ভণিতা আছে দেখিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "এই পদ কয়টি (অর্থাৎ বড়ু ভণিতাযুক্ত পদগুলি) কৃষ্ণকীর্তন রচয়িতার নহে। পরে কেহ লিখিয়া বড়ুর নাম দিয়াছেন।" এখানে তিনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস যে একদা নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না, তাহা অন্যান্য পদকর্তাদের তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া পদরচনা হইতেই বুঝা যাইতেছে। তাঁহার কাব্যও একদা পাঠকসমাজে সুপরিচিত ছিল, তবেই তো কবিযশঃপ্রার্থীরা বড়ু চণ্ডীদাস

ভণিতায় পদ লিখিয়া লোকস্মৃতিতে বাঁচিয়া থাকিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। সে যাহা হোক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস অর্বাচীন নহেন, জাল ব্যক্তিও নহেন। তাঁহাকে কোন যুক্তিক্রমেই চৈতন্য বা উত্তর-চৈতন্যযুগে নামাইয়া আনা যায় না। যদি তাঁহাকে কোনক্রমে উত্তর-চৈতন্যযুগের কবি বলিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ফিরাইয়া লিখিতে হইবে।

বড়ু চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে আর একটা কথা এখানে পরিষ্কার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস একটা বৃহৎ পালাগানের কাব্য লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি কি বিচ্ছিন্নভাবে কোন পদ লিখিয়াছিলেন? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষ খণ্ডটি, যাহা 'রাধাবিরহ' নামে পরিচিত, তাহার অনেক-গুলি পদ বিশুদ্ধ রোমান্টিক লীরিকধর্মী। এই অংশেও একটা কাহিনীর সূত্র আছে, কৃষ্ণ রাধাকে ছাড়িয়া মথুরা চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু রাধার নির্বন্ধাতিশয্যে বড়াই গিয়া কৃষ্ণকে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আনিয়া দিল। রাধা ও কৃষ্ণের পুনর্মিলনের পর রাধা কৃষ্ণের উরুর উপরে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে সেই অবকাশে কৃষ্ণ তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় রাখিয়া পুনরায় মথুরায় চলিয়া গিয়াছিলেন—'রাধাবিরহে' এই কাহিনীটুকু অনুসৃত হইয়াছে। এই অংশে কিন্তু কাহিনীর প্রাধান্য কিছু অল্প, বরং গীতিরসোচ্ছ্বাসই বেশি। এই খণ্ডের যে পদগুলিতে রাধার বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে কিয়দংশে প্রচলিত পদাবলীর স্পর্শ আছে। কিন্তু এই পদগুলি পদাবলীর আকারে বিচ্ছিন্নভাবে চলে নাই, বা কোন সঙ্কলন-গ্রন্থেও গৃহীত হয় নাই। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুইটি পদ 'কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে' এবং 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী' (রাধাবিরহ) পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভণিতায় সঙ্কলন-গ্রন্থে মিলিতেছে। ইহা হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পদই কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া পদাবলীতে পরিণত হইয়া থাকিবে। এ অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই দুইটি পদ ভিন্ন আর কোন পদ পদাবলী-সঙ্কলনে পাওয়া যায় নাই। বড়ু চণ্ডীদাস রাধাবিরহের এই দুইটি পদ অপেক্ষা আরও অনেক উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়াছেন, যেগুলির সুর পরবর্তী কালের পদাবলীকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু এই সমস্ত পদ কোন সঙ্কলন গ্রন্থেই গৃহীত হয় নাই। আর তা'ছাড়া ভাব ও ভাষার বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদে পরিণত হইয়াছে একথা কখনও যুক্তিসঙ্গত মনে হইবে না। অথচ পদসংগ্রহ-গ্রন্থে সঙ্কলিত অনেক পদে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে কি সম্পর্ক?

ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত হইয়া ১৯৩২ সালে সাহিত্য পরিষদ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাঁহারা মূলতঃ বড়ু চণ্ডীদাসকে আদি চণ্ডীদাস ধরিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাবাদর্শের সঙ্গে ঐক্য রাখিয়া উক্ত পদাবলীতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে পৃথক ভাবে বিন্যস্ত করেন এবং এই পদগুলিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের উক্তি: "আমরা এপর্যন্ত দুইজন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। একজন শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস, অন্যজন শ্রীচৈতন্যপরবর্তী দীন চণ্ডীদাস।) একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই দুইজন কবির পদ পৃথক করা যায়। কিন্তু বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন, 'চণ্ডীদাস' এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ চলিতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়া লওয়া একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভাব ও রূপের পরিবর্তনে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, এমন পদেরও অভাব নাই। এই সমস্ত বিষয় আলোচনাপূর্বক আমরা বড়ু-চণ্ডীদাসের পদ যথাসম্ভব পৃথকরূপে চিহ্নিত করিয়াছি।......বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানিকে আমরা প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া মনে করি। এই জন্য চণ্ডীদাস পদাবলীর উপযুক্ত শ্রেণীবিভাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেই কষ্টিপাথররূপে গ্রহণ করিয়াছি।" কেন তাঁহারা এইরূপ অভিনব সিদ্ধান্ত করিলেন সে বিষয়ে বলিয়াছেন, "পরবর্তী ভূমিকায় তাহার কারণ আলোচনা করিব।" দুঃখের বিষয় 'পরবর্তী ভূমিকা' আর প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের বিন্যাস-পদ্ধতির যুক্তিক্রম আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি প্রাচীন ও প্রামাণিক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলিও যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির রচিত, সম্পাদকদ্বয় কিরূপে এ সিদ্ধান্ত করিলেন? শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের দুইটি অপ্রধান পদ বাদ দিলে এই পালার ৪১৫টি পদের আর একটিও পদাবলী সাহিত্যে স্থান পায় নাই। ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু

ভাবাদর্শের প্রাথমিক বিচারেই পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাসকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগ, ভাব-ভাবনা ও আদর্শের কবি বলিয়া মনে হইবে। একদা বড়ু-চণ্ডীদাসের কাব্যও একশ্রেণীর পাঠকের মধ্যে পরিচিত ছিল; কিন্তু চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের ফলে দেশের ও সাহিত্যের রুচি ফিরিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জনরুচি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িলেও বড়ু চণ্ডীদাসের নামের খ্যাতি রহিয়া গেল। কাজেই অল্পশক্তিশালী কোন কবি-চতুর ভণিতায় পদ লিখিয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছিলেন, অথবা কীর্তনীয়ারা ও সঙ্কলকগণ পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাসকে অভিন্ন মনে করিয়া পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভণিতায় ভ্রমক্রমে 'বড়ু' যোগ করিয়া দিয়াছিলেন—এরূপ ভণিতার গোলমাল বৈষ্ণব পদসাহিত্যে এমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নহে। "চণ্ডীদাস এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ চলিতেছে," একথা উক্ত সম্পাদক-দ্বয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম দিকে কয়েকটি পদকে 'বড়ু চণ্ডীদাসের পদ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন এবং পরিশিষ্টে আরও ৬টি পদকে বড়ুর রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে মাত্র ১০টি পদে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতা আছে। এই সঙ্কলনে ধৃত কোন পদকেই যে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলা যায় না, তাহা ডঃ মহম্মদ শহিদুল্লাহ্ সাহেব সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রমাণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আমরা শহিদুল্লাহ্ সাহেবের মতানুবর্তী। আমাদের মতে পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভণিতায় 'বড়ু' উপাধি থাকিলেও তাহাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না, তাহা পরবর্তী কালের অন্য কোন কবির রচনা, বা পদাবলীর চণ্ডীদাসের নামে ভ্রমক্রমে 'বড়ু' উপাধি যুক্ত হইয়া গিয়াছে। ডঃ চট্টো-পাধ্যায় এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এই সঙ্কলনে প্রথমাংশের ১২ সংখ্যক পদের ("জনম গোঁয়ানু দুখে / কত না সহিব বুকে / কার আশে নিশি পোহাইব") ভণিতায় আছে :

বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি অনল হয়
সুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে গেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

এই পদের ভাবভঙ্গী, ভাষা, রূপক-প্রতীক, চিত্রকল্প কখনও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির

রচনা হইতে পারে না। [ডঃ শহিদুল্লাহ্ সাহেব এই ধরণের পদ সমালোচনা করিতে গিয়া ঠিকই বলিয়াছেন, "ইহার ভাব ও ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে সাত্ত্বিক প্রেম আছে, মদনজ্বালা নাই।" অতএব অন্য কোন বিপরীত প্রমাণ না পাইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে স্থির থাকিব যে, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অন্তর্গত দুইটি পদ (ইতিপূর্বে উল্লিখিত) পরবর্তী কালে ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া পদাবলী সাহিত্যে স্থান পাইলেও বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ব্যতীত অন্য কোন বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করেন নাই। সঙ্কলনে ধৃত পদের ভণিতায় যে বড়ু চণ্ডীদাসের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির কোন সম্পর্ক নাই।]

এইবার পদাবলীর চণ্ডীদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে আসা যাক। 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি'তে চণ্ডীদাসের একটা পদও গৃহীত হয় নাই। 'পদামৃত সমুদ্রে' চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা—৯; 'পদকল্পতরু'তে চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১৮। পরবর্তী কালের সঙ্কলনে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ('বড়ু', 'দ্বিজ', 'দীন', 'আদি', 'কবি') আরও অনেক পদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। পরে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় চণ্ডীদাসের ভণিতায় কয়েকটি পালার সঙ্কলনও প্রকাশিত হইয়াছিল। নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলনে চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা প্রায় নয়শত। 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় ৭ম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখক একটি বিচিত্র পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন :

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীতি পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিয্যা।
আদি বিধেয় রস চণ্ডীদাস কিষ্যা॥

ইহার নির্গলিতার্থ—১৩৫৫ শকে (১৪৩৩ খ্রীঃ) চণ্ডীদাসের পদাবলীর রচনা শেষ হইল, এবং এইরূপ পদের সমষ্টি—৯৯৬। এ সমস্ত হেঁয়ালি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। উক্ত পত্রিকার অজ্ঞাতনামা লেখক কোথা হইতে এই 'আর্যাতর্জা' সংগ্রহ করিলেন জানা যায় না। এইরূপ শুভঙ্করী ঢঙের দুইচারি ছত্র অর্বাচীন রচনা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যত্রতত্র মিলিবে। কাজেই এই চারিছত্রকে চণ্ডীদাস আলোচনায় ত্যাগ করা গেল। সে যাহা হোক, ১৩২১ সালে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদের বৃহৎ সঙ্কলন প্রকাশিত হইবার পর

অনেকেই মনে করিতে লাগিলেন যে, চণ্ডীদাসের আরও অনেক পদ হয়তো ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। সেই সন্দেহের নিরসন হইল ১৩৩৩ সালে যখন মণীন্দ্রবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগ হইতে দীন চণ্ডীদাসের পুঁথি আবিষ্কার করিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা হইতে মণীন্দ্রমোহন বসু দীন চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত এক কবির বৃহৎ পালাগানের দুইখানি পুঁথি আবিষ্কার করিয়া চণ্ডীদাস-সমস্যার সহজ সমাধানের পথ দেখাইয়া দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় তিনি দুইখানি পুঁথিতে (পুঁথি সংখ্যা—২৩৮৯ এবং ২৯৪) দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রায় দুই হাজার পদের সন্ধান পাইলেন। দীনেশ-চন্দ্রের কাছেও দীন চণ্ডীদাসের আর একখানি পুঁথি ছিল; মণীন্দ্রবাবু সেখানিও সংগ্রহ করিলেন। পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি দুইখানি (মুদ্রিত আলোক-চিত্র দ্রষ্টব্য) কিন্তু ধারাবাহিক পদ-সঙ্কলন নহে। এ বিষয়ে মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "ঐ দুইখানি পুঁথিতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর তিনখানি প্রাচীন পুঁথির পত্র সংগৃহীত হইয়াছে, আর তাহাদের একখানাতে যে চণ্ডীদাসের দুই সহস্রের অধিক পদ সন্নিবিষ্ট ছিল তাহার নিদর্শনও বর্তমান রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের এতগুলি পদের সন্ধান এপর্যন্ত আর কোনও পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই" (দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম ভূমিকা)। নানা প্রমাণ দৃষ্টে তিনি পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন: "চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত দুই হাজারের অধিক পদের সন্ধান পাইয়া আমি ঐ পদগুলি পরীক্ষা করিতে ব্যাপৃত হই, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, দীন চণ্ডীদাস নামে একজন কবি চৈতন্য-পরবর্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন" (দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম, ভূমিকা)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইখানি (পুঁ. সং. ২৩৮৯ এবং ২৯৪) পুঁথিতে এবং দীনেশচন্দ্র সেন প্রদত্ত পুঁথিতে মণীন্দ্রবাবু দীন চণ্ডীদাসের যে নূতন পদ পাইয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

(১) পুঁথি সংখ্যা ২৩৮৯—৬১টি পদ
(২) ,, ,, ২৯৪ —৫০টি পদ
(৩) দীনেশচন্দ্রের পুঁথি—৪০টি পদ
মোট —১৫১টি পদ

মণীন্দ্রমোহন ১৩৩৩ সালে সাহিত্য পরিষদের ৭ম বার্ষিক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দীন চণ্ডীদাসের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিলেন। ১৩৩৩ ও ১৩৩৪ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির পদগুলিও প্রকাশিত হইল। মণীন্দ্রবাবু আরও নানা পত্র-পত্রিকায় উত্তর-চৈতন্যযুগের কবি দীন চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপিত করিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি পণ্ডিত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষকগণ মণীন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত মোটামুটি মানিয়া লইলেন। হরপ্রসাদ মণীন্দ্রবাবুর প্রশংসা করিয়া লিখিলেন, "Manindra Babu has done a great service by showing that Dina Chandidasa was a different person than the old Chandidasa so much admired by the great Reformer Chaitanya, and that Dina belonged to a much later age." পদকল্পতরুর ভূমিকা-খণ্ডে সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "মণীন্দ্রবাবু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৪ সালের ১ম-২য় সংখ্যায় 'দীন চণ্ডীদাস' শীর্ষক তিনটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস হইতে স্বতন্ত্রতা উত্তমরূপে প্রমাণিত করায় 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', 'দীন চণ্ডীদাস' ও শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত বহুসংখ্যক এক-শ্রেণীর পদের কবিত্ব নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়া থাকিলেও 'পদামৃতসমুদ্র' 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃত চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট ও সর্বত্র সমাদৃত পদের কৃতিত্ব নির্ণয়ের সমস্যা যে জটিল সে জটিলই রহিয়া গিয়াছে।" এখানে লক্ষণীয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মণীন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন—চণ্ডীদাস দুইজন। একজন পূর্বচৈতন্য যুগের "So much admired by the great Reformer Chaitanya", এবং দীন চণ্ডীদাস আর একজন কবি, "Dina belonged to a much later age ." অবশ্য ইহাও মণীন্দ্রবাবুর পুরাপুরি অভিমত নহে। তাঁহার মতে চৈতন্য যে-চণ্ডীদাসের গীতি আস্বাদন করিতেন, তিনি বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি। উত্তর-কালের দীন চণ্ডীদাস চৈতন্যতত্ত্বেই নিষ্ণাত হইয়া পদের আকারে পালাগান রচনা করিয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্র মণীন্দ্রমোহনের সিদ্ধান্তের খানিকটা স্বীকার করিয়াও মূল অংশে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'এক শ্রেণীর' (অর্থাৎ

অপকৃষ্ট) পদের জন্য একজন পৃথক চণ্ডীদাসের (দীন) পরিকল্পনা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু'তে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত যে উৎকৃষ্ট পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঙালীর সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়া আছে, তাহা তথাকথিত দীন চণ্ডীদাসের রচিত হইতে পারে না, তাহা অপর কোন উৎকৃষ্টকতর এবং প্রাচীনতর চণ্ডীদাসের রচনা। অতএব দেখা যাইতেছে—মণীন্দ্রমোহনের মতে চণ্ডীদাস দুইজন—(১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস এবং (২) পদাবলী ও পালাগানের কবি দীন চণ্ডীদাস। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে পদাবলীর চণ্ডীদাস দুইজন। একজন পূর্ব-চৈতন্যযুগের পদাবলীকার, আর একজন মণীন্দ্রবাবু-আবিষ্কৃত দীন চণ্ডীদাস, যিনি উত্তর-চৈতন্যযুগের কবি। অর্থাৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুসারে চণ্ডীদাস তিনজন—(১) পূর্ব-চৈতন্যযুগের বড়ু চণ্ডীদাস, (২) পূর্ব-চৈতন্যযুগের পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং (৩) উত্তর-চৈতন্যযুগের পালাগানের দীন চণ্ডীদাস। সতীশচন্দ্র রায়ের মতেও তিনজন চণ্ডীদাস—এবিষয়েও তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পন্থানুবর্তী।

কিছুকাল পূর্বে বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রাম হইতে দীন চণ্ডীদাসের পালাগানের এক বিরাট পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় প্রথমে ইহার অস্তিত্ব ঘোষণা করেন, এবং কিছু পরে ডঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুঁথিটির বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন।[৫] এই নবাবিষ্কৃত পুঁথিটিতে মোট ১২০২টি পদ আছে। মণীন্দ্রবাবুও এত অধিক সংখ্যক পদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; তিনি নানা পুঁথি হইতে জোড়াতালি দিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে প্রদত্ত পদের সংখ্যা ধরিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, দীন চণ্ডীদাস প্রায় দুইহাজার পদ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীন চণ্ডীদাসের ১২০২টি পদ লোক-চক্ষুর গোচরীভূত করিয়া চণ্ডীদাস-সমস্যার একটা নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছেন। তাহা হইলে উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা তিনটি চণ্ডীদাসকে পাইলাম—বড়ু চণ্ডীদাস (প্রাক্-চৈতন্যযুগ), উৎকৃষ্টতর পদাবলীর চণ্ডীদাস (প্রাক্-চৈতন্যযুগ) এবং পালাগান রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস (উত্তর-চৈতন্যযুগ)।

৫ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' দ্রষ্টব্য।

কিন্তু চণ্ডীদাস সমস্যায় আরও একটি গ্রন্থি আছে। এই প্রসঙ্গে আর এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি সহজিয়া মতের রাগাত্মিকা পদের লেখক ও পিরীতিমন্ত্রের সাধক চণ্ডীদাস। ইঁহাকে লইয়া যত গল্পকাহিনী, যত গোলমাল, যত সমস্যা। নানা প্রাচীন পদসঙ্কলন গ্রন্থেও চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত সহজিয়া মতের অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এযুগেও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের চণ্ডীদাস পদাবলীর প্রথম প্রামাণিক সংস্করণে অনেকগুলি রাগাত্মিকা পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস ও রামীঘটিত যে-সব কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই এক শ্রেণীর ভক্ত ও পাঠকমহলে জনপ্রিয় হইয়াছিল, এই রাগাত্মিকা পদগুলি খুব সম্ভব এই চণ্ডীদাস বিরচিত। মণীন্দ্রমোহন তাঁহার পদাবলীর ভূমিকায় দীন, দ্বিজ ও বড়ু লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলেও সহজিয়া চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "স্থানাভাব বশতঃ সহজিয়া পদগুলি এইগ্রন্থে মুদ্রিত করিতে পারি নাই। চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত যাবতীয় সহজিয়া পদ লইয়া এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।"[৬] কিন্তু তৃতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং চণ্ডীদাস, রামী-রজকিনী ও সহজিয়া পদ সম্বন্ধে মণীন্দ্রমোহনের অভিমত জানা যাইতেছে না। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত *Post Caitanya Sahajiya Cult*-এ তিনি চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদের উল্লেখ করিলেও, এই পদগুলি কোন্ চণ্ডীদাসের রচনা তাহা বলেন নাই, শুধু **'attributed to Candidasa'** বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রথমে দেখা যাক রামী-চণ্ডীদাস-ঘটিত কাহিনী কত পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। বোধহয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই চণ্ডীদাস-রামীর গল্প লোকসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছিল। এপর্যন্ত নানা পদে চণ্ডীদাস, রামী রজকিনী, বাশুলী ও নান্নুর গ্রামের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, বহু পুঁথিতে এ গল্প পল্লবিত আকারে স্থান পাইয়াছে। সহজিয়ারাও পিরীতিতন্ত্রের সাধক ও রামী রজকিনীর

[৬] মণীন্দ্রবাবু এই মন্তব্যের দীর্ঘকাল পরেও দীন চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদ কেন প্রকাশ করিলেন না, সে বিষয়ে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থ সন্দেহ ব্যক্ত করিয়াছেন, "পরে হয়তো তিনি (মণীন্দ্রমোহন) বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দীন চণ্ডীদাস সহজিয়া পদের লেখক হইতে পারেন না, তাই দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন নাই।" (ডঃ মজুমদার সম্পাদিত এবং সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃ. ১৯)

বঁধু চণ্ডীদাসের ভক্তিপ্রেম ও সহজ সাধনার অন্তর্গত 'আরোপসিদ্ধির' কাহিনী কখনও সহজ ভাষায়, কখনও-বা দুর্বোধ্য প্রহেলিকার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৭০৩ খ্রীঃ অব্দে লিখিত একটি পুঁথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত যে ১৪টি রাগাত্মিকা পদ পাওয়া গিয়াছে (সা. প. পত্রিকা, ১৩০৫), তাহার একটি পদে আছে—"রামুচণ্ডীদাস এই সে ভণে।" এই রামু কি রামী বা রামমণির অপভ্রংশ? ১৭১৬ খ্রীঃ অব্দে রচিত প্রেমদাসের 'বংশী শিক্ষা'য় সহজিয়া চণ্ডীদাসের 'পিরীতি সাধনা'র কথা থাকিলেও রামীর উল্লেখ নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সহজিয়া বৈষ্ণবদের আরও কয়েকখানি সাধনভজন-সংক্রান্ত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে অকিঞ্চন রচিত 'বিবর্তবিলাসে' চণ্ডীদাসের কাহিনী আছে। 'বিবর্তবিলাসে' আছে যে, "যোগমায়া ভগবতী নিত্যের আদেশে" চণ্ডীদাসকে সহজিয়া তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাতে রামীর কোন প্রসঙ্গ নাই, অবশ্য 'নান্নুর' গ্রামের উল্লেখ আছে। ইহাতে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত কয়েকটি রাগাত্মিকা পদও সঙ্কলিত হইয়াছে। মুকুন্দদাস রচিত 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' এই দিক দিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়াছে; এই সহজিয়া নিবন্ধপুঁথিটি অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হওয়াই সম্ভব।[৭] ইহাতেও অনেকগুলি রাগাত্মিকা পদ আছে, কিন্তু ভণিতায় চণ্ডীদাসের স্থলে তরুণীরমণ বা তরণীরমণের ভণিতা আছে। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৩৩৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় 'তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা তত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত তরুণীরমণের একখানি পুঁথি হইতে তরুণীরমণের পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত পুঁথির প্রথম দিকের আখ্যানপত্র এইরূপ:

> সহজ উপাসনা তত্ত্ব / ৺শ্রীশ্রীহর্হরিঃ / শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস নবরসিক ভক্ত মহাশয় / আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নকুল ঠাকুর মহাশয়কে শিক্ষা দিলেন / অষ্টম শ্লোকার্থে দেবী শ্রীশ্রীবাহুল্যাক্তশ / কামং ব্রহ্মা ময়ং পরং পরপরং সর্বব্রহ্মাণ্ডজাতং কামদ্বয়ং প্রকৃতয়ঃ কৃতায়া ক্রীড়ন্তি স্বেচ্ছাময়ম্ কামং সর্বরসাদিভিশ্চ সমূলং সারসরঙ্গাসৌ কামং সর্বগুনিত্যয়া বিহরতি কামং ধীমহি ॥

ইহার পর তরুণীরমণ নামধেয় এই কবি চণ্ডীদাস-রামী নকুলের গল্পটি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মাঝখানে কাটাকাটা গদ্যও আছে। যথা:

---

৭. ডঃ সুকুমার সেন—বিচিত্র সাহিত্য (১ম)

অথ কথা। পুরুষ কার আশ্রয়। প্রকৃতির আশ্রয়। প্রকৃতি কার আশ্রয়। পরকীয়া আশ্রয়। পরকীয়া কার আশ্রয়। শৃঙ্গার রতির আশ্রয়...।

উক্ত প্রবন্ধে বসন্তরঞ্জন মন্তব্য করিয়াছেন: "বিবিধ রাগাত্মিকা পদে নানা সহজিয়া পুঁথিতে ও প্রচলিত প্রবাদে আমরা পাইতেছি, মহাকবি চণ্ডীদাস একজন শ্রেষ্ঠ সহজসাধক ছিলেন (সহজ সাধনা বলিতে অধুনা লোকে যাহা বুঝে) ও রজকিনী-রামী তাঁহার প্রধান অবলম্বন। বাস্তবিকই কি তাই? ইহাতেও কি সংশয়ের অবসর আছে? আমরা বলি, নাই কেন?" অর্থাৎ বসন্তরঞ্জনের মতে সহজিয়াসাধক চণ্ডীদাস এবং উৎকৃষ্ট পদাবলীর লেখক 'মহাকবি' চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নহেন। কেহ কেহ আবার তরুণীরমণ ও সহজিয়া চণ্ডীদাসকে একই ব্যক্তি বলিতে চাহেন। সহজিয়া চণ্ডীদাসের কোন কোন পদ তরুণীরমণের ভণিতায়ও মিলিতেছে। যেমন নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৩৮৫ সংখ্যক পদ এবং 'রত্নসারের' তরুণীরমণের আর একটি পদ। উভয় পদই প্রায় একপ্রকার।[৮] 'রত্নসারে'র লেখক কৃষ্ণদাসের মতে এই কবির পূরা নাম চণ্ডীদাস-তরুণীরমণ। অর্থাৎ মনে হয়, ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর অনেক বৈষ্ণব সহজিয়া কবি চণ্ডীদাসের নামটি নিজ নামের সঙ্গে যোগ করিতেন।[৯] সে যাহা হোক, সহজিয়া সাধনভজন-সংক্রান্ত আর একজন চণ্ডীদাসের অনেক পদ এক শ্রেণীর পাঠক ও ভক্ত সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, সঙ্কলনগ্রন্থেও এই সমস্ত পদের কিছু কিছু স্থান পাইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্কলনসমূহে চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে এইরূপ কিছু কিছু সহজিয়া পদ 'রাগাত্মিক পদ' নামে মুদ্রিত হইত।

চণ্ডীদাসের জীবনকথা-সংক্রান্ত অনেক গালগল্প ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর সহজিয়া পুঁথিপত্রে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পরে লোকমুখে

৮ দ্রষ্টব্য: ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস পদাবলী', পৃ. ৩২-৩৩

৯ এ বিষয়ে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার একটি কৌতূহলজনক সংবাদ দিয়াছেন: "চণ্ডীদাস নামটি যে সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পঞ্চাশ বছর পূর্বে, আমরা যখন স্কুলের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, তখন নবদ্বীপের বনচারির ডাঙ্গায় এক চণ্ডীদাস ও রজকিনী দেখিতে যাইতাম। তাঁহারা পাশাপাশি যোগাসনে বসিয়া থাকিতেন। আর তাঁহাদের সামনে একটি কুকুরও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। এই চণ্ডীদাস পদ রচনাও করিতেন। আমরা চারি আনা দিয়া তাঁহার পদের বইও কিনিয়াছিলাম।" (ডঃ মজুমদার সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃ. ৩৫)

প্রচারিত, রূপান্তরিত এবং বিকৃত হইয়া এই কাহিনী আমাদের যুগেও পৌঁছাইয়াছে। চণ্ডীদাস-রজকিনী-সংক্রান্ত গল্পটি নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে (যথা—'বংশীশিক্ষা', 'বিবর্তবিলাস', 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়')। 'পদকল্পতরু'তে উল্লিখিত পদ এবং ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর পদকর্তাদের পদে চণ্ডীদাসের জীবনী ও রামী-সংক্রান্ত কাহিনীর ইঙ্গিত আছে। 'পদকল্পতরু' ও 'গৌরপদতরঙ্গিণী'-তে চণ্ডীদাসবিষয়ক যে সমস্ত পদ আছে তাহা হইতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি পাওয়া যাইতেছে :

পদকল্পতরু ॥

(১) নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাশুলি আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ সে পাইবে কোথা ॥ (পদ—৮৭৭)

(২) চণ্ডীদাস মন বাসুলী চরণ
আদেশে রজক নারি। (পদ—৮৭৯)

(৩) রজকী সঙ্গতি চণ্ডীদাস গীতি। (পদ-৬৪০)

'পদকল্পতরু'র দুই তিনটি পদে রামীর উল্লেখ আছে। 'পদকল্পতরু'র মতো প্রামাণিক পদসংগ্রহ গ্রন্থেও আমরা নান্নুরের অধিবাসী বাশুলীর সেবক এবং রজকিনী রামীর সাধনসঙ্গী চণ্ডীদাসের উল্লেখ পাইতেছি।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীদাস পদাবলীতে 'রাগাত্মিকা পদাবলী' বলিয়া যে ৬০টি চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত পদ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার কোন কোনটিতে রামীর উল্লেখ আছে। বসুমতী সংস্করণের চণ্ডীদাস পদাবলীতে ১০০৯ সনের (১৬০২-৩ খ্রীঃ অঃ) একটি পুঁথি হইতে "কহে চণ্ডীদাসে রসের উল্লাসে রজকিনী সঙ্গে রবে" এই পদটি উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুঁথিটি যথার্থতঃ ১০০৯ সনে অনুলিখিত হইলে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতেই রামী-ঘটিত চণ্ডীদাসের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬ সংখ্যা পুঁথিতে আছে :

বাসুলি কৃপায়ে সকলি জানিয়ে
স্বরূপ আরোপ করি।
কৃপা করি মোরে আশ পুরায়ল
স্বরূপ রজক নারী ॥

সেই রজকিনী আমার জননী
সেবিয়া তাহার পায়।
কহে চণ্ডীদাস কৃপা করি রাখ
রাখহ আপন কায়॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একখানি পুঁথিতে (পুঁথি—২৮৮) চণ্ডীদাসের পদে 'রজক ঝিয়ারি'র উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে :

তোমার আরোপ ঝিয়ারি
রামিনি বলিয়ে যারে।

এই পুঁথিতেই রজকিনী রামীর উক্তিরূপে একটা দীর্ঘ পয়ার জাতীয় ছন্দে সহজিয়া মত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[১০] নানা সঙ্কলনে আরও অনেক সহজ ভজনের পদ আছে যাহার ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম রহিয়াছে—কিন্তু সব পদে রামীর প্রসঙ্গ নাই। এই সমস্ত পদ হইতে শুধু এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, কোন এক চণ্ডীদাস নামক (উপাধি?) ব্রাহ্মণকবি সহজিয়া মতানুবর্তী অনেক পদ লিখিয়াছিলেন, যাহার কোন কোনটিতে প্রেমতন্ত্রের গুরুহিসাবে তিনি রজকিনী রামীর উল্লেখ করিয়াছেন। পদগুলি পড়িয়া মনে হয়, এই কবি সহজিয়া মতের 'আরোপসিদ্ধি'র জন্যই হয়তো এই রজকনন্দিনীকে (রামী, রামমণি, রামতারা, তারাধুবুনী ইত্যাদি নামে উল্লিখিত) সাধন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবার 'গৌরপদতরঙ্গিণী' হইতে রামীঘটিত কাহিনীর নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

গৌরপদতরঙ্গিণী॥

(১) রামতারা ধনী রাধা স্বরূপিণী
ইষ্ট বস্তু যার হয়।
যাঁহার দরশে চণ্ডী রসে ভাসে
কবিতার স্রোত বয়॥ (কানুদাস)

(২) শুনি ভাবে মনে জানি পুন দেবী
কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা ধুবলী দরশে
ফুরিবে বিবিধ মতে॥

১০ দ্রষ্টব্য : *Journal of the Department of Letters*, 1923 p. 35

ইহা শুনি নিশি প্রভাতে চলিত
প্রণমি বাশুলী পায়।
ধুবলী দরশ রসে ফুরে সব
কি দিব তুলনা তায়॥
চণ্ডীদাস হিয়া ধুইল ধুবলী
প্রেমেতে পড়িল বাঁধা।
রাইকানু গুণে ঝুরে দিবানিশি
ঘুচিল সকল ধাঁধা।
ধুবলী মহিমা সীমা জানাইল
ধন্য সে বাশুলী দেবী।
নরহরি কহে পাইল দুলহ
প্রেম চণ্ডীদাস কবি॥

কানুদাস ও নরহরি চক্রবর্তীর এই পদ দুইটিতে বাশুলীর পূজক ও তারা-রামতারার সঙ্গী সহজসাধক চণ্ডীদাসের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কিন্তু খুব ফলাও করিয়া এই গল্পটি বিবৃত হইয়াছে সহজিয়াদের গোপন সাধনভজন-সংক্রান্ত পুঁথিতে। সেই সমস্ত কাহিনী জনকল্পনার দ্বারা পল্লবিত হইয়া এযুগে আসিয়া পৌছিয়াছে এবং আমাদেরও যুক্তিবিশ্বাসকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। অকিঞ্চনের 'বিবর্তবিলাস' এবং তরুণীরমণ রচিত 'সহজ উপাসনা তত্ত্ব' (সা-প-পত্রিকা, ১৩৩৩) নামক পুঁথিতে চণ্ডীদাস ও রামী-সংক্রান্ত যে কাহিনী আছে, তাহাতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই তথ্যগুলি পাওয়া যাইতেছে :

ব্রাহ্মণবংশে নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নকুল। নকুল সমাজে বেশ মান্যগণ্য ছিলেন। চণ্ডীদাস শাক্ত দেবী বাশুলীর সেবক হইলেও বৈষ্ণব সহজিয়া মতের উপাসক ছিলেন এবং রামীকে সহজিয়া প্রেমতত্ত্বের যথার্থ সাধিকা জানিয়া তাহার প্রেমে উন্মাদ হইয়া পড়েন। মুকুন্দ-দাস তাঁহার 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়' নামক সহজিয়া গ্রন্থের প্রথমেই একটি সংস্কৃত শ্লোকে ("তারাখ্যরজকীসঙ্গী চণ্ডীদাসো দ্বিজোত্তমঃ") উল্লেখ করিয়া চণ্ডীদাস-রজকী সংযোগের আভাস দিয়াছেন। রজক-কন্যার সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রীতির সংবাদে লোকে তাঁহাকে নীচ প্রেমে উন্মাদ বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল, তাঁহাকে সমাজ চ্যুত্য করিল। স্থানীয় রাজাও তাঁহাকে সভা হইতে

বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তখন রাজা চণ্ডীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন যে, চণ্ডীদাসকে নীচ সংসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে জাতে তুলিতে হইবে। নকুল জ্যেষ্ঠের কাছে গিয়া তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন, "ধোবিনী ছাড়হ ভাই জাতে উঠ তুমি।" কিন্তু চণ্ডীদাস সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, বলিলেন "সর্বস্ব ধোবিনী মোর এ ভূমি আকাশ।" যাহা হোক চণ্ডীদাসের সঙ্গে আলাপে নকুলের সমস্ত সংশয় কাটিয়া গেল, তিনি রামীর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পরে নকুলের নিকট এ সংবাদ জানিতে পারিয়া সকলে চণ্ডীদাস ও রামীর প্রতি বৈরিতা ত্যাগ করিল। নকুল রামীর নিকট সহজ তত্ত্ব শিক্ষা করিলেন।

তরণীরমণের 'সহজ উপাসনা তত্ত্বে' (১৩৩৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত) চণ্ডীদাসকে জাতে তুলিবার গল্পটি আর একটু বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া চণ্ডীদাস জাতে উঠিতে রাজি হইলেন; নিমন্ত্রণের দিন ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বসিয়াছেন, চণ্ডীদাস সকলের পাতে অন্ন পরিবেষণ করিতে গেলেন। সকলে আহারে প্রস্তুত—এদিকে 'নাছে' দাঁড়াইয়া রামী চক্ষু মুছিতে মুছিতে শুধু 'পিরীতি পিরীতি' জপ করিতেছে। যখন ব্রাহ্মণগণ ব্যঞ্জন চাহিলেন, "ধোবিনী তখন ধায়"। তরণী রমণের পুঁথি এই নাটকীয় পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে আসিয়া হঠাৎ খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু জনরুচি এইখানে থামিতে রাজি নহে। ইহার পরেও গল্পের গতি আর একটু অগ্রসর হইয়াছে—চণ্ডীদাস নাকি রামীকে দেখিয়া সেই অবস্থায় আলিঙ্গন করিতে গেলেন। তাঁহার দুইখানি হাত তো পূর্বেই অন্ন ব্যঞ্জনের থালি ধরিয়া আছে। সুতরাং তাঁহার স্কন্ধ হইতে আরও দুইখানি হাত বাহির হইল, দ্বিজ চণ্ডীদাস চতুর্ভুজ হইয়া পড়িলেন—নহিলে গল্পের মর্যাদা থাকে না যে! তাঁহার অতিরিক্ত এক জোড়া হাতের গতি কি হইল তাহা অবশ্য ইতিহাসে লেখে না। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩২৬) প্রকাশিত আরও কতকগুলি শ্লোকে আছে যে, চণ্ডীদাস কোন এক মুসলমান গৌড়েশ্বরের সভায় কৃষ্ণকীর্তন গান করিতে গিয়াছিলেন; পাৎসার বেগম চণ্ডীদাসের গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ইহা জানিতে পারিয়া সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডীদাসকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া দিয়া মারিয়া ফেলিলেন। চণ্ডী-দাসের মৃত্যুকালে রামী সেখানে উপস্থিত হইয়া হাহাকার করিয়া বলিলেন:

বেগম সহিত নেহ হা নাথ খুয়ালে দেহ
প্রাণে মাল্য এ রাজা গোঁয়ারে।

বেগমও গভীর শোকে ছুটিয়া আসিয়া চণ্ডীদাসের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।—"চণ্ডীদাস করি ধ্যান বেগম তেজল প্রাণ।" এই সমস্ত জনরুচিলোভন গালগল্পকে বসন্তরঞ্জন রায়ের মতো বিচক্ষণ পণ্ডিতও বিশ্বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকায় তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। আর দীনেশচন্দ্র তো এই বাদশাহ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' তিনি এই বাদশাহকে গণেশের পুত্র ধর্মত্যাগী যদু (জলালুদ্দিন) বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এইরূপ কত গল্প কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ আর একটি বিচিত্র গল্পের সন্ধান মিলিয়াছে জগন্নাথ দাসের 'ভক্ত চরিতামৃতে' (রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—৬ষ্ঠ খণ্ড)। সেই পুস্তিকায় আছে যে, নানোর গ্রামের অধিবাসী চণ্ডীদাস যৌবনে লেখাপড়া করিতেন না বলিয়া তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পাতে আহারের পরিবর্তে ছাই দিতে আজ্ঞা করিলে কবি ক্ষুব্ধ চিত্তে গলায় দড়ি দিয়া মরিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কবির সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইতে পারিল না, স্বয়ং বাশুলী আসিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন এবং কবিকে বর দিলেন, "মোর আশীর্বাদে তুমি পণ্ডিত হইবে।" কবি দেবীর বরে আশান্বিত হইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে নবযুবতী তারাকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইলেন, "রূপ নিরখিতে প্রথম মন কৈল চুরি।" বাশুলীর কৃপা লাভ করিবার ফলে চণ্ডীদাস ও তাঁহার প্রেয়সী রামীর মিলনকাহিনী সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। পদ্মলোচন শর্মার সংস্কৃতে রচিত 'বাসুলিমাহাত্ম্য' নামে একখানি সংস্কৃত পুঁথিতে এই গল্পটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে যে সনের উল্লেখ আছে, তাহা সত্য হইলে এই সংস্কৃত পুঁথিটি ১৪৬৫ খ্রীঃ অব্দে রচিত হইয়া থাকিবে। ইহার মতে চণ্ডীদাস বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামের অধিবাসী।

'চণ্ডীদাসের জীবনী বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ প্রাচীন বলিয়া মুদ্রিত হইয়া কিছুকাল পূর্বে সাহিত্যসমাজে বিশেষ আলোড়ন তুলিয়াছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে 'প্রবাসী' কার্যালয় হইতে 'চণ্ডীদাস চরিত' নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার লেখক কৃষ্ণপ্রসাদ সেন। এই

পুঁথি লইয়া একদা প্রচুর ঘোঁট পাকাইয়াছিল বলিয়া এখানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পদাবলীর চণ্ডীদাস কয়জন তাহা লইয়া মতভেদ হইলেও বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর বা নানুর গ্রামই যে পদাবলীর চণ্ডীদাসের অধিষ্ঠানভূমি, তাহাতে ইতিপূর্বে কোন সন্দেহ ছিল না। সহজিয়া পুঁথিতে নানুর (নানোর, নান্নুর) গ্রামের উল্লেখ তো ছিলই, এমন কি 'পদকল্পতরু'তে গৃহীত পদেও 'নানুরের মাঠে গ্রামের হাটে' (পদ—৮৭৭) প্রভৃতির নির্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু ১৩৪২ সালে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি আষাঢ় ও ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে 'চণ্ডীদাসচরিত' নামক একখানি প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ঘোষণা করিয়া চণ্ডীদাস সমস্যাকে 'জেলাওয়ারি' বিবাদে পরিণত করিয়াছেন। অতঃপর, চণ্ডীদাস কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বীরভূম জেলার নান্নুরে, না বাঁকুড়া জেলার ছাতনায়—তাহা লইয়া বিষম গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য যোগেশচন্দ্র ছাতনার পক্ষপাতী।

যোগেশচন্দ্র একখানি পুঁথিকে 'প্রবাসী' পত্রে সবিস্তারে আলোচনা করিবার পরে ১৩৪৪ সালে ইহাকে 'কৃষ্ণপ্রসাদ সেন বিরচিত চণ্ডীদাস চরিত' নামে প্রকাশ করেন, এবং মুদ্রিত গ্রন্থের আখ্যাপত্রে নিজেকে উহার সম্পাদক না বলিয়া 'সংস্কর্তা' আখ্যা দেন। মুদ্রিত পুস্তকের প্রারম্ভে 'সংস্করণের বিজ্ঞাপন' নামক ভূমিকায় তিনি প্রাপ্ত পুঁথির বিবরণ দান করেন। বাঁকুড়া শহরের আট মাইল পশ্চিম-উত্তরে ছাতনা গ্রাম এখনও আছে। ইহা একদা সামন্তভূমের রাজধানী ছিল। ছাতনার রাজা উত্তর নারায়ণ ১৫৭৫ শকে (১৬৫৩ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার কবিরাজ উদয় সেনকে চণ্ডীদাস চরিত্র বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলে উদয় সেন সংস্কৃতে 'চণ্ডীদাস চরিতম্' নামক একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। সেই কাব্য পাওয়া যায় নাই, তাহার একখানি পৃষ্ঠা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহার অনেক পরে ঐ ছাতনার রাজা বলাই নারাণ কৃষ্ণপ্রসাদ সেনকে 'চণ্ডীদাস চরিতম্'-এর বাংলায় অনুবাদ করিবার অনুরোধ করিলেন। উদয় সেনের প্রপৌত্র কৃষ্ণপ্রসাদ সেন জমিদারের নির্দেশে ১৭২৫ শকের (১৮০৩) দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে উক্ত সংস্কৃত কাব্যকে বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন। বাংলায় অনুবাদ করিয়া তিনি ইহার নাম দেন 'বাসলী ও চণ্ডীদাস'। ইহা ঐ রাজবংশের আর একজন রাজা

আনন্দলালের অধিকারে ছিল। ১৮৬৭ সালে রাজা গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলে রাজার দরোয়ান শিবু বাগ্‌দী পুঁথিখানিকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছিল। শিবুর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র গিরি বাগ্‌দী বাংলা ১৩২৫ বা ১৩২৮ সালে ঐ পুঁথি ও অন্যান্য কাগজ পত্র কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের পৌত্র মহেন্দ্র সেনকে বিক্রয় করে। বাংলা ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসে রামানুজ কর ঐ পুঁথিখানির ১১ ও ১২ পৃষ্ঠা বাদে প্রথম ৪৪ পৃষ্ঠা পাইয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় রামানুজের নিকটে ঐ পৃষ্ঠাগুলি সংগ্রহ করেন। পরে কাঠের বাক্সে কাগজপত্র খুঁজিতে খুঁজিতে ঐ ১১ ও ১২ পৃষ্ঠাও পাওয়া গেল। পুঁথিটিতে চণ্ডীদাসের জীবন কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই পুঁথি অনুসারে চণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুঁথিতে আছে যে, চণ্ডীদাস নিজের জন্মকাল সম্বন্ধে বলিতেছেন :

> যেই দিন মহামুদী ঘোর অত্যাচারী।
> বসিলেন সিংহাসনে পিতৃহত্যা করি॥
> তার পূর্ব দিনে মোর জন্ম মধুমাসে।
> তুমি কিনা বল মোরে বালক বয়সে॥

অর্থাৎ ১৩২৫ খ্রীঃ অব্দে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়।

এই দীর্ঘকাব্যে চণ্ডীদাস রামীর নানা গালগল্প, বিষ্ণুপুর, নানুর, পাণ্ডুয়া, রঙ্গনাথপুর, কেন্দুবিল্ব, কাশীধাম—বহুস্থানের নানা কিংবদন্তী, রাজবংশের কাহিনী নির্বিচারে স্থান পাইয়াছে। চণ্ডীদাসের কাহিনী অতিরঞ্জন ও জনরুচির দ্বারা কতদূর স্ফীত হইতে পারে, তাহা এই পুঁথি না পড়িলে বুঝা যায় না। এই পুঁথি অবলম্বনে যোগেশচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে, চণ্ডীদাস বীরভূমের অন্তর্গত নানুরের অধিবাসী নহেন, বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে বর্তমান ছিলেন। এই গ্রন্থটি কিঞ্চিৎ ধৈর্যের সঙ্গে পড়িলে ইহাকে কিছুতেই প্রাচীন গ্রন্থ বা প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া মনে হইবে না। ইহার ভাষা অত্যন্ত আধুনিক, ছন্দও আধুনিককালের আদর্শে পরিকল্পিত। বর্ণনায় নানা স্থানে উৎকট আধুনিকতার ছাপ আছে। সর্বোপরি ইহাতে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পুঁথির হাস্যকর অর্বাচীনত্ব ধরা পড়িবে। 'গোবিন্দদাসের কড়চা' লইয়া যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইয়াছে, এই 'চণ্ডীদাস চরিত' সম্বন্ধে তাহার

সামান্য আলোচনা হইলেই ইহার অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়িয়া যাইবে। উপরন্তু পুঁথির লিপি একেবারে আধুনিক কালের, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত বলিয়া মনে হয়। যোগেশচন্দ্র উক্তগ্রন্থের ভূমিকার ৩ পৃষ্ঠায় পুঁথির যে আলোকচিত্র দিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্ত অক্ষর বিংশ শতাব্দীর গ্রামবৃদ্ধদের লেখায় এখনও দেখা যায়। এমন কি এই পুঁথির সঙ্গে উদয়নারায়ণের রচিত বলিয়া সংস্কৃতে লেখা যে পৃষ্ঠাটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার লিপিও ১৯শ-২০শ শতাব্দীর হওয়াই অধিকতর সম্ভব। ভাষা ও ছন্দ যে কত আধুনিক তাহা নিম্নে উদ্ধৃত এই দুই পংক্তি হইতেই বুঝা যাইবে :

আমি অনলে পশিব অগাধে ডুবিব মরিব মরিব তারা।
তায় দেখিব কেমনে বহে কিনা তোর বহে সে নয়ানে ধারা॥

এ ভাষা ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ বা শেষভাগের ভাষা। এই কাব্যের অনেক স্থলে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা এত বারবার বলা হইয়াছে যে, ইহা রামমোহনের তিরোধানের পরে রচিত বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণপ্রসাদ সেন ইহাতে 'কৌনস্থলি' (counsel) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ১৮১৩ সালের দিকে সুদূর বাঁকুড়ায় একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি 'কৌনস্থলি' শব্দের সঙ্গে কি পরিচিত ছিলেন? ইহাতে আরও অনেক ঘটনা, সংবাদ ও তথ্য আছে যাহা কিছুতেই ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বের ব্যাপার হইতে পারে না। কাজেই যোগেশচন্দ্র প্রচারিত এই 'চণ্ডীদাস চরিত'কে প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া এবং ইহাতে বর্ণিত চণ্ডীদাস সম্পর্কিত উপকথাকে আদৌ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা অর্বাচীন তো বটেই, এমন কি ইহা কোন প্রাচীনতর সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। পদ্মলোচন শর্মার 'বাসুলি মাহাত্ম্য' নামক সংস্কৃতে রচিত একখানি পুঁথির সঙ্গে আলোচ্য 'চণ্ডীদাস চরিতের' বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কে কাহার অনুবাদ, তাহা ভবিষ্যতের গবেষক বিচার করিবেন। সে যাহা হোক চণ্ডীদাসের জন্মস্থান লইয়া নান্নুর ও ছাতনার মধ্যে যে মতভেদ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে জোর করিয়া চূড়ান্ত কিছু বলা যায় না। নান্নুরে যেমন চণ্ডীদাস সংক্রান্ত প্রবাদ আছে, চণ্ডীদাসের ভিটি বা সমাধিস্থান আছে, ছাতনাতেও ঠিক সেইরূপ প্রবাদ আছে। এই বিরোধ মিটাইবার জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ছাতনার অধিবাসী ছিলেন এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস নান্নুরের কবি। এসব জল্পনা নিরর্থক।

চণ্ডীদাসের পদাবলী বিচারে বা রসবিশ্লেষণে নান্নুর-ছাতনার দ্বন্দ্ব আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে না। তবে কোন পদে ছাতনার উল্লেখ পাওয়া যায় না, সহজিয়া গ্রন্থেও এ গ্রামের কথা নাই। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান সম্পর্কে নান্নুরের দাবিই অগ্রগণ্য।[১১] অন্য কোন দৃঢ়তর প্রমাণ পাওয়া না গেলে পদাবলীর চণ্ডীদাসকে বীরভূমের নান্নুর গ্রামের অধিবাসী বলিয়া ধরিতে হইবে। অবশ্য পদাবলীর কোন্ চণ্ডীদাস, সে সম্বন্ধেও জটিল প্রশ্ন রহিয়াছে।

চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত ॥

চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত সমস্যার উৎপত্তি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়াছি; তাহা হইতে চণ্ডীদাস-সমস্যার আসল স্বরূপ সম্বন্ধে পাঠকের মোটামুটি ধারণা জন্মিবে। আসল সমস্যা—পদাবলীর চণ্ডীদাস কয়জন, এবং তিনি বা তাঁহারা কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন—চৈতন্যের পূর্বে, না পরে? যে সমস্ত পাঠক ততটা তথ্যানুসন্ধিৎসু নহেন, জটিল ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় যাঁহাদের বিশেষ কৌতূহল নাই, তাঁহারা সাধারণ রসবোধের দ্বারাই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কয়েকটা বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্তে আসিতে পারিবেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিবিধ পদসঙ্কলনে ধৃত দ্বিজ-দীন-বড়ু-আদি প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত চণ্ডীদাসের পদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মণীন্দ্রমোহন বসু আবিষ্কৃত দীন চণ্ডীদাসের পালাগানের পদাবলী এবং ডঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচায়িত বর্ধমানের বনপাশ হইতে সংগৃহীত দীন চণ্ডীদাসের বৃহত্তর পালাগানের বিপুল সংগ্রহ হইতে একাধিক চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে এইরূপ সিদ্ধান্তের উদয় হওয়া স্বাভাবিক:—

'(১) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস।

(২) বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত পদাবলীর চণ্ডীদাস (নানা সঙ্কলনে ইহার নামের পূর্বে দ্বিজ, দীনু, বড়ু, আদি প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে।)

(৩) পুরাণকথা এবং রূপ গোস্বামীর অলঙ্কার, কাব্যনাট্যাদির প্রভাবে পরবর্তী কালে পালাগান রচনাকার দীন চণ্ডীদাস।

---

[১১] ছাতনার নিকটেও সুনুয়ার মাঠ আছে। যোগেশচন্দ্র ইহাকেই নান্নুর বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন।

(৪) সহজিয়া পন্থী রাগাত্মিকা পদের চণ্ডীদাস।

এখন দেখা যাক, এই চারিজন চণ্ডীদাস এক, না একাধিক ; একাধিক হইলে, কয়জন। ভাব ও বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে 'চণ্ডীদাসবৃত্ত' (Chandidas Cycle) হইতে চারিটি স্বরূপের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িতে পারে। উপস্থিত প্রসঙ্গে তথ্য ও অন্য প্রমাণপঞ্জীর উল্লেখ না করিয়া শুধু সাধারণ পাঠকের কান ও প্রাণের দাবি হইতেই এইরূপ চারিটি স্তর উপলব্ধি করা যাইবে। এই তত্ত্ব নির্ণয়ে সংস্কার, রুচি ও আবেগের বাধা প্রবল হইয়া থাকে বলিয়া আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসকার ও সমালোচকগণ এই সমস্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতার দ্বারা অধিকতর আবিষ্ট হইয়া পড়েন। তাই ঠিক কথাটি ধরিতে আমাদের এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। দীনেশচন্দ্র অলৌকিক শক্তির বশেই যেন পদাবলীর চণ্ডীদাসের রচনা চক্ষু মুদিয়া চিনিতে পারিতেন। তাঁহার উক্তি উদ্ধারের যোগ্য :

> এই দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর পরিচয়ে আমি তাঁহার সুরটা চিনিয়াছি ; এতদিন ধরিয়া যদি কাহারও কথা দিনরাতি শোনা যায়, তবে তাহার সুরটা চেনা খুবই স্বাভাবিক। —আমি ভাষা বিচার করিয়া কে খাঁটি চণ্ডীদাস, কে দীন চণ্ডীদাস, কে বড়ু চণ্ডীদাস, কে দ্বিজ চণ্ডীদাস, কে বাশুলীসেবক চণ্ডীদাস, কে তরুণীরমণ চণ্ডীদাস—এই চণ্ডীদাস-ব্যূহের সমস্যা ভেদ করিতে যাইব না ; আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। কয়েক বৎসর গত হইল একজন আমাকে কতকগুলি অজ্ঞাত পদ আনিয়া পরীক্ষা করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যেগুলি চণ্ডীদাসের পদ, তাহা আমার তখন অজ্ঞাত থাকিলেও আমি দুই একটি পদ শুনিয়া ঠিক ধরিয়া দিয়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, আমার একটিও ভুল হয় নাই।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

সাহিত্যবিচার, বিশেষতঃ কবিব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে এরূপ ব্যক্তিগত 'টেলিপ্যাথি' বিশেষ কোন সাহায্য করে না। ব্যক্তিগত অভিরুচি চণ্ডীদাস-সমস্যা সমাধানের একমাত্র মাপকাঠি হইলে নানাজনের রুচি ও মনের প্রবণতা অনুসারে অসংখ্য চণ্ডীদাস খাড়া হইবে। "আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই"—দীনেশচন্দ্রের এই দৃঢ়বিশ্বাস আধুনিক ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে নাও গ্রাহ্য করিতে পারেন। দীনেশচন্দ্র চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত ভালো-মন্দ-মাঝারি নানা পদ দেখিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যও তাঁহারা অপঠিত থাকিবার কথা নয়। তৎসত্ত্বেও তিনি চণ্ডীদাসকে এক বলিয়া মনে করিতেন। এই চণ্ডীদাস নান্নুরের অধিবাসী, বাশুলীসেবক, রামী রজকিনীর বঁধু, পিরীতিতত্ত্বের

সাধক, সহজিয়া রসিকের অন্যতম—আবার তিনিই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি? দীনেশচন্দ্রের মতে এই একই কবি তরুণ যৌবনে বড়ু চণ্ডীদাস সাজিয়া বাশুলীর দোহাই দিয়া আদিরসের 'রঙ্গঢামালি'-যুক্ত রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী ফাঁদিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে দ্বিজ চণ্ডীদাস সাজিয়া চৈতন্যের পূর্বে অপূর্ব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, দীন চণ্ডীদাস সাজিয়া পুরাণ অনুসরণে পালাগান রচনা করিয়াছিলেন,[১২] তরুণীরমণ সাজিয়া রাগাত্মিকা পদ লিখিয়াছিলেন, রামীকে দিয়াও লেখাইয়া লইয়াছিলেন, আবার তিনি গঙ্গাতীরে বিদ্যাপতির সঙ্গে রসতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীও প্রখর ঐতিহাসিক নিষ্ঠা সত্ত্বেও সংস্কারের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই। তিনিও 'একমেবমদ্বিতীয়ম্' চণ্ডীদাসে বিশ্বাস করিতেন :

> আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে চাহি, চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই, কেহ এপর্যন্ত এমন প্রমাণ দিতে পারেন নাই। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কবিত্বের অপকর্ষ উৎকর্ষ বিচার করিয়া ভণিতায় প্রকারভেদ লক্ষ্য করিয়া যে সকল প্রমাণ খাড়া করা হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

পরে তিনি এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

> চণ্ডীদাসের নামে কি কিছু মাত্র ভেজাল চলে নাই? সম্ভবতঃ কিছু কিছু চলিয়াছে, কিন্তু সে সমস্ত পদই উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রয়োজনের অনুরোধে যেমন রূপসনাতন ইত্যাদি মহামহোপাধ্যায়গণের নামেও জালগ্রন্থ চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, চণ্ডীদাসের নামেও সেরকম হওয়া সম্ভব। চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি বজায় রাখিবার জন্য বড় বড় কবিগণ তাঁহার নামে পদ রচনা করিয়া চালাইয়া দিয়াছিলেন— অথবা ক্ষুদ্রতর কবিগণ স্বরচিত কবিতা সুপ্রচলিত করিবার জন্য তাহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা জুড়িয়া দিয়াছেন, এই উভয় অনুমানই অশ্রদ্ধেয়।[১৩]

---

[১২] দীনেশচন্দ্র দীন চণ্ডীদাসকে পৃথক কবি বলিয়া স্বীকার করেন নাই—"কেহ কেহ কোন একটি স্থানে 'দীন চণ্ডীদাস' পাইয়া অনুরূপ বহুপদে শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকা সত্ত্বেও তাহা তথাকথিত 'দীন চণ্ডীদাসের' বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আসল কথা, শুধু 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতায় পাইলে যে পৃথক চণ্ডীদাস দাঁড় করাইতে হইবে—তাহা আমরা স্বীকার করি না" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। দীনেশচন্দ্র এখানে 'কেহ কেহ' বলিতে মণীন্দ্রমোহন বসুকে নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ মণীন্দ্রমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত দীন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদের সঙ্গে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত অন্যান্য সঙ্কলনে ধৃত যাবতীয় পদকে একই চণ্ডীদাস, অর্থাৎ দীন চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াছেন। পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[১৩] ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩৪ (নলিনীকান্ত ভট্টশালী—দ্বিজ বা দীনচণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলী')

সাহিত্যবিচারে এবং প্রমাণ বিশ্লেষণে শ্রদ্ধেয়-অশ্রদ্ধেয় বলিয়া কিছু নাই। পরম অশ্রদ্ধেয় ব্যাপারও বিশুদ্ধ প্রমাণসঙ্গত হইতে পারে। সে যাহা হোক, ডঃ ভট্টশালীর মতে চণ্ডীদাস একজন।) তবে দুরভিসন্ধিপরায়ণ কেহ কেহ বাজে পদ লিখিয়া তাঁহার নামে চালাইয়া দিয়াছে—মাত্র এইটুকু ভেজাল স্বীকার করিতে তিনি রাজী আছেন।

('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আবিষ্কারক ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জনও কিন্তু চণ্ডীদাসকে এক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে, "কৃষ্ণকীর্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।" কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় তিনজন চণ্ডীদাসের কথা বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস, উৎকৃষ্টতর পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং পালাগানের দীনচণ্ডীদাস। মণীন্দ্রমোহন অনুমান করিয়াছিলেন যে, দীনচণ্ডীদাসই সমস্ত পদের রচনাকার, উৎকৃষ্টতর পদের জন্য অন্য কোন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করিবার কারণ নাই। এ বিষয়ে সতীশচন্দ্রের মন্তব্যটি অতিশয় যুক্তিযুক্ত।) তাঁহার উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :

> আমাদিগের বিবেচনায় কৃষ্ণকীর্তনের 'প্রবল শক্তিশালী' কিন্তু উন্নত আধ্যাত্মিকতার লেশশূন্য কবি চণ্ডীদাস বরং কোন অচিন্তনীয় সাধনার বলে পদাবলীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি চণ্ডীদাসে পরিণত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু দীনচণ্ডীদাসের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বটে।[১৪])

'পদকল্পতরু'র আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন :

> চণ্ডীদাস ভণিতার পদগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর পদ বড় জোর ৪০।৫০টীর অধিক হইবে না ; বাকি মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর পদগুলির মধ্যে বহু সংখ্যক পদই যে, মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত পুঁথির প্রণেতা 'দীন চণ্ডীদাসের' ইহা বেশ বুঝা গিয়াছে।...চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদগুলির মধ্যে একটা ভাষাগত ও ভাবগত ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদকর্তার পদে ঐরূপ ঐক্য থাকার আশা করা যাইতে পারে না ; সুতরাং অন্ততঃ চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলি একজন শ্রেষ্ঠ কবির রচনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

(সতীশচন্দ্রের এ যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি সহজিয়া চণ্ডীদাস সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া কিছু বলেন নাই। তাঁহার মন্তব্য হইতে অনুমিত হয় যে, সহজিয়া চণ্ডীদাস ও উৎকৃষ্টতর পদাবলীর চণ্ডীদাসকে তিনি এক ও অভিন্ন মনে করিতেন :)

---

১৪ পদকল্পতরু—৫ম

> সম্পাদক বসন্তবাবুর ন্যায় আমরাও বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে সহজিয়া ভাবের কোনও পরিচয় পাই নাই। পক্ষান্তরে 'চণ্ডীদাস' ভণিতার 'রাগাত্মিকা' পদাবলীতে সহজিয়া ভাবের এবং কয়েকটি 'রাগাত্মিকা' পদে অপূর্ব আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন সুস্পষ্ট। মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগে সহজিয়া ধর্মের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হওয়ায়, সেই জন্যও এই সহজিয়া শ্রেষ্ঠ কবিকে বৈষ্ণব সমাজ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন কিনা, এবং আন্দাজ দেড়শত, কি দুইশত বৎসর পরে লোকে তাঁহার রজকীসংসর্গ ও সহজিয়া অপবাদ বড়ু চণ্ডীদাসের উপর ভুলে আরোপ করায়, নিজস্ব অপূর্ব কবিত্বের প্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট পদগুলি আন্দাজ দুইশত বৎসর যাবৎ পদাবলী সাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে কিনা—এই বিকল্প দুইটির মধ্যে কোনও একটি বিকল্প সঙ্গত কিনা, সঙ্গত হইলে কোন্‌টি অধিকতর সঙ্গত, তাহাও বিচার করিয়া দেখা উচিত।

এখানে সতীশচন্দ্র কয়েকটি বিকল্প প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু সহজিয়া পদের চণ্ডীদাস, কোন্ চণ্ডীদাস তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তাঁহার উক্তি হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, রাগাত্মিকা পদগুলিও প্রাক্‌চৈতন্য যুগের উৎকৃষ্টতর চণ্ডীদাসের রচনা।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় 'বীরভূমি বিবরণে' (৩য়) এবং সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হইতেছে, তিনি দীন চণ্ডীদাসকে একজন পৃথক কবি বলিয়া মানিতে রাজি আছেন। তিনি দীন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত নরোত্তম ঠাকুরের বন্দনা বিষয়ক একটি পদ পাইয়াছেন।[১৫] এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> দীনচণ্ডীদাসের লেখা রাধার কলঙ্কভঞ্জনের ছন্দ ও রচনারীতি ঠাকুর নরোত্তমের রচিত রাধিকার মানভঞ্জনের পদের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। ইঁহার শ্রীনিবাস নামে সহজ ভজনের একখানি পুঁথি আছে। বৈষ্ণব সহজভজন—যাহা রসরাজ উপাসনা নামে পরিচিত, তাহার পদ্ধতি নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্যের এবং তাঁহাদের

---

১৫ জয় নরোত্তম গুণধাম।
দীনদয়াময় অধম দুর্গত
পতিতে করুণাবান॥
... ...
নরোত্তম রে বাপরে ডাকে শ্যামমণি
পুন প্রভু আবির্ভাব।
দীনচণ্ডীদাস কহ কত দিনে
পদযুগ হবে লাভ॥ (বীরভূমি বিবরণ, ৩য়)

শিষ্যপ্রশিষ্যগণের দ্বারা প্রচারিত হয়। এইসব কারণে দীনচণ্ডীদাসকে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য বলিয়াই মনে হইতেছে। চণ্ডীদাসভণিতাযুক্ত সহজ ভজনের পদগুলি আদি চণ্ডীদাস ও রামীর প্রবাদ অবলম্বন করিয়া এই দীনচণ্ডীদাসই লিখিয়াছিলেন, এখন এরূপ অনুমানের মূলেও জোর পাওয়া যাইতেছে।"[১৬]

দীনচণ্ডীদাস সম্বন্ধে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অযুক্তিযুক্ত নহে, তবে সহজিয়া চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস একই কিনা, এবং চণ্ডীদাস-রামীঘটিত কাহিনী প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে চণ্ডীদাসের নামে সংযুক্ত হইতে পারে কিনা তাহা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি। তবে এখানে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাক্‌-চৈতন্যযুগের পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং উত্তর-চৈতন্যযুগের নরোত্তম-শিষ্য দীন চণ্ডীদাসের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়া পদাবলীর দুই কবি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত সম্বন্ধে গোল বাধিয়াছে অন্যত্র।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত কতকটা বসন্তরঞ্জনের মতো। তিনি অনুমান করেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস এবং প্রাক্‌-চৈতন্যযুগের পদাবলীর চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নানা পদই কালক্রমে বদলাইয়া গিয়া উৎকৃষ্টতর চণ্ডীদাস-পদাবলীতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার 'বীরভূমি বিবরণ' গ্রন্থে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের নানা উদ্ধৃতি তুলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে ভাবের অবশ্যম্ভাবী ঐক্য রহিয়াছে, অতএব দুইজনে এক কবি। তাঁহার এ অনুমান যথার্থ নহে। যদিও তিনি সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ডে (ইহার আর কোন খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই) বড়ু চণ্ডীদাসের নজিরে পদাবলীর চণ্ডীদাসকে ঢালিয়া সাজাইতে চাহিয়াছেন, তবু "সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, আমরা চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা, ভাব ও আখ্যানবস্তুর সহিত কোনরূপেই বড়ু চণ্ডীদাসের নিঃসন্দিগ্ধ রচনা কৃষ্ণকীর্তনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে সমর্থ হই নাই।"[১৭] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি 'বৈষ্ণব পদাবলী' নামক যে সুবৃহৎ

[১৬] বীরভূমি বিবরণ. ৩য়

[১৭] পদকল্পতরু (৫ম)-তে সতীশচন্দ্র রায়ের উক্তি। সতীশচন্দ্র এ বিষয়ে যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন, "হরেকৃষ্ণ বাবু কৃষ্ণকীর্তনের সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর রচনার ভাবের

পদসংগ্রহ সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহার প্রথম দিকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদপর্যায়ে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গেই পদাবলীর চণ্ডীদাসের প্রায় ১২১টি পদ গ্রহণ করিয়াছেন—অবশ্য পদগুলি বড়ুর পরে স্থাপিত হইয়াছে। এই সঙ্কলনের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "চণ্ডীদাস যে কয়েকজনই ছিলেন সে বিষয়ে যেমন আমার কোন সংশয় নাই, তেমনি বড়ু চণ্ডীদাসই যে শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী কবি, একথাও আমি সুনিশ্চিত রূপেই বিশ্বাস করি।" কিন্তু ইতিপূর্বে ১৩৪১ সনে সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাস পদাবলীর ১ম খণ্ডের ভূমিকায় হরেকৃষ্ণ ও সুনীতিকুমার বলিয়াছিলেন, "আমরা এ পর্যন্ত দুই জন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। একজন শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস, অন্যজন শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী দীনচণ্ডীদাস।' একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই দুইজন কবির পদ পৃথক করা যায়। কিন্তু বড়ু ও দীনচণ্ডীদাস ভিন্ন, 'চণ্ডীদাস' এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ চলিতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়া লওয়া একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার।" অর্থাৎ ১৩৪১ সনে হরেকৃষ্ণ বিশ্বাস করিতেন যে, চণ্ডীদাস দুইজন—চৈতন্য পূর্ববর্তী (বড়ু চণ্ডীদাস) এবং চৈতন্য পরবর্তী (দীনচণ্ডীদাস)। সহজিয়া পদগুলি কোন্ চণ্ডীদাসের, সেকথা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। বোধ হয় সহজিয়া পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের রচিত কিনা তাহাতে তাঁহাদের কিছু সংশয় ছিল। তাহা না হইলে তাঁহারা একথা লিখিবেন কেন?—"পরবর্তী দুইখণ্ডে (দুইখণ্ডের একখানিও প্রকাশিত হয় নাই) দীনচণ্ডীদাসের পদের শেষে

ঐক্য দেখাইবার জন্য তাঁহার গ্রন্থের ('বীরভূমি বিবরণ, ৩য়) ১০৬-১১৩ পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকৃত ও কল্পিত সাদৃশ্যের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্তী যুগের পদাবলী সাহিত্যে তাঁহার অনেক কথা ও ভাবের প্রতিধ্বনি পাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক ; উহার দ্বারা কৃষ্ণকীর্তনের ও চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর সমকালীনতা বা অভিন্ন কবির কৃতিত্ব প্রমাণিত হয় না" (পদ-৫ম)। অবশ্য সতীশচন্দ্র 'সমকালীনতা' শব্দটি ব্যবহার করিয়া আবার একটি সমস্যা জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার এই শব্দটি ধরিয়া কেহ যদি বলেন যে, পদাবলীর চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাসের সমকালীন কবি নহেন, অর্থাৎ প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি নহেন (মণীন্দ্র বাবুর অভিমত), তবে তাঁহাকে নিরস্ত করা যাইবে কি প্রকারে? সতীশচন্দ্রের নিজস্ব সিদ্ধান্তেই তো (অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর পদাবলীর চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি) তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে যাইবে।

চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত সহজিয়া ভাবের পদগুলি সন্নিবেশিত হইবে। কারণ চণ্ডীদাস নামের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন পদই আমরা বর্জন করিতে পারি না। সে অধিকার আমাদের নাই; আমরা ভ্রম-প্রমাদের অতীত নহি।" এই উক্তির তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, তাঁহারা দীন চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে সহজিয়া পদগুলি সংযোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও এইগুলি যে, চৈতন্যোত্তর যুগের চণ্ডীদাসেরই রচিত, তাহাতে তাঁহাদের কিছু সংশয় ছিল। অবশ্য হরেকৃষ্ণ বাবু 'বীরভূমি বিবরণে'র তৃতীয় খণ্ডে দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া চণ্ডীদাসকে একজন কবি মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরাতন ও আধুনিক মত বিচার করিয়া মনে হয়, তিনি মূলতঃ দুই চণ্ডীদাসে বিশ্বাসী—(১) প্রাক্-চৈতন্যযুগের বড়ু চণ্ডীদাস ও উৎকৃষ্টতর পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং (২) উত্তর-চৈতন্যযুগের দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া চণ্ডীদাস। অর্থাৎ তাঁহার মতে বোধ হয়, বড়ু ও পদাবলীর চণ্ডীদাস এক ও অভিন্ন, এবং দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া চণ্ডীদাস এক ও অভিন্ন।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় যুক্তি বা তথ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া অন্তরস্থিত আবেগ ও ভাবপ্রবণতার বশে মনে করিতেন যে, দ্বিজ চণ্ডীদাসই পূর্ব-চৈতন্যযুগের শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস,—"কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্য পরবর্তী কালের কোন দেশীয় বা স্থানীয় সঙ্গীত রীতি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল।"[১৮] মণীন্দ্রমোহন-আবিষ্কৃত দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে খগেন্দ্রনাথের অভিমত, "দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস যে অভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ অনুমানও যুক্তিসহ নহে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু যে পুঁথি হইতে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশ করিয়াছেন তাহার একটি স্থলেও দ্বিজের উল্লেখ নাই।...যদি দীনের পদের মধ্যে দ্বিজের পদ থাকিত, তাহা হইলে লেখকের অনবধানতার দোহাই দিয়া ইহাদের একাত্মা প্রমাণ করা যাইতেও পারিত। কিন্তু যতগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দীন চণ্ডীদাসকে দ্বিজ হইতে পৃথক ব্যক্তি মনে না করিয়া উপায় নাই।" (ঐ, পৃ ১৫৩)। তাঁহার মতে চণ্ডীদাস দুইজন। একজন দ্বিজ চণ্ডীদাস, যিনি চৈতন্যের পূর্বে আবির্ভূত হইয়া বিচ্ছিন্ন ধরণের উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়াছিলেন, আর একজন দীন চণ্ডীদাস, যিনি উত্তর চৈতন্য-যুগের চণ্ডীদাস—

---

১৮ খগেন্দ্রনাথ মিত্র—বৈষ্ণব রসসাহিত্য

কবিত্ব শক্তিতে নিকৃষ্ট। বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতি খগেন্দ্রনাথ অতিশয় বিরূপ, এবং বিরূপ বলিয়াই তাঁহার প্রামাণিকতায় অবিশ্বাস করিয়াছেন।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বড়ু চণ্ডীদাসকে উত্তর-চৈতন্যযুগের কবি বলিয়া যে-সমস্ত প্রমাণ দিয়াছেন (চণ্ডীদাস পদাবলী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ. ৪২-৪৫), শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ভাবের ধারা বিচার করিলে তাহা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য মনে হইবে না। তাঁহার বিচিত্র অভিমতটি উল্লেখ-যোগ্য : "আমার নিজের ধারণা যে, শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথধামে বাস করিবার সময় বড়ু চণ্ডীদাস দানখণ্ড ইত্যাদি রচনা করেন। সেইজন্যই তিনি রাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, কৃষ্ণকে সেইখানে পাইবে, যেখানে জগন্নাথ বসেন বা থাকেন—"তবে সুধি পাইবে যঁথা বসে জগন্নাথে।" সুধি মানে—সন্ধান পাইবে যেখানে জগন্নাথ থাকেন—অবশ্য এটি ব্যঞ্জনামাত্র; প্রকট এই যে, জগন্নাথ কৃষ্ণের সন্ধান পাইবে যদি তুমি সব লোকের কাছে জিজ্ঞাসা কর।" (পৃ. ৪৫)। ডঃ মজুমদার যে যুক্তিবলে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে চৈতন্যযুগের কাব্য বলিতেছেন, তাহা অতিশয় দুর্বল ও কাল্পনিক। ইহাকে যুক্তি না বলিয়া ডঃ মজুমদারের একপ্রকার অদ্ভুত বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লইয়া বহু 'জল ঘোলা' হইয়াছে। এতদিন পরে বড়ু চণ্ডীদাসকে চৈতন্যযুগে বা উত্তর-চৈতন্যযুগে টানিয়া নামাইতে হইলে শুধু 'জগন্নাথ' শব্দের আনুমানিক অর্থ যথেষ্ট নহে। ভাষাতত্ত্ব, ভাববস্তু, চরিত্র রচনা ও কবিমানস বিশ্লেষণ করিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে যে পূর্ব-চৈতন্যযুগে স্থাপন করিয়াছি,[১৯] ডঃ মজুমদার তাহার বিপরীতে এমন কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই যে, আমাদিগকে পূর্বতন সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে হইবে।

ডঃ মজুমদার প্রাক্-চৈতন্যযুগের উৎকৃষ্টতর পদাবলীর একজন কবি চণ্ডীদাসকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে দীন চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পালাগান রচনা করিয়াছিলেন এবং একই যুগে (অর্থাৎ চৈতন্যদেবের পরে) "দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে একজন স্বতন্ত্র কবি শ্রীচৈতন্যের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা তাঁহার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি পরম ভক্ত কবি ছিলেন।" অতঃপর ডঃ মজুমদার রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধবে'র "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং" ও চণ্ডীদাসের "জপিতে

---

[১৯] লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

জপিতে নাম অবশ করিল গো"; এবং "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার"-এর সঙ্গে 'উজ্জ্বলনীলমণি'র পূর্বরাগ প্রকরণের ১২শ শ্লোকের ভাব-ভাষার ঐক্য দেখাইয়াছেন। চণ্ডীদাসের "যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়রে—" পদটি রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'র "হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তি-রুচ্যতে" শ্লোক এবং জীব গোস্বামীর দার্শনিক গ্রন্থের কোন কোন উক্তির সঙ্গে এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদের সদৃশ্য দেখিয়া বিমানবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই চণ্ডীদাস রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামীর পরে আবির্ভূত হইয়া সেই আদর্শে পদ রচনা করিয়াছিলেন। সহজিয়া পদের জন্য তিনি কোন পৃথক চণ্ডীদাসের কল্পনা করিতে চাহেন না। তাঁহার উক্তি—"চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সহজিয়া পদগুলি কোন একজন কবির লেখা নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এই পদগুলি রচনা করিয়াছেন" (চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃ. ২২)। তাহা হইলে চণ্ডীদাস সম্পর্কে ডঃ মজুমদারের সর্বাধুনিক মত এই প্রকার : চৈতন্যের পূর্বে একজন চণ্ডীদাস কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছিলেন যাহা চৈতন্যদেব স্বয়ং আস্বাদন করিতেন। চৈতন্যদেবের সমকালে বর্তমান ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস। কারণ ডঃ মজুমদারের অনুমান অনুসারে চৈতন্যদেব যখন পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নাকি বড়ুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কিয়দংশ রচিত হয়। চৈতন্যের পরে আরও দুইজন চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন পালাগানের লেখক দীন চণ্ডীদাস. আর একজন রূপ গোস্বামী জীব গোস্বামীর গ্রন্থের আদর্শে পদলেখক দ্বিজ চণ্ডীদাস। তাঁহার এই অভিমত সুধীজন গ্রহণ করেন নাই—যুক্তি দিয়া গ্রহণ করাও যায় না। তাঁহার দুইটি মন্তব্য নিশ্চয় বিতর্ক সৃষ্টি করিবে। একটি—বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যযুগের কবি, আর একটি—সহজিয়া চণ্ডীদাস বলিয়া কোন পৃথক কবি ছিলেন না।

এতক্ষণ আমরা চণ্ডীদাস-সমস্যার যাবতীয় তথ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। হয়তো . পাঠকগণ তাহা হইতে চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন। তবে কোন বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না, কারণ বিশ্বাসযোগ্য এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহার দ্বারা আমরা বলিতে পারি চণ্ডীদাস এক বা একাধিক। তাহা হইলেও বিতর্কের অবকাশ রাখিয়া আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

১॥ বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্বে খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগের

দিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য লিখিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা অন্যত্র[২০] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বড়ু চণ্ডীদাসকে যে চৈতন্যযুগের কবি বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রামাণিকতা উড়াইয়া দিয়াছিলেন—তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। আমরা বড়ু চণ্ডীদাসকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম।

কিন্তু এক বিষয়ে একটি সংশয় আছে: চৈতন্যদেব বড়ুর কাব্যটি আস্বাদন করিতেন কি? 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে যে, মহাপ্রভু রায় রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির পদ ও ভক্তিরসের অন্যান্য কাব্যনাটক পাঠ ও আস্বাদন করিতেন। বড়ুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বৃন্দাবনখণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণের উক্তি ও আচরণে বহু স্থলে রসাভাস সৃষ্টি হইয়াছে, ভক্তির মোড়কে তাহা ঢাকিয়া ফেলিবার উপায় নাই। মহাপ্রভু রসাভাসযুক্ত কাব্য পাঠে বা শ্রবণে অতিশয় বিরক্ত হইতেন। এইজন্য কোন কাব্য মহাপ্রভু শ্রবণের পূর্বে স্বরূপ-দামোদর পড়িয়া দেখিতেন যে, সে কাব্যে রসাভাস দোষ ঘটিয়াছে কিনা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রায় অর্ধেকটাই রসিকের নিকট রসের হানিকর মনে হইবে। চৈতন্যদেবের কাছে তাহা তো বিরক্তিকর হইবেই। তবে বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ অংশ দুইটিতে প্রেম ও গভীর আত্মনিবেদনের নিদর্শন আছে; এই অংশগুলি পাঠ করিলে চৈতন্যদেব বিরক্ত হইতেন না।

অবশ্য যথার্থই চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আস্বাদন করিতেন কিনা, এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত চণ্ডীদাসের গীতিকা বলিতে বড়ুর কাব্যকে নির্দেশ করিতেছে কিনা, তাহা সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায় না। যদি মহাপ্রভু এই কাব্য পাঠে আনন্দ লাভ করিতেন, তাহা হইলে পরবর্তী কালে ইহার কোন কপি পাওয়া যায় নাই কেন? মাত্র দু'একখানি তাল শিখিবার পুঁথিতে ইহার কয়েকটি পদের উল্লেখ আছে মাত্র। কেহ কেহ বলিবেন যে, চৈতন্য ও চৈতন্য-পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্ম, সমাজ ও রসের আদর্শ এমনভাবে বদলাইয়া গিয়াছিল যে, ইহার দুই একটি পদ ব্যতীত আর কিছুই রক্ষিত হয় নাই। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, "আদি কবি চণ্ডীদাসের

২০. বড়ু চণ্ডীদাসের সময় নির্ণয়ের জন্য লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদাবলী শ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ও পবিত্র বৈষ্ণবমতাবলম্বী বঙ্গ-সমাজে ভাষা ও ভাবের বিশেষ পরিবর্তন হেতু শ্রোতৃবর্গের দুর্বোধ্য ও অপ্রীতিকর হইয়া পড়িলে" শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ক্রমশঃ জনরুচি হইতে বহিষ্কৃত হইল। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, যাঁহার কাব্য স্বয়ং মহাপ্রভুর দ্বারা নিত্য আস্বাদিত হইত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে, রুচিপরিবর্তনের জন্য তাহা এমনভাবে অপ্রচলিত হইয়া পড়িল যে, তাহার আর কোন কপি পাওয়া গেল না? আমাদের মতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাক্-চৈতন্য যুগের গ্রন্থ, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু এ কাব্য চৈতন্যদেব আস্বাদন করিতেন কিনা তাহাতে ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। প্রথম কারণ এই কাব্যের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রচলিত অর্থে এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের দিক দিয়াও রসাভাস বা কাব্য-ঔচিত্যের হানি লক্ষ্য করা যাইবে। সুতরাং মহাপ্রভুর পক্ষে রসাভাসযুক্ত গ্রাম্যরুচির কাব্য-আস্বাদন দুঃসাধ্য হইত। দ্বিতীয় কারণ, এই কাব্যের দ্বিতীয় কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই বলিয়া মনে হয়, ইহা কদাপি মহাপ্রভুর দ্বারা পঠিত হইত না; হইলে বৈষ্ণবসমাজের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচার থাকিত—এবং ইহার একাধিক কপিও মিলিত। তাই বলিয়া আমরা এই কাব্যের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোন সংশয় তুলিতেছি না। বড়ু চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি তাহাতে আমরা সন্দিহান নহি। কারণ ইহার ভাব, ভাষা ও আদর্শ ইহাকে প্রাক্-চৈতন্যযুগে স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণা এই কাব্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের কোন সম্পর্ক নাই। তবে মনে রাখিতে হইবে ইনি প্রায় সর্বত্র বড়ু ভণিতা দিয়াছেন, বাশুলীকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও রামী রজকিনীর উল্লেখ করেন নাই,—এ কাব্যের কোথাও সহজিয়া মতের ইঙ্গিত মাত্র নাই। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাস রামী-চণ্ডীদাস কাহিনীর নায়ক নহেন।

২ ॥ নানা মত অনুসন্ধান ও বিচারবিশ্লেষণ করিয়া মনে হইতেছে যে, চৈতন্যের পূর্বে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বিচ্ছিন্ন পদাবলীর লেখক কোন এক চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন। ইহার পূর্বরাগ আক্ষেপানুরাগ ও ভাবসম্মেলনের পদগুলি অতি উৎকৃষ্ট। এই পদসমূহের ভাব ও আদর্শ দেখিয়া মনে হয়, চৈতন্যদেব ইহার পদ হইতেই অধিকতর আনন্দ লাভ করিতেন। চৈতন্য-

চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে চৈতন্যদেবের বিরহবিলাপের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীর আক্ষেপানুরাগের ভাবগত ঐক্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হইবে। তাই মনে হয়, মহাপ্রভু পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন। ইঁহাকে কেহ কেহ আদি চণ্ডীদাস বলিতে চাহেন। কোন কোন পদে 'আদি চণ্ডীদাস' ভণিতাও আছে। পরবর্তী কালে যখন একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হইল, তখন হয়তো কেহ কেহ আদি নাম দিয়া চণ্ডীদাসের কিছু কিছু পদকে পৃথক করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। 'আদি' নামটি বিশুদ্ধ জাল, এবং নকলনবীশের কারসাজি মাত্র। পূর্বতন চণ্ডীদাস 'আদি' নাম দিয়া কিরূপে পদ রচনা করিবেন? ইঁহার কোন কোন ভণিতায় 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' পাওয়া যায়। সুতরাং কবিকে কেহ কেহ দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিতে চাহেন। কিন্তু প্রাচীন পদসঙ্কলনে এবং কীর্তনীয়াদের পুঁথিতে দীন-দ্বিজ-বড়ু বিশেষণ এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, কোন্‌টি যথার্থ পূর্ব-চৈতন্যযুগের পদ তাহা নির্ধারণ করা একটু দুরূহ ব্যাপার। পদের উৎকর্ষ ধরিয়া বিচার করিলে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত মাত্র ৪০-৫০টি পদকেই চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া ধরিতে হয়। মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় মনে করিতেন যে, রূপ গোস্বামীর গ্রন্থ ও ভাবাদর্শের বশে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট পদ রচিত হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কালের দীন চণ্ডীদাসের রচনা। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে এই জাতীয় পদগুলি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামক আর একজন উত্তর-চৈতন্যযুগের কবির রচনা। এ বিষয়ে অন্যদিক হইতে আর একটু ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'র কোন কোন শ্লোকের সঙ্গে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদের ভাব ও আদর্শগত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই সেই পদগুলি রূপ গোস্বামীর আদর্শে পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত অনুমান মাত্র। এরূপ হইতে পারে যে, রূপ গোস্বামীই চণ্ডীদাসের ভাবাদর্শ নিজ নিজ রচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি চণ্ডীদাসের পদাবলী মহাপ্রভু আস্বাদন করিয়া থাকেন—এই মত আমরা মানিয়া লই, তাহা হইলে এই চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের ভাবাদর্শ ও কবিত্বের দ্বারা রূপ গোস্বামী কি অনুপ্রাণিত হইতে পারিতেন না? সনাতন গোস্বামী যদি সংস্কৃতগ্রন্থের সংস্কৃত টীকায় কাব্য শব্দ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেশভাষায় রচিত 'শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি'র উল্লেখ করিতে পারেন, তাহা হইলে চৈতন্যভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া রূপ গোস্বামী গ্রন্থ রচনা করিলে তাহাতে

বিস্ময়ের কি আছে? শুধু রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত রচনার সঙ্গে পদাবলীর চণ্ডীদাসের কোন কোন পদের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে আর একজন উত্তর-চৈতন্যযুগের পৃথক কবি কল্পনা করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। দুঃখের বিষয়, যে-চণ্ডীদাসের পদ মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন বলিয়া আমরা অনুমান করি, তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। পরবর্তী কালের ভণিতায় এমন গোলমাল হইয়া গিয়াছে যে, এই চণ্ডীদাসকে নান্নুর ও রামীঘটিত কাহিনীর সঙ্গে জড়িত করা যায় না। কারণ ইনি যদি রামীর সঙ্গে 'নীচপ্রেমে উন্মত্ত' হইতেন, তাহা হইলে চৈতন্যগোষ্ঠীতে ইঁহার কবিতা এত শ্রদ্ধাসহকারে পঠিত হইত না, স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে ইঁহার গীতি শুনাইতে ভরসা পাইতেন না। উপরন্তু রামী-চণ্ডীদাসের চণ্ডীদাস সহজিয়া মন্ত্রের সাধক ছিলেন। সহজিয়া সাধনার জন্যই তিনি রামীর সাহায্য কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়া আদর্শ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৈষ্ণবসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়—তাহার পূর্বে নহে। চৈতন্য-তিরোধানের পর শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের মধ্যে নাগরীভাবের সাধনা প্রচারলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) সহজিয়া মতাবলম্বীদিগকে বৈষ্ণব সমাজে স্থান দিবার পর ইহারা সহজিয়া বৈষ্ণবমত সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ব্যাপার সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঘটাই সম্ভব। ইহারা বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হইলেও নিজেদের পূর্বতন সংস্কার ছাড়িতে পারে নাই, বিরাট বৈষ্ণবসমাজে একটা গোপনচারী উপসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই জন্য প্রাক-চৈতন্যযুগের পদাবলীর চণ্ডীদাসে এই সহজিয়া মতের সংস্পর্শ থাকা সম্ভব নহে।/

৩॥ এবার দীন চণ্ডীদাসের কথা। মণীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ পদাবলীর কিয়দংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রাম হইতে এই দীন চণ্ডীদাসের একটি পূর্ণতর পালাগানের বৃহৎ পুঁথি পাইয়াছেন এবং ডঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তারিতভাবে এই নবাবিষ্কৃত পুঁথিটির পরিচয় দিয়াছেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদে দীন-দ্বিজ-আদি-কবি-বড়ু প্রভৃতি নানা বিশেষণ যথেচ্ছা ব্যবহৃত হইয়াছে। অসতর্ক পদসঙ্কলকগণ ও অমনোযোগী কীর্তনীয়ারা

ককাহেতোতে আমিকিকরিব ঊড়িয়াজাইতেতেজ । সেফনবাঙ্গিন ওপ্রেরবরোতে সায়
রেপড়িলসেজে ॥ দেবআবিমান নাহেসমাধান ফলেরকারনেক্ষুরে । চণ্ডিদাসবলে পুজি
নেপাইবে অবশ্যসায়রজলে ॥ ৬ ॥ দেবগনজত হৈত্তা একত্রিত ককনবদনেচায় । কিহ
ন্য২ দেয়াসেনাদিন একথাকহিবকায় ॥ হেনকসময়ে নারদআইলা দেবতাসমাঝজ
স্থ । বেষ্ঠিতহইয়া পুছেনকারন কিহেতুশুনিএকথা ॥ কন্দনময়ন কিসেরকারন :
কহদেখিসুনিতাই । কেনবাদ্দঃখিত দেখিএঅন্তর কহদেখি মোরঠাকিত ॥ সবাদেবগন
কাহিতেনাগান জতেককারনকথা । সুনহবচন জিসেরকারন মোসবাপাইএবেথা ॥
কপ্পতরুফল গোলোকসম্পদ সকনজানহতুমি । সেইফলেকত অমিত্তাসাছএ তাহানা
বুঝিবজানি ॥ একশুকবরে তোজিনগোলোকে সেফলআনলতুলি । ওপ্রেরউপারে উড়ি
য়াজাইতে সেফলকতিনাগোলি ॥ এককাহেআছে এতিনসায়রে পাতিলদিগুনহৈথা । ফ
লাপেনিজলে আসিসুকবরে কহিতেনাগনাসিণ্ডা ॥ সুনিঞানারদ দেবেরবচন কহিতে
নাগনতায় । ইহারউপায় কহিবসকল দিনচণ্ডিদাসগায় ॥ ৭ ॥ সুনহকারন আমার

দীনচণ্ডীদাসের পালাগানের পুঁথির এক পৃষ্ঠা

অধিকাংশ স্থলে এইরূপ ভণিতার গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। বড়ু ভণিতাযুক্ত যত পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির রচনা নহে। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভিন্ন অন্য কোন বিচ্ছিন্ন পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও 'দীন' ভণিতা আছে। এই দীন চণ্ডীদাস কে তাহা লইয়া কিছুকাল পূর্বে কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন অনুমান করিয়াছিলেন, চণ্ডীদাসের নামে যে সমস্ত পদ চলিতেছে, তাহার সবই যে চণ্ডীদাসের রচনা, তাহা নহে। 'জন্মলীলা', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'রাসলীলা'র পালাগুলি চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া গেলেও ইহার সুর পদাবলীর চণ্ডীদাসের সঙ্গে মিলিতেছে না বলিয়া ব্যোমকেশ মুস্তফী, নীলরতন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গবেষকগণ পূর্বেই সন্দেহের কথা তুলিয়াছিলেন,—তাঁহাদের মতে বহু পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গেলেও, চৈতন্যদেব যে-চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন, সে-চণ্ডীদাসের রচিত পদের সংখ্যা খুব বেশি নহে, অথচ নীলরতনবাবু সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রায় নয়শত পদ সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয় যে, কবিযশঃপ্রার্থী অনেক ব্যক্তি চণ্ডীদাসের বকলমে অসংখ্য পদ লিখিয়াছিলেন। বসন্তরঞ্জন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পরে অনেকে নিশ্চিত হইয়াছিলেন যে, প্রাক্-চৈতন্য ও পর-চৈতন্যযুগের দুই চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা হইতে মণীন্দ্রমোহন বসু দীন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক এক বিরাট পালাগানের পুঁথির কিয়দংশ আবিষ্কার করিলেন। পরে দীন চণ্ডীদাসের আরও কিছু পদ মিলিল, সম্প্রতি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দীন চণ্ডীদাসের আর একখানি পূর্ণতর পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। মণীন্দ্রমোহনের মতে পদাবলীর চণ্ডীদাস বলিতে দীন চণ্ডীদাসকে নির্দেশ করিতে হইবে। ইনি শুধু বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করেন নাই, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুরাণের ছায়া অবলম্বনে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ে মস্তবড় এক কাব্য রচনা করেন। পদসঙ্কলনে ইঁহার উৎকৃষ্ট পদগুলি গৃহীত হইয়াছিল, মধ্যম বা নিকৃষ্টশ্রেণীর পদগুলি স্বভাবতই সঙ্কলনে গৃহীত হয় নাই। বাঙালী পাঠক এতদিন ধরিয়া দীন চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদগুলির সন্ধান জানিত। তিনি যে পালাগানের এক বিরাট পদাবলী লিখিয়াছিলেন, তাহা মণীন্দ্রবাবু প্রমাণ করিয়াছেন। অবশ্য সঙ্কলনে ধৃত

চণ্ডীদাসের পদগুলির তুলনায় দীন চণ্ডীদাসের পালাগানের পদসমূহ মধ্যম-শ্রেণীর, কখনও বা আরো নিকৃষ্ট। দীন চণ্ডীদাসের পালাগানের পুঁথিতে হাজার দুই পদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে এই দুই হাজারের মধ্যে কুড়িটি উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। তাই কেহ কেহ মণীন্দ্রমোহন বসু আবিষ্কৃত দীন চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস দুইজনকে পৃথক কবি বলিয়া মনে করেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করিয়াছেন যে, দীন চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, এবং খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কবি। দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইনি কোথাও বাশুলীর উল্লেখ করেন নাই, ইঁহার কোন পদে রামীরও ইঙ্গিত নাই। হরেকৃষ্ণ ইঁহাকে সহজিয়া মতের কবি বলিলেও, আমরা তাঁহাকে সেভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। চণ্ডীদাস ও কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির মিলন বিষয়ক যে সমস্ত পদ পাওয়া গিয়াছে, অনুমান হয় নরোত্তমের শিষ্য দীন চণ্ডীদাস ও ছোট বিদ্যাপতি (কবিরঞ্জন) তাহার উদ্দিষ্ট কবি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আলোচনা করা প্রযোজন। পালাগান লেখক দীন চণ্ডীদাস উত্তর-চৈতন্যযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ধরা যাক তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। তিনি চৈতন্যপ্রবর্তিত ভক্তিধর্মে নিষ্ণাত ছিলেন, অথচ তিনি গৌরাঙ্গবিষয়ক একটি পদও লিখেন নাই। ইহার কারণ কি? দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। উক্ত কবির প্রচারক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ও ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। যে দীন চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের বন্দনা (পূর্বে পাদটীকায় উদ্ধৃত) লিখিয়াছিলেন ('বীরভূমি বিবরণ'---৩য়), তিনি চৈতন্য বিষয়ক একটা পদও রচনা করেন নাই। কিন্তু কেন করেন নাই তাহাই প্রশ্ন, এবং এখনও পর্যন্ত সে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় নাই। নূতন কোন তথ্য বা সূত্র না পাওয়া গেলে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না।

আরও একটা কথা—জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের অনুসরণে বাংলা পদ লিখিয়াছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বলাই বাহুল্য জ্ঞানদাস যে-চণ্ডীদাসকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তিনি মণীন্দ্রমোহন কথিত দীন চণ্ডীদাস নহেন, কারণ তাহা হইলে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস একই সময়ের কবি হইয়া পড়িবেন, কে কাহাকে অনুসরণ করিবেন?

দীন চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে উপস্থিতক্ষেত্রে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দীন চণ্ডীদাস নামক একজন স্বল্পপ্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, যিনি রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে বিরাট পালা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা অতিশয় নীরস, কবিত্বপ্রতিভাবর্জিত, সাধারণ স্তরের লেখনীকণ্ডূয়ন মাত্র। মণীন্দ্রমোহন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত যাবতীয় পদকে দীন চণ্ডীদাসের ক্ষীণ স্কন্ধে আরোপ করিয়াছেন, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

৪ ॥ সর্বশেষে তথাকথিত সহজিয়া চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করিতে হয়। চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত 'রাগাত্মিকা' পদাবলীর জন্য কেহ কেহ আর একটি স্বতন্ত্র চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করিয়াছেন। পূর্ব-চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাস সহজিয়া পদ লিখিতে পারিতেন না, কারণ সেযুগে বৈষ্ণব সহজিয়াদের পিরীতি সাধনার উৎপত্তি হয় নাই। দীন চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলাগান রচনা করিলেও বাশুলী বা রামী ঘটিত কোন ইঙ্গিত দেন নাই। সুতরাং সহজিয়া পদ ও রামীঘটিত কাহিনী তাঁহার উপর অর্পণ করা যায় না, এবং এই জন্যই রাগাত্মিকা পদ ও সহজিয়া মতের গানগুলির জন্য আর একজন স্বতন্ত্র চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করিতে হয়। বিমানবিহারী বাবু অনুমান করিয়াছেন যে, সহজিয়া মতের চণ্ডীদাস বলিয়া কোন কবি বর্তমান ছিলেন না। সহজিয়ারা চণ্ডীদাসের নামটাকে নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া তাঁহার ভণিতা দিয়া সহজিয়া মতের অনুকূলে পদ লিখিয়াছিলেন। একথা অবশ্য সত্য যে, সহজিয়া চণ্ডীদাসের পদেই সবচেয়ে বেশী ভেজাল চলিয়াছে। প্রথমতঃ সহজিয়া বৈষ্ণব মত গোপনচারী; গোপনতা অবলম্বনকারী সাহিত্য ও ধর্মে এইরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ সহজিয়ারা নিজ নিজ উপসম্প্রদায়গত ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠানকে বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধার্হ করিবার জন্য নিজেদের অপদার্থ পদকে রূপ গোস্বামী, স্বরূপ দামোদর, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি ও আচার্যদের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সহজিয়া পদের কোন চণ্ডীদাস কবি ছিলেন না, শুধু সহজিয়ারা নিজেদের দল পরিপুষ্ট করিবার জন্যই একজন সহজিয়া চণ্ডীদাস খাড়া করিয়াছিলেন, এ ধারণা একেবারে অসম্ভব না হইলেও পুরাপুরি সত্য কিনা সন্দেহের বিষয়। একজন কাল্পনিক কবিকে লইয়া এত

উপকথা প্রবাদ সৃষ্টি হইতে পারে না। যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে সহজিয়া সম্প্রদায়ে কোন একজন কবি চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, যিনি সম্ভবতঃ রামী রজকিনীর সাধনসঙ্গী ছিলেন। ইঁহার নামে বীরভূমের নান্নুর গ্রামে এবং বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে নানা উপকথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। সহজিয়াদের নানা পুঁথিপত্রে চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামী সংক্রান্ত অনেক গল্প আছে। নূতন কোন তথ্য পাওয়া না গেলে সহজিয়া মতের একজন পৃথক চণ্ডীদাসকে মানিয়া লইতে হইবে, এবং তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিলে রামীঘটিত উপকথাকেও কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি দিতে হইবে। অবশ্য ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের অনুমান সত্য যে, সহজিয়া মতের বহু কবি চণ্ডীদাসের ভণিতায় রাশি রাশি পদ জড়ো করিয়া অনাবশ্যক জঞ্জালের স্তূপ বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাক্-চৈতন্যযুগের বড়ু চণ্ডীদাস, পদাবলীর চণ্ডীদাস বা উত্তর-চৈতন্যযুগের দীন-চণ্ডীদাস অপেক্ষা সহজিয়া চণ্ডীদাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্তর ও মনের কবি। প্রচলিত গল্পকাহিনী তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে।

চণ্ডীদাস-সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিলাম। এখনও দৃঢ় নিশ্চয়তা সহ চণ্ডীদাস-সমস্যা সমাধান করিবার মতো উপাদান পাওয়া যায় নাই। তাই অনুমান ভিন্ন গত্যন্তর নাই। নানা উপকরণ এবং নানা বিশেষজ্ঞের মতামত আলোচনা করিয়া আমরা চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদে যে চারিটি পৃথক ধারা লক্ষ্য করিয়াছি (প্রাক্-চৈতন্যযুগের বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদ এবং উত্তর-চৈতন্যযুগের দীনচণ্ডীদাসের পালাগান ও সহজিয়া চণ্ডীদাসের সাধন-ভজন সংক্রান্ত পদ), তাহার তথ্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা চণ্ডীদাস নামক চারিজন কবির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইয়াছি। দাস উপাধিক অসংখ্য পদকর্তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদসাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় চারি শতাব্দীর (১৫শ—১৮শ) মধ্যে চারিজন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। এখন কথা হইতেছে, "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?" কোন্ দেবতাকে যজ্ঞহবিঃ দান করিব? কোন্ চণ্ডীদাসকে খ্যাতির পুষ্পচন্দনে অভিষিক্ত করা যাইবে? নূতন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাইলে এবিষয়ে চূড়ান্ত 'রায়' দেওয়া সম্ভব নহে।

দ্বাদশ অধ্যায়

চণ্ডীদাসের কবিত্ব

সূচনা ॥

চণ্ডীদাসের পদের জনপ্রিয়তার প্রধান প্রমাণ আধুনিক কালে তিনি মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত ও পরিচিত কবি। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত গল্পকাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার চারিদিকে ভক্তির জ্যোতির্ময় আলোকবলয় রচিত হইয়াছে,—তাহার কারণ তাঁহার সহজ সাদা ভাষায় রচিত পদগুলিতে আবেগ, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একটা ব্যাখ্যার অতীত অধ্যাত্ম চেতনা গোপনে প্রবাহিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, রায়শেখরের অলঙ্কারমুখর বিচিত্র বাকনির্মিতির প্রতি সাধারণ পাঠক, ভক্তসম্প্রদায় ও সাহিত্য রসিকের অধিকতর আকর্ষণ থাকিলেও চণ্ডীদাসের পদের অনাবৃত প্রাণের নিরাভরণ আনন্দ-বেদনার মেদুর মুহূর্তগুলি পাঠকের মনে যে প্রশান্তি, স্নিগ্ধতা ও প্রাপ্তির আনন্দঘন উপলব্ধি সৃষ্টি করে, তাহার মূল্য অনেক। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোল্‌রীজের মধ্যে কবিত্ব, সৃষ্টিশক্তি কল্পনার বৈচিত্র্য বিচার করিলে কোলরীজই অধিকতর প্রশংসা দাবি করিবেন। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহজ সুরে গীত জীবনরসের আকর্ষণও বড় কম নহে। পদাবলীর চণ্ডীদাস সহজ সুরে এবং উপলব্ধির সরলতায় আজ চারিশত বৎসর ধরিয়া বাঙালী পাঠকের মনে অক্ষয় আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলিবেন যে, চণ্ডীদাসের এই জনপ্রিয়তা আধুনিক কালের ব্যাপার। 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি' নামক আদি বৈষ্ণব পদসঙ্কলনে চণ্ডীদাসের একটি পদও গৃহীত হয় নাই। 'পদামৃতসমুদ্রে' চণ্ডীদাসের পদ আছে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অন্যান্য পদকারদের পদের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ। 'পদকল্পতরুতে' চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা কিছু বেশী, কিন্তু তাহাই বা এমন কি বেশী? গোবিন্দদাসের পদসংখ্যা বিচার করিলে চণ্ডীদাসের পদগুলির সংখ্যা কোনক্রমেই আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইবে না। তাই মনে হয়, যত দিন গিয়াছে, ততই চণ্ডীদাসের পদাবলীর আদর বাড়িয়াছে। সর্বশেষে উনবিংশ শতাব্দীর ৭ম-৮ম

দশকে আধুনিক শিক্ষা ও নব্যহিন্দুধর্মের প্রভাবের ফলে অধ্যাত্মরসরঞ্জিত পদাবলীর চণ্ডীদাস শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন।

উল্লিখিত যুক্তি কিন্তু ততটা প্রমাণসহ নয়। চৈতন্যযুগ হইতেই চণ্ডীদাসের পদাবলী অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল—চণ্ডীদাসের ভণিতার নানা গোলমাল এবং রামী-চণ্ডীদাস ঘটিত গালগল্পের দ্বারা তাহাই মনে হয়। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে চণ্ডীদাসের কোন পদ না থাকিবার কারণ, এই সঙ্কলনে পদসমূহ যে পর্যায় অনুসারে সজ্জিত হইয়াছে চণ্ডীদাস সে ধরণের পদ রচনা করেন নাই। পরবর্তী সঙ্কলনগ্রন্থগুলি পদাবলী কীর্তনের জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল। অলঙ্কারমুখর, ভাষাচাতুর্যপূর্ণ পদ, বিশেষতঃ ব্রজবুলি মিশ্রিত পদের প্রতি কীর্তনীয়া ও সঙ্কলকগণের অধিকতর আকর্ষণ ছিল। তাই প্রায় সমস্ত পদসঙ্কলনে চণ্ডীদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যা অধিক। কিন্তু কবিত্ব ও ভক্তির গভীর ব্যঞ্জনা বিচার করিলে পদাবলীর চণ্ডীদাসকে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া চণ্ডীদাস॥

এই প্রসঙ্গে দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া চণ্ডীদাসের কবিত্ব সম্পর্কে দুই এক কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। বিরাট পালাগানের লেখক দীন চণ্ডীদাসের পদ সংখ্যা প্রায় অগণিত বলিলেই চলে। কিন্তু অধিকাংশ পদেই বিশেষ কোন কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কবি পুরাণ ও বৃন্দাবন গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে রাধা-কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যে সুবৃহৎ পালাগানের পুঁথি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ধারাবাহিক ভাবে রাধা-কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছেবটে, কিন্তু বিস্ময়কর সৃষ্টিশক্তির অভাবই দীন চণ্ডীদাসের কল্পনা ও প্রতিভার দীনতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। পালাগানটিতে কাহিনীচাতুর্য থাকিলেও রচনাচাতুর্য নাই, ভাবের ঐকান্তিক গভীরতা নাই, মণ্ডনকলায় কোন উজ্জ্বলতা নাই। ছন্দ অলঙ্কারে তিনি পুঁথিপড়া বিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা রচনার সঙ্গে অবিনাভাবে অদ্বয় সম্পর্ক লাভ করিতে পারে নাই। প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলীর চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁহার তুলনাই চলে না। সে আর্তি, সে আবেগ, সে গভীর মর্মব্যঞ্জনা দীন চণ্ডীদাসের বিপুলকলেবর পদসংগ্রহে প্রায় নাই বলিলেই চলে। এদিক দিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনাচাতুর্য ও

কবিত্বশক্তিতে অনেক উৎকৃষ্ট। তাই তো সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, বড়ু চণ্ডীদাসের পক্ষে তবু পদাবলীর চণ্ডীদাস হওয়া সম্ভব, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পক্ষে কিছুতেই পদাবলীর চণ্ডীদাস হওয়া সম্ভব নহে। অথচ পদাবলীর চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাসের অবলম্বিত বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য রহিয়াছে, বরং বড়ু চণ্ডীদাস বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে যেন দলছাড়া। কিন্তু বড়ুর ছন্দ, অলঙ্কার, কল্পনা-শক্তি, বাকনির্মিতি প্রভৃতি রচনা-কৌশল বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। একমাত্র বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস যথার্থ কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, দীনচণ্ডীদাসের সেরূপ আবেগ ও কল্পনাকুশলতা নাই। তাঁহার পালাগানের পদাবলী অতিশয় নীরস—শুষ্ক ঘটনাবিবৃতি মাত্র। দীন চণ্ডীদাস উপাদান-কঙ্কালে লাবণ্য সঞ্চার করিতে পারেন নাই। যাহাকে ইংরাজীতে 'uninspired' লেখা বলে, দীনচণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদই সেই প্রকার uninspired, আবেগ উত্তাপহীন, প্রথাপালনের পদাবলী হইয়াছে।

(সহজিয়া চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত রাগাত্মিকা, প্রহেলিকা ও প্রচ্ছন্ন তাৎপর্যপূর্ণ পদগুলির কোন কোনটি বুদ্ধির ঝলকে উজ্জ্বল, কোনটির রূপক-প্রতীক প্রশংসার যোগ্য, কোথাও কোথাও কল্পনাশক্তি শিল্পরূপ লাভ করিয়াছে। দুঃখের বিষয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণের পর চণ্ডীদাসের আর কোন প্রামাণিক সংস্করণে সহজিয়া চণ্ডীদাসের পদ সঙ্কলিত হয় নাই। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ১ম খণ্ডে শুধু উল্লিখিত হইয়াছিল যে, ঐ গ্রন্থের ২য়-৩য় খণ্ডে দীন চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে সহজিয়া চণ্ডীদাসের পদগুলিও সঙ্কলিত হইবে। কিন্তু এই ২য়-৩য় খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নাই। মণীন্দ্রমোহন বসু দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর ২য় খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছিলেন যে, ৩য় খণ্ডে সহজিয়া পদাবলী সঙ্কলিত হইবে। কিন্তু তাঁহারও ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বৈষ্ণব পদাবলী' নামক যে বৃহৎ সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদগুলি রহস্যজনক ভাবে অনুপস্থিত। কেবল ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর নূতন সংস্করণে ১৯টি সহজিয়া পদ স্থান পাইয়াছে। যে চণ্ডীদাস 'শুনহে মানুষ ভাই' পদটি লিখিতে পারেন, তাঁহার

কবিত্বশক্তি তুচ্ছ করিবার মতো নহে। অবশ্য আধুনিক পাঠকগণ এই পংক্তিতে যেরূপ মানবতাবাদের (humanism) নিদর্শন পাইয়াছেন, ইহার প্রকৃত অর্থ কিন্তু সেরূপ নহে—চণ্ডীদাস আধুনিক যুগাদর্শে এ পদ রচনা করেন নাই। সহজিয়া মতের 'আরোপসিদ্ধি' তত্ত্ব ব্যাখ্যায় মানুষের সহায়তা ভিন্ন সিদ্ধি লাভ হয় না—এই উক্তিটির ইহাই প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য। এখানে সহজিয়া চণ্ডীদাসের কয়েকটি কবিত্বপূর্ণ ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে :

(১) শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥

(২) তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও পিতৃ মাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥

(৩) রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥

(৪) আমার পরাণ- পুথলি লইয়া
নাগর করয়ে পূজা।
নাগর পরাণ- পুথলি আমার
হৃদয় মাঝারে রাজা॥

(৫) মাটির জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস॥

অবশ্য এই সমস্ত পদের ভাষা এত আধুনিক যে, ইহাকে তিনচারিশত বৎসরের পুরাতন বলা দুরূহ। এই ধরণের পদে কত ব্যক্তির যে হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে তাহার হিসাব নাই। সহজিয়া চণ্ডীদাস গূঢ় ধর্মপ্রণালী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এমন সমস্ত পংক্তি ও রূপক-প্রতীক ব্যবহার করিয়াছেন যাহা বাহিরের দিক হইতে প্রহেলিকা ও অর্থহীন মনে হয়। যেমন—

মা বাপ জনম না ছিল যখন
আমার জনম হল।
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল ॥

অথবা

সুমেরু উপরে ভ্রমর পশিল
একথা বুঝিবে কে।
চণ্ডীদাস কহে রসিক হইলে
বুঝিতে পারিবে সে ॥

এ রসিক শুধু কাব্যরসিক নহে, সহজিয়া সাধনার রসিক না হইলে এই 'প্রবর্তযাগ' বুঝিতে পারিবে না। সহজিয়া মতের পারিভাষিক শব্দপরম্পরা এবং তন্ত্রাশ্রিত যোগসাধনার মোটামুটি স্বরূপ না জানিলে এই সমস্ত সহজিয়া পদের তাৎপর্য গ্রহণ অনেক সময়ে অসুবিধার সৃষ্টি করে। তবে কবি বহু স্থলে দুরূহ পারিভাষিক সাধনভজনের কথা বলিলেও বক্তব্যের ভঙ্গিমার মধ্যে চারুত্ব আছে। যেমন—

মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পিরীতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ ॥

কিংবা

গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ ॥
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ ॥

এই সমস্ত তত্ত্বসাধনার পদেও যে মাঝে মাঝে কবিত্ব ফুটিয়াছে তাহার কারণ সহজিয়া চণ্ডীদাস মূলতঃ কবি, তাহার পরে সাধক। তাই তাঁহার সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বও মাঝে মাঝে কবিত্বমণ্ডিত হইয়াছে।

পদাবলীর চণ্ডীদাস ॥

এবার আমরা পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব। চণ্ডীদাসের পদাবলীর যদি কোন একটি স্থায়ী সুর থাকে, তবে তাহা

বেদনার সুর, আক্ষেপানুরাগের সুর।[১] বিদ্যাপতির পদে যেমন ঐকান্তিক আর্তির সঙ্গে বিলাসবিভ্রম ও মিলনোল্লাসের তীব্র বিষামৃত পরিবেষিত হইয়াছে, পদাবলীর চণ্ডীদাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। বস্তুতঃ নিছক দেহকেন্দ্রিক মিলনরভস, কায়াকান্তির আসবমত্ততা—এ সমস্ত পদাবলীর চণ্ডীদাসে বিশেষ নাই। কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনায় কিছু কিছু বাস্তব সৌন্দর্যের বিলাসবিভ্রম ও দেহচাঞ্চল্যের ইঙ্গিত আছে বটে ; যেমন রাধার রূপ সম্বন্ধে সখীর নিকট কৃষ্ণের উক্তি :

সই মরম কহিয়ে তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করল মোরে ॥
ফুলের গেঁড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস ॥

কিংবা

উচ কুচমূলে হেমহার দোলে
সুমেরুশিখর জিনি।

কিন্তু রাধার এই দেহচাঞ্চল্য যেন চণ্ডীদাসের রচনার সঙ্গে খাপ খায় না। তাই শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় 'ফুলের গেঁড়ুয়া' ইত্যাদি পংক্তিগুলিকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলীর চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে, "এ প্রগল্‌ভার চিত্র চণ্ডীদাসের নহে। অঙ্গের বসন ঘুচাইয়া-সঘনে ঝাঁপিয়া লওয়া, সহাস কটাক্ষ, ফুলের গেঁড়ুয়া লুফিয়া ধরিবার কালে পার্শ্বদেশ প্রদর্শন—এই যে রূপ দেখাইয়া নায়ককে ভুলাইবার চাতুরী", ইহা চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে না। কারণ চণ্ডীদাসকে আধ্যাত্মিক কবি বলিয়া গ্রহণ করিবার একটা রেওয়াজ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয়, রাধার দেহসৌন্দর্যের লীলাচাঞ্চল্য কৃষ্ণের পক্ষ হইতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রাধার দেহসৌন্দর্যের প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ-অনুরাগ বর্ণনা করিতে গিয়া চণ্ডীদাসকে কিছু কিছু আদিরসাত্মক চিত্রকল্প গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা সব সময়ে কৃষ্ণের জবানীতে উক্ত হইয়াছে,

[১] পূর্বে (১০ম অধ্যায়) আক্ষেপানুরাগ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

রাধার দিক হইতে কোন চাঞ্চল্য, দেহজ কোন আকর্ষণই পদাবলীর চণ্ডীদাসে নাই। সিক্তবসনা শ্রীরাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণের উক্তি :

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ জ্বরে ভোর॥

এখানে প্রথম তিন পংক্তিতে দেহসৌন্দর্যের এক অপূর্ব সূক্ষ্মরসের ব্যঞ্জনা ফুটিয়াছে, কিন্তু শেষের তিন পংক্তিতে সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি 'মনমথ জ্বরের' উত্তাপে উবিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আমরা বলিতে চাহি যে, পদাবলীর চণ্ডীদাস দেহের কবি নহেন, আনন্দ-বিলাসের কবি নহেন। যেখানে তিনি একটু আধটু দেহের কথা বলিয়াছেন, সেখানে তাহার সবটাই কৃষ্ণের উক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও দেহের কথা বলিতে গিয়া কবি পুরাপুরি সার্থক হইতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির রাধা যেমন দেহের পানপাত্রে অনঙ্গরঙ্গের ফেনোচ্ছ্বসিত সুরা পান করিয়াছেন, চণ্ডীদাসের রাধা সেরূপ নহেন ; তাঁহার দেহের যৌবন দেহেই শুব্ধ হইয়া আছে, বিদ্যাপতির রাধার মতো তাহা পাখা মেলিয়া উড়িতে চাহিতেছে না। চণ্ডীদাসের মনোভাবটি বিদ্যাপতির প্রায় বিপরীত। তাই তিনি প্রায় কোথাও প্রেমরঙ্গের তরঙ্গভঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। যখন তিনি রাধাকৃষ্ণের পিরীতির কথা বলেন, মিলনের বর্ণনা দেন, তখন তাহাতে 'দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাস' ও অনুত্তপ্ত ইঙ্গিতই অধিকতর ফুটিয়া ওঠে। রাধা স্বপ্নে দেখিতেছিলেন যেন কৃষ্ণ :

মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করিল কোলে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইনু বলে॥
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।

কিন্তু "পরশ করিতে রস উপজিল, জাগিয়া হৈনু হারা।" জাগ্রতে মিলন-রভস বর্ণনায় চণ্ডীদাসের লেখনী যেন কিঞ্চিত সঙ্কুচিত। অকস্মাৎ এই সুখস্বপ্নভঙ্গের পর রাধার অন্তরটি কিরূপ হায় হায় করিয়া উঠিল ?

কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।

ঠিক তেমনি রাধার সমাজ-সংসার তাড়িত ভীরু কপোতহৃদয়টি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এখানে লক্ষণীর মিলনের আনন্দোল্লাসের চেয়ে স্বপ্নভঙ্গের ব্যথাটাই তীব্রতর হইয়াছে। মিলন বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণের "রূপ নিরীক্ষণ, করে ঘনেঘন, তিলেক নাহিক বাধা।" বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনায় কবিগণ কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। সেই সমস্ত উতরোল বর্ণনায় দেহ ও দেহাতীত, কাম ও প্রেমের সীমারেখা প্রায়ই মুছিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসের দুই একটি পদে এরূপ সম্ভোগচিত্র যে নাই তাহা নহে—

বিগলিত কেশ কুন্তল শিখিচন্দ্রক
বিগলিত নিতল নিচোল।
দুহুক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেমহিলোল॥

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেহের উল্লাসের চেয়ে মুগ্ধ রূপোল্লাসই পরিস্ফুট হইয়াছে— "দুঁহুঁ রূপ নিরখিতে বিছুরল ইহ পরকাল।"

রসভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই
ঝাঁপই দুহুঁ দোহাঁ আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি নিভায়ল আনল
পাওল বিরহক ওর॥

এখানেও 'দুঁহুঁ তনু' রভসসমুদ্র পার হইয়া "অনিমেষে রহুল ধন্ধে"। এই এই অংশেও সেই নিমেষনিহত রূপোল্লাস—যেখানে দেহটি আসক্তির আধারে পরিণত হয় নাই, জন্মান্তরীণ বিস্ময়রসে নির্বাক হইয়া গিয়াছে। এই জন্য চণ্ডীদাসকে অধ্যাত্মরসের কবি বলা হইয়াছে।

অধ্যাত্মচেতনার বিচিত্র রূপটি রাধার 'ভাবসম্মেলনে' চমৎকার ফুটিয়াছে। শত বর্ষের বিরহ-ব্যবধানের পর রাধাকৃষ্ণের মিলন হইতেছে—"শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে"—কিন্তু এ তো মিলন নহে, এ যে ভাবসম্মেলন,— ভাবজগতে স্বপ্নসম্ভব মিলনের আর্তি। রাধা অভিমান করিয়া বলেন :

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥

এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভালো॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥

কখনও-বা অশ্রুহাসিতে মাখামাখি স্বরে শ্রীমতী রাধা বলেন :

আনের আনেক আছে কত জন
রাধার কেবল তুমি।
ও দুটি চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইনু আমি॥

কিংবা সেই আশ্চর্য তদ্গত চিত্তের অপার্থিব অনিকেত আত্মনিবেদন :

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়॥
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥

আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি।

এ ভাষা একেবারে মেয়েলি ভাষা, কুলবধূর পীড়িত মনের ব্যথাবেদনা এ ভাষায় সহানুভূতির রসে মূর্ত হইয়াছে। বোধহয় এই পদটির সমতুল্য আত্ম-নিবেদনের কবিতা সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও বড় বেশি নাই:

বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপগোয়ালিনী হাম অতিহীনা
না জানি ভজনপূজন॥
পীরিতি রসেতে ঢালি তনুমন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণ খানি॥

এই পদটির যে-কোন পংক্তি হইতেই মর্ত্য প্রেম ও অধ্যাত্ম অনুভূতির নিবিড় আস্বাদ পাওয়া যাইবে। তাই চণ্ডীদাস নিছক দেহ-সৌন্দর্যের কবি নহেন, প্রেমরসেরও পদকার নহেন। দেহকে অবলম্বন করিয়া এই প্রেমের যাত্রা; কিন্তু "আমার এই দেহখানি তুলে ধর, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর—" ইহাই চণ্ডীদাসের ভাবসম্মেলনের অধিকাংশ পদের অর্থ। পরবর্তী কালের

বৈষ্ণব পদসাহিত্যের নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও শ্রীরাধার এই আত্মসমর্পণ ও আত্ম-বিসর্জন বৈষ্ণব পদাবলীর এক দুর্লভ সম্পদ।

চণ্ডীদাস যে বেদনার কবি, তাহা আক্ষেপানুরাগের পদগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রাধা নিজ দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন :

রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু ব'ধু তোমার পিরীতি ॥

এক দিকে তিনি দয়িতের নিকট অবহেলা পাইতেছেন, অপর দিকে "ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই।" সকলই যে তাঁহার ভাগ্যের দোষ—"সকলি আমার দোষ হে বন্ধু, সকলি আমার দোষ।" তাই পরিজনের পরিবাদে রাধার জীবন দুঃসহ হইয়াছে। তবু তিনি স্বামীসোহাগিনী ভাগ্যবতীদের বলেন :

তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম শ্যাম ব'ধু বিনে
আর কেহ মোর নয় ॥

যদিও "ঘরের শাশুড়ী ননদী গঞ্জে দিবারাতি" এবং পাড়াপড়শীরা "ইঙ্গিত-আকারে কুবচন বলে কত", তবু এসমস্ত নিন্দা-কলঙ্ক যেন তাঁহার আভরণ হইয়াছে :

গুরু দুরজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া ॥

কিন্তু রাধার সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক আক্ষেপ :

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার ব'ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥

এ আক্ষেপ শ্রীরাধা কোথায় রাখিবেন? 'আন'-রমণী কৃষ্ণকে জিনিয়া লইয়াছে, এ দুঃখ-লজ্জা রাধার সহনাতীত। তাই তিনি নিষ্ফল আক্রোশে শ্যাম-সোহাগিনীদিগকে অভিশাপ দেন :

যুবতী হৈয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে ॥

কখনও বলেন,

সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হামনারী অবলার বধ লাগে তায় ॥

এখন রাধার কিরূপ মনের অবস্থা ?

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে ॥

আক্ষেপানুরাগের পদগুলিতে রাধার এই বিড়ম্বিত রূপটি অশ্রুবেদনায় সকরুণ লাবণ্য লাভ করিয়াছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে রাধার চরিত্রটি যেন জীবন লাভ করিয়া আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বৃষভানুনন্দিনী রাধা, শাশুড়ী-ননদী-তর্জিতা রাধা, কুললাজভয়ে ভীতা রাধার কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হইলেও চরিত্রটিতে বিদ্যাপতির রাধার মতো মর্ত্যচেতনার প্রকাশ ঘটে নাই, ফলে চরিত্রবিকাশ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা চণ্ডীদাসের রাধার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। রাধা শ্যামনাম শুনিয়াই কৃষ্ণপদে দেহমন বিকাইয়া দিয়াছেন, তখনও সাক্ষাৎদর্শন হয় নাই—"কেবা শুনাইল শ্যামনাম ?"

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥

রাধা ভাবিয়া ব্যাকুল—"নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয় ?" এই সমস্ত বর্ণনায় রাধার তদ্গত রূপটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে, ধীরে ধীরে আক্ষেপ ও অনুভূতির নির্মোক মোচন হয় নাই। বিশাখা শুধু কৃষ্ণের চিত্রপট দেখাইতেই রাধাকে কে যেন বাড়বানলে ঠেলিয়া দিল—"বিষম বাড়ব আনলমাঝারে আমারে ডারিয়া দিল।" তারপর ধীরে ধীরে রাধার নয়নে শ্যামরূপ ভাসিয়া উঠিল :

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন তনু
উদইছে শুধু সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥

দুই একটি পদে রাধার রূপোল্লাসও বর্ণিত হইয়াছে :

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকন দেহা।
অঞ্জনে গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙাড়িয়া কেবা মু'খানি বনাল রে
জবা নিঙাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড।
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥

পূর্বরাগের এই পদে রাধা কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কতকগুলি বস্তু-উপমার সাহায্যে কৃষ্ণরূপের বর্ণনা দিয়াছেন। তাই রচনাংশে ও আবেগের আন্তরিকতায় এ পদটি দুর্বল। কিন্তু রাধা যখন কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দেখেন নাই, শুধু তাঁহার নাম বা বাঁশী শুনিয়াছেন, তখনই তাঁহার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হইয়াছে। চণ্ডীদাস যখন চাক্ষুষ বস্তু-প্রতীতির মধ্য দিয়া আবেগের চিত্র আঁকিয়াছেন, তখনই তাহা রচনাংশে অতি সাধারণ স্তরে নামিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব অধিকতর প্রশংসনীয়। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণলীলার চিত্রাঙ্কনে মর্ত্যরূপ ও প্রতীকের সাহায্য লইয়াছেন। এই জাতীয় রচনায় যে চাঞ্চল্য, সৌন্দর্য, বাস্তব আকাঙ্ক্ষার উদ্বেল রহস্য রহিয়াছে, চণ্ডীদাসের পদে তাহার বিশেষ স্পর্শ নাই।

চণ্ডীদাসের কবিত্ব বিচার করিতে গেলে নানা বাদপ্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। যাঁহারা অধ্যাত্মচেতনার ধর্মীয় অনুভূতি ও ভাগবত গভীরতার নিরিখে পদসাহিত্য বিচার করিতে অভিলাষী, তাঁহারা চণ্ডীদাসের গভীর, স্তব্ধ,

নিরুচ্ছ্বসিত, শান্ত ও সংযত রচনারীতি এবং কবিমানসের অনুদ্বেল প্রশান্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শিরোধার্য করিবেন। এই বিষয়ে দীনেশচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, এখানে আমরা তাহা উল্লেখ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি :

> চণ্ডীদাসের বাণী সহজ, সরল ও সুন্দর। বিদ্যাপতির পূর্বরাগের 'ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণে অনুসরই। ক্ষণে ক্ষণে বসনধুলি তনু ভরই॥' প্রভৃতি বর্ণনায় ঈষদুদ্‌ভিন্ন যৌবনা রাধিকার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেই পূর্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে এবং চৈতন্যপ্রভুর দুটি সজলচক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মূর্তি ভাষার পুষ্পপল্লবের বহু উর্ধ্বে নির্মল অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। সেই স্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের আড়ম্বর নাই। কিন্তু তাহা প্রেমের নিজের স্থান। এখানে শব্দের ঐশ্বর্য অপেক্ষা শব্দের অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্যকরী হয়। প্রকৃত প্রেমিক বড় স্বল্পভাষী, এখানে উচ্চভাবের শোভা অবগতির জন্যই যেন ভাষার শোভা তনু ত্যাগ করে এবং বাহ্য সৌন্দর্যের বাহুল্য না থাকিলেও মন্ত্রপূত কোটি হৃদয়ের অন্তঃপুর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। (—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

এই একই মনোভাবের বশে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।……চণ্ডীদাস আসিয়া চির-পুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।" এই সমস্ত সমালোচনা হইতে মনে হইতেছে যে, চণ্ডীদাসের সহজ সরল রাখালী সুরের মধ্যে মানবজীবনের দেশকালাতীত আনন্দ-বেদনার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার প্রেম-বিরহ-মিলন দেহকে অবলম্বন করিয়াও দেহাতিচারী। তাই তাঁহার ভাষার মধ্যে সহজ প্রাণের রস বেশী। চেষ্টাকৃত কবিত্ব প্রকাশের কোন প্রয়াসই তাঁহার রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। যেখানে তিনি একটু-আধটু অলঙ্কারের আঁচ-ইশারা দিয়াছেন, সেখানে তাহা রচনাংশে কিছু দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি রচনাসৌন্দর্যের জন্য যে সমস্ত অলঙ্কারের সাহায্য লইয়াছেন, সেগুলি একেবারে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি উক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) ক্ষুরের উপর রাধার বসতি নড়িতে কাটিয়ে দেহ।

(২) বণিক জনার করাত যেমন দুদিকে কাটিয়া যায়।

(৩) জল বিনে মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।

(৪) শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।

(৫) তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে।

(৬) কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।

এই উক্তিগুলিতে যৎসামান্য অলঙ্কারের স্পর্শ আছে বটে, কিন্তু প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গেই ইহাদের অধিকতর যোগাযোগ। কৃত্রিম কবিত্বের তিরস্করণীর মধ্য দিয়া চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করেন নাই বলিয়া ইহার নিরলঙ্কৃত বাক্‌রীতি এত সহজে অন্তরকে স্পর্শ করে। শঙ্খ বণিকের করাত যেমন দুদিকে কাটে, তেমনি রাধার ঘরে বাহিরে দুঃখলাঞ্ছনা, শাণিত ক্ষুরের উপর দিয়া রাধাকে চলিতে হয়, একটু অসতর্ক হইলেই চরণ ক্ষত-বিক্ষত হয়, তুষের অনলের মতো রাধার অন্তর ধিকি ধিকি জ্বলে, চন্দন কাঠ যেমন ঘর্ষণ না করিলে সুরভি দান করে না, কৃষ্ণপ্রেমও সেইরূপ, এ প্রেম বেদনার মধ্য দিয়াই সুরভি দান করে। রাধার দুঃখ-আক্ষেপ-ব্যর্থতাকে ফুটাইতে গেলে বাস্তব জীবন হইতেই অলঙ্কার সংগ্রহ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে বলিয়াছেন, "চণ্ডীদাস গভীর ও ব্যাকুল"—তাহা চণ্ডীদাসের বাক্‌রীতি সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভাষার গভীরতা ও ব্যাকুলতার অর্থ—ব্যঞ্জনা। চণ্ডীদাসের পদে ব্যঞ্জনার সঙ্কেতই অধিকতর প্রশংসনীয়।

চণ্ডীদাসের পদ উপভোগ করিতে হইলে পাঠককেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনা-কুশলতার অধিকারী হইতে হইবে। "একেলা গায়কের নহে তো গান"—একথা চণ্ডীদাসের পদ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে। যথার্থ সাহিত্য-শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য, কবিশিল্পীর রসমূর্তি অবলম্বনে পাঠকও নিজের মনে আর একটা রসমূর্তি গড়িয়া লইতে পারে, কবির আবেগ-অনুভূতি পাঠকের মনেও অনুরূপভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঁই সে অবলা নাম।

এ পদের ব্যঞ্জনা বড় বেদনাময়, 'অবোলা' রাধার আত্মপ্রকাশের ব্যাকুল আর্তি এই ছত্রে একটি আশ্চর্য ইঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদে বেদনার ভাগ অধিক, এবং বেদনা সার্থক হইয়াছে এই ব্যঞ্জনায়। বস্তুতঃ বেদনার ভাষা সর্বত্র ব্যঞ্জনাধর্মী—দীনেশচন্দ্রের এই মন্তব্য প্রকৃত রসজ্ঞেরই উক্তি। বিদ্যাপতির পদে যে ঐশ্বর্য, লীলা, উল্লাস সহস্রমুখ হীরকের মতো দীপ্তি

পাইয়াছে, তাহা অধিকাংশস্থলে যতটা বিবরণধর্মী, ততটা ব্যঞ্জনাধর্মী নহে। "আমার পরাণ যেমন করিছে তেমতি হউক সে"—ইহাই যথার্থ ব্যঞ্জনাবহ উক্তি। রাধার পরাণ কিরূপ আকুলি-বিকুলি করিতেছে কবি তাহার কোন বিশদ বর্ণনা দেন নাই, পাঠক তাহা নিজেই উপলব্ধি করিয়া লইতে পারে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের রূপক ছাড়িয়া দিলেও ইহার একটা সার্বজনীন ও সার্বভূমিক আবেদন আছে। বোধ হয় বেদনা ও ব্যাকুলতা এই পদের মূল সুর বলিয়া নিখিল মানুষের অন্তরাত্মা ইহাতে সহজেই সাড়া দিতে পারে। ইহার যদি কোন কাব্যমূল্য থাকে, তবে নিরাভরণ বৈরাগ্যের গৈরিক শ্রী ইহার মূল আকর্ষণ। তাঁহার ভাষায় বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস,—এমন কি বড়ু চণ্ডীদাসের মতো সচেতন শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় না। শব্দ ঝঙ্কারে তিনি নিঃস্ব, তাঁহার ভাণ্ডারে দুই চারিটি মাটির অলঙ্কার ও মাঠের ফুল ভিন্ন কোন হীরামণিমাণিক্য নাই; আবেগের মধ্যে সাগরসঙ্গীতও নাই, বাড়বানলের দাহও নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে অন্য পদকারের তাহা নাই। অলঙ্কারহীন, নিরাবরণ জীবনের দুটি অশ্রুকলুষিত ব্যথিত দৃষ্টি আমাদের অন্তরকে নিবিড় আবেগে স্পর্শ করে; রসের ও রঙের হাটে দেউলিয়া অন্তরকে মেলিয়া ধরিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না। চণ্ডীদাস রাধার কণ্ঠে আধখানা কথা দিয়া পাঠকের অন্তরে তাহার সহস্র প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী

চৈতন্যদেবের আয়ুষ্কালের মধ্যে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর সংখ্যা সুপ্রচুর নহে; ইতিপূর্বে আমরা চণ্ডীদাসের কথা আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, চৈতন্যদেবের পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন এক সময়ে চণ্ডীদাস নামক কোন এক কবি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ লিখিয়াছিলেন। 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি সঙ্কলন-গ্রন্থে চণ্ডীদাস ভণিতায় ভালোমন্দ মাঝারি যে সমস্ত পদ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই যে এই প্রাক্-চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাসের রচনা তাহা নহে, কারণ বাঙলাদেশে অনেক কবি চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া নিজেরা পদ লিখিয়াছিলেন, কোন্ পদটি কোন্ চণ্ডীদাসের তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা দুরূহ হইলেও নানা উল্লেখ হইতে মনে হইতেছে যে, চৈতন্যদেবের পূর্বে বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় পদ লিখিয়াছিলেন, এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস বাংলা ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং চৈতন্যের পূর্ব হইতেই বৈষ্ণব পদসাহিত্যের ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছিল; তবে প্রাক্-চৈতন্য, চৈতন্য ও উত্তর-চৈতন্যযুগের পদাবলীর মধ্যে ভাব, ভাষা ও আদর্শগত বিশেষ পার্থক্য আছে।

চৈতন্যদেব যখন প্রথম যৌবনে নবদ্বীপধামে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন অনেক বৈষ্ণব-মতাবলম্বী ভক্ত তাঁহার মধ্যে ঐশ্বরিক আবেশ দেখিয়া মুগ্ধ ও আশান্বিত হইয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন বুঝি বৃন্দাবনের গোপেন্দ্রনন্দন স্বয়ং নবদ্বীপধামে গৌরকান্তি গ্রহণ করিয়া অবতার হইয়াছেন। চৈতন্যদেব প্রায় চব্বিশ বৎসর বয়সে নীলাচলে প্রস্থান করিলে গৌড়ে তাঁহার অনুপস্থিতির ফলে ভক্তগণের হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলতা জাগিয়াছিল। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়া অনেককে স্ব-মতে আনিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনধাম তো তাঁহারি প্রভাবে পুনরায় পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। তিনি কত দুর্বিনীত কদাচারীকে ভক্ত বৈষ্ণবে পরিণত করিয়াছিলেন, অভিজাত বংশীয় কত রাজামহারাজা তাঁহার চরণধূলার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন—এ

সমস্ত গল্পকাহিনী বাঙলাদেশে আসিয়া পৌঁছাইত। সুতরাং অনুমান করিতে পারি, তাঁহার গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য, সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইতেন। এই ব্যাকুলতা হইতেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক পদ রচিত হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই গৌরাঙ্গবিষয়ক অনেক পদ লিখিয়াছিলেন, কেহ-বা রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদও রচনা করিয়াছিলেন। চৈতন্যের সমসাময়িক যুগে যে সমস্ত পদকর্তা পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই তাঁহার ভক্তশিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহাদের অনেকেই মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে যথার্থ চৈতন্যপ্রভাব এই সমস্ত চৈতন্যানুচরদের দ্বারা প্রথম সূচিত হয়। মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন চট্টো, রামানন্দ বসু, গোবিন্দ আচার্য, শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ দাস—ইহারা সকলেই মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণব পদসাহিত্যে ইহাদের পদের সংখ্যা সুপ্রচুর না হইলেও গুণগত উৎকর্ষে এগুলির উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

চৈতন্যসমকালীন বৈষ্ণবপদের দুইটি ধারা, তাহা আমরা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি—একটি চৈতন্যবিষয়ক পদাবলী, আর একটি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী। চৈতন্যবিষয়ক পদাবলী আবার তিনভাগে বিভক্ত। একশ্রেণীর চৈতন্যবিষয়ক পদ নিছক চৈতন্যবন্দনা মাত্র; এগুলি যথার্থতঃ গৌরচন্দ্রিকার অন্তর্ভুক্ত। আর কতকগুলি চৈতন্যবিষয়ক পদে ধারাবাহিকভাবে চৈতন্যের বাল্য, যৌবন ও সন্ন্যাসগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে বাসু ঘোষ ও মুরারি গুপ্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আর এক প্রকার পদ—যাহা নরহরি ও শিবানন্দ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে চৈতন্যের নাগরভাবের বর্ণনাসূচক পদ আছে। ইহার মধ্যে পরবর্তী কালে 'গৌরচন্দ্রিকা' অর্থাৎ বৈষ্ণব লীলাপর্যায়ের প্রবেশক হিসাবে চৈতন্যবন্দনা ও চৈতন্যবর্ণনা-সংক্রান্ত পদগুলি বৈষ্ণব পদসাহিত্য, পদাবলী কীর্তন ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যজীবনকথার মধ্যে বাসু ঘোষের নিমাই-সন্ন্যাস পালা একদা করুণরসের আকর বলিয়া বিবেচিত হইত। চৈতন্যের নাগরভাবের পদ, যাহা নরহরির প্রশ্রয়ে এবং শ্রীখণ্ডসম্প্রদায়ের উৎসাহে অনুশীলিত, রচিত ও

আস্বাদিত হইয়াছিল, তাহা শেষ পর্যন্ত লোচনদাসের ঢামালি ঢঙে রচিত আদিরসাত্মক বিকৃতরুচির পদে পরিণত হইয়াছিল। সে যাহা হোক, ইহারা প্রায় সকলেই চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন, এবং মহাপ্রভুর বাল্য ও যৌবন-লীলার সঙ্গী ছিলেন বলিয়া ইঁহাদের পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

(এই যুগের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলীও উল্লেখযোগ্য। মুরারি গুপ্ত এবং আরও কয়েকজন পদকর্তা ব্রজবুলিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদের রচিত কয়েকটি পদেই তাহার প্রমাণ। সরল বাংলাতেও ইঁহারা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ লিখিয়াছিলেন। রাধার আকুলতা, আক্ষেপ, বিরহ, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি পর্যায়ের পদগুলির একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইতেছে—মানবী রাধা ক্রমে ক্রমে মহাভাবস্বরূপিণী হইয়া উঠিতেছেন। অবশ্য তখনও রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীর গ্রন্থাদি এদেশে প্রচার লাভ করে নাই, কারণ ইঁহাদের অনেক গ্রন্থ তখন রচিতই হয় নাই, জীব তখন শিশুমাত্র। কাজেই চৈতন্য-সমকালীন রাধাকৃষ্ণ পদাবলীতে অধ্যাত্ম সংস্কারের সংস্পর্শ ঘটিলেও তখনও কোনও বিশেষ সম্প্রদায়গত তত্ত্বকথা ও দর্শন-মননের প্রভাব পড়ে নাই। এখন সংক্ষেপে চৈতন্য সমসাময়িক কয়েকজন পদকর্তার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মুরারি গুপ্ত ॥

চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র যেমন পিতৃভূমি শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুরারি গুপ্তের পরিবারও শ্রীহট্ট হইতে বাস উঠাইয়া নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর নিকটেই বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। বৈদ্যবংশোদ্ভূত মুরারি চৈতন্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি, মুকুন্দ দত্ত, নিমাই—সকলেই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতেন। দুর্ললিত বালক নিমাই বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারিকেও ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া রঙ্গব্যঙ্গে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। মুরারি এই দিব্যকান্তি দুষ্ট কিশোরের নিকট হইতে একটু দূরে দূরে অবস্থান করিতেন। ধর্মমতে তিনি রামোপাসক ছিলেন। ক্রমে ক্রমে নিমাই যুবক হইলেন। গয়া হইতে ফিরিবার পর নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্য দূরীভূত হইল, তাঁহার মধ্যে ভক্তের আবির্ভাব হইল। মুরারি পূর্বেই নিমাইয়ের প্রতি

আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবার সেই আকর্ষণ গভীর ভক্তিতে পরিণত হইল। মুরারি শ্রীরামচন্দ্রের পূজারী ছিলেন; মহাপ্রভুর নির্দেশেও রাধাকৃষ্ণ ভজনা করিতে পারেন নাই। অবশ্য পরে মহাপ্রভুর মতানুবর্তী হইয়া পরম ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন। ভাগ্যবান মুরারি মহাপ্রভুর মহাবরাহ-অবতার মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

'মুরারির 'কড়চা'য় ('শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্')[১] আছে যে, তিনি বাংলাভাষায় পদ লিখিয়াছিলেন। দামোদর পণ্ডিত নাকি তাঁহাকে চৈতন্য-জীবনী রচনায় উপদেশ দিলে মুরারি মহাপ্রভুর জীবনকথাকে মহাকাব্যের আকারে রচনা করিয়াছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে মুরারির ভণিতায় তিনটি পদ আছে। মুরারি গুপ্ত ভণিতায় আরও দুই-একটি পদ পাওয়া যায়। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদেও মুরারি গুপ্ত ভণিতায় ৯টি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দুইটি পদ ব্রজবুলিতে রচিত। মুরারি, মুরারি গুপ্ত, দাস মুরারি এ সমস্তই মুরারির ভণিতা বলিয়া মনে হয়। অবশ্য মুরারি নামে আরও অনেক বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন যাঁহারা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। অদ্বৈতের শিষ্য মুরারি পণ্ডিত, নিত্যানন্দের শিষ্য চৈতন্যদাস মুরারি, চৈতন্যের উৎকলীয় ভক্ত মুরারি মাহাতী (শিখী মাহাতীর ভাই), ব্রাহ্মণ মুরারি, রাজা অচ্যুতের পুত্র মুরারি দাস (ইনি শ্যামানন্দের শিষ্য, রসিক মুরারি নামে পরিচিত) —এই রূপ নানা মুরারি এই সময়ে এবং ইহার পরেও বর্তমান ছিলেন। কিন্তু মুরারি ভণিতায় যে ৯-১০টি পদ পাওয়া গিয়াছে তাহা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্' এর (মুরারি গুপ্তের কড়চা) লেখক মহাপ্রভুর পরম ভক্ত শ্রীহট্টীয়া মুরারি গুপ্তের রচিত বলিয়া মনে হয়।

মুরারির সামান্য পদ রক্ষা পাইয়াছে। তিনি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন, চৈতন্য-প্রবর্তিত কৃষ্ণোপাসনা এবং নিজের রামোপাসনা—এই দুই বিরোধ মিটাইতে না পারিয়া মুরারি আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিলে অন্তর্যামী গৌরাঙ্গ-দেব তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বল্পসংখ্যক পদগুলিতে আশ্চর্য সংযম ও লিপিকৌশল লক্ষ্য করা যায়। মাত্র অল্প কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার কবিখ্যাতি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার 'কড়চার' জন্যই তিনি স্মরণীয় হইয়া আছেন। কিন্তু

[১] পূর্বে চৈতন্যজীবনকাব্য প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

বাংলা পদেও তাঁহার কৃতিত্ব প্রশংসার যোগ্য। ব্রজবুলিতে রচিত তাঁহার দুইটি পদ কবিত্বের দিক দিয়া নিন্দনীয় নহে। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

তপত কিরণ যদি অঙ্গ না দগধল
কি করব জল অভিষেকে।
দুঃখভরে প্রাণ বাহিরে যবে নিকসব
কি করব ঔষধ বিশেখে॥
মানিনি অতএ সমাপহ মানে
মৃদু মৃদু ভাষে সম্ভাষহ বরতনু
একবার দেহ জীউ দানে॥
সুন্দর বদনে বিহসি বরভামিনি
রচহ মনোহর বাণী।
কুচকনয়াগিরি মধি গহি রাখহ
নিজ ভুজে আপন জানি॥

তাঁহার কড়চাপ্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে[২] তাঁহার বিখ্যাত পদ 'সখিহে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও' উদ্ধৃত করিয়াছি। পদাবলীর চণ্ডীদাস, যাঁহাকে আমরা প্রাক্-চৈতন্যযুগে স্থাপন করিয়াছি, এই পদে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে।

পিরীতি আগুন জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুলশীল অভিমান॥

মুরারির পদের এই কয় পংক্তি চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তুতঃ আক্ষেপানুরাগের সুরটি মুরারি চমৎকার আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আর একটি পদে :

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
শফরী সলিল বিন গোঙাইব কতদিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥

সখীর অভিযোগে সেই বেদনার সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের বাল্যকৈশোর লীলাকে কেন্দ্র করিয়া মুরারির ভণিতায় যে দুই চারিটি পদ আছে, তাহার আন্তরিকতা অবশ্য স্বীকার্য। মুরারি চৈতন্যের শৈশব—বাল্য-কৈশোর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই পদগুলিতে

---

২ এই গ্রন্থের ৩১৫ পৃষ্ঠায় পদটি উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভক্তের ভক্তি মিশিয়া গিয়াছে। শিশু নিমাইয়ের এই চিত্রটি বাৎসল্যরসের স্নিগ্ধরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছে :

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের আঙ্গুল ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি ॥
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লোলে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধূলামাখা সর্বগায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি ॥

এই রূপ বাৎসল্যরসের পদ একমাত্র বলরামদাসের লেখনী হইতে বাহির হইতে পারিত। ভাবোন্মত্ত চৈতন্যদেব নবদ্বীপে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন, শচীমাতার জবানীতে মুরারি এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়াছেন :

ধর ধর-রে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া
বারেক করুণা কর ॥
আচার্য গোঁসাই দেখিও নিতাই
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে নাচিতে কীর্তনে
পরাণে হইব হারা ॥
শুনহ শ্রীবাস কৈরাছে সন্ন্যাস
ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোনার বরণ ননীর পুতলি
ব্যথা না লাগায়ে গায় ॥

মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের বাল্যকৈশোর লীলা সম্বন্ধে আরও কিছু বেশি সংখ্যক পদ লিখিলে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের মহিমা বৃদ্ধি হইত। তাঁহার রচনায় প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ও শিল্পকৌশল যুক্ত হইয়াছে বলিয়া এই পদগুলির স্বাদ একটু বিচিত্র।

নরহরি সরকার ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে দুই জন নরহরি পদ রচনা করিয়াছিলেন, দুইজনের মধ্যে প্রায় দুইশত বৎসরের ব্যবধান। পূর্বতন নরহরি সরকার (দাস) শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, এবং নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের পার্শ্বচর ছিলেন। দ্বিতীয় জন নরহরি চক্রবর্তী। ইতি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন এবং 'ঘনশ্যামদাস' নামে পদ লিখিতেন। তাঁহার 'ভক্তিরত্নাকর' সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই দুই জনের নামসাদৃশ্যের জন্য উভয়ের পদের মধ্যে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। অবশ্য একটু অবহিত হইয়া পাঠ করিলে দুইজনের পদের মধ্যে পার্থক্য ধরা যায়। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের এই অভিমতটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "Narahari Sarkar's language is simple and direct ; it does not contain a vast amount of Tatsama words as that of the later poet (i. e. Narahari Chakraborty). Narahari Chakraborty on the other hand wrote mostly in Brajabuli, and the poems are rather artificial verbose and complex.''[৩] 'পদকল্পতরু'তে নরহরি ভণিতায় ৩৬টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া ইহার মধ্যে ২৫টি পদকে নরহরি সরকারের এবং ১১টিকে নরহরি চক্রবর্তীর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গৌরগুণানন্দ ঠাকুর প্রণীত 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব 'গ্রন্থে নরহরি সরকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোন প্রামাণিক চৈতন্যজীবনীতে নরহরির উল্লেখ নাই—ইহা বিস্ময়কর বটে। লোচনদাস নরহরির শিষ্য ছিলেন, এই জন্য তিনি চৈতন্যমঙ্গলে নিজ গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস, যিনি নরহরির ঘটনা ও কাহিনী জানিতেন, তিনি চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান পার্শ্বচর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। ইহার একটা কারণ, নরহরি গৌরনাগর সাধনার প্রথম সূত্রপাত করেন এবং গৌরাঙ্গদর্শনে নদীয়া নাগরীগণের রসোদ্গার সংক্রান্ত পদ লিখিয়া এক বিচিত্র ধরণের গৌরাঙ্গ অনুরাগের পরিচয় দেন, যাহা শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্বীকার করিত না। সেই জন্যই সম্ভবতঃ

* Dr. S. K. Sen—*History of Brajabuli Literature*, p. 32

চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার সঙ্গীর প্রতি চৈতন্য-জীবনীকাব্যে অবহেলা লক্ষিত হইতেছে।

জনশ্রুতি অনুসারে নরহরি সরকার শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে চৈতন্যদেবের জন্মের চার পাঁচ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নরনারায়ণ দেব, মাতার নাম গোয়ী দেবী। নরনারায়ণের দুই পুত্র—মুকুন্দ ও নরহরি। পিতা ভক্তিপথের পথিক ছিলেন, পুত্র দুইটিও বাল্যকালে পিতার শিক্ষা ও আদর্শে ভক্তিধর্মের অনুশীলন করিয়াছিলেন। মুকুন্দ বৈদ্যশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। তিনি গৌড়ের পাঠান সুলতানের চিকিৎসা করিতেন। পিতার মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ নরহরিকে নবদ্বীপে রাখিয়া গৌড়ে কর্মস্থানে চলিয়া যান। পরে তিনি সুলতানের কর্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া কনিষ্ঠ নরহরির সঙ্গে মিলিত হন। বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রদ্ধি রঘুনন্দন এই মুকুন্দের পুত্র। নরহরি আজীবন অকৃতদার ছিলেন। সরকার ঠাকুর নবদ্বীপের টোলে পড়িতেন, সেই সূত্রে নিমাই পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যজীবনীকাব্যে উভয়ের সম্বন্ধে বিশের কোন প্রসঙ্গ নাই : কেন নাই, পূর্বে তাহার কারণ বিবৃত হইয়াছে। চৈতন্যের পরমভক্ত গদাধরের (যাঁহাকে রাধার অবতার বলা হইত) সঙ্গেও নরহরির অতিশয় সম্প্রীতি ছিল। গদাধরই বোধ হয় তাঁহাকে পদ রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নরহরির নামে সংস্কৃতে রচিত দুইখানি পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে—(১) শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত (২) গৌরাঙ্গাষ্টকালিকা। ইহার মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে' নরহরি গদাধর সম্পর্কে বলিয়াছেন—"রাধা শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ এব সকলচরিত্রভাবঞ্চ প্রশম্য স্বৈ বিখ্যাতঃ"। তিনি এই গ্রন্থে স্বরূপ-দামোদরের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, 'চৈতন্যচারুচরণাম্বুজ মত্তভৃঙ্গঃ শ্রীমৎ স্বরূপ ইহ মে প্রভুরাশ্রয়শ্চ।" বাসু ঘোষ তাঁহার পদে নরহরি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
> পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈনু মনে।।
> সরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
> ব্রজে মধুমতী যে--গুণের নাহি সীমা।।

বাসু ঘোষের মতে নরহরি ব্রজধামের মধুমতীর অবতার। চৈতন্যচরিতামৃতে

আছে (চৈ, চ, মধ্য, ১৩শ) যে, জগন্নাথের রথাগ্রে চৈতন্যদেব যখন নৃত্য করিতে করিতে যাইতেন, তখন আরও সাতটি কীর্তনসম্প্রদায় তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া নৃত্যগীত করিত। এই বর্ণনায় শ্রীখণ্ডসম্প্রদায়ের মধ্যে নরহরি এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের নাম পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্য ও পদাবলীর দু' একস্থলে নরহরি উল্লিখিত হইয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীখণ্ডদল সুপরিচিত। মুকুন্দ, নরহরি ও লোচনদাস—ইঁহারা শ্রীখণ্ডে চৈতন্যপূজা ও চৈতন্য প্রাধান্যের সূচনা করিয়াছিলেন। ইঁহারা ঠাকুর উপাধিসহ গোপাল-মন্ত্রের স্থলে গৌরমন্ত্র দিয়া শিষ্য করিতেন, চৈতন্যের নাগরভাবের বৈশিষ্ট্য ও পদরচনার রীতি নরহরিরই কীর্তি। তিনিই সর্বপ্রথম চৈতন্যলীলা অবলম্বনে বাংলায় পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে নরহরি ভণিতাযুক্ত একটি পদ আছে :

গৌরলীলা দরশনে　　ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি তো অতি অধম　　লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি।।

এই পদ যদি যথার্থ নরহরির রচনা হয়, তাহা হইলে তিনিই গৌরলীলা বিষয়ে পদের সূচনা করেন, ইহা বলা চলিতে পারে। মনে হয় নরহরি প্রথম জীবনে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদও লিখিয়াছিলেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উল্লিখিত পাপিয়া শেখরের ভণিতায় একটি পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

রঘুনন্দনের পিতা　　মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা
নাম তার নরহরি দাস।
রাঢে বঙ্গে সুপ্রচার　　পদবী সে সরকার
শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস।।
গৌরাঙ্গের জন্মের আগে　　বিবিধ রাগিণীরাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ　　পাঞা পহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ
বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ।।

ইহাতে মনে হয় নরহরি পূর্বে বোধ হয় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ লিখিতেন। অবশ্য 'গৌরাঙ্গ জন্মের আগে' তিনি পদ লিখিয়াছিলেন, ইহা বোধহয় সত্য নহে। কারণ প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে তিনি চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়সে

চার-পাঁচ বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং চৈতন্যের পূর্বে তিনি পদ লিখিবেন ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার ভণিতায় রাধাকৃষ্ণবিষয়ক দু একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সমস্ত পদ বাংলায় রচিত হইলেও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক একটি ব্রজবুলির পদ এখানে উল্লেখযোগ্য :

রাইক বিপত্তি শুনি বিদগধ শিরোমণি
পুছই গদগদ ভাষা।
নিজ মন্দির ত্যজি চলু নব নাগর
পুনঃ পুনঃ পরশই নাসা ॥
বিছুরল চরণ- রণিত মণিমঞ্জীর
বিছুরল মুরলিক রন্ধ্রে।
বিছুরল বেশ বসন ভেল বিগলিত
বিগলিত শিখিপুচ্ছ চন্দ্রে ॥

নরহরি ভণিতায় 'পদকল্পতরুতে' ৩৬টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে, 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে' আছে একটি পদ। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তেই নরহরির পদসংখ্যা সর্বাধিক—৩৮২টি পদ। এতগুলির মধ্যে সবগুলিই যে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত, তাহা মনে হয় না। কারণ পরবর্তী কালের 'ভক্তিরত্নাকরে'র কবি নরহরি চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে নরহরি সরকারের পদের সংমিশ্রণ হইয়া গিয়াছিল। তবে নরহরি সরকার ঠাকুরের দুই চারিটি পদ বাদ দিলে প্রায় সমস্ত পদই চৈতন্যবিষয়ক—ইহা স্মরণ রাখিলে তাঁহার পদ বাছিয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। তাঁহার দু' একটি পদে চণ্ডীদাসের সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

(১) কিনা হৈল সই মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি ॥
খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে ॥

(২) সই কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া ॥
যেদিন দেখিব আপন নয়নে
কহে কার সনে কথা।

কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥

এই পদ দুটিতে চণ্ডীদাসের সুর ও রচনাবৈশিষ্ট্য অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, '২' সংখ্যক পদটি আসলে নরহরির, কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা চণ্ডীদাসের সুরের সঙ্গে নরহরির ভণিতাযুক্ত পংক্তিগুলির সুর মিলাইয়া দেখেন নাই, দেখিলে একথা বলিতে পারিতেন না। যেখানে নরহরি বলেন, "কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব ভাঙ্গিব আপন মাথা"—সেখানে চণ্ডীদাস বলেন, "আমার অন্তর যেমন করিছে তেমতি হউক সে"। নরহরি চণ্ডীদাসের পদ নকল করিয়াছিলেন, অথবা কেহ তাঁহার নামে এই সুপ্রসিদ্ধ পদটিকে একটু বদলাইয়া চালাইয়া দিয়াছিল।

নরহরির সমধিক খ্যাতি গৌরপদাবলীর উপর নির্ভর করিতেছে। যদিও ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "নরহরি গৌরপদাবলী রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু সরকার ঠাকুর রচিত বলিয়া নিশ্চিতভাবে লইতে পারি এমন কোন পদ নাই।"[৪]—কিন্তু পদকল্পতরু ও 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে নরহরির ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদ আছে, তাহার কিছু কিছু পরবর্তী কালের নরহরি চক্রবর্তীর রচিত হইলেও, যে পদগুলিতে সরল বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যাহাতে চৈতন্যের নাগরভাবের ইঙ্গিত আছে, তাহা যে নরহরি সরকার রচিত, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংশয় নাই। যদিও কোন কোন সমালোচক বলেন, "কবিত্ব হিসাবে সরকার ঠাকুরের পদাবলীর বিশেষ কোন গৌরব নাই"[৫], তবু গৌরাঙ্গবিষয়ক কয়েকটি পদ প্রশংসা দাবী করিতে পারে। গৌরাঙ্গই যে শ্রীকৃষ্ণ, এবং গৌরাঙ্গ অবতার না হইলে শ্রীরাধার মহিমা লোকে জানিতে পারিত না, তাহা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :

গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে ॥

---

৪ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম, পূর্বার্ধ, পৃ ৩৯৫

৫ সতীশচন্দ্র রায়—পদকল্পতরু, ৫ম

মধুর বৃন্দা- বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরি সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস :

দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি।
চিতে করি অনুসঙ্গ শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ তনু তার সাথী॥
অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদভূত গৌরাঙ্গের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জবনে বিলসিতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥

স্বরূপ-দামোদর নির্দিষ্ট ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যাখ্যাত চৈতন্যলীলা ও তত্ত্বকথাকে নরহরি অনেক পূর্বেই যথার্থ অনুমান করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণভাবে, এবং গদাধর রাধাভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন :

কিভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে।
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা-বলি ডাকে॥
... ...
রাধাভাবে গদাধরে কি জানি কি কহে।
অনিমেষে পণ্ডিতেরে মুখপানে চাহে॥

কখনও বা চৈতন্যদেব রাধাভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণকে সাভিমানে বলেন :

প্রেম করি কুলবতী সনে।
এত কি শঠতা কানুর মনে॥
বংশীনাদে সঙ্কেত করিল।
ঘরের বাহিরে মুই আইল॥
... ...
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে।
রজনী বঞ্চিল কার ঘরে॥

নরহরি এখানে চৈতন্যকে রাধাভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

কিন্তু নরহরির নামে প্রচারিত যে পদগুলি অধিকতর পরিচিত, সেগুলি

চৈতন্যদেবের নাগরভাবের পদ। চৈতন্যকে পরমতত্ত্বরূপে প্রচারের প্রধান দায়িত্ব মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন এবং নরহরি সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার নরহরি নাগরভাবের আমদানি করিয়াছিলেন।[৬] তাঁহার শিষ্যের দল গুরুর নাগরভাবের অনুকরণে আরও স্থূল আদিরসের পদ রচনা করিয়া বৈষ্ণবধর্মের আদর্শের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ড গোষ্ঠী বরাবর চৈতন্যদেবকে স্বয়ং-কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এমন কি তাঁহারা প্রকাশ্যে চৈতন্য-বিগ্রহ পূজার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। চৈতন্যবিষয়ক কিছু কিছু পদে তাঁহারা চৈতন্যদেবকে নাগররূপে এবং নিজেদের নাগরীরূপে কল্পনা করিয়া চটুল ধরণের আদিরসাত্মক পদ লিখিয়াছিলেন। বোধহয় নরহরি ও শিবানন্দ সেন এই শ্রেণীর নাগরভাবের পদ প্রথম লিখিয়াছিলেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে গৌরাঙ্গকে দেখিয়া কোন এক নাগরীর উক্তি :

(১) বেলা অবসানে ননদিনী সনে
জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া
কলসি ভাঙিয়া এনু॥
কাঁপে কলেবর গায়ে আসে জ্বর
চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথারে
সাঁতারে না পাই থা॥

(২) শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলায় হারা॥
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া
বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধেতে সে রূপ চাঁদেরে
নয়নে নয়নে থোব॥

---

৬ এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে নাগরভাব আলোচনা করা হইয়াছে।

সই কহ লো গৌরের কথা।
গোরার সে নাম অমিয়ার ধাম,
পিরীতি মুরতি দাতা ॥

এই সমস্ত পদে নারী হৃদয়ের আবেগ ভক্তদের মনে সঞ্চারিত হইলেও ইহাতে তখনও আদিরসের তীব্রতা সঞ্চারিত হয় নাই। কার্ডিনাল নিউম্যান যেমন বলিয়াছিলেন, "If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a woman ; yes however, manly thou mayst be among men"—নরহরিও বোধ হয় সেই রূপ মনে করিতেন যে, নারীর আবেগ লইয়া চৈতন্যকে ভজনা না করিয়া প্রেমসাধনমার্গে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের পদ বিশেষতঃ লোচন দাসের ধামালি জাতীয় হালকাছন্দে রচিত স্থূল আদিরসের পদগুলি চৈতন্যের নাগরভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে; পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বৈষ্ণবসমাজে প্রাধান্য লাভ করিলে চৈতন্যের নীতিমার্গীয় প্রেমধর্ম রহস্যবাদী আদিরসাত্মক 'কাল্ট'-এর কবলগ্রস্ত হইয়া পড়িল, এবং ধীরে ধীরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অবক্ষয়ের পথ ধরিল।নরহরি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও এই ব্যাপারের জন্য গৌণতঃ দায়ী, কারণ তিনিই এই জাতীয় নাগরভাবের আদর্শ প্রচার ও পদ রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

শিবানন্দ সেন ॥

শিবানন্দ সেন পদকর্তা হিসাবে সুপরিচিত না হইলেও মহাপ্রভুর অন্যতম পার্শ্বচর হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। কাঁচড়াপাড়ায় তাঁহার নিবাস হইলেও বোধ হয় কুলীন গ্রামের সঙ্গেও তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল। কারণ নানা জনশ্রুতি অনুসারে তাঁহাকে কুলীনগ্রামের অধিবাসী বলিয়াও দাবি করা হয়। অবশ্য তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বৈষ্ণব সমাজ ও সাহিত্যে সুবিখ্যাত কবিকর্ণপুর (পরমানন্দ দাস) কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন; মহাপ্রভু পুরী হইতে বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে গৌড়ে আসিয়া শিবানন্দের কাঁচড়াপাড়ার বাটীতেই পদার্পণ করিয়াছিলেন। শিবানন্দ মহাপ্রভুকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিলে শিবানন্দ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে একটি ভার দিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর গৌড়ের যাত্রিগণ রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামে মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করিতে যাইতেন;

শিবানন্দই তাঁহাদিগকে গৌড় হইতে নীলাচলে লইয়া যাইতেন এবং যাত্রীদের পথের ব্যয়ভারও বহন করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে:

প্রতিবর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া ।।

শিবানন্দ ভণিতাযুক্ত একটি পদেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে:

দয়াময় গৌরহরি   নৈস্থালীলা সাঙ্গ করি
হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে   এ দাসেরে একা ফেলে
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ ।।
আদেশ করিলা যাহা   নিয়ম পালিব তাহা
কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত   লাগিবে বিষের মত
তোয়া বিনে কিমতে গোঙাব ।।
গৌড়ীয় যাত্রিক সনে   বৎসরান্তে দরশনে
কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব   সম্বৎসর কাটাইব
যুগশত জ্ঞান করি তিলে ।।

বৈষ্ণব পদসঙ্কলনে শিবাই, শিবানন্দ, শিবাই দাস, শিবরাম প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত অল্প কিছু পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। 'পদকল্পতরু'তে শিবানন্দ ভণিতাযুক্ত ৩টি, শিবাই ভণিতায় ৬টি, 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে শিবরামের ভণিতায় ৩টি, শিবাই দাসের ভণিতায় ১টি এবং শিবানন্দের ভণিতায় ৬টি পদ গৃহীত হইয়াছে। গদাধর পণ্ডিতের এক শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্তীও পদ রচনা করিয়াছিলেন। যে পদগুলিতে গদাধরের প্রতি অধিকতর ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে সেগুলি এই শিবানন্দ চক্রবর্তীর রচিত হওয়া সম্ভব। গোপালদাসের 'রসকল্পবল্লী'তে শিবানন্দ আচার্য ঠাকুর ভণিতায় যে দুইটি পদ গৃহীত হইয়াছে, তাহা বৃন্দাবনবাসী এই শিবানন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে পদগুলিতে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে, সেগুলিকেই পরমানন্দের পিতা চৈতন্যানুচর শিবানন্দের রচনা বলিয়া মানিতে হইবে, তাহা নহে। শিবানন্দ চৈতন্যকে স্বয়ং কৃষ্ণ এবং গদাধরকে রাধার অবতার

বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার কোন কোন পদে এই তত্ত্বটি প্রকাশিত হইয়াছে।[৭] শিবানন্দের দুই একটি পদ নিতান্ত অবহেলার বস্তু নহে :

(১) অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর
বরিখয়ে চৈতন্য মেঘে।
ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত
অনুখন প্রেমজল মাগে ॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি প্রেমজলে ভাসাওল
সেই মেঘে করল বাদর।
উচ্চ নীচ যত ছিল প্রেমজলে ভাসাওল
গোরা বড় দয়ার সাগর ॥
জীবেরে করিয়া যত্ন হরিনাম মহামন্ত্র
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত যত তারা হৈল ভাগবত
বাঢ়িল গৌরাঙ্গ ঠাকুরালি ॥

এই সমস্ত স্বল্পসংখ্যক পদে তথাকথিত কবিত্বের ঝঙ্কার না থাকিলেও প্রত্যক্ষ-দর্শীর নিষ্ঠা আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য শিবানন্দ তাঁহার বিখ্যাত পুত্র কবিকর্ণপূরের জন্যই বৈষ্ণব-সাহিত্যে অল্প কয়েকটি পদ লিখিয়াও স্মরণীয় হইয়াছেন।

গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ ॥

চৈতন্যের পরম অনুরাগী ও সহচর এই তিন ভাই-ই কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ বাসুদেব ঘোষ নিমাইসন্ন্যাসের পালাগান রচনা করিয়া অধিকতর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুলনায় তাঁহার অগ্রজ-দ্বয়কেও তুচ্ছ করা যায় না। ইঁহাদের পিতা বল্লভ ঘোষ পূর্বে মুর্শিদাবাদের

---

[৭] দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) হোলি খেলত গৌরকিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর ॥

(২) গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম জানকী যেন এক কলেবর ॥
যেন একপ্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌরগদাধর প্রেমের তরঙ্গ ॥

অধিবাসী ছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ছড়াইয়া পড়িলে এই তিন ভাই নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যগোষ্ঠীতে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনজনেই কীর্তনগানে পারদর্শী ছিলেন। তন্মধ্যে মধ্যম ভ্রাতা মাধবের কীর্তনের অধিকতর সুখ্যাতি ছিল।[৮] চৈতন্যদেব নীলাচলে যাত্রা করিলে ইঁহারাও সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তারপর চৈতন্যের নির্দেশে জ্যেষ্ঠ পুরীধামে রহিয়া গেলেন, মাধব ও বাসুদেব গৌড়ে ফিরিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিন ভাই চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা বিষয়ে যে পদ লিখিয়াছিলেন, আন্তরিকতা, আবেগ, নিষ্ঠা ও ঐতিহাসিকতার দিক হইতে সেগুলি বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। গোবিন্দ ঘোষের সমস্ত পদ গৌরাঙ্গ বিষয়ক; ইহার সরল সহজ কবিত্ব যেমন প্রশংসার যোগ্য, তেমনি চৈতন্য-জীবনের চাক্ষুষ কাহিনী হিসাবে ইহার মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস লইতে উদ্যত হইলে গোবিন্দের একটি পদে যেরূপ ব্যাকুলতা ও আর্তি ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার আন্তরিকতা শ্রদ্ধার যোগ্য। যেমন :

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও ॥
তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আরনা করিব মোরা কীর্তন বিলাস ॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া ॥

পয়ার ছন্দে রচিত এই সাধারণ ছত্র কয়টিতে যেরূপ অনুভূতি-ব্যাকুল হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে, তাহার স্বাভাবিক আবেদন যে-কোন পাঠককেই অনুপ্রাণিত করিবে।

মধ্যম ভ্রাতা মাধব ঘোষ বাংলাভাষায় চৈতন্যবিষয়ক পদ লিখিয়াছিলেন, তেমনি আবার ব্রজবুলিতেও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক দুই একটি পদ রচনা করিয়া-

[৮] সুকৃতি মাধব ঘোষ—কীর্তনে তৎপর।
তেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

ছিলেন। বিরহখন্না রাধার কৃশতনুর বর্ণনা করিয়া কোন সখী মথুরায় গিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন :

মাধব করুণা কি লব তোহে নাই।
এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এ দুহুঁ পদ দরশাই ॥
রাইকে পেখি ধরণীপর লুটই
কত কত সারঙ্গ নয়নী।
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত
জীবইতে সংশয় জনি ॥

গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস লইবার পর তাঁহার পরিবার ও নদীয়া ভক্তদের কি দশা হইয়াছে, মাধব ঘোষ তাহার চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন :

অচলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়া গুণ সোঙারিয়া
মূরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ ঘিরি করে রোদন
তুলা ধরি নাসার উপরে ॥
তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়া নিবাসী যত তারা ভেল মূরছিত
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি ॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা দেহ তার প্রাণ ছাড়া
তার প্রতি নাই তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গিগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া ॥

মাধব ঘোষ কীর্তনীয়া হিসাবেই অধিকতর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদের সংখ্যা স্বল্পতর, কবিত্ববিচারে সরল সহজভাষায় রচিত এই পদগুলিতে বাস্তবতা ও আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে।

তিন ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ বাসুদেব ঘোষই চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ বিষয়ক অনেকগুলি বাংলা পদ লিখিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাদের বিবরণীকে চৈতন্যজীবনীকাব্য অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস করিতে চাহেন। কারণ তাঁহারা চৈতন্যদেবের নদীয়ালীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন এবং রচিত পদসমূহে তাহার বিবরণ দিয়া গিয়াছেন।

বাসুদেব ঘোষের চৈতন্যলীলা বিষয়ক পদগুলি নানা দিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিত্ব বিচারে কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে অগ্রজদ্বয় অপেক্ষা অধিকতর নিপুণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যের বাস্তবজীবনবিষয়ক বর্ণনায় তাঁহার পদগুলি বাংলা পদসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজনা। চৈতন্যের ব্যক্তিগত জীবনীর অনেক তথ্যই এই পদে স্থান পাইয়াছে। বাসুদেব চৈতন্যজীবনকথাকে দুইটি পৃথক পর্যায়ে বর্ণনার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। একটি পর্যায়ে অলঙ্কারশাস্ত্র ও পূর্বপ্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেণী ও পালা অনুসারে চৈতন্যলীলাকে সেই ছাঁচে ঢালিয়া তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার পটভূমিকায় চৈতন্য-কাহিনী স্থাপন করিয়াছিলেন। আর একটি পর্যায়ে তিনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের জীবনলীলাকে ঐতিহাসিক ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে অঙ্কন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম পর্যায়টি নিছক কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে ইহার ততটা সম্পর্ক নাই; কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের পদগুলিতে চৈতন্যের দৈনন্দিন জীবনের অধিকতর ছায়াপাত হইয়াছে। এই প্রথম পর্যায়ের পদে চৈতন্য-দর্শনে নদীয়া-নাগরীগণের রসোদ্গার অনেকটা নরহরি ও লোচনের ঢঙে রচিত হইয়াছে। এখানে কবিকে 'গৌরনাগর' ভাবের কবি বলিয়া মনে হয়।

প্রথম পর্যায়ের পদে রাধাকৃষ্ণলীলার পূর্বরাগ, মিলন, হোরিকা, ফুলদোল, জলকেলি, দানলীলা, গোষ্ঠলীলা, ঝুলন, রাসলীলা, বিরহ প্রভৃতির আদর্শে চৈতন্যকে আঁকিবার কষ্টকল্পিত চেষ্টা লক্ষণীয়। কৃষ্ণের সঙ্গে গৌরাঙ্গকে মিলাইয়া দিবার জন্য বাসুদেব এই কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কখনও-বা গৌরাঙ্গদেব রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতেছেন। যেমন এই বাসকসজ্জার পদ :

অরুণ নয়নে ধারা বহে
অবনত মাথে গোরা রহে ॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে।
ভূমি গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে ॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
বাসকসজ্জার ভাব করে ॥

মানের পদ :

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে ॥

সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাথে গায়ে।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমি গড়ি যায়ে ॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায় ॥

বিরহের পদ :

আজ্ কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কে আইল কে আইল বলি ঝরয়ে নয়ান ॥
চৌদিকে ভকতগণ কান্দি অচেতন।
গৌরাঙ্গ এমন কেন না বুঝি কারণ ।।

এই পদপর্যায় কিছু কৃত্রিম হইলেও খুব একটা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কৃষ্ণের দানলীলার অনুকরণে গৌরাঙ্গ পদাবলীর পদ :

গৌরাঙ্গ চান্দের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল ।।
কিসের বা দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেড় দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী ।।
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরে নাগরী সব পড়িল বিপাকে ।।

এ বর্ণনা সুন্দর নহে, স্বাভাবিক তো নহেই।

বাসু ঘোষ অনেকগুলি পদে গৌরাঙ্গদর্শনে নাগরীগণের রসোদ্‌গার বর্ণনা করিয়াছেন। এখানেও তিনি ভক্তদের উপর পুরাপুরি ব্রজের গোপীভাব আরোপ করিয়াছেন। গৌরনাগরভাব নবদ্বীপেও কিরূপ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা বাসু ঘোষের এই পদগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। নিম্নে এইরূপ পদের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) আজুক প্রেমক নাহিক ওর।
স্বপনহি শুতলু গৌরক কোর ।।
পহুঁ মুখ হেরইতে পড়লহি ভোর।
চরকি চরকি রহে লোচনলোর ।।
উচকুচ কাজরে হার ওজোর।
ভীগল তিলক বসন রুচি মোর ।।

২) আজুক প্রেম কহনে না যায়।
শুতি রহলু হাম সেজ বিছায় ।।

রুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু নূপুর পায়।
পেখলুঁ গৌরাঙ্গ বর নটরায়॥
আঁচলে রাখলুঁ আঁচলে ছাপাই।
বিদগধ নাগর চৌদিকে চাই॥

৩) নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণি বাহির হৈতে চায়॥
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব।
ভয় নাহি মোর মন গৃহপতি গুরুজন
গোরা লাগি পরাণ ত্যজিব॥
সব সুখ তেয়াগেলুঁ কুলে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
গোরা বিনা আন নাহি ভায়।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুনহে মরম সখি
বাসুঘোষ কি বলিবে তায়॥

এই পদগুলি গৌরাঙ্গের নাগরভাবের পদ হইলেও বিকৃত রুচি ইহাকে ততটা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বরং লোচনের হাতে এই ধরণের পদ আদিরসের জুগুপ্সায় পরিণত হইয়াছিল। বাসু ঘোষের এই পদগুলিতে স্থূল আকাঙ্ক্ষার চেয়ে একটা অশরীরী আবেগবেদনাই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। এই দিক দিয়া বাসু ঘোষের রুচি আদৌ নিন্দনীয় নহে, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমার মধ্যে তিনি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য আমাদের মতে এ জাতীয় পদ অত্যন্ত আপত্তিকর, কারণ এই আদিরসাত্মক দুর্বলতার ছিদ্র দিয়া পরবর্তী কালে বৈষ্ণবসমাজ ও নৈতিকজীবনে হীনাদর্শ প্রবেশ করিয়াছিল। সে যাহা হোক, বাসু ঘোষের পদগুলিতে গৌরাঙ্গ-দর্শনে নাগরীগণের যে আবেগ ও আর্তির ছবি ফুটিয়াছে, তাহাতে আবিলতার সংস্পর্শ নাই বলিয়া এদিক হইতে বাসু ঘোষ ক্ষমার্হ।[৬]

[৬] এ বিষয়ে 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মন্তব্য করিয়াছিলেন, "নবদ্বীপলীলায় যে ব্রজগোপীদিগের অভাব ছিল, নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার অনুকরণে বাসুদেব নিজেকে ও অন্যান্য গৌরভক্তগণকে সেই নদীয়া-নাগরী কল্পনা করিয়া 'নাগরী' ভাবের পদ নামক এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর পদেরও সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। লোচনদাস ও ঘনশ্যাম-নরহরি প্রভৃতির হাতে পড়িয়া উহা নিতান্ত পল্লবিত হইয়াছে…। লোচন ও নরহরির নদীয়া নাগরী পদের কোন

বাসুদেব বৈষ্ণব পদসাহিত্যে স্মরণীয় হইয়াছেন চৈতন্যের বাল্যকৈশোরের ও প্রথম যৌবনের বাস্তব জীবন-চিত্রগুলির জন্য। এখানে তাঁহার সৃষ্টি-কুশলতা অধিকতর প্রশংসা দাবি করিতে পারে। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের যে প্রধান দুইটি লক্ষণ—বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি, বাসু ঘোষের তাহা পুরা-মাত্রায় ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাসুদেবের চৈতন্যজীবনী বিষয়ক পদ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন :

বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥

একথা অতি সত্য ; চৈতন্যজীবনী বিষয়ক এই পদগুলি আন্তরিকতায় আশ্চর্য জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আমরা দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

(১) শিশু গৌরাঙ্গের বর্ণনা—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইলুঁ।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিলুঁ ॥

(২) নিমাইয়ের গৃহত্যাগ শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ—

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিলা নিশা শেষে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া ॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিল শচী মাতা।
আউদড় কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥

কোন স্থলে এবিষয়ে এত বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে যে, তাহা সুরুচিসম্পন্ন মনে হয় না। বর্তমান সময়ে একশ্রেণীর গৌরভক্তদের মধ্যে 'নাগরীভাবের' উপাসনার উপলক্ষে যে নানা উচ্ছৃঙ্খলতার কথা শুনা যায়, উহার জন্য লোচন-নবঘনশ্যাম-নরহরির উদ্দাম পরিকল্পনা আংশিকভাবে দায়ী কিনা তাহা আধুনিক বৈষ্ণব ইতিহাস লেখকের চিন্তনীয় হইয়াছে।......আনন্দের বিষয় যে, নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষের সম্বন্ধে এরূপ কোনও অভিযোগ করা চলে না।" (পদকল্পতরু, ৫ম)

তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া ।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥

(৩) বৈষ্ণব পদের ভাবসম্মেলনের ঢঙে রচিত শচীমাতার স্বপ্ন কাহিনীটি বেদনারসে অভিষিক্ত হইয়াছে :

আজিকার স্বপনের কথা শুনগো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে ।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে চাহিয়া
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে ॥
ঘরেতে শুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির হইলাম
নিমাইর গলার সাড়া পাইয়া ।
আমার চরণধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুন কান্দে গলায় ধরিয়া ॥
... ...
আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল ।
পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কান্দিয়া রজনী পোহাইল ॥

এই পদগুলির বাস্তবতা ও ঐতিহাসিকতা অতিশয় মূল্যবান, অনেক সময় চৈতন্যজীবনীকাব্যের তথ্য অপেক্ষা এগুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য নহে। কিন্তু বাসু ঘোষের সরল রচনাভঙ্গী ও প্রাণের গভীর বেদনার এমন একটা আকর্ষণ আছে যে, ইহার মানবিক রূপটা আমাদের নিকট অধিকতর উপভোগ্য বোধ হয়। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্বেদনার এমন মর্মস্পর্শী চিত্র অন্য কোথাও মিলিবে না। অথচ এই পদগুলির ভাষায় কিছুমাত্র রং-রূপের ঐশ্বর্য নাই, অলঙ্কারের উজ্জ্বলতা নাই, নিতান্ত সরল প্রাণের নিরাভরণ উক্তি আমাদের মন জয় করিয়াছে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, গভীর কথা গভীর বেদনার মতোই আভরণহীন। বাসু ঘোষের পদগুলি তাহার প্রধান সাক্ষী।

রামানন্দ বসু ॥

কুলীন গ্রামের মালাধর বসুর (গুণরাজ খাঁ) পৌত্র (মতান্তরে পুত্র)[৭] রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ বয়সে দুইজনে প্রায় সমান ছিলেন। কুলীন গ্রাম বোধ হয় নবদ্বীপের পূর্বেই বৈষ্ণবধর্মের অনুকূল কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এইজন্য চৈতন্যদেব এই গ্রাম ও গ্রামবাসীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল। পুরীধামে একদা চৈতন্যদেব রামানন্দকে বলিয়াছিলেন:

> তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
> সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর ॥

এই রামানন্দের ভণিতায় 'পদকল্পতরু'তে ১১টি এবং রামানন্দ বসুর ভণিতায় ৭টি পদ পাওয়া গিয়াছে। বসু ভণিতাযুক্ত এই ৭টি পদ যে রামানন্দের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু রামানন্দ ভণিতাযুক্ত যে পদগুলি 'পদকল্পতরু'তে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা রামানন্দ বসুর রচিত নহে বলিয়া ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ বিষয়ে ডঃ মজুমদারের অভিমত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। শুধু 'রামানন্দ' ভণিতাযুক্ত পদে আছে:

> কহে দীন রামানন্দে এ হেন আনন্দকন্দে
> বঞ্চিত রহিলুঁ মুঞি এক।

কিন্তু রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর সাহচয বঞ্চিত হন নাই। তিনি কুলীন গ্রামের ভক্তদের লইয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় নীলাচলে উপস্থিত হইতেন এবং বর্ষার চারিমাস মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে বাস করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। সুতরাং উল্লিখিত পদকর্তা অন্য কোন ব্যক্তি হইবেন।

রামানন্দের পদগুলির (৭টি) মধ্যে চারিটি কৃষ্ণলীলার, দুইটি শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক এবং একটি নিত্যানন্দ বিষয়ক। তন্মধ্যে শ্রীরাধার স্বপ্নে কৃষ্ণমিলনের পদটি বৈষ্ণবপদাবলীর একটি সার্থক সৃষ্টি:

> তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
> পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥

[৭] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

শাওন মাসের যে রিমিঝিমে বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যামবরণ এক পুরুষ আসিয়া মোরে
মুখে ধরি করয়ে চুম্বন॥
বলি সুমধুর বোল পুনপুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করিয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিনা যাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিয়া জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু সেহ নহে অতি।
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীত॥

পরবর্তী কালে জ্ঞানদাস এই পদের রক্তমাংসে লাবণ্য সঞ্চার করিয়া একটি উৎকৃষ্টতর পদ[৮] রচনা করিয়াছিলেন। রামানন্দের একটি ব্রজবুলির পদ কবিত্বের দিক দিয়া প্রশংসার যোগ্য :

মলয়জ মিলিত যমুনাজল শীতল
বংশীবট নিরমাণ।
নিকটহি নীপ কদম্বতরু কুসুমিত
কোকিল ভ্রমর করু গান॥
তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ তমাল তনু
বামে রসবতী রাই।
এক নব জলধর কোরে বিজুরি থির
কাঞ্চন রতন মিশাই॥

জ্ঞানদাসের পদটির কয়ছত্রের দৃষ্টান্ত :

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন শুন পরাণির সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥ ইত্যাদি

কৃষ্ণপ্রেমে মূর্চ্ছাতুর চৈতন্যের বর্ণনাও প্রশংসার যোগ্য :

আরে মোর গৌর কিশোর।
সহচর কান্ধে পহু ভুজযুগ আরোপিয়া
নবমী দশায় ভেল ভোর ॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি
তত্ত্বক দোসর ভেল দেহ ॥

বংশীবদন চট্টো ॥

চৈতন্যের সমসাময়িক ও প্রতিবেশী বংশীবদন চট্টো চৈতন্যের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, বয়সে বোধ হয় তিনি চৈতন্যের কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচলে যাত্রা করিলে বংশীবদন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার চৈতন্যলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক অনেকগুলি পদ নানা সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্যের আর এক শিষ্য বংশীদাসও (১৭শ শতাব্দী) পদ রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং বংশীদাস ও বংশীবদন ভণিতায় পদের গোলমাল হইয়া গেলেও উভয়ের পদ পৃথক করা খুব দুরূহ নহে। 'পদকল্পতরু'তে বংশীবদন ভণিতায় ২৫টি, বংশীদাস ভণিতায় ৮টি ও শুধু বংশী ভণিতায় ৯টি পদ আছে। তন্মধ্যে বংশীবদন ভণিতার পদগুলি বংশীবদন চট্টোর রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। চৈতন্যবিষয়ক যে পদগুলিতে প্রত্যক্ষদর্শীর মনোভাব ও অন্তরঙ্গতার সুর পাওয়া যায় তাহা চৈতন্যভক্ত ও প্রতিবেশী বংশীবদনের রচিত। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে বংশীবদনের আবেগের পদটি উল্লেখযোগ্য।

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা তিলকা কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন খঞ্জন নাচ ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে
ভকত চাতক লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চায়্যা ॥

...   .

কেবা হেন জন   আনিবে এখন
আমার গৌর রায়।
শাশুড়ী বধুর   রোদন শুনিতে
বংশী গড়াগড়ি যায়॥

এখানে যেরূপ পরিচিত অন্তরঙ্গতার চিত্র ফুটিয়াছে, তাহা বংশীবদন চট্টোর মতো প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা ভিন্ন শ্রীনিবাসের শিষ্য বংশীদাসের হইতে পারে না। কবিত্বের দিক দিয়া আরও দুইটি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি শুকশারীর উক্তি :

রাই জাগ রাই জাগ শারীশুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালো মাণিকের কোলে।
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥

আর একটি পদ অতি চমৎকার; চিত্রধর্মে ও প্রতীক নির্বাচনে এই পদটির pastoral (রাখালী) সুর অতি প্রশংসনীয়। দানী সাজিয়া কৃষ্ণ পসারিণী রাধিকাকে বলিতেছেন :

হেদে লো বিনোদিনী
এপথে কেমতে যাবে তুমি।
শীতল কদম্ব তলে   বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি॥
এ ভর দুপুর বেলা   তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়েছে মুখ   দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভরে আউলাইল কবরী॥
অমূল্য রতন সাথে   গোডারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি   এই পথে মহাদানী
তিল আধ না যাও ছাড়িয়া॥
মথুরা অনেক পথ   তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনী।
বংশীবদন কয়   এই সে উচিত হয়
শ্যামসঙ্গে কর বিকিকিনি॥

পদটির রাধাকৃষ্ণ রূপক বাদ দিলে ইহাকে একটি শ্রেষ্ঠ আধুনিক রোমাণ্টিক গীতিকবিতা বলিয়া গণ্য করা যায়। ইহারই আদর্শে রবীন্দ্রনাথ 'পসারিণী' কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন :

ওগো পসারিণী, দেখি আয়
কি রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়!
কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়।
সম্মুখে দেখ তো চাহি পথের সে সীমা নাহি
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পসারিণি, কথা রাখো দূর পথে যেয়ো নাকো
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে।

বংশীবদনের রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদে পালাগানের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে দানলীলার পদগুলি বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্যান্য পদকার॥

চৈতন্যের সমকালে আবির্ভূত আরও অনেক পদকর্তা রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য-বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গোবিন্দ আচার্যের পদগুলি মূল্যবান, কিন্তু একাধিক গোবিন্দ নামক পদকর্তার সঙ্গে ইঁহার পদ মিশ্রিত হইবার ফলে কোন্‌গুলি ইঁহার রচনা তাহা বাছিয়া লওয়া দুষ্কর।

যদুনাথ দাস, যদু কবিচন্দ্র, যদুনন্দন—ইঁহাদেরও অনেক পদ সঙ্কলনসমূহে ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যদুনন্দনাচার্য অদ্বৈতের 'গণ' বলিয়া চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইনি গদাধরের শিষ্য ছিলেন এবং গৌরাঙ্গের 'অদ্ভুতচরিত' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া 'ভক্তিরত্নাকরে' উল্লিখিত হইয়াছে। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) ইঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি নাকি 'রাধাকৃষ্ণলীলাকদম্ব' নামক এক বিরাট কাব্য (ছয় হাজার শ্লোকে সমাপ্ত) রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা পাওয়া যায় নাই। তিনি কোন পদ লিখিয়াছিলেন কিনা তাহাও জানা যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে :

দীন প্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয়।
বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর প্রশংসাতিশয়।।
যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারুণ পাষাণ শুনিয়া যাঁর গীত।।

তাহা হইলে ইনি কি পুরা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, অথবা চৈতন্যবিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন? পদ-রচনা করিলে তাহা কোন-না-কোন পদসঙ্কলনে গৃহীত হইত। সুতরাং আমাদের অনুমান যদুনন্দনাচার্য চৈতন্যবিষয়ক কোন কাব্য লিখিয়া থাকিলেও কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কাটোয়ার যদুনন্দন চক্রবর্তীও (নিত্যানন্দের পার্ষদ ও গদাধরের শিষ্য) কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর খেতুরীতে যে বৈষ্ণবসম্মিলনীর আহ্বান করিয়াছিলেন, ইনি তাহাতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পদকর্তা হিসাবে যে-যদুনন্দন চৈতন্যযুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি যদুনন্দন দাস। ইনি চৈতন্যের তিরোধানের পর জন্মগ্রহণ করেন।[১] 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'র দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণের মতে যদুনন্দন ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭) জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যের সমকালে যে যদুনন্দন কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন, তিনি কবিচন্দ্র নামেও পরিচিত ছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে ইঁহার কিছু কিছু পদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি'তেও ইহার পাঁচটি পদ গৃহীত হইয়াছিল। 'ভ্রমর গীত' নামক একখানি পুঁথিতে ইহার ভণিতা আছে। তাঁহার চৈতন্যবিষয়ক একটি পদের কয়ছত্র বেশ মর্মগ্রাহী ও কবিত্বপূর্ণ:

অরুণ নয়নে বরুণ আলয়
বহয়ে প্রেম সুধাজল।
যদুনাথ দাস বলে যেন সোনার কমলে
প্রসবিছে মুকুতার ফল।।

আরও কয়েকজন চৈতন্যভক্ত ও অনুচরের পদ পাওয়া গিয়াছে যাঁহারা চৈতন্যের জীবিতকালের মধ্যে কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। পরমানন্দের (গুপ্ত) চৈতন্যবিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ আছে। 'পদকল্পতরু'তে শুধু পরমানন্দ-ভণিতায় ছয়টিপদ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ কবিকর্ণপূর পরমানন্দ

[১] সুতরাং ইঁহার পদাবলী বা অন্যান্য গ্রন্থ চৈতন্য তিরোধানের পর রচিত হইয়াছিল। ইনি ১৭শ শতাব্দীতেও বর্তমান ছিলেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইঁহার সম্বন্ধে আলোচিত হইবে

নহেন। 'চৈতন্যমঙ্গলে' জয়ানন্দ বলিয়াছেন, "পরমানন্দ গুপ্ত গৌরাঙ্গ বিজয়গীত শুনিতে অদ্ভুত।" কবিকর্ণপুর (পরমানন্দ দাস) তাঁহার 'গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা'য় এই পরমানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "পরমানন্দগুপ্তো যৎকৃত কৃষ্ণস্তবাবলী।" সুতরাং পরমানন্দ অন্য কোন কবি। তবে ইনি চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার বাটীতে নিত্যানন্দ বোধহয় কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কারণ বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে'[১০] ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'[১১] এইরূপ উল্লেখ আছে। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সেকথা স্মরণ করিয়া পরমানন্দ গুপ্ত লিখিয়াছিলেন :

> কি করিলা গোরাচাঁদ নদিয়া ছাড়িয়া।
> মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া ॥
> কীর্তন বিলাস আদি যে করিলা সুখ।
> সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয়ে বুক ॥
> ... ...
> কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
> একবার নদীয়া চল প্রভু গৌরহরি।।

এই বর্ণনা হইতে কবিকে চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্ত দুই ভাই-ই মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ বাসুদেব মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন। ইঁহারা দুই ভাই কীর্তনে পরম পারদর্শী ছিলেন। এই মুকুন্দ বোধহয় কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন। বাসুদেবের নামেও দুই একটি পদ পাওয়া যায়।

গোবিন্দ আচার্য শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইনি বাংলায় কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে দেবকীনন্দন 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় বলিয়াছেন যে, তিনি নাকি রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু কিছু ধামালি পদ

১০ প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ।। (চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য। ৬ষ্ঠ)

১১ পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ।। (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি। ১১শ)

("যে করিলা রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালি") রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য বৈষ্ণব পদসাহিত্যে গোবিন্দ নামে একাধিক কবি ছিলেন বলিয়া কোন্‌টি তাঁহার পদ তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তিনি বহুস্থলে গোবিন্দদাস ও দাস গোবিন্দ ভণিতায় পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া এই গোলমাল জটিলতর হইয়া পড়িয়াছে। একটি বিখ্যাত পদ দাস গোবিন্দের ভণিতায় চলিতেছে। তাহা এই গোবিন্দ আচার্যের হইলে তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলিতে হইবে। এই পদটির কয়েকছত্র উল্লিখিত হইতেছে :

চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মুরছা পায়॥
সে শ্যাম নাগরে কি খেনে দেখিনু
ধৈরজ রহল দূরে!
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥
... ...
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

চৈতন্যজীবৎকালের মধ্যে তাঁহার নানা ভক্ত পদ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই চৈতন্যজীবনকাহিনীর দ্বারা অতিশয় অভিভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা বহু রাধাকৃষ্ণ পদাবলী লিখিয়াছিলেন। গৌরলীলার পদও নিতান্ত অল্প নহে। এই সমস্ত পদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, চৈতন্যবিষয়ক পদে ভক্তি, আবেগ, ও বাস্তবতার একরূপ বিচিত্রসমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীতে তখনও প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার উদয় হয় নাই। এই সমস্ত পদকারদের দুই চারিটি এমন পদ আছে যাহা অবশ্য কালের কষ্টিপাথরে টিকিয়া থাকিবে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ, পরিপূর্ণ ও বিকশিত কবিপ্রতিভা বলিতে যাহা বুঝায়, সেরূপ কবিদের আবির্ভাব হইয়াছিল চৈতন্যতিরোধানের পরে।

চতুর্দশ অধ্যায়

চৈতন্যতিরোধানের পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি চৈতন্যের সমকালে তাঁহার অনেক অনুচর-পরিকর উৎকৃষ্ট পদকর্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, নানা সঙ্কলনে তাঁহাদের কাহারও কাহারও পদ গৃহীত হইয়াছিল। চৈতন্যের তিরোধান হইতে শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের প্রভাবের প্রারম্ভ পর্যন্ত বৈষ্ণবপদাবলীর দ্বিতীয় পর্যায় পরিকল্পিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য চৈতন্যের জীবৎকালের মধ্যে রচিত পদগুলিকে আমরা বৈষ্ণব পদের প্রথম পর্ব বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। দ্বিতীয় পর্ব ১৫৩৩ হইতে ১৫৮৩, প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোধান হয় এবং ১৫৮৩ খ্রীঃ অব্দের পর পশ্চিমবঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য এবং উত্তরবঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের নেতৃত্ব স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে তাঁহাদের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল।

চৈতন্যের তিরোধানের পর তাঁহার অলোকসামান্য লীলাকথা সমগ্র গৌড়-বঙ্গে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সমাজ—সর্বত্রই বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল, তাঁহার অনুচরগণ তৎপূর্বেই পদাবলী ও গ্রন্থ রচনা করিয়া এই নূতন ভাবাদর্শকে দুই দিক হইতে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ সংস্কৃতে তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিয়া এই আবেগধর্মকে মননের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন, আর চৈতন্যানুচর পদকারগণ গৌরাঙ্গজীবনী ও রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ে পদ রচনা করিয়া বৈষ্ণবমত ও আদর্শকে আবেগের সৌন্দর্যলোকে মুক্তি দিয়াছিলেন। চৈতন্যের তিরোধানের পর সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ কিছুকাল মুহ্যমান হইয়া পড়িলেও পরে ক্রমেক্রমে সকলে আত্মস্থ হইলেন। চৈতন্যতিরোধানের প্রথম শোকা-বেগের বিবশভাব কাটিয়া যাইবার পর বৈষ্ণবসমাজ ও সাহিত্যে স্থিরতা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চৈতন্যের অবসান হইতে শ্রীনিবাস-নরোত্তমের আবির্ভাবের মধ্যে বৈষ্ণবসাহিত্যে তিনটি প্রধান পর্যায় স্পষ্ট হইতে লাগিল। একটি—পদ-শাখা, একটি—জীবনীশাখা এবং আর একটি—ভাগবত-অনুসারী কৃষ্ণকাহিনী-

কেন্দ্রিক অনুবাদশাখা। চৈতন্যজীবনীকাব্য পর্যায়ে আমরা চৈতন্য জীবনীগ্রন্থের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি ; চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যসমকালীন পদেরও কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা অনুবাদ-সাহিত্য প্রসঙ্গে কৃষ্ণলীলানুসারী ও অনুবাদ-আশ্রয়ী কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব। এখন চৈতন্যের তিরোধানের পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক। বর্তমান প্রসঙ্গে এই যুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা, (শুধু এই যুগেরই নহে, সমগ্র বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বিখ্যাত কবি) বলরামদাস ও জ্ঞানদাসের কবিত্ব পরিচয় লওয়া যাইতেছে।

বলরাম দাস ॥

চণ্ডীদাসকে লইয়া যেরূপ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, বৈষ্ণব পদসাহিত্যে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের সমকক্ষ অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর বলরামদাস সম্বন্ধেও সেরূপ সমস্যা সৃষ্টি হইতে পারিত। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র সর্বপ্রথম একাধিক বলরাম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি ঐ সঙ্কলনের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "বলরাম দাস লইয়া সাহিত্যজগতে বিষম গোল। আমরা ১৯ জন বলরামের সন্ধান পাইয়াছি।" আমরা ইতিমধ্যেই গুটিকয়েক চণ্ডীদাস লইয়া বিষম বিব্রত বোধ করিতেছি। তাহার উপর যদি জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় আবার উনিশজন বলরামকে আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনা এক ভয়াবহ ব্যাপারে পরিণত হইবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক বলরাম দাস ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঁচজন বলরামের সন্ধান পাইয়াছেন :

(১) নিত্যানন্দের ভক্ত দোগাছিয়া গ্রাম নিবাসী বলরামদাস। নানা সঙ্কলনে গৃহীত বলরামদাস ভণিতাযুক্ত বাংলা ও ব্রজবুলিতে রচিত অধিকাংশ পদই ইঁহার রচিত।

(২) বসু বলরাম বা বলরাম বসু ভণিতাযুক্ত আরও একজন পদকর্তার কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে।

(৩) নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর এক শিষ্যের নাম বলরাম দাস।

ইনি নিত্যানন্দ দাস নামে অধিকতর পরিচিত। 'প্রেমবিলাস' ইঁহার রচনা। ইনিও কিছু কিছু পদ লিখিয়া থাকিবেন। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী ছিলেন।

(৭) রামচন্দ্র কবিরাজের (গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠ) এক শিষ্য বুধরী গ্রামবাসী বলরামদাস বোধহয় উৎকৃষ্ট ব্রজবুলির রচয়িতা।

(৫) আর একজন বলরাম দীনবলরাম ভণিতায় 'কৃষ্ণলীলামৃত' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইনিও কিছু কিছু পদ লিখিয়া থাকিবেন।

ইঁহাদের মধ্যে বসু উপাধিক পদকর্তাকে না হয় পৃথক করিয়া রাখা গেল। ইঁহার ভণিতায় চারটি পদ পাওয়া গিয়াছে—ইঁহাকে এক স্বতন্ত্র পদকর্তা বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। ইঁহার ভণিতা এইরূপ :

বসু বলরাম বলে অবতরি কলিকালে
জগাই মাধাই হাটে হাসি।

বুধরী নিবাসী আর একজন বলরাম দাস উৎকৃষ্ট ব্রজবুলির পদ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধেই 'পদকল্পতরু'তে বৈষ্ণবদাসের একটি পদে বলা হইয়াছে :

কবিনৃপবংশজ ভুবনবিদিত যশ
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জন নিরুপম গুণগণ
গৌর প্রেমময় ধাম।।

ইঁহাদের মধ্যে ঘনশ্যাম ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র। কিন্তু ইঁহার সঙ্গে এই বলরামের উল্লেখ করা হইল কেন ভাবিবার বিষয়। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাসে' রামচন্দ্র কবিরাজের শাখা-নির্ণয়ে (অনুচর-পরিকরদের তালিকা) আছে :

আর শাখা বলরাম কবিপতি হয়।
পরম পণ্ডিত তিহোঁ বুধরী আলয়।।

'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্যের শাখা বর্ণনায় আছে 'শ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখা গণ''। অর্থাৎ এই বর্ণনা অনুসারেও বলরামকে রামচন্দ্র কবিরাজের উপশাখা মনে হইতেছে। সুতরাং বুধরী নিবাসী (রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দদাস কবিরাজও বুধরী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন) এই বলরাম ঘনশ্যামের সমসাময়িক ও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। বলরামদাস ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত উৎকৃষ্ট

ঝঙ্কারমুখর ও আলঙ্কারিক ব্রজবুলির পদ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই ইঁহার রচনা বলিয়া মনে হয়। দীনেশচন্দ্র এই বলরামকে গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় বলিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে, তাহা হইলে বৈষ্ণবদাস এই বলরামকে 'কবিনৃপবংশজ' বলিতেন না। ইনি রামচন্দ্র কবিরাজের শাখা ছিলেন বলিয়াই ইঁহাকে 'কবিনৃপ' বংশজ (অর্থাৎ কবিরাজের 'গণ') বলা হইয়াছে।

তৃতীয় বলরাম দাসের অপর নাম নিত্যানন্দ দাস। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য এই বলরাম দাস নিত্যানন্দ দাস নামে অধিকতর পরিচিত। ইঁহার 'প্রেম-বিলাস' বৈষ্ণব সমাজবিষয়ক গ্রন্থ হিসাবে মূল্যবান ইতিহাস। সংসার আশ্রমে ইঁহার নাম ছিল বলরাম দাস। ইনি শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ রামচন্দ্র কবিরাজের শাখাভুক্ত বলরাম অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু বলরামদাস ভণিতাযুক্ত পদের সঙ্গে ইঁহাকে সংযুক্ত করা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ ইনি সংসার আশ্রমের নাম ত্যাগ করিয়া সর্বত্র গুরুদত্ত নাম 'নিত্যানন্দ দাস' ব্যবহার করিয়াছেন। 'প্রেমবিলাসে' তিনি কোথাও নিত্যানন্দ দাস ভিন্ন বলরামদাসের নামে ভণিতা দেন নাই। নিজ জীবনকথা ও নাম পরিবর্তনের ইতিহাসটি তিনি 'প্রেমবিলাসে' সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন :

মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডে বাস ॥
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়ে বালক।
পিতামাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক ॥
অনাথ হইয়া আমি কাঁদি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার ॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই ॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈলা আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন ॥
বলরাম দাস নাম পূর্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা ॥

জাহ্নবাদেবী শিষ্যের বলরামদাস নাম বদলাইয়া নিত্যানন্দ দাস নামকরণ করেন এবং কবিও পরবর্তীকালে গুরুদত্ত নামেই নিজের ভণিতা দিয়াছেন।

সুতরাং বলরামদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এবার প্রাচীনতর বলরামের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামে[১] পাশ্চাত্ত্য বৈদিক বংশে বলরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দের সেবক ছিলেন। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের বেশ কিছু পূর্বে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। চৈতন্যলীলার সময়ে তিনি নিশ্চয় বালক ছিলেন। কারণ কবি চৈতন্যবন্দন-প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, "এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরামদাস," "বিন্দু না পরশল বলরাম দাস," "হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম", ইত্যাদি। তাই অনুমান হয়, চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই। তাঁহাদের আদি নিবাস শ্রীহট্টে। তিনি নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দোগাছিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কবি বালগোপাল মূর্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও বিগ্রহ এখনও দোগাছিয়া গ্রামে আছে। কথিত আছে নিত্যানন্দ একবার নৃত্যকীর্তন ও প্রচার করিতে করিতে দোগাছিয়া গ্রামে উপস্থিত হন এবং ভক্ত বলরামকে বালগোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন এবং কবিকে নিজ পাগড়ীটি দান করেন। ঐ পাগড়ী বলরামের বংশধরগণ এখনও রক্ষা করিতে-ছেন। বলরাম দাসের তিরোধান উপলক্ষে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে এই গ্রামে এখনও মেলা হয়। বলরাম নিত্যানন্দের আদেশে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র। তাঁহার বংশধর হরিদাস গোস্বামী মহাশয় 'দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী' নামক একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বলরাম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অনেক সুযোগ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই গোস্বামী মহাশয় বৃন্দাবনে গিয়া একখানি পাণ্ডুলিপিতে

[১] ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "বলরাম দাস বাস করিয়াছিলেন আধুনিক বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে দোগাছিয়া (দোগেছে) গ্রামে" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম, পূর্বার্ধ)। কিন্তু তিনি *History of Brajabuli Literature*-এ বলিয়াছেন "Balaram dasa was a Brahmin, and he lived at Dogachhia near Krishnagor." ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত 'বলরাম দাসের পদাবলী'র ভূমিকায় ডঃ সেন ইঁহাকে কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী দোগাছিয়া গ্রামের অধিবাসী বলিয়াছেন।

বলরাম ও দ্বিজবলরাম ভণিতাযুক্ত অনেক পদ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়ীতেও বলরামের অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। 'পদকল্পতরু' ও 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে বলরাম ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদ গৃহীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই বলরামের রচনা বলিয়া মনে হয়।

সমস্ত পদ বিচার করিয়া আমরা সংশয়ের অবকাশ রাখিয়া বৈষ্ণব পদে দুই জন বলরামের সন্ধান করিতে পারি। একজন ঈষৎ প্রাচীন—নিত্যানন্দের সেবক ও জাহ্নবাদেবীর শিষ্য। ইনি খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা একটু পরে বর্তমান ছিলেন—বাংলা ও ব্রজবুলির কিছু কিছু পদ ইঁহার রচনা হইতে পারে। আর একজন বলরাম পরবর্তী কালের পদকর্তা, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং গোবিন্দদাস কবিরাজের ঢঙে ব্রজবুলিতে কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন। ইনি নিত্যানন্দের শিষ্য নহেন, গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজের পরিকরের মধ্যে ইনি গণনীয়। অবশ্য ইনি যে বাংলায় পদ রচনা করেন নাই, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। দুই-বলরামই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন। তবে যে ব্রজবুলিতে বাংলা শব্দের মিশাল অধিক এবং ঝঙ্কার, ছন্দের কারুকর্ম ও কৃত্রিমতা অল্প তাহাই নিত্যানন্দের শিষ্য বলরামের রচনা বলিয়া আমরা অনুমান করি। পদসাহিত্যে যে বলরাম দাসের চৈতন্য-নিত্যানন্দ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে, যাঁহার বাৎসল্য রসের পদের সমকক্ষ কোন রচনা সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায় না, তিনি প্রাচীনতর—ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন। ১৫৮৩ খ্রী: অব্দের দিকে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর শেষে খেতুরীতে যে বৈষ্ণব সম্মেলন আহূত হইয়াছিল, তাহাতে বলরামদাসও উপস্থিত ছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে বলরামদাস ভণিতায় ১২৬টি পদ গৃহীত হইয়াছে।

যদিও বলরামের কয়েকটি পদ অতি উৎকৃষ্ট, তবু কেহ কেহ তাঁহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না: "বলরাম দাসের জন্য প্রথম শ্রেণীর দাবি যেমন বাড়াবাড়ি ঠেকিবে, তেমনি একেবারে মধ্যম শ্রেণীর বলিলে উন্নাসিকতার অপবাদ বর্তিবে। উভয়ের মধ্যবর্তী অংশে বলরামের স্থান।"[১] বলরাম দাসের নামে প্রচারিত শতাধিক পদের মধ্যে

[১] শঙ্করীপ্রসাদ বসু—মধ্যযুগের কবি ও কাব্য

অন্ততঃ ২০টি পদ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের তুলনায় খুব নিকৃষ্ট মনে হইবে না। তাঁহার দুই-চারিটি এমন পদ আছে যে, উল্লিখিত কবিত্রয় লিখিতে পারিলেও ধন্য হইতেন। তথাপি সমস্ত দিক বিচার করিয়া তাঁহাকে পুরাপুরি প্রথম শ্রেণীর কবি বলা যায় না। সহানুভূতি ও মানবীয় আবেগে তাঁহার স্থান অতিশয় উচ্চে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কবির আরও একটা বড় গুণ প্রয়োজন—কল্পনার উৎসার ও ক্রিয়াশীলতা, বলরাম দাস উল্লিখিত কবিত্রয় হইতে এ বিষয় কিঞ্চিত ন্যূন বলিয়া তাঁহাকে পুরাপুরি প্রথম শ্রেণীর পদকর্তা বলা না গেলেও তাহার কিছু কিছু পদ যে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

বলরামের একটি দুটি শব্দ, ছোট একটি ছত্র পাঠকের মনে যে কিরূপ অনাস্বাদিত মাধুর্য, অপরূপ রসের ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তোলে, তাহা রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি হইতে পরিষ্কার হইবে। বলরামের

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির॥

এই ছত্র দুইটি রবীন্দ্রনাথের মনে একটি অপূর্ব ব্যাকুলতার রস জাগাইয়া তুলিয়াছে—"আমরা যেন কোন এক কালে একত্র মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, 'তোমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির'। একী হইল! যে আমার মনোরাজ্যের লোক, সে আজ বাহিরে আসিল কেন? ওখানে তো তোমার স্থান নয়। বলরাম দাস বলিতেছেন, 'তেঁই বলরামের পহুঁ চিত নহে স্থির।' যাহারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়াছিল, তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না—বিরহে বিধুর বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।" পদ দুইটির যথার্থ তাৎপর্য ও রবীন্দ্রনাথের এই রসাস্বাদন এক না হইতে পারে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ তো এই রূপই; তাহা নানা মনের মধ্যে গিয়া নানা মূর্তি লাভ করে। উক্ত দুইটি পংক্তির পূর্বে দুইটি পংক্তি আছে। কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন:

হিয়ার ভিতর থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই হেন সদা করে চিত॥

এই যে 'হারাই হারাই' ভয়—কৃষ্ণের এই উক্তিতে শুধু আদিরস নহে, যে স্নেহমমতাপূর্ণ ব্যাকুলতা ফুটিয়াছে, বৈষ্ণব পদসাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল। বাস্তবিক বলরাম দাসের এমন কিছু কিছু পংক্তি আছে যাহার রসব্যঞ্জনা আধুনিক কালের পাঠককেও বিস্মিত করিয়া দেয়।

বলরাম দাসের পদাবলী আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার পদগুলিকে গৌরচন্দ্রিকা ও রাধাকৃষ্ণলীলা এই দুই পর্যায়েই ভাগ করা প্রয়োজন, কিন্তু চৈতন্যলীলার প্রসঙ্গে ভক্তকবি বলরাম নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতেরও বন্দনা করিয়াছেন। এই বন্দনার অধিকাংশই সরল বাংলায় রচিত। নিরাভরণ ভাষায় রচিত এই পদগুলির নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা শ্রদ্ধার যোগ্য। চৈতন্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কেন গৌরবর্ণ ধারণ করিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহার প্রশ্নটি ভারি চমৎকার :

হরি হরি এ বড় বিস্ময় লাগে মনে।
জিনি নব জলধর পূর্বে যার কলেবর
সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে॥
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জ বেড়া মনোহর যার চূড়া
সে মস্তক কেশ শূন্য দেখি।
যার বাঁকা চাহনিতে মোহে রাধিকার চিতে
এবে প্রেমে ছল ছল আঁখি॥
সদা গোপগোপী সঙ্গে বিস্ময়ে রসরঙ্গে
এ যে নারী নাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশীধারী আকর্ষয়ে ব্রজনারী
সেই ভুজে দণ্ড কেনে লয়॥

নৃত্যোন্মত্ত আবেশমুগ্ধ গৌরাঙ্গের বর্ণনাও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতো বাস্তবধর্মী হইয়াছে :

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া নগরে।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক না রহিল ঘরে॥

... ...

নাচিতে নাচিতে গোরা যেনা দিগে চায়।
লাখে লাখে দীপ জ্বলে কেহ হরি গায়॥
কুলবধূ সকল ছাড়িয়া হরি বলে।
প্রেম নদী বহে সবার নয়নের জলে॥

বলরামের ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলিতে রচিত যে চৈতন্যবন্দনা পাওয়া গিয়াছে

অহাতে গোবিন্দদাসের অনুকরণে ছন্দোকৌশল ও শব্দঝঙ্কার আছে বলিয়া কেহ কেহ এই জাতীয় পদের জন্য দ্বিতীয় বলরামদাসের কল্পনা করিয়াছেন।

নাচত গৌর সুনাগর-মণিয়া।
খঞ্জন গঞ্জন পদযুগ রঞ্জন
রণরণি মঞ্জীর মঞ্জুল ধ্বনিয়া ॥
সহজই কাঞ্চন কাঁথি কলেবর
হেরইতে জগজন মনমোহনিয়া ॥
ডগমগ দেহ থেহ নাই বান্ধই
দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরিখনিয়া ॥

অথবা

কঞ্জ চরণ খঞ্জন গঞ্জন
মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ।
ইন্দুনিন্দন নখর চন্দন
বনি বলরাম দাস ॥

এই পদগুলিতে ব্রজবুলির ছন্দ ও শব্দঝঙ্কার পুনঃ পুনঃ গোবিন্দদাস কবিরাজকে স্মরণ করাইয়া দেয়। উপরন্তু এ ভাষার মধ্যে স্বাভাবিক মনের কথার চেয়ে আলঙ্কারিক কৃত্রিমতাই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। এই জাতীয় পদগুলিতে কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কিঞ্চিৎ ম্লান বলিয়া মনে হয়। তাই কেহ কেহ অনুমান করেন বৈষ্ণবদাস-অভিনন্দিত রামচন্দ্র কবিরাজের শাখা-ভুক্ত পরবর্তীকালের বলরামদাস এই ধরণের ঝঙ্কারমুখর ব্রজবুলিপদের রচয়িতা।

নিত্যানন্দের মত্ত বর্ণনাটিও বলরাম সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন :

আওত অবধৌত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গরগর মন করে হরি সঙ্কীর্তন
পতিতপাবন দীনবন্ধু ॥
হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে
প্রেমে ভাসে অমর সমাজে।
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে
অলখিতে করে সব কাজে ॥

বলরাম অলঙ্কার শাস্ত্রের বিবিধ পর্যায় অনুসারে কৃষ্ণের বাল্যলীলা, [illegible]র পূর্বরাগ, অনুরাগ ও মিলন, অভিসার ও সম্ভোগ, রসোদ্গার,

নৌকাবিলাস, দানলীলা, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, বিরহ প্রভৃতি নানা পর্যায়ের বাঁধাপথে বেশ কিছু পদ লিখিয়াছিলেন। ইহার অনেক অংশ গতানুগতিক, বৈচিত্র্যহীন ও ক্লান্তিকর। নৌকাবিলাস ও দানলীলার মধ্যে কাহিনী বিন্যাসের দিকে কিঞ্চিৎ পারিপাট্য আছে। কিন্তু বলরাম দাসের রাধাকৃষ্ণ-লীলার পদে লীলাকাহিনীর বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। এমন কি পদাবলীর চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রভৃতি পদকর্তাদের তুলনায় তাঁহার এই শ্রেণীর পদে কোন উল্লেখযোগ্য গুণই লক্ষ্য করা যায় না। এইজন্য হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঊর্ধ্বে স্থাপন করিতে চাহিবেন না। ছন্দ-অলঙ্কার, ভাষাভঙ্গিমা, কল্পনার অভিনবত্ব, চিত্রকল্পের সুবিহিত প্রয়োগ প্রভৃতি আলোচনা করিলে তাঁহার এই পদগুলিতে বিশেষ কোন কবিত্ব ও নিপুণতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাহার কারণ তাঁহার পদে চমকপ্রদ শিল্পগুণের একান্ত অভাব আছে। দ্বিতীয়তঃ তাহার পদে প্রত্যক্ষ শিল্পায়ন অপেক্ষা ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত একটু বেশি। এইজন্য যাঁহারা বৈষ্ণবপদে ছন্দ ও অলঙ্কারের কারুকর্ম দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা বলরামের এই সমস্ত জলবৎ তরল পদগুলিতে উগ্র স্বাদ পাইবেন না। কিন্তু একথা অবশ্যই যথার্থ যে, বলরামদাস দুই কথা বলেন, তাহা আমাদের মনের মধ্যে গিয়া নানা মূর্তি গ্রহণ করে।

তাঁহার পদের প্রধান গুণ অন্তরঙ্গতা ও আন্তরিকতা। রাধাকৃষ্ণের পদাবলীতে শিল্পসম্মত কারুকার্য না থাকিলেও অন্তরের অনাবৃত আনন্দবেদনার স্পর্শ রহিয়াছে বলিয়াই এই পদগুলিতে একটা নূতন আস্বাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে। রাধার আক্ষেপের কয় ছত্র—

> দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
> কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
> কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
> আঁখিলোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
> বসনে মুছিয়ে ধারা ঢাকি যদি গায়।
> আনছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥

কুলবধূর সংসারপীড়িত মনের অসহায় কান্নার সুরটি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে

পদপর্যায় বিচার করিলে বলরামদাসের বাৎসল্যের পদ সর্বোৎকৃষ্ট। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বাৎসল্যরসের উৎকৃষ্ট পদ বেশি নাই। রামানন্দ বসু, যাদবানন্দ প্রভৃতি পদকর্তাদের বাৎসল্যরসের দুই একটি উৎকৃষ্ট পদ আছে বটে, কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনগণ মূলতঃ মধুররসের সাধক। বাৎসল্যরসের চিত্র তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই ইহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। গোপালের প্রতি যশোদার মাতৃস্নেহের বর্ণনা, ব্যাকুলতা বেদনা, আশঙ্কাই এই বাৎসল্য রসের পদগুলির বৈশিষ্ট্য। কোন কোন কবি কৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে গোষ্ঠলীলা বর্ণনা করিয়াছেন এবং গোষ্ঠলীলায় বাৎসল্য ও সখ্যরসের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আদিরসও আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু বলরামের বাৎসল্যরসের পদগুলি মাতা ও সন্তানের স্নিগ্ধ মধুর সম্পর্কটির ফলে একটা স্নিগ্ধ মাধুরী অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপ আন্তরিকতা ও মানবী মাতার ব্যাকুলতা ও আশঙ্কা পরবর্তীকালের শাক্ত পদাবলীতেই কিয়ৎ-পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

বলরামদাসের যশোদা প্রাণের ধন নীলমণিকে গোষ্ঠে পাঠাইবার সময় কাঁদিয়া আকুল হন :

বলরাম, তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ।
যারে ঘুমে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ ॥

দুধের বালক কৃষ্ণ গোঠে যাইতেছেন, মায়ের চিন্তার শেষ নাই। যে শিশুটি

বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে·
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এহেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায় ॥

যশোদা শুনিয়াছেন, তাঁহার 'দুগ্ধ কোঙরাকে' নাকি "আনলে বেড়িয়াছিল, দুহাতে আনল ধরি পিয়া।" সে নাকি দাবানল পান করিয়াছিল : এখানে বলরামদাস কিন্তু যশোদার মনে কৃষ্ণ সম্পর্কে কোন ঐশ্বরিক ভাব আরোপ করেন নাই। যশোদা মনে করেন যে,

এ নন্দের ভাগ্যবলে যশোদার পুণ্য ফলে
তেঞি সে গোপাল মোর জীয়ে ॥

এমন কি ভণিতাতেও বলরাম যশোদাকে সম্বোধন করিয়া একথা বলেন নাই যে, হে যশোদা মাতা, তুমি কেন বৃথা ভয় পাও? তোমার দুধের বাছাই যে বিরিঞ্চি-বিষ্ণু-পঞ্চানন! তাহা না বলিয়া পদকর্তা সখ্যরসে মুগ্ধ হইয়া পদটির শেষে ভণিতা দিয়াছেন ;

বলরাম দাসের বাণী শুন শুন নন্দরাণী
কেন সদা ভাবিতেছ তুমি।
গোপাল সাজায়ে দেহ মোর মিনতি মানহ
সঙ্গে যাইব গোঠে আমি॥

স্বয়ং বলরামদাস বলিতেছেন—তিনি গোপালের সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। এই পদটি পুরাপুরি রাখালী আবহাওয়ায় ('প্যাসটোরাল') স্থাপিত হওয়াতে ইহার স্বভাবসুন্দর সুরটি চমৎকার ধ্বনিত হইয়াছে।

যশোদা যখন দেখিলেন, "বিধি কৈলা গোপজাতি, গোধন পালন বৃত্তি"—তখন গোপালকে তো গোচারণে পাঠাইতেই হইবে। তাই তিনি অন্যান্য গোপবালকদের ডাকিয়া সকাতরে বলিতেছেন :

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লইয়া না যাহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন।
নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপজাতি গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব॥

এইরূপ কয়েকটি পদে মাতৃহৃদয়ের যে আশঙ্কা ও স্নেহাতিশয্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মানবরসটুকু পরম উপভোগ্য হইয়াছে। এই পদগুলির স্বাদুতা বাড়িয়াছে ইহার অন্তর্নিহিত সখ্য রসের জন্য। নন্দরাণী গোপালের জন্য ব্যাকুল হইলে গোপবালকেরা সান্ত্বনা দিয়া বলে :

নন্দরাণী যাহ গো ভবনে।
তোমার গোপাল আনি দিব বেলি অবসানে ॥
লৈয়া যাছি তোমার গোপাল রাখিব বসাইয়া।
আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদমুখ চাইয়া ॥

আর একটি পদে গোপবালকদের দলটিকে কবি জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন :

নটবর নব কিশোর রায় রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে
ধূলিধূসর শ্যাম অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ ঘনয়ে বোলত মধুর মুরলী বায় গো ॥

এখানে হৈ হৈ শব্দে গোপবালকদের গোষ্ঠে যাইবার চিত্রটি মাত্র গোটাকতক শব্দপ্রতীকের সাহায্যে বিবৃত হইয়াছে। সখ্যরসাশ্রয়ী বলরামের ভণিতাযুক্ত শেষ কয়পংক্তিও অতিশয় আন্তরিক :

বলরাম দাস করতহি আশ
রাখাল সঙ্গে সদাই বাস
বেত্র মুরলী লইয়া খুরলী সঙ্গে সঙ্গে যায় গো ॥

কিন্তু আধুনিক পাঠকের দৃষ্টিতে এই উৎকৃষ্ট পদটিতেও একটি ত্রুটি ধরা পড়িবে। (কৃষ্ণ যখন অন্য গোপবালকদের সঙ্গে হৈ হৈ শব্দে গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছেন, তখন সেই বালচপল সখ্যরসের সঙ্গে হঠাৎ একবিন্দু আদিরসের ছিটা দিয়া বলরামদাস পদটি মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। গোপাল সখাগণের সঙ্গে যাইতে যাইতে

নয়নে সঘনে উলটি উলটি
হেরি হেরি পালটি পালটি
গোরী গোরী থোরি থোরি আন নাহিক ভায় গো ॥

বালক কৃষ্ণ 'গোরী' রাধাকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন—এ বর্ণনায় মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণ খুশী হইবেন, কিন্তু পদটির গতি ও প্রবণতা বিচার করিলে আদিরসাত্মক এই কয় পংক্তিকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও হানিকর মনে হইবে।

বলরাম পদের বাঁধা পর্যায় অনুসারে রাধাকৃষ্ণের যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে পরিকল্পনাগত মৌলিকতা বড় একটা না থাকিলেও

বর্ণনার মধ্যে এমন একটা সহজ সুর আছে যাহা আধুনিক যুগের ভিন্নরুচি ও মনোধর্মের পাঠকেরও প্রীতিকর হইবে। কৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট রাধার উক্তি:

মুখ দেখিতে বুক বিদরে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভাবিলে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥
সই কি জানি কদম্ব তলে।
দেখিয়া ওরূপ কুলে তিলাঞ্জলি
যাইতে যমুনা জলে॥

এখানে আলঙ্কারিক কৌশল অপেক্ষা সরল কথাই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। শ্রীরাধার রূপ দর্শনে কৃষ্ণের মনে যে আবেগ আর্তি ফুটিয়াছে তাহা আদিরসাত্মক হইলেও বাৎসল্য রসের কবি বলরাম দাস কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে আদিরসের উত্তেজনা অপেক্ষা একটা শান্ত স্নিগ্ধ মমতা সঞ্চার করিয়াছেন:

রাই বোলহ করিব কি।
তিলেক তোমার পরশ না পাইলে
সেই ক্ষণে নাহি জী॥
তোমার অঙ্গের সরস পরশ
পাইলে যে সুখ উঠে।
বুকের ভিতর বান্ধিয়া রাখয়ে
ছাড়িতে পরাণ ফাটে॥
... ...
হেন লএ মনে প্রবেশিয়া বনে
তোমারে করিয়া বুকে।
বলরাম চিতে দেখি দিন রাইতে
আপন মনের সুখে॥

এই পদের শেষ কয় পংক্তির মতো যশোদাও নীলমণিকে বলিতে পারিতেন—"হেন লএ মনে প্রবেশিয়া বনে তোমারে করিয়া বুকে"—ইহা তো বাৎসল্য রসেরই আর্তি।

আক্ষেপানুরাগের পদে রাধা যখন নিজের বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখ বিবৃত করিয়া বলেন:

বন্ধু হে তোমারে বুঝাই।
সভাই বলে আমি তোমার তেজ্ঞি জীতে চাই ॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াকু পরাণ ॥

তখন এই ধরণের পদে চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের আন্তরিকতা ফুটিয়া ওঠে।

বলরাম রাধার রসোদ্গার বিষয়ক কয়েকটি চমৎকার পদ লিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রেমপ্রীতি স্মরণ করিয়া বলিতেছেন :

নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে ॥
সই কি ছাই পরাণ ধরি।
কি তার আরতি কি সে পিরীতি
জীতে কি পাসরিতে নারি ॥
নিশাস ছাড়িতে গুণে পরমাদে
কাতর হইয়া পুছে।
বালাই লইয়া মো মরোঁ বলিয়া
আপনা দিয়া কত কি নিছে ॥

কখনও কৃষ্ণ

জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া পোহাল রাতি
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে ক্ষণ করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে ॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥
ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে
ক্ষণে পুলকিত হয় ক্ষণে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে ॥

এখানে বলরাম কৃষ্ণের যে ভাবব্যাকুল মুগ্ধ চিত্র আঁকিয়াছেন, সমগ্র বৈষ্ণব-

সাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল। বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণের সচঞ্চল সম্ভোগরসের মূর্তিটি অধিকতর পরিচিত; রাধাকেই বরং ভাবরসে মুগ্ধ কৃষ্ণগতপ্রাণা করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু বলরাম এখানে কৃষ্ণকে আদিরসের নায়করূপে আঁকিয়া তাঁহার মধ্যেও একটা অপার্থিব আবেগ, সস্নেহ, বেদনা ও মমতা সঞ্চার করিয়াছেন। ইহার শুচিস্নিগ্ধতা বলরাম দাসের স্নিগ্ধমধুর বাৎসল্য রসের কবিপ্রকৃতিটিকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। এমন কি বলরাম যেখানে প্রথাসিদ্ধভাবে রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সেখানেও একটা আশ্চর্য সরলতা ও শুচিতা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার শৃঙ্গার রসের পদে যেন কামের বিষদাঁত ভাঙিয়া গিয়াছে :

মিটল চন্দন টুটল আভরণ ছুটল কুন্তল বন্ধ।
অধর খলিত গলিত কুসুমাবলী ধূসর দুহুঁ মুখচন্দ ॥
হরি হরি অব দুহুঁ শ্যামর গোরী।
দুহুঁক পরসরভসে দুহুঁ মুরছিত শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি ॥
রাইক বাম জঘনপর নাগর ডাহিন চরণহি আপি।
নওল কিশোরী আগোরি কোরি পহুঁ ঘুমল মুখে মুখ ঝাঁপি ॥

বলাই বাহুল্য—এ বর্ণনা মূলতঃ ইন্দ্রিয়াসক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; ফলে দেহ এখানে প্রধান অবলম্বন। কিন্তু কবি শুধু 'পরশরভসে মুরছিত শ্যামরগোরি'র অপার্থিব উল্লাসের মধ্যেই বর্ণনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। "রাইক বাম জঘন পর নাগর ডাহিন চরণহি আপি"—এ বর্ণনার শুচিতা ও রমণীয়তা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করাইয়া দেয় :

আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।

কবি বলরাম দাস কতকগুলি দেহতত্ত্ববিষয়ক পদ লিখিয়া নিজের অধ্যাত্মসংস্কার ঘোষণা করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার :

ভাইরে সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবা মহানন্দ সুখ পাবা
নিতাই-চৈতন্য গুণ গাইয়া ॥

কিংবা :

বুড়া তুমি কি আর গরব ধর।
এ ভবসংসার সাগর তরিবে
হরিনাম সার কর ॥

পদগুলি ভক্তসমাজে সুপরিচিত। কিন্তু পাণ্ডুর বৈরাগ্যের নিষ্প্রাণ ছায়ামূর্তি এই পদগুলির কাব্যসৌন্দর্য একেবারে নষ্ট করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বলরাম দাসের পদের মূল সুর সহজ জীবনরসপ্রীতি। এইজন্য আধুনিক কালের পাঠক এই প্রাচীন পদকর্তার সঙ্গে সমপ্রাণতা বোধ করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যবিষয়ক পদাবলীতে কবি সহানুভূতি সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার অনেক পদ এখনও আমাদের নিকট সুখপাঠ্য। কিন্তু উল্লিখিত 'বৈরাগ্য শতক' আর যাহাই হোক, কাব্যরসে অভিষিক্ত হইতে পারে নাই। প্রবাসী কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া রাধার হতাশা 'কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস'—কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, কত দীর্ঘ দিনের ব্যবধান। এমন কি, তিনি যে আবার আসিবেন এমন কোন আশ্বাসও তো কেহ রাধাকে দেয় না—"কেহো তো না বোলে রে আওব তোর পিয়া"। রাধার আশা নাই, আশ্বাসও নাই—এই মানবীয় বেদনাটুকুই পাঠক-শ্রোতার পরম লাভ। কিন্তু কবি যখন শ্মশানযাত্রার পথটা দেখাইয়া দিয়া ভবসাগর পার হইবার জন্য হরিনাম সার করিতে উপদেশ দেন, তখন তাঁহাকে শুধু একটা শুষ্ক প্রণাম জানাইয়া আমরা কবির রাধাকৃষ্ণলীলার বেদনামধুর পদগুলিকেই নিজের বুকের মধ্যে ভরিয়া লই। বলরাম দাস এই জন্য এখনও রসিকসমাজে বাঁচিয়া আছেন এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও থাকিবেন।

জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব পদাবলী ও পদকারদের চারিদিকে এমন একটা দেশকাল ও ভাবানুষঙ্গের বলয়বেষ্টনী আছে যে, বিশুদ্ধ মর্ত্যজীবনচারী রোমান্টিক রসানুভূতি মাত্র সম্বল করিয়া বৈষ্ণব পদ আস্বাদন করিতে গেলে অনেক সময় ব্যর্থ হইতে হয়। বৈষ্ণব আদর্শে যাঁহার স্বল্পমাত্র প্রবেশাধিকার নাই, তাঁহার নিকট রাধাকৃষ্ণলীলা কোন কোন সময় অতিশয় স্থূল মনে হইবে, কখনও বহুকথনদোষে ভারাক্রান্ত বিরাট পদাবলী সাহিত্যের অনেকটাই প্রতিভার

অপব্যয় বলিয়া ধারণা জন্মিয়া যাইবে। এইজন্য এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে একটা বিশেষ ধরণের সংস্কার প্রয়োজন। তবু বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে নিখিল মানবের চিত্তগ্রাহী রোমান্টিক রসপ্রবণতা আছে, এবং আছে বলিয়াই এই পদাবলী শুধু বৈষ্ণব মহান্তের মঠে এবং পাঠবাড়ীতে স্থান পায় নাই, আধুনিক সহৃদয় পাঠকেরও রসের ভোগে লাগিয়াছে। একদা হয়তো বৈষ্ণব পদের ধর্মীয় মূল্যই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এযুগের পাঠকের মনে মধ্যযুগের পদাবলী-সাহিত্যও যে রসের দোলা দেয়, তাহার কারণ—ইহার মধ্যে যুগাতিচারী অনুভূতি লুকাইয়া আছে। পাঠক-পাঠিকা সে কথাটার তখনই সম্যক তাৎপর্য বুঝিবেন, যখন তিনি জ্ঞানদাসের বাংলা পদগুলি মনে মনে আবৃত্তি করিবেন। তখন তিনি দেখিবেন, জ্ঞানদাস যেন তাঁহারই কালের কবি, তাঁহার অন্তরের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে কবি জ্ঞানদাসের যেন জন্মান্তরীণ যোগাযোগ। একথাটি পরে তাঁহার পদ হইতে আমরা বুঝিয়া লইব। এখন দেখা যাক জ্ঞানদাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্যে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস, এই কবিত্রয় একটা স্বতন্ত্র মহিমায় আসীন। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সমস্যার অন্ত নাই, গোবিন্দদাসের জীবনকথা মোটামুটি পরিচিত; কিন্তু জ্ঞানদাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোন কোন সমালোচকের মতে জ্ঞানদাসের মতো কবিমানস মধ্যযুগে দুর্লভ। অথচ তাঁহার জীবনকথা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কোন তথ্যই সুলভ নহে। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে :

> পীতাম্বর মাধবাচার্য দাস দামোদর।
> শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥

নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনায় জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যাইতেছে। তিনি নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন এবং নিত্যানন্দের অন্যতমা পত্নী জাহ্নবাদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। খেতুরীর উৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন—ইহার অতিরিক্ত আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু জনজল্পনা এত সহজে কবিকে ছাড়িয়া দিবার পাত্র নহে। জ্ঞানদাসের জন্মকাল

বাসস্থান এবং জীবনের দুই চারিটি ঘটনা লইয়া নানা কথা চলিয়া আসিতেছে। 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে

> রাঢদেশে কান্দরা নামেতে গ্রাম হয়।
> যথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়।।

ইহাতে কোন গোলমাল নাই। রাঢে কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের নিবাস, ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গোল বাধিয়াছে 'মঙ্গল' শব্দটি লইয়া। ইহা কি জ্ঞানদাসের বিশেষণ, না উপাধি? শ্রীযুক্ত হরে-কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানদাসের পদাবলীর' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, এই 'মঙ্গল' বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত 'মঙ্গল বৈষ্ণব'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গদাধর-শাখা বর্ণনায় মঙ্গল বৈষ্ণবের উল্লেখ আছে—"যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব।" কাঁদড়া গ্রামে এখনও ইঁহার বংশধর বর্তমান। মঙ্গল বৈষ্ণব বা মঙ্গল ঠাকুর জ্ঞানদাসের সঙ্গে খেতুরীর উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। জ্ঞানদাস ও মঙ্গল সমসাময়িক এবং একই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[৩] লোকশ্রুতি অনুসারে জ্ঞানদাস চিরকুমার ছিলেন, আবার আর এক মতে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন, একটি পুত্রও হইয়াছিল। কাঁদড়ায় এখনও জ্ঞানদাসের মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ পূজিত হন। শুনা যায়, প্রসিদ্ধ ভক্ত মনোহর দাস আউলিয়া নাকি জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন. জ্ঞানদাসের মৃত্যুর পর তিনি এই মঠের ভার গ্রহণ করেন। এখনও এই মঠে পৌষমাসের পূর্ণিমায় তিন দিন ধরিয়া জ্ঞানদাসের স্মরণ-উৎসব হয়।

তাঁহার জন্মসন সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলিয়াছেন। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের মতে জ্ঞানদাসের জন্মসন ১৪৫৭ শক অর্থাৎ ১৫২৫ খ্রীঃ অব্দ। হারাধন দত্ত, জগদ্বন্ধু ভদ্র, দীনেশচন্দ্র—ইঁহাদের মতে জ্ঞানদাসের জন্মকাল যথাক্রমে ১৪৫৯ শক (১৫৩৭), ১৪৫৩ শক (১৫৩১) এবং ১৫৩০ খ্রীঃ অঃ। এই তারিখ যাচাই করিয়া লইবার মতো কোন উপাদান পাওয়া যায় নাই। যাঁহারা এই সনতারিখ নির্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাও নিজ নিজ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন। শুধু এইটুকু জানা যাইতেছে যে, জ্ঞানদাস খেতুরী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং জাহ্নবাদেবীর মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে নরোত্তমের আহ্বানে খেতুরীতে বৈষ্ণব সম্মেলন আহূত হইয়াছিল।

[৩] কোন কোন মতে জ্ঞানদাস নাকি মঙ্গলবংশীয় রাঢী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।

জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দবিষয়ক পদে যেরূপ প্রত্যক্ষ বর্ণনা আছে, তাহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি হয়তো নিত্যানন্দকে চাক্ষুষ করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহাকে নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত করা হইয়াছে। নিত্যানন্দ চৈতন্য-তিরোধানের (১৫৩৩) আট-দশ বৎসর পরে লীলা সংবরণ করেন। এই সময়ে জ্ঞানদাস যদি সত্যই নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার 'গণের' অন্তর্ভুক্ত হন, তাহা হইলে তখন তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন না। তিনি নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য হইলে ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দের কিছু পূর্বে তাঁহার জন্ম হওয়া সম্ভব। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেন, "জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দের ভাববর্ণনার পদগুলি দেখিয়া মনে হয়, কবি যেন নিজে চোখে দেখিয়া এগুলি লিখিতেছেন।"[৪] বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে নিত্যানন্দ-বন্দনাসূচক পদগুলির মধ্যে জ্ঞানদাসের পদসংখ্যাই সর্বাধিক। এই দৃষ্টান্ত তুলিয়া ডঃ মজুমদার মন্তব্য করিয়াছেন, "ক্ষণদায় জ্ঞানদাসের তিনটি পদ (৯।২, ১৩।২, ২২।২) চক্রবর্তীপাদ ধরিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় জ্ঞানদাসকে তিনি নিত্যানন্দ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পদ তিনটি পড়িলেও সেইরূপ মনে হয়।"[৫] এই সমস্ত অনুমান অনুমান মাত্র এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না তাহা সহজেই অনুমেয়। অনুমানের সীমা একটু বাড়াইয়া বলা যাইতে পারে যে, ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে জ্ঞানদাসের জন্ম হওয়া সম্ভব, তাহা হইলে খেতুরীর উৎসবের সময় তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছাইয়াছিল। 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'তে নরহরিদাস ভণিতাযুক্ত একটি পদে আছে, "শ্রীবীরভূমেতে ধাম, কাঁদড়া-মাঁদড়া গ্রাম, তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাস।" নরহরি চক্রবর্তীর (ঘনশ্যাম) 'ভক্তিরত্নাকরে' এ পদটি নাই। নরহরি সরকার ঠাকুর জ্ঞানদাসের পূর্ববর্তী। তাই 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র এই পদটিকে বিশেষ মূল্য দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র দুই-চারি কথায় যাহা বলিয়াছেন, আমরা জ্ঞানদাস সম্বন্ধে তাহাই গ্রহণ করিয়া কবির অন্যান্য আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি: "সিউড়ির বিশক্রোশ পূর্বে ও বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম। তথায় ব্রাহ্মণবংশে

---

৪ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য

৫ ঐ

১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত। খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন দেখা যায়, স্থতরাং ইনি গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্রভৃতির সমকালিক কবি।"

চণ্ডীদাস-বলরামদাস-গোবিন্দদাস নামক যেমন একাধিক পদকর্তা বর্তমান ছিলেন, জ্ঞানদাস নামেও কি সেইরূপ একাধিক পদকর্তা ছিলেন? 'পদকল্পতরুতে' ১৮৬টি পদ জ্ঞানদাসের ভণিতায় স্থান পাইয়াছে, তাহার মধ্যে ১০৫টি পদই ব্রজবুলিতে রচিত। রমণীমোহন মল্লিক জ্ঞানদাসের পদাবলীর যে সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে অতিরিক্ত আরও কিছু পদ সংযোজিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব তিনি এই অতিরিক্ত পদগুলি কীর্তনীয়া সমাজ, অপ্রধান বা অর্বাচীন সঙ্কলন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে নানা প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া ('পদরসসার' 'পদরত্নাকর' ইত্যাদি) জ্ঞানদাসের আরও ৫০টি নূতন পদ পাইয়াছিলেন। শ্রীস্থকুমার ভট্টাচার্য্য এম. এ. ১৩৪৭ সালে 'যশোদার বাৎসল্য লীলা' নামে একটি পুঁথি আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞানদাসের ভণিতার ২০টি অতিদীর্ঘ বাৎসল্য লীলার পদ আছে।[৬] সাধারণ হিসাব হইতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় আড়াই শতেরও বেশি পদ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে এই সংখ্যা প্রায় চারিশতের মতো হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, জ্ঞানদাস ভণিতাযুক্ত যাবতীয় পদ কি একজন কবির রচনা? ডঃ স্থকুমার সেন বলেন, "জ্ঞানদাস নাম তখন এবং পরেও অনেকের নিশ্চয়ই ছিল। এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ নামে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে ধরা যাইতেছে না এবং পদগুলির মধ্যে দ্বিতীয় লেখনীর নিশ্চিত পরিচয়ও

৬ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের যুগ্ম সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্ঞানদাসের যে পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মোট পদের সংখ্যা—৩৯৫। জ্ঞানদাসের প্রচলিত প্রায় দুইশত পদ এই সঙ্কলনে কি করিয়া ডবল হইয়া গেল, সম্পাদকগণ তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেন নাই। অন্যতম সম্পাদক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "এই সমস্ত পদ ও পাঠান্তর কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, অনেক দিনের কথা বলিয়া আজি আর স্মরণ করিতে পারিতেছি না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও অনেক হারাইয়া গিয়াছে।" কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিতে হইলে উৎস অর্থাৎ মূল পুঁথির সন্ধান না দিলে শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোন কাব্যকে প্রামাণিক বলা যায় না।

পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং আপাতত জ্ঞানদাসনামিত সমস্ত পদই একজনের উপর চাপাইতে হয়।"[৭] ডঃ সেনের মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত। বাস্তবিক একজন জ্ঞানদাস সম্বন্ধেই যখন বিশেষ কিছু জানা যায় না, তখন একাধিক জ্ঞানদাসের পরিকল্পনা নিতান্তই হাস্যকর। "জ্ঞানদাস নাম তখন এবং পরেও অনেকের নিশ্চয়ই ছিল। এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ পদ রচনা করিয়া থাকিবেন"—ডঃ সেনের অনুমানকে কি টানিয়া এতটা দীর্ঘ করা যায়? সে যাহা হোক, অন্য প্রমাণের অভাবে আপাততঃ না হয় জ্ঞানদাসভণিতায় প্রচারিত সমস্ত পদকে একজন জ্ঞানদাসের বলিয়া গ্রহণ করা গেল। কিন্তু সত্যই কি আর কেহ জ্ঞানদাসের ভণিতায় অথবা দ্বিতীয় কোন জ্ঞানদাস পদ রচনা করেন নাই? শ্রীযুক্ত সুকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত 'যশোদার বাৎসল্যলীলা' নামক কুড়িটি পদের সংক্ষিপ্ত পালার প্রতিটি পদের অন্তে সর্বত্র "জ্ঞানদাসে কন"—এইরূপ ভণিতা আছে। এই পুঁথিটি পরিচিত জ্ঞানদাসের হইতেই পারে না। ডঃ সেন এই পালাটিকে "অত্যন্ত বর্ণহীন" বলিয়া কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন, ইহা প্রচলিত কবি জ্ঞানদাসের রচিত হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্ঞানদাসের যে পদসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিশিষ্টে সম্ভবতঃ অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত সুকুমার ভট্টাচার্য আবিষ্কৃত এই 'যশোদার বাৎসল্যলীলা'র ২০টি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য পদগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সাহিত্যরত্নের কিছু সন্দেহ আছে। তাঁহার মন্তব্যটি উদ্ধৃতির যোগ্য: "এই পালাপুঁথিটি পদাবলী সাহিত্যের জ্ঞানদাসের রচিত কিনা, তাহা আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। বৈষ্ণব জগতে দ্বিতীয় কোন জ্ঞানদাসের কথা শোনা যায় নাই—জ্ঞানদাসও পদাবলী ছাড়া ঠিক আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহাও অজ্ঞাত। অবশ্য তাঁহার পদাবলীর মধ্যেই কিছু কিছু আখ্যানমূলক রচনা আছে, কিন্তু গীতিকবিরূপেই তাঁহার প্রধান পরিচয়। অন্য কোন অখ্যাতনামা কবি নিজের পদ যে জ্ঞানদাসের নামে চালাইতে চেষ্টা করিবেন তাহা একেবারে অচিন্তনীয় নয়—বৈষ্ণব কাব্যে এইরূপ রীতির প্রমাণও আছে।

---

৭ ডঃ সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ,

তবে বৈষ্ণব কবির-ভক্তিরস এত সর্বতোমুখী ও এত বিচিত্র উপায়ে ইহা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে যে, জ্ঞানদাস যে রাধাকৃষ্ণলীলা লইয়া দীনচণ্ডীদাসের মতো একটা ধারাবাহিক আখ্যায়িকা লিখিতে পারেন তাহাও অসম্ভব নয়।" ভূমিকার আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত গোষ্ঠলীলার পদগুলি জ্ঞানদাস-নামাঙ্কিত, কিন্তু—পদগুলি কবি জ্ঞানদাসের রচিত বলিয়া মনে হয় না।" গৌণ প্রমাণের বলে আমাদের অনুমান এই পদগুলি কদাচ পদাবলীর বিখ্যাত জ্ঞানদাসের রচিত নহে। প্রথম কারণ, এই পদের কবি প্রত্যেক পদের অন্তে "জ্ঞানদাস কন" ভণিতা দিয়াছেন। এই ভণিতা অত্যন্ত সন্দেহজনক। সম্ভ্রমবাচক 'কন' শব্দেই বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানদাসের পরে কোন জ্ঞানদাস-ভক্ত এই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। উপরন্তু জ্ঞানদাসের ভণিতার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি শুধু 'কহে জ্ঞানদাস', 'জ্ঞানদাস ভণে' বা 'গাহে জ্ঞানদাস' এইরূপ সাদাসিধা ভণিতা দিতে অভ্যস্ত নহেন। বর্ণিত পদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়া তিনি ভণিতায় নিজের কথাও কিছু কিছু জুড়িয়া দেন, অথবা বর্ণিত বিষয়ে দুই একটা মন্তব্য জুড়িয়া দেন। যেমন—

১। হেরি জ্ঞানদাস কহে যেহ বলে যেহ হয়।
২। জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি।
৩। জ্ঞানদাস বলে ভালই বুঝিলে মরমে লাগিল মোর।

এইজন্য নবাবিষ্কৃত বাৎসল্যলীলার পদগুলির ভণিতায় বিশেষ সন্দেহ হয়। উপরন্তু বাৎসল্যলীলার প্রতি জ্ঞানদাসের বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণে মাত্র ৭টি বাৎসল্যলীলার পদ সঙ্কলিত হইয়াছে; তাহাতেও আবার বলরামের প্রাধান্য অধিক, কৃষ্ণ নহে—যশোদা তো একেবারেই নহে। প্রাপ্ত পদগুলির কবিত্ব ও রচনাভঙ্গিমা অত্যন্ত দুর্বল, ভাষার মধ্যে অনভ্যস্ত জড়তা ধরা পড়িবে। যথা:

একদিন বিহানে উঠিঞা নন্দরাণী।
যাদুরে লইয়া কোলে মথিছে নবনী॥
হেনকালে ধরে কৃষ্ণ মন্থনের ডারি।
ন্নুনী দে মা বল্যা কর পাতএ মুরারি॥

অথবা

রূহিনীর কাছে বলাই ন্নুনী খাত্যেছিল।
ক্রন্দনের ধ্ব'নি শুনি আঙ্গিনায় আল্য।।
দেখিলা যশোদা পড়্যা ধুলার উপর।
হেন দশা কেন গো মা পুছে হলধর।।
দু করের ন্নুনী পেল্যা আনু ধায়াধাই।
কি কারণে কান্দ তুমি কোথা কানুভাই।।

ইহা কখনও পদাবলীর জ্ঞানদাসের রচনা হইতে পারে না। অবশ্য এ পদ-গুলিতে একটা অমার্জিত গ্রাম্য সৌন্দর্য আছে। ইহার ভাষাকে আর একটু পুরাতন করিয়া আরও কিছু অনুনাসিক স্বরের চিহ্ন যোগ করিয়া দিলে পুঁথিটিকে পিছনে ঠেলিয়া প্রায় বড়ু চণ্ডীদাসের কাছাকাছি লইয়া যাওয়া সম্ভব। এ সমস্ত অনুমানের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাপ্ত পুঁথিটির বর্ণনায় ধারাবাহিকতার পরিচ্ছন্নতা আছে, পয়ার ছন্দও যথাসম্ভব নিখুঁত; ভাষার দুই চারিটি স্থানীয় বাক্‌রীতি বাদ দিলে এ ভাষা খুব বেশি পুরাতন মনে হইবে না। ইহাতে বাৎসল্য ও সখ্যরস বেশ মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানদাসের ভাব ও ভাষার কোন চিহ্ন এই পদগুলিতে নাই। কোন আবেগের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও লীরিক কবিতার উচ্ছ্বাস এই পদগুলিতে সর্বত্রই অনুপস্থিত। সুতরাং জ্ঞানদাস ভণিতাযুক্ত এই বাৎসল্য লীলার পদগুলিকে আপাততঃ অন্য কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা গেল।

জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি—উভয় ভাষাতেই পদ লিখিয়াছিলেন, 'পদ-কল্পতরু'তে গৃহীত তাঁহার পদের অর্ধেকের বেশি পদ ব্রজবুলিতেই রচিত। তাঁহার ব্রজবুলি পূর্বতন ধারাকে অনুসরণ করিয়াছে, খুব সম্ভব বিদ্যাপতির মৈথিলী পদগুলি তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রজবুলিতে পদ রচনা একটা জনপ্রিয় কাব্যরীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বোধহয় শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তমের প্রভাবের ফলে বাংলা পদে ব্রজবুলির প্রভাব বিশেষভাবে ছড়াইতে আরম্ভ করে। খেতুরীর উৎসবের পরে বৈষ্ণবসমাজে নানা 'ঘরানা'র কীর্তনগানের প্রচার হইয়াছিল। ব্রজবুলিতে রচিত গানগুলি কীর্তনে খুব জমিয়া ওঠে, উপরন্তু অনভ্যস্ত ভাষার জন্য কীর্তনীয়াগণ ইহাতে ইচ্ছামতো আখর দিতে পারেন। তাই সে যুগের

পদসঙ্কলনগ্রন্থে বাংলা পদের সঙ্গে ব্রজবুলি পদের এত আদর হইয়াছিল। জ্ঞানদাসও সেই প্রথামতো ব্রজবুলিতে বেশ কিছু পদ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাংলা পদের মতো ব্রজবুলির পদগুলি কাব্যধর্মে ততটা উৎকৃষ্ট নহে। একটু দৃষ্টান্ত লওয়া যাক :

> কষিল কনক রুচির গৌর অখিলভুবন মরমচৌর
> করভশুণ্ড বাহুদণ্ড কল্মষ-তাপ-ত্রাসনি।
> প্রচুর পুলক শোভিত অঙ্গ নটনলীলা অধিক রঙ্গ
> বয়ান শরদ পূনিম ইন্দু সরস হাসভাষণি ॥
> আজু বণি গৌর চান্দ জগজনমন নয়নফান্দ
> উরহ দোলত কুন্দমাল ভালে তিলক লায়নি ॥ ধ্রু ॥

এখানে ব্রজবুলির ধ্বনিঝঙ্কার ও ছন্দের দোলন অতিশয় সুখপাঠ্য ; কিন্তু ইহাতে তাহার অতিরিক্ত কোন ভাবগভীর ব্যঞ্জনা বা সূক্ষ্মতর রসের ইঙ্গিত নাই। বিদ্যাপতির পদের মতো ইহা ঘনপিনদ্ধ নহে, আবার গোবিন্দদাস কবিরাজের মতো ইহাতে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের আবেগমুগ্ধ উল্লাস নাই। অবশ্য দুই চারিটি ব্রজবুলির পদে শিল্পীর উৎকর্ষ প্রশংসার যোগ্য :

> লহু লহু মুচকি হাসি হাসি আওলি
> পুন পুন হেরসি ফেরি।
> জনু রতিপতি সঞে মিলনরঙ্গভূমে
> ঐছন কয়ল পুছুরি ॥
> ধনী হে বুঝলুঁ এসব বাত।
> এতদিনে তুহুঁক মনোরথ পূরল
> ভেটলি কানুক সাথ ॥

এই পদটির ভাষা উগ্র আলঙ্কারিক কৌশলে আত্মঘোষণা করে না, শব্দালঙ্কারে মাতাইতে চাহে না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতার যে প্রধান গুণ ব্যঞ্জনা, গূঢ় রসের ইঙ্গিত—তাহা 'ধনী হে বুঝলুঁ এসব বাত' এই অর্ধোক্তিতে চমৎকার ফুটিয়াছে। এই পদটির উল্লেখ করিয়া ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, "With the exception of Govindadas Kaviraj, Jnanadasa was the most careful writer of Brajabuli, though there are a few poems where Brajabuli is greatly mixed up with Bengali."[৮] বাংলার সঙ্গে

[৮] Dr S. K Sen—*History of Brajabuli Literature* (C U.)

ব্রজবুলির যে মিশ্রণ ঘটিয়াছে তাহার কারণ কবি convention বা প্রথার খাতিরে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিলেও তাঁহার মনের কথাটি কিন্তু বাংলা পদেই যথার্থ ধরা পড়িয়াছে। রসলোকের খাসদরবারে প্রবেশের জন্য তিনি বাংলা পয়ার-ত্রিপদীর চাবিকাঠি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ব্রজবুলিতে বুদ্ধির কৌশল, আবেগ, আন্তরিক কলানৈপুণ্য—সবই আছে; কবি যেন গজকাঠি মাপিয়া মাপিয়া এই ব্রজবুলির পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য দুটি চারিটি পদের ব্রজবুলিতে স্বতোস্ফূর্ত ভাবাবেগ যে নাই তাহা নহে, কিন্তু কবি যেন এই জাতীয় পদে বেশ সুস্থ হইয়া নিজেকে পুরাপুরি সঁপিয়া দিতে পারেন নাই। তাজমহলের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের যে পার্থক্য, জ্ঞানদাসের বাংলাপদের সঙ্গে তাঁহার ব্রজবুলির তফাৎ তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। যদিও ডঃ সেন জ্ঞানদাসকে একজন শ্রেষ্ঠ ব্রজবুলির কবি বলিয়াছেন, তবু কবির যথার্থ প্রতিভা ব্রজবুলিতে যেন সম্যক আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। ব্রজবুলি তাঁহার কবিভাষা, প্রাণের ধাত্রী নহে। আমাদের তো মনে হয় রাধামোহন ঠাকুরের ব্রজবুলির পদে শিল্পপ্রকরণ ও রসবস্তু জ্ঞানদাস অপেক্ষা অধিকতর কৌশলে মিশ্রিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির অনুকরণ ছাড়িয়া খুব অল্প ক্ষেত্রেই তিনি ব্রজবুলিতে স্বচ্ছন্দ পদচারণা করিতে পারিয়াছেন। যে সমস্ত বিচিত্র বাক্‌রীতি জ্ঞানদাসের নিজস্ব সম্পদ, যাহা তাঁহাকে আধুনিক পাঠকের দরবারেও শ্রদ্ধান্বিত আসন দিয়াছে, তাহা এই ব্রজবুলির পদে ততটা পাওয়া যায় না—যতটা পাওয়া যায় তাঁহার বাংলা পদে।

অতঃপর কেহ হয়তো বলিবেন, জ্ঞানদাসের বাংলা পদেই বা এমন কি মৌলিক কবিপ্রত্যয় ও শিল্পীদৃষ্টি ফুটিয়াছে? যিনি ব্রজবুলিতে বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াছেন, আক্ষেপানুরাগের ও রসোদ্‌গারের পদে চণ্ডীদাস, বলরামদাস ও বসু রামানন্দের পথ ধরিয়াছেন এবং হয় তো ভণিতার গোলমালে চণ্ডীদাসের কোন কোন পদের গৌরব তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার কবিতা লইয়া এত কি বলিবার আছে? সে কথাটাই এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের বর্ণনা ও বন্দনাসূচক তাঁহার গুটিকয়েক পদ আছে। কোনটিই খুব কিছু অভূতপূর্ব নহে। চৈতন্যলীলা দর্শন তাঁহার ভাগ্যে

ঘটে নাই, তাই চৈতন্যবিষয়ক পদে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব পরিলক্ষিত হইবে। তিনি যখন কলিযুগ-মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া বলেন,

ধনি খিতিমণ্ডল ধনি নদীয়াপুর
ধনি ধনি ইহ কলিকাল।
ধনি অবতার ধনি রে ধনি কীর্তন
জ্ঞানদাস নহ পায়॥

তখন চৈতন্য-আবির্ভাবে পূতপবিত্র ক্ষিতিমণ্ডলের কথাই কবির মনে ভাসিয়া ওঠে। নিত্যানন্দের বন্দনাসূচক পদগুলিতে কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষভাব আছে বটে, কিন্তু 'মহামল্ল' নিত্যানন্দের বাস্তব বর্ণনা ভিন্ন ইহাতে কবিত্বের নিপুণতা নাই, আবেগের গভীরতাও সুলভ নহে—বস্তুতঃ এই পদগুলির জন্য জ্ঞানদাসের খ্যাতি নহে, অনেক দ্বিতীয়শ্রেণীর কবি এরূপ পদ অজস্র লিখিতে পারিতেন এবং লিখিয়াও গিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানদাসের প্রতিভার যথার্থ বিকাশ হইয়াছে রাধাকৃষ্ণের পদাবলীতে।

জ্ঞানদাস রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত যে পদগুলি লিখিয়াছেন, সেগুলির সমস্তই যে সমান শিল্পোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। বৈষ্ণব পদাবলী এমন এক বিচিত্র সৃষ্টি, যাহা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক, তেমনি কিয়দংশে তাহা কৃত্রিম ও চেষ্টাকৃত। সপ্তদশ শতাব্দীর পদসাহিত্যে এই কৃত্রিমতা অতিশয় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানদাসের ব্রজবুলিতে কৃত্রিমতা দুর্লভ নহে, এমন কি তাঁহার কোন কোন বাংলাপদেও বুদ্ধির কৃত্রিম কৌশল ধরা পড়িয়াছে। বিদ্যাপতির অনুকরণে তিনিও প্রহেলিকা ধরণের বুদ্ধির মারপ্যাচে পূর্ণ দু একটি শূন্যগর্ভ পদ লিখিয়াছিলেন। যথা:

সজনি কি পেখলু নীপমূলে ধন্দ।
এক বরণে কালা বিবিধ বিনোদলীলা
লাবণ্যে ঝরয়ে মকরন্দ॥ ধ্রু॥
ভবজ-অম্বুজ রথ তা তলে বিনতাসুত
কোরে কুমুদবন্ধু সাজে।
হরি-অরি সন্নিধান অলি বসে পুরে বাণ
রমণীমণির মনে বাজে॥
খগেন্দ্র নিকটে বসি রসেন্দ্র বাজায় বাঁশি
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়।

কুন্তীর নন্দন মূলে কশ্যপনন্দন দোলে
মনমথের মন মথে তায় ॥
জলধিসুতা-পতি তার উরে যার স্থিতি
সে কেনে যমুনা জলে ভাসে।
শচীপতি-রিপু-সুতা বাহন বিজুরিলতা
নিরীক্ষণ করে জ্ঞানদাসে ॥

জ্ঞানদাস এই শব্দার্থব্যায়াম মহাসুখে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু রসিক পাঠক এই 'হিং-টিং-ছটে' কিছুমাত্র আনন্দ পাইবেন না। এই কাব্যপ্রবন্ধের জট ছাড়াইলে সহজ অর্থটি এইরূপ দাঁড়ায়:

সজনি, কদম্বমূলে কি দেখিলাম, ধাঁধা লাগিল। একজন বর্ণ কালো, তাহার মনোহর লীলার অন্ত নাই। দেহ-লাবণ্যে যেন মধু ঝরিতেছে। দেখিলাম গণেশের কনিষ্ঠ কার্তিকের রথের (ময়ূরপুচ্ছ চূড়ায়) তলে গরুড় (গরুড়ের মতো নাসিকা), তাহার কোলে চাঁদ (চাঁদের মতো মুখ)। সিংহের শত্রু হরিণের (হরিণের মতো চক্ষু) নিকটে অলি (চক্ষু তারকা) বসিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতেছে। সেই বাণ নারীশিরোমণি-গণের মনে বাজিতেছে। খগেন্দ্র (নাসিকা) নিকটে রসেন্দ্র (হিঙ্গুলের ন্যায় আরক্ত সরস অধর) বাঁশি বাজায় শুনিয়া যোগিশ্রেষ্ঠ মুনিশ্রেষ্ঠগণও মূর্চ্ছা যায়। কুন্তীর নন্দন-(কর্ণ) মূলে কশ্যপপুত্র (সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল কুণ্ডল) দুলিতেছে, তাহা মদনের মনকেও মথিত করে। জলধি-সুতা-(লক্ষ্মী) পতি (নারায়ণ)-বক্ষে যাহার বাস (কৌস্তুভ), সে আজ যমুনাজলে (যমুনাবারির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কৃষ্ণবক্ষ-স্থলে) কি জন্য ভাসিতেছে? ইন্দ্রশত্রু পর্বত ও তাহার কন্যা পার্বতী, পার্বতীর বাহন সিংহে বিজুরিলতা জড়াইয়াছে (সিংহের ন্যায় কৃশ কটীতে পীতবসন রহিয়াছে)। জ্ঞানদাস তাহাই দেখিতেছেন।*

বলাই বাহুল্য এখানে জ্ঞানদাস বিদ্যাপতির পদে অক্ষম হস্তে দাগা বুলাইয়াছেন। বিদ্যাপতির সে চিত্তচমৎকারী কৌশল ও বুদ্ধির দীপ্তি এ পদে নাই। এই ধরণের অতিশয় কৃত্রিম ও অনুকরণের পদে জ্ঞানদাসের কোনরূপ কবিপ্রতিভা ফুটিতে পারে নাই। তাঁহার প্রশংসা অন্য কারণের উপর নির্ভর করিতেছে।

যখন জ্ঞানদাস কৃত্রিম কবিসংস্কারের চশমা আর ব্রজবুলির সাজসজ্জা ত্যাগ করিয়া রাখালী সুরে রাধাকৃষ্ণের সুখদুঃখের কথা শুনাইয়াছেন, তখনই তিনি পাঠকের মন লুঠ করিয়া লইয়াছেন, তখনই তিনি যথার্থ চণ্ডীদাসের উত্তরসাধক হইয়াছেন। চণ্ডীদাসের অনেক পদ তাঁহার ভণিতায় চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার পদেও চণ্ডীদাসের ভণিতা সংযোজিত হইয়াছে। হইবেই তো! উভয়ের মনের

* হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত ব্যাখ্যা। দ্রষ্টব্য: জ্ঞানদাসের পদাবলী (ক. বি. প্রকাশিত)

মানুষ যে একই ব্যক্তি। হয়তো চণ্ডীদাস আরও গভীর, চৈতন্যের তমোগহ্বরে একটি অনির্বাণ দীপশিখা। জ্ঞানদাস হয়তো সে মণিদীপ্ত তিমিরগহ্বরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রাইকানুর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, চণ্ডীদাসের মতো নিঃসঙ্কোচে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কারণ চণ্ডীদাস মূলতঃ তদ্‌গত, জ্ঞানদাস মূলতঃ আত্মগত। চণ্ডীদাসের অহং—বাউলের ভাষায় 'জীয়ন্তে মরা'; জ্ঞানদাসের অহং আত্মনিবেদনে বিগলিত হইলেও একেবারে 'সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী' বলিয়া জাতিকুল বিসর্জন দিতে পারে নাই। রাইকানুর লীলাবিলাসে জ্ঞানদাসও মঞ্জরীমাত্র, কিন্তু মধুবৃন্দাবনের বিপিনমাধুরী তিনিও ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই স্থানে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের কবিপুরুষের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে। কবিত্বের বাহিরের লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাস অপেক্ষা উচ্চতর কারুশিল্পী, কারণ রূপনির্মিতিতে জ্ঞানদাস অধিকতর শিল্পপ্রয়াসের পরিচয় দিয়াছেন। অনুভূতির সঙ্গে তাঁহার দুইটি সজীব ও সজাগ চক্ষুও দৃষ্টি পাতিয়া অপেক্ষা করে। কিন্তু চণ্ডীদাসের সমস্ত ইন্দ্রিই চক্ষু হইয়া যায়, কখনও-বা সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রবণধ্বনিতে পরিণত হয়। চণ্ডীদাস শিল্পসৃষ্টির সক্রিয় প্রয়াসে উদাসীন, কাজেই ছন্দ-অলঙ্কার ও রূপনির্মাণে তিনি ধনী নহেন। তবে তাঁহার পদ মনের মধ্যে একটা ব্যঞ্জনার আভাস দেয়, তাহাকে কিসের ব্যঞ্জনা বলা যাইবে? রসের ব্যঞ্জনা বলিলে অলঙ্কার শাস্ত্রের মহিমা রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে ঠিক খবরটি পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের পদাবলী রস-ধ্বনির বাহিরে চিত্তকে আকর্ষণ করে। তাই বলিয়া তাহাকে পুরাপুরি আধ্যাত্মিকও বলা চলিবে না। কারণ আধ্যাত্মিকতা অনেক সময়ে কাব্যের সাক্ষাৎ জ্ঞাতিশক্রতা করে। চণ্ডীদাস মানব-হৃদয়কে মানবিক রাখিয়াই আধ্যাত্মিক হইয়াছেন; জ্ঞানদাস সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা দিয়াছেন, আবেগের সূক্ষ্ম কারুকর্ম ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলরাম দাসের মতোই মানবজীবনের বাতায়নে বসিয়া ভাব-বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই চণ্ডীদাস সাধক, জ্ঞানদাস শিল্পী। তবে সে শিল্পচেতনা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্রের মতো সচেতন সাধনা নহে, তাহাতে ততটা রূপসৃষ্টির ইন্দ্রিয়ময়তা নাই। শব্দসম্ভারের বিচিত্র উল্লাস, যাহা বিদগ্ধ বিদ্যাপতি ও ভক্ত গোবিন্দদাস কবিরাজ উভয়কেই মাতাইয়া

তুলিয়াছিল, তাহা জ্ঞানদাসের প্রধান অবলম্বন নহে। রূপসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় জ্ঞানদাস সহজেই সামান্য পরিবেশে প্রচলিত শব্দকে একটা স্নিগ্ধ মধুর রস-ব্যঞ্জনায় পরিণত করিতে পারেন, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁহার পদে অতি সুলভ। কিন্তু শতমুখী হীরকদ্যুতি তাঁহার প্রধান সম্পদ নহে। এবার তাঁহার পদ হইতে এই শিল্পরস, রূপোল্লাস, চিত্রব্যঞ্জনার কিছু কিছু পরিচয় লওয়া যাক।

অনেক পদকার কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ লিখিয়াছেন, বালগোপাল মূর্তিটি কোন কোন কবির রচনায় একটি নবনীত-সুকুমার লাবণ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার বাল্যলীলার পদটী বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বলিয়া গৃহীত পারে। নবজাতা শ্রীরাধাকে দেখিয়া পুরস্ত্রীগণ রাধার জননী কীর্তিদাকে বলিতেছে :

ও তোর বালিকা চান্দের কলিকা
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে সদাই হৃদয়ে
পসরা করিয়া রাখি॥
শুন বৃষভানুপ্রিয়ে।
কি হেন করিয়া কোলেতে রেখেছ
এ হেন সোনার ঝিয়ে॥
কমল জিনিয়া বদন সুন্দর
মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম সে নাম রাখুক
আমরা রাখিলাম রাধা॥

ইহার পরে অবশ্য জ্ঞানদাস ঐশ্বর্যভাব আনিয়া কবিতাটির বাৎসল্যরস মাটি করিয়াছেন। পুরস্ত্রীরা বলিতে লাগিল :

স্বরূপ লক্ষণ অতি বিলক্ষণ
তুলনা দিব যে কিয়ে।
মহাপুরুষের প্রেয়সী হইব
সোঙরিবে যদি জীয়ে॥
দুহিতা বলিয়া দুখ না ভাবিহ
এহো উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে শুনেছি কমলা
ইহার অংশের অংশ॥

কবি লক্ষ্মীকে ছাপাইয়া রাধাকে বড় করিতে গিয়া পদটির স্বাভাবিক বাৎসল্য-রসের গাঢ়ত্ব তরল করিয়া ফেলিয়াছেন। এ দিক দিয়া রামপ্রসাদের গিরি-রাণীর উক্তি, "গিরিবর, আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে"—একটি নিখুঁত বাৎসল্যরসের অনবদ্য পদ বলিয়া গৃহীত হইবে। সেখানে উমার দেবীভাব বালিকামূর্তিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই।

জ্ঞানদাসের দানখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত দু-একটি পদ রচনার স্বাভাবিকতায় আধুনিক পাঠকেরও বিস্ময় আকর্ষণ করিতে পারে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর দানখণ্ডের বহু পদ আধুনিক পাঠকের নিকট ক্লান্তিকর ও বিস্বাদ মনে হইবে। কৃষ্ণ পথে দানী সাজিয়া গোপবালা রাধার নিকট দান চাহিয়া রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান হিসাবে দাবি করিয়া বসিলেন। ইহাতেই কত রঙ্গরসের সৃষ্টি হইয়াছে, কত মান অভিমান হাস্যপরিহাসের লীলাচাপল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদা দান ও নৌকালীলা শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

রাধা দধিদুগ্ধ বিক্রয়ে পথে বাহির হইয়াছেন। এদিকে কৃষ্ণ তো দানী সাজিয়া পথের ধারে অপেক্ষা করিতেছেন। এই ধরণের পদে হালকা চালের বর্ণনা ও রঙ্গরহস্যই প্রাধান্য পায়। কিন্তু জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ রাধাকে ভরদুপুরে দধিদুগ্ধের পসরা লইয়া পথে বাহির হইতে দেখিয়া সস্নেহে বলিয়া ওঠেন :

> আইস বৈস মোর কাছে রৌদ্রে মিলাও পাছে
> বসনে করিয়ে মন্দ বায়;
> এ দুখানি রাঙ্গা পায় কেমনে হাঁটিছ তায়
> দেখিয়া হালিছে মোর গায়।।
> কেমন তোমার গুরুজন কি সাধে আনিল ধন
> কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
> তোর নিজ পতি যে কেমনে বাঁচিবে সে
> পাঠাইয়া চিত দিয়া প্রেমা।।

এখানে কৃষ্ণের অন্তরের মমতাটুকু অত্যন্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে চমৎকার মানবীয় অনুভূতি সৃষ্টি করিয়াছে।

নৌকাবিলাসের একটি পদ উল্লেখ না করিলে জ্ঞানদাসের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। এ পদটিতে জ্ঞানদাসের বিচিত্র কবিপ্রতিভা এবং

দুর্বলতা একসঙ্গে ধরা পড়িয়াছে। মানসগঙ্গায় রাধা নৌকা পার হইতেছেন, নবীন কাণ্ডারীর বাক্যপ্রবন্ধে ভুলিয়া তিনি নায়ে চড়িয়াছেন :

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূল বাহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥

গগনে মেঘ উঠিয়াছে, বেগে বাতাস বহিতেছে, মানসগঙ্গার জলে ঢেউ দিয়াছে, দুকূল বুঝি ভাসিয়া যায়। এখন এ তরণীকে কে রাখিবে?

দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িনু কেন নায় ॥
ন্যায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটা কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥

এখানে একটি চমৎকার চিত্ররূপ এবং তাহার সঙ্গে কুলমান ও প্রাণভয়েভীতা রাধার কী আকুল আর্তি ফুটিয়াছে! নৌকা বুঝি ডোবে ডোবে। অথচ 'ন্যায়্যা'র তো-ভয় ডর নাই, তিনি বিপদেও হাসিতেছেন। একদিকে আকাশে ঘনায়মান মেঘডম্বর, আসন্ন মৃত্যুর কুটিল করাল তরঙ্গনৃত্য, আর এক দিকে প্রাণ অপেক্ষাও মূল্যবান কুল- মান—তাহাও বুঝি যায় যায়—সহসা রাধার এই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে "কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে।" এই পদটীতে প্রায়-নিমজ্জমান তরণী, তাহার অসহায় আরোহিণী এবং নিশ্চিন্ত-নির্ভয় কাণ্ডারীর কুটিল কটাক্ষ এমন চমৎকার মিশিয়া গিয়াছে যে, কয়েকটি চিত্রপ্রতীক ও আবেগপ্রতীক জ্ঞানদাসের প্রথমশ্রেণীর কবিপ্রতিভার নিঃসংশয় প্রমাণ দিয়াছে। কিন্তু অনেক শ্রেষ্ঠ কবির রচনার মতো জ্ঞানদাসের অনেক উৎকৃষ্ট পদের শেষরক্ষা হয় নাই। এই অপূর্ব অনবদ্য পদটির শেষের কয় পংক্তি :

অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে, সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি
এখনি না ভাবিহ বিষাদ ॥

এখানে মানসগঙ্গার অপূর্ব রোমান্টিক চিত্রটি জ্ঞানদাসের ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম চিন্তার জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় এই পদটির টীকা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "এই আপাত-প্রতীয়মান প্রেম-বিলাসের মধ্যে অধ্যাত্মব্যঞ্জনা কিরূপ অনিবার্যভাবে ফুটিয়াছে।" কিন্তু 'অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হৈল, পরাণে হৈল পরমাদ'—ছত্র দুইটি মূল-পদের সঙ্গে অনিবার্যভাবে অনুস্যূত নহে; ইহা বাদ গেলে পদটির মূল্য বরং বৃদ্ধি পায়।

জ্ঞানদাসের রসোদ্গারের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ পরম উপভোগ্য হইয়াছে। সখীকে রাধা গতরাত্রির রসাবেশের কাহিনী বলিতেছেন—কানুর রসসম্ভাষণের কত বিচিত্র মধুর কথা। এই জাতীয় পদে আদিরসের অনিবার্য বাহুল্য ঘটিবেই, এবং বৈষ্ণব পদসাহিত্যে রসোদ্গারের বহুপদে আদিরস বেশ ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানদাসের এই পর্যায়ের পদগুলিতে অনেক স্থলে সম্ভোগের উত্তাপের চেয়ে রাধার প্রতি কৃষ্ণের স্নিগ্ধসজল মেদুর মমতার কোমল স্পর্শ বড় করুণ হইয়া ফুটিয়াছে। তিনি যদি ঘুমের ঘোরে একটু এপাশ-ওপাশ করেন, তাহা হইলেই কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া ওঠেন, মিলনের মধ্যেও সর্বদা হারাই-হারাই ভয়:

> নিঁদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
> কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
>
> হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে।
> নাসিকায় নাসিকায় এক নয়ানে নয়ানে॥
> ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস।
> আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস॥

মিলনের মধ্যে এই আশঙ্কা, এই ত্রাস—এবং তাহা বর্ণিত হইয়াছে কৃষ্ণের পক্ষ হইতে, উত্তর-চৈতন্যযুগের পদাবলীতে যাহা খুব সুলভ নহে। রাধাকে কোলে ধরিয়াও কৃষ্ণ যেন তাঁহাকে দূর বলিয়া মানেন—"কোরে রাখি কতদূর হেন মানে"—কৃষ্ণের প্রেম কিরূপ?

> কায়ার সহিত ছায়া মিশাইতে
> পথের নিকট রয়।

জ্ঞানদাসের কৃষ্ণের আর্তি এই কায়াছায়াময় আবেগকে ব্যাকুলবেদনায়

অপরিতৃপ্ত করিয়াছে। এ প্রেমে তো কামগন্ধ নাই—"মদন পালায় লাজে।"

শ্রীরাধার স্বপ্নবিলাসের স্নিগ্ধমধুর বেদনাবিবশ চিত্রটি কী সুন্দর:

পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিলু'
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে॥

শ্রীরাধা যেন নিবিড় করিয়া পরাণ-বঁধুর সান্নিধ্য লাভ করিলেন, কিন্তু উপলব্ধির তীব্র মুহূর্তের সুখস্বর্গ হইতে রাধার নির্বাসন:

পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হৈনু হারা।

নিষ্ঠুর জাগরণে রাধার বুকফাটা আর্তনাদ:

কপোতপাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়—*

রাধার সেইরূপ মৃত্যুশায়কবিদ্ধ ভীরু কপোতীর মতো অবস্থা। বেদনার তীব্র উপলব্ধি এবং বাস্তব প্রতীকের সাহায্যে তাহার স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে জ্ঞানদাস আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য রসোদ্গার পর্যায়ের কয়েকটি পদাংশ উদ্ধৃত হইতেছে:

(১) শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই, কিবা সে পীরিতি তার।
জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে
কি দিয়া শোধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।

* চণ্ডীদাসের ভণিতায়ও পাওয়া যায়।

বাহু পসারিয়া বাউল হৈয়া
তখন সে দিগে ধায় ॥

(২) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।

এ পদের ভাব ও ভাষা, চিত্রপ্রতীক ও আবেগ—সর্বোপরি একটি সরস মর্ত্যচেতনার পরিচিত স্পর্শ পদগুলিকে আধুনিক মনোভাবের অনুকূল করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানদাস আমাদের যুগের কবি। তাই কৃষ্ণ যখন রাধার প্রেমে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া বিশ্বময় রাধাকে দেখিয়া বলিয়া ওঠেন :

গগনে ভুবনে দশ দিগ্ গণে
তোমারে দেখিতে পাই।

তখন এই দশদিকে-পরিব্যাপ্ত ভুবনভরা প্রেমতন্ময়তা অতীতদিনের স্বপ্ন-সমুদ্র পার হইয়া আমাদের যুগের তট স্পর্শ করে।

জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদগুলি চণ্ডীদাসের তুলনায় কিছু দুর্বল হইলেও আবেগের স্বাভাবিকতায় ইহার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার্য। উভয়ের পদের মধ্যে এত সূক্ষ্ম ব্যবধান যে, দুইজন কবির ভণিতার গোলমাল এই আক্ষেপানুরাগের পদেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। জ্ঞানদাসের নামে প্রচারিত এই বিখ্যাত পদটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাইলেই যেন আমরা অধিকতর আনন্দিত হইতাম :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

রাধার ভাগ্যদোষে সবই বিপরীত হইল। তিনি তো সুখের আশায় পিরীতি করিয়াছিলেন, শীতল বলিয়া চাঁদের কিরণে হাত বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে তাহাই যে তীব্র রবিদাহে পরিণত হইল। পিপাসার্ত হইয়া তিনি মেঘ চাহিলেন, কিন্তু মেঘে যে বজ্র লুকানো। জ্ঞানদাস কিন্তু শ্রীমতীকে সান্ত্বনা দেন নাই, হতাশ রাধাকে আশার কথা শুনান নাই। কানুর প্রেম তো আনন্দ বহিয়া আনে না, এ প্রেমে বিলাসের চেয়ে ব্যথা বেশি—'কানুর

'পিরীতি মরণ অধিক শেল', এযে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা। রাধা বারবার বলিয়াছেন :

তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে ॥

রাধার গরব-ভরমের শেষ পরিণাম—দুটি চরণের অন্তিম আশ্রয়। কখনও তিনি কুলবতীদিগকে বলেন :

তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যামবন্ধু বিনু
আর কেহো মোর নয় ॥

রাধা কুল ছাড়িয়াছেন, 'গুরু-দুরুজনের' কুবচনের ভয় ছাড়িয়াছেন। কারণ—

সে রূপসাযরে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধিলুঁ হিয়া।

রূপগুণে তাঁহার তনুমন ভরিয়া গিয়াছে। তাই যখন দয়িতের প্রেমের আর্তি রাধার মনে পড়ে :

সে সব আদর ভাদর-বাদর
কেমনে ধরিব দে।

ভাদ্রের বাদলের মতো সে প্রেমের মেঘরৌদ্রকে কি সহজে ভোলা যায়? যে প্রেম—

হিয়ার হইতে পিয়া শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায় ॥

সে প্রেমের কি পরিণাম? শুধু চোখের জল রাধার সম্বল। সখীগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলে তিনি ব্যাকুল হইয়া বলেন, "নিভান আনল আর পুন কেন জ্বাল?" রাধার সাধের প্রদীপ যে সন্ধ্যাবেলাতেই নিভিয়া গেল—"সাধের প্রদীপ নিভাই সাঁঝে।" বিরহখিন্না রাধার শুধু কান্নাই সম্বল :

পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিবস লিখিতে পথ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখ কত ভেল ॥

রাধা কৃষ্ণের পথ চাহিয়া আছেন। কত যুগ বহিয়া যায়, চাহিয়া চাহিয়া

তাঁহার দুটি চক্ষু যে অন্ধ হইয়া গেল। হরিহীন কত রাত্রিদিন, কত মাসবর্ষ শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বিরহের সমাপ্তি হয় কই? বাস্তবিক জ্ঞানদাসের পদে বিরহের সমাপ্তি হইয়াছে কি? প্রথাসিদ্ধ ভাবে জ্ঞানদাস রাধাকৃষ্ণের ভাব-সম্মেলন কল্পনা করিয়াছেন, রাধাও অদর্শনের দুঃখ সহিয়া কৃষ্ণকে যেন বুকে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন :

তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥

ইহাই তো রাধার বিস্ময়বেদনামুগ্ধ প্রশ্ন, তুমি আমার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া কিরূপে কাল কাটাইলে? জ্ঞানদাসের ভাবসম্মেলনের পদের সংখ্যা খুবই অল্প। যে বিরহে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা, তাহাকে জ্ঞানদাস মিলনানন্দের রসে ভরিয়া তুলিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

সর্বশেষে এই কথা বলিয়া উপসংহার করিতে হয় যে, জ্ঞানদাসের যুগ ও আমাদের যুগের মধ্যে প্রায় চারিশত বৎসরের ব্যবধান—সে ব্যবধান মন, প্রাণ ও হৃদয়ের। তবু কেমন করিয়া জানি না, জ্ঞানদাসের পদে আমরা আধুনিক মানুষের প্রাণের কথা শুনিতে পাই। রাধাকৃষ্ণের রূপকে কবি যেন নিখিলমানবের দেশকালাতীত বেদনাকেই নিকষে সোনার রেখার মতো ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আবেগে তিনি মানবিক, চিত্রকল্পে তিনি আধুনিক। "ও অঙ্গপরশে পবন হরষে বরষে পরশ শিলা"—এ ভাষারীতি কি মধ্যযুগীয়? নিম্নোদ্ধৃত ছত্রকয়টিও কি পুরাতন যুগের বলিয়া অনাদরে নিক্ষিপ্ত হইবে?

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

ইহার রূপকল্প, বিশেষতঃ যৌবনের বনে মন হারাইয়া যাওয়ার বিচিত্র রূপকল্পটি যেন এ যুগের কোন কবির রচনা বলিয়া মনে হয়। মধ্যযুগীয় কোন কবিকে যদি আমরা আধুনিক যুগের আসনে অভিনন্দিত করিতে চাই, তবে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও জ্ঞানদাস সে আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ইহাদের একের সঙ্গে অপরের এবং প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের নানা পার্থক্য থাকিলেও এক বিষয়ে ইহারা এক—তাঁহাদের পদে মধ্যযুগীয় সংস্কারের সঙ্গে কিছু কিছু

আধুনিক মনোভাবও স্থান পাইয়াছিল। কি করিয়া পাইয়াছিল,—জানি না, কিন্তু আধুনিক কালের মনের সঙ্গে তাঁহাদের অধিকতর সংযোগ তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

যদুনন্দন ॥

যদুনন্দন, যদুনাথ ও যদুর ভণিতায় যে সমস্ত পদ 'পদকল্পতরু'তে গৃহীত হইয়াছে, তাহা একজন কবির রচনা কিনা সন্দেহ হয়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলীতে' যদুনন্দন ভণিতায় সমস্ত পদ একই স্থলে সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু যদুনন্দন, যদুনাথ এবং যদু ভণিতাযুক্ত পদগুলি একই কবির রচিত নহে, এক যুগেও রচিত হয় নাই। আমরা অন্ততঃ তিনজন প্রসিদ্ধ যদুনন্দনের পরিচয় পাইয়াছি। একজনের নাম যদুনাথ চক্রবর্তী; ইনি নিত্যানন্দের সমসাময়িক এবং নিত্যানন্দ-শিষ্য গদাধরের অনুচর। আর একজন—মালিহাটী নিবাসী বৈদ্যবংশীয় যদুনন্দন দাস। ইনি 'কর্ণানন্দ' নামক কাব্য রচনা করেন। শ্রীনিবাস-আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর ইনি মন্ত্রশিষ্য। আর একজন যদুনন্দন অদ্বৈত আচার্যের শাখাভুক্ত ছিলেন। ইনি 'রাধাকৃষ্ণলীলা কদম্ব' নামক এক বিরাট কাব্য লিখিয়াছিলেন। তিনি নাকি গৌরাঙ্গচরিতও লিখিয়াছিলেন। কারণ 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে :

> যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য ॥
>
> … … …
>
> যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
>
> দ্রবে দারু পাষাণ শুনিয়া যাঁর গীত ॥

কিন্তু উল্লিখিত কাব্য দুইখানি পাওয়া যায় নাই।

দুইজন পদকর্তা যদুনন্দনের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর যদুনন্দন দাসের (বৈদ্য) রচিত পদের সংখ্যাই অধিক : 'পদকল্পতরু'তে যদুভণিতাযুক্ত ১৪টি, যদুনন্দন ভণিতায় ৭১টি এবং যদুনাথ ভণিতায় ১৬টি—মোট ১০১টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পদের মধ্যে কোন্‌গুলি প্রথম যদুনন্দনের, কোনগুলি বা দ্বিতীয় যদুনন্দনের রচনা, তাহা আলাদা করিয়া বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। অবশ্য কেহ কেহ দুইজনের পদ পৃথক করিবার জন্য একটা পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।[১০]

১০ Dr. S. K. Sen—*History of Brajabuli Literature*

প্রথম যদুনন্দন (চক্রবর্তী) নিত্যানন্দ-অনুচর গদাধরের শিষ্য ছিলেন সুতরাং যে সমস্ত পদে গদাধরের উল্লেখ আছে বা শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় প্রথম যদুনন্দনের রচিত। এ অনুমান মিথ্যা নহে। কিন্তু যদুনন্দন গদাধরপ্রসঙ্গ ছাড়াও পদ রচনা করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদে গদাধরের উল্লেখের সম্ভাবনা অল্প। কাজেই গদাধর প্রসঙ্গ না থাকিলেই সেই পদ দ্বিতীয় যদুনন্দনের (বৈদ্য-দাস) রচিত, একথা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় না। একটি পদে যদুনন্দন গৌরাঙ্গ ও গদাধরের লীলা একত্রে অঙ্কন করিয়াছেন :

গৌর-গদাধর দুহুঁ তনু সুন্দর
অপরূপ প্রেম বিথার।
দুহুঁ দুহুঁ হরষে পরশে সব বিলসয়
অমিয়া বরিখে অনিবার ॥
দেখ দেখ অপরূপ দুহুঁ জন নেহ।
কো অছু ভাব প্রেমময় চাতুরী
নিমজিয়া পাওব থেহ ॥

তবে দ্বিতীয় যদুনন্দনই উৎকৃষ্টতর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

মাধবদাস (মাধব আচার্য) ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে দুইজন মাধব খুব বিখ্যাত; একজন—পদাবলীকার আর একজন ভাগবত-অনুসারী 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা। দুই জনই এক ব্যক্তি কিনা তাহা লইয়া কিছু সন্দেহ আছে। মাধবদাস বৈদিক ব্রাহ্মণবংশে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালিদাস মিশ্র চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুতরাং সম্পর্কে মাধব চৈতন্যদেবের শ্যালক।* মাধব অল্প বয়সেই সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন এবং সর্বত্র মাধব আচার্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি চৈতন্যের নির্দেশে অদ্বৈতের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'ই অধিকতর নিপুণ কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার ব্রজবুলিগুলি মধ্যমশ্রেণীর পদের মধ্যে প্রশংসনীয় :

* এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সহচরি সঙ্গে রাই খিতি লুঠই
খনহি খনহি মুরছায় ।
কুন্তল তোড়ি সঘনে শির হানই
কো পরবোধব তায় ॥
হরি হরি কি ভেল বজর নিপাত ।
কাহে লাগি কালিন্দী বিষজলে পৈঠল
সো মঝু জীবননাথ ॥

কালিন্দীর বিষজলে প্রবিষ্ট কৃষ্ণের বিপত্তি স্মরণ করিয়া রাধার এই বিলাপের আন্তরিকতা পাঠককেও স্পর্শ করে। বাংলায় রচিত মাধবের দুই একটি বাৎসল্যরসের পদ সুপাঠ্য। যশোদা কৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠাইবার পূর্বে বলরামকে বলিতেছেন :

বলরামের কর লৈয়া গোপালেরে সমর্পিয়া
পুন পুন বলে নন্দরাণী ।
এই নিবেদন তোরে না যাবে কালিন্দীতীরে
সাবধান মোর নীলমণি ॥
রামেরে লইয়া কোরে সিঞ্চয়ে আঁখির নীরে
পুন পুন চুম্বে মুখখানি ।
সভার অগ্রজ তুমি : শি খাব আমি
বাপ মোর যাইয়ে নিছনি ॥

এই মাধবদাস প্রসঙ্গে আর একটি জটিল ব্যাপার সম্বন্ধে এখানেই দুই এক কথা বলিয়া লওয়া যাক। মাধবদাসের সঙ্গে 'মাধবী' এবং 'মাধবীদাস' ভণিতায়ও কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। 'পদকল্পতরু'তে মাধবী ভণিতায় ২টি এবং মাধবীদাস ভণিতায় ৫টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাচীন সমালোচকগণ এই পদকারকে পুরীর শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবীদেবী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, জগদ্বন্ধু ভদ্র—এমন কি দীনেশচন্দ্র পর্যন্ত ইহাকে শিখী মাহিতীর ভগিনী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এই ওড়িয়া মহিলা বৈষ্ণব সমাজে শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন, এমন কি মহাপ্রভুর ব্রজরস পুরীধামের যে কয়জন বুঝিতেন, তাঁহাদের মধ্যে মাধবীদেবী অন্যতমা—অবশ্য রমণী বলিয়া তাঁহাকে 'অর্ধ' বলা হইয়াছে। পুরীধামের মাত্র সাড়ে তিন জন মহাপ্রভুর গূঢ় তাৎপর্য বুঝিতেন :

প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিনজন।।
স্বরূপদামোদর আর রায় রামানন্দ।
শিখী মাহাতী আর তার ভগ্নী অর্ধ।। (চৈতন্যচরিতামৃত)

'পদসমুদ্রে' নাকি এই মাধবীর ভণিতায় ওড়িয়া পদও ছিল। কিন্তু এই পদসঙ্কলনের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া মাধবীর তথাকথিত ওড়িয়া পদ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা যায় না। 'মাধবীদাস' ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে কোন পুরুষের রচনা বলিয়া মনে হয়। ইনি স্ত্রীলোক হইলে 'দাসী' ভণিতা দিতেন। শিখী মাহিতীর ভগিনী যে পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার পক্ষে বাংলা পদ রচনা তো আরও অসম্ভব। সতীশচন্দ্র রায় এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহা বর্তমান প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলাম, "আমাদের বিবেচনায় এই পদের রচয়িতা খুব সম্ভবতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ের ব্যক্তি।······আমরা এযাবৎ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরিচিত কোন মাধবী দাসের উল্লেখ পাই নাই। পাইলেও বিশেষ পরিচয়ের অভাবে তাঁহাকেই পদকর্তা বলিয়া স্থির করা সঙ্গত মনে করি না। তবে সত্যের অনুরোধে দুঃখের সহিত না বলিয়া পারিতেছিনা যে, উৎকল দেশীয় গৌরভক্ত শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবী দেবীর পক্ষে আলোচ্য পদের রচনা আমাদের নিকট সম্ভবপর বোধ হয় হয় না।"[১১]

অনন্তদাস ॥

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদকল্পতরু' এবং 'গীতচন্দ্রোদয়ে' অনন্ত ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। 'পদকল্পতরুতে' অনন্তদাস ভণিতায় ৩২টি এবং অনন্ত আচার্য ভণিতায় ১টি, অনন্ত রায় ভণিতায় ১টি, 'ক্ষণদা'য় রায় অনন্ত ভণিতায় ২টি, 'গীতচন্দ্রোদয়ে' রায় অনন্ত ভণিতায় ১টি পদ মিলিতেছে। অনন্তদাস, অনন্ত আচার্য, ও রায় অনন্ত একই কবি, অথবা পৃথক কবি, তাহা লইয়াই সমস্যা।[১২] সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 'অপ্রকাশিত পদ-

১১ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'পদকল্পতরু'র ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিও মাঝে মাঝে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা দিয়াছেন। এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, বড়ু চণ্ডীদাসের আসল নাম অনন্ত, বড়ু চণ্ডীদাস খুব সম্ভব উপাধি। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে।

রত্নাবলী'তে অনন্তদাস ভণিতায় ১২টি নূতনপদ পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্য-চরিতামৃতে অদ্বৈত শাখাভুক্ত এক অনন্ত আচার্যের উল্লেখ আছে। অনন্ত রায় ও অনন্ত আচার্য সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ উভয়ের পৃথক কৌলিক উপাধিই তাহা প্রমাণ করিতেছে। অনন্তদাস আর একজন পদকর্তা, এবং সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠতর কবিত্বের অধিকারী। ইঁহার চৈতন্য-নিত্যানন্দ বিষয়ক পদগুলি কৃত্রিম নহে, রাধাকৃষ্ণপদাবলীও বেশ সুখপাঠ্য। একটি অভিসারের পদ হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনীরঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী
সাজলি শ্যামবিহারে॥
কনকলতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপসাজে।
কিঙ্কিণী রণরণি বঙ্করাজধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে॥

চৈতন্যের তিরোধান হইতে শ্রীনিবাস-নরোত্তমের আবির্ভাবের মধ্যে আরও অনেক পদকর্তা পদ রচনা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবনীকাব্যের বহুস্থলে অতি চমৎকার পদ স্থান পাইয়াছে; চৈতন্য-জীবনীসাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁহাদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আরও যে সমস্ত পদকর্তা কিছু প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নয়নানন্দ, দেবকীনন্দন, দ্বিজহরিদাস, পুরুষোত্তম দাস, জগন্নাথ দাস, কানুদাস[১৩], উদ্ধবদাস, চৈতন্যদাস, আত্মারামদাস প্রভৃতি দাস উপাধিক পদকর্তার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে দ্বিজহরিদাস, কানুদাস প্রভৃতি কবিদের দুই চারিটি পদ পদসংগ্রহ গ্রন্থের মারফতে পাঠকসমাজে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছে। চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থাটি কানুদাস চমৎকার ফুটাইয়াছেন।

---

১৩ একাধিক কানুদাস ছিলেন।

অপরূপ গৌরাঙ্গবিলাস।
ক্ষেণে বলে মুঞি পহুঁ ক্ষেণে বলে দাস॥
ক্ষেণে মত্ত সিংহগতি ক্ষেণে ভাবস্তম্ভ।
ক্ষেণে ধরু ধরণী পাইয়া অঙ্গসঙ্গ॥
ক্ষেণে মালসাট মারে অট্ট অট্ট হাসে।
ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণে গদগদ ভাষে॥

চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর যে কিরূপ বিচিত্র বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহা পূর্বের আলোচনা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। প্রেমভক্তির শিল্পসমুৎকর্ষ ও কল্পনার অবাধ লীলায় বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী যে বিশ্বের লীরিক কবিতার ইতিহাসে একটি যুগসৃষ্টি করিয়াছে, তাহার উৎস প্রেরণা হইতেছে চৈতন্যদেবের অলোকসামান্য প্রভাব; তাঁহার প্রেম ও ভক্তির দৃষ্টান্তই পদকারদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, উন্মত্ত করিয়াছে। ইহার পরবর্তী যুগে শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তমের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আবার নূতন দিকে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বৈষ্ণব পদাবলীর সেই পর্যায়টি আলোচিত হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দীর কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য

ভূমিকা ॥

ইতিপূর্বে অন্যত্র[১] আমরা মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' আলোচনা প্রসঙ্গে ভাগবতপুরাণ সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি ; এখানে তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। চৈতন্যদেবের পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশে ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণলীলার বিশেষ প্রচার হইয়াছিল, তাহা প্রাক্-চৈতন্য যুগের বাংলা সাহিত্য, মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত শিল্পকলার নিদর্শন, পোড়ামাটির কাজ, নানা স্মৃতি-পুরাণে কৃষ্ণ-বিষ্ণুকেন্দ্রিক স্মার্ত আচার এবং পূজা অনুষ্ঠানের পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে। ভাগবতপুরাণ বিশেষ প্রাচীন না হইলেও খ্রীঃ দশম শতাব্দীর দিকে পূর্ব-ভারতে ইহার অল্প-স্বল্প প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল। এদেশে খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবেন্দ্রপুরী ভাগবতপুরাণের আদর্শ ও কাহিনী প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ; তিনি নিজেও আদিরসাত্মক ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, যশোরাজ খান—ইঁহারা সকলেই অল্পাধিক ভাগবতপুরাণের (বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ১০ম-১২শ স্কন্ধ) দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের প্রভাবের জন্য বাঙলাদেশে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে, এবং মথুরালীলা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বাঙালীর কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছিল। মধ্যযুগের সমাজে বৈষ্ণব ও শাক্তমত অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এবং তন্মধ্যে ভাগবতে-বর্ণিত কৃষ্ণলীলাকাহিনী গান, পাঁচালী, নাটগীতি ও কথকতার সাহায্যে জনমনে বিশেষভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। 'কানু ছাড়া গীত নাই' একথা যেমন সত্য, তেমনি কৃষ্ণকথা সর্বশ্রেণীর বাঙালীর জীবন ও চিন্তায় প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহাও সত্য। বাঙলার নব্যন্যায়পন্থী শুষ্ক তার্কিকগণও ভগবান বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া আলোচনায় অবতীর্ণ হইতেন, ইহাও উল্লেখযোগ্য।

---

১ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১ম খণ্ড ১৫শ অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যদেবের পূর্বে সাধারণ ভক্তসমাজে ভাগবত, বিদ্যাপতির পদাবলী, চণ্ডীদাসের পদাবলী ও বড়ু চণ্ডীদাসের আখ্যানকাব্য প্রভৃতির প্রভাবের ফলে কৃষ্ণকথাকেন্দ্রিক সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখ্য উপাদান ভাগবত হইতেই গৃহীত। এই ভাগবতাশ্রয়ী কথা ও কাহিনী বৈষ্ণব পদ ও কাহিনী-কাব্যকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে, তেমনি মূল ভাগবতের পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদও জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ ভক্তসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' চৈতন্যজন্মের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। ইহা ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নহে—দশম-দ্বাদশ স্কন্ধের আখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। অবশ্য কয়েকস্থলে মূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যাইবে।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের ভাগবতের অনুবাদে মূলতঃ কৃষ্ণলীলার ঐশ্বর্যের দিকটি অধিকতর প্রকট হইয়াছে। বৃন্দাবনলীলায় রাস ও বসন্তলীলা প্রসঙ্গে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের আদিরসাত্মক লীলার প্রচুর বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু সে আদিরসের লীলাও ঐশ্বর্যলীলার আর একটি দিক মাত্র। অবতার কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলাই ভাগবতের মূল বক্তব্য। কাজেই প্রাক্-চৈতন্যযুগের ভাগবত-অনুসারী রচনায় কৃষ্ণলীলার ঐশ্বর্য প্রাধান্য পাইয়াছে। এই স্থানে চৈতন্য ও উত্তর-চৈতন্যযুগের ভাগবতের অনুবাদ ও ভাগবত-অনুসারী কৃষ্ণকাহিনীগুলির মৌলিক পার্থক্য।

চৈতন্যযুগের প্রভাবে কৃষ্ণলীলার মাধুর্যের দিকটি বাঙালী বৈষ্ণবের অধিকতর লোভনীয় মনে হইয়াছিল; যদিও ভাগবতপুরাণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট উপনিষদরূপে পরিগণিত, তবু তাঁহারা ভাগবতের সেই অংশগুলির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন, যাহাতে কৃষ্ণের মাধুর্য ও ভক্তির দিকটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলীর একটা প্রধান অংশ ভাগবতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বৈষ্ণব পদকারগণ ভাগবতের মধুর রসের লীলাটুকু গ্রহণ করিয়াছেন, কৃষ্ণের ঐশ্বর্যদীপ্ত প্রচণ্ড পৌরুষবীর্য তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করে নাই। মহাপ্রভুও কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা অপেক্ষা মাধুর্যলীলার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহার তিরোধানের পর বৈষ্ণব ধর্মসাধনা, দর্শন ও সাহিত্যে কৃষ্ণের আদিরসাত্মক বৃন্দাবনলীলাই একমাত্র শরণ্যরূপে গৃহীত হইল; পদকারগণ কথাপ্রসঙ্গে দুই এক স্থলে কৃষ্ণের মথুরা-

লীলার উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর লম্পট কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বল্লবীযুবতী শ্রীরাধাকে ভুলিয়া মথুরায় রাজ্যপাট লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন, এবং সেজন্ত তাঁহারা রাধার সখীদের জবানীতে কৃষ্ণকে নানাভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছেন এইরূপ বর্ণনাই অধিক। চৈতন্যযুগের পদাবলী ও আখ্যানকাব্যে কুরুক্ষেত্রের সারথি, মহাভারতের স্রষ্টা ও গীতার উদ্‌গাতা কৃষ্ণের স্থান সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। চৈতন্যযুগের পূর্বে তবু কৃষ্ণকথারসে খানিকটা পৌরুষবীর্যসম্পন্ন মথুরা ও কুরুক্ষেত্র লীলার উল্লেখ ছিল, কিন্তু ভাবরসমুগ্ধ শ্রীচৈতন্যের অপার্থিব প্রেমভক্তির প্রভাবে নন্দনন্দন গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ প্রেমের দেবতা হইয়া উঠিলেন, রাধাকৃষ্ণের নিভৃত-নিধুবন লীলাই একমাত্র কৃষ্ণলীলা বলিয়া গৃহীত হইল।

বাঙলাদেশে কৃষ্ণগীতিকা ও পদাবলীর সর্বব্যাপী প্রভাব সত্ত্বেও কৃষ্ণকথার প্রধান উৎস ভাগবত বা ইহার অনুবাদ পরবর্তী কালে ততটা জনপ্রিয় হয় নাই কেন, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। এদেশে প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া ভূরিপরিমাণ বৈষ্ণবপদ রচিত হইয়াছে; তাহার কিছু কিছু অংশ অদ্যাপি নিখিল রসিক মানুষের হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইতে সক্ষম। বস্তুতঃ মধ্যযুগীয় বাঙালী-মানসের সার্থক প্রকাশ—বৈষ্ণব পদাবলী। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের মূলাধার ভাগবত চৈতন্যযুগে বা পরবর্তী কালে সেরূপ সর্বব্যাপক হয় নাই। ভাগবতের অধিকাংশ অনুবাদ একমাত্র দশম-একাদশ দ্বাদশ স্কন্ধের কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন। দুই-একজন দুঃসাহসিক কবি অবশ্য সম্পূর্ণ ভাগবতকেই সংক্ষেপে সারানুবাদের চেষ্টা করিয়াছেন। ভাগবত-অনুবাদকের সংখ্যা অনুবাদ সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বিশাল নহে, গুণগত উৎকর্ষেও ভাগবতের বাংলা রূপান্তর কিছু ন্যূন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ফলে চৈতন্যযুগে ভাগবতের অনুবাদ, সারানুবাদ বা সংক্ষিপ্ত কাহিনী পাঠকসমাজে আশানুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ কি? অথচ সমগ্র মধ্যযুগেই তো চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব মতাদর্শের বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব আদর্শের প্রাণকেন্দ্র ভাগবতের স্বল্পতার কারণ কি হইতে পারে, সে বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।

ভাগবত-অনুবাদের সংখ্যাদীনতার কারণ হিসাবে মনে হয় যে, প্রথমতঃ এই বিভাগে প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই বলিয়া জনসাধারণ

ইহার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নাই বা আকর্ষণ বোধ করে নাই। কবিপ্রতিভার স্পর্শে অতি তুচ্ছ বস্তুও সাহিত্যের রাজদরবারে শিরোপা লাভ করিতে পারে। কিন্তু চৈতন্যযুগে বা তাহার পরে ভাগবতের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়া কোন দক্ষ প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব হয় নাই। কাজেই বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই শাখা তেমন পুষ্টি লাভ করে নাই, এবং ইহার জনপ্রিয়তাও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব পদশাখা রচনা-সৌকুমার্যে ও ভক্তির গভীরতায় এমন প্রাধান্য লাভ করে যে, ভাগবতের মূল রস ও বক্তব্য জনচিত্তে ও ভক্তহৃদয়ে পদাবলীর দ্বারাই অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ভাগবতে শুধু ঘটনাগুলির বিবৃতি থাকিত মাত্র, কিন্তু পদাবলীতে তাহা গীতিরসার্দ্র হইয়া একটা অপূর্ব ভক্তি ও রোমান্টিক ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে—ভক্তি ও রসের তৃষ্ণা মিটাইতে বৈষ্ণব পদাবলী অধিকতর সাহায্য করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ ভাগবতে ঐশ্বর্য-ভাবেরই প্রাধান্য। অনুবাদকগণ যদিও দশম-দ্বাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে কৃষ্ণকাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন, তবু কৃষ্ণের ঐশ্বর্য লীলাকে অস্বীকার বা অবহেলা করিতে পারেন নাই। যে-কৃষ্ণ অবতার, অসুরহন্তা, বিরাটমহিমান্বিত—ভাগবতের অনুবাদকগণ তাঁহাকেই চিত্রিত করিয়াছেন; অবশ্য কৃষ্ণের গোপীলীলাকেও তাঁহারা বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যযুগে কৃষ্ণকে মধুর রসের মারফতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। ভাগবতের অনুবাদ বা অনুসরণে রচিত কাব্যগুলি কেন বৈষ্ণবসমাজে ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই, সম্ভবতঃ ইহাই তাহার প্রধান কারণ। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' চৈতন্যের উক্তি স্বরূপ বলা হইয়াছে :

> ঐশ্বর্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
> ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।

অথচ ভাগবতে 'ঐশ্বর্যশিথিল' প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণকে বিরাট মহিমান্বিত ও প্রচণ্ড ঐশ্বর্যশালী করিয়া তোলা হইয়াছে; চৈতন্য-যুগপ্রভাবে এই ঐশ্বর্য মিশ্রিত ভক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া কৃষ্ণের প্রেম-স্বরূপই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কাজে কাজেই ভাগবতের মূল আদর্শ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। এই পর্বের বৈষ্ণব পদাবলীই বরং ভাগবতের ভাবানুবাদকে অধিকতর প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। কারণ প্রায় সমস্ত অনুবাদেই

ভাগবতবহির্ভূত রাধাপ্রসঙ্গ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পদাবলীর দানলীলা, নৌকালীলা, বড়াইয়ের চরিত্র-সংক্রান্ত আখ্যানও ভাগবতের অনুবাদসমূহে অবিরোধে গৃহীত হইয়াছে। এই জন্য ভাগবতের অনুবাদগুলিকে বৈষ্ণবপদ-শাখার তুলনায় কিছু ম্লান ও দুর্বল বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্যযুগের প্রারম্ভে বাঙলায় ভাগবতের বিশেষ প্রভাব ছিল তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইতিপূর্বে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের প্রভাব বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। চৈতন্যের আবির্ভাবের প্রারম্ভে যশোরাজ খান 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামক ভাগবত-অনুসারী কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী'তে উদ্ধৃত পদ হইতে তাহাই মনে হয়। অবশ্য এই 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য পাওয়া যায় নাই। অনুমিত হয় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই সাধারণ সমাজে ভাগবতের বিশেষ চাহিদা হইয়াছিল; তাহার সূচনা করিয়াছিলেন মালাধর বসু তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'। 'রসমঞ্জরী'তে উদ্ধৃত যশোরাজ খানের পদ হইতে মনে হয় যে, ইঁহার 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য ভাগবতের অনুসরণে রচিত হইয়াছিল, এবং ইহাতে সম্ভবতঃ রাধাকৃষ্ণলীলা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের প্রতি জনচিত্তের আকর্ষণ বৃদ্ধির ফলে কৃষ্ণলীলার মূল আকর ভাগবতের প্রতিও দৃষ্টি পড়িল। চৈতন্যের অনেক ভক্ত ও অনুচর ভাগবতের অংশবিশেষ অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ আচার্যের 'কৃষ্ণমঙ্গল', পরমানন্দের ভাগবতের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ এবং পরমানন্দ গুপ্তের কৃষ্ণলীলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে প্রথম দুইখানি পুঁথি এখনও মুদ্রিত হয় নাই, এবং তৃতীয়খানির কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

গোবিন্দ আচার্যের 'কৃষ্ণমঙ্গলে'র একখানি পুঁথি এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে আছে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় ইহার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, এই গোবিন্দ আচার্য চৈতন্য-নিত্যানন্দের ভক্ত পদকর্তা গোবিন্দ আচার্য হইতে পারেন। অবশ্য তিনি এই কৃষ্ণমঙ্গলে 'দ্বিজ গোবিন্দ' ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। কবি কাব্যের সর্বত্র কৃষ্ণলীলাকে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মধ্যযুগে অনেক স্থলেই ভাগবতের অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নামে অভিহিত হইত। দ্বিজ গোবিন্দ কৃষ্ণমঙ্গলে সংক্ষেপ গোটা ভাগবতের

কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। যদিও তিনি ভাগবতের দশম-দ্বাদশ স্কন্ধের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধেরও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে এবং দানখণ্ড ও নৌকা লীলার সামান্য উল্লেখ লক্ষ্য করা যাইবে। পরমানন্দের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুঁথিতেও ভাগবতের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ অনুসৃত হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় পরমানন্দ গুপ্ত রচিত কৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে। এ কাব্য পাওয়া যায় নাই। সুতরাং দুই পরমানন্দ একই কবি কিনা বলা যাইতেছে না। তবু এইটুকু স্বীকার করা যাইতে পারে যে, এ সমস্ত সংক্ষিপ্ত অনুবাদ কোনদিনই জনপ্রিয় হয় নাই। এগুলি প্রচার লাভ করিলে নানা পুঁথি মিলিত। এবার ভাগবতের কয়েকখানি সারানুবাদ ও ভাবানুবাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ভাগবতাচার্য রঘুনাথের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥

ভাগবতাচার্য উপাধিক রঘুনাথ পণ্ডিতের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' ভাগবতের পুরা সারানুবাদ হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে কেহ কেহ মূল ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধেরই সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভাগবতের বিরাট পরিধিকে তাঁহারা প্রায়শঃই অতিশয় সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন; ফলে মূলের কাহিনীটি কোন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র, মূলের রসের কোন স্বাদই এই সমস্ত সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ হইতে পাওয়া যাইবে না। সেই দিক দিয়া ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' উল্লেখযোগ্য। কারণ কবি ইহাতে ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধই অনুবাদ করিয়াছেন, এবং অনুবাদটি মূলের সারানুবাদ হইলেও খুব সংক্ষিপ্ত নহে।

গ্রন্থমধ্যে রঘুনাথ বিশেষ কোন আত্মপরিচয় দেন নাই। ভণিতায় তিনি প্রায় সর্বত্র 'ভাগবতাচার্য' বিশেষণটি নিজে ব্যবহার করিয়াছেন। মাত্র দু এক স্থলে তাঁহার প্রকৃত নাম 'রঘুনাথ' ও 'রঘুপণ্ডিত' পাওয়া যায়। যথা:

(১) ভাগবত আচার্যের মধুরস বাণী।
সাবধানে শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥

(২) ভক্তিরসগুরু গদাধর শিরোমণি।
রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

(৩) কহে রঘুপণ্ডিত গোবিন্দগুণগান।
কৃষ্ণগুণ সবে শুন হয়্যে সাবধান ॥

কবির ভাগবতাচার্য উপাধিটির প্রতি অধিকতর আকর্ষণ ছিল, কারণ এই বিশেষণটি ভণিতার অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

রঘুনাথ সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবত' হইতে সামান্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্যদেব গৌড় হইতে পুরীধামে ফিরিবার সময় বরাহনগরে রঘুনাথ নামক কোন এক বৈষ্ণব বিপ্রের গৃহে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলেন।

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগবত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥

চৈতন্যদের রঘুনাথের ভাগবত পাঠ শুনিয়া তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দিলেন :

প্রভু বলে ভাগবত এমন পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য।
ইহা বৈ আর কোন না করিহ কার্য॥

রঘুনাথ গদাধরের শিষ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভের পরে তিনি ভাগবতের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য কবি-কর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' রচনার (১৫৭৬) অনেক পূর্বেই রঘুনাথের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' রচিত হইয়াছিল। কারণ কবিকর্ণপূরের গ্রন্থে এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

নির্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥

এখানে কবিকর্ণপূর রঘুনাথকে গৌরাঙ্গের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াছেন। কিন্তু কবি নিজে চৈতন্যের "অভিন্নতত্ত্ব সহজশকতি" (কবির উক্তি) গদাধরকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। অনুমান হয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই অনুবাদকার্য সমাপ্ত হইয়াছিল।

এ পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র দুইটি মুদ্রণ হইয়াছে। একটি বঙ্গবাসী সংস্করণ (১৩১৭ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত), আর একটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত (১৩১২ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত) সংস্করণ। দুই সংস্করণের পাঠের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে, এবং তাহা

অস্বাভাবিক নহে। সম্পাদকগণ যে সমস্ত পুঁথির পাঠ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে নানা বিশৃঙ্খলা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ অধিকতর বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুবিন্যস্ত। ষোড়শ শতাব্দীর পুঁথির পাঠের এতটা সুবিন্যাস ও বিশুদ্ধি অবলম্বিত পুঁথির প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দেহ জাগাইয়া দেয়। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় সাহিত্যপরিষদ সংস্করণের পাঠ সম্বন্ধে যথার্থ বলিয়াছেন, "পরিষৎ সংস্করণ একেবারে অকিঞ্চিৎকর।" অবশ্য 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর' কোন প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই, সুতরাং পাঠবিশুদ্ধি নির্ণয় করাও দুরূহ।

প্রায় বিশহাজার শ্লোকে সমাপ্ত এই বিরাট কাব্য নানা দিক দিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি রঘুনাথ চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের পূর্বেই ভাগবতাশ্রিত ভক্তিধর্মে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। বরাহনগরে চৈতন্যদেব কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহে অতিবাহিত করিবার পর ভক্ত রঘুনাথ নিশ্চয় মহাপ্রভুর উৎসাহে সংস্কৃত ভাগবতকে বাংলা পয়ার ও ত্রিপদীতে সারানুবাদ আরম্ভ করিযাছিলেন! অবশ্য স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদের দৃষ্টান্তও বিরল নহে:

> নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
> শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
> পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
> মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।। (ভাগবত)

> নিগমকল্পতরু-বিগলিত ফলে।
> শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতরে।।
> ক্ষিতিতলে অবতরি ভাগবত নাম।
> পিবয়ে ভাবুক তাই রসিক সুজান।। (রঘুনাথের অনুবাদ)

এই আক্ষরিক অনুবাদ উল্লেখ করিয়া মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বলিয়াছেন, "কবি যেভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যথাসাধ্য মূলের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস এইরূপ আদর্শ অনুসরণ করেন নাই, এই জন্য তাঁহারা স্বাধীনভাবে গ্রন্থ রচনার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগবতাচার্য সর্বদা আদর্শের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন।"[২]

[২] মণীন্দ্রমোহন বসু—বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য় ভাগ

কবি প্রচুর পাণ্ডিত্যসহ মূল ভাগবতের বারোটি স্কন্ধেরই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদে মূলকাহিনীর বিশেষ কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। কবি স্বকপোলকল্পিত রচনা পরিহার করিয়া যথাসাধ্য মূলকে অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে মূলের বর্ণনার বহর ও খুঁটিনাটি তথ্য সঙ্কুচিত হইয়াছে; তাহাতে কাব্যটি পাঠযোগ্যতা লাভ করিয়াছে। মণীন্দ্রমোহন কবির পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন।[৩] এ প্রশংসা অযৌক্তিক নহে। ভাগবতের মতো বিচিত্র বিষয়পূর্ণ ও দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বে স্ফীতকায় পুরাণ গ্রন্থের পুরা অনুবাদ করিতে গিয়া পয়ারত্রিপদীতে পাড়ি জমানো অতিশয় দুরূহ। কবি তাহাতে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইহাতে পরিচ্ছন্ন পয়ারে মূল কাহিনী বা তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ইহার ধারাবাহিকতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কবি অন্যান্য ভাগবত-অনুবাদকের মতো শুধু দশম-দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদে কর্তব্য সমাধা না করিয়া বারোটি স্কন্ধেরই সারানুবাদ করিয়াছেন—তাঁহার এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। তিনি যে মূলকে প্রায়শঃই ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—তিনি কৃষ্ণ-গোপীলীলাপ্রসঙ্গে মাত্র একস্থান ব্যতীত আর কোথাও রাধার উল্লেখ করেন নাই। ভাগবতের দশম স্কন্ধে আছে যে, রাসক্রীড়ায় গোপীদের অহঙ্কার অভিমান দূর করিবার জন্য কোন এক প্রধানা গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্ধান করেন। ভাগবতে এই ভাগ্যবতী গোপীর নাম নাই। আমাদের কবি এই বর্ণনার মাত্র একস্থলে এই গোপীকে রাধা বলিয়াছেন। ভাগ্যবতী গোপীর সৌভাগ্য ভাবিয়া ঈর্ষাতুর হইয়া কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলা গোপীগণ বলিতেছে :

> দেখ সখিগণ এই সখি পুণ্যবতী।
> দূরেতে আনিল কৃষ্ণ করিয়া পিরীতি॥
> এই সখি আমা সবা নৈরাশ করিয়া।
> আপনি সংভোগ করে বিরল পাইয়া॥
> কৃষ্ণের অধরসুধা পীয়ে একাকিনী।
> সফল রাধিকা নামে জন্মিল ভাবিনী॥

---

৩ "ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, গ্রন্থ রচনায় তিনি অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।"—বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য়

হের দেখ রাধাকৃষ্ণ বসি দুইজনে।
কুসুম তুলিল কৃষ্ণ রাধার কারণে ॥

শুধু এই অংশে রাধার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, আর কোথাও রাধার প্রসঙ্গ নাই। প্রচলিত সংস্কারের বশে তিনি ভাগবতের রাসের বর্ণনায় রাধার ক্ষণিক উল্লেখ করিয়া এ সম্পর্কে আর কিছু বলেন নাই। ভাগবতের অন্যান্য অনুবাদে দানলীলা ও নৌকালীলা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ ও বড়াইয়ের রঙ্গরসের বিস্তর লৌকিক বর্ণনা আছে--বলা বাহুল্য এ সমস্তই ভাগবত বহির্ভূত ব্যাপার, স্থানীয় গণমানস হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কবি দশম স্কন্ধে গোপীলীলা প্রসঙ্গে এরূপ বর্ণনা দিতে পারিতেন। কিন্তু ভাগবতের বিশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বোধহয় তিনি এসমস্ত বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভাগবতের বারোটি স্কন্ধের মধ্যে খুব সামান্য অংশে গোপীলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতাচার্য সেই আদর্শ অনুসারে গোপীলীলার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেন নাই। কবি যে সংস্কৃত সাহিত্যে পরম পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার ভাষার সংযম দেখিয়াই অনুমান করিতে পারা যায়। তাঁহার পরিচ্ছন্ন বর্ণনাধর্মী ভাষার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। একটু তথ্যপ্রিয়তা, সংস্কৃত পাণ্ডিত্য এবং মূলকে ঘনিষ্ঠতর অনুসরণের জন্য তাঁহার রচনারীতি কিছু গুরুভার মনে হইতে পারে। কিন্তু দুই এক স্থলে তাঁহার রচনামাধুর্য খুবই চমকপ্রদ হইয়াছে। কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের বিলাপ উৎকৃষ্ট পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

তোমারে পড়িল মনে চাহি বৃন্দাবন পানে
ধ্যান করি ও-রাঙ্গা চরণ।
ফুকরে কাঁদিতে নারি অনিমিখে পথ হেরি
যাবৎ না হয় দরশন ॥
বুঝিতে না পারি মেনে নিদয় হ'ল কেনে
ওহে শ্যাম না কর চাতুরী
ত্যজি সব পরিবার তুয়া পদ কৈল সার
কত দুঃখ দিবে হে মুরারি ॥
যে ভজে তোমার পায় তার কি এ দশা হয়
গৃহধর্ম সকল পাসরে।

যেন কাঙ্গালিনী হঞা পথে পথে ভ্রমাইয়া
ভিক্ষা মাগি খায় ঘরে ঘরে ॥
কোথা আছ প্রাণকানু বাজাও মোহন বেণু
তবে বাঁচে গোপীর জীবন।
ক্ষণেক বিলম্ব দেখি শরীর বিকল সখি
কোথা কৃষ্ণ দেহ দরশন ॥

ইহা তো বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুরবেদনার যথার্থ সুর। রঘুনাথ পদাবলী রচনা করিলেও সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেন। পরবর্তী কালের পদসাহিত্যের প্রাধান্যের জন্য ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' যথেষ্ট জনসমাদর লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু অনুবাদ-কাব্য হিসাবে ইহার বিশেষ গৌরব স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, তিনি মূলকেই অনুসরণ করিয়াছেন, বিশেষ কোথাও মৌলিকতা বা নূতনত্ব দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই: কৃত্তিবাস কাশীরাম বা অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থে মূলের ভাবানুসরণ মাত্র লক্ষিত হয়; কবিগণ স্বেচ্ছামতো কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিয়াছেন, কোথাও-বা বাঙালীর মনের সঙ্গে ঘটনাকাহিনী মিশাইয়া দিয়াছেন। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র কোন কোন স্থলে বাঙালী-জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে; কিন্তু রঘুনাথের 'শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী'তে সেরূপ কোন স্থানীয় জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব দৃষ্ট হয় না। ভাগবতাচার্য ভাগবতকেই অনুসরণ করিয়াছেন, লৌকিক বা স্থানীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। সে যাহা হোক, মূল ভাগবতকে ঘনিষ্ঠ-ভাবে অনুসরণ করিয়া সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া এত বড় একখানি গ্রন্থ রচনা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু প্রশংসনীয় গুণ সত্ত্বেও এ কাব্য ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই।

মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

ভাগবতের দশম স্কন্ধ, অন্য স্কন্ধ এবং অন্যান্য স্থল হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া মাধবাচার্য 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামক ভাগবত অনুসারী কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যে কাব্য রচনা করেন, নানা কারণে তাহা বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছে। মাধবাচার্যের কুলপরিচয় লইয়া নানা গণ্ডগোল দেখা দিয়াছে। ইতিপূর্বে চণ্ডীমঙ্গল প্রসঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর কবিরূপে আমরা আর এক মাধবাচার্যের পরিচয়

লইয়াছি। কাহারও কাহারও মতে চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতাই চৈতন্যভক্ত মাধবাচার্য। এখনও পূর্ববঙ্গে ইঁহার বংশধরেরা বর্তমান আছেন। যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজ মাধব এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মাধবাচার্য বা দ্বিজ মাধবকে পৃথক কবি বলিয়া মনে হইতেছে। চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজ মাধব নিজ কাব্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদ লিখিয়া এইরূপ সন্দেহের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মাধবাচার্য সম্বন্ধেও নানা সমস্যার উদয় হইয়াছে।

বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা দ্বিজমাধবের (মাধবাচার্য) কিছু কিছু উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে দেবকী-নন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় :

মাধব আচার্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল।
যাঁহার চরিতগীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

দেবকীনন্দন পদকর্তা হিসাবেও সুপরিচিত। তাঁহার গ্রন্থে বীরচন্দ্রের (বীরভদ্র) তিনপুত্রের উল্লেখ আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে 'বৈষ্ণববন্দনা' রচনা করিয়াছিলেন।[৪] মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের উল্লেখ হইতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণচরিত বিষয়ক এই কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। অবশ্য এখানে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'কে ভাগবতের অনুবাদ বা অনুসরণ না বলিয়া 'চরিতগীত' বলা হইয়াছে। বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচারিত 'বৈষ্ণববন্দনায়' আছে :

তবে ত বন্দনা কৈল মাধব আচার্য।
কৃষ্ণগুণ বর্ণন সদাই যাঁর কার্য ॥
যে কৃষ্ণমঙ্গল হৈল ভাগবতামৃতে।
যে গীত বিদিত হৈল সকল জগতে ॥

এখানে বোধ হয় 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'কে ভাগবতামৃত বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস নামে আর একজন কৃষ্ণমঙ্গলের কবি মাধবাচার্যের বন্দনা করিয়াছেন :

মাধব-আচার্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল।
যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

[৪] ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস. ১ম, পূর্বার্ধ

কেহ কেহ মনে করেন যে, 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত চৈতন্যশাখাভুক্ত মাধব আচার্য হয়তো 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের' কবি। জীব গোস্বামীর নামে সংস্কৃতে রচিত যে বৈষ্ণববন্দনা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও "বন্দে শ্রীমাধবাচার্যং কৃষ্ণমঙ্গলকারকম্"—এই পংক্তি পাওয়া যাইতেছে। নানা স্থানের উল্লেখে মনে হইতেছে, কবি খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাসে' বর্ণিত মাধবাচার্যের কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা কর্তব্য, তাহাতে এই কবি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। অবশ্য ইহা তথ্যনির্ভর গ্রন্থরূপে সমাদর লাভ করে নাই, তাহাও স্বীকার্য। 'প্রেমবিলাসে'র ২৯শ বিলাসে আছে যে, চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া; সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম কালিদাস। ইঁহার একটিমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল, ইঁহারই নাম মাধব। অর্থাৎ 'প্রেমবিলাসে'র মতে মাধব চৈতন্যের শ্যালক, বিষ্ণুপ্রিয়ার খুড়তুত ভাই। মাধব অল্প বয়সেই নানা বিদ্যা অর্জন করিয়া আচার্য উপাধি লাভ করেন এবং মাধবাচার্য নামে অভিহিত হন :

> নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি হইলা পণ্ডিত।
> আচার্য উপাধিতে তিঁহ হইল বিদিত॥ ('প্রেমবিলাস')

এই মতে মাধব চৈতন্যের সমসাময়িক এবং তাঁহার পরিকর ভুক্ত। যথাসময়ে ইঁহার মাতা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিলে মাধব বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনের রূপ গোস্বামীর নিকট পলায়ন করেন। পরে মাতার দেহাবসানের পর তিনি দেশে উপস্থিত হন। নরোত্তম-আয়োজিত খেতুরীর উৎসবেও মাধবাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল সম্বন্ধে নিত্যানন্দদাস বলিতেছেন :

> শ্রীভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ।
> গীতিবর্ণনাতে তিঁহ করি নানা ছন্দ॥
> রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
> শ্রীচৈতন্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল॥
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে কৈল অনুগ্রহ।
> সব ভক্তগণ তাঁরে করিলেন স্নেহ॥ ('প্রেমবিলাস')

এখানে দেখা যাইতেছে, শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচিত হইয়াছিল, এবং ইহা শ্রীচৈতন্যকে সমর্পিতও হইয়াছিল। কিন্তু 'প্রেমবিলাসে'র এই বর্ণনা কতদূর গ্রহণযোগ্য, তাহা চিন্তার বিষয়। নিত্যানন্দদাসের মতে মাধবাচার্য বিষ্ণুপ্রিয়ার খুড়তুত ভাই, সহোদর ভ্রাতা নহেন। কিন্তু 'বৈষ্ণব আচার দর্পণে' তাঁহাকে সনাতন মিশ্রের পুত্র অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়ার সহোদর ভ্রাতা বলা হইয়াছে। নবদ্বীপে কিন্তু বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সহোদর ভ্রাতাকে 'যাদব' বলিয়াই জানেন। তাঁহাদের মতে চৈতন্যদেবের কোন শ্যালক ভাগবতের অনুবাদ বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকাব্য রচনা করেন নাই। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের বঙ্গবাসী সংস্করণে মাধব আচার্য বা দ্বিজমাধবকে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলা হইয়াছে। তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক হইলে খেতুরী উৎসবের সময় তাঁহার বয়স দাঁড়াইত প্রায় একশত বৎসর। খেতুরী উৎসবে যোগদানের পর তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, এবং সেই বয়সে নানা স্থান পর্যটন করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ দাসের এ বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের কবি মাধবাচার্যের বংশধরেরা নাকি এখনও ময়মনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন ; ইনি চৈতন্যানুচর নহেন—অন্য কোন কবি, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অবশ্য ইনিও চৈতন্যভক্ত ছিলেন, গ্রন্থের নানা স্থানে কবি চৈতন্য বন্দনা করিয়াছেন।[৫] কিন্তু তাঁহার কাব্যের কোথাও তিনি স্পষ্টাক্ষরে এমন কোন কথা বলেন নাই যাহাতে তাঁহাকে চৈতন্যের সমসাময়িক বলিয়া মনে হইতে পারে।[৬] তিনি যে চৈতন্যদেবের শ্যালক ছিলেন এরূপ কোন ইঙ্গিত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে পাওয়া যায় না। 'প্রেমরত্নাকর' নামক

[৫] চৈতন্যচরণ-ধন শিরে করি আভরণ
ভূদেব মাধব ভাষে।

[৬] ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে, মাধবাচার্য চৈতন্যদেবকে দেখিয়াছিলেন :

কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার।
দ্বিজ মাধব কহে কিঙ্কর তাহার ॥

এই উক্তি হইতে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে, "মাধব চৈতন্যকে দেখিয়াছিলেন।" কিন্তু ডঃ সেন-উদ্ধৃত উক্তি হইতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, যাহার দ্বারা কবিকে চৈতন্যের সমসাময়িক মনে হইতে পারে। আমাদের অনুমান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের কবি মাধবাচার্য চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন না।

এক বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থে মাধবাচার্যের নাম পাওয়া যাইতেছে। এখন এই তিন মাধবের মধ্যে কে যথার্থ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে ইনি যে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাক 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল' আনুমানিক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের কোথাও সনতারিখজ্ঞাপক কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই। কবিকে চৈতন্যের শ্যালক ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা প্রমাণ করাও দুরূহ। সুতরাং তাঁহাকে চৈতন্য-সমসাময়িক বলিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। খেতুরী উৎসবে তিনি যোগ দিয়াছিলেন এবং উৎসবান্তে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তারপরে তিনি নানা স্থান পর্যটন করেন—ইহা সত্য হইলে তাঁহাকে কিছুতেই চৈতন্যের সমসাময়িক বা তাঁহার সমবয়স্ক বলা যায় না। প্রাপ্ত উপকরণ হইতে এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মাধবাচার্য নামক এক ভক্তকবি, যিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন, এবং ঐ সময়ে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

এখন কাব্য পরিচয়। কবি মূলতঃ ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে এই কাব্য রচনা করেন, অবশ্য অন্যান্য স্কন্ধ হইতেও তিনি দুই একটি পালা গ্রহণ করিয়াছিলেন—যেমন একাদশ স্কন্ধের যদুবংশ ধ্বংসের গল্পটিও তিনি ইহাতে স্থান দিয়াছেন, এবং হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের কাহিনীকেও প্রয়োজনমতো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[৭]

ছাপাখানার যুগে মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' একাধিক বার 'শ্রীমদ্ভাগবত-সার' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থটি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র পুঁথি অবলম্বনেই মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পালা ও পংক্তিবিন্যাসে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। বটতলার ছাপাখানার 'দেবতাগণ' এইরূপ অনেক পুঁথির নামধাম ও পাঠ বদলাইয়া প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রাচীন বাংলা কাব্যের বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ

[৭] তিনি কাব্য মধ্যে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন :

(১) রাজরাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ মতে॥

(২) পারিজাত হরণ ঈষৎ ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব বিষ্ণুপুরাণের মতে॥

করিয়াছেন। এখানে আমরা 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এবং বটতলা প্রকাশিত দ্বিজ মাধবের শ্রীমদ্‌ভাগবতসারের দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :

॥ বটতলা-প্রকাশিত মাধবচার্যের শ্রীমদ্‌ভাগবতসার ॥

ষোল সেরে কত রস সবে বেচি গণ্ডাদশ
তার দান নাই দুইপণ।
আছুক লাভের কাজ মূলে পড়ি গেল বাজ
দিতে কিছু হবে চিরন্তন ॥
দ্বাদশ বৎসর বয় এই মোর হয় নয়
বারো বৎসরের চাহ দান।
কি আর করহ হট এক বোলে কৈলে ফট
সভা মাঝে পাবে অপমান ॥

॥ বঙ্গবাসী-প্রকাশিত দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

ষোল বৎসর বয়স আমার বার বৎসরের চাহ দান।
কি আর করসি হট এক বোলে করিলে নট
সভা হৈলে পাইতে অপমান ॥
হেদেরে নন্দের পো আপনারে দেগহ সেয়ান।
পথ ছাড়ি দেহ কেবা আছে আগয়ান ॥
ষোল সেরে কত রস সবে বেচি গণ্ডাদশ
তার দান চাহ দুই পণ।
আছুক লাভের কাজ মূলে পড়িল বাজ
খাবে কিছু চাহি চিরন্তন ॥

পুঁথির পাঠ দুইখানি মুদ্রিতগ্রন্থে কিরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া হইয়া গিয়াছে, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে। এমন কি সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র সঙ্গে বঙ্গবাসী প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'রও অনেক পাঠবৈষম্য আছে। যেমন :

বঙ্গবাসী সংস্করণ ॥

শরৎ যামিনী চারু চৌদিকে বিমল।
প্রফুল্ল মালতী জাতি যূথিকা সুন্দর ॥
বহু গুণ বহু সুখ হৈল বৃন্দাবনে।
অখণ্ড পূর্ণিমাশশী উদিত গগনে ॥

চিরদিনে যেন নারী পতিদরশনে।
সর্ব দুঃখ শোক হরে আনন্দিত মনে ।।
কমলা বদন তুল্য পূর্ণ শশধর ।
তা দেখিয়া আনন্দিত ভাবে গদাধর ।।

সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ ॥

শরৎসহায় আর পূর্ণিমা রজনী ।
মনোহর মুরলী বাজাল যদুমণি ।।
একত্র মিলিয়া আইল ষড়ঋতুগণ।
যমুনা লহরী তাহে সুমন্দ পবন ।।
প্রফুল্ল কমলদল ভ্রমর গুঞ্জরে ।
কুহু কুহু কোকিল করযে সুমধুরে ।।

এখানে এই দুইখানি গ্রন্থকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া মনে হয় না কি? বোধহয় বঙ্গবাসী সংস্করণ সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক। বঙ্গবাসী সংস্করণে সম্পাদক মহাশয় অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর একখানি প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল সম্পাদনা করিয়াছিলেন। কাজেই পুঁথির পাঠের সঙ্গে বঙ্গবাসী সংস্করণে ছাপা পাঠে বিশেষ গরমিল নাই। এখানে দুইখানি পুঁথির পাঠ ও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পাঠের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

আড়াই শত বৎসরের পুরাতন পুঁথি ॥

এথা কংস বসি আছে নিজ রাজ কাজে ।
হেন বেলা আইলা নারদ মুনিরাজে ।।
ভেজাল-জুঝাল কথা কথোপকারণ ।
তা দেখি সভ্রম রাজা উঠিলা তখন ।।
ভকতি প্রণতি করি যোগাইল আসন ।
করিল শিতল জলে পাদ প্রক্ষালন ।।
দুই কর জুড়ি রাজা বলিছে বচন ।
আজি কেনে তোমার এথাএ আগমন ।। (কলি. বিশ্ব. পুঁথি-৯৭৯)

দুইশত বৎসরের পুরাতন পুঁথি ॥

এথা কংস বসি আছে নিজ রাজকাজে ।
হেন কালে আইল নারদ মুনিরাজে ॥

ভেজালি-জঝালি কথা কথোপকথনে।
তা দেখি সম্ভাসে রাজা উঠিয়া তৎক্ষণে ॥
করিলা সিতল জলে পাদ প্রক্ষালন।
করজোড় করি বলে বিনয় বচন ॥
ভকতি প্রণতি করি জোগাল্য আসন।
নিবেদিল আচম্বিতে কেন আগমন ॥ (কলি. বিশ্ব. পুঁথি—১০০৩)

বঙ্গবাসীর মুদ্রিত (২য় সংস্করণ) পাঠ ॥

এথা কংস বসিয়াছে আপনার ঘরে।
হেন বেলে আইল নারদ মুনিবরে ॥
ভেদাভেদ বুঝান কথা কথোপকথনে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে-রাজা উঠিল তখনে ॥
প্রণতি ভকতি করি যোগায় আসন।
করিল শীতল জলে পদ প্রক্ষালন ॥
করযোড়ে নৃপবর বলিছে বচন।
আজি কেনে এথায় তোমার আগমন ॥ (১৩৩৩ সালে মুদ্রিত)

এখানে দেখা যাইতেছে যে, পুঁথির পাঠ ও বঙ্গবাসী সংস্করণের মুদ্রিত পাঠের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নাই। কিন্তু সাহিত্যপরিষদের মুদ্রিত পাঠে নানা বৈষম্য আছে। সুতরাং সাহিত্য পরিষদ সংস্কণের অবলম্বিত পুঁথিটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

দ্বিজমাধব মূল ভাগবতের দশম স্কন্ধের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়াছেন, শেষাংশে কিছু কিছু তত্ত্বকথাও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গূঢ় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি তান্ত্রিক ষটকর্মেরও বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। রেচক-পূরক-স্তম্ভক, ষটচক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ প্রভৃতির বর্ণনা হইতে মনে হইতেছে, যোগ, হটযোগ ও তান্ত্রিকতার দিকে কবির বিশেষ প্রবণতা ছিল। যথা :

অভ্যাসের যোগে বশ করিহ পবন।
ষটচক্র ভেদিবারে করিহ যতন ॥
সুকুমার দুয়ার জিনিয়া ত্রিবেণী।
পবন আহারে নিদ্রা যায় কুণ্ডলিনী।
দুয়ার রুধিয়া আছে কুণ্ডলাকার।
মুখানি বাহির করি পরশ আকার ॥

মাধবাচার্যের ঘটনা ও কাহিনীর বিবরণ বেশ পরিচ্ছন্ন, ধারাবাহিকতা বিশেষ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আর কোন প্রশংসনীয় শিল্পগুণ এ কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। অথচ মধ্যযুগে এ কাব্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কবি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, ভাবানুবাদও করেন নাই—মূল গ্রন্থের ভাব লইয়া প্রায় নিজের ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন—কাজেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রায় মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বর্ণনা ও ছন্দে যদিও দ্বিজ মাধব বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তবু এক বিষয়ে তাঁহার কাব্যের একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। ইহাতে বিস্তারিতভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য এই সময়ে ভাগবতের প্রায় অধিকাংশ অনুবাদেই রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী, দান ও নৌকাবিলাসের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে ভবানন্দের 'হরিবংশ' এবং দ্বিজমাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে এই জাতীয় অমার্জিত আদিরসের বাহুল্য লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত রাধা, কৃষ্ণ, চন্দ্রাবলী ও বড়াইয়ের আখ্যান বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেয়। দানলীলায় কৃষ্ণ রাধার নিকট যৌবনের দান চাহিলে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের রাধা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার মতোই বলিয়াছে :

> আপনার অপযশ শুনিলে আপনি।
> তুমি যশোদার পো আমি মাতুলানী ॥

এবং পূর্বে উদ্ধৃত 'ষোল বৎসর বয়স আমার বার বরিষের চাহ দান' শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হইতেছে। কৃষ্ণ কর্তৃক বলপূর্বক রাধাকে আকর্ষণের চিত্র :

> কমলে ভ্রমর যেন লাগে জড়াজড়ি।
> আই আই করিয়া ডাকেন বড়াই বুড়ী ॥
> চারিভিতে সখীগণ করে কানাকানি।
> দেখিতে আসিতে লাজ না ধরে পরাণী।
> রাধাকানুর ধামালি দেখিয়া সব সখী।
> নয়নে বসন দিয়া ঘন হাস্যমুখী ॥

রাধা ও অন্যান্য গোপীদের কৃষ্ণ উপর দৌরাত্ম্য শুরু করিলে বড়াই এই অনাচার দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল :

> আপনার রঙ্গে হেরি কৌতুকে বিহরে।
> তা দেখি বড়াইল হৈল আগুন সোসরে ॥

ক্রোধমুখী দন্তসারি আঁখি পাকাইয়া।
গোপালে মারিতে যায় লড়ি হাথে লয়্যা ॥

কৃষ্ণও বড়াইকে উচিত দণ্ড দিলেন :

আর যত সখী সব আইল বড়াবড়ি।
ভাঙ্গা ঢোল হেন বুড়ী যায় গড়াগড়ি ॥
ধূলায় ধূসর বুড়ী বোল নাহি তুণ্ডে।
মাথার চুল ফুর ফুর করে ধূলাভার মুণ্ডে ॥

নৌকাবিলাসেও রাধাকৃষ্ণের রঙ্গধামালির অনাবৃত বর্ণনা আছে। তবে নৌকালীলার দুই এক স্থলের বর্ণনা নিতান্ত মন্দ নহে। আসন্ন অন্ধকারে ঝড়ের পটভূমিকায় রাধার খেয়াপারের দৃশ্যটি গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে :

প্রবল পবন সঙ্গে বহু ভয়ঙ্কর রঙ্গে
কেবল দিবস অবশেষে।
অম্বর মুখরিত বারি পূরণিত
তিমিরনিকর পরকাশে ॥

রাসলীলার বর্ণনাতেও রাধাকৃষ্ণলীলার স্থূল বর্ণনাই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। ভাগবতের ভক্তিরস দ্বিজ মাধবের হাতে পড়িয়া অনেক স্থলে কটু আদিরসে পরিণত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের মাতুলানী-ভাগিনেয় সম্পর্কের ন্যায় এক যুগে ভাগবতের কোন কোন বাংলা অনুবাদে অনুরূপ রাখালী কাহিনী (pastoral) অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। বাঙলা দেশে ও বাঙলার বাহিরে রাধাকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করিয়া একপ্রকার গ্রাম্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহাতে আদিরসের তীব্রতা ও রুচিবিকারের প্রভাব আছে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যাহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণের দান ও নৌকালীলা-সংক্রান্ত এই সমস্ত গ্রাম্য উপকথা ভাগবতের অনুবাদেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—ইহাই বিস্ময়কর। দ্বিজ মাধব পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সেই সমস্ত উত্তেজক বর্ণনার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল ॥

ভাগবতের দশম স্কন্ধ এবং আরও দুই একটি স্কন্ধ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' রচিত হয়। এই কাব্য কিঞ্চিৎ জনপ্রিয়তা

লাভ করিয়াছিল, ইহার কিছু কিছু পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে ঈশানচন্দ্র বসু 'বঙ্গবাসী' মুদ্রাযন্ত্র হইতে "শ্রীমদ্ভাগবতার্থ সঙ্কলনপূর্বক ৺দুঃখী শ্যামদাস বিরচিত গোবিন্দমঙ্গল" সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। সম্পাদকের কোন কোন সিদ্ধান্ত কিছু সংশয়যুক্ত হইলেও এই সংস্করণটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য।

মেদিনীপুর জেলায় কেদারকুণ্ড পরগণার হরিপুর গ্রামে শ্যামদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা কাশীরাম দাসের ন্যায় দে-উপাধিক কায়স্থবংশীয়; কাব্যের মধ্যে কবি সর্বত্র 'দাস' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্য-সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু কবিকে কাশীরামের সমসাময়িক এবং "২০০ শত বৎসরের" প্রাচীন বলিয়াছেন। এই হিসাব খুব সম্ভব ঠিক নহে। দুইটি আনুমানিক হিসাবের বলে কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লইয়া যাওয়া চলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও কবির বাস্তুভূমিতে তাঁহার একাদশ অধস্তনপুরুষ সীতানাথ অধিকারী বাস করিতেন, ঈশানচন্দ্র বসু ভূমিকায় তাহা জানাইয়াছেন। প্রতি তিন পুরুষে একশত বৎসর ধরা হয়; এই হিসাব অনুসারে কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া মনে হইতেছে। আরও একটা কথা—কবি জমিদারের নিকট দেবত্র ভোগ করিতেন। পরবর্তীকালে ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজ শাসনের গোড়ার দিকে সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির সময় কবির বংশধর গৌরাঙ্গচরণ অধিকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট যে নূতন সনদ লাভ করেন, তাহাতে কোন্ সময় হইতে তাঁহারা দেবত্র ভোগ করিতেছেন, তাহা দেখাইতে পারেন নাই। দেবত্র পত্রে লিখিত আছে যে, "সন দেওয়ানীর পূর্ব হইতে" তাঁহারা এই জমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করে। কবি শ্যামদাস মাত্র দুইশত বৎসরের পূর্ববর্তী কবি হইলে তাঁহার উত্তরপুরুষ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দেবত্রের সন তারিখ যথাযথ উল্লেখ করিতে পারিতেন। তাই মনে হয়, শ্যামদাস অন্ততঃ চারিশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, কবির পিতা শ্রীমুখ কাশীরাম দাসের খুল্ল প্রপিতামহ। তিন পুরুষে একশত বৎসরের হিসাব অনুসারে, এই অনুমানের বলে ডঃ সেন কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি লইয়া যাইতে চাহেন। তাঁহার এ অনুমান যথার্থ। সুতরাং কিঞ্চিৎ সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া একথা

বলা যায় যে, শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বা শেষ-দিকে রচিত হয়।

কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভরদ্বাজ গোত্রীয়, দে-উপাধিক কায়স্থবংশে তাঁহার জন্ম, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। "শ্রীমুখ জনমদাতা, স্থমতী ভবানী মাতা, যার পুণ্যে সিরজিল তনু"—কবি শুধু এইটুকু আত্মপরিচয় দিয়াছেন। গোবিন্দমঙ্গলের সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু কবি সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুঃখী শ্যামদাস "তাঁহার রচিত এই গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ কখন গাইয়া, কখন পাঠ করিয়া দেশে দেশে লোককে শুনাইতেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি হইত, এবং অনেকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিত" (—সম্পাদক)। কায়স্থ কবির নিকট মন্ত্র গ্রহণে মনে হইতেছে শ্যামদাস নরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী। কারণ কায়স্থ নরোত্তমই ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণদের শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগেও শ্যামদাসের বংশধরেরা 'অধিকারী' উপাধি গ্রহণ করিয়া অনেকের মন্ত্রদাতা গুরু হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশে এ রীতি এখনও অব্যাহত আছে।

ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে দুঃখী শ্যামদাস 'গোবিন্দমঙ্গল' নামক আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন স্থলে অন্যান্য স্কন্ধ হইতেও উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধ হইতে দুই চারিটি আখ্যান গৃহীত হইলেও মূল ঘটনা কিন্তু দশম স্কন্ধেরই সংক্ষিপ্তসার। অবশ্য কবি প্রায় কোথাও অনুবাদের রীতি অনুসরণ করেন নাই, শুধু আখ্যানটিকে বিবৃত করিয়াছেন। কবিত্ব বিচারে 'গোবিন্দমঙ্গল' এমন কোন প্রশংসা দাবী করিতে পারে না—পরিচ্ছন্ন ঘটনাবিবৃতিই ইহার একমাত্র গুণ। কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া গোপীরা কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা মন্দ নহে :

গৃহে এক গোপনারী গোরস নিয়োগ করি
কানুর মুরলী তারে ডাকে।
শুনিয়া মোহন বেণু ধরিতে না পারে তনু
চলে বেগে বৃন্দাবনমুখে॥
এক গোপী নিজ ঘরে বসিয়া ভোজন করে
তার নামে মুরলী ডাকিল।

শ্যামগুণে মোহমতি চলিল সে দ্রুতগতি
হাত পাখালিতে না পারিল ॥
চুলিতে বসায়ে দুগ্ধ এক গোপী হৈলা মুগ্ধ
বাজে বাঁশী তার নাম ধরি।
উন্মত্ত মদন-বাণে চলে সে কানুর স্থানে
গৃহকর্ম দূরে পরিহরি ॥

শিশুপাল বধের সহজ বর্ণনাটিও প্রশংসার যোগ্য :

দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা কোপে শিশুপাল রাজা
গোবিন্দে গর্জিয়া দেয় গালি।
কহে রাজা যুধিষ্ঠিরে না ধরিয়া নৃপবরে
কি গুণে বরিলা বনমালী ॥
নৃপতিনন্দন নহে ছত্রদণ্ড নাহি বহে
গোধন রাখিয়া গেল কাল।
কংস আদি রাজগণে মায়ায় মারিয়া রণে
আপনি বাঢায় ঠাকুরাল ॥
ভার বহে গোপিকার পথে দান সাধে আর
নৌকায় কাণ্ডারী নারায়ণ।
ভোজবিদ্যা শিক্ষা করি সংগ্রাম জিনিল হরি
নহে ক্ষত্র গোপের নন্দন ॥
হেন রূপে নানা ছলে গোবিন্দেরে মন্দ বলে
দমঘোষ রাজার নন্দন।
শুনি তার কটুবাণী ক্রোধভরে চক্রপাণি
নিরীখয়ে চঞ্চল নয়ন ॥
আউ সরা যজ্ঞস্থলে তাগ কৃষ্ণ নিল করে
ঘুরাইয়া ছাড়িল প্রচণ্ড।
সুদর্শন সম হৈয়া অবিলম্বে কাটে গিয়া
শিশুপাল নৃপতির মুণ্ড ॥

অবশ্য কবি এখানে ভাগবতবহির্ভূত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও ভারখণ্ডের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই দিক্ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত নানা পালার সঙ্গে দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলের কোন কোন স্থলের সাদৃশ্য আছে। কবি এই কাব্যে রাধা চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। কবির বর্ণনা অনুসারে কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধা রীতিমতো বয়োজ্যেষ্ঠা। কৃষ্ণের জন্মের পর নন্দালয়ের

উৎসবে রাধাও নৃত্যগীতে যোগ দিয়াছিলেন। যশোদার কোলে নবজাত শিশু-কৃষ্ণকে দেখিয়া :

রাধা আদি রসবতী মঙ্গলকলস পাতি
খেলে রঙ্গে ধামালি করিয়া ।।

একদা বালক কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠা রাধা বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন

আঙ্গিনে বসিয়া গোবিন্দাই ধূলি খেলে।
দেখিয়া সুন্দরী রাধা কৃষ্ণ কৈল কোলে ।।
লাগিল অঙ্গের ধূলা নেতের আঁচলে।
চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া চাপিলা বিহ্বোলে ।।

এ কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ রাধাকৃষ্ণলীলায় বড়াইয়ের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। কৃষ্ণের নির্বন্ধাতিশয্যে বড়াই রাধার নিকট কৃষ্ণের আতির কথা বলিয়া উভয়কে মিলিত করিতে চাহিলে রাধা বলিলেন :

তুমি যে বলিলে বড়াই সে কানু ভজিতে।
পরবশ আমি প্রেম করিব কি মতে ।।
গৃহে গুরুজনে মোর বড় পরমাদ।
বাড়ীর বাহির হব হেন নাহি সাধ।।
এ পাটপড়সি মোর বড়ই বিষম।
শাশুড়ি দুরন্ত মোর জীয়ন্ত যে যম ।।
পাপ ননদিনী ভয়ে না ছাড়ি নিশ্বাস।
শার্দূল সমাজে যেন কুরঙ্গিণী বাস ।।

অতঃপর দানখণ্ডে রাধার নিকট কৃষ্ণ যৌবনের দান চাহিলে রাধা বলিলেন :

ব্রজবধূ কৈল বিধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ দধি
বিকে লৈয়া যাই মধুপুর।
ইথে কিবা দান চাও সাক্ষাতে ভাগিনা হও
পথ ছাড় নন্দের কুমার ।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কাহ্ন'র মতোই 'গোবিন্দমঙ্গলে'র গোবিন্দ বলিলেন ;

শুন রাধে আমি তোর না হই ভাগিনা।
আমি তোর নিজ পতি তুমি বরাঙ্গনা ।।
... ...
চতুর্দশ ভুবনে আমার অধিকার।
দৈত্যেরে দলিতে আমি দৈবকী কুমার ।।

নন্দগৃহে স্থিতি মোর লীলার কারণে।
যত দৈত্য বধ কৈনু দেখিলে নয়নে॥

উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমার নিমেষে।
যার বোলে রাত্রিদিন জলদ বরিষে॥
সুরমুনিগণ মোরে ধেয়ানে না পায়।
শুন রাধে হেন হরি তোর প্রেম চায়॥

প্রত্যুত্তরে রাধা ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন :

তুমি যদি লক্ষ্মীকান্ত শুনহ কানাই।
তবে কেন এত লোভ গোপিনীর ঠাঁই॥
অখিল ভুবনপতি বলিয়া বলাহ।
তবে কেন বনে বনে গোধন চরাহ॥

নৌকাখণ্ড, রাসলীলা প্রভৃতি বর্ণনায় যে গ্রাম্য মনোভাবের ছায়া পড়িয়াছে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এমন কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো এ কাব্যেও কোন কোন স্থলে রাধাকেই চন্দ্রাবলী বলা হইয়াছে। যথা :

এত শুনি বলেন নাগর বনমালী।
নৌকায় আসিয়া উঠ রাধাচন্দ্রাবলী॥

ভাগবতে আছে যে, কৃষ্ণ কোন এক গোপীকে লইয়া রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন—ভাগবতে এই গোপীর নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না। দুঃখী শ্যামদাসও এই গোপীর নাম করেন নাই, বা তাঁহাকে রাধাও বলেন নাই। কিন্তু পরবর্তী বর্ণনায় গোপীগণ বিলাপ করিতে করিতে কৃষ্ণসঙ্গাভিলাষিণী রাধার কথাই বলিয়াছে :

হেনকালে বনে দেখিল নয়নে
কুসুমশয়ন স্থলী।
কহ কিবা ইথে রাধিকার সাথে
গোবিন্দ করিল কেলি॥
বলে সে নাগরী পরম চাতুরী
কতেক প্রেম সন্ধানে।
প্রভু ভগবানে আরাধিল বনে
রাধা সে পিরীতি জানে॥

রাধা বিনে আন ভুলাইতে কান
না দেখি নাগরী মাঝে।
আমা সভাকারে রাখি বনান্তরে
লৈয়া গেলা ব্রজরাজে ॥

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ভাগবতে কৃষ্ণ যে প্রধানা গোপীকে লইয়া রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কবি শ্যামদাস তাঁহাকেই রাধা বলিয়াছেন। ভাগবতের নানা অনুবাদে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রবেশ করিলেও রাধাকে এই কাব্যের মতো অন্য কোন অনুবাদে এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনীর মূলে ছিল একপ্রকার গ্রামীণ সংস্কার। সারা ভারতেই পৌরাণিক কৃষ্ণলীলার পাশেই একটি গ্রামীণ ও লৌকিক রাধাকৃষ্ণের উদ্দাম আদিরসাত্মক (এবং সম্ভবতঃ অসামাজিক) প্রণয়কাহিনী প্রচলিত ছিল। মাতুলানী-ভাগিনেয় সম্পর্ক ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের রঙ্গ-ধামালির বর্ণনা যেমন প্রাকৃত-অপভ্রংশ প্রাচীন শ্লোকে স্থান পাইয়াছে, তেমনি দেশভাষাতেও তাহার স্থূল রঙ্গরসের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই লোকসংস্কার কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। ভাগবতে কৃষ্ণগোপীলীলার বর্ণনা থাকিলেও রাধার উল্লেখ নাই; ভাগবতের বাংলা অনুবাদে গৃহীত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড প্রভৃতি বর্ণনাও গ্রামীণ-সংস্কার হইতে জন্মলাভ করিয়াছে এবং মধ্যযুগীয় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আখ্যানকাব্য অনুবাদকাব্য ও পদসাহিত্যে স্থান করিয়া লইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাবেই যে এই সমস্ত লোকপ্রিয় আদিরসের বর্ণনা ভাগবতের অনুবাদে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নহে। একই উৎস হইতে বড়ু চণ্ডীদাস উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ভাগবতের অনুবাদগুলিতেও সেই ভাবধারার প্রভাবে কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলাকে কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। দুঃখী শ্যামদাসও সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য কবি উগ্র আদি-রসের তীব্রতা যথাসম্ভব পরিহার করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরটি চৈতন্যরসে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া এই সমস্ত রঙ্গকথার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিবার অবকাশ পান নাই।[৮] সে যাহা হোক, 'গোবিন্দমঙ্গল' ভাগবতের অনুসরণে রচিত

[৮] বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক কাব্যটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "গোবিন্দমঙ্গল ভক্তিগ্রন্থ; কাব্যগ্রন্থ নহে।" ইহা সত্য বটে; কিন্তু এই কাব্যের কোন কোন স্থলে স্বচ্ছ বর্ণনাভঙ্গিমা ও পদাবলীর রসমাধুর্য আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

হইলেও পুরাপুরি অনুবাদ নহে; ভাষাভঙ্গিমা সহজ ও সংযত—কোথাও অযথা আবেগ-উচ্ছ্বাস নাই। কিন্তু বর্ণনার ধরণ এমন পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত এবং অলঙ্কারাদি এমন নির্দোষ যে, ইহার রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী বলিয়া সন্দেহ হয়। বঙ্গবাসী সংস্করণে সম্পাদক 'বিজ্ঞাপনে' বলিয়াছিলেন, "আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত কয়েকখানি পুস্তক হইতে প্রকৃত পাঠ নির্বাচন পূর্বক এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম। আমরা শব্দসকলের বর্ণাশুদ্ধি ও বর্ণবৈক্লব্য প্রভৃতি দোষ নিরাকরণ ভিন্ন আদর্শ গ্রন্থের আর কোন ব্যত্যয় করি নাই। ২০০ বৎসর পূর্বের দুঃখী শ্যামদাসের ভাষা ও রচনাপ্রণালী যেমন বুঝিয়াছি তেমনি রাখিয়া দিয়াছি।" সম্পাদক 'বর্ণাশুদ্ধি ও বর্ণবৈক্লব্য' বজায় রাখিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে কাব্যটির প্রাচীনত্ব বিচারে সুবিধা হইত। তিনি পুঁথির উল্লেখ করিলেও আদর্শ পুঁথির বিষয়ে আর কোন তথ্য সরবরাহ করেন নাই। সুতরাং পুঁথির সনতারিখ ধরিয়াও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে কাব্যের ভাষা দৃষ্টে মনে হইতেছে সম্পাদকের অবলম্বিত পুঁথিটি আদৌ প্রাচীন নহে, অথবা গ্রন্থের 'বর্ণবৈক্লব্য নিরাকরণে' সম্পাদক মহাশয় পুঁথির পাঠে কিঞ্চিৎ গাঢ়তর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ভাগবতের আর সমস্ত অনুবাদ বা ভাগবতের অনুকারী আখ্যানকাব্য-গুলির রচনাকাল নিঃসংশয়ে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কাজেই এই খণ্ডে অন্যান্য অনুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবকাশ নাই।

উপসংহার ॥ চৈতন্যযুগের বাংলাসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বাঙালীমানসের পরিচয় লইবার চেষ্টা করিয়াছি। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য সবিস্তারে আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের বিকাশ ও পরিণতির মূলে চৈতন্যপ্রভাব কিরূপ কার্যকরী হইয়াছিল। বাঙালীর জীবন, সাধনা ও শিল্পচেতনা মূলতঃ মহাপ্রভুর দানেই গঠিত হইয়াছে, তাঁহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের রূপরীতি ও ভাবাদর্শগত নবজন্মলাভ হইয়াছে; এইখানে তৎকালীন সাহিত্যের মারফতে সেই অভিনব স্বরূপের মূল অবধারণের চেষ্টা করা হইল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যে যুগটিকে সাধারণতঃ স্বর্ণযুগ বলা হয়, তাহা যে অমূলতরুর মতো নিরবলম্ব নহে, পরন্তু দেশ, জাতি ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত—এই যুগের সাহিত্যের তাৎপর্য আলোচনা করিলে তাহাই প্রতীয়মান হইবে।

পরিশিষ্ট

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চৈতন্যপর্বের আলোচনা সমাপ্ত হইল। এখন অন্য দুইটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতেছে যাহা মূল আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত না হইলেও আলোচনার সুবিধার জন্য বর্তমান প্রসঙ্গে সে বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তদানীন্তন ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান সাহিত্য এবং হিন্দী, মারাঠী, ওড়িয়া আসামী প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিলে চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যথাথ স্বরূপটি অধিকতর স্পষ্ট হইবে। এখানে আমরা প্রথমে ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য

ইংরেজী সাহিত্য ॥ ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের যে বৈচিত্র্য, বিশালতা ও ব্যাপক গভীরতা দেখা যায়, তাহার জন্য ঐতিহাসিকগণ দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। একটি রেনেসাঁসের প্রভাব, অপরটি এলিজাবেথের শাসনকাল। ১৪৫৩ খ্রীঃ অব্দে তুরস্কের হস্তে গ্রীককেন্দ্র কনস্টাণ্টিনোপলের পতন হইলে এই অঞ্চলের গ্রীক-রোমান সাহিত্যের পণ্ডিত, দার্শনিক সাহিত্যিক ও শিল্পীরা ইসলামের আক্রমণ হইতে হেলেনীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য য়ুরোপের নানা স্থানে যাত্রা শুরু করিলেন। ইতালিতে তাঁহাদের একটা বড় কেন্দ্র স্থাপিত হইল, এবং ইতালি হইতে য়ুরোপের নানাস্থানে তাঁহাদের মারফতে হেলেনীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। ইতিপূর্বে মধ্যযুগের গোড়ার দিকে রোমানক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস ও যাজকসম্প্রদায়ের অতিরিক্ত চাপে পড়িয়া য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি বিশেষভাবে বাধা পাইয়াছিল, মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের স্থলে ধর্মগ্রন্থের নীতিকথা অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিল। কিন্তু গ্রীক-রোমান সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাবে য়ুরোপের যেন নবজীবনলাভ হইল, ধর্মীয় শুষ্ক আচার-আচরণের স্থলে মানুষের ইহজীবন পরম শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হইল, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন বাড়িয়া চলিল। নানা দেশ আবিষ্কারের ফলে দেশ ও কালের সীমাও যেন বাড়িয়া গেল। ইতালির মারফতে এই পুনর্জন্ম বা রেনেসাঁস ইংরেজী সাহিত্যকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত, বিকশিত ও নিয়ন্ত্রিত

করিয়াছে। ইতিপূর্বে চতুর্দশ শতাব্দীতে চসারের রচনায় নবজীবনের প্রথম সূচনা হইয়াছিল। তার পর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশ এবং গোটা ষোড়শ শতাব্দী ধরিয়াই রেনেসাঁসের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিকাশধারাও লক্ষণীয়। এলিজাবেথের শাসন কাল, খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগ—প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসকে ইংলণ্ডের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই ষোড়শ শতাব্দী, বিশেষতঃ ইহার দ্বিতীয়ার্ধে রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের একটা সর্বাঙ্গীণ উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। বিশেষতঃ সাহিত্যের বিকাশধারাটি রেনেসাঁসের প্রভাবে এবং ঐশ্বর্যময় রাষ্ট্রজীবনের ছায়াতলে অসাধারণ গৌরব লাভ করিয়াছিল। কাব্য, নাটক, গল্পকাহিনী, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সাহিত্যসমালোচনা, ভ্রমণকাহিনী, ধর্মনৈতিক আলোচনা—মানবচিন্তা ও অনুভূতির এমন কোন বিষয় নাই যাহা ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজ লেখক ও পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করে নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন ক্যাক্‌স্‌টন লণ্ডন শহরে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া নিজেই প্রকাশ করেন। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মানবচিন্তার যে মুক্তি ঘটিল, তাহার প্রধান প্রভাব পরিদৃষ্ট হইবে ষোড়শ শতাব্দীতে। বস্তুতঃ ক্যাক্‌স্‌টনের মুদ্রাযন্ত্র ইংরেজী সাহিত্যের গঠন, বিকাশ ও প্রসারে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। ক্যাক্‌স্‌টন স্বয়ং অনেক ক্লাসিক গ্রন্থের অনুবাদ সুলভে প্রচার করেন। এইভাবে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ইংরেজী সাহিত্য রেনেসাঁসের আশীর্বাদকে সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ইংরাজী কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের প্রথম স্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হইবে। গ্রীক-রোমান আদর্শ ও ইতালীয় সাহিত্যের প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ইংরাজী কাব্যসাহিত্য নূতন ঐশ্বর্য লাভ করিল, ইতালীয় ভাষায় রচিত সনেটের বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যক্ষেত্রে নূতন প্রাণরসের ধারাপ্রবাহ সৃষ্টি করিল। স্যর টমাস ওয়াইট (১৫০৩-৪২) এবং সারের আর্ল হেনরি হাওয়ার্ড (১৫১৬-৪৭)-এই দুইজন অভিজাত কবি ইতালির পেত্রার্কার আদর্শে (কিন্তু পেত্রার্কার পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া) নিজস্ব রীতিতে ইংরেজী সনেটের পরিকল্পনা করিলেন। ইহাদের সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য কাব্যকবিতা ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই রচিত ও জনপ্রিয়তা লাভ

করে। কিন্তু আর এক জন বিরাট কবিপ্রতিভাধর ব্যক্তি আসিয়া ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্যের এমন একটা বিচিত্র রূপ পরিকল্পনা করিলেন যে, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ শিল্পী-মানস যেমন আত্মপ্রকাশের পথ পাইল, তেমনি পরবর্তী কালের ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁহার প্রভাব অনিবার্যরূপে মুদ্রিত হইয়া গেল। আমরা 'ফেয়ারি কুইন'-এর কবি এডমণ্ড স্পেন্সরের (আনুঃ ১৫৫২-৯৯) কথা বলিতেছি। বোধ করি শেকস্‌পীয়র-মিলটনকে বাদ দিলে স্পেনসরের মতো আর কোন কবি ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরাজ-মানসে এতটা সুগভীর প্রভাব মুদ্রিত করেন নাই।

স্পেনসরের 'শেফার্ড্‌স্‌ ক্যালেণ্ডার' ও 'এপিথালমিয়ন' কাব্যে কবি-প্রতিভার অল্পতা নাই বটে, কিন্তু তাঁহার যাহা কিছু গৌরব, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে ১৫৯০-৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুইখণ্ডে প্রকাশিত রূপক কাব্য 'ফেয়ারি কুইন'-এর উপর। প্রেম, সৌন্দর্য, স্বপ্নাভিসার, জীবনের প্রসন্নতা, অনুভূতির নিবিড়তা, কল্পনার বিশালতা ও প্রতীকদ্যোতনার সূক্ষ্ম কারুকর্ম বিচার করিলে স্পেন্‌সরের 'ফেয়ারি কুইন' যে-কোন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। বস্তুতঃ মধ্যযুগীয় রোমান্স ও প্রতীকতা এবং সমসাময়িক ইংলণ্ডের সমাজ ও রাষ্ট্রপরিবেশ এই কাব্যে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে সমন্বয় লাভ করিয়াছে। এই যুগে রেনেসাঁসের খোলা হাওয়ার আলোকলগ্নে আরও অনেক কলকণ্ঠ কবি গান ধরিয়াছিলেন। স্যর ফিলিপ সিড্‌নে সাহিত্য-সমালোচনা ও গদ্যকাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে সনেটের জাল বুনিয়া চলিয়াছিলেন, এবং আরও কয়েকজন কবি ইতালীয় ও প্রাচীন গ্রীক-রোমান সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া ইংরেজী সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতেই ইংরেজী নাটক সর্বপ্রথম ব্যাপকতা লাভ করে। যদিও ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে শেকস্‌পীয়রের আবির্ভাব হয়, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তাঁহার আত্মপ্রকাশ ও প্রাধান্যের পূর্বেই টমাস কীড, রবার্ট গ্রীন, খ্রিস্টোফার মার্লো ইংরেজী নাটকের বৈচিত্র্যবিধানে বিশেষ সাহায্য করেন। অবশ্য মার্লোর নাট্যপ্রতিভা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজী নাটককে একটি নিয়মানুগ শিল্পরীতি দান করেন। 'টাম্‌বারলেন' 'ডক্টর ফাউস্টাস', 'জু অব মাল্টা' প্রভৃতি নাটক লিখিয়া তিনি বিশেষ জন-প্রিয়তা অর্জন করেন—এমন কি শেক্‌সপীয়রের উপরেও তাঁহার প্রভাব

সঞ্চারিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে শেকস্‌পীয়র আসিয়া 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট' (১৫৯২), 'দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস' (১৫৯৪), 'লাভস্ লেবারস্ লস্ট' (১৫৯১), 'দি কমেডি অব এররস্ (১৫৯২), 'টু জেণ্টল্‌মেন অব ভেরোনা' (১৫৯১), 'এ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম' (১৯৯৪-৯৫) প্রভৃতি নাটকের সাহায্যে ইংরেজী নাটকের স্বাদ ফিরাইতে চেষ্টা করেন। অবশ্য তখনও তিনি মার্লোর প্রভাব পুরাপুরি ছাড়াইতে পারেন নাই, বোধ হয় 'কিং জনে'ই তিনি সর্বপ্রথম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। যাহা হোক, এখানে লক্ষ্মণীয় যে, ষোড়শ শতাব্দীর ঐশ্বর্যের যুগে মার্লো ও শেকস্‌পীয়রের প্রভাবে ইংরেজী সাহিত্য সর্বপ্রথম একটি বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম রূপে জনসাধারণের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল।

গাছের মূলে যেমন রস সঞ্চারিত হইলে পত্রপল্লবের মধ্যেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তেমনি রেনেসাঁসের প্রভাব ইংরেজী কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ-নিবন্ধেও আত্মপ্রকাশ করিল। ইতিপূর্বে কবিতায় রোমান্সধর্মী বীরত্ব ও প্রেমের গল্প প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু চতুর্দশ শতকের ইতালীয় গল্পলেখক বোকাচিওর 'দি ডেকামেরন' (১৩৫০) নামক *novella storia* বা নূতন গল্পের প্রভাবে ইংলণ্ডেও দৈনন্দিন জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া গদ্যে গল্পকথা রচিত হইতে লাগিল—যাহাতে উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল। উইলিয়ম পেণ্টার কিছু কিছু ইতালীয় গল্পের ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিয়া গদ্যাত্মক কাহিনীর প্রতি ইংরাজ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জন লাইলি, রবার্ট গ্রীন, টমাস লজ, টমাস ন্যাশ, ফিলিপস সিডনে—ইঁহারাই ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কখনও রূপকথা, কখনও কল্পনাপ্রধান প্রেমপ্রীতির গল্প, কখনও বীররসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহ, কখনও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা, কখনও-বা রঙ্গপরিহাসকে ভিত্তি করিয়া আধুনিক উপন্যাসের অনুরূপ শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। সর্বপ্রথম টমাস ম্যালেরির 'মর্টি ডি আর্থার' গ্রন্থে ইংরাজী গদ্যে মধ্যযুগীয় আর্থারচক্রের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছিল। ক্যাক্সটনের ছাপাখানা হইতে সুলভ মূল্যে প্রচারিত হইবার ফলে এই গদ্যগ্রন্থটির জনপ্রিয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। লাইলির 'ইউফিউয়স' (১৫৭৯) সর্বপ্রথম জনপ্রিয় গদ্যকাহিনীর সূত্রপাত করে। টমাস লজের 'রোজালিণ্ড' (১৫৯০) মধ্যযুগীয় গদ্য রোমান্স হইলেও শেকস্‌পীয়রের 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকের কাহিনী এই উপন্যাস হইতেই গৃহীত।

সমসাময়িক কথাসাহিত্যিক টমাস ন্যাশ এক দিক দিয়া ইংরেজী উপন্যাসের যথার্থ সূচনা করেন। গ্রীন ও লজ গদ্যে কাহিনী লিখিলেও মধ্যযুগীয় রোমান্সের স্বপ্নাতুর ছায়ালোক ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ন্যাশ 'দি লাইফ অব জ্যাক উইলটন' (১৫৯৪) উপন্যাসে রঙ্গরস, মানুষের ছোটখাট সুখদুঃখ, বাস্তব জীবনের আলোছায়াকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্যর ফিলিপ সিড্‌নের 'আর্কাডিয়া'র নাম উল্লেখযোগ্য। সে যুগের অভিজাত সমাজের নেতা, শিল্পসাহিত্যে অভিজ্ঞ সিড্‌নে এই উপন্যাসে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সমন্বয়ে ইংরাজী উপন্যাসের সীমাকে আরও সম্প্রসারিত করেন।

শুধু কথাসাহিত্যে নহে, মননশীল রচনাভঙ্গিমা ও প্রবন্ধসাহিত্য ইংরাজী গদ্যরীতিকে ধীরে ধীরে চিন্তার বাহন করিয়া তুলিতেছিল, তাহা ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজী প্রবন্ধসাহিত্যের সামান্য পরিচয় লইলেই বোধগম্য হইবে। অবশ্য এ যুগের শিষ্টসমাজের বুদ্ধিজীবী লেখকগণ তদানীন্তন প্রথা অনুযায়ী লাটিন গদ্যে চিন্তাপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে অধিকতর উৎসাহী হইয়াছিলেন। টমাস ম্যুর, ফ্রান্সিস বেকন—ইহারা লাটিন ভাষাতেই অধিকাংশ গদ্য রচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রাণী এলিজাবেথের শিক্ষক রোজার এ্যাসচাম (১৫১৫-১৫৬৮) প্রথমে লাটিনেই রচনাদি অভ্যাস করিয়াছিলেন, পরে ধীরে ধীরে ইংরাজী গদ্য অবলম্বন করেন। স্যর ফিলিপ সিডনে ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র সিডনে সর্বপ্রথম সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'দি ডিফেন্স অব পোয়সি' রচনা করেন। এই সময়ে আরও কয়েকজন লেখক ইংরেজী গদ্যে সাহিত্যসমালোচনা আরম্ভ করেন। জর্জ পুটেনহামের (১৫৩০-১৫৯০) 'দি আর্ট অব ইংলিশ পোয়সি' (১৫৮৯), টমাস কাম্পিয়নের 'অবজারভেশন্‌স্ ইন দি আর্ট অব ইংলিশ পোয়সি' (১৬০২) প্রভৃতি আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজী গদ্যে ধীরে ধীরে সাহিত্যবিচারপদ্ধতি গড়িয়া উঠিতেছিল। তবে মননশীল রচনাকার হিসাবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্যর টমাস ম্যুর এবং শেষের দিকে স্যর ফ্রান্সিস বেকনের নাম ইংরেজী গদ্য-সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ম্যুরের সমাজতত্ত্বসম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইউটোপিয়া' ১৫১৬ খ্রীঃ অব্দে লাটিন ভাষায় রচিত হয়, তাঁহার মৃত্যুর

পরে ১৫৫১ খ্রীঃ অব্দে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ম্যুর সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার মূল তত্ত্বগুলি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে স্যর ফ্রান্সিস বেকন লাটিন ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ইংরেজী ভাষার প্রতি গোড়ার দিকে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু তিনি 'এসেজ' (১৫৯৭) গ্রন্থে ফরাসী রচনাকার মনটেইনের আদর্শে ইংরেজী প্রবন্ধের একটি আশ্চর্য সঙ্কলন প্রকাশ করেন। তাঁহার 'এ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব লার্নিং' বিশ্বের সর্বযুগের বুদ্ধিজীবীদের পরম সম্পদরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

বাইবেলকে কেন্দ্র করিয়া একপ্রকার ধর্মসাহিত্যের প্রভাবও এই যুগের ইংরেজী গদ্যে লক্ষ্য করা যায়। উইলিয়ম টিণ্ডেল ১৫২৫ খ্রীঃ অব্দে সর্বপ্রথম ইংরেজী গদ্যে নিউ টেস্টামেণ্ট অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। ইহার দশ বৎসর পরে ১৫৩৫ খ্রীঃ অব্দে মাইল্‌স্ কভারডেল সমগ্র বাইবেলকে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলে ধর্মগ্রন্থের তত্ত্ব লইয়া নানা আলোচনা আরম্ভ হয়। টমাস ম্যুর বাইবেল ঘটিত নানা তথ্য ও তত্ত্ব লইয়া টিণ্ডেলের সঙ্গে দীর্ঘকাল লিপিযুদ্ধ করিয়াছিলেন।

রেনেসাঁসের প্রভাব ও এলিজাবেথীয় ঐশ্বর্যযুগের পটভূমিকায় ইংরেজী সাহিত্য বিকশিত হইয়াছে, ইংরাজ জাতির মন ও প্রাণের নিগূঢ় রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। এই যুগে কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, রাজনীতি-সমাজনীতি-ধর্মতত্ত্ব লইয়া নানা আন্দোলন, সাহিত্য সমালোচনা—সমস্ত বিষয়েই যেন নূতন জীবনবেগের বন্যা নামিয়াছিল। সমসাময়িক কালের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের তুলনাই চলে না। চৈতন্য প্রভাবে বৈষ্ণব তত্ত্ব, সাহিত্য ও ধর্মাচার একটা প্রবল আবেগরূপে আবির্ভূত হয়। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে অসাধারণ অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাব, তদানীন্তন নব্য ন্যায়, স্মৃতি-মীমাংসা-তন্ত্র, বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলনের ফলে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির মনঃপ্রকৃতির যে বিচিত্র বিকাশ হইয়াছে, ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যেই তাহার যথার্থ প্রতিক্রিয়া সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরাজমানসের বিচিত্রমুখী গতিপ্রকৃতি ও বিশাল বিস্তারের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কদাচিৎ তুলনা চলিতে পারে। তখনও বাংলা গদ্য সাহিত্য-

কর্মে ব্যবহৃত হয় নাই, রাজনীতি ও সমাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা দূরের কথা সেরূপ চিন্তার কথাও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ধর্মানুভূতিতে একটা বন্ধনহীন বিচিত্র উল্লাস ও মুক্তির প্রকাশ ঘটিলেও বাঙালীর মন তখনও মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, সাহিত্যে সেই মন ও প্রাণের ছায়াপাত হইয়াছিল।

ফরাসী সাহিত্য॥ ইংরেজী সাহিত্যের মতো ফরাসী সাহিত্যও ষোড়শ শতাব্দীতে আশ্চর্য বিকাশ লাভ করে। বলা বাহুল্য ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রভাবেই একশত বৎসরের মধ্যে ফরাসী সাহিত্য এত দ্রুতবেগে বিচিত্র দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগ—কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসরের ফরাসী সাহিত্যকে রেনেসাঁসের সাহিত্য বলা হইয়া থাকে, এবং এই রেনেসাঁসের মূলে যেমন ইতালীয় সাহিত্য ও হেলেনীয় গ্রন্থাদির প্রভাব রহিয়াছে, তেমনি রাষ্ট্রশক্তিও এই রেনেসাঁসের যুগের সাহিত্যের প্রতি আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া ফরাসী জাতির আত্মপ্রকাশের বাহন ফরাসী সাহিত্যের গঠন ও ক্রমবিকাশে সাহায্য করিয়াছিল।

খ্রীঃ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর দারুণ যুদ্ধ বিগ্রহ, মহামারী, আধিব্যাধি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানা বিপর্যয়ের ফলে এই দুই শত বৎসরে ফরাসী সাহিত্যে নূতন প্রাণরসের স্পর্শ ঘটিবার অবকাশ পায় নাই। যে সময়ে ইতালিতে হেলেনীয় সাহিত্যের প্রভাবে রেনেসাঁসের বিচিত্র বিকাশ দেখা গিয়াছিল, ইতালীয় ভাষায় গ্রীক-রোমান সাহিত্য-দর্শন-শিল্পাদি অনূদিত হইয়া ইতালীয় সাহিত্যকে নূতন পথে লইয়া যাইতেছিল; কিন্তু তখন ফরাসী দেশে মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কার প্রবল বিক্রমে আধিপত্য করিতেছিল। ১৪৯৪ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী সম্রাট অষ্টম চার্লস্ ইতালি অভিযানে গিয়া ইতালীয় রেনেসাঁসের স্বরূপ দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। অবশ্য এই অভিযানের কিছু পূর্ব হইতে ইতালির সঙ্গে ফরাসী বণিকদের কেনাবেচা চলিত এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপ বাণিজ্যের আদানপ্রদানের সঙ্গে কিছু ইতালীয় সাহিত্য অনুবাদের মারফতে ফরাসী জনসাধারণের মনে স্থান করিয়া লইয়াছিল। প্রথম ফ্রান্সিস (রাজ্যকাল —১৫১৫-৪৭) ইতালি হইতে জ্ঞানীগুণী শিল্পীদের ফরাসী দেশে সাদরে

আমন্ত্রণ করিয়া ইতালির রেনেসাঁসের ঐশ্বর্যসম্ভারে স্বদেশের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেন। এইজন্য তিনি ফরাসী রেনেসাঁসের জনক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বিদ্যানুরাগী এই রাজা গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া মধ্যযুগীয় ফরাসী দেশ ও ভাষাকে অতি দ্রুত রেনেসাঁসের প্রভাবে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিসের উত্তর-পুরুষগণ ও পরবর্তীকালের ফরাসী দেশের শাসনশক্তির কর্ণধারেরা এ আদর্শ দীর্ঘকাল অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হেনরীর রাণী ক্যাথারিন দে মেডিসি, নবম চার্লস্—ইঁহারা সকলেই ইতালীয় রেনেসাঁসের ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিলেন। ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ইঁহারা ইতালীয় রেনেসাঁসের ভাবে সজ্জিত করিতে চাহিয়াছিলেন। গোটা ষোড়শ শতাব্দী ধরিয়াই ফরাসী সাহিত্যে ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রভাব বিশেষ ভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে ইতালীয় রেনেসাঁসের স্থলে ফরাসী জাতীয় সংস্কৃতি, ধর্মবোধ ও সামাজিকতা ফরাসী সাহিত্যে নূতন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর হইল এবং কিছুদিন ধরিয়া ফরাসী সাহিত্যে ইতালীয় রেনেসাঁসের মুক্ত বায়ু বন্ধ হইয়া গিয়া গ্রীক রোমান মানবতন্ত্রী 'হিউম্যানিজম্'-এর স্থলে খ্রীষ্টান ধর্মসংক্রান্ত বাদানুবাদ ফরাসী সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

রেনেসাঁসের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে Francois Rabelais (১৪৯৪-১৫৫৩) এবং John Calvin (১৫০৯-১৫৬২)-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যঙ্গবিদ্রূপ, হাস্যকৌতুকে অদ্বিতীয় Rabelais গ্রীক-রোমান শিল্পসাহিত্যের অন্যতম প্রচারক ও গুণগ্রাহী হইয়া জীবনের সুখদুঃখ আনন্দবেদনাকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। সময় সময় তিনি মানুষের স্থূল বাস্তব প্রকৃতিকেও চিত্রিত করিয়াছিলেন। হয়তা বৃহৎ মহৎ কিছু তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হয় নাই, কিন্তু রেনেসাঁসের জ্ঞান-শিল্প, সাহিত্য এবং ইহমুখী জীবনবাদের একনিষ্ঠ ভক্ত Rabelais ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে মানুষকে না দেখিয়া উদারতর সুপ্রসর মর্ত্য-জীবনের প্রাঙ্গণে মানুষকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

John Calvin আবার ঠিক Rabelais-এর বিপরীত। মূলতঃ প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের আদর্শ ও জ্ঞানবিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন (*L' Institution de la religion Chretienne*), সারা য়ুরোপের বুদ্ধিজীবী মহলে তাহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মসংস্কারের

নেতা হইয়া Calvin ফরাসী চিন্তার গভীর দিকটিকে সুষ্ঠু গদ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের যুগে অলঙ্কারপ্রিয় একদল কবি (*Grands Rhetoriqueurs*) যথাসম্ভব রেনেসাঁসের প্রভাব বর্জন করিয়া সূক্ষ্ম রচনা-কৌশল, ছন্দচাতুর্য প্রভৃতি কবিতার বহিরঙ্গকে কবিতার প্রাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার আর একদল কবি ছিলেন, যাঁহারা কিয়দংশে 'নব্য প্লেটোবাদ' ও পেত্রার্কার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যদিও এই মতাবলম্বীদের কেহ কেহ গ্রীক ও ইতালীয় গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা ইতালির প্রভাব অপেক্ষা ফরাসীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ হইতে ফরাসী সাহিত্যে ইতালির সাহিত্য ও শিল্পের প্রবল প্রভাব সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করে। Pierre de Ronsard-এর নেতৃত্বে একদল তরুণ কবিসাহিত্যিক এই সময়ে গ্রীক-রোমান ক্লাসিক ও ইতালীয় সাহিত্যের দ্বারা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সচেষ্ট হন। নিজেদের মতাদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া ইঁহারা দুইখণ্ডে একটি ঘোষণা-গ্রন্থ (*La Defense et Illustration de la langue francaise*) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে ইঁহারা রেনেসাঁসের প্রভাব স্বীকার করিয়াও লাটিনের স্থলে ফরাসী ভাষাকে প্রাধান্য দিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই দল *La Pleiade* নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। Pierre de Ronsard (১৫২৪-১৫৮৫) এই দলের নেতৃত্বভার লইয়া সনেট, গীতিকবিতা, প্রণয়গীতিকা, রাজনৈতিক কবিতা, মহাকাব্য—কাব্যের প্রায় সমস্ত বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহাকাব্য ও স্তোত্রজাতীয় কবিতায় তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর না থাকিলেও প্রণয়গীতিকায় তাঁহার কবিত্ব স্মরণীয়। Ronsard-এর সমসাময়িক এবং *Pleiade* দলের মধ্যমণি Joachim du Belley (১৫২৫-১৫৬০) এই দলের ঘোষণাপত্র রচনা করেন এবং ফরাসী ভাষায় উৎকৃষ্ট সনেট লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসী নাটকেরও শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাইবে। ইতিপূর্ব্বে নাটকাভিনয় ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে গণ্য হইত। কিন্তু *Pleiade* দল এবং গ্রীক-রোমান-প্রিয় সাহিত্যিকগণ ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ক্লাসিক আদর্শে ফরাসী নাটকের নূতন রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের অঙ্গ নাটকা-

ভিনয়ে বাস্তব জীবন স্থান লাভ করিলে ধর্মযাজক সম্প্রদায় ধর্মের অঙ্গহানি হইতেছে মনে করিয়া নাটকের এই নূতন আদর্শের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৫৩৭ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ফরাসী নাট্যকারগণ ইউরিপিদেস ও সোফোক্লিসের ট্র্যাজেডির ফরাসী অনুবাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য ফরাসী ক্লাসিকপন্থী নাট্যকারগণ সেনেকের রীতি-নীতি অধিকতর অনুসরণ করিতেন। Etienne Jodelle (১৫৩২-৭৩) ফরাসী ভাষায় প্রথম ট্র্যাজেডি *Cleopatre* (১৫৫২) রচনা করেন। Robert Garnier (১৫৩৪-১৫৯০) গ্রীক-রোমান আখ্যান লইয়া আটখানি ট্র্যাজেডি রচনা করেন। বস্তুতঃ Garnier-ই সর্বপ্রথম ফরাসী ভাষায় রচিত মৌলিক নাটকে ঘটনাসংঘাত ও চরিত্রদ্বন্দ্বের আমদানি করিয়াছিলেন। এই যুগে প্লটাসের আদর্শে ফরাসী ভাষায় কিছু কিছু মিলনান্ত নাটকও রচিত হইয়াছিল। এই কমেডিগুলিতে ইতালীয় নাটকের প্রভাবই অধিকতর লক্ষিত হয়। মিলনান্ত ও রঙ্গপরিহাসমুখর নাটকের মধ্যে Larivey-র *Les Esprits* নাটকখানি ষোড়শ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই একশত বৎসরের নাটকের অধিকাংশই অবশ্য ক্লাসিক আদর্শে রচিত, কোন কোনটিতে আবার ইতালীয় আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। এদেশের নাটকে যথার্থ ফরাসী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে আরও পরে। Pierre Corneille ১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দে *The Cid* নামক নাটকে ক্লাসিক আদর্শ গ্রহণ করিয়াও ক্লাসিক রীতি নীতির অতি-প্রাধান্য অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে Montaign (১৫৩৩-৯২)-এর প্রভাবে ফরাসী গদ্য বিচিত্র শিল্পমূর্তি লাভ করে। এই সুবিখ্যাত গদ্যশিল্পী নানাবিধ গুরুতর কর্মে লিপ্ত থাকিয়া জীবনের শেষভাগে গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বিখ্যাত রচনাগ্রন্থ *Essais* ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে সমস্ত প্রবন্ধ একত্র করিয়া ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সমগ্র য়ুরোপেই রচনা-সাহিত্যের নূতন পথ দেখাইয়া দিয়াছে। অবসর জীবনে Montaign কিছু কিছু গদ্য রচনায় অকপটে নিজের কথা বলিয়াছিলেন। বিষয়বস্তু ও বক্তব্যে বাঁধুনির অভাব থাকিলেও সমগ্র রচনার মধ্যে লেখকের মনের কথাটি এত চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে যে, এই ধরণের রচনা-সাহিত্য য়ুরোপের নানা দেশে অনুকৃত হইয়াছিল।

প্যাসকাল, রবার্ট বারটন, টমাস ব্রাউন, রুসো, নিৎশে—অনেকেই তাঁহার সংশয়াত্মক চিত্তবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। বেকন ও ল্যাম্ব্ তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাদর্শকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ রেনেসাঁসের যুগে ধীরে ধীরে কাব্যক্ষেত্রে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রাধান্য পাইতেছিল, মনটেইনের গদ্যনিবন্ধে সেই ব্যক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করা যাইবে। তিনি পাঠককে সম্বোধন করিয়া এই গ্রন্থে বলিয়াছিলেন, "I myself am the matter of my book...It is myself that I depict." মনটেইনের গদ্য রচনায় এই ব্যক্তিপ্রাধান্য উগ্র না হইয়া পাঠকচিত্তে স্নিগ্ধ স্পর্শ বুলাইয়া দেয়।

ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যে রেনেসাঁসের কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছিল, সংক্ষেপে তাহার আভাস দেওয়া হইল। এই শতাব্দীতে গ্রীক-রোমান ও ইতালীয় আদর্শ ফরাসী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের মূলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ফরাসী সাহিত্যে যথার্থ ফরাসী-মানস ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের দেশে চৈতন্য-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে গদ্য বা নাট্যরীতি তখনও অনুশীলিত হয় নাই, লোকাভিনয়ের অল্পস্বল্প প্রচলন অবশ্য অজানা ছিল না। বৃন্দাবনের গোস্বামীসম্প্রদায় তখন সংস্কৃতে কাব্য-নাটক ও নিবন্ধ রচনা করিতেছিলেন, টীকাটিপ্পনীতেও সংস্কৃত গদ্যই ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহ বাংলা গদ্যে কিছু রচনা করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পয়ার ছন্দের দ্বারা প্রায় গদ্যের সব কাজই চলিয়া যাইত বলিয়া সাহিত্যকর্মে গদ্যের আবির্ভাব হইতে এত বিলম্ব হইয়াছিল।

জার্মান সাহিত্য ॥ জার্মান সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁস ধর্ম-সংস্কারের বেশে আবির্ভূত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব হইতে জার্মানীতে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সূচনা হইয়াছিল, ষোড়শ শতাব্দী এবং তাহার পরেও সেই অনিয়ম অব্যাহত ছিল। 'হোলি রোমান সাম্রাজ্যে'র সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত বাহিরের যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, অনৈক্যের বিষে জর্জরিত নিজ দেশ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিবার অবকাশ পান নাই।

জার্মানীর রেনেসাঁস ফরাসী বা ইংরেজী রেনেসাঁসের অপেক্ষা একটু পৃথক ধরণের। রেনেসাঁসের যুগে ফরাসী সাহিত্য যেমন মানববাদী গ্রীক-রোমান

শিল্পসাহিত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, জার্মান দেশ ও সাহিত্য রেনেসাঁসের প্রভাবে ঠিক সেইরূপ মানবজীবনকেন্দ্রিক সাহিত্যানুশীলনকে রেনেসাঁসের একমাত্র ফল বলিয়া গ্রহণ করে নাই। ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান রেনেসাঁসের অর্থ—ধর্মসংস্কার, যাহা ইতিহাসে 'রিফর্মেশন' নামে পরিচিত। জার্মান সাহিত্যে রেনেসাঁস কেন মানববাদী ঐহিকতার প্রভাব বিশেষ মুদ্রিত করিতে পারিল না, পণ্ডিতগণ তাহার নানা কারণ দেখাইয়া থাকেন। ইতিহাসে দেখা যাইতেছে, চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রেনেসাঁসের নানা তরঙ্গ জার্মানীতে পৌঁছাইয়াছিল; অথচ সে প্রভাব ষোড়শ শতাব্দীর দিকে সাহিত্য ও শিল্পকলায় প্রচণ্ড আবেগরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিল না, খ্রীষ্টান ধর্মসংস্কারের দিকেই সমস্ত আন্দোলন মুখ ফিরাইল। কেহ কেহ বলেন যে, ফরাসী-ইতালি মানস কিয়দংশে হেলেনীয় অর্থাৎ গ্রীক আদর্শের প্রতি স্বতঃই অনুকূল; অপরদিকে জার্মান মন হিব্রু (Hebraistic) অর্থাৎ খ্রীষ্টান আদর্শের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট। ইতালি-ফরাসীতে গ্রীক-রোমান সাহিত্য-চর্চার মধ্য দিয়া উক্ত দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জার্মানীতে রেনেসাঁসের প্রভাবে ক্লাসিক সাহিত্যের চর্চা চলিলেও গ্রীক সাহিত্য-শিল্প-দর্শন বিদেশী বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। আরও একটা কারণ উল্লেখযোগ্য। জার্মানীতে অভিজাত সম্প্রদায় গ্রীক-লাটিন শিখিয়া গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের রস গ্রহণ করিত। কিন্তু জনসাধারণ লাটিন ভাষার কিছুই বুঝিত না; সুতরাং তাহারা রেনেসাঁসের গ্রীক-লাতিনবাহী ঐতিহ্যধারার কোন সংবাদ রাখিত না। কিন্তু ফরাসী-ইতালি ভাষা মূলতঃ লাতিন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং এই সমস্ত দেশে গ্রীক-রোমান সাহিত্য-দর্শনাদি নিতান্ত অজ্ঞাতকুলশীল বলিয়া মনে হইত না।

অবশ্য গ্রীক-রোমান সাহিত্য রেনেসাঁসের যুগে জার্মান সাহিত্যে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, একথা ঠিক নহে। Johane Reuchlin (১৪৫৫-১৫২২), Desiderius Erasmus—ইঁহারা সকলেই গ্রীক ক্লাসিক সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ছাপাখানার আবিষ্কারের সঙ্গে জার্মানীর বিদ্যার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, নানা স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। মার্টিন লুথার, যিনি খ্রীষ্টান ধর্মসংস্কারে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, তিনিও রেনেসাঁসের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিরূপ ছিলেন না।

ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যে ধর্মসংস্কার ও ধর্মনৈতিক আন্দোলন স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল। অধিকাংশ গ্রন্থে, এমনকি নাট্য-সাহিত্যেও ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন ও সমস্যা উৎকট আকার ধারণ করিয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান লেখক Desiderius Erasmus (১৪৬৬-১৫৩৬) জার্মান ভাষায় কিছু রচনা করেন নাই। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ *Encomium Moriae* (১৫০৯) এবং *Colloquiu* (১৫২৮) লাতিন ভাষায় রচিত। তিনি লাতিন ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ করিয়া *Encomium Moriae*-এ যাজকসম্প্রদায়ের ভণ্ডামিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যথার্থ ধর্মসংস্কার প্রচণ্ড আন্দোলনরূপে আবির্ভূত হইল এমন একটি মানুষের দ্বারা যিনি সমগ্র য়ুরোপের চিন্তানায়ক বলিয়া একদা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আমরা মার্টিন লুথারের (১৪৮৩-১৫৪৬) কথা বলিতেছি। মার্টিন লুথার সর্বপ্রথম জার্মানভাষায় বাইবেল অনুবাদ (নিউ টেস্টামেণ্ট—১৫২২, সমগ্র বাইবেল—১৫৩৪) করিয়া জার্মান গদ্যের প্রথম সার্থক শিল্পী বলিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন। যাহাকে High German ভাষা বলে, তাহা সমগ্র জাতির গ্রহণযোগ্য হইবে মনে করিয়া লুথার সহজ, সরল, সর্বজনবোধগম্য গদ্যে বাইবেল অনুবাদ করিয়া জার্মান গদ্যের রূপ ও রীতি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের সমগ্র জার্মান সাহিত্য মার্টিন লুথারের অনূদিত বাইবেলের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। বাইবেল ছাড়াও লুথার খ্রীষ্টান ধর্ম-সংক্রান্ত অনেক ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পুস্তকপুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে Hans Sachs (১৪৯৪-১৫৭৬) নামক একজন জুতাব্যবসায়ীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি লাতিন ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন। নিজ ব্যবসায় লিপ্ত থাকিয়াও এই লেখক ছয় হাজারের অধিক ক্ষুদ্র কবিতা এবং প্রায় দুইশত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটক এখনও অভিনীত হইয়া থাকে।

ষোড়শ শতাব্দীর অনেক অজ্ঞাতনামা লেখক নানা গল্পকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। ডক্টর ফাউস্টাস নামক জার্মান আখ্যায়িকা ইংলণ্ডেও অনূদিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না। মার্লো এই ঘটনা অবলম্বনে 'ডক্টর ফাউস্টাস্' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। Jorg Wickram নামক এক লেখক ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সর্বপ্রথম জার্মানভাষায় উপন্যাস

রচনা করেন। ইহার একখানি উপন্যাস *Der Gold fadem* ('The Gold Thread') ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্য মূলতঃ খ্রীষ্টানধর্মঘটিত সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শতাব্দীতে গদ্যানুশীলন একটু অধিকমাত্রায় অগ্রসর হইয়াছিল। কারণ আন্দোলন, আলাপ-আলোচনা, ধর্ম-সংস্কার ঘটিত বিচারবিতর্কে সর্বক্ষেত্রে গদ্যের ব্যবহার হইত। কিন্তু রসসাহিত্যের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। জার্মান সাহিত্য রেনেসাঁসের জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছিল, প্রাচীন ধর্মসংস্কারকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করিয়াছিল, যাজক সম্প্রদায়ের মূঢ়তাকে আক্রমণে আক্রমণে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। এই যে সদা সজাগ দৃষ্টি, প্রচলিত সংস্কার নত মস্তকে মানিয়া না লইয়া ইহার ত্রুটিবিচ্যুতিকে উদ্‌ঘাটিত করিবার বাসনা, ইহার মূলে রেনেসাঁসের আদর্শই প্রচ্ছন্নভাবে কার্যকরী হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যে তাহার প্রভাব প্রবল হইতে পারে নাই।

আমাদের বাঙলাদেশেও চৈতন্যপ্রভাবে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হইয়াছিল, তাহাও অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। পুরাতন ধর্মসংস্কারকে অস্বীকার করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ যে অনুরাগমূলক বৈষ্ণবধর্মের পত্তন করিলেন, ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য তাহার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

ইতালীয় সাহিত্য॥ খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইতালীয় সাহিত্যের মারফতে রেনেসাঁসের প্রভাব পশ্চিম য়ুরোপে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সুতরাং রেনেসাঁসের, বিশেষতঃ ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। যদিও চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে রেনেসাঁসের প্রভাবে ইতালীর সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করা যাইবে, কিন্তু এই তিন শতকের ইতালির রাজনৈতিক ইতিহাস ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, দল-উপদল পরস্পরে বিবদমান হইবার ফলে ইতালিতে শান্তি ছিল না। স্পেনের প্রথম চার্লসের অভিযানে এবং পঞ্চম চার্লস্ হোলি

রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হইলে ইতালির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। এই দুর্যোগের মধ্যেই ইতালিতে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তির মধ্যে রেনেসাঁসের বিস্ময়কর প্রভাব দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি বাস্তব ও মানসিক কারণের দ্বারা রেনেসাঁস ত্বরান্বিত হইয়াছিল ঃ—(১) ভৌগোলিক আবিষ্কার, (২) জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন, (৩) মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, (৪) তুরস্কের হস্তে কনস্টান্টিনোপ্‌লের পতন এবং হেলেনীয় সাহিত্যিক-দার্শনিকদের কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ ত্যাগ করিয়া ইতালির অভিমুখে পলায়ন, (৫) গ্রীক-রোমান সাহিত্যের প্রভাবে শুষ্ক খ্রীষ্টান ধর্মালোচনার স্থলে মানববাদী সাহিত্য শিল্পের প্রাধান্য, (৬) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা, (৭) সত্য ও সংস্কার সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ, (৮) ধর্মসংস্কার—এই কারণগুলি রেনেসাঁসকে আরও দ্রুত গতিবেগ দান করিয়াছিল। দান্তে হইতেই নবজীবন লাভের সূত্রপাত হয়, পেত্রার্কা (১৩০৪-৭৪), বোকাচিও (১৩১৩-'৫), লুইগি পুলচি (১৪৩২-৮৪), মাত্তেও মারিয়া, বোইয়ার্দো (১৪৩৪-৯৪) প্রভৃতি কবি, কাহিনীকার, মহাকাব্য লেখকগণ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইতালীয় সাহিত্যে রেনেসাঁসের বাণী ঘোষণা করেন। কিন্তু ষোড়াশ শতাব্দীতে বিশেষ কোন একক প্রতিভার উদয় না হইলেও বহুজনের চেষ্টায় এই শতাব্দীতে ইতালীয় সাহিত্যের নানা শাখা বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। লুডোভিকো আরিয়োস্টোর (১৪৭৪-১৫৩৩) *Orlando Furioso* (১৫১৬) মহাকাব্যে বিরাট জটিল ঘটনা স্থান পাইয়াছিল; কিন্তু চল্লিশ সর্গে সমাপ্ত এই বিপুলায়তন মহাকাব্যে বিস্ময়কর জীবনরস বিশেষ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে নাই। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছু রাখালিয়া গাথাকাব্য (pastoral) রচিত হইয়াছিল। জাকাপো সান্নাজারো (১৪৫৮-১৫৩০) রচিত 'আর্কাডিয়া'র স্নিগ্ধমধুর সাধারণ জীবনের চিত্র উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীয় ভাষায় অনেক ট্র্যাজেডি ও কমেডি রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। অবশ্য সেনেকার আদর্শে রচিত ট্র্যাজেডিগুলিতে বিশেষ কোন মৌলিকতা বা প্রতিভার চিহ্ন পাওয়া যায় না। কমেডিগুলি ট্র্যাজেডির তুলনায় উৎকৃষ্টতর তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইতালীয় কবি ট্যাসো (১৫৫৪-৯৫) নাটক, মহাকাব্য, গীতিকবিতা—কাব্যের সর্ববিভাগেই নিজ প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর

রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যে একদা বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তন্মধ্যে বিরহমিলনের স্নিগ্ধমধুর নাটক *Aminta* (১৫৭৩) এবং *Gerusalemme Liberata* (১৫৭৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ক্রুশেডে মুসলমানের কবল হইতে গডফ্রে কর্তৃক জেরুজালেম উদ্ধার এই মহাকাব্যের প্রধান বর্ণিত বিষয়। ইহাতে স্বাভাবিক-বহু ভাবেই যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা আছে, কিন্তু নায়ক-নায়িকার মিলনবিরহের কয়েকটি উপকাহিনীতে কবি অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এইজন্য কোন কোন সমালোচকের মতে ট্যাসোর মহাকাব্যে আদিরসাত্মক কাহিনীর প্রাধান্যের জন্য ইহার বীররসের অংশ কিছু ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনারীতিও অনিন্দনীয় নহে। সে যাহা হোক, বিরাট ও মহৎভাব সঞ্চারে তিনি সর্বত্র সাফল্য লাভ না করিলেও নারী চরিত্রাঙ্কনে যে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এই শতাব্দীতে ইতালির গদ্য যে কিরূপ বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ম্যাকিয়াভেলির (১৪৬৯-১৫২৭) *Il Principe* ('The Prince'-১৫১৬) এবং মেলিনির (১৫০০-১৫৭১) আত্মজীবনী। রাজনীতি ও রাষ্ট্র-বিদ্যা সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির *Il Principe* দীর্ঘকাল য়ুরোপে ক্লাসিক গ্রন্থের সম্মান লাভ করিয়াছে। প্রধানতঃ ইতালীয় সাহিত্যের মারফতে পশ্চিম য়ুরোপে রেনেসাঁসের বাণী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার যোগ্য।

ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্য

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য যেমন চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনকে কেন্দ্র করিয়া আশ্চর্য বিকাশ লাভ করিয়াছিল, সমসাময়িক ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যেও প্রায় অনুরূপ সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাইবে। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, ওড়িয়া ও আসামী সাহিত্যের উল্লেখ করা যাইতেছে।

হিন্দী সাহিত্য॥ ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্য বিস্ময়কর প্রাণশক্তি, গভীর ভক্তি, অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা ও শিল্পরসে পরিপূর্ণ। হিন্দী সাহিত্যের আদি-

মধ্যযুগ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা সাধারণতঃ 'ভক্তিকাল' নামে পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্যায়কে (অন্ত্য মধ্যযুগ) 'রীতিকাল' বলা হয় এবং উনবিংশ শতাব্দী হইতে আধুনিক কাল বা 'গদ্যকালের' আরম্ভ। 'ভক্তিকালে' হিন্দী সাহিত্য বিভিন্ন ভক্ত-সাধকের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ আদি ও মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে এই ভক্তিযুগের সাহিত্যে যথার্থ সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও গভীর অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। তখন মুঘল-শাসনকাল। দেশে নানা সামাজিক ও ধর্মীয় সঙ্কট চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় সন্ত-সাধকগণের দ্বারা ভক্তিধর্ম ও ভক্তিসাহিত্যের সবিশেষ অনুশীলন হওয়াই স্বাভাবিক। এই যুগে হিন্দী সাহিত্যে নির্গুণ ভক্তিশাখা, সগুণ ভক্তিশাখা ও সুফী ভক্তিশাখার বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল। অবশ্য কয়েকজন মুসলমান কবি কিছু কিছু রোমান্টিক আখ্যানকাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

সগুণ ভক্তিশাখার দুইটি উপবিভাগ পরিলক্ষিত হইবে—(১) রামভক্তিশাখা। (২) কৃষ্ণভক্তিশাখা। এই সময়ে পূর্বাঞ্চলে রামানন্দ এবং পশ্চিম অঞ্চলে বল্লভাচার্যের শিষ্যসম্প্রদায় রাম ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া সগুণ ভক্তিভাবে গীতি-কবিতা, ভজনগীতিকা ও আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভক্তিশাখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধিকা ও কবি মীরাবাইয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার উৎকৃষ্ট ভজনগীতিকাগুলি রচিত হইয়াছিল। অদ্যাপি তাঁহার ভজন সারা ভারতের কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে। মীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করিয়া অনুরাগে সিক্ত যে সমস্ত ভজনগীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আবেগের ঐকান্তিকতা ও রচনার নিষ্ঠা এখনও শ্রদ্ধার যোগ্য। তাঁহার পদাবলী শুধু হিন্দী সাহিত্যে নহে, রাজস্থান হইতে গুজরাট পর্যন্ত জনপদে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে উত্তরে ও পূর্বে অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস'কে ছাড়িয়া দিলে, অন্য কোন হিন্দীভাষী ভক্তকবির ভজনগান সর্বভারতে এরূপ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই।

বল্লভাচার্য-প্রভাবিত ভক্তিধর্ম 'পুষ্টিমার্গ' নামে এবং তাঁহার সম্প্রদায় 'বল্লভী সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। ব্রজভাষার কবি অন্ধ সুরদাস এই সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকার। ভাগবত অবলম্বনে রচিত তাঁহার 'সুরসাগর' হিন্দী ভক্তি-

সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য। রাধাকৃষ্ণের মিলনবিরহলীলা অবলম্বনে রচিত তাঁহার পদে উৎকৃষ্ট কবিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু বাৎসল্যরসের পদে সুরদাস অদ্বিতীয়; বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণও কেহ এবিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ নহেন। বল্লভাচার্যের আটজন ভক্তশিষ্য ও কবি 'অষ্টছাপ' নামে পরিচিত—সুরদাস, কুম্ভনদাস, পরমানন্দ দাস, কৃষ্ণদাস, ছীতস্বামী, গোবিন্দ-স্বামী, চতুর্ভুজদাস ও নন্দদাস। ইঁহারা কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে অনেক কাব্য ও পদ লিখিয়াছিলেন।

সগুণ ভক্তিশাখার আর একটি উপদল হইতেছে রামভক্তিশাখা। এই দলভুক্ত কবিগণ শ্রীরামচন্দ্রকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রামায়ণ অবলম্বনে কাব্যও লিখিয়াছিলেন। রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রধান ভক্ত ও কবি তুলসীদাস গোস্বামী রামায়ণ অবলম্বনে 'রামচরিতমানস' নামক কাব্য রচনা করিয়া সারা ভারতেই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দে হিন্দীর অন্যতম উপভাষা অবধীতে রচিত ভক্তিরসের এই রামায়ণকাব্য উত্তর ভারতের মনঃপ্রকর্ষ ও অন্তরাবেগকেই প্রকাশ করিয়াছে। যদিও 'রামচরিত-মানস' রামলীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য, তবু ইহাতে কবির ভক্তিনত ব্যক্তিগত চিত্তটি বিনীত আত্মনিবেদনে সার্থক হইয়াছে। কবি ও ভক্ত হিসাবে তুলসীদাস যেমন সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তেমনি তৎকালীন সমাজজীবনেও তাঁহার প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। অবহেলিত হিন্দুসমাজ 'রামচরিতমানস'কে নবজীবন-রসায়ন রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তাই প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দী সাহিত্য বিচার করিয়া কেহ কেহ তুলসীদাসকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিতে চাহেন। তুলসীদাসের ভক্তির আন্তরিকতা ও গভীরতা শিল্পসমুৎকর্ষ এবং সমাজজীবনে তাঁহার প্রভাব বিচার করিলে সমালোচকের মন্তব্য অস্বীকার করা যায় না।

এই যুগে রামভক্তিশাখা ও কৃষ্ণভক্তিশাখাভুক্ত আরও অনেক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'ভক্তমালে'র কবি নাভাদাস, 'হিতহরিবংশে'র রচনাকার এবং রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের নেতা নন্দদাস, তানসেনের গুরু হরিদাস গোস্বামী এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত মুসলমান কবি রস খানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই ভক্তিশাখাকে হিন্দী সাহিত্যে সগুণ ভক্তিশাখা বলা হয়। কারণ এই কবিগণ নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মকে রাম ও কৃষ্ণরূপে ভক্তি

নিবেদন করিয়াছিলেন। জনচিত্তে এই সগুণ ভক্তিশাখার এরূপ প্রভাব ছিল যে, অদ্যাপি তাহা লুপ্ত হয় নাই।

হিন্দী সাহিত্যে নির্গুণ ভক্তিশাখার কবিতাও কিছু অল্প রচিত হয় নাই। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কবিগণ নির্গুণ ব্রহ্মকে অন্তরের ভক্তিপ্রেম নিবেদন করিয়াছিলেন। কবীর, দাদু, মুলুকদাস, দরিয়া সাহেব—প্রধানতঃ ইঁহারাই নির্গুণ ভক্তিশাখাকে হিন্দীসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। কবীর গোরক্ষনাথ-সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াও আচারবিচারের গোঁড়ামি ছাড়িয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অবলম্বন করেন এবং তাঁহাকে রাম বলিয়াই ভক্তি নিবেদন করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আচারবিচার সংক্রান্ত রক্ষণশীলতার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার দোঁহার উদার বিশ্বধর্ম, মানব ধর্ম ও ব্রহ্মভক্তি অবিরোধে স্থান পাইয়াছে। কবীর প্রচলিত অর্থে বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু ভক্তির অনুভূতি তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—পুঁথিপত্র তো অন্তরের কাছে মলিন হইয়া যায়। পরবর্তী কালে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার অখণ্ড প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

দাদু দয়াল, দরিয়া সাহেব প্রভৃতি নির্গুণ ভক্তকবিগণ 'সন্ত'নামে পরিচিত। ইঁহারা জাতিপাঁতির ভেদ ঘুচাইয়া দিয়া বিশ্বজনীন মানবধর্মের জয় ঘোষণা করেন। যে মানুষের জাতি নাই, ধর্ম নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা নাই, সেই মানুষই যথার্থ ভক্ত। ইঁহাদের বহু পদে ঈশ্বরভক্তি ও মানবতত্ত্ব একসঙ্গে মিশিয়া গিয়া হিন্দী সাহিত্যে এক বিচিত্র কাব্যবৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের আর একটি শাখার উল্লেখ করা কর্তব্য—ইহা আখ্যানকাব্য। সুফী মতাবলম্বী মুসলমান কবিগণও হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই কবিগণ কিছু কিছু আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন, যাহার মূল বক্তব্য বাস্তব ও রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার মিলনকাহিনী। কিন্তু কোন কোন কবি আবার আখ্যানের রূপকে প্রেমমার্গীয় সুফী মতের আভাস দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাণা ভীমসিংহ, পদ্মিনী ও আলাউদ্দিনের ঐতিহাসিক কাহিনী ইহার প্রধান ঘটনা হইলেও সুফীমতের জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের আকর্ষণই এখানে অতিশয় সূক্ষ্মতর কৌশলে ব্যাখ্যাত

হইয়াছে। জায়সী অবধী ভাষায় এই দীর্ঘ আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি আকারের দিক দিয়া মহাকাব্যের সমতুল্য, হিন্দীসাহিত্যে এরূপ নিটোল কাহিনীকাব্য কদাচিৎ পাওয়া যায়। সর্বোপরি ইহাতে বাস্তব ইতিহাস ও সূক্ষ্ম সুফী মতের অধ্যাত্ম সাধনাকে জায়সী যেভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ শক্তিশালী কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সময়ে আরও কয়েকজন মুসলমান কবি কিছু কিছু রোমান্টিক কাহিনী-কাব্যে রচনা করিয়াছিলেন। কুতুবনের 'মৃগাবতী' (১৫০২ খ্রীঃ অঃ), মংঝনের 'মধুমালতী', ওসমানের 'চিত্রাবতী' এবং নুরমহম্মদের 'ইন্দ্রাবতী' কাহিনী কাব্য সর্বত্র হিন্দু নায়ক-নায়িকা অবলম্বনে প্রেমের গল্প অনুসৃত হইলেও কবিগণ অধিকাংশ স্থলে প্রচ্ছন্নভাবে সুফীমতানুসারী অধ্যাত্ম প্রেমেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন। সাহিত্যে যে সাম্প্রদায়িকতা নাই, তাহা এই মুসলমান কবিগণ প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা কাব্যের উপাদান-কাহিনীকে যথাসাধ্য হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন। দুই একজন হিন্দু কবিও সুফীধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অনুরূপ ধরণের আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন। শাহজাহনের সময়ে সুরদাস নামক এক পঞ্জাবী হিন্দু 'নলদময়ন্তী কথা'য় ঐ একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যের বিকাশ ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে। ষোড়শ শতকে যেমন নির্গুণ ও সগুণ ভক্তিশাখার হিন্দু ভক্তকবি ও সুফীমতাবলম্বী কিছু কিছু মুসলমান কবি হিন্দী সাহিত্যের রূপ ও রীতিগঠনে বিশেষভাবে সফল হইয়াছিলেন, বাঙলাদেশেও তেমনি চৈতন্যপ্রভাবে বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করা যাইবে। উত্তরাপথের রামানন্দ ও বল্লভাচার্যের শিষ্যের দলই এই শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যকে ভক্তিসাহিত্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। চৈতন্য-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য ও মহাপ্রভুর প্রভাবে অনুরূপ বিশুদ্ধি ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে যেমন মঙ্গল-কাব্যও রচিত হইয়াছিল, মুকুন্দরাম নারায়ণদেবের মতো উৎকৃষ্ট কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, হিন্দী সাহিত্যে ঠিক সেইরূপ উপধর্মাশ্রয়ী আখ্যানকাব্য বা উক্ত মতাবলম্বী গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। রাম, কৃষ্ণ, সুফীমত এবং নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা—মোটামুটি এই কয়টি ধর্মাশ্রয়ী কাব্যশাখা ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।

সুফী মতের সাধকগণ হিন্দু আখ্যানকাব্যের মারফতে গভীর অধ্যাত্মমুখী প্রেমতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া আলাওল-দৌলতকাজি প্রভৃতির চেষ্টায় কতকটা অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আলাওল জায়সীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া 'পদ্মাবতী' রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মর্ত্যজীবনকেন্দ্রিক রোমান্টিক কাহিনীর অভাব হিন্দী সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। হিন্দী সুফী কবিগণ আখ্যান কাব্যসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে নিজ নিজ মতাদর্শ প্রচার করিলেও চরিত্রগুলি পুরাপুরি রূপকে পরিণত না হইয়া অনেক স্থলে রক্তমাংসের বাসনাবেদনায় ব্যাকুল মর্ত্যমানব-মানবীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এ দিক দিয়া হিন্দী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে ছাড়াইয়া অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। ভক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে মীরাবাই, তুলসীদাস, কবীর, সুরদাসের ভজনগীতিকা ও কাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের তুলনায় কোন দিক দিয়াই ন্যূন নহে। তুলসীদাসের সমধর্মী কোন কবি বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে আবির্ভূত হন নাই। মীরাবাইয়ের ভজনে যে ব্যক্তিগত আর্তি-অনুভূতি আছে, বাঙলার বৈষ্ণবসাহিত্যে পদকর্তাদের সেরূপ ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায় না। কবীরের দোঁহার প্রচ্ছন্ন অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা আধুনিক কালেও বিস্ময় উদ্রেক করিবে। কিন্তু মুকুন্দরামের মতো কাহিনী-গ্রন্থন ও চরিত্রসৃষ্টির নিপুণতা, বিজয় গুপ্তের পরিহাস রসিকতা, নারায়ণদেবের বিশালতাবোধ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের মতো বিস্ময়কর গ্রন্থ এবং পরিশেষে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-বলরামদাসের মতো অদ্ভুত শিল্পসমুৎকর্ষ ও আবেগের নিবিড়তা মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যে খুব সুলভ নহে।

গুজরাটী সাহিত্য ॥ ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যে যেরূপ বিচিত্র দিকে বিকশিত হইয়াছে, গুজরাটী সাহিত্যে ঠিক সেইরূপ উৎকর্ষ ততটা দেখা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে গুজরাটী ভাষায় ভক্তিসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল। সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত জুনাগড নিবাসী নরসিংহ মেহ্‌টা গুজরাটী ভক্তিসাহিত্যে অক্ষয় মহিমায় অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি নিজে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইলেও পরবর্তী শতাব্দীতেও তাঁহার প্রভাব সমগ্র গুজরাটী সাহিত্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মীরাবাইয়ের ভজনগীতিকা হিন্দী

সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ হইলেও আসলে ভক্তিমতী মীরা ছিলেন রাজস্থানের অন্তর্গত চিতোড়ের অধিবাসিনী ; তাঁহার গানগুলি মূলতঃ পশ্চিমা রাজস্থানী বা গৌর্জরী অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল—এই গৌর্জরী অপভ্রংশ হইতে গুজরাটী, মেওয়ারী ও মাড়োয়ারী ভাষাসমূহের জন্ম হয়। অবশ্য অঞ্চলভেদে মীরার ভজন নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিয়া সেই অঞ্চলের ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

গুজরাটী সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রোমান্টিক আখ্যানকাব্য জনচিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এ বিষয়ে গুজরাটী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যেই গুজরাটীর এই বৈশিষ্ট্যটুকু অভিনব। ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন পুরাণ অবলম্বনে গুজরাটী কাব্য রচিত হইয়াছিল, তেমনি প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনেও এমন সমস্ত আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল, যাহার মূল বিষয় নরনারীর বাস্তব আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হইয়াছিল। এই সমস্ত কাহিনী অনেক সময়ে লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িত, তারপরে পুঁথি-পত্রের আশ্রয় পাইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই রূপ বাস্তবধর্মী অনেক চমৎকার রোমান্টিক আখ্যানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গুজরাটী সাহিত্যে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে যেমন বীররসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী একপ্রকার সুস্থ ও বলিষ্ঠ আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিল, সেইরূপ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ভক্তিসাহিত্য ও পৌরাণিক সাহিত্য ছাড়াও এই জাতীয় বাস্তব-অনুগামী প্রেমের কাহিনী অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এ দিক দিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য অতিশয় দুর্বল। পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত গীতিসাহিত্যে এবং আরাকান রাজসভার কোন কোন মুসলমান কবির সামান্য কাব্যপ্রচেষ্টা বাদ দিলে বাঙলাদেশে মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মলেশবর্জিত মর্ত্যজীবী আখ্যান-উপাখ্যানের বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না।

মারাঠী সাহিত্য ॥ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া মারাঠী সাহিত্যের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, তাহা আমারা অন্যত্র আলোচনা

করিয়াছি।* পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে মারাঠী সাহিত্যের বিশেষ কোন উৎকর্ষ, বৈচিত্র্য বা বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আবার ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া মারাঠী সাহিত্যে নবজীবনের জোয়ার আসিল। একনাথ ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান উদ্‌গাতা। মারাঠী ধর্মসাহিত্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্য—এই মতের কবিগণ সাহিত্যকে শুধু সাহিত্য হিসাবে দেখেন নাই, বা শুধু ব্যক্তিগত ধর্ম-সাধনার অঙ্গ হিসাবেও গ্রহণ করেন নাই। সমাজের অনাচার, পাপতাপ, ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি কদাচার নিরাকরণে ভজনগীতিকা ও আখ্যান কাব্যকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মারাঠী সাহিত্যের জনক বলিয়া স্বীকৃত জ্ঞানেশ্বর মূলতঃ ধর্মজগতের লেখক হইলেও সমাজের অন্ত্যজদের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর একনাথ সেই পথটি ধরিয়াছিলেন। ১৫৬৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে মারাঠী ভাষায় 'ভাগবত' রচনা করেন। সন্ত জ্ঞানেশ্বরের 'জ্ঞানশ্বরী'-কে বাদ দিলে সমগ্র মারাঠী সাহিত্যে একনাথের 'ভাগবতে'র তুলনা পাওয়া যায় না। স্ত্রী ও শূদ্রসমাজ, শাস্ত্রযাজীরা যাহাদের কথা কোনদিনই চিন্তা করেন নাই, একনাথ তাহাদের কথা ভাবিয়া সর্বজনবোধ্য মারাঠীভাষায় এই 'ভাগবত' রচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, ভগবান নিজে সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন নাকি? আর চোরডাকাতে সৃষ্টি করিয়াছে মারাঠী ভাষা? মারাঠীভাষায় তিনি শাস্ত্র গ্রন্থাদি প্রচার আরম্ভ করিলে সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতের দল তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অন্দোলন করিয়া-ছিল; কিন্তু একনাথের বাণী সাধারণ মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়াছিল, পণ্ডিত-দের বিরোধিতা তাঁহার সাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল। 'রুক্মিণী স্বয়ংবর' এবং 'ভাবার্থ রামায়ণ'ও তাঁহার রচনা। ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পূর্বতন বিখ্যাত গ্রন্থ 'জ্ঞানেশ্বরী'কে সংশোধন করিয়া বিশুদ্ধরূপে প্রচার করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পরবর্তী শতাব্দীতে 'দত্তাত্রয়' নামক একটি উপসম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছিল, যাঁহারা পুরাণের 'দত্তাত্রেয়' ঋষিরভাবে ভক্তিসাধনা করিতেন। সরস্বতী গঙ্গাধরের 'গুরু চরিত্রে' এই আদর্শ ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। দশোপন্ত নামক একনাথের সমসাময়িক আর এক ভক্তকবি

* এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১ম) দ্রষ্টব্য।

১,২৫,০০০ শ্লোকে 'গীতার্ণব' নামক গ্রন্থে গীতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে মারাঠী সাহিত্যের প্রধান কবিগণ সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া মারাঠী ভাষায় এমন সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ ও গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে সমাজের আপামর জনসাধারণ সাহিত্য ও কাব্য হইতে মুক্তির বাণী, ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শ লাভ করিতে পারে। এই সময়ে আর একদল কবি অলঙ্কৃত ভাষায় সংস্কৃতগন্ধী রচনারীতির সাহায্যে পণ্ডিত ও রসিকজনের জন্য মারাঠী ভাষায় মহাভারত রামায়ণাদি অনুবাদের চেষ্টা করিয়াছিলেন। একনাথের দৌহিত্র মুক্তেশ্বর মহাভারতের মারাঠী অনুবাদ করিয়া বিখ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার অনুবাদের সামান্য মাত্র হস্তগত হইয়াছে। লোকশ্রুতি অনুসারে, তাঁহার মহাভারত অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে পাছে ব্যাসদেবের যশ আচ্ছন্ন হইয়া যায়, এইজন্য নাকি তাঁহার অধিকাংশ রচনা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ইনিও সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া মারাঠী ভাষায় ভক্তিসাহিত্য রচনার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। অবশ্য মুক্তেশ্বর রামায়ণকাব্যে সংস্কৃত ছন্দের সাহায্য লইয়াছিলেন। এই যুগে কিছু কিছু বাস্তব নরনারীর কাহিনী লইয়াও মারাঠী কাব্য রচিত হইয়াছিল। বামন পণ্ডিত নামক এক কবি সংস্কৃতভাষা ও ছন্দের প্রভাবে কিছু কিছু এই জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি তুকারাম মারাঠী কাব্যসাহিত্যকে পরম গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ওড়িয়া সাহিত্য ॥ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে সরলদাসের মহাভারত, বলরামদাসের রামায়ণ এবং জগন্নাথ দাসের ভাগবত সরলভাষায় উড়িষ্যাবাসীর মনপ্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই ওড়িয়া সাহিত্যে 'পঞ্চসখা' (বলরামদাস, জগন্নাথদাস, অনন্তদাস, যশোবন্ত দাস ও অচ্যুতানন্দ দাস) নামে পরিচিত কবিপঞ্চক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সমগ্র ওড়িয়া সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ জয়দেবকে ওড়িয়া বলিয়া দাবি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা এ দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। জয়দেব যে বাঙালী ছিলেন তাহা আমরা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখানে সে প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।* কিন্তু

* লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১ম) দ্রষ্টব্য।

জয়দেব ওড়িয়া না হইলেও ওড়িয়া সাহিত্যের উপর যে অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে দুইটি স্পষ্টধারা প্রত্যক্ষ করা যাইবে। একদল সরলভাষায় রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কাব্য সমাজের অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্যই রচিত। কাজেই এই সমস্ত কাব্যের ভাষা সহজ, সরল ও অলঙ্কারহীন। আর একদল সংস্কৃতানুসারী ভাষায় শিষ্টজনের জন্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাবে ওড়িয়া সাহিত্যে যে কাব্যধারা অনুশীলিত হইয়াছিল, তাহাতে রচনার সৌকুমার্য, কারুকর্ম ও সংস্কৃত ভাষা-ছন্দের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হইবে। এই প্রভাব ক্রমে মাত্রা ছাড়াইয়া যায় এবং মাঘ-ভারবির অনুসরণে সংস্কৃত ভাষার অন্ধ অনুকরণ অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া ওঠে। ফলে ষোড়শ শতাব্দী হইতে একটি কৃত্রিম কাব্যরীতি ওড়িয়া বিদগ্ধমণ্ডলী ও পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ সমগ্র ওড়িয়া সাহিত্যের উপর অসাধারণ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে পুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কাব্য রচনা করেন, কিন্তু পরে নিজেও কাহিনীর উদ্ভাবন করিয়া মৌলিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'লাবণ্যবতী' কাব্য ওড়িয়া সাহিত্যে সর্বাধিক পরিচিত। উপেন্দ্র ভঞ্জের প্রভাবে যে কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়, তাঁহারা অনেক সময় পুরাণ বা ধর্মগ্রন্থ বাদ দিয়া মর্ত্যজীবনের কাব্য রচনা করিতেন এবং ভাষা ও ছন্দে আয়াসসাধ্য শিল্পকর্মের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেন।

এই সময়ে এইরূপ কৃত্রিম কাব্যকলার পাশে পাশেই একটি কৃষ্ণভক্তিশাখাও গড়িয়া ওঠে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে দীন কৃষ্ণদাস, অভিমন্যু সামন্ত, কবিসূর্য বলদেব রথ, গোপালকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্ত কবিগণ মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে সুস্থ, স্বাভাবিক প্রেমভক্তির কবিতা ও গান লিখিয়া গতানুগতিক কাব্যকলার মধ্যে স্নিগ্ধ মাধুর্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তিমার্গীয় ওড়িয়া সাহিত্যে চৈতন্যদেবেরও কিছু পরোক্ষ প্রভাব আছে। তাঁহার অনেক উৎকলীয় ভক্ত চৈতন্যজীবনী বিষয়ক কাব্য লিখিয়া ওড়িয়া সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

অসমীয়া সাহিত্য ॥ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর দিকে অসমীয়া সাহিত্যে অনুবাদের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্বে পণ্ডিতসমাজ ও উচ্চতর মহলে সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণ প্রচলিত থাকিলেও জনসাধারণ তাহা হইতে কোন স্বাদগন্ধ পাইত না। কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁহার রাজসভায় কিছু কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ ভাষায় অনুবাদের নির্দেশ দিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের সমসাময়িক অনন্তকন্দলী সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া অসমীয়া ভাষা অবলম্বনে রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবও সংস্কৃত ছাড়িয়া লোকভাষায় কাব্যরচনার কথা বলিয়াছেন।

এই সময়ে আসামে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক শাসকশক্তি দেশের অঞ্চল বিশেষে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং প্রথামতো তাঁহারা তাঁহাদের সভায় কবিসাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করিতেন। পূর্ব-আসামের অন্তর্ভুক্ত কুচবিহার ও দরং রাজসভায় এইভাবে অসমীয়া কবিদের স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অসমীয়া ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়া রামসরস্বতী কুচবিহার রাজের নিকট অর্থ ও উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্য মূলতঃ অনুবাদ গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃত মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতি অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়া অতি দ্রুতবেগে অসমীয়া ভাষায় স্বাতন্ত্র্য স্থাপনের চেষ্টা—এই শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তদানীন্তন প্রধান প্রধান ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। একটি ভক্তিশাখা, যাহা মূলতঃ গীতিধর্মী এবং অধিকাংশ স্থলে রাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। অবশ্য রামভক্তিশাখাও কোন কোন প্রদেশের সাহিত্যে বিশেষভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত বা অন্যান্য পুরাণের সহজ প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ—ভারতীয় সাহিত্যের নানা অঞ্চলেই প্রত্যক্ষ করা যাইবে। তৃতীয়তঃ কিছু কিছু মর্ত্যজীবনকেন্দ্রিক আখ্যানকাব্যও এইযুগের সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে। ষোড়শ শতাব্দীর ওড়িয়া ও অসমীয়া সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের পাশে অতিশয় দীন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ

করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর যে নবীন জীবনবার্তা বাংলা, হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটী সাহিত্যে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়, যাহার মূল সুর গূঢ় ভক্তিকে অবলম্বন করিয়াছে—অসমীয়া ও ওড়িয়া সাহিত্যে সেইরূপে বিচিত্র ঐশ্বর্য ততটা পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। সে যাহা হোক, ষোড়শ শতাব্দীর আর্যশাখাসম্ভূত ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশে নানা পার্থক্য থাকিলেও, ধর্মানুভূতি, বিশেষতঃ আবেগমূলক প্রেমভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় সর্বত্রই একটা সাহিত্যিক রেনেসাঁস বিচিত্র দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

নির্ঘণ্ট

পা. টী.—পাদটীকা